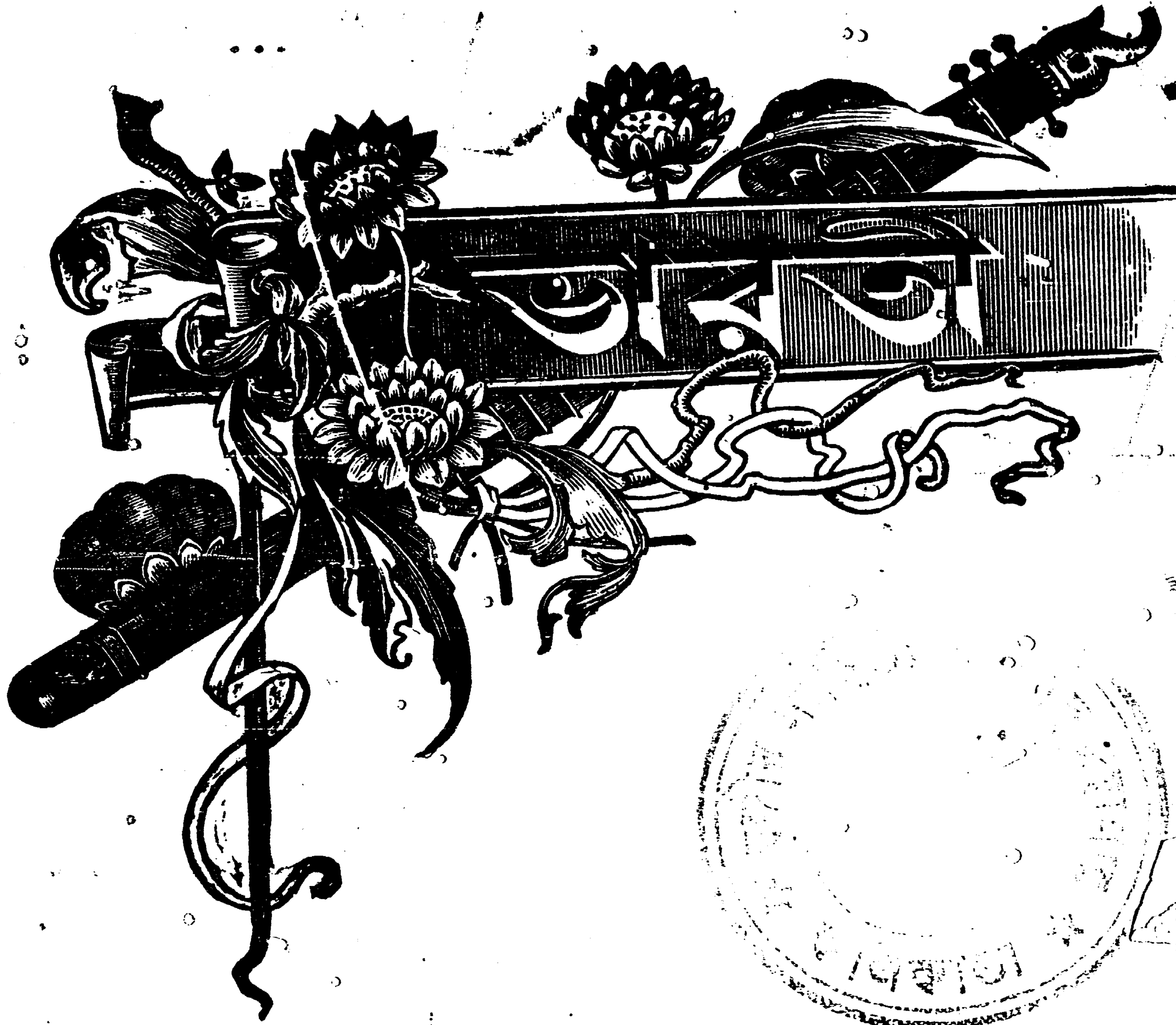

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত।

৩২শ বর্ষ।

১৩১৫

TORN PAGES

ভারতী

১৩১৫

৩২শ বর্ষ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অরিসিংহ	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫
অসম্পূর্ণ	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৭৯
অমরগুচ্ছ	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৮৯, ১৪০, ১৫২
অশেষ	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	১৫১
অনন্তরূপ	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার ...	২৮০
অরণ্য স্বর্গ	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৩০৯
অসময়ে	শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু ...	৩৪৫
আরতি	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১
আধুনিক জাপান	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৮, ৮৪, ১৩৩, ১৭৫, ২১৭, ২৬৭
আহ্বান	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ...	৪৬
আঁখি	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	১৩২
আদর্শ জননী	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ...	২২০
আমাদের কর্ত্তব্য	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	২২৯
আচার্য্য বসুর আবিষ্কার ...	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক	৩৫৮, ৪২৫, ৪৮০
আসামের শঙ্করদেব ও মাধবদেব ...	শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	৩৮৩, ৪০৮, ৪৫৮
আঁখি ও তারা	শ্রীসুখরঞ্জন রায় ...	৪৯২
আর্য্যঋষির কামনা	শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত ...	৪৯৩
ইতুর কথা (সংক্ষিপ্ত) ...	শ্রীমতী সুরমা দেবী ...	৪৯৯
ঐ	শ্রীমতী সেফালিকা দেবী ...	৫০০
ইতুর অর্থ ব্যাখ্যা	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ...	৫০৪

TORN PAGES

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উদারনীতি ও রক্ষণশীলতা ...	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৪১৫
একজন বহিষ্কৃতের দৈনিক লিপি ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৭৯
ঐতিহাসিক বীরগাথা	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	৩২৬
ওরাওন জাতি	শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ...	১৪৫
কর্ম্মচক্র	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	১৭
কর্জ্জন (লর্ড) ও বর্ত্তমান অরাজকতা ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৯২
কাব্যে বর্ষাচিত্র	শ্রীযামিনীকান্ত সেন ...	২৬৩, ৩১০
কি ও কেন	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩২৯
কল্পনার প্রতি	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	৩৩৫
কল্পনা	শ্রীসত্যরঞ্জন সেন ...	৪১৮
কর্ত্তব্য কোন্ পথে	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৪৩০
কবি সমাধি	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ...	৫২৪
ক্ষুদ্রজীব	শ্রীশশধর রায় ...	১৫৫
খুঁটিব্রত বা ইতুর কথা	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ...	৪৭৪
গুরুদক্ষিণা	শ্রীমতী অনুপমা দেবী ...	৩৪৫
ঘটনাচক্র	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১৫৮
ঘাটকালী ব্রতকথা	শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া ...	৫৪৯
ঘুম	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ...	৩৫৪
চন্দ্রে জীব আছে কি না ...	শ্রীকুলদাকুমার সেন রায় ...	১৯৩
চয়ন		২৯১, ৩৪০, ৩৮০, ৪৩৩, ৪৮৪, ৫৩৪
ছাত্রের নিদ্রাসম্ভাষণ	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	৪২৫
জাতীয় মহাসমিতি	...	৩৭৮
ডাকের সৃষ্টি বিবরণ	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ...	৮
তরুসিংহ	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫০৫
দেবতার কোপ	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	২৪
দুর্ভিক্ষ	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ...	৯৬
ঐ	শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ...	২৮১
দূরে অতি দূরে	শ্রীমতী আমোদিনী দাসী ...	২২৮
দুর্গম পথে পান্থ	শ্রীচণ্ডিচরণ মুখোপাধ্যায় ...	১৭৪
দিবস	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	২৮৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দুই ইচ্ছা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫১০
ধনিয়াসুত্ত	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৮৬
ধ্রুবতারা	শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র ...	৪৬৭
নিয়তি	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৭৪
নির্ভর	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ...	২৩২
নির্ব্বন্ধ	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	২৫৮
নিস্পৃহ	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	২৬২
নান্দী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৩৫
নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা ...	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ...	৪০২
নিষ্ফল	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ...	৫০৪
নবীনচন্দ্র সেন (স্বর্গীয়) ...	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৫২৫
পরিচয়	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৭১
প্রশ্রয়	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৩
পুষ্পমালা ...	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৩৫, ৫৬, ১১৭
পুরাতন বেথুন স্কুল	শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র ...	৮০
পথ ও পাথেয়	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৭
পূর্ণিমা উপহার	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	১১৬
পৌরাণিক ব্রতকথা	শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী ...	২৪৯
প্রার্থনা	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ...	৩২২
পূর্ব্ববঙ্গে নিরাকালী ব্রত ...	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ...	৩২৩
পূজা	শ্রীমতী কমলা দেবী ...	৩৩৯
পরিত্যক্ত বা পরিত্যক্তা ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ...	৩৯৩
পূজার স্বপ্ন	শ্রীসুখরঞ্জন রায় ...	৪৪৮
প্রেম স্বপ্ন	শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ...	৫০৯
প্রেম	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	৪৯২
ফাগুনে	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ...	৪৯৯
বাসবদত্তা	শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় ...	৫৫২
বাঙ্গালার গীতকথা	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ...	৩১
বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ...	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ...	২
বিলাতের রমণী	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক	৭৫, ১২৪, ৩১৬
ব্যর্থ	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	১৫১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিসর্জ্জন	শ্রীতরুণরাম ফুকন ...	১৭৯
বিস্মৃত স্মৃতি	শ্রীমতী অনুপমা দেবী ...	২০৪
বুকে	শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য ...	২৬২
বর্ণ রহস্য	শ্রীমনোমোহন সেন ...	৩৬৩
বিলাতি জাহাজে	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক ...	৫২৯
বীরধাত্রী	শ্রীসুখরঞ্জন রায় ...	৫৪৭
বর্ষ-বিদায়	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৫৮৮
ভারতবর্ষের বিদুষী রমণী ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬৭
ভারতে ডাকপ্রথা	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ...	২২১
ভগ্নবীণা	শ্রীসত্যরঞ্জন সেন ...	৩০৪
ভারতের ভূতপূর্ব্ব কয়েকজন লাট	...	৪৬৮
মহতাব সিংহ	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৪১
মানসী	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	৬
মাসিক পত্রের ত্রুটি ...	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ...	৪৯
ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য	সম্পাদিকা ...	৫৩
মৃত্যুঞ্জয়	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ...	৭৪
মিলনের আশা	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ...	২১৬
মেয়ে যজ্ঞি	শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী ...	২২৫
মিলনে বিরহ	শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ...	২৬০
মহিলা শিল্পসমিতি	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	২৭৭
মাতা শত্রু	শ্রীমতী মাধুরীলতা দেবী ...	২৯৭
মহারাজা সূর্য্যকান্ত	সম্পাদিকা ...	৩৬৬
মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা ...	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ...	৩৭৫
মাতৃমঙ্গল	শ্রীকুলচন্দ্র দে ...	৩৯৩
মানসীর প্রতি	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ...	৪০৭
মণিসিংহ	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৫১
মৃত্যুর প্রতি	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	৫৫৮
যাদু	শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ...	৩৭৪
যদি-তবে	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ...	৪৯১
যৌবন উৎস ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ...	সম্পাদিকা ...	১৮১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রাজ্যের কথা		২৩৩, ২৮৫, ৩৪২, ৩৮৮, ৪৩৮, ৪৮৬, ৫৩৮, ৫৮৪
রূপার কাটির জয়	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৫৯
লাফকাডিয়ো হার্ণের জাপান চিত্র ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০৪, ৩৫৫, ৪১৯, ৪৬১
শিশু	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯১
শ্রীপঞ্চমী ...	শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী ...	১২৮
শুকতারা	শ্রীতরুণরাম ফুকন ...	২৮০
শিকার কাহিনী	শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য ...	৩৬৮
শেফালিকা	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ...	৪৪৪
সুবেগ সিং ও সবজ সিং ...	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৩৬
সূর্য্যকান্ত	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ...	৩৬৫
সাঞ্চীর তোরণ ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৩৭১
সম্রাটের ঘোষণাবাণী ...	...	৩৭৯
সিকিম ভ্রমণ	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ...	৪৪১
স্বদেশী সার্কাস	সম্পাদিকা ...	৪৭৩
স্পর্দ্ধা	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১২৩
সদুপায়	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬৭
সময়াভাব	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	১৮০
সন্ধ্যা	শ্রীতরুণরাম ফুকন ...	২১৬
সন্ধ্যায়	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ...	২১৬
সমালোচনা		২৯৩৯, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৯২, ৪৭০, ৫৪০
স্বপ্ন-কন্যা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৪৯৪
স্পষ্ট কথা ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫১৫
"সমর্পণ"	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার ...	৫২৩
সুন্দর	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার ...	৫৮৪
হাম্বির	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৭, ২৭৪
হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক স্বার্থ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	২৫৫

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৫, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

আরতি।

হে মনোমহিনি, দেবি, বীণাপাণি,
উজ্জ্বলরূপা অরুণা,
ঢালিছ সতত, অযাচিত তব
পুণ্যপ্রসাদ করুণা !
চাহি বা না চাহি তবু হাসি মুখে
দরশন দাও আসিয়া,
জানি বা না জানি, তোমারি চরণে
চিত্ত চলেছে ভাসিয়া।
তোমা ছাড়ি যদি দূরে চলি যাই
সহসা প্রকাশ নয়নে,
জাগরণে যদি ভুলিয়া বা থাকি
বিরাজিত হও স্বপনে !
তবে,—তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ
জীবন হউক ধন্য !
দেহ প্রাণ মন হউক পতন
জননি, তোমারি জন্য।
দাও নব বল আন সুমঙ্গল,
হে বরদায়িনি ভারতি,
পুরাতন ব্রত করি উদযাপিত
নবোৎসাহে জ্বালি আরতি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়।

খৃষ্টীয় ৭৫০—১২০৩।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব হ্রাস হইলে ভারতে আর একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। উহার নাম বিক্রমশিলা। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা বিক্রমশিলা মহাবিহার নামে কথিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে আবার বিক্রমশীল দেবমহাবিহার এরূপ নামও দৃষ্ট হয়। স্রগ্ধরাস্তোত্র নামক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার জিনরক্ষিত স্বীয় টীকার শেষভাগে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"শ্রীমদ্‌বিক্রমশীলদেব মহাবিহারীয় রাজগুরুপণ্ডিত ভিক্ষু
শ্রীজিনরক্ষিতকৃতা বালার্কস্তুতিটীকা পরিসমাপ্তা।"

লামা তারানাথের মতে মহারাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক বিক্রমশিলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মপালের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন ৮৭৫ খৃঃ অঃ হইতে ৮৯৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিশ বৎসরকাল ধর্ম্মপাল বঙ্গ ও বিহারে রাজত্ব করেন *। পাগ্‌ছাম্ জোঙ্গাঙ ও লামা তারানাথ প্রভৃতির তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া দেখা যায় ধর্ম্মপাল ৭৬৫ হইতে ৮২৯ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গ ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাহা হউক ডাক্তার মিত্র ও তিব্বতীয় গ্রন্থকার উভয়েরই মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ ধর্ম্মপাল জীবিত ছিলেন। তিব্বতীয় গ্রন্থকারগণের বর্ণনানুসারে দেখা যায় বিক্রমশিলা-বিহার, গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। কথিত আছে বিক্রমশিলার পার্শ্বে উত্তরবাহিনী গঙ্গা। নানা কারণে আমাদের বোধ হয়, বর্ত্তমান ভাগলপুরের সন্নিধানে সুলতানগঞ্জ নামক স্থানে বিক্রমশিলা অবস্থিত ছিল †। Archœlogical রিপোর্টে প্রকাশ নালন্দার (বর্গাঁর) সন্নিধানে বিক্রমশিলার অবস্থান কিন্তু বিশেষ যুক্তি না পাওয়ায় ঐ মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কেহ কেহ আবার বলেন বঙ্গদেশের বিক্রমপুর পরগণা প্রাচীন বিক্রমশিলারই নামান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য এ মতও নিতান্ত যুক্তিহীন।

বিক্রমশিলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার সংরক্ষণকল্পে মহারাজ ধর্ম্মপাল প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন। ঐ ভূমির উপসত্ব হইতে প্রতিদিন ১০৮ জন স্থায়ী অধ্যাপক এবং অসংখ্য অভ্যাগতের আহার নির্ব্বাহিত হইত। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ অধ্যাপক বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইতেন। মহারাজ ধর্ম্মপালের সময়ে মহামনীষী বিদ্বদ্বর আচার্য্য শ্রীবুদ্ধজ্ঞানপাদ বিক্রমশিলার অধিনায়ক ছিলেন। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) বিক্রমশিলার অধ্যক্ষতা করেন।

---

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo-Aryan, Volume II. page 232 দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত বুদ্ধিষ্ট টেক্সট্ সোসাইটীর জর্ণাল ভলুম ১, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০—১২ দ্রষ্টব্য।

ব্যাকরণ, দর্শন, ন্যায়, ও তন্ত্র এই কয়টী বিষয় বিক্রমশিলা মহাবিহারে বিশেষভাবে অধ্যাপিত হইত। এই বিহারের চারিদিকের দেয়ালের উপরিভাগে কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত থাকিত। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের সাধারণ উপাধি পণ্ডিত। বারেন্দ্র (রাজসাহীর) বিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক আচার্য্য জেতারি অনুমান ৯৪০ খৃঃ অব্দে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাজা মহাপালের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হন। অনুমান ৯৮৩ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরের সুবিখ্যাত রত্নবজ্র বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাজা চণকের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিত উপাধি লাভ করেন।

ভারতের বিদ্বত্তম মনীষিগণ বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষকপদে নিযুক্ত হইতেন। ঐকালের দ্বাররক্ষকের পদ বর্ত্তমান সময়ের দ্বারপণ্ডিতের তুল্য বলিয়া বোধ হয়। এককালে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এত প্রভাব ছিল যে, যিনি সেখানে আসিয়া নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে না পারিতেন তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দ্বাররক্ষকের নিকট নিজের পরিচয় দিতে হইত। যিনি দ্বাররক্ষকের সহিত বিচারে পরাস্ত হইতেন তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টী দ্বার ছিল যথা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্যের প্রথম দ্বার ও দ্বিতীয় দ্বার। ৯৫০ হইতে ৯৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সময়ে রাজা চণকের রাজত্বকালে ভারতের নিম্নলিখিত সুবিখ্যাত বিদ্বদ্‌গণ বিক্রমশিলার দ্বাররক্ষকের কার্য্য করিতেন :—

(১) পূর্ব্বদ্বারে—আচার্য্য রত্নাকর শান্তি।
(২) পশ্চিম দ্বারে—বারাণসীর বাগীশ্বর কীর্ত্তি।
(৩) উত্তর দ্বারে—সুবিখ্যাত নরোপ।
(৪) দক্ষিণ দ্বারে—প্রজ্ঞাকর মতি।
(৫) মধ্যের প্রথম দ্বারে—কাশ্মীরের রত্নবজ্র
(৬) মধ্যের দ্বিতীয় দ্বারে—গৌড়ের জ্ঞানশ্রী মিত্র।

বিক্রমশিলা বিহারের কতিপয় অধিনায়কের ধারাবাহিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আচার্য্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ—মহারাজ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক, অনুমান ৭৮০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

লঙ্কাজয়ভদ্র—ইনি লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল হইতে আগমন করিয়াছিলেন। চক্র-সংবর তন্ত্র ইঁহার প্রণীত।

আচার্য্য শ্রীধর—ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ভবভদ্র—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। পঞ্চাশৎ তন্ত্রে ইনি অভিজ্ঞ ছিলেন।

ভব্যকীর্ত্তি—ইনি মন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

লীলা বজ্র—ইঁহার সময়ে একদল তুরস্ক সেনা বিক্রমশিলা অবরোধ করিতে আইসে। কথিত আছে ইনি যমারিমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ঐ সেনাদলকে উহা অবরোধ করিতে বলেন। তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে তুরস্ক সৈন্যগণ নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করে।

দুর্জ্জয়চন্দ্র।

কৃষ্ণসমরবজ্র।

তথাগত রক্ষিত—ইনি মন্ত্রপ্রভাবে নানা দেশের ভাষা বুঝিতে পারিতেন।

বোধভদ্র—ইনি গুহ্য মন্ত্র জানিতেন।

কমলরক্ষিত—ইনি প্রজ্ঞাপারমিতা, গুহ্য সময় এবং যমারিতন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার সময়ে কর্ণদেশ হইতে ৫০০ শত তুরস্ক সৈন্যসহ তুরস্করাজ মগধ লুণ্ঠন করিতে আইসে। উহারা বিহারের পূজার দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করে। কমলরক্ষিত ক্রোধভরে একটী পূর্ণকুম্ভ তুরস্করাজের মস্তকে নিক্ষেপ করেন। হঠাৎ ঝঞ্ঝাবাতের আবির্ভাব হওয়ায় তুরস্ক সৈন্যগণ শোণিত উদ্গিরণ করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যায়।

আচার্য্য রত্নাকর শান্তি, বারাণসীর বাগীশ্বর কীর্ত্তি, সুবিখ্যাত নরোপ, প্রজ্ঞাকর মতি, কাশ্মীরের রত্নবজ্র ও গৌড়ের জ্ঞানশ্রী মিত্র।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

মহাবজ্রাসন।

কমলকুলিশ।

নরেন্দ্র শ্রীজ্ঞান।

দানরক্ষিত।

অভয়কর গুপ্ত।

শুভকর গুপ্ত।

সুনায়ক শ্রী।

ধর্ম্মাকর শান্তি।

শাক্যশ্রী—ইনি কাশ্মীর হইতে আগত।

তিব্বতের লামাগণ বিক্রমশিলার আগমন করিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে শাক্যশ্রী পণ্ডিত ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে বিক্রমশিলার অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজী বিক্রমশিলা আক্রমণ করিয়া উহার ধ্বংস সাধন করে। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫০ শত বৎসর স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসের পর বৌদ্ধগণ বাঙ্গালা ও বিহার হইতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটে। ইহারই পরে মিথিলা ও নদীয়ায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

অরিসিংহ।

চিতোর তখনও পাঠানের হস্তগত হয় নাই, মেবারে তখনও ভীমরাণার অটুট প্রতাপ, মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের সুশাসনে দেশ তখন ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ; সেই সময় একদিন যুবরাজ অরিসিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। আন্ধোয়া বনের ধারে উজলা গ্রামে, মেঠো রাস্তায় শিকারির দল রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল—শিকার একটা ছুঁচালো মুখ, দাঁতালো বরা—বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেক খানি ধুলো উড়িয়ে অনেক দূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার একটা জনার ক্ষেতের ভিতর ঝাপিয়ে পড়ল; সেখানে ঘোড়া চলে না, তীরত ছোটেই না।

ক্ষেতের মধ্যে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাসা দেখছিল; পরণে তার পীলা ওড়নী, নীল আঙ্গিয়া। রাজকুমারের গায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা। দুজনের চোখ দুজনের উপর পড়েছিল।

শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাশ নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, ক্ষেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে রাজকুমারকে ভেট দিয়ে গেল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা কল্লেন "ক্যায়সে মারা"? বালিকা বল্লমের মত সিধে একটা জনারের শিশ্ দেখিয়ে বল্লে "ইসিসে ঘায়েল কিয়া"। তার ধুলো-মাখা কালো চুলগুলি সাপের ফণার মত সুন্দর মুখের চারিদিকে শোভা ধরেছিল, তার সুডৌল হাতে পিতলের কাঁকণ সূর্য্যের আলোয় সোণার মত ঝকমক্ করছিল।

বুনাশ্ নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কন্যার কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল। সবুজ ক্ষেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখীর ঝাক আর হরিণের পাল তাড়াতে তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কিনা কে জানে, কিন্তু একসময় তার হাত থেকে ঠিক্‌রে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে গাছতলায় বাঁধা একটা ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল। হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে, রাজকুমার চেয়ে দেখলেন; আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ ক্ষেত, তার মাঝে সেই নীল আঙ্গিয়া পীলা ওড়নী রাজপুতকন্যা, পশ্চিম বাতাসে অড়হরের ক্ষেতে ঢেউ উঠছে, একদল টীয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা শেষে দিনের আলো নিবু নিবু, পাথরের মত পরিষ্কার আকাশ তার কোলে কালো মেঘের সরু রেখা। রাজকুমার শিকারশেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে দুই জনে আর একবার দেখা হল; বালিকা মাথায় দুধের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙ্গে গ্রামে চলেছে, সঙ্গে দুটি চিকণ কালো ছানা ভৈঁষ।

পরদিন উজলা গ্রামে সেই বালিকার ঘরে বিয়ের কথা নিয়ে রাজকুমারের দূত এল। বালিকার ঠাকুরদাদা চন্দানোবংশের চোহান রাজপুত কিছুতেই সম্মত হল না। রাজকুমার

হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ঘরে পরে, গৃহিণীর কাছে, পাড়াপড়সীর দুয়ারে লাঞ্ছনা, গঞ্জনার সীমা পরিসীমা রইল না—'এমন কাযও করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? রাজা হচ্ছিল নাতজামাই তা মর্দ্দর মনে ধরল না, যেমন বুদ্ধি তেমনি চিরকালটা চাষা হয়েই থাক'—বুড়োর কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব 'তা তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু লছমীকে রাজবাড়ীতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারব না, তার চেয়ে আমার নাত্‌নী গরীবের ঘরে গিন্নি হয়ে থাকে সে ভাল। বুড়োর প্রতিজ্ঞা কিন্তু বেশি দিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, রাণী পদ্মিনী লিখেছেন—"আমি নিঃসন্তান, তোমার লছমীকে ভিক্ষা চাই, আমার আশীর্ব্বাদ, চিতোর রাজলক্ষ্মী তোমার বংশ আশ্রয় করুন"। সতীর কথা ব্যর্থ হয় না, লছমিয়ার সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। শুভলগ্ন স্থির হল। ধূমে ধামে আলো জ্বালিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে বরবেশে যুবরাজ এলেন; যেন কোন স্বপ্নের রাজ্য থেকে রাজপুত্র এসে উজলা গ্রামে উদয় হলেন! আনন্দে আলোয়, নাচে গানে সমস্ত গ্রাম এক রাত্রের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠল; সে দিনের সে সুখের বাসর কোথা দিয়ে কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমী-রাণীকে আর এক মাসের রাজপুত্র হাম্বীরকে উজলা গ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে যুদ্ধে যে গেল তাকে আর ফিরতে হল না। রাণা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রাণী পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা সকলে গেলেন, চিতোর লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হলেন। রইলেন কেবল হাম্বীরকে নিয়ে রাণী লছমী আর কৈলোরের কেল্লায় মেবারের রাণার বংশধর অজয়সিংহ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানসী।

প্রথম তোমারে হেরিনু যখন,
রবির প্রখর আলো
তোমার শান্ত, সুন্দর ছবি,
দেখিতে দেয়নি ভালো,
সহস্র আঁখি কৌতুক-ভরে
চেয়েছিল, সখি, তব মুখ'পরে—
জানিনা কি ভাব করিয়াছে পাঠ
তোমার নয়নে কালো!
কোন্ সুদূরের গীতি সুমধুর,
কত না ছন্দ, কত নব সুর
তব কেশপাশ ঘেরিয়া ঘেরিয়া
কত কথা বলে গেল!

জানিনা তাহারা পেয়েছে কি, সখি,
আমি যে পেয়েছি কত—
কেমনেতে তাহা বুঝাব তোমায়
কি রতন শত শত!
কি যে সরলতা নয়নের মাঝে,
কি পবিত্রতা চারিধারে রাজে—
মধুর গন্ধ কুসুমে বেড়িয়া
বহে যথা অবিরত!
প্রথম তোমার দৃষ্টি পরশে
নির্ব্বাক্ আমি, মৌন হরষে!
কোন্ দেবী আসি নিমেষে হরিল
মলিন বাসনা যত!

মৃদু হাসি হেসে তুমি গেলে চলি
চমক ভাঙিল মম—
হা রে অভাগ্য, ফুরাল নিমেষে
মহাসুখ অনুপম!

কি যে হিল্লোল উঠিল চমকি,
হীরার মতন ঝমকি ঝমকি,
নড়িয়া উঠিল যবে দেহলতা
সুকোমল মনোরম!
মানস-প্রতিমা এসে'ছিল দ্বারে—
হা রে আঁখিহীন চিনিলি না তারে—
হাতের নাগালে পাইয়া হারালি
অবোধ শিশুর সম!

মন, ওরে মন, নাহি আর আশা
এ কথা বলিল কে রে—
সে গেছে চলিয়া, ছায়াটুকু তার
চোখে লেগে আছে যে রে!
সে ছায়া, সে মোহ, কে দেয় ভাঙিয়া,
আপন বক্ষ-শোণিত রাঙিয়া
করেছি তাহারে নিবিড়, গভীর,
মুগ্ধ এ অন্তরে!
চিরদিনকার প্রীতি-আরাধনা
সুমহান্ ধ্যান্ আর উপাসনা
টানিয়া তাহারে আনিবে আবার
আমারি গৃহের দ্বারে!

'এবার যখন আসিবে, ললনে,
এসোনা তেমন করে,
কোলাহল-ভরা পথে এসোনা'ক
প্রখর রবির করে!
এসো অতি-মৃদু নীরব চরণে,
জনহীন পথে, বিরলে, গোপনে,
সন্ধ্যার ঘন ছায়াতলে এসো,
এ দীন কবির দ্বারে!

যা' কিছু আমার আছে আপনার
সব সঁপে দিব করেতে তোমার,

তুমি রবে শুধু আপনার জন
বিশাল ধরণী'পরে!

বীণাখানি, সখি, তোমারেই দিব—
তোমারে গো দিব সব,
হরষ, বিষাদ, হাসি ও অশ্রু
মৌনতা কলরব!
ঘুমে, জাগরণে, শয়নে, স্বপনে,
রাখি নয়নের নিবিড় শাসনে,
সঙ্গীত-ছলে মাধুরী তোমার
বিশ্বের কানে গা'ব!

স্তম্ভিত সবে রবে বাক্‌হীন,
ভুলিবে ধরার দুঃখ মলিন—
ভাসিবে মর্ত্ত্য বিপুল হরষ-
উচ্ছ্বাসে অভিনব!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ডাকের সৃষ্টি বিবরণ।

—:০:—

এই প্রবন্ধ লেখার সূত্রপাত করিবামাত্রই বাল্যকালের একটী ঘটনা আমার মনে পড়িল। একবার হুগলী জেলার সীমান্তবর্ত্তী ত্রিবেণীতীর্থে, দশহরাপর্ব্বোপলক্ষে, গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলাম। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বিমল সলিলে স্নাত হইয়া যাত্রীবৃন্দ যখন তটদেশে আরোহণ করিল, সেই সময়ে পশ্চিমোত্তরপ্রদেশীয় এক সুদক্ষ বাজিকর আসিয়া কহিল, "আপনারা যদি প্রত্যেকে এক একটি পয়সা দান করেন, তাহা হইলে আমি বিশ-বাইশ রকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তামাসা দেখাইয়া আপনাদিগের সকলকে চমৎকৃত করিতে পারি।" একটা পয়সার মূল্য অধিক নহে, ভাবিয়া অনেকে এক একটি তাম্রমুদ্রা দান করিতে লাগিল। বাজিকর বাস্তবিক বহুবিধ তামাসা দেখাইয়া সমাগত যাত্রীগণের যথারীতি সন্তোষবিধান-পূর্ব্বক স্থানত্যাগ করিলে পর, অনেকে কহিতে লাগিল, "সামান্য এক পয়সায় এই পারদর্শী বাজিকর বাস্তবিক অতীব আশ্চর্য্য বাজি দেখাইয়া গিয়াছে। আমাদের দান সার্থক হইয়াছে। একটা পয়সায়, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা আর কখন কেহ অধিকতর মজা দেখাইতে পারিবেনা।"

বর্ত্তমান কালে ইংরাজের ডাকঘর হইতে এক পয়সা মূল্যের একখানি পোষ্টকার্ড যে মজা দেখাইতেছে, আমার মনে হয়, তাহার মত আশ্চর্য্য ব্যাপার আর নাই। ঢাকাসহর, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পেশোয়ার, কুমারিকা অন্তরীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, হরিদ্বার, নাগপুর, আরব্যসাগরোপকূলস্থিত কোচিনরাজ্য এবং হিমালয়পাদস্থিত গড়োয়াল অথবা আসামের "ডাকিনী মুলুকের" কামরূপ পাহাড়ের খবর পর্য্যন্ত মাত্র একটী পয়সার মাহাত্ম্যে পাওয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যের কথা—অধিকতর অদ্ভুত তামাসা বা বাজির কথা—আর কি হইতে পারে? শুধু কি তাই? ডাকঘরের কল্যাণে এক আনায় সাত-সমুদ্র-তের-নদী-পারে বিলাতের বন্ধুর সহিত খবরাখবর করিতেছি; চারি আনার পয়সার টেলিগ্রাফ করিয়া এক ছিলিম্ তামাক খাইতে খাইতে ঢাকা দারজিলিং দিল্লী লাহোরের সমাচার আনাইতেছি। মণিঅর্ডার, রেজেষ্ট্রী পার্শেল, প্যাকেট, সেভিংব্যাঙ্ক প্রভৃতির ত কথাই নাই।

এই ভোজবাজিরূপ ডাকের সৃষ্টিবিবরণ জানিতে কাহার না কৌতূহল জন্মে। এই কৌতূহল নিবারণ করিতেই আজ আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি।

পৃথিবীর সমুদায় সভ্য জাতির গ্রন্থ বা ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা আমাদের ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। এই সুবৃহৎ গ্রন্থরাজির মধ্যে কোথাও চিঠি বা পত্রের প্রতিশব্দ নাই, কোথাও মসি বা লেখনীর উল্লেখ নাই। বৈদিক শাস্ত্রের ঋক্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, মণ্ডল, বাক্, অনুবাক্ প্রভৃতি কোন অংশে লেখা পড়ার কথা উল্লিখিত হয় নাই; কারণ এই যে, বর্ণমালা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ঋগ্বেদ উদ্ভূত হইয়াছিল। হিন্দুর বিশ্বাস এই, ভগবান তৎসাময়িক ঋষিবর্গকে

প্রত্যাদেশ দ্বারা যাহা অনুজ্ঞা করিতেন, ঋষিরা তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। বর্ণমালার আবিষ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ঋষিসন্তানগণ মুখে মুখে ঐ সমস্ত ঋক্ অভ্যাস করিয়া রাখিত। যাহা শ্রবণ করিত তাহা কণ্ঠস্থ করিত বলিয়া বেদের অপর নাম "শ্রুতি"। যে শাস্ত্রে মসি, লেখনী বা লেখা পড়ার কথা নাই তাহাতে ডাকের প্রসঙ্গ বা চিঠি পত্রের উল্লেখ থাকার কথা নহে। ঋক, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদের বিভাগ, এই জন্য বেদের অন্য সংজ্ঞা "ত্রয়ী"। বর্ণমালার পরে যে বেদ রচিত হয় তাহার নাম অথর্ব্ব বেদ। ইহাতে সংগীত, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সমগ্র অথর্ব্ব বেদে একটী স্থান ব্যতীত স্থানান্তরে চিঠি বা পত্রের প্রতিশব্দ নাই। যে স্থলে ঐ শব্দ আছে তাহা মিলাইয়া দেখিবার জন্য মূল অথর্ব্ব বেদে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা মেশার্শ আর, ক্যাম্ব্রে কোম্পানীর সাহেবগণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং হুইটনী সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজিতে অনুবাদিত সুবৃহৎ অথর্ব্ব বেদ দেখিয়াছি। *

ইহাতে লিখিত আছে "তদনন্তর অঞ্জুদ্বয় আগমনপূর্ব্বক তথাকার নির্দ্দিষ্ট চিহ্নসমন্বিত সুবৃহৎ মহায়নটিকে সঙ্গে লইয়া হোত্বা মধিক্ষের হস্তে দিয়াছিল।" এই শ্লোকোল্লিখিত অঞ্জু শব্দের অর্থ দূত বা বাহক; হোত্বা শব্দে হোমকারী (যজ্ঞকারী) পুরোহিত বা আচার্য্য এবং মধিক্ষ ঐ হোত্বার নাম। অঞ্জু শব্দে ডাকঘরের পেয়াদা বা ডাক-বাহক (Mail Runner) বুঝায় না; প্রাচীন রাজাদের দূতেরা যেমন এক রাজার পত্র অন্য রাজার কাছে পৌঁছাইয়া দিত, অঞ্জুরাও ঋষিদের সেইরূপ সেবক, শিষ্য বা ভৃত্য ছিল। আবশ্যক হইলে তাহারা সম্বাদাদি লইয়া যাইত, কিন্তু জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এক্ষণে মহায়ন শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। পালি ও মাগধী ভাষায় হিনায়ন ও মহায়ন শব্দদ্বয় একই অর্থবাচক; অর্থ—সেতু। হিন্দুরা যেমন বলেন, "অমুকের মৃত্যু সময়ে চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে বৈতরণী পার করান হইয়াছে", বৌদ্ধের তেমনি বিশ্বাস ছিল এবং এখনও অনেকের আছে যে, মৃত্যুর পরে কর্ম্ম-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত না হইলে নির্ব্বাণপদ কেহই প্রাপ্ত হইবে না, এই জন্য হিনায়ন বা মহায়ন নামক সেতু পার হইতে হয়। তাহা হইলেই বুঝা গেল, যাহার দ্বারা (নদীর) এক পার হইতে অন্য পারে যাওয়া যায়, সেই উপায়ের নাম মহায়ন। আমরা যে চিঠি বা পত্র লিখি, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, একের মনোভাব বর্ণমালার সাহায্যে অপরের নিকটে প্রকাশ করা, অর্থাৎ ঠিক সেতুর কাজ। বৈদিক সংস্কৃতে মহায়ন শব্দ এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অথর্ব্ব-বেদের সময়ে বৃক্ষপত্র, পশুচর্ম্ম, কাষ্ঠ, ধাতু, প্রস্তর, বল্কল ইত্যাদির উপরে লিখন-কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, তখনও

---

* English Translation of Atharva Veda by W. D. Whitney (Messrs. R. Cambray & co., 8 Hastings Street, Calcutta.)

কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই। পল্‌কেরস্‌ কহেন, * "বৌদ্ধেরা মহায়ন ও হিনায়ন শব্দ বৈদিক সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।" † অথর্ব্ব-বেদে "পত্র" (Letters) শব্দের মাত্র একটু আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাতে বুঝায় না যে, সে সময় পত্র সরবরাহ করিবার জন্য ডাকঘরের মত কোন বাঁধাবাঁধি। বন্দোবস্ত ছিল। বলা বাহুল্য, উপনিষদেও ডাকের উল্লেখ নাই। বেদের পরে পার্শীকদিগের জেন্দাবস্তা গ্রন্থের উল্লেখ করিতে হয়। জেন্দ ভাষা অতীব কঠিন। হিব্রু বা ইব্রিয় ভাষা যেমন আরব্য ভাষার প্রসূতি, সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষার মিশ্রণে তেমনি জেন্দ ভাষার উৎপত্তি। আরব্য ও জেন্দ ভাষা, পারস্য ও তুরস্ক ভাষার জননী। এই জেন্দ ভাষার এক একটা শব্দের একশত প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। বোম্বায়ের সুবিখ্যাত আচার্য্য (ডাক্তার) হল্‌ সাহেব সমুদায় জেন্দাবস্তা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। জেন্দাবস্তার সপ্তদশ "সপর্‌" (পর্ব্বে) লিখিত আছে, ‡ "খৎ-এ খোয়াজ্‌ মজ্‌হুণ দশায়ীন্‌। ইববিল্‌ মকারুণ।" ইহা মূল জেন্দভাষা। ইহার অর্থ এই :—খৎ (পত্র) সুবিধামত দৃষ্ট করিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষ মঞ্জুর করিয়া প্রেরণ করিলেন। এস্থলে পত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু ডাকঘরের প্রথার উল্লেখ নাই। মহাভারত, রামায়ণ, সংহিতা, পুরাণ, উপ-পুরাণ প্রভৃতিতে—অধিক কি, ঋগ্বেদ হইতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ পর্য্যন্ত—কোথাও ডাকঘরের প্রসঙ্গ দেখা যায় না। পুষ্পকরথ, বিমান, শতঘ্নী অস্ত্র, কামান, বারুদ, গোলা গুলি প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ডাকঘরের প্রথার ও প্রচলনের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "এক রাজার দূত অন্য রাজার নিকটে পত্র লইয়া গেল" ইহা লিখিত আছে, কিন্তু তাহা ডাকঘরের কথা নহে।

এখন বুঝিতেছি, আসিয়া দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ডাকঘরের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, সুতরাং আমাদিগকে এক্ষণে ইউরোপদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। নানা বিদ্যার উদ্ভাবক এবং নানা কৌশলে পারদর্শী, সুবুদ্ধিমান ইউরোপদেশই ডাক-প্রথার জন্মদাতা; এই অদ্ভুত উদ্ভাবনের জন্য সমগ্র জগতবাসী তাহার নিকট চির ঋণী। ইউরোপের পর্টুগাল-দেশ সর্ব্বপ্রথমে ডাকনিয়ম উদ্ভাবিত করিয়াছিল। পর্টুগিজ জাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে অবগত হইতে পারা যায় যে, রোমক সম্রাটদিগের শাসনকালে ইংলণ্ডদ্বীপ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু সমগ্র ইউরোপ এতাদৃশ অসভ্য ছিল না। ইউরোপের ফ্রান্স, জর্ম্মণি, পর্টুগাল প্রভৃতি দেশ তখন জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইউরোপের যে অংশ ইউরোপীয় তুর্কী বলিয়া বিখ্যাত, তাহা তখন ধন, ধান্য, জ্ঞান,

---

* "Gospel of Buddha" By Paul Carus. Chicago (The Open Court Publishing Company) 1896.

† Dissertation on Nirukta. (Vedic Grammar) R. A. S. Journal. Vol. XIV.

‡ পার্শীকদের শাস্ত্রের সপর্‌ এবং কোরাণের সেপারা একই কথা। মহাভারতের পর্ব্ব শব্দেরও ঐ অর্থ।

বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল ইত্যাদিতে আসিয়ামহাদেশে মহা প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পর্টুগাল ও ইতালী তখন সমগ্র ইউরোপের মধ্যে প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্টুগাল দেশে ভয়ানক ভূমিকম্প এবং তাহার পরে প্রবল বাত্যা, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি সংঘটিত হওয়ায়, কয়েক বৎসর তথায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে বহু সহস্র লোকের প্রাণনাশ হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে পর্টুগাল দেশের আর্থিক অবস্থা পুনরুন্নতি লাভ করিলে, তৎসাময়িক নরপতির নিকট প্রজাপুঞ্জ আবেদন-পত্র দ্বারা জানাইল যে, রাজ্যের সর্ব্বত্র সম্বাদ বহনের যদি রীতিমত বন্দোবস্ত থাকিত তাহা হইলে যথাসময়ে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পশু বা মনুষ্যদ্বারা শস্যাদি প্রেরণপূর্ব্বক সওদাগরেরা বহু সংখ্যক লোকের প্রাণরক্ষা করিতে পারিত। রাজ্যের কোথায় শস্য কম হইয়াছে, কোথায় দুর্ভিক্ষের বা রোগের প্রকোপ অধিক, কোথায় অত্যন্ত বা স্বল্প অভাব, তাহার কিছুই জানিতে না পারায় এবং প্রধানতঃ শীঘ্র শীঘ্র সমাচার চলাচলের কোন উপায় বিদ্যমান না থাকায়, দুর্ভিক্ষ নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; অথচ সমগ্র রাজ্য একেবারে শস্যশূন্য হয় নাই; স্থানে স্থানে সওদাগরদিগের আড়তে যথেষ্ট শস্য ছিল। সর্ব্বস্থানে শস্যের মূল্যের তারতম্যের হিসাবও কেহ জানিত না। কয়েক স্থান হইতে সময়ে বা অসময়ে দুর্ভিক্ষের যে সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা রাজার নিয়োজিত কর্ম্মচারী ও দূতদিগের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাহাও যথেষ্ট সমাচার নহে; অধিকন্তু সর্ব্বসাধারণের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিলনা। প্রজাপুঞ্জের এই আবেদন শ্রবণ করিয়া রাজা ভাবিয়া দেখিলেন, প্রজারা যাহা কহিতেছে তাহা সৎযুক্তি সঙ্গত এবং বিবেচনার যোগ্য বিষয়। স্বল্পকালমধ্যে রাজাবাহাদুর তাঁহার এক পরমাত্মীয় পুরুষকে শস্যরক্ষা ও সম্বাদ বহনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। এই বুদ্ধিমান পুরুষের নাম আঞ্জিলো, ইহার পূর্ণনাম বীড়ে বন্‌কাল্‌ আঞ্জিলো (Birrha Bunkal Angelo)।

বীড়ে আঞ্জিলোর সময়ে সমস্ত পর্টুগাল দেশ ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল, ইহার প্রত্যেক খণ্ডে এক একজন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল। সওদাগর, মহাজন, শেঠ, আড়তদার বণিক, নাবিক ও প্রধান ব্যক্তির পত্রাদি, বেতনভোগী বাহকেরা বহন করিয়া কর্ম্মচারীর হস্তে দিত। এইরূপে ত্রয়োদশ কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। একটি কার্য্যালয় হইতে অপর কার্য্যালয়ে এবং তদনন্তর সমুদায় কার্য্যালয়ে যথারীতি চিঠিপত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও জনসাধারণের পত্র পাঠাইবার সুবিধা ছিলনা। ঐ সকল কার্য্যালয় আঞ্জিলোর নামানুসারে আন্‌জেল্‌ বলিয়া কথিত হইত। বাহকেরা পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত হইত বলিয়া, তাহাদের ভোজন, বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের জন্য, মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে এক একটা ছোট ছোট ঘর তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই বিশ্রাম গৃহগুলি আঞ্জিলোর আদিনাম "বীড়ে বন্‌কুলো" নামে কথিত হইত। এই বন্‌কুলো শব্দ ক্রমে ভারতবর্ষে বাঙ্গলো (Bungalow বা ডাক-বাঙ্গালা) নামে পরিবর্ত্তিত

হইয়া প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পর্টুগিজেরাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ইহাঁদেরই ভাস্কোদাগামা সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আগমন করিয়া ইউরোপবাসীদিগের নিকটে ভারতের কথা প্রচার করেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদিগের মতে ইনিই ভারতের আবিষ্কারক; ইনি পর্টুগিজদেশীয় মহারাণী ইজাবিলার সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের বহু অনুসন্ধানে ইহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, ভাস্কোদাগামার ভারতাগমনের পূর্ব্বে ইটালীর ও পর্টুগালের অনেক রোমান্‌-কাথলিক-পাদ্রী ভারতবর্ষে আগমন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কেহ বা পরিব্রাজকরূপে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। আরব সাগরের তটে কোচিন-রাজ্যে, মালাবারউপকূলে ত্রিবাঙ্কোড় ও জামোরীনরাজ্যে, করমণ্ডলউপকূলে কদালুর প্রভৃতি জেলায়, এবং কালীকোট, পালঘাট প্রভৃতি স্থানে রোমান্‌-কাথলিক-প্রচারকেরা প্রথমে আসিয়াছিলেন। এই জন্য মাদ্রাজ প্রদেশে যত খৃষ্টান, এত খৃষ্টান ভারতের আর কোথাও নাই; এই জন্যই দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বত্র রোমান্‌-কাথলিক খৃষ্টানের সংখ্যা অত্যধিক; এবং এই জন্যই পাঁচ ছয়শত বর্ষাধিক কালের পূর্ব্ববর্ত্তী খৃষ্টান-পরিবার মাদ্রাজদেশে বর্ত্তমান আছে। প্রায় এক সহস্র বৎসরের সমসাময়িক খৃষ্টীয় গির্জ্জাও দাক্ষিণাত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আনীত এবং আসিরিয়ান্‌ ভাষায় লিখিত বাইবেল এখনও ত্রিনেভেলী জেলায় পালম্‌কোটার গির্জ্জায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গির্জ্জার তত্ত্বাবধানে দ্বাদশশতাধিক বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবর্ষের 'সিরিয় খৃষ্টান' বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমুদ্র-উপকূলে জামোরীন রাজার রাজ্যে ভাস্কোদাগামা প্রথমে উপনীত হয়েন, ইহার পূর্ব্বকাল হইতে দক্ষিণ-ভারতে পর্টুগিজ-সংস্পর্শের প্রভাব চলিয়া আসিতেছিল।

যাঁহারা দক্ষিণ-ভারতে, বিশেষতঃ সুদুর সমুদ্রকূলস্থিত দেশীয় রাজ্যসমূহে পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন যে, কোচিন ত্রিবাঙ্কোড় প্রভৃতি রাজ্যের রাজকীয় ডাকঘরগুলি এখনও "অনুজল্" বলিয়া খ্যাত। সেখানে ইংরাজি ডাকখানা স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু তথাকার অনুজল্‌গুলি এ দেশে বৃটীশাধিকার স্থাপিত হইবার বহুশত পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুশাসনকাল হইতে এখনও চলিয়া আসিতেছে। পর্টুগিজ পাদ্রী ও ভ্রমণকারীদিগের উপদেশে ও পরামর্শে এই অনুজল্ স্থাপিত হইয়াছিল। পর্টুগালদেশ যে ডাকপ্রথার উদ্ভাবক, দক্ষিণ-ভারতের বহু পুরাতন অনুজেল্‌গুলি তাহার অন্যতম প্রমাণ। প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে রাজাদের দুতেরা চিঠিপত্রাদি বহনের এবং ডাকের পেয়াদারা চিঠি পত্রাদি লইয়া যাইবার জন্য যে সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিত, তাহার নাম "বীড়ে বনকূলো" ছিল, ইহাও পর্টুগীজ দেশীয় কথা। আমাদের বাঙ্গালাভাষায় যেমন চেয়ার, টেবিল, কোট, প্যাণ্টালুন, পেন্সীল প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদেশীয় ভাষা গুলিতে তেমনি অনেক পর্টুগিজ শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের যেমন বঙ্গদেশে ইংরাজের সহিত

প্রথম সম্পর্ক হয়, দক্ষিণ-ভারতে তেমনি পর্টুগিজজাতির সহিত সর্ব্বপ্রথম হিন্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। এই কারণে তামীল, মালয়লী প্রভৃতি ভাষায় অনেক পর্টুগিজ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে তথায় পর্টুগিজ দেশীয় পয়সাও চলিত এবং এখনও স্থানে স্থানে ইহা প্রচলিত আছে। তামিল ভাষায় "বীড়ে" শব্দের অর্থ "ঘর"। ইহা খাঁটী তামিল শব্দ নহে, পর্টুগিজ শব্দ। ত্রিবাঙ্কোড়, কোচিন ও মালাবারের উপকূলের ভাষার "বান্‌কূলো" শব্দ পর্টুগিজ শব্দ, ইহার অর্থ সরকারী (অর্থাৎ রাজকীয়) দুতগণের ও পত্রাদিবাহকগণের বিশ্রাম ঘর। এই শব্দ ক্রমে সমস্ত ভারতে, ইউরোপীয় অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংগলো-শব্দে সুপরিচিত হইয়াছে। এখনও ডাকবাংগলো (Dak Bungalow) শব্দ প্রায় প্রতি জেলায় ব্যবহৃত। সম্ভ্রান্ত পথিক, পরিব্রাজক ও রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের পান্থশালার নাম এখন ডাক-বাংগলো। আদিতে ডাকবিভাগের লোকের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত বলিয়া এখনও ইহা ডাক-বাঙ্গলো নামেই কথিত হইয়া থাকে।

পর্টুগালদেশের যে রাজার সময়ে সর্ব্বপ্রথম ডাক-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল সেই রাজার নাম জুয়ান্। ইঁহারই বংশধর প্রথম জন্ রাজার সময় পর্টুগিজেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, এবং ইউরোপ, আফ্রিকার নানাস্থানে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য বা দিগ্বিজয় করিতে আরম্ভ করে এবং মুর জাতিকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে। *

পর্টুগালের পার্শ্বদেশে স্পেনরাজ্য অবস্থিত। স্পেনের ও পর্টুগালের অধিবাসীদিগের দেহে প্রায় একই রক্ত প্রবাহিত। উভয়ের ভাষাও লাটিন হইতে উৎপন্ন। খৃষ্টীয় ১১৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত স্পেনের রাজা, পর্টুগালের উপর প্রভূত পরিমাণে প্রভুত্ব করিতেন। তদনন্তর পর্টুগাল স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পর্টুগাল রাজ্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে "কোর্টাশ" নামে মহা সভা স্থাপন করিয়া পার্লামেণ্টের মত রাজকার্য্য চালাইতে থাকে। কিন্তু ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্টুগাল দেশ, স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের শাসন সময়ে, পুনরায় পরাজিত হয় এবং কয়েক বৎসর স্পেনের অধীনতা স্বীকার করিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময়ে স্পেনদেশবাসীরা মিলান (Milan) নগরে রীতিমত ডাকঘর বসাইয়া রাজা ও প্রজাসাধারণের পত্র সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। মিলান, স্পেনের এক প্রধান নগরী; ইহা "Po" পো-নদের ঊর্দ্ধাংশের তটে অবস্থিত। এখনও এই নগরী বর্ত্তমান আছে; ইহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চ লক্ষ। সমস্ত ইউরোপের প্রধানতম গির্জ্জা (Cathedral) এই মিলান নগরীতে অবস্থিত। এখন দেখা গেল, পোর্টুগাল ও স্পেনের খৃষ্টানেরাই ডাকের

---

* Read Asia By Juan De Barros. Asia Portuguesa By Faria Sousa. History of the Discovery and Conquest of the East Indies By Herman Lopez de Castenheda. History of the Portugese during the reign of Emanuel By Osorio. History of India By HughMurray, History of Portugal By Gameza. 1836.

সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাচীন কালে হিন্দু রাজাদের যুদ্ধ-সমাচার-সম্বলিত লিপি অথবা অন্য বিষয় সম্পর্কীয় পত্রাদি কোন প্রধান রাজা বা পুরুষের নিকট পাঠাইতে হইলে, ঘোড়ার মাথায় তাহা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। গ্রীশদেশে এবং রোমক সম্রাটদের শাসনকালেও এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল। রঘুরাজার দিগ্বিজয়কালে পত্রাদি দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবার জন্য ডাকঘরের ব্যবস্থা ছিলনা। গিবন-সাহেবও তাঁহার ভুবনবিখ্যাত রোমের অধঃপতনের ইতিহাসে ডাকঘরের উল্লেখ করেন নাই। তবে তাহাতে এমন কথা পাওয়া যায় যে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমাচার শীঘ্র পাঠাইতে হইলে মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে ঘোড়ার আড্ডা বসান হইত। অশ্বারোহী সেনারা পত্র বা মৌখিক সমাচার লইয়া যাইত। কিন্তু তাহাতে রাজাদেরই সুবিধা ছিল, প্রজাসাধারণের সুবিধা ছিল না।

পর্টুগাল অপেক্ষা স্পেনের ডাকখানার ব্যবস্থা আরও সুন্দর হইয়াছিল। স্পেনের ডাকখানায় টিকিটের চলন হয় নাই, পর্টুগীজ ডাকখানাতেও তাহা ছিলনা। পত্র পৌঁছিলে তাহার খরচ দিয়া চিঠি লইতে হইত। চিঠি না লইলে পত্রপ্রেরকগণ ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য হইত। এই কারণে প্রত্যেক পত্র-প্রেরক আপনাপন নামধাম ডাকঘরের রেজিষ্টি খাতায় লিখিয়া দিতে আইনমতে বাধ্য ছিল। পত্র-গ্রাহকের নামও এ খাতায় লেখা থাকিত। পর্টুগিজ ডাকখানার পেয়াদারা লোহিতবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিত, স্পেনেও সেই নিয়ম ছিল। ঐ উভয় দেশের পেয়াদারা পদব্রজে, নৌকায় বা পশুপৃষ্ঠে গমন করিত। ট্যাক্সদ্বারা প্রজা সাধারণের নিকট হইতে ইহার ব্যয়ের টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা ছিল। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত পেয়াদিনী নিযুক্ত হইত; কিন্তু গর্ভবতী, অতিবৃদ্ধা, রুগ্না অথবা বহু সন্তানসন্ততির মাতারা এই কার্য্যে নিযুক্তা হইত না। পেয়াদিনীদিগকে কেহ আক্রমণ করিলে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। (Porto-Spaniardes Statutes. Journal R. A. S. Vol. XI.)

পর্টুগালদেশে ডাকের সৃষ্টি হয়, এবং স্পেনে তাহার প্রথম উন্নতি সাধিত হয় কিন্তু হলণ্ড দেশেই এ প্রথা সমধিক উন্নতি লাভ করিয়া সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত হইয়া পড়ে; এবং অবশেষে ইংলণ্ডে ইহা মহোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। ১৬৩০ হইতে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হলণ্ডদেশের লোকেরা নানাস্থানে জলযুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐ সময়ে নানা স্থান হইতে সম্বাদ সংগ্রহ করা এবং নানা স্থানে সমাচার প্রেরণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য ওলন্দাজেরা স্পেনীয় প্রথার ডাকবিভাগের অনুকরণ করিয়া ডাকঘর স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। সর্ব্বসমেত ১৮৬টা ডাকঘর স্থাপিত হয়; জলপথেও ডাকখানা (Sea Post Office) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্বল্পকালের জন্য। স্থলপথে যাহা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাই ক্রমশঃ স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। জলপথের কার্য্য নাবিক ও জলযুদ্ধের সেনাগণের দ্বারা সম্পাদিত হইত; স্থলের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য রীতিমত বেতনভোগী পেয়াদা নিযুক্ত হইয়াছিল। এই পেয়াদারা লালবর্ণের

পোষাক পরিত এবং ইহাদের মাথায় ধুচুনির ন্যায় বড় বড় লম্বা টুপি বিরাজ করিত। হলণ্ডের ডাকঘরের পেয়াদাগণের হাতে কাঠের মোটা মোটা লাঠি এবং লাঠির অগ্রভাগে রাজকীয় চিহ্নসমন্বিত লৌহের পাতা আঁটা থাকিত। পোর্টুগাল ও স্পেন দেশ অপেক্ষা হলণ্ডের ডাকবিভাগ অধিকতর সমুন্নত ও সুবিধাজনক ছিল। সেই জন্য এই প্রথাই ইংরেজেরা ক্রমশঃ অনুকরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে ডাকবিভাগে এখনও এইরূপ লাঠি ও লোহার পাতার ব্যবহার আছে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হলণ্ডের রাজা, ওলন্দাজি সওদাগর ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির পরামর্শমতে তথাকার ডাকঘরে একটা নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোন জরুরী খপর সত্বর প্রচার করিবার প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ "বিশেষ পেয়াদা" (Special Peons) নিযুক্ত হইত; ইহাদের নাম ছিল—হকশ্ (Hawkes)। এই শব্দ হইতে ইংরাজি Hawker "হকার" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই "বিশেষ পেয়াদারা" চীৎকার করিয়া নগরে নগরে বলিয়া বেড়াইত "অমুক বিষয়ের অমুক হইয়াছে" অথবা "অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে।" ইত্যাদি। কেহ কেহ ভাটের ন্যায় স্থানে স্থানে কাগজ পড়িয়া উচ্চরবে তাহা ঘোষণা করিয়া দিত।

খৃষ্টীয় ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লশ্ (Charles I) বিলাতে সর্ব্বপ্রথম অতীব উন্নত ধরণের ডাকখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিলাতে ডাকঘর ছিলনা। সহরের প্রধান প্রধান পথের ধারে ও রাজ্যের প্রায় সমুদায় বড় বড় রাস্তার পার্শ্বে ডাকের অফিস্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পোষ্ট-মাষ্টারেরা আপনাপন ঘোড়া নিজেদের ঘর হইতে আনিতে বাধ্য হইত। প্রতি মাইলে তাহারা ঘোড়ার জন্য আড়াই পেনী মুদ্রা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইত, ইহা ভিন্ন বেতন স্বতন্ত্র ছিল। যাহারা গাড়ী চালাইত তাহারা প্রতি অর্দ্ধক্রোশে সাড়ে পাঁচ পেন্স প্রাপ্ত হইত। এক এক দিনে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ঘোড়ায় বা ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক-মুন্সীরা গমন করিত। যেখানে ঘোড়ার বন্দোবস্ত হইয়া উঠিতনা, সেখানে পেয়াদারা পদব্রজে গমন করিয়া চিঠি বিলি করিয়া দিত। পেয়াদারা মদ্য, ডিম্ব ও রুটির টুকরা গামোছায় বাঁধিয়া সঙ্গে লইত এবং ছোট ছোট নদী ও খাল পার হইবার জন্য বাঁশের সেতু সঙ্গে লইয়া যাইত। পেয়াদাদের ডিম্ব, সুরা বা রুটি ফুরাইয়া গেলে, গ্রামের প্রধান লোকেরা রাজকীয় আইনমতে তাহাদিগকে খাওয়াইতে বাধ্য ছিল। প্রথমে মাসে দুইবার মাত্র পত্রাদি ডাক দ্বারা বিলি করা হইত। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে যাহাতে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া সাধারণ জনগণমধ্যে চিঠি বিলি হইতে পারে সে বিষয়েও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১৬৫৬ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ অলিভার ক্রমওয়েলের চেষ্টায় পার্লামেণ্ট সভায় ডাকঘরের বিধি মঞ্জুর হয় এবং ডাকখানার সংখ্যা ও সুবিধা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৭১০ অব্দে দ্বিতীয় চার্লস্ রাজার সময় পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য চলিয়াছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষেরা দেখিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে পেয়াদারা লণ্ডন নগর হইতে বাথ্ (Bath) নগর পর্য্যন্ত একখানি পত্র লইয়া গেলে চল্লিশ ঘণ্টার কমে যাইতে পারে না, কিন্তু গাড়ীতে গেলে

১৭ ঘণ্টায় পৌঁছিতে পারে। সুতরাং এই বৎসর হইতে গাড়ীর বন্দোবস্ত হইতে আরম্ভ হয়। গাড়োয়ানদের সহিত রাজকীয় বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু সরকারী ডাকগাড়ীর তখনও সৃষ্টি হয় নাই। এখন যাহাকে ডাকের টিকিট বলা হইয়া থাকে, সে সময়ে তাহাও ছিল না। দুরত্বানুসারে প্রতি পত্র বা প্যাকেট অথবা পার্শেলের উপর মাশুল আদায় করিয়া লওয়া হইত। ১৮৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত এই নিয়ম ছিল। ঐ বর্ষের শেষভাগে পার্লামেণ্ট মহাসভা হইতে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, তদনুসারে যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি এক তোলা ওজনের পত্র এক পেনি মাশুলে পাঠাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহার নাম "পেনী পোষ্টেজ প্রথা"। কিন্তু ঐ আইনের শেষ ধারায় লিখিত ছিল, "গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন"।* এই আইন প্রচলিত হইবার স্বল্পকাল পরে কর্ত্তৃপক্ষেরা দেখিলেন, এই নবীন প্রথামত কার্য্য ভাল রকম চলিতেছে এবং জনসাধারণেরও ইহাতে বেশ সুবিধা হইতেছে; কিন্তু পার্লামেণ্টের জনকয়েক সভ্য ইহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া আবার একটা নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিলেন। ঐ আইনে যাহা নূতনভাবে সংযোজিত করা হইয়াছিল, তাহা এই :—(১৩ ধারা) মূল্যবান অলঙ্কার, মূল্যবান্ প্রস্তরাদি বা মুদ্রা প্রেরণ করিতে হইলে ডাকঘরের লোকদিগকে তাহা না দিয়া, স্বতন্ত্র "ধনবাহী বিভাগের" কর্ম্মচারীগণকে দিতে হইবে। ডাকঘর হইতে এবম্প্রকার দ্রব্যাদি প্রেরিত হইবে না। কিন্তু প্রেরকগণ ইচ্ছা করিলে ডাকঘরের প্রধান কর্ম্মচারীকে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া রসিদ লইতে পারেন, ডাকঘরের প্রধান কর্ম্মচারী উহা ধনবাহী বিভাগে প্রেরণ করিবেন, কিন্তু প্রেরককে সমুদায় খরচ দিতে হইবে। ডাকঘরের প্রধান অমাত্য মহাশয়, ধনবাহী বিভাগেরও প্রধান অমাত্য বলিয়া গণ্য হইবেন। (১৪ ধারা) কোন প্রকার পোষাক, জুতা, টুপি, যষ্টি কিম্বা লিখিবার সরঞ্জাম পোষ্ট-অফিসের দ্বারা প্রেরণ করিতে হইলে, ডাকঘরের প্রধান অমাত্যের সম্মুখে তাহা পার্শেল করিয়া দিতে হইবে। (১৫ ধারা) অলঙ্কার ও মূল্যবান প্রস্তরাদি সম্বন্ধেও এই নিয়ম রহিল। (১৬ ধারা) মুদ্রাসমূহ সরকারী খাজাঞ্চীর নিকটে জমা দিলে, ডাকঘর হইতে ঐ টাকা গ্রাহকেরা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইত্যাদি।

বিলাতী ডাকের কথা এইখানে শেষ করা যাউক। বারান্তরে ভারতবর্ষীয় ডাকের বিবরণ বিবৃত করা যাইবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

* See "Penny Postage" Act of 1839. [Parliamentary Statute Book]. "Government reserves to itself the right of altering this plan at any time, if it be found not to answer."

কর্ম্ম-চক্র।

—*—

দেবতা ছিলেন মন্দিরের মাঝে
পূজারী থাকিত ঘরে।
পূজা দিয়ে যেত সকালে বিকালে
আসিয়া ক্ষণেক তরে!

সেদিন পূজারী ফিরিছে যখন
সাঁজের আরতি সেরে,
দেখিল জাগিছে ঘন ঘোর মেঘ
শ্রাবণ গগন ঘেরে!
সারারাত ধরে প্রহরে প্রহরে
বজ্র পড়িল কত।
হেঁকে গেল বায়ু কাননে প্রান্তরে
প্রলয় পিনাক মত!

প্রভাতে পূজারী ফিরিল যখন
সাজি খানি ফুলে গ'ড়ে;
দেখিল দেবতা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
রয়েছে ধূলায় পড়ে!

দেবতা ভাঙ্গিয়া পড়ে গেল হায়!
তবু ফুরাল না কাজ;
ভাঙ্গা দেবতারে ভাসাতে সাগরে
পূজারী চলেছে আজ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

—*—

আধুনিক জাপান।

(ফেলিসিয়ঁ শালের ফরাসী হইতে)

১

আধুনিক জাপান—একটি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক সমস্যা।

যে দেশের সভ্যতা বহু প্রাচীন এবং আমাদের সভ্যতা হইতে অনেক ভিন্ন, বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত যেখানে কোন প্রকার বৈদেশিক ভাব প্রবেশ করে নাই, সেই জাপান, ত্রিশ বৎসর হইল, সম্পূর্ণরূপে না হউক অন্তত আংশিকভাবে, আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি সামন্ত-শাসনতন্ত্রের অধীন ছিল, সেই জাতি এখন 'আধুনিক' হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতি বিলাতী বনিয়া গেল কি জন্য?—আধুনিক ভাবাপন্ন হইল কেমন করিয়া?

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে, য়ুরোপে একটি সর্ব্বজনগৃহীত প্রচলিত মত আছে। সকলেই এইরূপ মনে করে,—আমাদের আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা, জাপানের প্রাচীন সভ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই জাপান য়ুরোপীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের জাতীয় গর্ব্ব হইতেই আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে,—আমাদের সভ্যতা, পৃথিবীর সমস্ত জাতির পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে হিতকর। কিন্তু জাপানীরা অবশ্য এই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াছিল; তাই তাহারা যথাসাধ্য আমাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আধুনিক জাপানে এখনও যে দুর-অতীতের কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে,—সে জাপানীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই সব অনিচ্ছাকৃত অসঙ্গতিগুলা এখন কেবল একটু হাস্যের উদ্রেক করে। একজন দৌত্যকার্য্য-নিপুণ রাষ্ট্রনীতিবেত্তা বলিয়াছিলেন,—"আধুনিক জাপান—য়ুরোপের হুবহু তর্জ্জমা, কিন্তু ভাল তর্জ্জমা নহে।

কতকগুলি জাপানী যাঁহারা য়ুরোপে বাস করেন এবং কতকগুলি য়ুরোপীয় যাঁহারা জাপানে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাও এই প্রচলিত মতের পক্ষপাতী। যে সকল জাপানী আমাদের মধ্যে একত্র বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের উপহাসকে ভয় করেন। আমাদের হইতে ভিন্নরূপে তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন—এই কথা স্বীকার করিতে তাঁহারা ভয় পান, পাছে আমরা তাঁহাদিগকে অসভ্য মনে করি; তাঁহারা শুধু আমাদের নিকট, তাঁহাদের রেল-পথের কথা, তাঁহাদের ট্র্যাম্‌-ওএর কথা, তাঁহাদের টেলিগ্রাফের কথা, তাঁহাদের টেলিফোনের কথা, তাঁহাদের সৈন্যের কথা, তাঁহাদের জাহাজের কথা, তাঁহাদের পার্লেমেণ্টের কথা, তাঁহাদের সংবাদপত্রাদির কথাই বলিয়া থাকেন। যে সকল য়ুরোপীয় ও মার্কিণদের জাপান ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট অর্থসম্বল আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক জাপানে গিয়া

শুধু জাপানী-জীবনের বাহ্য দিক্‌টাই দেখিয়াছে। স্বদেশের স্থানীয় অভ্যাস, স্থানীয় অভাব ও প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের চিন্তা ও চেষ্টা সংকীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় সহরের বড় বড় ইংরেজী হোটেল ছাড়া তাহারা আর কোথাও বাস করিতে পারে না। খাস দেশী অঞ্চলে তাহারা একাকী থাকিতে সাহস করে না; তাহাদের পথপ্রদর্শক দোভাষী তাহাদিগকে যাহা দেখায়, তাহারা তাহাই দেখে। তাহারা যাহা আবিষ্কার করে, তাহারা যাহা বর্ণনা করে, তাহা প্রকৃত জাপান নহে,—তাহা কল্পিত জাপান, বিকৃত জাপান, মিথ্যা জাপান।

প্রকৃত জাপানকে বুঝিবার জন্য আর এক প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। জাপানকে জাপানীভাবে দেখিতে হইবে, সহজভাবে দেখিতে হইবে।

জাপানীভাষা এতটা জানা চাই যে পথপ্রদর্শক না লইয়াও জাপানের অভ্যন্তর-প্রদেশে ভ্রমণ করা যাইতে পারে। সর্ব্বত্রই দেশীয় পান্থশালায় গিয়া উঠিতে হইবে; তবেই জাপানীরা প্রতিদিন কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে; বিশেষত সেই সকল জাপানীদের গৃহে যাইতে হইবে যাহারা য়ুরোপীয় হইয়া যায় নাই। তিনমাস কাল (এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ১৯০১) এইরূপভাবে ভ্রমণ করিয়া আমার এই সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে যে, জাপানের বিলাতিয়ানা-সম্বন্ধীয় প্রচলিত মতটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। আধুনিক জাপান, প্রাচীন জাপানের অধিকাংশই বজায় রাখিয়াছে, আধুনিক য়ুরোপ হইতে অল্পই ধার করিয়াছে। জাপান, সাংসারিক জীবনের মুখ্য উপাদানগুলিকে, বিশেষত গৃহকে ঠিক বজায় রাখিয়াছে।

জাপানীদের কাঠের বাড়ী। সাদাসিধা একতলা গৃহ—অধিকাংশস্থলে ভূমির অর্দ্ধতলার উপর আর একটি তলা উঠিয়াছে। গৃহটি সম্পূর্ণরূপে দেয়াল দিয়া ঘেরা নহে; গৃহের ভিতরে একটা বারাণ্ডা পথ চারিদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। কখন কখন উহার মাথার উপর একেবারে খোলা আকাশ, কখন বা অস্বচ্ছ মোটা কাগজের (শোজি) নির্ম্মিত অস্থাবর চলিষ্ণু দেয়ালের দ্বারা উহা পরিরক্ষিত; উহাকে ইচ্ছামত টানা যায়, কিংবা একেবারেই সরাইয়া ফেলা যায়; কেবল রাত্রিকালে ঐ স্থানে কতকগুলি তক্তা বসাইয়া গৃহটিকে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা হয়।

ঐ বারাণ্ডা-পথের ভিতর দিকে গৃহের কাম্‌রাগুলি উদ্ঘাটিত। এই জাপানী কাম্‌রার ভিতরে গিয়া প্রথমেই চোখে ঠেকে কি?—না কামরার নগ্নতা—সম্পূর্ণ নগ্নতা। কাম্‌রার মধ্যে কিছুই নাই; একটিও আস্‌বাব নাই; না আছে টেবিল, না আছে চৌকি, না আছে আরাম-কেদারা, না আছে খাট, না আছে আলমারি। মাটীর উপর মাদুর বিছানো—মাদুরগুলা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। চারিধারে,—মোটা কাগজের চলিষ্ণু দেয়াল; হাল্‌কা কাঠের চৌকোনা ফ্রেমের মধ্যে এই কাগজগুলা বসানো; যে খাঁজের ভিতর দিয়া এই কাগজের দেয়ালকে টানিয়া লওয়া যায়, সেই খাঁজ-কাটা পথটাও খুব পিচ্ছল। পর্দ্দা-দেয়াল সরাইয়া ফেলিলেই দুইটা ছোট কামরাকে মিলিত করিয়া সহজেই একটা বড়

কাম্‌রা করা যায়॥ অথবা, ঐ পর্দ্দা-দেয়ালের দ্বারা একটা বড় কাম্‌রাকে দুইটা ছোট কাম্‌রায় বিভক্ত করা যায়। মাদুরগুলার একই মাপ; ছয় ফিট লম্বা, তিন ফিট চৌড়া। সংখ্যার দ্বারা কামরার আয়তন নির্দ্দেশিত হয়; ছয় মাদুরের ঘর, কিংবা দশ মাদুরের ঘর,—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। গৃহ যাহাতে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সেই দিকে জাপানীদের বিশেষ লক্ষ্য। কাগজের দেয়ালগুলা প্রায় বৎসরে দুইবার করিয়া বদ্‌লানো হয়। প্রতি বৎসর শরৎকালে মাদুরগুলাও বদ্‌লানো হয়। জাপানীরা খালি পায়ে ঘরের ভিতর আনাগোনা করে; গৃহে প্রবেশ করিবার সময় জুতা দ্বারদেশে রাখিয়া আসে।

জাপানী কামরার সম্মুখ-প্রান্তে প্রায়ই একটা গুপ্ত কুঠুরীর মত ঘর থাকে (টোকোনর্মা); তাহাতে শিল্প-সামগ্রী সকল রক্ষিত হয়। একটা পালিস্ করা কাঠের ধাপের উপর,—একটা ঘট, একটা বাক্স, একটা দোয়াৎ, অথবা কাঠের, গালার, চীনেমাটির, হাতীর দাঁতের, কিংবা পিতলের এক একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি থাকে, যথা,—সোণালি কাজ-করা একটা গালার বাসন, যাহার কোণে উড়ন্ত রাজহংস; পিতলের একটা ফুলদানী—এই ফুলদানীর গঠন বংশবৃন্তের ন্যায়; একটা ধূপদান—ধূপদানের গায়ে একটা উচু-করা ফুলের নক্‌সা, সেই ফুলের উপর একটা ফড়িং বসিয়া আছে। ঘটের মধ্যে বসানো একটা জাপানী ফুলের তোড়া, কতকগুলি পুষ্পিত শাখা দিয়া এই তোড়াটি রচিত; উহাদের বিভিন্ন বক্রতা, ও অসমান উচ্চতা; ষোড়শ শতাব্দি হইতে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের যে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে সেই নিয়মানুসারেই এই শাখাগুলিকে সাজাইয়া বসানো হইয়াছে। 'টোকোনমার' দেয়ালের গায়ে একটা লম্বা ছবি ঝুলিতেছে; এই ছবি রেশমের উপর কিংবা কাগজের উপর আঁকা,—এবং ইহার ফ্রেম্ কাপড়ের পাড় দিয়া (কাকেমোনো) রচিত। সময়ে সময়ে এই শিল্প-সামগ্রীগুলি বদ্‌লানো হয়; 'কাকেমোনো'ও বদ্‌লানো হয়। পরিবারের মধ্যে যে সকল চিত্র সঞ্চিত আছে, তাহার মধ্যে যাহা বর্ত্তমান ঋতুর ঠিক উপযোগী, শীতাতপ প্রভৃতি দৈনিক-ভাবের উপযোগী, কোন সাময়িক ঘটনা-বিশেষে, গৃহের উপস্থিত অতিথিগণের মনে যদি কোন বিশেষ মনোবিকার উপস্থিত হয় সেই মনোবিকারের উপযোগী,—কোন চিত্র বাছিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখা হয়। এই শিল্পসামগ্রীর গুপ্ত কুঠরীটি,—পুরাতন বৌদ্ধ যজ্ঞবেদীর একপ্রকার স্মৃতিচিহ্ন বলিলেও হয়। সম্মানের জন্য অতিথিকে এই পবিত্র স্থানের সম্মুখে বসানো হয়।

জাপানী গৃহের কোন একটি কাম্‌রা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে ছোটখাটো অনেক জিনিস চ'খে পড়ে; সে সমস্তেরই উদ্দেশ্য গৃহকে ভুষিত করা, নেত্রকে পরিতৃপ্ত করা কাগজের পর্দ্দার উপর জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়পর্ব্বতের চিত্র অতি পরিপাটীরূপে অঙ্কিত, সমস্ত চিত্রগুলিই পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন; রুজুমাফিক ঘর-সাজানো জাপানীদের চক্ষুশূল। অঙ্গুলী-আকার কতকগুলি গর্ত্ত আছে, তাহার সাহায্যে দেয়াল ও দরজাগুলা (ফুসুমা) সরাইতে পারা যায়। এই গর্ত্তগুলা, সুন্দর কাজ-করা পিতলের আবরণে বিভুষিত,

খুব কাছে গিয়া দেখিলে দেখা যায়, দুইটা উড়ন্ত সারস, একটা কচ্ছপ, কিংবা দেবদারু গাছের কতকগুলা বাঁকানো ডাল রহিয়াছে।

সচরাচর, এই সব কাম্‌রায় কতকগুলি সুন্দর শিল্পসামগ্রী ছাড়া আর কিছুই থাকে না, কোন আস্‌বাব ব্যবহারের জন্য আবশ্যক হইলে তবেই তাহা উপস্থিতমত ঘরের মধ্যে আনা হয়। মনে কর একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল; অমনি তাড়াতাড়ি একটা বালিস আনিয়া মাদুরের উপর রাখা হইল্। অতিথি সেই বালিসের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিল; শীত হইলে, গরম ছাই ভরিয়া একটা ছাই-দানি তাহার সম্মুখে রাখা হয়।

ভোজনের সময়, প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটি ছোট ছোট গালার টেবিল রাখা হয়; তাহার উপর চীনেমাটির কিংবা গালার অনেকগুলি ঢাকাওয়ালা বাসন ও বাটী সাজানো থাকে। এই সব বাসন ও বাটীর মধ্যে, সীম কিংবা সমুদ্র-তৃণের সুপ, কাঁচা মাছ (আদার চাট্‌নী সহকৃত), ভাজা মাছ, সিদ্ধ মাছ, একপ্রকার 'ম্যাকারণি', বাইন-মৎস্যের টুক্‌রা, ডিম, সীম, বাঁশের কচি ডাল, পদ্মের শিকড়—এই সমস্ত থাকে। জাপানীরা প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন—এই তিন বেলার ভোজনে ঐ একই প্রকার খাদ্যসামগ্রী আহার করে; প্রাতর্ভোজনটা খুব স্বল্পস্থায়ী ও হাল্‌কা ধরণের। আমাদের যেমন পাঁউরুটি—উহাদের তেমনি ভাতই আহারের মূলভিত্তি। খর্ব্বকায় একজন পরিচারিকা, ভাতে-ভরা একটা কাঠের বারকসের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া, তাহা হইতে ভাত উঠাইয়া বাটীগুলা পূর্ণ করিতেছে। ভোজনকারী ব্যক্তি বামহস্তে বাটী ও দক্ষিণ হস্তের প্রথম তিন আঙ্গুলের মধ্যে দুইটা কাঠি ধরিয়া, খাদ্যের বাসনগুলা হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, ভাতের সঙ্গে কিছু তরকারী ও কিছু মৎস্য আহার করিতেছে। ভোজনকালে জাপানীরা অতি ক্ষুদ্র পেয়ালায়, দুধ ও চিনি না দিয়া চা পান করে। ভোজনের পূর্ব্বে, উহারা কখন কখন খুব ছোট গেলাসের এক গেলাস গরম 'সাকে' (চাউলের সুরা) পান করে।

ঘুমাইবার সময় হইলে, উহারা কতকগুলা মোটা লেপ মাদুরের উপর বিছাইয়া দেয়; উহাই তাহাদের খাট্। পুরুষদের মাথার বালিস সরু ও লম্বা। মেয়েদের কাঠের বালিস; ঐ বালিসের উপর উহারা মাথা না রাখিয়া ঘাড়টা রাখে;—কেন না, পাছে তাহাদের সুজটিল খোঁপাটি এলাইয়া যায়। যদি মশা থাকে, তাহা হইলে একটা নীল-সবুজ গাজের মশারী, ঘরের চাঁদি হইতে লট্‌কাইয়া দেয়। প্রত্যুষে একজন দাসী আসিয়া ঐ সকল অনাবশ্যক বিছানাপত্র সরাইয়া ফেলে। আলমারীর বদলে, দেয়ালের মধ্যে কুলুঙ্গিকাটা আছে, ঐ কুলুঙ্গিগুলা কাগজের চলন্ত দেয়ালের সাহায্যে বন্ধ করা হয়। প্রত্যেক গৃহেই কাঠের তক্তা দেওয়া একটা রান্নাঘর, তাহাতে কোন মাদুর নাই;—আর একটা স্নানের ঘর থাকে।

অধিকাংশ জাপানীই এইরূপ গৃহে বাস করে; এইরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। জাপানে, বিশেষত জাপানের 'মুক্ত বন্দরগুলিতে' কতকগুলি য়ুরোপীয় ধরণের বাড়ী আছে। কিন্তু প্রায় য়ুরোপীয়েরাই এই সকল বাড়ীতে বাস করে। বৈদেশিকদিগের অভ্যর্থনার জন্য,

য়ুরোপীয়-ধরণে-সজ্জিত কাম্‌রা নহিলে উচ্চ কর্ম্মচারীদের চলে না। তাঁহারা বাধ্য হইয়াই এইরূপ এক একটা কাম্‌রা রাখেন। কিন্তু গৃহের অবশিষ্ট অংশ একেবারেই জাপানী। এবং তাঁহারা জাপানী ধরণেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কয়েক বৎসর হইল, প্রায় সকল বড় সহরেই বিদেশীয়-হোটেল খোলা হইয়াছে (সেইয়ো রিয়োরী)। সেখানকার খাদ্য-তালিকা এক অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। 'পাঁ' (প্যাঁ); 'বিয়েরু' (বিয়ের) 'অমলেটু', 'বিফ্‌টেকি' ইত্যাদি। স্বজাতি-ধরণের আহার সমস্ত বজায় রাখিয়া, জাপানীরা কখন কখন আমোদ করিয়া য়ুরোপীয় ধরণে আহার করে।

জীবন যাত্রার প্রাচীন পদ্ধতিটি জাপানীরা কেন অবলম্বন করিয়াছে? আর্থিক কারণ ও হৃদয়ের টান্—উভয়ই ইহার মূলে অবস্থিত। কাঠের ও কাগজের বাড়ী অল্পদিনের মধ্যেই তৈয়ারী হয়; আহারও অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়। দরিদ্রদেশে ইহা কম সুবিধার কথা নহে। আচার ব্যবহার যেখানে খুব সাদাসিধা, সেইখানেই নিরুদ্বেগ জীবন ও মধুর কাল্পনিকতা সম্ভবপর; ভৌতিক জীবনের উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করা আবশ্যক বোধ হয় না। ইহা হইতেই নূতন ধরণের কতকগুলি ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে যাহার অনুরূপ য়ুরোপে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। জাপানীভাবাপন্ন একজন টোকিওর বাসিন্দা আমাকে বলিতেছিলেন,—নিজের বাড়ী পুড়িবার সময় অনেক জাপানীকেই তিনি হাসিতে দেখিয়াছেন; এইরূপ ঘটনায় তাহাদের অল্পই ক্ষতি হয়; যদি কাহারও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী থাকে, তাহা বাঁচাইবার জন্য তাহারা যথেষ্ট সময় পায়; তা ছাড়া, দগ্ধগৃহ ব্যক্তির প্রতি দেশের আইনও কতকগুলি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং এইরূপ দেশাচারও প্রচলিত যে, কাহারও গৃহ দগ্ধ হইলে তাহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তাহাকে অর্থ সাহায্য করিবে।

সমাজের মূল-গঠনটিতে এখনও সামন্ত-তন্ত্রের ও অভিজাত-তন্ত্রের প্রাধান্য থাকিলেও, এইরূপ সাদাসিধা জীবন-পদ্ধতি সাম্যনীতিরই অনুকূল। কি প্রাচীন "ডাইমিওর" গৃহে, কি গ্রাম্য পান্থশালায়—জাপানের সর্ব্বত্রই আমি এইরূপ বাস-পদ্ধতি, এইরূপ আস্‌বাব, এইরূপ ধরণের আহারাদি দেখিয়াছি। অবস্থা ও ভাগ্যের তারতম্য য়ুরোপে যেরূপ তীব্রভাবে প্রকটিত হয়, এখানে সেরূপ নহে। অবস্থার তারতম্যে কেবল জানা যায়, কাহার গৃহের কিংবা বাগানের আয়তন অপেক্ষাকৃত বড়, কাহার শিল্পসামগ্রী অধিক মূল্যবান, এই পর্য্যন্ত; তাহার অধিক আর কিছু নহে। তাই, "অন্য হইতে আপনাকে বিশেষ করা অপেক্ষা, অন্যের সদৃশ হইবার চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য",—বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই উচ্চনীতিটির প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। তা ছাড়া, সৌন্দর্য্যানুরাগ পরিতৃপ্ত হয় বলিয়াই জাপানীরা, জাপানী ধরণে জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। ঘরের আস্‌বাব-হীন নগ্নতাকেই তাহারা খুব সুরুচিসঙ্গত বলিয়া মনে করে। অনাবশ্যক, ঘর-যোড়া বহুমূল্য আস্‌বাব-আদি না থাকাতেই তাহারা কৌতূহলোদ্দীপক সৌন্দর্য্যের জিনিসগুলি তাহাদের গৃহে রাখিতে পারে।

বিলাসের সামগ্রী ও মিথ্যা বিলাসের সামগ্রী না থাকা প্রযুক্তই গৃহের মধ্যে প্রকৃত শিল্পকলা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হইয়াছে। Wlliam Morrisএর সোণার নিয়মটি জাপানে যেমন পালিত হয়, সেরূপ আর কোথাও হয় না। "এমন কোন জিনিস গৃহে রাখিবে না, যাহা তুমি আবশ্যক জ্ঞান কর না কিংবা যাহা সুন্দর বলিয়া মনে কর না।"

জাপানী গৃহের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া যখন য়ুরোপে ফিরিয়া আসা যায়, তখন ঐ প্রাচ্যদেশবাসীদের মত কতকটা ভাব ও ধারণা আমরাও অন্তরের মধ্যে অনুভব করি। আমাদের বিশাল ও উচ্চ বাড়ীগুলা কদর্য্য 'ব্যারাক্' (সৈন্যনিবাস) কিংবা কুৎসিৎ জেল্‌খানা বলিয়া মনে হয়। আমাদের য়ুরোপীয় গৃহের ঘরগুলা, কদর্য্যধরণে রংকরা কাগজে ঢাকা ঘরের দেয়াল, ঘরের অনাবশ্যক গালিচা, অলঙ্কারে অতিভারাক্রান্ত আস্‌বাব গুলা—সমস্তই আমাদের তখন অসহ্য বোধ হয়। রুজুমাফিক্ চারিদিক্ সমান করিয়া ফুলের যে তোড়া সাজানো হয় তাহাও অতীব গ্রাম্য বলিয়া মনে হয়। বিশেষত, প্রকৃত শিল্পসামগ্রী ও মিথ্যা শিল্পসামগ্রী যেরূপ নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করা হয় তাহাও অতীব শোচনীয়। ধনীদের গৃহে শিল্পসামগ্রী সকল গাদা করিয়া রাখা হয়; যাহার যত বেশী মূল্য সেই অনুসারে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইয়া থাকে; ঐ সকল শিল্পসামগ্রী, সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত না করিয়া প্রত্যুত মালিকের ধন ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয় দিয়া থাকে। আবার অর্দ্ধ-দরিদ্রের গৃহে, টুকিটাকি গৃহসজ্জার খেলো জিনিস দিয়া স্বকীয় অর্দ্ধ দারিদ্র্য ঢাকিবার চেষ্টা করা হয়; কেন না তাহারা দারিদ্র্যে লজ্জিত। এই বিলাস-সামগ্রীর চাপে,—মিথ্যা বিলাস-সামগ্রীর চাপে, প্রকৃত শিল্পকলা চূর্ণ হইয়া যায়। যে সাধারণ কুসংস্কার, ধন ও সৌন্দর্য্যকে এক করিয়া ফেলিয়াছে, যে গ্রাম্য অহঙ্কার, শিল্পকলাকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের উপায়রূপে পরিণত করিয়াছে, সেই কুসংস্কার ও মিথ্যা অহঙ্কার হইতেই জীবনের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। আমাদের য়ুরোপীয় সমাজে যে এই কদর্য্যতা প্রবেশ করিয়াছে তাহার কারণ,—কোন্ জিনিস আসলে উৎকৃষ্ট সে জ্ঞানটি আমাদের নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

দেবতার কোপ।

নিখিলনাথ বড়ই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল। সংসারের মধ্যে যাহারা আমোদ-আহ্লাদ হাসি-ঠাট্টার প্রশ্রয় দেয় সে তাহাদিগকে পাপী বলিত। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বত্রই একটা উদার গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে সেই গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে সে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা পাপ। এই সারবান তত্বটা নিখিলনাথ অতি অল্প বয়সেই আবিষ্কার করিয়াছিল। তাই সে সদাসর্ব্বদা গম্ভীর হইয়া থাকিত। একটা হাসির কথা শুনিয়া পেটের ভিতরে বত্রিশটা নাড়ি যখন ছিঁড়িবার উপক্রম করিত, সে তাহা অতি কষ্টে সামলাইয়া লইত, কিন্তু হাসিত না।

অদৃষ্টক্রমে তাহার পত্নী সুরবালা ঠিক বিপরীত প্রকৃতির হইয়াছিল। সদাই অধঃপ্রান্তে হাসির রেখাটুকু লাগিয়া আছে; কথায় কথায় পরিহাস; আর বড়ই আমোদ-প্রিয়।

এই দুইটী ভিন্ন প্রকৃতির প্রাণী সাংসারিক বন্ধনে এক হইলেও, উভয়ের হৃদয়ের মিলন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল, উভয়ে উভয়কে কিছুতেই মনোমত করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

বন্ধুবান্ধবের সহিত ক্বচিৎ কখন হাসি, ঠাট্টা করা যাইতে পারে কিন্তু স্ত্রীর সহিত কখনও না। স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র, তাহার মধ্যে বাচালতা আনা অন্যায়। নিখিলনাথের এইরূপ ধারণা ছিল,—তাই সে কখনও স্ত্রীর চপলতায় নির্ব্বিকার চিত্তে প্রশ্রয় দিত না। সুরবালা যখন স্বামীর সমক্ষে একটা সামান্য কথা পরিহাস-রস-সংযোগে বেশ সরস করিয়া তুলিত, তখন নিখিলনাথ সেটা একটু মিঠা হাসিতে আরো রঙ্গাইয়া না তুলিয়া একটা ক্রোধপূর্ণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার ধ্বংসসাধন করিত। নিখিলনাথ ভাবিয়াছিল, এইরূপ বারম্বার বাধা দিয়া সে সুরবালার রহস্য-প্রবৃত্তির বীজ একেবারে উন্মূল করিয়া দিতে পারিবে।

বহু চেষ্টা করিয়াও নিখিলনাথ সুরবালার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছিল না। তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরক্তি দেখাইলে পাছে সুরবালার উদ্দাম প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, সেই জন্য সে পত্নীর সহিত বড় ভাল ব্যবহার করিত না। অনেক সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিত। নিখিলনাথ মনে করিত, পৃথিবীতে বিধাতার অসংখ্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাহার স্ত্রীও একটী, তাহার উপর কোন বিশেষ মূল্য আরোপ করিবার আবশ্যক নাই।

স্বামীর এই অপরূপ ব্যবহারে সুরবালা নিখিলনাথের ভালবাসায় সন্দিহান হইয়া উঠিতেছিল। নিখিল যে এটা বুঝিতনা তাহা নহে, তবে কর্ত্তব্যের কঠোর আদেশপালনে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র সে নহে। যখন তাহার স্ত্রীকে এক একবার বক্ষে টানিয়া লইবার বাসনা হইত তখন সে সেই আবেগস্রোত প্রাণপণে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত।

(২)

নিখিলনাথ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কি করিবে সহজে ঠিক করিতে পারিল না। চাকুরী সে প্রাণান্তে করিবে না, ওকালতী ডাক্তারীতে আজকাল তেমন পসার নাই, ব্যবসার জন্য রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন,—কোনটারই সুবিধা ছিল না; গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তাও তেমন বলবতী নহে, কাজেই তাহার আর কোন পথ অবলম্বন করা হইল না।

ছেলেবেলা হইতে তাহার একটু রচনার সখ ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া বাঙ্গালা কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই লিখিবার ঝোঁকটা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

লেখাপড়া শেষ হইলে নিখিলের করিবার যখন আর কিছুই রহিল না তখন সে প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় খুব মাতিয়া উঠিল। ইহা ছাড়া, আরো একটী কাজে সে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিল—তাহা দেশের কাজ। মিটিং, বক্তৃতা, চাঁদার খাতা তাহাকে এতই ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল যে, সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার আহার ও স্নানের সময়ও কুলাইয়া উঠিত না। দেশের হিতকল্পে একটা-না একটা অনুষ্ঠান তাহাকে তন্ময় করিয়া রাখিত, অন্য কার্য্যের অবসর দিত না। স্বদেশ-চিন্তা তাহার হৃদয় হইতে সুরবালার মূর্ত্তিটা একেবারে চাঁচিয়া ফেলিতেছিল।

(৩)

সুরবালা স্বামীর মন নিজের দিকে ফিরাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিত; কিন্তু ক্রমেই স্বামীর দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যখন একটু আদর লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকিত, তখন হয়ত নিখিলনাথ সমাজ-সংস্কারের একটা জটিল প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতেছে। বেশভূষার আড়ম্বরে স্বামীকে সে যতই আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিত, নিখিলনাথের মন একটা কল্পনার আশ্রয়ে ততই শূন্যমার্গে উঠিতে থাকিত।

যে দিন নিখিলনাথ বাড়ী থাকিত, দুপুরবেলা অভিভাবকদের লুকাইয়া সুরবালা একটু প্রেমালাপের জন্য স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিত। দেখিত, হয় তাহার স্বামী প্রবন্ধরচনায় নয় পুস্তকপাঠে ব্যস্ত। সে কি করিবে? নিখিলনাথের কি এমন একটু অবসর নাই যে তাহার সহিত দুদণ্ড ভাল করিয়া কথা কহে? সে স্বামীর পশ্চাতে দীনহীনার ন্যায় সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়াইত—যদি নিখিল করুণা করিয়া তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহে। কিন্তু সে অন্যমনা হইত না, তাহাকে সম্ভাষণও করিত না।

কি করিয়া তবে সে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে? পৃথিবীর অসংখ্য বস্তুতে নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি কোন্ চৌম্বক শক্তিপ্রভাবে নিজের দিকে ফিরাইবে, তাহা সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিত না।

সুরবালা ব্যস্ততার ভান করিয়া স্বেচ্ছায় যখন স্বামীর লিখিবার দোয়াতটা উল্টাইয়া দিত, তখন নিখিল তাহাকে কিছুই না বলিয়া, নিজেই দোয়াতটা সামলাইয়া লইয়া আবার

লিখিতে বসিত। তবে সুরবালা কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইবে যে, সে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

সুরবালা কিছুতেই স্বামীকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সে স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে,—সে আর স্বামীকে আপনার মধ্যে পাইতেছে না। তাহার বক্ষের পঞ্জরের মধ্যে যতটুকু শক্তি আছে তাহার দ্বারাই সে নিখিলনাথকে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিত।

(৪)

সেদিন নিখিলনাথ সমস্ত দুপুরবেলাটা একটা প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত ছিল, তাই বৈকালে বড়ই ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য জিনিসটা তখনও তাহার মাথায় ঘুর-পাক খাইতেছিল। কপাল ও ভ্রূযুগের মধ্যে পরিশ্রমের চিহ্নস্বরূপ কতকগুলা স্বেদবিন্দু তখনও যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোন্ এক নূতন দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া প্রথম বসন্তের বৈকালের স্নিগ্ধ বায়ু যখন হঠাৎ ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল, পাশের বাগান হইতে মাধবীফুলের এক রাশ গন্ধ যখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল, তখন নিখিলনাথ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। গৃহ-প্রাচীরের বহির্ভাগে যে জগৎটা সন্ধ্যার তিমিরে অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, তাহার শোভা দেখিবার জন্য তাহার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল,—সে বাতায়নপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, এক ঝলক বায়ু তাহার পরিশ্রমক্লান্ত মুখখানিকে সরস করিয়া তুলিল।

তখন বাহিরে আলোকে ও অন্ধকারে বড়ই সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে,—অন্ধকার দৈত্য শুভ্র আলোকরেখাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিল। এক রাশ আলো প্রাণভয়ে গগনের একপ্রান্তে ক্ষুদ্রখণ্ড পাংশুল মেঘের নিকট কম্পিতকলেবরে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিল। নিখিলনাথ নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতেছিল। একটা কি কল্পনার উদ্দেশ পাইয়া তখন তাহার মন সেই মেঘখণ্ডের দিকে উড়িতেছিল।

সুরবালা সেই সময় গৃহে প্রবেশ করিল, স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। নিখিলনাথ তাহার আগমন জানিতে পারিল বলিয়া বোধ হইল না।

সুরবালা তখন প্রাণপণে নিখিলনাথের চিন্তার একটা খেই ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল; তাহা যে তখন অনেক দূরদেশে—মেঘের রাজত্বে গিয়া পড়িয়াছে, সে সন্ধান সুরবালা পাইলনা।

নিখিলনাথ তন্ময় হইয়া কাহার কথা ভাবিতেছে? কে সে? সুরবালা বারম্বার আলোচনা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলনা। তাহার মনটা আজ বড় খারাপ ছিল। সকালবেলা সে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে,—সেটী নিখিলনাথের কবিতার খাতা। নবাবিষ্কৃত এক্স-রশ্মি-প্রভাবে বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া

ভিতরকার সব পদার্থ যেমন দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি সুরবালা এই খাতার কল্যাণে আজ স্বামীর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত দেখিয়াছে। সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, স্বামীর হৃদয়ে তার একতিল স্থান নাই।

নিখিলনাথের সমস্ত কবিতাই জন্মভূমির উদ্দেশ্যে রচনা। কল্পনাতেও নিখিলনাথ কোন প্রেমিকার প্রেমবিহ্বলতা প্রকাশ করিয়া আপনার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করে নাই। কিন্তু অনেকস্থলে জননীর পরিবর্ত্তে দুঃখিনী রমণী বলিয়া নিখিল মাতৃভূমির জন্য আক্ষেপ করিয়াছিল। সুরবালার জানিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কে সে দুঃখিনী রমণী যাহার উদ্দেশে তাহার স্বামী হৃদয়োচ্ছ্বাসে এমন সব সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছে। নিখিল কবিতায় যেমন বাছা-বাছা কথাগুলি সাজাইয়াছে তাহার একটা কথা যদি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইয়া যাইত। আর যাহাহউক, সেই দুঃখিনী রমণী যে তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সে তাহা বুঝিল।

(৫)

যে বিপদের আশঙ্কায় সুরবালা এতদিন ম্রিয়মান ছিল, যাহার জন্য সুখের প্রাচীরে ঘেরা গৃহমধ্যে থাকিয়াও একটা শান্তি পাইতেছিলনা, আজ সেই বিপদ তাহার দ্বারস্থ। সে কি করিবে? কাহার নিকট এই বিপদের কথা বলিবে,—কে উপায় বলিয়া দিবে? কি উপায়ে তাহার স্বামীর পরিপূর্ণ ভালবাসা সে লাভ করিবে? সুরবালা মনে মনে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু একটা পন্থা আবিষ্কৃত হইল না।

তখন সে বুড়ী ঝির কাছে চলিল,—বুড়ী ঝি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল; স্নেহের শৃঙ্খল তাহাকে বুড়া বয়সে সুরবালার শ্বশুরবাড়ীর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছিল, আজও পর্য্যন্ত মুক্তি দেয় নাই। সুরবালা এই বুড়ী ঝিটিকে বড়ই ভালবাসিত। প্রথম প্রথম শ্বশুর গৃহটা যখন বড়ই অপরিচিত স্থান বলিয়া সুরবালার মনে ঠেকিত, তখন এই শৈশবের সঙ্গিনী বুড়ী ঝি তাহার একমাত্র অতিপরিচিত আশ্রয় ছিল,—সুরবালার একটু কষ্ট হইলে এই বুড়ী ঝির বক্ষে আসিয়া ঝাপাইয়া পড়িত, তাহাতে সে অনেকটা শান্ত হইতে পারিত।

আজ সে তাই বুড়ী ঝির কাছে আসিয়াছিল। প্রথমে সে কথা কহিতে পারিলনা। অনেক চেষ্টা করিল, কথাগুলা যেন বক্ষের ভিতর হইতে গলায় আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। অশ্রু ও কথা এই দুটা জিনিস একত্রে বাহির হইতে গিয়া একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিতেছিল, কেহই বাহির হইতে পারিতেছিলনা।

সুরবালা বুড়ী ঝির কোলে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। ঝি তাহাকে বারম্বার প্রশ্ন করিল, কিন্তু সে একটা কথারও জবাব দিতে পারিলনা।

অশ্রুমোচনের পর হৃদয়ের গুরুভার কতকটা কমিয়া গেলে সুরবালা নিখিলনাথের কথাটা পাড়িল। ঝিকে ভালরকম করিয়া বুঝাইয়া বলিল যে, সে বেশ জানিয়াছে তাহার স্বামী অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। ঝি কথাটা শুনিয়া বিস্মিত হইল,—সুরবালার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া

তাহার নয়ন সজল হইয়া উঠিল, সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নিখিল কি তোমায় আদর যত্ন করেনা ?"

"আদর যত্ন ?—ভাল করিয়া দুটা কথাও বলেনা।"

"সত্যি নাকি ?"

"বুড়ি! আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে!"

সুরবালা নিখিলনাথের উপর যে অস্পষ্ট সন্দেহ পোষণ করিত, এখন তাহাকে দৃঢ় সত্যে পরিণত করিয়া লইয়াছে।

সুরবালা বলিল,—"বুড়ী, এর কি কোন উপায় নেই ?" সে অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা একটু ভাবিয়া বলিল,—"আছে।"

"কি ?"

"দেবতার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই,—মানুষের সাধ্য নাই কিছু করে।"

সুরবালা কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলনা, বলিল—"কি বলিস তুই!"

বৃদ্ধা তখন সব কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল, বলিল,—"শুনিস নি কি মা, ওষুধ করার কথা ? আর তুইত সেদিনকার মেয়ে, কেমন করিয়াই বা জানিবি।"

সুরবালা বলিল—"ওষুধ কি ?"

"সে খাওয়ালে অবাধ্য স্বোয়ামী বাধ্য হয়—সে দেবতার স্বপ্নদত্ত।"

"কোথায় পাওয়া যায় ?"

"বনপুরের পঞ্চানন ঠাকুর জাগ্রত—পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে।"

বৃদ্ধা তখন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করিল, তাহার পরিচিত কত স্ত্রীলোক পঞ্চানন ঠাকুরের ঔষধ লইয়া স্বামীকে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। ঐ উপায়ে নিজের অবাধ্য স্বামীকে সে কি রকম বশে আনিয়াছিল, সে কথাও বলিতে ভুলিল না।

বৃদ্ধার কথায় সুরবালা আশ্বস্ত হইল। হিন্দুর মেয়ে শৈশবে খেলার ঘরে যে দেব-ভক্তি শিক্ষা করে তাহার আধিপত্য জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। সুরবালা এ ক্ষেত্রে দৈবের আশ্রয় নতশিরে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। তা ছাড়া স্বামীর উদ্ধারের দ্বিতীয় পথ তখন আর ছিলনা।

বৃদ্ধা সেই দিনই বনপুর অভিমুখে রওনা হইল।

(৬)

বুড়ী যথাসময়ে পঞ্চানন-দেবের মহৌষধ লইয়া বনপুর হইতে ফিরিল, এবং যথানিয়মে তাহা মন্ত্র পড়িয়া ও কৌটায় পুরিয়া সুরবালার হাতে আনিয়া দিল এবং চুপে চুপে কহিল, —"বারবেলায় খাওয়াতে হবে, বুঝলি! জামাইবাবুর চার সঙ্গে মিশিয়ে দিস্,—খাওয়াতে

মাত্র দেখবি হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে। পঞ্চাননঠাকুরের ওষুধ। এ পীরপ্যাকম্বর নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!—তুই এগো, আমি গরমজল নিয়ে আসছি। দেখিস, চুলটা এলিয়ে তবে ওষুধ ঢালবি, ভুলিসনে।"

বুড়ী গরম জল আনিতে গেল ওষুধের কৌটা হাতে লইয়া সুরবালা ধীরে ধীরে তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কই এতদিন যাহার জন্য সে প্রত্যাশ করিয়া ছিল তাহা হাতে পাইয়া তাহার হৃদয় ত আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিল না। বরঞ্চ একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক আসিয়া যেন তাহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। গৃহের যে দেয়ালের ধারে একটি ছোট টেবিলে স্বামীর জন্য চার সরঞ্জাম সাজান ছিল, সেই খানে আসিয়া ক্ষণকাল বিমর্ষ ভাবে শূন্য পেয়ালার দিকে চাহিয়া রহিল। যখন দেখিল, বুড়ী কেটলীহস্ত গৃহে প্রবেশ করিতেছে তখন অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি কৌটার গুঁড়া পেয়ালায় ঢালিয় দিল। ঘরে আসিয়া বুড়ী কেটলীটা ভূমে রাখিয়া আবার চুপে চুপে তাহাকে কহিল,—"এইবার চা তৈরি কর, আমি ভুতোকে এখানে পাঠিয়ে শিল নোড়াটা ভাল করে ধুয়ে রেখে আসি।"

সুরবালা আদিষ্ট ভৃত্যের ন্যায় ধীরে ধীরে যে পেয়ালায় ঔষধ ঢালিয়াছিল তাহাতে চা ঢালিল। কিন্তু চাকর আসিয়া যখন বাবুর জন্য চা চাহিল, তখন তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হাত কাঁপিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যেন বাল্যকালে একবার শুনিয়াছিল যে, একজন ঔষধে স্বামী বশ করিতে গিয়া কি একটা বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে আর এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া চাকরের হাতে দিল।

চাকর চলিয়া গেলে সে রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিল,—"হে ঠাকুর, ক্ষমা কর, তুমি দয়া করিয়া যাহা দিয়াছ তাহা আমার ভালর জন্যই, আমি তাহা ফেলিব না, কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদি ক্ষতি না হয় তাঁহাকেই দিব। আর যদি কোন ক্ষতি হয় ? মৃত্যুর অধিক আর ক্ষতি কি হইবে ? মৃত্যুতে আমার কি ভয় ? ভগবান তাহাই হউক সেই প্রসাদই আমি ভিক্ষা করি। আর যেন স্বামীর অবহেলা চক্ষে দেখিতে না হয়।"

ভাবিতে ভাবিতে সুরবালা সেই ঔষধ-মিশ্রিত চা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর বিছানায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

(৭)

ঘুমাইয়া সুরবালা স্বপ্নে দেখিল, নিখিলনাথ আর সেরূপ নাই, তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার সহিত কত হাস্য পরিহাস করিতেছে; নিখিলনাথ একবার বাহু দুটী প্রসারণ করিয়া সুরবালাকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল, সুরবালা বোধ করিল, তাহার সমস্ত দেহখানা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, সে জীবনে কখন এতটা আনন্দ অনুভব করে নাই।

হঠাৎ কি একটা যন্ত্রণায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সুরবালার মনে হইল তাহার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন প্রহার করিতেছে। সে চীৎকার করিরা উঠিয়া বসিল।

নিখিলনাথ এই সময় তাঁহার হারান খাতার অনুসন্ধানে এইখানে আসিয়াছিল। অসময়ে

তাহার নয়ন সজল হইয়া উঠিল, সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নিখিল কি তোমায় আদর যত্ন করেনা ?"

"আদর যত্ন ?—ভাল করিয়া দুটা কথাও বলেনা।"

"সত্যি নাকি ?"

"বুড়ি ! আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে !"

সুরবালা নিখিলনাথের উপর যে অস্পষ্ট সন্দেহ পোষণ করিত, এখন তাহাকে দৃঢ় সত্যে পরিণত করিয়া লইয়াছে।

সুরবালা বলিল,—"বুড়ী, এর কি কোন উপায় নেই ?" সে অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা একটু ভাবিয়া বলিল,—"আছে।"

"কি ?"

"দেবতার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই,—মানুষের সাধ্য নাই কিছু করে।"

সুরবালা কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলনা, বলিল—"কি বলিস তুই !"

বৃদ্ধা তখন সব কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল, বলিল,—"শুনিস নি কি মা, ওষুধ করার কথা ? আর তুইত সেদিনকার মেয়ে, কেমন করিয়াই বা জানিবি।"

সুরবালা বলিল—"ওষুধ কি ?"

"সে খাওয়ালে অবাধ্য স্বোয়ামী বাধ্য হয়—সে দেবতার স্বপ্নদত্ত।"

"কোথায় পাওয়া যায় ?"

"বনপুরের পঞ্চানন ঠাকুর জাগ্রত—পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে।"

বৃদ্ধা তখন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করিল, তাহার পরিচিত কত স্ত্রীলোক পঞ্চানন ঠাকুরের ঔষধ লইয়া স্বামীকে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। ঐ উপায়ে নিজের অবাধ্য স্বামীকে সে কি রকম বশে আনিয়াছিল, সে কথাও বলিতে ভুলিল না।

বৃদ্ধার কথায় সুরবালা আশ্বস্ত হইল। হিন্দুর মেয়ে শৈশবে খেলার ঘরে যে দেব-ভক্তি শিক্ষা করে তাহার আধিপত্য জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। সুরবালা এ ক্ষেত্রে দৈবের আশ্রয় নতশিরে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। তা ছাড়া স্বামীর উদ্ধারের দ্বিতীয় পথ তখন আর ছিলনা।

বৃদ্ধা সেই দিনই বনপুর অভিমুখে রওনা হইল।

(৬)

বুড়ী যথাসময়ে পঞ্চানন-দেবের মহৌষধ লইয়া বনপুর হইতে ফিরিল, এবং যথানিয়মে তাহা মন্ত্র পড়িয়া ও কৌটায় পুরিয়া সুরবালার হাতে আনিয়া দিল এবং চুপে চুপে কহিল, —"বারবেলায় খাওয়াতে হবে, বুঝলি ! জামাইবাবুর চার সঙ্গে মিশিয়ে দিস্,—খাওয়াতে

মাত্র দেখবি হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে। পঞ্চাননঠাকুরের ওষুধ। এ পীরপ্যাকম্বর নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী !—তুই এগো, আমি গরমজল নিয়ে আসছি। দেখিস, চুলটা এলিয়ে তবে ওষুধ ঢালবি, ভুলিসনে।"

বুড়ী গরম জল আনিতে গেল ওষুধের কৌটা হাতে লইয়া সুরবালা ধীরে ধীরে তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কই এতদিন যাহার জন্য সে প্রত্যাশ করিয়া ছিল তাহা হাতে পাইয়া তাহার হৃদয় ত আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল না। বরঞ্চ একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক আসিয়া যেন তাহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। গৃহের যে দেয়ালের ধারে একটি ছোট টেবিলে স্বামীর জন্য চার সরঞ্জাম সাজান ছিল, সেই খানে আসিয়া ক্ষণকাল বিমর্ষ ভাবে শূন্য পেয়ালার দিকে চাহিয়া রহিল। যখন দেখিল, বুড়ী কেটলীহস্তে গৃহে প্রবেশ করিতেছে তখন অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি কৌটার গুঁড়া পেয়ালায় ঢালিয়া দিল। ঘরে আসিয়া বুড়ী কেটলীটা ভুমে রাখিয়া আবার চুপে চুপে তাহাকে কহিল, —"এইবার চা তৈরি কর, আমি ভুতোকে এখানে পাঠিয়ে শিল নোড়াটা ভাল করে ধুয়ে রেখে আসি।"

সুরবালা আদিষ্ট ভৃত্যের ন্যায় ধীরে ধীরে যে পেয়ালায় ঔষধ ঢালিয়াছিল তাহাতে চা ঢালিল। কিন্তু চাকর আসিয়া যখন বাবুর জন্য চা চাহিল, তখন তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হাত কাঁপিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যেন বাল্যকালে একবার শুনিয়াছিল যে, একজন ঔষধে স্বামী বশ করিতে গিয়া কি একটা বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে আর এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া চাকরের হাতে দিল।

চাকর চলিয়া গেলে সে রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিল,—"হে ঠাকুর, ক্ষমা কর, তুমি দয়া করিয়া যাহা দিয়াছ তাহা আমার ভালর জন্যই, আমি তাহা ফেলিব না, কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদি ক্ষতি না হয় তাঁহাকেই দিব। আর যদি কোন ক্ষতি হয় ? মৃত্যুর অধিক আর ক্ষতি কি হইবে ? মৃত্যুতে আমার কি ভয় ? ভগবান তাহাই হউক সেই প্রসাদই আমি ভিক্ষা করি। আর যেন স্বামীর অবহেলা চক্ষে দেখিতে না হয়।"

ভাবিতে ভাবিতে সুরবালা সেই ঔষধ-মিশ্রিত চা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর বিছানায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

(৭)

ঘুমাইয়া সুরবালা স্বপ্নে দেখিল, নিখিলনাথ আর সেরূপ নাই, তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার সহিত কত হাস্য পরিহাস করিতেছে; নিখিলনাথ একবার বাহু দুটী প্রসারণ করিয়া সুরবালাকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল, সুরবালা বোধ করিল, তাহার সমস্ত দেহখানা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, সে জীবনে কখন এতটা আনন্দ অনুভব করে নাই।

হঠাৎ কি একটা যন্ত্রণায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সুরবালার মনে হইল তাহার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন প্রহার করিতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিখিলনাথ এই সময় তাঁহার হারান খাতার অনুসন্ধানে এইখানে আসিয়াছিল। অসময়ে

সুরবালাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার মনে একটু চিন্তার উদ্রেক হইল। ভাবিলেন, কোন অসুখ করে নাইত? নিকটে আসিয়া কপালে হাত দিবামাত্র সুরবালা চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল। নিখিলনাথের মুখের দিকে অপরিচিতের ন্যায় ভয়বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"কে তুই?"

সে স্বর পরিহাসের স্বর নহে, সে হাসি উন্মত্তের হাসি। নিখিলনাথ সকাতরে কহিলেন,—"আমি নিখিলনাথ, তোমার স্বামী! তুমি এমন করিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" এই কথা বলিয়া নিখিল শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সাদরে বক্ষে টানিয়া লইতে গেল।

হায়! কিছু পূর্ব্বে তাহার এইরূপ আদরের জন্য সুরবালা কিরূপ লালায়িত ছিল! কিন্তু এখন সে তাহাতে অধিকতর ভীত হইয়া তাঁহাকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—"তুই নিখিলনাথ কক্ষণো না সর বলছি,—নইলে তোকেও বিষ খাওয়াব।"

নিখিলনাথের চক্ষে জল আসিল—বুঝিল সুরবালা পাগল হইয়াছে তাহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া উঠিতে চাহিল। সম্ভবত সেই ইহার কারণ! ভগবান কি করিলে সুরবালার মুখে আবার সেই পরিহাসের হাসি ফুটিয়া উঠে! সেজন্য নিখিলনাথ যে তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য ত্যাগে প্রস্তুত!

ডাক্তার আসিয়াও বলিলেন, সুরবালা উন্মাদরোগে আক্রান্ত। অনুসন্ধানে ধরা পড়িল, সুরবালা বিষ ভক্ষণ করিয়াছে। নিখিলনাথের প্রাণ অনুতাপে বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

বুড়ী ঝি সুরবালার অবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিতে করিতে ঠাকুরঘরে ঢুকিল। সেখানে গৃহতলে মাথামুড় খুঁড়িয়া কহিল—"কি দোষ হয়েছে বাবা,—কি অপরাধে এমন ঘটালি! আমি ত সব রীত পালন করেছি! তিনবার মন্ত্র পড়ে উপর দিকে চেয়ে তবে শিকড় গুঁড় করেছি, তবে কি দোষে তুই এমন ঘটালি বাবা!"

সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—সুরবালার কেশ ত সে এলায়িত দেখে নাই। এই দোষেই যে ঠাকুর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন সে তখন ঠিক বুঝিল। ঠাকুরের ন্যায়-বিচারের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়া সুরবালার প্রতি রাগ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল,—"করলি কি সুর, তুই কি কল্লি, এলোচুলে ওষুধ ঢাল্লিনে! পঞ্চানন ঠাকুর যে জাগ্রত দেবতা! হায় হায়! কি হোল ঠাকুর এ যাত্রা রক্ষে কর;—আমি এখনি স্বস্ত্যয়ন করাব।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার গীতকথা।

—:০:—

পরিচয়।

অনেকেই জানেন, বাঙ্গালার মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টির পর বাঙ্গালায় 'উপন্যাস' জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু, এই যে 'উপন্যাস', ইহা ভাবে স্বভাবে ইংরেজীর অনুবাদ। 'উপন্যাসে'র কলাকৌশল, চমৎকারিত্ব, উহার বর্ণনাভঙ্গী হইতে চরিত্র চিত্রণ প্রভৃতি এবং কল্পনার নানামুখীন্ বিচিত্র গতি,—সমস্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্য দিয়া চুঁয়াইয়া আসিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে 'উপন্যাস' বলিয়া বাঙ্গালায় কিছু ছিল না,—যাহা ছিল, তাহা 'কথা' * আখ্যায় অভিহিত হইত,—তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছাঁচের জিনিষ। তাহা যেন বাঙ্গালীর আপন প্রকৃতির একটী নিতান্ত নিজস্ব সুরের মধ্য দিয়া একান্ত সহজ ভাবে বাজিয়া যাইত। অথচ আজ 'উপন্যাস' যে ক্ষেত্রে যাহা করিতেছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে তাহার অপেক্ষা অনেকখানি বেশী কাজ এই 'কথা' বা কাহিনীর উপর সংন্যস্ত ছিল,—এবং আপনার প্রত্যেক সুরে, প্রত্যেক শব্দে নিতান্ত অবহেলায় এই 'কথা' বা কাহিনী প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার কাজ উদ্ধার করিয়া গিয়াছে।

এখনও, বাঙ্গালীর প্রকৃত প্রাণ যেখানে, সেই পল্লীর শান্ত বাটে, মুক্ত মাঠে, নদীর ঘাটে, নিত্য যখন এই 'কথা'র সুর প্রাণের আবেগরাশি ও আদররাশি মথিত করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠে, পরিচিত বা অপরিচিত কলা-প্রয়াসহীন কোন সাধারণ কণ্ঠে যখন সেই সুর আপনার এক স্বতন্ত্র নিজস্ব ললিত রাগিণীর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় কড়ি-কোমলে খেলিতে খেলিতে

"কোথা' থেকে কোথায় এলাম, জঙ্গলমাঝে শু'য়ে রইলাম,
স্বপ্নে দেখি আমি মধুমালার মুখ—রে!—"

প্রভৃতি চিরপরিচিত কিন্তু নিত্য আবছায়ায় ঢাকা মধুর পদগুলি বাতাসের হিল্লোলে হিল্লোলে কাঁপাইয়া তোলে,—তখন সত্যই কত স্বপ্ন সত্যের কল্পনায় চিত্তের দুয়ারে কত সোণার রাজ্য আনিয়া বসাইয়া যায়।—তখন, স্নিগ্ধ প্রকৃতি যেন অকস্মাৎ সুরে আহত হইয়া উচ্ছ্সিত

* রূপকথা ও গীতকথা এই শ্রেণীর প্রধান বস্তু। উভয়ের মূল এক, কিন্তু কাণ্ডের প্রভেদ, তাহা পরে বুঝানো যাইতেছে।

হইয়া উঠে,—বাংলার সেই পল্লীর শিশু হইতে বৃদ্ধের পর্য্যন্ত চিত্তগুলি কত কাব্য কত কল্পনা, কত সৌন্দর্য্যের কি এক অব্যক্ত মোহন ভাবের অমৃত ঝঙ্কারে তারে তারে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে।

এই চিরকালের সামগ্রীর কাছে বাংলার সকল নব কাব্য, সকল উপন্যাস, সকল গল্পগুচ্ছ কোথায় ভাসিয়া যায়। ইহা, বুঝিবার না বুঝিবার অপেক্ষা রাখে না,—সুরের প্রথম টানের সঙ্গে ইহা যেন গাছ পাথরেও প্রাণের আবেশের ঢেউ তুলিয়া দেয়।

কিন্তু এই জিনিষ আমরা উপেক্ষা করিয়াছিলাম! পরের দুয়ার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিবার পূর্ব্বে আমরা খুঁজি নাই যে, ভাবে, সৌন্দর্য্যে, কত মহিমা কত গরিমা আমারই বাংলা-মা'র ধূলি-কণিকায় পড়িয়া রহিয়াছে! সে যে আমাদের গৌরবের জিনিষ, সে যে আমাদের আপনার জিনিষ,—পরের মতন তাহাও যে আমরা জগত সমক্ষে বাহির করিয়া দিয়া অনেক বাহবা লইতে পারি, সে দিকে আমরা দৃষ্টি করি নাই! নহিলে, আরব পারস্যের একাধিক সহস্র রজনী আসিয়া আমাদের দেশ জুড়িয়া বসিয়া কত তারা-নক্ষত্র ফুটাইয়া গেল, আর তাহা হইতে কত নির্ম্মল—কত সরল—কত পবিত্র সুন্দর নিষ্কলঙ্ক রাকা-চাঁদের মত প্রাণের জিনিষ আমাদের,—আমার বাংলা-মা'র বাঁশীর সুর,—গোধূলির ধূলাতেই ধূসরিত হইয়া লুটাইয়া রহিল,—তাহার আর আরতিই হইল না!! *

যদি আপনি পল্লীর জীবন অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তবে জানিতে পারিয়াছেন, ঠিক যে মূল্যে বিদ্বজ্জনের সভা-দরবারে শাস্ত্র কথার তর্ক-বিতণ্ডা উত্থিত হয়, কাব্য দর্শনের চর্চ্চা-কোলাহল আসর সরগরম করিয়া তোলে, যেমন আর এক পার্শ্বে আমাদের তাল-বেতালের বা প্রবাদ প্রবচনের কঠিন প্রশ্ন-সমস্যায় গভীর চিন্তাসঙ্কুল ভাব রেখা দিয়া উঠে, বা বৈঠকীয় রসকথার মুক্ত হাস্য তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠায়, অথবা বণিক মোদকের দোকানে দোকানে যে মূল্যে প্রাণের যে আবেগে কৃত্তিবাস, কাশীদাস বা দাশরথীর কাব্যকলা আধ-সুরে বিচর্চ্চিত হয়, ঠিক সেই মূল্যে,—অথচ তাহার অপেক্ষা পরম স্নিগ্ধ কমনীয়তায়, অতি মোহন নিরঙ্কুশ সরলতায় পল্লীর পথে ঘাটে, আর পল্লীর গৃহাঙ্গনে ঠাকুরমার অমৃত মুখের কথা-নির্ঝর এবং এই গীতকথার মনোমুগ্ধকর সুর বাংলার দীপখচিত সন্ধ্যাকে অনাবিল ব্যগ্র আনন্দে অধীর করিয়া তুলে। আহা সেই আরামের সন্ধ্যা।—সেই বিশ্রামের শীতল লগ্ন! সে সন্ধ্যা শুক্লাই হউক, কৃষ্ণাই হউক,—তখন গলার সুরে প্রাণের পুলকে মধু হইতেও মধুময়ী হইয়া উঠে।

যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, পল্লীর আতুর ঘর ঘিরিয়া † প্রথম এই সুর

---

* কেবল, উল্লেখযোগ্য ভাবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে 'মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের গৃহে একদিন ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল মাত্র।

† পল্লীগ্রামে, জননী যখন আতুর গৃহে যান, সেই দিন হইতেই ইহার আয়োজন হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাকে 'পরণকথা' বলে। গ্রামের যাহারা গীতকথা জানে, তাহারা অধিকাংশই কৃষক পুরুষ, কচিৎ বর্ষিয়সী গ্রাম্য

উঠিয়াছে, আর, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে,—কত নিদ্রাতুর, কত বিনিদ্র বিভাবরীর উপর দিয়া, জীবনের কর্ম্ম বন্ধনের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত নিত্য জননীর স্নেহের ন্যায় এ সুর বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে!

সেই,—জীর্ণ পর্ণকুটীরের নিরক্ষর কৃষক হইতে ধনী-গৃহের দিদিমার কণ্ঠে পর্য্যন্ত যে 'মধুমালা' 'রূপমালা'র কথা আনন্দপুলকের লহর তুলিয়াছিল, আজ শিক্ষিতের অক্ষর-মহিমার কাছে তাহা নিতান্তই উপেক্ষার অনাদর সহিয়া নীরবে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

Arabian nights আজ জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আদর পাইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগা দেশের মধ্যে কেবল এক কাশ্মীর কথাই (Folk Tales of Cashmir) কথঞ্চিৎ আদর পাইয়াছে, তাহাও বিদেশীয়ের কৃপাকটাক্ষে পড়িতে পারিয়াছিল বলিয়া!

কিন্তু ধন্য আমাদের লালবিহারী, আমাদের বরেণ্য পথপ্রদর্শক, যিনি প্রাণের আহ্লাদে অন্তরের আকুলতায় এই ধূলির ঝুলি ঘৃণায় নিক্ষেপ না করিয়া, ঝাড়িয়া তুলিয়া তাঁহার মজবুত বিলাতী ট্রাঙ্কে পূরিয়াছিলেন। * তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা ভিন্ন ইহাকে রক্ষা করিবার পথান্তর নাই!

বিধবা। তাহাদের কেহ এক জোড়া কাপড় বা কিছু তণ্ডুলের লোভে আসিয়া "রোজের রাত যোগান" লয়। 'প্রত্যেক রাত্রে গীতকথা গীত হয়। সন্ধ্যারাত্রে আরম্ভ হইয়া, রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরের শেষে এক একটী প্রায় শেষ হয়। ষষ্ঠীর দিন ঘটা কিছু অন্যপ্রকার হইয়া থাকে। এই দিন সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইবে,—কেন না, আজ বিধাতা পুরুষ শিশুর ললাট লিপি লিখিয়া যাইবেন। এই দিন ধূয়া গাইবার জন্য দুইচারিটী সুকণ্ঠ লোক মূল কথকের সঙ্গে আসিয়া যোগ দেয় এবং গীতকথায় রাত্রি কাটিয়া যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্র মতে এই প্রথা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ কবিরাজ নারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—শিশুর ও প্রসূতির উভয়েরই স্বাস্থ্যাদির পক্ষে ইহা বড়ই কল্যাণকর।" তিনি আমাকে গীতকথাগুলি সংগ্রহ করিবার পক্ষে এজন্য বিশেষ উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন।

* তিনি গীতকথা এবং রূপকথাকে এক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুই জিনিস সর্ব্বাঙ্গে এক নহে। রূপ কথা পুরুষেরা বড় জানেন না, জানিলেও ঠিক তেমন ভাষাটী দিয়া বলিতে পারেন না। উহা দিদিমাদের এবং গৃহিণী-দেরই একচেটিয়া সম্পত্তি।—আর, রূপ কথায় কেবল ছড়া আছে, গান নাই।

গীতকথা তাহা নহে। গানই ইহার মজ্জা। ইহা যেমন গোঠের রাখালের উচ্চ কণ্ঠে, যেমন পথবাহী ভার-বাহকের ভাঙ্গাসুরে, যেমন প্রান্তর প্রত্যাগত চাষী কৃষকের পরুষ গলায় শুনা যায়, তেমনই অনেক স্ত্রীলোকেও ইহা জানেন, কিন্তু প্রকাশ্যে বড় গান না।

আর এক স্বাতন্ত্র্য এই,—উভয়ের কথার ভাষা প্রায় এক হইলেও,—ভাব, কল্পনা এবং বিষয় গুলি গীত কথাতে অধিক পরিস্ফুট এবং ঘটনা বহুল।

স্থূলতঃ, শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগে যে প্রকারের তফাৎ, বিষয় সম্বন্ধে রূপকথা আর গীতকথায় ততখানি পার্থক্য,—বা, আজি কালি উপন্যাস যে শ্রেণীর কাজ করে, বাংলার গীতকথার স্থান সেইখানে ছিল; আর রূপকথা মার আঁচলের সুলভ বাতাসের মত বাংলার গৃহ সহজেই শীতল করিতে পারিত। কিন্তু রূপকথা গীতকথা উভয়ই ক্রমপর্য্যায়ে শিশু বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান আনন্দ বিলাইতে সক্ষম ছিল!

কিন্তু আজ যদি স্পর্দ্ধা করিতে হয়, তাহা করিব। দেখাইব যে, জগতের সমস্ত কথা কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বাংলা এ ক্ষেত্রে উচ্চতর আসনের অধিকারী। এই জিনিষ,—আমাদের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের মূল্যবান অতি প্রধান অঙ্কুরাংশ,—ঠিক এইরূপ অংশ লইয়া পৃথিবীর অন্য দেশের লোক আপনাদের কুটীর হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত ফুলের তোড়ায় সাজাইয়া দেয় আর আমরা অবাক হইয়া তাহাই দেখি বা দুই একটী ঝরা পাপ্‌ড়ী পড়িয়া আছে তাহাই পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করি। জানি না, আমাদের জননী, বধূ এবং সহোদরকে দুইটী কথা শিখাইতে গেলেই আমাদিগকে পরদেশের ধার করা জিনিষ আনিয়া 'কোন্ পাপে' হাতে করিয়া তুলিয়া দিতে হয়!—অথচ, আমাদেরই নির্ম্মল অমৃতের ভাণ্ড আমাদেরই পায়ের কাছে পথের ধূলামাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছে।

শেষ কথা, এই 'উপন্যাসের' বা 'কথা'গুলির ভিত্তি যে নিতান্ত সাধারণ, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে জটিলতার আবর্জ্জনা নাই, ইহাদের মধ্যে অঙ্ক বা পরিচ্ছেদের কৌশলঘটা নাই,—অথচ ইহাদের মধ্যে অসম্ভবও কিছু নাই। এ অসম্ভব সরল অসম্ভব, তৈয়ারী করা অসম্ভব নহে। আমাদের দেশের মেরুমজ্জায় যে অসম্ভবতা বৈদিক কালের দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহা সেইরূপ অসম্ভব।—যেন জাহ্নবীর একটানা স্রোতের মধ্যে যাহা পড়িয়াছে, তাহাই নিরাপত্তিতে সাগরমুখে চলিয়া গিয়াছে! সম্ভব অসম্ভবে মাথামাখি অনায়াস শিল্পকৌশলে ছোট বড় সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া কাহিনীগুলি কোথাও কল্পনার "ডালপত্র মেলিয়া" গগন জুড়িয়া খাড়া হইয়াছে, কোথাও "ফুলবাতাসী পাখায় সাট দিয়া" গগনে উধাও হইয়া যাইতেছে।

কবিপ্লাবিত কাব্যপ্রবণ বাঙ্গালীর সরসতা এতকাল অমৃত বিলাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর নিজস্ব যে ভাষা নিজস্ব যে ভাব তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব কল্পনায় একদিন প্রকৃত উচ্চ উপন্যাসও গড়িয়াছিল। আমরা একটী একটী করিয়া বাংলার এই গীতকথা, যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিতেছি, প্রকাশ করিতে থাকিব!—আর যিনি পারেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে ইহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

পুষ্পমালা।

—ঃ০ঃ—

এক নিঃসন্তান রাজা আর এক আটকুড়ে কোটাল।

এত বড় রাজত্ব কিসে থাকে, কোটালের কোটালগি কে রাখে, রাজার মনেও সুখ নাই, কোটালের মনেও সুখ নাই।

এক দিন, দাসী বাঁদী না নিয়া, সাড়াশব্দ না দিয়া, রাজার রাণী একা রাজপুরীর অষ্ট সরোবরের পুত্রসরোবরে স্নান করিতে গিয়াছেন।

সেইদিন, কোটালের স্ত্রী যে, পুত্রসরোবরের আর এক পারে স্নান করে।

পাথরের সিঁড়ি; পাথরের ধাপে ক্ষার খৈল রাখিয়া, রাণী ডাক দিলেন,—

"কোটালনী দিদি, কোটালনী দিদি
পূর্ণ হ'লে মনের বাসন
কার ঘরে দিদি বাজবে বাজন?"

ওপার হইতে কোটালনী বলিল, "রাণী দিদি! রাণী দিদি! আমরা হলাম ক্ষুদ্র মানুষ, কোটালের কোটালনী;—রাণী-দিদির ঘরে বাদ্য বাজবে।"

শুনিয়া বড়ই খুসী মুসী, রাণী বলিলেন,—"না দিদি, তা'নয়,—আয় আমরা সত্য করি।"

কোটালনী বলিল,—"রাণী দিদি জানিও না, শুনিও না, সত্য কি রাণী-দিদি?"

রাণী বলিলেন,—সত্য এই,—আমার ঘরে ছেলে হয় তোর ঘরে মেয়ে হয় বিয়ে দিব, আমার ঘরে ছেলে হয় তোর ঘরে ছেলে হয় বন্ধু পাতিয়ে দিব, আমার ঘরে মেয়ে হয় তোর ঘরে মেয়ে হয় সই পাতিয়ে দিব, আর যদি আমার ঘরে মেয়ে হয় তোর ঘরে ছেলে হয় তা'হলেও বিয়ে দিব।

শুনিয়া ভয়ে ভয়ে কোটালনী বলিল,—"ওমা মা! রাণী-দিদি, এমন সত্য আমি করিতে পারিব না।"

রাণী বলিলেন,—"দ্যাখ কোটালনী, পুত্রসরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছি, জলের ঢেউ, নামনের ঢেউ, সত্য তোর করিতেই হইবে।"

আর কি করে? কোটালনী বলিল,—"তা রাণী-দিদি, তোমরা দেবতা, কি কর না কর তোমরাই জান; তা সত্য আমি করিলাম।"

রাণী বলিলেন,—"কি সত্য করিলি?"

কোটালনী বলিল,—"তা' যদি কও রাণী-দিদি, তো, আগেও বিয়ে, পাছেও বিয়ে, বিয়ের সত্যই সত্য।"

রাণী বলিলেন—"আচ্ছা, তবে ডুব দে।"

তখন রাণী কোটালিনী, দুইজনে দুই ডুব দিয়া, তিন সত্য শপথ করিয়া, দুই ঘাটের দুই পদ্মফুল ছিঁড়িয়া ভাসাইয়া দিলেন; ঢেউয়ের বাতাস; দুই পদ্ম গিয়া একখানে হইল।

রাণী, কোটালিনী, দুইজনে 'উলু' দিয়া উঠিলেন।

তারপর, মনে আনন্দ, রাণী আর অত ভাবিলেন না, যে, সত্য করিলেন কোটালনীর সঙ্গে, কোটালনীও অত ভাবিল না, যে, সত্য হইল রাণীর সঙ্গে।—রাণী কোটালনী, মনের সুখে স্নান টান করিয়া যে যাহার ঘরে গেলেন।

কেহই আর একথা জানিল না।

(২)

রাজা ছিলেন মৃগয়ায়; রাজার সঙ্গে লোক লস্কর সিপাই শান্ত্রী, আর ছিল সেই আটকুড়ে কোটাল। সারাদিনে একটিও শীকার পাইলেন না। রাজা বলিলেন—দেখ, "এই ব্যাটা কোটালকে সঙ্গে আনিয়াছি, তাই আমার দিন আজ মিছা গেল।"

তাড়াতাড়ি মাথা নামাইয়া দিয়া কোটাল বলিল,—"মহারাজ, তবে আমার গর্দ্দান নিন্।"

খুসী হইয়া রাজা বলিলেন,—"আর সবে থাক, কেবল কোটাল আমার সঙ্গে আইস।"

রাজা কোটালে যান। বনের শেষে একখানে গিয়া রাজা বলিলেন,—"কোটাল, শীকার টিকার ত কিছু পাইলাম না, আইস এইখানে একটু বসি।" গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া এক বটগাছের নীচে দুইজনে বসিলেন।

রাজা বলিলেন,—"দেখ কোটাল, তুমিও যেমন পুত্রের কাঙ্গাল, আমিও তেমনি পুত্রের কাঙ্গাল। কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম কি, আমার ঘরে একটি ছেলে হইয়াছে, তোমার ঘরেও একটি ছেলে হইয়াছে।"

যোড়হাত করিয়া কোটাল বলিল,—"মহারাজ, বলিলেন তো আমিও একটা কথা বলিতে চাই,—কিন্তু মহারাজ যদি নির্ভয় দেন"—

রাজা বলিলেন,—"কেন কোটাল, নির্ভয়ে বল।"

কোটাল বলিল,—"মহারাজ, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, মহারাজের রাজপুরীতে একটি কুমার হইয়াছে, আর আমার কুঁড়েতে একটি মেয়ে হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"দেখ কোটাল মিথ্যা কথা।"

কোটাল বলিল,—"তবে মহারাজ, আমারি ঘরে ছেলে হইয়াছে; আর মহারাজের ঘরে একটী মেয়ে হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"কোটাল! সাবধান! রাজার স্বপ্ন সত্য কি কোটালের স্বপ্ন সত্য?"

কোটাল বলিল,—"মহারাজ, রাজার স্বপ্নই সত্য।"

রাজা বলিলেন,—"না, কোন কথাই ঠিক হইল না, বটের পাতা পাড়, আমি ইহার লেখা পড়া করিব।"

মুখ শুকন, বুক ধড় ধড়, কাঁপিতে কাঁপিতে কোটাল বটের পাতা পাড়িয়া দিল।

তীরের ফলা দিয়া রাজা বটের পাতায় লিখিলেন,—

"যদি কোটাল, তোমার ছেলে হয় আমার মেয়ে হয়, বিবাহ দিব।
যদি তোমার মেয়ে হয় আমার ছেলে হয়, তোমার গর্দ্দান নিব।
যদি তোমার ছেলে হয় আমার ছেলে হয়, অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব।"

তিন সত্য লিখিতেই লোকলস্করের শাঁখে ফুঁ পড়িল, তাড়াতাড়িতে রাজা বটের পাতা কোটালের হাতে দিলেন।

সন্ধ্যারাত্রে রাজার কটক রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল।

(৩)

দিন যায় ক্ষণ যায়, রাজপুরীতে ঢোল বাজিল, দিন যায় মাস যায়, দশ মাস দশদিনে রাণী সোণার নির্ম্মাণ আতুরঘরে গেলেন। পাঁজি পুঁথি সকল নিয়া ঠাকুর পুরুত সব বসিয়া আছেন, কি হইল, কি হইল?———

—ক্ষীরের পুতুল কন্যা!———

মুখখান নীচু করিয়া রাজা রাজসভায় চলিয়া গেলেন।

কোটালের ঘরে 'ট্যাগডুম বাগডুম'।—ঘরের জিনিষ-পাতি বেচিয়া কিনিয়া কোটাল তিন পক্ষ তের দিন ধরিয়া চার দুয়ারে নহবৎ দিল, কাঙ্গাল দুঃখীর ভিখ্ দিল, পাড়াপড়শীকে সওগাদ দিল, পাড়া প্রতিবাসী কোটালের দুয়ারে ভাঙ্গিয়া পড়ে,—না,—খবর রাজারও কাণে গেল রাণীরও কাণে গেল,—

'আটকুড়ে কোটালের আফাটা কপাল,
কুঁড়ের তলে যে সোণার ছাওয়াল।'

রাজার সভার চামর থামিল, আতুর ঘরে রাণীর গা ঘামিল, রাজ-আঙ্গিনায় জগঝম্প বাজে কি না বাজে!

(৪)

মাস যায় বছর যায়, রাজার মনে রাজা, কোটালের মনে কোটাল, রাণীর মতন রাণী, কোটালিনীর মত কোটালিনী, রাজ করে রাজত্ব করে, ঘর করে চার করে, মনের কথা কেউ না বার করে। দিনের সূর্য্য দিন উঠে, বাঁশের পাতা বাতাসে খসে, চা'র মনের চা'র সত্য নিশার নিশুতি টলেও না বলেও না।

দিন যায়, না, বছর যায়, না বোলে না কয়, মনের কথা কি মনে রয়? মন পাথর হইলে কি হয়? সত্যের ছুরি পাথর পায় আর শান কাটে।—দিনে, দিনে; যতনে অযতনে কোটালের ঘরে কোটালের ছেলে রাজার ঘরে পুষ্পমালা, চন্দনের পুতুল ক্ষীরের প্রতিমা পলকে পলকে বাড়ে, ক্ষীর চন্দনে সোণার কিরণ ছাড়ে।

গীত

ওরে, পঞ্চম বয়সে কন্যা, কন্যা পুষ্পমালা,
রাজা, হা রে, দিল পাঠশালেরে!
একহি গুরুর কাছে, হা রে, হা রে, পড়ে দুহুজন,
'কন্যা আর কোটালের ছাবাল রে!

গুরু পড়ান, রাজকন্যা বসেন এক সিংহাসনে, আর কোটালের ছেলে যে, সেই সিংহাসনের নীচে মাটিতে বসিয়া লেখেন।

গীত

আরে, একহি বৃক্ষের দেখ দুহ ডাল ছিল,
উপরে বসিল শারী, শুক নীচ নিল—
কন্যা কোটাল রে!

কে যে কার কোন সত্যে বাঁধা, তা' কিন্তু কেউই জানেন না!

তা', যার কাজ তাঁর কাজ—কাজের কাজী আপ্নি করেন,—একদিন, কন্যা লেখেন উপরে, কোটাল পুত্র লেখেন নীচে,—লিখিতে, পড়িতে, রাজকন্যার হাতের যে কলম, খসিয়া, কোটাল পুত্রের সাম্‌নে মাটীতে পড়িয়া গেল। কোটাল পুত্র চমকিয়া উঠিয়া মাথা তুলিলেন।

কন্যা বলেন,—

গীত

"জ্যৈষ্ঠরে আষাঢ় মাসে ইন্দ্র বর্ষে ধারে,
ছুটিল হাতের কলম, কোটাল, তুলে' দাও
আমারে।"

কিছু না বলিয়া, না কহিয়া থির নয়নে চাহিয়া, আস্তে কোটালপুত্র কলম তুলিয়া দিল।

না, সেইদিন থেকে রাজকন্যার হাতে কলম আর থাকে না! রোজ খসে, রোজ পড়ে। রোজ কোটালপুত্র কলমটি তুলিয়া দেয়।

এই রকমে পাঁচদিন, ছয়দিন, সাতদিন গেল, আট দিনের দিন, কলম পড়ে, কোটালপুত্র আর তুলে না।

কন্যা বলেন,—

গীত

"ওরে, নিতুই যে কলম ছুটে, নয়ন তুলে' চাও,
আজ কেন কোটাল, হা রে, তুলে' নাহি দাও?—
কোটাল রে!"

ভাবিয়া ভুবিয়া, ঢোক ঢাক গিলিয়া, মনে সাহস বুকে আলস, আস্তে কোটালপুত্র বলিল,—"রাজকন্যা, এতদিন তুলিলাম আজ কেন তুলিনা? যদ্দি,—মালা যদি বদল হয়, রাজকন্যা, তো কলম তুলি, না হইলে, রাজকন্যা, আর আমি কলম তুলিব না।"

শুনিয়া কন্যা 'শিউরে' উঠিলেন,—"কি! কোটাল, তা'র মুখে এমন কথা!"

কন্যা বল্লেন,—

গীত

"আমার বাপের মাটীতে, কোটাল, তোর বাপের ঘর,
এ সব কথা শুনিলে, হা রে, গর্দ্দান যাবে তোর—
ক্ষুদ্র কোটাল রে!"

কোটাল-পুত্র বলিল,—"রাজকন্যা, তা ঠিক,—

গীত

তোমার বাপের, মাটীতে, কন্যা, বটে আমার বাপের ঘর,
মাল খাজানা বুঝা'য়ে দিলে, কার বা রাখি ডর?
কন্যা হে!"

কন্যা ভাবিলেন,—"তাই তো!"

এই ভাবিতেই সেদিনকার পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল।

পরের দিন, লেখেন পড়েন, আজ রাজকন্যার কলম তো ছুটিল না, আজ যে, কলমের মুখে কালী ঝপ্ ঝপ্, নাড়িতে, কাড়িতে, কোটালপুত্রের কলম ছুটিয়া গিয়া রাজকন্যার গায়ে পড়িল। চমকিয়া কোটালপুত্র বলিল,—"কি করিলাম!"

কালীমুখ হইয়া রাজকন্যা গালে হাত দিয়া বসিলেন।

কোটালপুত্র বলিলেন,—"রাজকন্যা, যা' হইবার তা' তো হইয়াছে,—

গীত

"ওরে তুমি আমি লিখি পড়ি হে, একই গুরুর কাছে,
কেমনে ছুটিল কলম, দাও কন্যা মোর হাতে—
গো রাজকন্যা!"

মুখ ফিরাইয়া কন্যা বলিলেন,—

"লিখুক পড়ুক কোটালের ছা,
তা'র মুখে কেন বড় রা?"

রাজকন্যা বাঁ হাত দিয়া কলমটা মাটীতে ফেলিয়া দিলেন।

হাসিয়া কোটালপুত্র বলিল,—

গীত

ওরে, পঞ্চম বয়সে কন্যা, কন্যা পুষ্পমালা,
রাজা, হা রে, দিল পাঠশালেরে!
একহি গুরুর কাছে, হা রে, হা রে, পড়ে দুহুজন,
কন্যা আর কোটালের ছাবাল রে!

গুরু পড়ান, রাজকন্যা বসেন এক সিংহাসনে, আর কোটালের ছেলে যে, সেই সিংহাসনের নীচে মাটিতে বসিয়া লেখেন।

গীত

আরে, একহি বৃক্ষের দেখ দুহ ডাল ছিল,
উপরে বসিল শারী, শুক নীচ নিল—
কন্যা কোটাল রে!

কে যে কার কোন সত্যে বাঁধা, তা' কিন্তু কেউই জানেন না!

তা', যার কাজ তাঁর কাজ—কাজের কাজী আপ্‌নি করেন,—একদিন, কন্যা লেখেন উপরে, কোটাল পুত্র লেখেন নীচে,—লিখিতে, পড়িতে, রাজকন্যার হাতের যে কলম, খসিয়া, কোটাল পুত্রের সামনে মাটীতে পড়িয়া গেল। কোটাল পুত্র চমকিয়া উঠিয়া মাথা তুলিলেন।

কন্যা বলেন,—

গীত

"জ্যৈষ্ঠরে আষাঢ় মাসে ইন্দ্র বর্ষে ধারে,
ছুটিল হাতের কলম, কোটাল, তুলে' দাও
আমারে।"

কিছু না বলিয়া, না কহিয়া থির নয়নে চাহিয়া, আস্তে কোটালপুত্র কলম তুলিয়া দিল।

না, সেইদিন থেকে রাজকন্যার হাতে কলম আর থাকে না! রোজ খসে, রোজ পড়ে। রোজ কোটালপুত্র কলমটি তুলিয়া দেয়।

এই রকমে পাঁচদিন, ছয়দিন, সাতদিন গেল, আট দিনের দিন, কলম পড়ে, কোটাল-পুত্র আর তুলে না।

কন্যা বলেন,—

গীত

"ওরে, নিতুই যে কলম ছুটে, নয়ন তুলে' চাও,
আজ কেন কোটাল, হা রে, তুলে' নাহি দাও?—
কোটাল রে!"

ভাবিয়া ভুবিয়া, ঢোক ঢাক গিলিয়া, মনে সাহস বুকে আলস, আস্তে কোটালপুত্র বলিল,—"রাজকন্যা, এতদিন তুলিলাম আজ কেন তুলিনা? যদি,—মালা যদি বদল হয়, রাজকন্যা, তো কলম তুলি, না হইলে, রাজকন্যা, আর আমি কলম তুলিব না।"

শুনিয়া কন্যা 'শিউরে' উঠিলেন,—"কি! কোটাল, তা'র মুখে এমন কথা!"

কন্যা বল্লেন,—

গীত

"আমার বাপের মাটীতে, কোটাল, তোর বাপের ঘর,
এ সব কথা শুনিলে, হা রে, গর্দ্দান যাবে তোর—
ক্ষুদ্র কোটাল রে!"

কোটাল-পুত্র বলিল,—"রাজকন্যা, তা ঠিক,—

গীত

তোমার বাপের, মাটীতে, কন্যা, বটে আমার বাপের ঘর,
মাল খাজানা বুঝা'য়ে দিলে, কার বা রাখি ডর?
কন্যা হে!"

কন্যা ভাবিলেন,—"তাই তো!"

এই ভাবিতেই সেদিনকার পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল।

পরের দিন, লেখেন পড়েন, আজ রাজকন্যার কলম তো ছুটিল না, আজ যে, কলমের মুখে কালী ঝপ্ ঝপ্, নাড়িতে, কাড়িতে, কোটালপুত্রের কলম ছুটিয়া গিয়া রাজকন্যার গায়ে পড়িল। চমকিয়া কোটালপুত্র বলিল,—"কি করিলাম!"

কালীমুখ হইয়া রাজকন্যা গালে হাত দিয়া বসিলেন।

কোটালপুত্র বলিলেন,—"রাজকন্যা, যা' হইবার তা' তো হইয়াছে,—

গীত

"ওরে তুমি আমি লিখি পড়ি হে, একই গুরুর কাছে,
কেমনে ছুটিল কলম, দাও কন্যা মোর হাতে—
গো রাজকন্যা!"

মুখ ফিরাইয়া কন্যা বলিলেন,—

"লিখুক পড়ুক কোটালের ছা,
তা'র মুখে কেন বড় রা?"

রাজকন্যা বাঁ হাত দিয়া কলমটা মাটীতে ফেলিয়া দিলেন।

হাসিয়া কোটালপুত্র বলিল,—

গীত

"তুমি আমি লিখি পড়ি, কন্যা, একই গুরুর ঠাঁই,
সে সম্বন্ধে কন্যা গো, আমরা, ধর্ম্মের সোদর ভাই!—
রাজকন্যা!

কন্যা, গাল দিলে, না আপনার গায়েই নিলে। তা' যা'ক্, কন্যা, ডান হাত বাঁ হাত দুই হাতেই তোমার হাত;—তোমার কলম আমি মাটী থেকে তুলিয়া দিয়াছি, তুমিও আমার কলম মাটীতেই ফেলিয়া দিয়াছ,—মাটী যদি মাটী হয়, ফুল যদি মাটীতেই ফোটে, তবে কন্যা, তোমার কথা—আমার কথা,—সূর্য্যও আছে চন্দ্রও আছে,—দিন হইলেও হইতে পারে, রাত হইলেও হইতে পারে।"

পুঁথি পত্র ফেলিয়া, কেবল কলমটি তুলিয়া নিয়া কোটালপুত্র বাড়ী গেল।

চাহিয়া রাজকন্যা দেখেন, তাই তো! দিন দুপুর বহিয়া গিয়াছে, পাঠের মত পাঠ পড়িয়া আছে, সরোবরের পাড়ে ক্ষার গামছা নিয়া দাসী বাঁদী সারির উপর সারি দিয়াছে, দেরী দেখিয়া মা জননী আপ্‌নি রাণী আসিয়া ঘাটলার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন।

রাজকন্যা, আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া পুঁথি পাটা মিলাইয়া গুরুর পায়ে বিদায় নিলেন।

(৫)

রাণী দেখেন, সেই ও পারের ঘাটে যে, কোটালিনী নায়, সর্ব্বাঙ্গ বসন থর থর, এলো চুলে জলের ধারা ঝর ঝর কোটালিনী কাঁদে,—

কাঁদে,—

গীত

"কোন্‌বা সত্যের সরোবর রে, কোন্‌বা সত্যেরি ফুল,
কোনবা সুখে ফোটরে পদ্ম, কিসে বা রাখ কূল—
রে সরোবর!
আকাশের নক্ষত্র তারা, হা রে কেনবা বুকে কর,
রাত পোহাতে নিবাওরে বাতি, হায়রে, কালী বুকেধর—
রে সরোবর!
দিনের সাথে দিন পোহায় রে, রাতে পোহায় রাত,
যা'র সত্য তারি সত্য থাকেরে হাজার চন্দ্রপাত—
রে সরোবর!"

ডাকিয়া রাণী বলিলেন, "কোটালনি! বড় যে গলা করিস্! যাতো দাসী, যাতো বাঁদী, কোটালনীর কোটালনী সেই মাগীর এত ধার! সাত পুরুষের পুত্রসরোবরে চখের জলের অমঙ্গল!! দে, দে, কোটালনীকে পঁয়জার দে' ঘাটের পথে ছড়া দে।"

চক্ষের জল ছাড়িয়া কোটালিনী বলিল,—

গীত

"ক'য়োনা কয়োনা রাণীগো দিদি,
দিদি, ভাল তোমার সত্য হইবে শেষ,
রাণীর ঝিয়ের সাথে গো কবে, আমার,
হায়রে, কোটাল-বাছার বেশ—
ভাল, রাণীগো!
তোমার আমার সত্য গো দিদি, সত্য, পূর্ণ হইল আজ,
যে ছিল সত্যের সাক্ষীগো,—সাক্ষী, করলে, আপন কাজের কাজি,
দিদি, মার আর কাট!"

দাসী বাঁদী যাইতে না যাইতে রাজকন্যা হাতের পুঁথি পথে ফেলিয়া খাড়া হইলেন,—"আই-মা, ধাই-মা, কোটাল মাগীর কিসের সত্য?"

—ছুটিয়া আসিয়া রাণী বলিলেন, "ও পুষ্প মা লক্ষ্মী, রাজকন্যা রাজলক্ষ্মী, ছার কোটালের ছার কথা তুই কেন কানে নিস? ক্ষার খৈল না দিলি, উজান বেলা না নাইলি,—আয়লো আমরা ঘরে যাই।" কন্যা নিয়া, বাঁদী দাসী নিয়া, রাজার রাণী পুরে গেলেন; অবাক হইয়া কোটালনী ভিজা কাপড় খোলা চুল ঘাটের পথে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

(৬)

কোটাল পুত্র যে বাড়ী গিয়াছে?—গিয়া সেই কলমখানা, এ কোণে রাখে, ও কোণে রাখে,—কে দেখিবে কেবা নিবে, নয়তো বা ফেলিয়াই দিবে, কলমখানা রাখিতে কোটালপুত্র ঘরময় করিল। করিতেই কোটালের বিছানার নীচে দেখে, শুকন মুকন এক বটপাতা।

"বটপাতা দিয়া বাবা কি করে?" দেখে, আঁচড় কাটা মাকড় আঁকা হয় ষষ্ঠীর বিধির লেখা!—না, দেখিতে দেখিতে পড়িয়া দেখে কি,—

যদি কোটাল, তোমার ছেলে হয় আমার মেয়ে হয়,
বিবাহ দিব।
যদি তোমার মেয়ে হয় আমার ছেলে হয়,
তোমার গর্দ্দান নিব।
যদি তোমার ছেলে হয় আমার ছেলে হয়,
অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব।"

নীচে দেখে, রাজার নাম!—হাতের কলম দাঁতে, বটের পাতা নিয়া কোটাল পুত্র লেট-খাইয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময়, কোটাল যে, রাজার চৌকির দুইপহরা বুঝ দিয়া, ঘরে আসে।

কাজ করে কর্ম্ম করে কোটালের মনে দিন রাত উকুধুকু জাগে,—"হা! রাজার রাজা-মহারাজ, তাঁরি কথা 'অনয়' হইল! আজের না কালের না—ছেলে যখন মায়ের উদরে মেয়ে

যখন মায়ের উদরে তখনকার সত্য।—আজ এখনও বিয়ে আসে তখনও বিয়ে আসে, কবে না জানি টুক করিয়া রাজার কন্যার বিয়ে হইয়া যায়। রাজার চার চাকলা চৌষট্টি বাঁধ সোণার রাজত্ব, সত্য যদি ভাঙ্গে, তবে কি ভর সইবে?"—হাটন পথে চোখ নাই, দেখন চোখে দৃষ্টি নাই, ঘরে আসিতে কোটালের মাথায় ঘরের চৌকাটখান ঠক্ করিয়া ঠেকিয়া গেল।

—দুর্গা, রামঃ!"

চমকিয়া কোটাল পুত্র উঠিয়া বলে,—"বাবা, কি করিব, আঁকের আখর চোকে ঠেকে, আমি যে, পড়িয়া ফেলিয়াছি!"

কোটাল দেখে,—'তাই তো!—'

গীত।

"ও হায়, যে ধনের ধন ছিপায়ে রাখিলাম,
ওরে সেই হইল প্রকাশরে!
ওরে, আমার, পাথরের পাচিল ভেঙ্গে' গজাইল ঘাস,—
আমি ঢাকিয়া কি করি রে!"

কোটাল বলিল,—"যাক্; পুত্র, হাতে যখন তোমার পড়িয়াছে, সত্য যখন তুমি পড়িয়াছ, তখন সত্য আর আমি ঢাকিবনা; কথা যে, এই।" বলিয়া কোটাল বলিল,—"এখন পুত্র, তোমার কপাল তুমি জান।"

কোটাল পুত্র আর কিছু বলিল না। সাজ পরিলনা, তাজ পরিলনা, হাতে এক তরোয়াল, বটপাতা খান নিয়া রাজার সভায় চলিল।

মা যে ছিল সেই সরোবরের পাড়ে,—কোটাল পুত্র দেখে, চলেনা বলেনা, মা কেন উন্মনা? বলে,—"ভিজা কাপড় ভিজা চুল মায়ের আমার পথ ভুল!"—কোটাল-পুত্র "মা" বলিয়া ডাক দিল।

মা চাহিয়া দেখেন, পুত্র।—

গীত।

"ওরে, কোথায় ছিলি পরাণ মণিরে,
হারে বাছা, ভাঙ্গনে সুখেরি বাসা,
ওরে রাণী যে ভাঙ্গে রাণীর সত্য, হায়,
বাপধন!"

কোটাল পুত্র বলিল,—"মা, তবে রাণীও, মা সত্যে বাঁধা! তা রাণীর সত্য রাণী ভাঙ্গিয়াছেন? আচ্ছা মা, দেখি রাজার সত্য রাজা রাখেন কিনা। মা তুমি যাও, আমি বটপাতার লিখন যে, রাজার দুয়ারে হাজির দিব।"

মা বলিল,—

গীত।

"হায় রে বাছা, সতীর সত্য সতী না রাখে,
ওরে, রাজা কি বা ছার,
না রাখিলে সত্যেরে রাজা, বাছা, দোষ দিবে কার?—
হা রে অভাগীর পুত!"

পুত্র বলিল,—"মা তুমি কেঁদনা, সে চিন্তা আমার। তুমি পায়ের ধুলা রাখিয়া ঘরে যাও।

পায়ের ধুলা নিয়া কোটালপুত্র রাজসভায় গেল, কোটালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গেল।

(৭)

গীত।

রাজার সভায় রাজদুয়ারী
দুয়ায় নাহি ছাড়ে,
"তিন সত্য, তিন সত্য!" বলি' কোটাল ডাকপাড়ে—
"মহারাজ!"

রাজা বলেন, "দেখতো কে?" "বাচ্চা কোটাল।"

"বাচ্চা কোটালের রাজ সভায় কি?"

বাহির হইতে কোটাল পুত্র বলিল,—

"দোহাই মহারাজ একটা কথা—
নড়ে চড়ে বটের পাতা,
মহারাজের কয়টি মাথা?"

সিংহাসনে রাজা চমকিয়া উঠিলেন। রাজার মনে 'জান' দিল, রাজা বলিলেন,—"কোটাল পুত্রকে সভায় আন?"

তরোয়াল খানা তিনহাত মাটীর নীচে থুইয়া, হাতের উপর বটপাতাখান মেলিয়া কোটাল পুত্র উচুমাথা বুকটান, বলিল,—

দোহাই মহারাজ,—মাথাতো একটী;—
কোনটী বা বিকাবেন কোনটী বা কিনিবেন?"

নরম হইয়া রাজা বলিলেন,—

"কোটাল পুত্র, বুঝিলাম, বিকাবওনা, কিনিবওনা; তোমার পাতা তোমার হাতে,—মান রাখিয়া যদি কাজ পার, যোগ্যতা যদি থাকে কিনিতে পারিলে কিনিও বিকাইতে পারিলে বিকাইও।

রাজার ভুল না রাজ্যের ভুল
কাল সায়রের পদ্মফুল,
ডাঁটা আছে পাতা আছে, ঘিরবন্ধী কাঁটা আছে,
'অথৈ' পাথার জল আছে,—
যে পারে সে পারে, যে না পারে সে ডুবে মরে।"

কোটাল পুত্র বলিল,—"দোহাই মহারাজ! দাঁতে কুটা, মাথে তৃণ নফরের নফর; দোষ হইলেও আপনার গুণ হইলেও আপনার,—আমি যে, চলিলাম।"

তরোয়াল খান তুলিয়া নিয়া কোটাল পুত্র রাজসভা ছাড়িল।

রাজ সভা ছাড়িয়া কোটাল পুত্র সন্ সন্ সরোবরের জলে গিয়া নামিল, নামিয়া, তখনি তিন খান পদ্মের পাত তিনটী পদ্মফুল সত্যের বটপাতা খানা আর আপন হাতের তরোয়াল একখানে করিয়া, মাথায় নিয়া, সরোবরের জলে সাঁতার দিল।

সরোবরে ভোমরার ঝাঁক উড়িয়া বসে, পদ্মের পাতা পাতায় পাতায় ইসারা ডাকে, পদ্মের ফুল হাসিয়া পড়ে, আর সরোবরের জল? ঢেউয়ে ভাঙ্গে বাতাসে করে খল্ খল্ ছল্ ছল্।

খানিকক্ষণ পর, যেমন জল তেমন জল—টল্ টল্।

(৮)

রাজকন্যা 'যে, নান্ নাই, খান নাই, ঘরে গিয়া কবাটে খিল দিয়াছেন দাসী বাঁদী দুয়ারে, আপনি রাণী চুল ছিঁড়েন ও রাজকন্যা শেষ মাথার বেণী উল্টাইয়া, পাল্টাইয়া, মাটীতে আসিয়া শুইলেন। না, মাটী বড় শক্ত, মাটী বড় তপ্ত, পিছল দুয়ার খুলিয়া রাজকন্যা উদলমাথা উদল গা জলের তলে দুখান পা, সরোবরের ঘাটে গিয়া বসিলেন।

গীত।

"কহ শুক কহ শারী, কহরে সায়রের বারি,
কিবা সত্য করিল আমার মায়,—
বুকের কলিজা কাটি' সত্য আমি দিব খাটি'
না জানি কি কঠিন সত্য, মায়ের প্রাণ যায়—
রে সরোবর!"

সেই সময় যে, এক তুফান এল, চার পাড়ের গাছ লুটে' পড়ে, পদ্মের ফুল ছুটে' পড়ে, পাতার কুটায় অন্ধকার, রাজকন্যা বসিবেন কি উঠিবেন, ঝড়ের বাতাসে পায়ের উপর এ কি? চমকিয়া রাজকন্যা দেখেন, পদ্মের পাতে এক তরোয়াল, তিন পদ্ম।

রাজকন্যা ভাবিলেন, 'তাইতো! তরোয়াল যখন জলে ভাসে, এতক্ষণে তবে মায়ের সত্য বুঝিলাম,—মা'র প্রথম সন্তান পুত্রসরোবরে সঁপে দিয়াছেন।' রাজকন্যা বলিলেন,—"তবে আর কেন?—মা তুমি মা থাক, কন্যা আমি কন্যা থাকি,—সরোবরের সত্যই পূর্ণ হউক্।

গীত।

"হায়রে দেখ, তরোয়াল নিয়া কন্যা,
হা রে কন্যা কোমল বাহু তুলে,
সত্যের পাতা হাতে ক'রে হা রে, হাত ধরিল কোটালে—
রে কন্যার!"

"ওমা—মা!!" বলিয়া রাজকন্যা মূর্চ্ছা খাইয়া পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন।

আস্তে, কোটাল, তিন ফুল পদ্মের পাতা রাজকন্যার শিয়রের বালিশ দিয়া দিল; দিয়া, দেখি না দেখি তাড়াতাড়ি সত্যের বটপাতা রাজকন্যার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া, কোটালপুত্র চক্ষের মটক ফেলিতে না ফেলিতে ঝড়ের আগে মিশিয়া গেল।

দাসী ছুটে, বাঁদী ছুটে, পাইক পাহারা দুয়ারী ছুটে, রাণী রাজা আপ্‌নি ছুটেন,—"কি হইল! কি হইল।

'—একি সর্ব্বনাশ!—'

গীত।

'ওরে পুষ্প যে শিয়রে পুষ্প কম্‌নে এল ঘাটে!'—
বুকের কাঁদন মুখে এসে' চোকে রক্ত ফাটে—
'হায় কন্যা কিসে মূর্চ্ছা যায়!'

তখন, সাড়্ সোর্ চুপ চাপ্; রাজকন্যাকে নিয়া, রাজা রাণী, জন পরিজন বার দুয়ারের কবাট দিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মজুমদার।

প্রশ্রয়।

দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয়,
হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছ প্রশ্রয়!
ফিরেছি আপনমনে আলসে লালসে
বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
নানা পথে, নানা ব্যর্থ কাজে,—তুমি তবু
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর, প্রভু,
আজ তাহা জানি! যে অলস চিন্তালতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা
হৃদয়ে বেষ্টিয়াছিল, তারি শাখাজালে
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে,
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুধা
গোপনে সিঞ্চন করি। দিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
দিয়ে দণ্ড পুরস্কার, সুখ দুঃখ ভয়
নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছ প্রশ্রয়।

২৩শে ফাল্গুন, ১৩০৭ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আহ্বান।

রাগিণী ভৈরবী—ঝাপতাল।

এস দয়া, গলে যাক্ পাষাণ হৃদয়।
এস পুণ্য, হোক্ প্রাণ পবিত্রতাময়।
এস মৈত্রী, খুলে দাও মনের দুয়ার,
নরনারী সকলেরে করি আপনার।
এস ভক্তি, উর্দ্ধপানে টেনে লও মন,
এস প্রীতি, ছিন্ন হোক্ স্বার্থের বন্ধন,
এস শুভবুদ্ধি, তব উদার আলোকে
চলি সংসারের পথে সুখে দুঃখে শোকে।
বিরজ অচলা শান্তি হৃদয়ের মাঝে,
ছয় রিপু তোমা হেরি দূরে যাক্ লাজে,
সর্ব্বোপরি তুমি দেব আসি দেখা দাও,
নববর্ষে নবশক্তি জীবনে জাগাও।

শ্রীইন্দিরা দেবী—

কলিকাতা—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

মাসিক পত্রের ত্রুটি।

বঙ্কিম বাবুর পরিচালিত বঙ্গদর্শনের পরে বাংলা মাসিক পত্র আর পাঠকগণের তেমন আগ্রহের সামগ্রী হইতে পারে নাই। আমরা শুনিয়াছি বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনের জন্য গ্রাহকগণ পোষ্টাফিসে যাইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন; যে তারিখে বঙ্গদর্শন বাহির হইবে কথা থাকিত, অনেক উৎসুক পাঠকের তৎপূর্ব্ব রাত্রে সুনিদ্রা হইত না। এই অপূর্ব্ব আগ্রহ এখন কোন বাংলা মাসিক পত্রিকা পাঠে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? বঙ্কিম বাবুর স্থলে আমরা রবীন্দ্র বাবুকে পাইয়াছি, সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহে নাই; তখন চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিক নক্ষত্রগণ যেরূপ সমুদ্দিত ছিলেন এখনও রবিচক্র বেষ্টন করিয়া তদ্রূপ প্রভাময় সাহিত্যিক তারাগণের গতি-বিধির অভাব দেখা যায় না। তথাপি মাসিক পত্রিকা গুলি হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে কেন? সম্পাদকগণ গ্রাহক লাভের চেষ্টায় চেষ্টিত, গ্রাহকগণ যেন আপনা হইতে ধরা দিতে চাহেন না। চিরকালই ভাল জিনিষের জন্য খরিদ্দারকে বাজার যাইতে হয়,—মাসিক-পত্রিকার গ্রাহকগণ সেরূপ আপনা হইতে আর পত্রিকা খুঁজিতে আসেন না। অনেক প্রকার বৃথা আড়ম্বর পূর্ণ বিজ্ঞাপন জাহির করিয়া তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

এই জলন্ত উৎসাহ এরূপ শীতল হইয়া গেল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে বঙ্গদর্শন এক সময়ে কি দিতে পারিয়াছিল যাহাতে গ্রাহকগণ এরূপ আকৃষ্ট হইতেন এবং এখনকার পত্রিকা গুলি কি দিতেছে না।

বঙ্গদর্শন যখন প্রথম প্রচারিত হয়, এদেশের লোকের দৃষ্টি বিদেশের দিকে ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় সহসা এক দিন বুঝিলেন রেবেকার মত প্রণয়িনীর চিত্র বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায়, ওয়েভারলী নভেলে যেরূপ বিচিত্র বীরত্ব ও ভালবাসার লীলা, তাহা বঙ্কিম বাবু বাংলা ভাষায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতেছেন, তখন তাঁহারা বঙ্কিমকে, বাংলার সার ওয়াল্টার স্কট উপাধি দিয়া বঙ্গদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমের পূর্ব্বে গ্রন্থ সমালোচনা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে নূতন ভাবে গ্রন্থ সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। টেইল, ড্রাইডেন, ম্যাথু আরনল্ড প্রভৃতি পাঠের ফল বাংলা ভাষায় অনায়াসে লব্ধ হইল। আর প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে যখন শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের আধুনিক রীতিসঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৃষ্ণা মিটিবার মতন

কোন সামগ্রীরই একত্রে অভাব রহিল না। এদিকে বঙ্গদর্শনের এক প্রান্তে নবীন চন্দ্র বাংলার বাইরণ বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইলেন, অপর দিকে হেমচন্দ্র ড্রাইডেনের মত কবিতার উদ্দীপনা আনয়ন করিলেন। এতগুলি কারণে বাংলা মাসিক পত্রিকা নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষুর তারার ন্যায় প্রিয় হইল।

এক কথায় বিদেশী ভাবাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় যে নেশায় বিভোর ছিলেন, বঙ্কিম বাবু তাহারই পান পাত্র বঙ্গদর্শনে তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে এত ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন।

তার পর নেশা ছুটিয়া যাইবার যুগ। তখনও বিলাতী ভাবে মস্তিষ্ক বিচলিত, কিন্তু আমাদের দেশেও যে অনেক ভাল জিনিষ আছে—এই তত্ত্বের ইঙ্গিত মাথায় প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই ইঙ্গিত এরূপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় নাই, যে বিলাতী নকল ছাড়িয়া আমরা তখনও আসল ধরিতে পারি। এই যুগে আগ্রহ অনেকটা কমিয়া যায় এবং যাহা হৃদয় চাহে তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত পুরাতনটাই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়।

আমাদিগের মাসিক পত্রিকাগুলি এখন সেই মধ্যযুগের এক সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইংরেজী ধরণে গল্প, বেদান্ত ব্যাখ্যা, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি বিষয় সকল লইয়া সেই বঙ্গদর্শনের প্রাচীন আদর্শ হইতে এখনকার মাসিক পত্রিকাগুলি এক পাও আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, সুতরাং বঙ্গদর্শনের সময়ে যে পূর্ব্বরাগ ছিল এখন পাঠকচিত্তে তাহা সম্পূর্ণরূপে জুড়াইয়া গিয়াছে। সে আগ্রহ নাই, শুধু গতানুমতিক্রমে পূর্ব্ব রসের জের চলিতেছে মাত্র।

কিন্তু এখন জাতীয় তৃষ্ণা নবভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। আর ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের সম্বন্ধসূচক কবিতা, কিংবা দুই পত্র পুস্তক সমালোচনা, বা সমাজ-সম্বন্ধে দায়িত্বহীন মস্তিষ্ক-উদ্ভাবিত প্রবন্ধের পণ্ড-শ্রম প্রভৃতি রূপ চেষ্টায় মাসিক-পত্রিকাগুলি সজীব থাকিতে পারিবে না।

এখন বাংলায় স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এই অনুরাগের প্রথম লক্ষণ স্বদেশের সঙ্গে প্রকৃত ও প্রাণের পরিচয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা; এই আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালী জাতি হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। এখন যদি কোন মাসিক পত্রিকা এই তৃষ্ণা নিবারণের সহায় হয়, তবে তাহা দেশের প্রকৃত সেবা করিবে এবং সেই সঙ্গে নিজেও অশেষরূপে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

আমরা জানি এই মুহূর্ত্তে বঙ্গদেশে ৪৮ জন অবতার এখনও বিদ্যমান। শিক্ষিত-সম্প্রদায় এখন তাঁহাদের কোন সন্ধানই রাখেন না, কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্গীয় পল্লীগুলির উপর তাহাদের প্রভাব অল্প নহে। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অল্পকাল হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, যথা যশোহরের পাগলা কানাই। ইহাঁদের অধিকাংশ নিরক্ষর, কিন্তু কাহারও শিষ্য-সংখ্যা ৪ হাজার, কাহারও শিষ্য-সংখ্যা ১০ হাজার। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া স্বীকৃত, যথা ফরিদপুরের জগদ্বন্ধু। ইহাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এই ধর্ম্মশিক্ষকগণের প্রভাব বিস্তারিত রহিয়াছে, ইহাঁদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম-মতেরই কোন না কোন বিশেষত্ব আছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ব্যক্তিদিগের নাম ধাম কিছুই জানেন না, অথচ 'আমরাই দেশের প্রতিনিধি' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন। অবতার কিংবা ঈশ্বর-চিহ্নিত ব্যক্তি বলিয়া যাঁহারা পূজা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের বিবরণ সংগ্রহ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

বাংলা দেশের বহু পল্লীতে ঐতিহাসিক ঘটনার নানা চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এদেশ সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন, ইহার পদধূলিরেণুতে কত সাধু, কত ধর্ম্ম-বীর, কত যোদ্ধা, কত কবি ও কত রাজ-চক্রবর্ত্তীর কীর্ত্তি-চিহ্ন বিজড়িত রহিয়াছে। রংপুরে প্রাচীন কোন রাজার বাড়ীতে লৌহ পরিষ্কার করিবার যন্ত্রাদি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ দেশের বহুস্থানে বৌদ্ধস্তূপ বিদ্যমান। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী সাভারে হরিশ্চন্দ্র পালের বাড়ী, ত্রিপুরার উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরগণের অসংখ্য কীর্ত্তি, রামপালের সেন রাজগণের প্রাসাদ চিহ্ন, রংপুরের নিকট বিস্তৃত বৌদ্ধ-বিহারের বিলয়োন্মুখ নিদর্শন ও পালরাজগণের নানা কীর্ত্তি-চিহ্ন, এখনও এরূপ শত শত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই দেশের মৃত্তিকায় গচ্ছিত আছে। প্রাচীন দেবমন্দির, পুষ্করিণী ও বৌদ্ধস্তূপ ত প্রায় পল্লীতে পল্লীতেই আছে। সরকার বাহাদুর কিছু চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং সেই চেষ্টায় অতি সামান্য তত্ত্বের উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কে উহাদের সন্ধান লয়?

বঙ্গদেশে অনেকগুলি মেলা প্রতিষ্ঠিত আছে। বৎসর বৎসর ঐ সকল মেলা উপলক্ষে সহস্র সহস্র নর নারী একত্র হইয়া থাকে; এই মেলাগুলি কতকালের প্রাচীন এবং অপূর্ব্ব ত্যাগ-কথা বা ধর্ম্ম-কাহিনীর ভিত্তিতে উহাদের প্রতিষ্ঠা, তাহা কি জানিবার কোনই উপায় নাই? যত্ন ও চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নহে, আমার বিশ্বাস সন্ধান করিলে অনেক অজ্ঞাত তত্ত্বের আবিষ্কার হইবে।

বঙ্গদেশ এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ও হস্তীদন্তের কারুকার্য্য মণ্ডিত দ্রব্যাদি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিচিত্র আভরণ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করত; সেই সকল শিল্পের কেন্দ্রস্থল কোথায় কোথায় ছিল এবং কোন্ ধনশালী ব্যক্তিগণের উৎসাহে ঐ সকল শিল্পের বিকাশ হইয়াছিল, সেই বিকাশ কিরূপ উৎকর্ষে পরিণত হইয়াছিল—ইহাও আমাদের জানিবার বিষয়। ঢাকার মস্লিন্ ও স্বর্ণরৌপ্যের কারুকার্য্য, শ্রীহট্ট ও সাঁচারের শীতল পাটী, কৃষ্ণনগরের পুতুল, এমন কি, অতি সামান্য বস্তু জয়নগরের খৈচুর—ইহাদের প্রত্যেক সামগ্রীর এক একটা ইতিহাস আছে, অন্য দেশে সেই ইতিহাস ঘরে ঘরে সকলে জানিত। আমরা তৎসম্বন্ধে সাহেবদের রিপোর্টের উপর ভরসা করিয়া আছি।

ইহা ছাড়া বাঙ্গালায় এমন পল্লী নাই, যেখানে প্রাচীন কালে কোন পল্লী কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের বিবরণও আমাদের সংগ্রহ করিবার বিষয়।

এখনও পল্লীর কর্ম্মঠ শিল্পীর হস্ত একবারে নিরুদ্যম হয় নাই, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া আসিলে এখনও পল্লী-শিল্পীর অসামান্য কৃতিত্বের চিহ্ন পাওয়া যাইবে; এখনও বাঙ্গালীর চেষ্টা-প্রসূত বিস্ময়কর কোন প্রাচীন শিল্পের বিলয়োন্মুখ নিদর্শন তত্ত্বান্বেষী পর্য্যটকের চক্ষু আকৃষ্ট করিবে।

মহোৎসব, কীর্ত্তন, কথকথা প্রভৃতি ব্যাপার এখনও বঙ্গদেশের আদরের সামগ্রী। একশত লোক সুখে স্বচ্ছন্দে এক পরিবারে আছে, এমন দৃশ্য বাংলায় এখনও বিরল নহে। সেই প্রাচীন আদর্শ যে ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা উপেক্ষার যোগ্য নহে। বহুসংখ্যক লোক স্বীয় স্বার্থ কুণ্ঠিত করিয়া যে অসামান্য সাম্য ও প্রীতিসূত্রে গ্রথিত হয়, তাঁহাতে মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ না হইয়া যায় না; এইরূপ পরিবারের ইতিহাস সুখপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ, ইহাতে প্রাচীন আদর্শকে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করে। আর আমাদিগের প্রাচীন মহিলাগণ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কঠোর আত্মত্যাগ ও অপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রেমের নিদর্শন দেখাইয়া চিতার অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রেমের শক্তির নিকট যে মৃত্যুর শক্তি অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য, প্রতি রোমকূপে দগ্ধ হইয়া তাঁহারা শ্মশানের অগ্নির অক্ষরে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই চিতাভস্মের পুণ্য আমাদিগের রক্তস্রোতে বহিতেছে, প্রেম ও পবিত্রতার যে উচ্চ আদর্শ তাঁহারা দেখাইয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। অন্য দেশে ব্যক্তিগত মতের জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ মার্টার; কত ইতিহাস, কত কাব্য তাঁহাদের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। আর এই আজন্মব্যাপী সাধনা ও প্রেমের নিকট, পবিত্রতার নিকট জীবন-উৎসর্গ, তাহাতে একটি কথা নাই, স্পর্দ্ধা নাই, প্রেমের অপূর্ব্ব প্রভাবে দৈহিক বেদনা-বোধের সম্পূর্ণ লয়, এই প্রচার শূন্য, আত্মাভিমানশূন্য আত্মোৎসর্গ,—ইহাকে পাদ্রীদের সঙ্গে সুর মিশাইয়া আমরা কত বিদ্রূপ করিয়াছি, এখন কি সময় হয় নাই যে আমাদের সতীদের একটা ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করি? হে সাধ্বী-মাতার সন্তান ভারতবাসী! তোমাদের মাতৃ-মহিমা প্রচার করিতে শিখ, তোমাদের স্বীয় মহিমা বর্দ্ধিত হইবে, তাঁহাদের পুণ্যে তোমরা মৃত্যুকে জয় করিতে শিখিবে।

ফটোগ্রাফের ক্যামেরা হস্তে লইয়া মাসিক পত্রিকার পক্ষ হইতে কোন শিক্ষিত যুবক বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করুন; তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, প্রেমের সহিত বাংলার প্রতি পল্লী, প্রতি অরণ্য, প্রতি দেবালয় দর্শন করুন, পল্লীবাসী কৃষককে ভ্রাতার মত আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিকট হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করুন। কোন উপাদান যতই কেন সামান্য হউক না, কিছুই যেন তিনি অবহেলা না করেন। এক বৎসরে দুই বৎসরে বহু তত্ত্বে, বহু চিত্রে তাহার উপাদান রাশি অসামান্য পুষ্টি লাভ করিবে, অনেক আবর্জ্জনা জুটিবে, তাহা শেষে তিনি বর্জ্জন করিতে পারিবেন, সেই সমস্ত তত্ত্ব ও চিত্র তিনি পত্রিকা-সম্পাদককে প্রদান করিলে, তাহা হইতে বৎসরের উপযোগী প্রবন্ধ প্রস্তুত হইতে পারিবে। নিজের দেশের কথা, নিজের ঘরের কথা চিত্রসহ প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালী পাঠক পুনরায় মাসিক পত্র পাঠে প্রলুব্ধ হইবেন। এখন বাঙ্গালী স্বদেশের সেই সকল কথা শুনিতে চায়, প্রাচীন পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনের সময় যেরূপ বিদেশীভাব পাইয়া বাঙ্গালী পাঠক পরিতৃপ্ত হইয়াছিল,—স্বদেশী কথা পাইয়া এবার সেইরূপ তৃপ্ত হইবে।

অন্যের উপর নির্ভর করিলে কখন কেহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামগ্রী রচনা করিতে পারে না। বাংলায় অনেক মাসিকপত্র জন্মলাভ করিতেছে, কিন্তু সেই রবীন্দ্র, রামেন্দ্র, হীরেন্দ্রকে লইয়া সকলেই টানা হেঁচড়া করিতেছেন। তাঁহারাই বা নিত্য নূতন কি লিখিবেন? নিজের চেষ্টায় নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখ, রবীন্দ্র রামেন্দ্রের আশায় সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হইয়া বসিয়া থাকিলে লাভ নাই। আমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয়ই নাই। সেই পরিচয় স্থাপনের জন্য যে মাসিকপত্রিকা এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে, তাহাই স্বীয় মহিমায় সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিবে। পাঠকগণকে নিজের চেষ্টার ফল দান করিলে তাহারা করায়ত্ত হইবে, নতুবা প্রেসের দেনা শোধ দেওয়ার জন্য নিঃসহায়ভাবে তাঁহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হইবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সম্পাদকের মন্তব্য।

"আমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয়ই নাই" এ কথা না মানিয়াও এই পরিচয় স্থাপনের জন্য দীনেশ বাবু যে পথ দেখাইয়া দিতেছেন তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট পথ ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

এতদিন ধরিয়া মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনে লক্ষ্যহীন হইয়া আছেন ইহা আমরা মনে করি না। সাহিত্যপরিষদের কথা ছাড়িয়া দিলেও উল্লেখযোগ্য সকল পত্রেই অল্পবিস্তর পরিমাণে দেশের অতীত এবং বর্ত্তমান কালের নানা বিষয়ক বিবরণাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ঐতিহাসিক কীর্ত্তিকলাপাদিতে বরঞ্চ পত্রিকা ভারাক্রান্ত নীরস হইয়া উঠে। আবার অনেক স্থলেই সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী ও প্রীতিউৎপাদক বিবরণাদি বিবৃত হইয়া থাকে। তবে রীতিমত প্রণালীতে দীনেশ বাবুর অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে বঙ্গের গ্রামপল্লিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যদি উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে মাসিক পত্রের যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন মৌলিক ও সরস প্রবন্ধে জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপুষ্টি লাভ করিবে অন্যদিকে তেমনি প্রবন্ধের অভাবও দুর হইবে। কেবল তাহাই নহে ইহাতে আর একটি বিশেষ মঙ্গল হইবে এই যে, এই উপায়ে নব নব অঙ্কুরশালী প্রতিভাগুলি প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে।

লেখক মহাশয়ের মতে ইংরাজি ধরণে গল্প, বেদান্ত ব্যাখ্যা, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের আদর্শ বিষয় হইতে আধুনিক পত্রিকাগুলি এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই। অগ্রসর হইয়াছে কিনা তাহা তর্কের বিষয়। তর্ক দ্বারা তাহার মীমাংসা হউক। আমাদের বক্তব্য এই, বঙ্গদর্শনপ্রমুখ মাসিক পত্রসমূহ প্রকাশের আরম্ভ কালে যেরূপ কথা, যেরূপ জ্ঞান নূতন ছিল এখন তাহা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে আছে ভারতীতে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় সহজ বিজ্ঞানের কথা পড়িয়াই বৃদ্ধ বৃদ্ধ পাঠকগণ তখন কিরূপ আনন্দ লাভ করিতেন। কিন্তু এখন সাহিত্যাকাশ সেরূপ জ্ঞানকণিকায় পরিপূর্ণ; নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পাঠকের অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হইতেছে। অতএব অধুনা এই বিজ্ঞতার যুগে—বিদেশী জ্ঞানদ্বারাই হৌক বা স্বদেশী জ্ঞানদ্বারাই হৌক পত্রিকার আদর্শ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা চাই। অথচ তাহার জন্য প্রতিভার অভাব।

লেখক বলিতেছেন "বাংলায় অনেক মাসিকপত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিন্তু সেই রবীন্দ্র, রামেন্দ্র, হীরেন্দ্রকে লইয়া সকলেই টানা হেঁচড়া করিতেছেন। তাঁহারাই বা নিত্য নূতন কি লিখিবেন?"

কিন্তু আমরা বলি—প্রতিভাময়ী লেখনীতে সামান্য সহজ বিষয়ও মহিমাময় প্রীতিজনক আকার ধারণ করে, পুরাতন কথাও রমণীয় নূতন ছবি বলিয়া মনে হয়। যদি বঙ্কিমবাবু বাঁচিয়া থাকিতেন, যদি রবীন্দ্র, রামেন্দ্র লেখনী চালনায় পরিশ্রান্ত না হইতেন তাহা হইলে এখনও মাসিকপত্রিকাগুলি পাঠকের আগ্রহের সামগ্রী থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহারা লেখনী পরিত্যাগ করিতেছেন তাঁহাদের মত প্রতিভা লইয়া কেহ আর সে স্থলভুক্ত হইতেছেন না।

দীনেশবাবুর প্রবন্ধের বিশেষ মূল্য এই—তিনি ইহাতে যে উপায় বলিয়াছেন তাহা অবলম্বিত হইলে অল্প প্রয়াসেই ভাল লেখক গঠিত হইতে পারিবে;—এবং এইজন্য তিনি আমাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতাভাজন।

এইখানে বলা কর্ত্তব্য, আমরা উপরিউক্ত প্রণালীতে ভারতী পরিচালিত করিবার মানসে এখন হইতে উপকরণ সংগ্রহে প্রয়াসী হইয়াছি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবিষয়ে আমাদের কতদূর সাহায্য করিতেছেন তাহা তাঁহার গীতকথাবলী হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন।

পুষ্পমালা।

(৯)

শারী চুপ, শুক চুপ, দাসী বাঁদী সবাই চুপ, রাণীর শেয়ে রাণী ঘুমে, কেবল, রাতের আঁখি, দিনের সাক্ষী হাজার মণির উজল বাতি যে শূন্যে জ্বলে, সেই নিশুম রাতে, রাজকন্যা চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন,—"কেনরে আমি কোথায়!"

(গীত)

সরোবরের ঘাটে ছিলাম, কেমন ক'রে কোথায় এলাম,
খাট পালঙ্কে ফুলের পাখা কে দিল বিছা'য়েরে!—
"আমার কিসেরি বা ঘুম হায়!"

তখন রাজকন্যার মনে হইল সেই পাঠশালা, সেই সত্য, সেই সরোবরের ঘাট। ঘর দুয়ার ছাড়িয়া রাজকন্যা যে ঘাটে গেলেন। রাজকন্যার গায়ের রোম কাঁটা দিল, ঝড় যেন উঠিয়া এল, ফুলের যেন হাত হইল!—হাত বাড়াইয়া রাজকন্যা খোঁজেন তরোয়াল কৈ?—রাজকন্যা থতমত খাইয়া উঠিলেন,—

(গীত)

অঞ্চলের কোণ কন্যার অষ্ট গিঠে বাঁধা,
কন্যা গিঠ খুলিলেন,

(গীত)

পড়িয়া বটের পাতা, কন্যার, চোখ দিল ধাঁ ধাঁ—
"হায়রে আমার এই হইল লিখন!"

রাজকন্যা পড়েন, দেখেন, আবার পড়েন, দুই চক্ষের জল অঝোরে ছাড়িয়া দিয়া রাজকন্যা বলিলেন,—

(গীত)

এতদিনে বুঝিলাম বিধি, আমার কলম কেন পড়ে,
কি সত্য করিল বাপ মায় আমার কোটালের ঘরে—
বিধি, তোমার লিখন!

তাই হোক, বিধি, কোটাল যখন চন্দ্র সূর্য্য দেখিল, দিন রাত দেখিল, মাটির মাটী পৃথিবী তা'ও যখন তাহারি হইল, বাঁ হাতে কোটাল আমার ডান হাত ধরিল, তখন, মায়ের সত্য বাপের সত্য দুই সত্যের বাঁধন—কোটালের ঘরই আমার।"

রাজকন্যা পুষ্পমালা পুষ্পের পাখায় বটপাতার লিখন বুকের উপর নিয়া নাকের শোয়াসে চোখের জলে, ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিসের অসুখ কিসের বিসুখ, পরদিন রাজকন্যা বিনন চুলের বেণী দিয়া ছোব্ কাপড়ের পরণ নিয়া, পটপুঁথি কলম্ দান' গুরুর কাছে পড়িতে গেলেন।

সেই সিংহাসনের নীচে, উঠন চড়ন নড়ন মাথা, ক্ষণেক ব্যথা ক্ষণেক কথা কোটাল পুত্র কলম নিয়া লেখে না আঁকে, আঁকে না পড়ে, আর আর দিন রুণুঝুণু, আজ রাজকন্যা পায়ের আঙ্গুলে চোক থুইয়া কোন মতে আসন নিলেন।

পড়ান না, আবার পড়ান,—না, শেষে ঠোঁট খড়ি, গলায় নুড়ি ডরে ভয়ে গুরু বলেন,—"রাজকন্যা", গুরু বলেন,—"কোটাল,

নিত্যই হয় পাঠ,
আজ কেন হেরি, কন্যা, কুড়ুল তলে কাঠ?
নিত্য হয় পড়া,
আজ কেন দেখি কোটাল, প্রভাত কালের ছড়া?"

তখন কন্যার দিকে কোটাল চাহিলেন কোটালের দিকে কন্যা চাহিলেন,—আস্তে ধীরে রাজকন্যা পুষ্পমালা মাথার কাপড় টান দিয়া, বালা কাঁকনে কথা—গুরুর হাতে বটপাতা খান তুলিয়া দিলেন।

কোটর চোকে তারার ফুল—গুরু দেখেন চুলের বাঁধন আছে কিনা, কাছার কাপড় আছে কিনা, ফোঁটা চন্দন গলিয়া পড়ে, দাঁতের ভরে দাঁত নড়ে, পড়িয়া, শুনিয়া শেষে গুরু বলিলেন,—"কন্যা, কোটাল, বাপের সত্যও সত্য মায়ের সত্যও সত্য,—এখন তোমার সত্য বা কি?

তোমার সত্য বাকি?"

কন্যা বলিলেন, "গুরু, গুরুর গুরু তুমি; বাপ মায়ের সত্য রাখি কি না রাখি?

কোটাল বলিল,—"গুরু, ? গুরুর গুরু তুমি; বাপ মায়ের সত্য রাখিলেই বা কি, না রাখিলেই বা কি?

গুরু বলিলেন,—দেখ সত্য রাখিলে স্বরগ, না রাখিলে পাতাল।

শুনিয়া গুরুর পায়ে প্রণাম করিয়া, কন্যা কোটাল, তিন সত্য শপথ, বাপ মাকে সত্যে মুক্তি দিয়া কন্যা বসিল নীচে, কোটাল বসিল সিংহাসনে।

তখন গুরু, কন্যাকোটালের পাঠ সঙ্গে দিলেন; গলার হার হাতের কাঁকন কন্যা, কোটাল হাতের তাঁজ বাজুবন্দ গুরুর পায়ে গুরু দক্ষিণা দিয়া, পুঁথি পাঠ বিলাইয়া দুইজনে বাহির হইলেন।

তে পথে পথে বট গাছ, কোটাল বলিল,
"রাত নিশুতি ঘুমের চর সাক্ষী গাছে বাঁশীর রব,
রাত ঝম্ ঝম্ বাত ঝম্ ঝম্, তখন কন্যা না দেখে যম,"

মাথা নামাইয়া কন্যা বলিল, "আচ্ছা"।

তখন কোটালের পথে কোটাল গেল, কন্যার পথে কন্যা গেলেন।

(১১)

সাঁঝের বাতির সময় হইল; বাতি দিতে, রাজকন্যার হাত কাঁপে, বুক কাঁপে, মনের কান্না ফুঁপিয়া উঠে, কাঁপন হাতে কন্যা সাঁঝের বাতিতে সাঁঝ দিল।

তারপর, কেউ যদি দেখে কেউ যদি জানে,—সারা আঁচল ভিজিয়া যায়, উননের জ্বাল নিভিয়া যায়, হাত পুড়িয়া পাত পুড়িয়া, বুকে মুখে পাষাণ দিয়া, কোনমতে কন্যা পঞ্চভাত ব্যঞ্জন রান্না অ-রান্না নামাইয়া, নিজের হাতে করিয়া দাসীকে দিল, বাঁদীকে দিল, বাপমায়ের সাম্‌নে দিল, জন আশ্রিত, কুকুর বিড়ালটা যে, তাকেও খাওয়াইল; খাওয়াইয়া, শুক শারীর মুখে কন্যা আপনার দুইগ্রাস নিয়া তুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় কন্যার কানে বাঁশীর সুর,—

(গীত)

"ওগো কত নিদ্রা যাওগো কন্যা রাত হইল ভারী,
আর তারা উঠিলে কন্যা পারি কি না পারি—
গো রাজকন্যা!"

পাতের মাথা ভাত পাতে, হাতের গ্রাস মাটীতে, হাতে পাতে জল ঢালিয়া, কন্যা উঠিয়া দেখে, রাজদুয়ারে বাতি নিভে নাই, রাজার কটক নিগম হয় নাই; কন্যা একবার ঘরে যায় একবার দুয়ারে আসে।

রাতের ঘড়ি ঘোড়া ছুটে;—এক প্রহর গেল, দুই প্রহর গেল, প্রহরের পর প্রহর গেল, তখন, বৃক্ষের তলে কোটাল, বৃক্ষকে সাক্ষী রাখিয়া বাঁশীতে সুর দিল,—

(গীত)

"ওরে, জল মেল পত্র মেল, বৃক্ষরে,
তোর ডালে বসে নানান্ পক্ষী,
পুষ্পমালার সত্যভঙ্গ হইল রে,
তোমরা থেকো সাক্ষী।"

রাজকন্যা উথাল পাথাল করিয়া কাপড় ছাড়িয়া কাপড় পরিল, গায়ের গহনা বাঁধিয়া নিল, নিয়া গীত গাইল,—

(গীত)

"রহ রহ রহ কুমারহে, রহ, এসনা বৃক্ষের নীচে,
ক্ষণিক বিলম্ব করবে কুমার, এই অভাগীর কারণহে!
এক প্রহর রাতি হইল হে কুমার রাঁধনে বাড়নে,
দুই প্রহর রাতি হইল হে কুমার খাওয়াইতে দাওয়াইতে,
তিন প্রহর রাতি হইল হে কুমার রাজার কটক বুঝাইতে;
চারি প্রহরে দিলাম পা হে কুমার, ঘরের বাহির হইতে।
বাপ মায়ের চক্ষের মণি আমি হে—

কুমার, এক পুষ্পমালা—
কি করে' বাহির হ'ব হে কুমার, বুক বাঁধা মায়া রে!"

চোখের জলে কন্যা গা'ন—

(গীত)

"গাই কাঁদে হামা ডামা বাছুরে কাঁদে মা,—
এইমত কাঁদিবে পুষ্পমালার বাপ মা—রে!"

তখন কোটালের বাঁশী বলিল,—

(গীত)

বাঘ ডাকে সিংহ ডাকে চারি বনে বেড়া,
ওরে, কি মতে পুষ্পের স্বামী মরেরে—
ওরে, সাক্ষী রইলে তোমরা, রে বৃক্ষ!"

তখন কন্যা, হা হুতাশ করিয়া, যেখানে যা' পাইল, মণি, রত্ন, ধন আভরণ, সোণার থালে পঞ্চ ব্যঞ্জন নিয়া, আউল চুলের বেণী, বাতাসের আগে রাতের প্রহর পাড়ি দিল।

রাতের আঁধার ঘুটঘুট, শ্বাস চলে না, রা সরে না, সাক্ষী গাছের তলায় গিয়া কন্যা মূর্চ্ছা দিয়া পড়িল।

ত্রস্তে ব্যস্তে কোটাল, কন্যার মাথার নীচে আপন হাঁটুখান পাতিয়া দিল।

কন্যার মাথা কোলে নিয়া কোটাল কাঁদে,—

(গীত)

"চারিদিকে সিংহ বাঘ, খালি পা, রে, হাত,
সাপের মণি নিয়া রে কন্যা, আমি কাটাই কত রাত,
কন্যা, আঁখিরে মেল!"

তখন কন্যা চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল,—"স্বামি, তুমি খাও নাই?—অভাগীর মুখের গ্রাস ফেলিয়া আসিয়াছি, চারিটী তুমি খাও, চোখের দেখা দেখিয়া, বুকের দুঃখ মুছিয়া, তার পর চল যাই।"

কোটাল, কন্যার হাতখান ধরিয়া পঞ্চ ব্যঞ্জনের উপরে দিল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় খাইয়া দাইয়া, দুইজনে বলিলেন,—"দেখ, রাত আর বেশী নাই; এভাবে কি ভাবে যাই; সাজ, তাজ, পক্ষিরাজ না হইলে এ অল্প রাতের পাড়ি তো কুলাইবে না, আবার রাজপুরীতে চল।"

দুইজনে পা টিপিয়া গা টিপিয়া সাজঘরে সাজতাজ দুই তরোয়াল নিলেন; ঘোড়াশালের দুই পক্ষিরাজের বাঁধন খুলিয়া দিলেন; দিয়া, দুইজনে দুই সিপাই মূর্ত্তি ধরিয়া পাখায় ভর পক্ষিরাজ ছাড়িয়া দিলেন।

রাত ভোরে কন্যার মন্দির খুলিয়া রাণী চীৎকার দিয়া পড়িয়া গেলেন, হাতের ঝারি মাটীতে রাখিয়া রাজা বসিয়া পড়িলেন।

(১২)

যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে, সে রাত, পরের দিন, তার পরের রাত, তা'র পরের দিন, এইভাবে, দুই পক্ষিরাজের পিঠে কন্যা কুমার তিন রাত্রি তিন দিন 'বাহুবহরে' ঘোড়া ছুটাইলেন। ইহার মধ্যে কোথাও জল জলাশয়, জায় জমী, কি লোকপথিকের ঘর বাড়ী কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

চা'রদিনের দিন, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুইজনের প্রাণ যায় নাই, দুইজনে হুবাতাসে যান, বেলা যায় যায় সময়, সেই আদিশা প্রান্তর মাঠের পরে, এক মস্ত বাড়ী দেখা যায়।

তখন ঘোড়া বলে কি আমি আগে, প্রাণী বলে কি আমি আগে, 'হায়হুড়াৎ' করিয়া দুই সিপাই তো বাড়ীর আঙ্গিনায় উঠিয়াই ডাক ছাড়িলেন, কে কোথায় আছ, একটু জল দিয়া বাঁচাও।

সেই বাড়ী যে, সে মুল্লুকের ডাকাত রাজা সাত ডাকাতের! সাত ডাকাত ডাকাতী করিতে গিয়াছে, কেবল ডাকাতের মা বুড়ী বাড়ীতে আছে!

ঘোড়া বাঁধিতে না বাঁধিতে ডাকাতের মা বুড়ী উঁকি মারিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি তিয়াসের জল, আসনের পিঁড়ি আনিয়া দিল, বুড়ী বলিল,—"বাপধনেরা! বাড়ীতে তো কেউ নাই,—কেউ গেছে খামারে, কেউ গেছে কামারে, কেউ গেছে হাট সওদায়, কেউ গেছে বাজারে; তা তোমরা হইলে আগত জন,—মাথার মণি!—ব'স, জিরোও, খাও দাও, পালঙ্কে শুইয়া ঘুম যাও।

তোমার ঘর তোমার বাড়ী
আর কি কিছু কইতে পারি?"

কথা কয় আর বুড়ী
পাঁচ কথার আড়ে আড়ে
কোটর চক্ষে মশাল নাড়ে—

দেখে, সিপাইদের সাজে তাজে বা কত মণি, গায়ে পায়ে হীরার খনি; ঘোড়া যে ঘোড়া মাণিক যোড়া, তাও চিকিমিকি—সোনায় মোড়া!—দেখিয়া বুড়ীর মুখ গলে কি চোখ গলে!—বুড়ী উঠে পড়ে থপ্ থপ্ থপ্ থপ্ পা ধুইবার জল দিল, সায় সিনানের তৈল দিল, বলিল,—"শুকন, কি, রন্ধন?"

শুকন হইলে আঁকড়ধানের চিড়ে দিত, ইট পাটকেল গুড় দিত, আটকলাই আধভাজা আধকাঁচা,—ইহারি নাম, 'শুকন'।

কন্যা কোটাল বলিলেন,—"আমরা পরের হাতের খাইনা, আমরা যে, রাঁধিয়া খাব।"

রন্ধন শুনিয়া বুড়ীর সে খুসীর সীমা নাই,—যত দেরী ততই ভাল;—বুড়ী মনে মনে গিস্ গিস্—"পোড়া কপালেরা শীগ্‌গীর আয়, শীগগীর আয়।"

বুড়ী তখন কথা বলে ঝোলা গুড় হাঁটে যেমন হুড়্ হুড়্, একুলায় থেকে ও কুলায়

করে, এ ডালা থেকে ও ডালায় তোলে, আস্তে ধীরে তাড়াতাড়ি বুড়ী কাঁকড় ধানের আউস চাল, পাথর ক্ষেতের পুরাণ ডাল, চোক ফোটনী ছিটন তেল,—ফল দিল, নারিকেল! ভিজা কাঠ কাঁচা উনন, নিঃসলিতা বাতি দিয়া, বুড়ী বলিল,—"রাজপুত্র সিপাইরা! নাও ধোও রাঁধ খাও।"

কোটাল পুত্র নাইতে গেলেন, পুষ্পমালা রাঁধিতে গেলেন।

রাঁধিবেন কি ছাই!—জ্বলিতে না জ্বলিতে বাতি নিবিয়া গেল, ধরিতে না ধরিতে ভিজা কাঠ কালী দিল; ধূঁয়ায়, চক্ষে জলের ধারা!

কোটাল পুত্র নাইয়া উঠিবেন, দেখেন, জল ঢালিয়া ঘাটের পথ পিছল ক'রে, বুড়ী কয়,—"ও বাপ সিপাই এ ঘাটে এঁটো পাড়, ঐ ঘাট দিয়ে উঠ," ওঘাটে উঠিতে যান, আবার বুড়ী গিয়া জল ঢালে,—"বাপসিপাই, ঘড়াটা পড়িল গেল, ঐ ঘাট দিয়ে উঠ।" তখন কোটাল পুত্র বুঝিলেন যে, এ তো ডাকাতের হাতে পড়িয়াছেন!

কোটাল তখন গীত ধরিলেন,—

গীত।

"ওরে, রান্নার ধূঁয়ায় কালরে, হায়রে,
কা'র চাঁদ মুখ!—
কিবা রান্না রাঁধ্‌বে কন্যা, রান্না সেরে' উঠ,
পিছল পথে বাড়াও রে হাত, কন্যা, পক্ষিরাজে ছুট'।"

কন্যা তো অত জানেনা কন্যা উত্তর দিলেন,—

"এতো, কাঁচা চুলা ভিজে কাঠ কুমার হে,
বাতির নাই সলিতা,
কিবা রান্না রাঁধিহে কুমার, মন হ'য়েছে তিত—হে!"

শুনিয়া কুমার, পাকচক্র সাঁতার কাটিয়া তাড়াতাড়ি আর এক ঘাট দিয়া উঠিয়া আসিলেন; আসিয়াই, আপন পাগড়ী ছিঁড়িয়া জ্বাল দিলেন,—চালে ডালে খিচুড়ী দিলেন,—অফুটা ডাল, কঙ্কর চাল সার সার করিয়া খিচুড়ী নামাইয়া, জিব্ পোড়া তালু পোড়া—নাকে মুখে গুঁজিয়া, দুইজনে কিসের থাকা, কিশের শোয়া,—পক্ষিরাজে চড়িয়া চার চাবুকে পীরসোওয়ার!

বুড়ী যে বুড়ী সেও কিন্তু কম নয়—ডাকাতের মা, সেয়ানার সেয়ানা, কন্যা যখন রাঁধে, কোটাল যখন নায়, সেই সময় বুড়ী গুড়ি গুড়ি শ্বেত সরিষা পড়িয়া দুই পুঁটলি নিয়া দুই পক্ষিরাজের পিছন পায়ে বাঁধিয়া দিল। তারপর বুড়ী সেই দুই পুঁটলি সুঁচের আগায় ফুটা করিয়া দিল, কন্যা কোটাল তো ছুট সোওয়ার,—ছুটে ছুটে, পড়া সরিষা পড়ে আর পথে পথে শ্বেত ফুল ফুটিয়া ফুটিয়া উঠে,—কন্যা কুমার তাহা জানিতেও পারেন না।

বুড়ী আথালি পিথালি—হাত আছড়ায় পা আছড়ায়—"অভাগীর পুত অভাগেরা—সারা

জন্ম বসিয়া খাবি সে ধন ঘরে আসিয়া ফিরিয়া যায়—এখনো আসে না রে, এখনো আসেনা!"—বুড়ী আর দিকদিশা না পাইয়া, বাড়ীর সাম্‌নে খড়ের গাদা ছিল, সেই গাদায় আগুন দিল।

ডাকাতরা সাত ভাই ছিল সেই ধূধূ পাথারের পথে আগুন দেখিয়া ডাকাতরা ছুটে' পুটে জড় হইল।

(গীত)

ছোট ডাকু বলে,—"ভাইরে, বড় ডাকুরে ভাই,
বাড়ীতে যেন কিসের আগুন, ভাইরে—
চল, শীগ্‌গীর বাড়ী যাই!"

বাতাস নাই ভূত নাই, সাত ভাই সাত ঘোড়ায় কোড়া মারিয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠিল, দেখিয়াই বুড়ী আগু পথে ধাই-ধাই—"ও অভাগীর বেটা অভাগীর পুত, পথে পথে সরষের ফুল, দে, দে, ছুট দে!" বলিতে কহিতে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া সাত ভাই ফুলের পথে ঘোড়া দিল।

ঝড় ঝট্‌কা বাতাস খুন,—সাত ডাকু একেবারে চারিদিক দিয়া কন্যা কুমারের নাগাল নিল।

কুমার বলে,—"রাজকন্যা, আজ তুমি জান?"

কন্যা বলিলেন,—"কুমার! আচ্ছা, তবে তোমার ঘোড়া ঠিক রাখ।" বলিয়া কন্যা বলিলেন,—কুমার, ডাকাত আমি কাটিব; কিন্তু কয়জন কাটি, গণিয়া তুমি বলিও।" কন্যা তখন চোকের পলক ফেলিয়া পক্ষিরাজে পাক্ দিলেন, শাণ তরোয়াল চক্র দিলেন, ধূলায় ধূসর রণের মুখে—ডাকাত কাটা পড়িল।

(গীত)

ছোট যে আছিল ডাকু বড়ই সেয়ানা,
কাটামুণ্ডে দিয়া শুইল আপন মুণ্ডখানা—
হা রে দেখ দাঁতের ভিরকুটী!

কন্যা বলিল,—"কুমার, কয়জন?"

"সাতজন"

কন্যা; "না, আমার যেন ঠেকে ছয়জন। আচ্ছা দেখি।" কন্যা, তরোয়াল দিয়া একে একে সকল ডাকাতের মুণ্ডে খোঁচা দিলেন।

(গীত)

"উহুঃ উহুঃ!" ছোট ডাকু উঠে বলে—"না মারবে!
চির জন্ম হইলাম আমি তোমার পায়ের নফর রে!

কন্যা, তোমার ঘোড়ার তো ঘেসেড়া থাকে, আমি সেই ঘাস কাটিব, প্রাণে আমায় রাখ।"

কুমার বলেন,—"হাঁ কন্যা, কথাতো ঠিক্! আচ্ছা; তবে উহার প্রাণ দাও।"

হাসিয়া কন্যা বলেন;—কুমার! তা হ'য় না—

(গীত)

ওগো, ঋণের শেষ অগ্নির শেষ শত্রুর শেষ রাখে;
ওরে আপনি পুকুর কেটেরে, হায় আপ্নি মরে সেহি পাঁকে!

কুমার, ছোট সাপ কাল সাপ, এর বিষ দিনে দিনে ওঝাকেও খায়। সাপ মারিয়া পার লেঞ্জুর রাখিতে কুমার বলিও না।"

কুমার বলিলেন,—কন্যা, তা হোক্,—আমরা আছি দু'জন ও হইল একা; চোকে চোকে থাকিবে, তার কি? ও য থাক।"

কন্যা বলিলেন,—কথা যখন তোমার, থাক্।"

দুইজনে ঘেসেড়া ডাকুর ঘাড়ে ঘাসের থলি দিয়া, চলিলেন।

(১৩)

এক দিন যায়, দু'দিন যায়, আবার প্রান্তর মাঠ। যাইতে, যাইতে, একখানে গিয়া, এক'খরনদীর পাড়ে, দু'ধারে বন। বনে নানান্ রঙ্গের পক্ষী, নানানি বিনানি ফল, গাছের তলে ছায়া, স্রোত নদীর জল; দেখিয়া, কুমার বলিলেন,—"কন্যা, দুই দুই দিন গেল, গায়ের রক্ত গায়ে শুকায়, নাম, এইখানে স্রোত জলে স্নান করি, আলানো বিলানো ফল আছে, খাই; তা'র পর আবার চলিব।

ঘেসেড়া বলিল,—"মহারাজ, তাই তাই!"

কন্যা, মুখখান ভার ভার, বলিলেন,—"কুমার, দেখ, যতক্ষণ না লোক লোকালয় পাই, ততক্ষণ নাই নামিলাম।"

কুমার বলিলেন,—"যাও! তোমার যে কথা!-নাম!"

ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কন্যা নামিলেন। দুই ঘোড়া ঘেসেড়ার হাতে দিয়া, দুইজনে চলে গেলেন। অমনি ছোট ডাকু লাফ দিয়া কুমারের ঘোড়ায় উঠিয়াই, কুমার কন্যা ছিলেন আনমন, এক চোপে কুমারের মাথা কাটিয়া ফেলিল। ফেলিয়াই বলিল,—"কন্যা, এখন?"

কন্যার পাঁচ পরাণ যেন চমক দিল! কাটা কুমার পাড়ে তুলিয়া, হাসিয়া কন্যা বলিলেন,—"ডাকু, কি কেমন?"

ডাকু বলিল,—"সব তো তোমার গেল, এখন আমার ঘরে চল।"

কন্যা বলিলেন,—"চল"।

হাঁ হাঁ তা'ই কও! রাজার বেটী রাজকন্যা, তা'তো আমি আগেই জানি!" হাসিয়া খুসিয়া ডাকু বলিল,—"তবে কন্যা, হাঁটিয়া কেন যাইবে? ঘোড়াতো আছেই, ঐ ঘোড়ায় উঠ।"

কন্যা বলিলেন,—দেখ ডাকু, যা'ই কেন হোক্, ওটী আমার স্বামীর ঘোড়া, ও ঘোড়ায় আমি উঠিব না; আমার ঘোড়া যদি দাও, তবে না হয় উঠি।"

ডাকু ভাবিল,—রাজার বেটীতো এখন আমারি; তা উঠুক না"

তখন, কন্যার ঘোড়ায় কন্যা, কুমারের ঘোড়ায় ডাকু, দুই ঘোড়া পাশে পাশে ফিরিয়া চলিল।

খানিক পথ গেলে, কাপড় চোপড়ের ভিতর থেকে' কন্যা, এক পানের বাটা বাহির করিলেন, বলিলেন,—"ডাকু কতদিন কেবল রাস্তাই চলি, স্নান আর খাওয়া হয় না, আজ মনভরা সুখ, আইস, আমি তোমার মুখে পান দেই, তুমি আমার মুখে পান দাও।"

গাল চিরিয়া হাসি,—"হী হী ঃ—হাহা ঃ"—পান নিতে ডাকু মাথা বাড়াইল, আর সেই মাথা, পুষ্পমালার তরোয়ালে, দেখিতে না দেখিতে, একেবারে মাটী দেখিল।

তখনি, চক্ষের জল সাত বর্ষার বান দিল, বুকের কলিজা ফাটিয়া গেল, দুই ঘোড়া নিয়া গিয়া আছাড় খাইয়া কুমারের কাটামুণ্ড কোলে তুলিয়া কন্যা কাঁদেন,—

(গীত)

"তুমি থাক নিদ্রায়, কুমার হে! আমি যাবরে কতি?
বড় দিয়াছ ধর্ম্ম আমায় দাগা রে! ওরে, কোথায় আমার পতি, রেঁ!
সাক্ষী থেকো দেব ধর্ম্ম হে! তোমরা সবাই থেকো সাক্ষী,
আমার পতি কাটা গেল, ও হায় ধর্ম্ম হে,—আমি যা'ব সঙ্গী!
—আমার পতি রে!"

কন্যা কাঁদেন,—নদীর জল কাঁদে, গাছ বৃক্ষ বন কাঁদে, পাথর পাষাণ ফাটে। মাছ মাগুর জীব জন্তু পশু পক্ষী, সকলে কাঁদিতে লাগিল।

কান্নায় বনপুরী ছাইয়া দিনের মত দিন গেল; রাত যে আঁধার—ঝিঁ ঝি পোকার ডাক, সেই আঁধার নিয়া রাত এল।

সেই আঁধার রাত্রে, শিব পার্ব্বতী কৈলাসে যান। আকাশের তারা পাতালের বালু গণিতে গণিতে দুই দেবতা চলিয়াছেন।

পার্ব্বতী বলেন,—"দেবতা, কার যেন রোদন শুনি! এই বনে কাঁদে কে?"

শিব বলেন,—"যা'র মনে দুঃখ, সেই কাঁদে। তা' দেখে কাজ কি? তোমার যে, সাপ দেখিলেও জিজ্ঞাসা বাঘ দেখিলেও জিজ্ঞাসা। কাজ নাই, চল।"

পার্ব্বতী বলিলেন,—

(গীত)

দেবতা দাঁড়াও তুমি, দেখি আমি হে—
কেবা, আমার, রোদন করে বনে,—
কোন অভাগী পতিহারা, কোন্ বামায় পুত্রছাড়া রে!—

না দেখিলে আমার প্রাণ যে না মানে—হে!"

পার্ব্বতী তখন দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে,—

(গীত)

আধেক জলে আধেক নারী কাটামুণ্ড বুকে করি'
কাঁদে,—"আমার পতিরে পতি!"

আর কি পার্ব্বতীর প্রাণে সয়, আর কি দেবীর মন রয়,—অস্থির হইয়া পার্ব্বতী বলিলেন, —"দেবতা, 'জীবনধন' তোমার ওকে দিতেই হ'বে, রথ নামাও।"

আর কি করেন শিব? রথ নামাইয়া দুইজনে বৃদ্ধবৃদ্ধার মূর্ত্তি ধরিয়া কন্যার সম্মুখে খাড়া হইলেন,—"কন্যা তুমি কাঁদ কেন?"

কন্যা বলেন,—

(গীত)

নিজন বনে বুড়া বুড়ী কে হও তোমরা বাপ মা আমার গো!
আমার দুখ কউক নদীর জল।
বাপ মায়ের সত্য কাটি' উড়াল দিলাম দুইটী পাখী,
দুখিনীর সম্বল মাগো ডাকু যে মারিল শর!
হায় আমার পতিরে!"

শিব পার্ব্বতী বলিলেন,—"মা, বুঝিলাম। আচ্ছা, কাটা মুণ্ড তুমি আমাদের হাতে দাও, ক্ষণেক তুমি বনের মুখ হইয়া চোক বুজ।"

কন্যা বলেন,—

(গীত)

না জানি না শুনি গো বাপ মা, নিশার নিশি কাল,
আমি হাতের মণি না দিব গো কারো হাতে।
আমার কাটা পদ্ম জলে ভাসে, আমি পদ্ম দিব কা'র হাতে,
আমি দিয়া শেষে, কানা চোক অন্ধ করে' মাগো—
আমার, পোড়া কপালের অঙ্গার দিয়া হায় কি আমি আবার
লিখবো গো আখর আমার কপালে।"

হাসিয়া শিব পার্ব্বতী বলিলেন,—"সতী! তবে দ্যাখ্।"

কন্যা দেখিবে কি?—মাটীর দিকে দেখিবে কি আকাশের দিকে দেখিবে? মাটীতে দেখে সাজ সাজন চৌষট্টি অস্ত্র কুমার সামনে খাড়া, আকাশে দেখে চাঁদ সূর্য্য তারার পথে আগুল রথের চূড়া।

তখন কুমার কন্যা, জয় জয় হুলুধ্বনি দিয়া, দুই জনের দুই ঘোড়ায় উঠিয়া বন পাথারে পক্ষিরাজ ছুটাইয়া দিলেন।

(১৪)

নিশি প্রভাত প্রভাত সময় কন্যা কোটাল দুইজনে, এক রাজার রাজ্য ছাড়াইয়া আর এক রাজার রাজ্যে গিয়া পড়িলেন। দেখেন অপূর্ব্ব পরিপাটি এক বাগান, প্রভাত কাল, বাগানে ফুল ধরে না, ফুলের গন্ধ কূল পায় না; কোটালের যে, ঘুমে চোক ঢুলু ঢুলু।

চোক ভাঙ্গিয়া ঘুম আসে, কোটাল বলিলেন,—"কন্যা, আরতো এখন ভয় নাই, এস নামি। এই পরিপাটি বাগান, ফুলের হাওয়া, ফুলের আসন,—পা ছড়াইয়া তুমি ব'স, আমি যে একটু ঘুমাই।"

কন্যা বলিলেন, "দেখ কুমার, এক যমের হাত এড়াইলাম, প্রভাত কালের ঘুম না যমের পরশ, একটু সহিয়া থাক, আর যে ঘুমাইয়া কাজ নাই।"

কোটাল ঘুমে অবশ, ঢুলিয়া পড়ে, কি করিবেন? দুইজনে নামিয়া এক গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া, কন্যা জানু দিলেন, জানুর উপর মাথা রাখিয়া কোটাল, শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত প্রভাত হইয়া গেল, পূব দুয়ারে সূর্য্য দেখা দিল। না, কুমারের ঘুম ভাঙ্গেনা। সেই সময় বাগানের পথে পথে পাইক পাহারা হাঁক দিল, যত ঘাঁটি খুলিয়া দিল, মালী মালিনী ফুলের সাজি ফলের ডালা নিয়া বাগানে আসিল।

দেখিয়া, কন্যা ভাবিলেন,—'তাই তো, এখন কি করি! লোকের সমাগম পড়িয়া গেল, কি করিয়া স্বামীকে জাগাই? কন্যা ডাকিলেন,—

(গীত)

"ওরে, উঠ উঠ উঠ হে কুমার, কুমার, কতই নিদ্রা যাও,
রাতি যে পোহা'য়ে গেছে, কুমার, কুলি করে রা।
এক সত্য দুই সত্য হে, কুমার, সত্য তিন বার,
পুষ্পমালার সত্য রে ভঙ্গ বুঝি নরকে হয় বাস—
কুমার, উঠে' দেখ।"

ধুচ্ মুচ্ করিয়া কুমার উঠিয়া বসিলেন,—"কি, কি!"—সেই সময় রাজবাড়ীর বড় মালিনীর চোক্ যে, কন্যা কুমারের উপর পড়িল।

মালিনী বড় যাদুকরী; যে যেমনই কেন হোকনা, মালিনীর যদি হিংসা হয়, মালিনী যদি আড়চোকে চায়, তো, মালিনীর যাদুতে সে মানুষ, ছাগল ভেড়া হইয়া মালিনীর সঙ্গ নেয়, মালিনী দেখে, নবীন বয়েস যুগলরূপ! মালিনীর চক্ষে সহিলনা; মালিনী ফুঁদিয়া বিনিসুতার আধগাঁথা হাতের মালা গাছি ছাড়িয়া দিল।

সতীর তেজ কন্যা, কন্যার কিছু হইলনা; কুমার যে, পলক নিতে ছাগের শরীর—এই মস্ত দাড়ী এক ছাগল হইয়া ছুটিয়া গিয়া মালিনীর পিছু নিলেন, এক দণ্ডে মালিনী আপন ঘর;—

কন্যার পায়ের নীচে পৃথিবী ঘোরে, মাথার উপর আকাশ পড়ে, কন্যার চোকে ফুলের মালঞ্চে তারা ফোটে!

তখন কন্যা ভাবিলেন,—

রাতের প্রহর পাড়ি দিলাম; ডাকাতের হাত এড়াইলাম, কাটা মুণ্ড জোড়া হ'ল, এতই যদি বিধি করিয়াছ, তখন, সত্য যাঁর সঙ্গে, প্রাণ যাঁকে সঁপিয়াছি, তার সঙ্গে এক চিতার আগুনে ছাড়া তো প্রাণ আমি ত্যজিবনা!—

গীত।

ও যদি, গলার মালা গলায় খসে,
খসা মালায় বাঁধন দিব আমি,
আমার, আজি হোক্ কালি হোক্, খালি সূতার বরণ দিবরে,
তবু আমি দেখিবরে আমার সত্যের যে স্বামীরে—
বিধি, আমি, এহি জনমে!"

বলিয়া, কন্যা, চোকের জল চোকে মুছিয়া দুই পক্ষিরাজ দুই হাতে ধরিয়া মালঞ্চের বাহির রাজপুরীর সামনে গিয়া উদয় হইলেন।

রাজপুরীর লোকে দেখে,
'বাপরে বাপ! এমন সিপাই নবীন ব'স
দুই ঘোড়া তা'র আপন বশ!
এমন সিপাই তো ভাই আর দেখি নাই!' ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, "ভাই সিপাই,

গীত।

কোন্ রাজার কোন্ পুরী কোন্ দিক লুটিতে গমন হে—
দুই পক্ষিতে ভর সিপাই, ভাই, উড়কি চল রে,
ওরে, হেথায় ভাই থাকিতে পার কিনা পার?"

কন্যা বলিলেন,—"ভাই, থাকি-ও না, যাই-ও না। চা'রের বাঁধ চৌষট্টি ঘোড়ায় আমার রণ, কেবা রাখে কোথায় বা থাকি? দুই ঘোড়া নিয়া কোন মতে পথ হাঁটি।" শুনিয়া, রাজা বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, এই সিপাইতো আমি চাই।"

ডাকিয়া কন্যা বলেন,—"মহারাজ, এক সূর্য্য ডুবিবে আর এক সূর্য্য উঠিবে. ইহার অষ্ট ভাগের প্রতিভাগে যে, এক এক ঢাল মোহর আমার খাটুনী।"

রাজা বলিলেন,—"অ্যাঁ—অ্যাঁ?—আচ্ছা। কথা যখন দিয়াছি, তখন, কথা নড়েনা দাঁত নড়ে; তুমি যে আট দুয়ারে অষ্ট প্রহর পাহারা দিবে।"

কন্যা বলিলেন,—"তাহাই হইবে।"

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষের বিদুষী রমণী।

১৩১৩ ফাল্গুন সংখ্যার অনুক্রম।

মীরাবাই।

মিথিলার জয়দেব বাঙ্গালার বিদ্যাপতি যখন কবির সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, সেই সময় চিতোরের রাজ-সিংহাসন ও কবির সিংহাসন এই দুই আসন জুড়িয়া এক রমণী বিদ্যমান—তিনি মীরাবাই। তিনি চিতোর-রাজ কুম্ভের মহিষী ছিলেন তাই তাঁর সিংহাসনে স্থান, আর তাঁর আবেগময়ী কবিতার ঝঙ্কারে চিতোর মুখরিত তাই সেখানকার কবি-সিংহাসনেও তাঁহার অধিকার। চিতোর যে কেবল রমণীর বীরত্বগাথা বহণ করিয়া নিজ গৌরব-প্রকাশ করিত তাহা নহে, তৎসঙ্গে রমণীর বিদুষিতার গৌরব মুকুটও তাহার শিরে শোভমান। মীরাবাই অসাধারণ ভক্তিমতী, ধার্ম্মিকা রমণী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইলেও, বিদুষিতার প্রখ্যাতি তাঁহার কম ছিলনা।

মীরা এক রাঠোর-সামন্তের কন্যা ছিলেন। অলোকসামান্যা রূপবতী ও সুকণ্ঠী বলিয়া বালিকাবয়স হইতে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতি দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার রূপ দেখিবার ও গান শুনিবার জন্য নানা স্থান হইতে তাঁহার পিত্রালয়ে লোক সমাগম হইত। মীরা তাহাদের সকলকে রূপ-লাবণ্যে ও সঙ্গীত-মাধুর্য্যে মুগ্ধ করিতেন। এই মুগ্ধ অতিথিদিগের মধ্যে চিতোরের যুবরাজ কুম্ভও একজন ছিলেন। মীরার রূপ সন্দর্শনে ও গান শ্রবণে তিনি এত প্রলুব্ধ হইয়া পড়িলেন যে, রাঠোর সামন্তের গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, তিনি সেইখানে কয়েক দিবস থাকিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বীয় হস্ত হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া মীরাকে উপহার দিয়া গেলেন—অঙ্গুরীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনপ্রাণ মীরার হস্তে গিয়া উঠিল।

কুম্ভ চিতোরে ফিরিয়া গেলেন, দূত বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া রাঠোর সামন্তের গৃহে উপস্থিত হইল। কুলশীলমানে কুম্ভ মীরার উপযুক্ত—যথা সময়ে বিবাহ হইয়া গেল।

মীরা ছেলে-বেলা হইতেই অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন—সংসারের ভোগ বিলাসের লালসা তাঁহার ছিলনা। পিত্রালয়ে তিনি প্রায় সমস্ত দিন সকলের সঙ্গে মিলিয়া ভগবানের নাম-গান করিয়াই সময় কাটাইতেন,—সংসারের প্রলোভনের দিকে তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না।

স্বামীগৃহের মর্য্যাদা তাঁহাকে রাজপ্রাসাদের প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, তথাকার ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রতি পদে সংসারের দিকে আকৃষ্ট করিতে চাহিল,—মুক্ত প্রাঙ্গনে জনসাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীত ধারা বর্ষণ করিবার সুযোগ দিলনা—প্রাসাদ-প্রাচীর তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া বসিল। ইহাতে মীরা দিন দিন ম্লান ও শীর্ণা হইতে লাগিলেন।

তাঁহার ভক্তিস্রোত সঙ্গীতপথে প্রবাহিত হইতে না পাইয়া অপর পন্থা আবিষ্কার করিল।

মীরা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন, এ সমস্ত কবিতা তাঁহার উপাস্য দেবতা 'রাঙ্গোড় দেব' এর উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, এখন হইতে তাহার স্ফূরণ আরম্ভ হইল। তাঁহার আবেগময়ী রচনা যখন সাধারণ্যে প্রচারিত হইল, তখন চতুর্দ্দিক প্রশংসা-বাণীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

মীরার কবিতা সুরলয়-সংযোগে রাজপুত, বৈষ্ণব সমাজে আগ্রহের সহিত গীত হইতে লাগিল। আজও পর্য্যন্ত সে গীতধারা মীরার প্রতিষ্ঠা বহন করিয়া প্রবাহিত, হইয়া আসিতেছে। ইহার পরে তিনি ভক্তি রসাত্মক কাব্য 'রাগ-গোবিন্দ' এবং জয়দেব কৃত 'গীত গোবিন্দের' একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই দুইখানি গ্রন্থই সর্ব্বজন-প্রশংসিত। মীরার স্বামী একজন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন,—প্রবাদ আছে যে, তাঁহার কবিতা লেখার হাতে খড়ি তাঁহার মহিষীর নিকটই হয়।

মীরা ধন সম্পদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। স্বাধীন ভাবে মুক্ত কণ্ঠে দিবারাত্র কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ও জন সাধারণে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর কাছে নিজের মনোবাসনা জ্ঞাপন করিলেন। কুম্ভের আদেশে রাজঅন্তঃপুরে রাঙ্গোর দেবের এক মন্দির নির্ম্মিত হইল, এবং বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মাত্রেই সে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইল। মীরা এই সকল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের সহিত অকুণ্ঠিত চিত্তে মিশিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।— তাহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ। ইহাতে মীরা এতদূর মত্ত হইয়া পড়িলেন যে, প্রত্যহ স্বামীর পরিচর্য্যার কথা তাঁহার মনেই পড়িত না।

কুম্ভ নিজ মহিষীকে এই রূপে অসঙ্কুচিত ভাবে সাধারণ লোকের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মেলামেশা করিতে দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজা, তাঁহার ভোগের প্রবৃত্তি তখন সম্পূর্ণ প্রখর। তিনি চাহিতেন, তাঁহার অসংখ্য বিলাসসামগ্রীর সহিত মিশিয়া মীরাও তাঁহার বিলাসের উপকরণ হইয়া উঠুক্। কিন্তু মীরা কিছুতেই স্বামীকে সে ভাবে ধরা দিতেন না। কুম্ভ ক্রমেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী দিন দিন তাঁহার প্রতি অনাসক্ত হইয়া উঠিতেছে—তিনি নিজে ইহার প্রতিকারের কোন বিধান করিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি পুনর্বিবাহের সংকল্প করিলেন। মীরার কাছে যখন এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি তাহার অনুমোদন করিলেন।

মীরার মত পাইয়া কুম্ভ কন্যা খুঁজিতে লাগিলেন। ঝালবার-রাজকুমারীর রূপলাবণ্যের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তিনি তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তখন রাজকুমারীর সহিত মন্দাররাজকুমারের বিবাহ হইবার কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। কুম্ভ তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না—বিবাহরাত্রে ঝালবার-কুমারীকে হরণ করিয়া আনিলেন।

মন্দার-রাজকুমারের প্রতি ঝালবারকুমারী অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন,—তাঁহাকে ভালবাসিতেন। চিতোরের রাজা তাঁহাকে হরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোহরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কুম্ভের অদৃষ্টে বিধাতা বোধ হয় দাম্পত্য সুখ লেখেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজঅন্তঃপুরস্থ রাঙ্গোরদেবের মন্দিরে সকল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরই প্রবেশাধিকার ছিল। একদিন মন্দার রাজকুমার বৈষ্ণবের বেশে সেই মন্দিরে আসিয়া দেখা দিলেন। যে সমস্ত অতিথি মন্দিরে নাম সংকীর্ত্তন ও দেবদর্শনে আসিতেন তাহাদের কেহই অভুক্ত অবস্থায় ফিরিতে পাইত না, সকলকেই, দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইত। সেদিন সকলে ভোজন করিয়া গেল কিন্তু মন্দারকুমার জলস্পর্শও করিলেন না। অতিথি অভুক্ত থাকিলে অধর্ম্ম হইবে, ধর্ম্মপ্রাণা মীরা তাহাতে বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি এই নবীন বৈষ্ণবকে আহার গ্রহণ করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক অনুরোধ বচনের পর মীরাকে বলিলেন, আপনি যদি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করেন তবেই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন। মীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন মন্দারকুমার নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া ঝালবার কুমারীর সব বৃত্তান্ত বলিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। ইহাই তাঁহার অনুরোধ! রাজপুতের অন্তঃপুরে পরপুরুষকে প্রবেশ করান বড়ই বিপদজনক কিন্তু রাজকুমারের মর্ম্মভেদী কাতরোক্তিতে তাঁহার সদয়প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই বিপদ শিরে লইয়া তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইল।

মীরা অন্তঃপুরের গুপ্তদ্বার খুলিয়া রাজকুমারকে ঝালবার কুমারীর শয়ন কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কুম্ভ সেই সময় সেই কক্ষদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি বৈষ্ণববেশী মন্দাররাজকুমারকে চিনিতে পারিলেন; মন্দারকুমার কুম্ভকে দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন—প্রণয়িনীর সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না।

কুম্ভ অবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, মীরার সাহায্যেই মন্দারকুমার পুরপ্রবেশ করিতে পাইয়াছে। মীরার উপর তিনি অসন্তুষ্টই ছিলেন, এই ঘটনায় অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ হইল। তিনি মীরাকে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—"অন্তঃপুরের গুপ্তদ্বার খোলার অপরাধে আমার রাজ্য হইতে তোমাকে নির্ব্বাসিত করিলাম।" এই কঠোরবাণী মীরার হৃদয় একটুও চঞ্চল করিল না, রাজপ্রাসাদ ও রাজপথ তাঁহার পক্ষে তুল্য, তিনি স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ভগবানের নাম গান করিতে করিতে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মীরাকে চিতোরবাসীরা বড়ই শ্রদ্ধা করিত, মীরার অনবস্থানে চিতোর নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এই কারণে তাহারা সকলেই কুম্ভের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, চারিদিকে তাঁহার নিন্দাবাদ হইতে লাগিল। কুম্ভ মীরাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

অভিমানশূন্যা মীরা বলিলেন,—"আমি চিতোররাজের দাসী, তাঁহারই আজ্ঞায় বিতাড়িত, হইয়াছি, আবার তাঁহারই আজ্ঞায় পুনরায় রাজপুরীতে প্রবেশ করিব।" মীরা পুনরায় চিতোরে অধিষ্ঠিত হইলেন।

পূর্ব্বে অন্তঃপুরস্থ দেবমন্দিরে কেবল বৈষ্ণবদিগকে লইয়া মীরা সংকীর্ত্তন করিতে পাইতেন, এখন রাজপথে জন সাধারণের সহিত মিলিয়া সংকীর্ত্তন করিবার আদেশ তিনি চিতোররাজের নিকট লাভ করিলেন। রাজ্যমধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। চিতোরের বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই আসিয়া এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘে যোগ দিল। চিতোর রাজধানী সকাল-সন্ধ্যা মীরা-রচিত ধর্ম্ম-সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিল। মীরা জন সাধারণের প্রাণে ধর্ম্মের বন্যা আনিয়া দিলেন; মীরাকে সকলেই দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। শৌর্য্য বীর্য্য সম্পদে গরীয়ান চিতোর, ভক্তির সঞ্জীবনী নিঝরিণীবারিতে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। যে ভক্তির প্রস্রবণ এতদিন প্রাসাদ প্রাচীরের অভ্যন্তরে রুদ্ধ ছিল আজ তাহা প্রবলবেগে লোক সমাজে আসিয়া দেখা দিল—দেশদেশান্তরের লোক মীরার ধর্ম্ম সঙ্গীত শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিল।

"মীরা সাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে একদল খলস্বভাব পরছিদ্রান্বেষী লোক তাঁহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করিল। মীরার গানে মোহিত হইয়া কোন ধনশালী ব্যক্তি তাঁহাকে একটী বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করেন, মীরা স্বয়ং তাহা গ্রহণ না করিয়া বাঙ্গোর দেবের অঙ্গে পরাইয়া দেন। এই অলঙ্কার গ্রহণ ব্যাপার লইয়া ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিরা নানাবিধ জঘন্য কুৎসা রটনা করে। সে সমস্ত কথা কুম্ভের কানে গিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মীরাকে পত্রদ্বারা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মীরা যেন নদীসলিলে দেহত্যাগ করিয়া এই কলঙ্ক কথার অবসান করেন। পত্র পাইয়া মীরা একবার স্বামী দর্শন করিতে চাহিলেন, কিন্তু কুম্ভ সাক্ষাৎ করিলেন না। মীরা তখন স্বামী-আজ্ঞা 'শিরোধার্য্য করিয়া নদীগর্ভে ঝাঁপ দিলেন—নদী তাঁহাকে গ্রাস করিলেন না, অজ্ঞান-অবস্থায় তীরবর্ত্তী করিয়া দিয়া গেলেন।

জ্ঞানলাভ করিয়া মীরা পদব্রজে বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। রাজমহিষী আজ পথের ভিখারিণী তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। কৃষ্ণনাম হরিনাম গান তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা পথশ্রম সব কষ্ট বিদুরিত করিয়া দিল। যে পথে তাঁহার অনিন্দ্য গীতধ্বনি উঠিল সে পথের চতুষ্পার্শ্বে প্রচারিত হইয়া গেল, মীরা আসিতেছেন। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে দলে দলে লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল—সকলেই বৃন্দাবন পথের পথিক! মীরার সমস্ত যাত্রাপথ ভক্তিস্রোতে পুণ্যময় হইয়া উঠিল।

প্রকাণ্ড এক দল লইয়া মীরা বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া পূর্ণ আনন্দ লাভ করিলেন! এই সময় মীরার যশোগাথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, তাহাদের

মুখে মুখে মীরার রচিত গীতগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল! মীরা-সম্প্রদায় নামে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠিত হইল।

কুম্ভের কানে এ সমস্ত কথাই পৌঁছিল, মীরার প্রতি তিনি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য অনুতপ্ত হইলেন, স্বয়ং বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। মীরা চিরদিনই স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, চিতোরে পুনরায় ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু অধিকদিন রাজপুরীতে বাস করিতে পারিলেন না, ধনসম্পদ তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, কুম্ভের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে চিতোরে আসিতেন।

মীরা শেষজীবন তীর্থপর্য্যটনেই কাটাইয়াছিলেন। নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তির আবেশে মীরা প্রায়ই দেবপদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, অবশেষে একদিন চিরকালের মত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন আর উঠিলেন না।

চিতোরে এখনও বাঙ্গোর দেবের সহিত মীরা বাইয়েরও পূজা হইয়া থাকে।

করমেতিবাই।

মীরাবাইয়েরই মত ভক্তিমতী, ধার্ম্মিকা, বিদুষী রমণী আর একজন ছিলেন, তাঁহার নাম করমেতিবাই। ভক্তমাল্য গ্রন্থে ইহাঁর জীবনীর কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাজন গ্রামের পরশুরাম পণ্ডিতনামে রাজপুরোহিতের কন্যা। পরশুরাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন, অল্প বয়স হইতে কন্যাকেও তিনি পরম বৈষ্ণবী করিয়া তুলিয়াছিলেন, শাস্ত্রের ধর্ম্মগ্রহণ ও বৈষ্ণবতত্ত্বে পারদর্শিনী করিবার জন্য তিনি করমেতিকে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। করমেতি বাই শৈশব কালেই বিশেষ বিদ্যাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইবার ভয়ে করমেতি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পিতার আজ্ঞায় তাঁহাকে পরিণীতা হইতে হইয়াছিল।

পিত্রালয়ে যতদিন ছিলেন তাঁহার কষ্টের কোন কারণ ছিল না। দিবারাত্র মনের আনন্দে হরিনাম ও দেবার্চ্চনা করিয়া সময় কাটাইতেন, কিন্তু স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবামাত্রই চারিদিক হইতে অশান্তির শৃঙ্খল তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। স্বামীর সহিত ঘোর মনোমালিন্যের সূচনা হইল; তাঁহার স্বামী অবৈষ্ণব ও অত্যন্ত বিষয়ী ছিলেন, করমেতির প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠান স্বামীর বাধায় প্রপীড়িত হইয়া উঠিত। তিনি অনাচারের মধ্যে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিলেন না। স্বামী সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পিতার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী দিন তথায় থাকা হইল না। কিছুদিন পরেই স্বামী তাঁহাকে

পুনরায় নিজ আলয়ে লইতে আসিলেন। তখন করমেতি বড়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। স্বামীর কবল হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই ভাবিয়া পলায়ন করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন—বৃন্দাবনে যাওয়া স্থির হইল। রাত্রিকালে শয়ন গৃহের বাহিরে আসিলেন, বাড়ীর সমস্ত দ্বার তখন রুদ্ধ, পলাইবার পথ নাই, কি করেন উপর তলা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। বাড়ীর বাহির হইলেন বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের পথ ত জানেননা, সে বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর নাই, একদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন।

প্রভাতে পরশুরাম কন্যাকে গৃহে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজার নিকট গিয়া কন্যার নিরুদ্দেশ-কথা জ্ঞাপন করিলেন, রাজা অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন।

করমেতি তখন এক প্রান্তর অতিক্রম করিতেছেন, পশ্চাতে জনকোলাহল শ্রুতি-গোচর হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অনুসন্ধানেই লোক আসিতেছে। বৃক্ষাদি বর্জ্জিত প্রান্তরে লুকাইবার স্থান নাই, অনন্যোপায় হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কিছু দুরে এক মৃত উষ্ট্রদেহ দৃষ্টিপথে পড়িল। শৃগাল কুক্কুরে তাহার উদর গহ্বরের অস্থিমাংস নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, করমেতি তাহারই মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। মৃতদেহ পচিয়া গিয়াছে, ভীষণ দুর্গন্ধ, তিনি সে দিকে দৃকপাত করিলেন না। যে রাজানুচরেরা উঁহাকে খুজিতে আসিয়াছিল তাহারা কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। তখন করমেতি উষ্ট্রদেহ হইতে বাহির হইয়া বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। পথে অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে বৃন্দাবন পৌঁছিলেন, তাঁহার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল। তিনি বৃন্দাবনেই বাস করিতে লাগিলেন, সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা অর্চ্চনা ও নামজপ চলিতে লাগিল।

পরশুরাম কন্যার অদর্শনে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, তিনি খাজল গ্রাম ত্যাগ করিয়া কন্যার অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বৃন্দাবনে কন্যার সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন, তিনি চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন, দুই চক্ষু বাহিয়া দরদরধারে প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে, একটী দিব্যজ্যোতি তাঁহার দেহখানি ঘিরিয়া আছে। পিতা কন্যার এই দেবিসদৃশ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন।

পরশুরাম কন্যাকে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু করমেতি বিনয়করে পিতাকে নিরস্ত করিলেন। তখন পরশুরাম নয়নের জল মুছিতে মুছিতে স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। কন্যার সকল বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন।

রাজা একজন বিশেষ ভগবৎ-প্রেমিক ছিলেন। করমেতির কৃষ্ণ ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার মানসে বৃন্দাবনে গেলেন, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার বাসের জন্য বৃন্দাবনে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে

ভূমধ্যস্থ অনেক কীটাণুর জীবন বিনষ্ট হইবে বলিয়া করমেতি আপত্তি করিলেন, রাজা তত্রাচ কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই কুটীরের ধ্বংশাবশেষ আজও করমেতির কীর্ত্তিস্মৃতি বহন করিতেছে।

লক্ষ্মীদেবী।

ইনি মিথিলারাজ চন্দ্রসিংহের মহিষী লছিমা নামেই পরিচিত। ইনি বিদ্যাচর্চ্চার বড় অনুরাগিনী ছিলেন, সেইজন্য নিজগৃহে তিনি অনেক মৈথিল্য পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিতেন। বিবাদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিসরুমিশ্র ও মিতাক্ষরটীকা-রচয়িতা বালম্ভট্য ইঁহারই আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, পণ্ডিতদিগের সহিত তিনি ঐ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কূট প্রশ্ন লইয়া দক্ষতার সহিত বিচার করিতেন। ইনি স্বয়ং মিতাক্ষরব্যাখ্যান নামক প্রসিদ্ধ মিতাক্ষরটীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবীণাবাই।

বুন্দেলখণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংহের সভা অনেক কবিরত্ন উজ্জল করিয়া থাকিতেন। তন্মধ্যে বিদুষী প্রবীণা বাই ও পণ্ডিত কেশবদাস। প্রসিদ্ধা প্রবীণা বাই ছোট ছোট কবিতা রচনা করিতেন। সেগুলি রাজসভায় ও অন্যত্র বিশেষ ভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। কবি কেশব দাস এই বিদুষী রমণীর সম্মানার্থ তাঁহার ‘কবিপ্রিয়া’ কাব্য রচনা করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীণা বাইয়ের কবিত্বযশ দিগ্বিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সম্রাট আকবর তাঁহার সেই যশোগাথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সভায় প্রবীণাকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিত তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। ইহাতে আকবর অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের এই বিদ্রোহাচরণের জন্য দশ লক্ষ মুদ্রা অর্থ দণ্ড করেন। এই উপলক্ষে কবি কেশবদাস আকবরের দরবারে গমন করেন এবং বীরবলের সাহায্যে ইন্দ্রজিতকে অর্থদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু প্রবীণাকে সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল, তিনি নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিলে পর তাঁহাকে আকবর ছাড়িয়া দিলেন। আকবর এই বিদুষী রমণীর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দরবারে আকবরের সহিত প্রবীণা বাইয়ের যে সমস্ত কথোপ-কথন হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহা এক খানি গ্রন্থে কবিতায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত দুইটী কবিতা দুইজন মহিলার রচনা। একই ভাবের চিত্র; অথচ দুইজনের লেখনীতে কিরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহাই দেখাইবার জন্য দুইটী পাশাপাশি সন্নিবেশিত হইল।

নিয়তি।

১

প্রেম যদি জীবনের হোত শুধু খেলা,
মনোসাধে খেলি লয়ে মধু রাত্রি বেলা,
মালা শুখাইলে শেষে, ফেলিয়া দিতাম হেসে,
নাহি হোত বহিবারে এ বেদনা জালা!

২

প্রেম যদি হোত শুধু জীবনের কাজ,
ঘুমাতাম কাজ শেষে বিশ্রামের মাঝ;
অবিশ্রাম অনিবার, বহিয়া নিরাশা ভার,
হোতনা নিষ্ফল ব্যর্থ এ জীবন আজ!

৩

প্রেম যদি হোত শুধু জীবনের তৃপ্তি,
আকাঙ্ক্ষা দাহনহীন মধুময়ী দীপ্তি।
অনাদর অপমান, সমাদর প্রতিদান,
বিরহ মিলন সবি সুখের সুষুপ্তি!

৪

তাহা নহে, প্রেম নয়, শুধু শান্তি জ্যোতি,
ফুল্ল উপবনে মৃদু তটিনীর গতি।
ঝঞ্ঝাঝড় নিরাশায়, সদা ইহা বহে যায়।
জীবনের স্রোত ইহা, ইহাই নিয়তি!

মৃত্যুঞ্জয়।

১

প্রেম আজি নহেত স্বপন!
এ নহে আকাশ ফুল জোছনা নিশীথে,
ফুটে উঠে ঝরেনাক তুহিন আঘাতে।
এ মোর হৃদয় তলে চির শোভাময়,
ঝটিকা মেঘেতে এর নাহি কোন ভয়!
প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

২

এ নহে মেঘের খেলা ঘূর্ণি ঝটিকার,
এ নহে আবেগ শুধু তীব্র বাসনার।
এ যে হুহু আলো করা শান্তির সুষমা,
জাগাইছে ঈশ্বরের জাগ্রত মহিমা।
নাহি এর নাহি কোন সীমা!

৩

এ নহে খেলার সাধ এ নহে খেলেনা,
শিরায় শোনিত যেন অন্তরে চেতনা।
জীবনের শক্তি মোর বিপদে অভয়,
সবি যাবে, দুদিনেতে সবি হবে লয়,
শুধু এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়!

বিলাতের রমণী।

"দেশের উন্নতি নারী জাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চলে;" বিলাতের রমণী এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।—প্রকৃত কথা এই, যে দেশে রমণীর সম্মান এবং আদর যত্ন আছে সে দেশ সৌভাগ্যবান, সুখী ও উন্নত। আর যে দেশে তাহা নাই সে দেশ দিন দিন অবনতির পথে যাইবেই যাইবে।

সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই মনুষ্যের ও মনুষ্যসমাজের ক্রমাভিব্যক্তি হইতেছে।

জীবের আবির্ভাবের প্রথম অবস্থায় একটি জীবকোষই বংশরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একটি কোষ দ্বিধা হইয়াই দুটি, এবং দুটি ভাগ হইয়াই চারিটি, এইরূপে জীবকোষের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারিত।

পরে দেখা গেল যে, অনেক বার একা একা ভাগ হইয়া শেষের কোষ কয়টির আর ভাগ হইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া বংশ রক্ষা করিবার উপযুক্ত করিতে প্রকৃতি দেবী আর এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সেই নিস্তেজ কোষ দুটিই পরস্পরের সহিত প্রবল আকর্ষণে মিলিত হইয়া এক হইয়া গেল। তখন এই মিলিত সমষ্টি সঞ্জীবিত ও আরও শক্তিমান হইয়া আবার নূতন তেজে ভাগ হইতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বে তাহাদের একলা একলা থাকিয়া কখনও এত শক্তি ছিল না। এই ঘটনাটিকেই যদি জীব রাজ্যের 'বিবাহ' বলা যায় তো এই শুভ বিবাহ প্রায় জীব সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই কল্পিত।

তখনও এই কোষ দুইটির স্ত্রী পুরুষের মত আকৃতি ভেদ হয় নাই। সে অবস্থা অল্প দিন পরে আপনিই আসিয়া পড়িল। একটি কোষ হইল ছোট ও গতিশীল এইটিই পুংকোষ, অপরটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতি ও স্থিতিশীল স্ত্রী-কোষ।

কি প্রাণী কি উদ্ভিদ এ দুইটীরই এইরূপ অনেক গুলি জীবকোষ দিয়া দেহ গঠিত। ফুলের পুংকোষের হলদে গুঁড়াগুলি পুংরেণু বা পরাগ রেণু। আর গর্ভকোষের তলায় ভ্রূণের আধার স্থান—গর্ভাশয়ে স্ত্রীবীজ রক্ষিত। ফুলে যেমন স্ত্রী বীজ ও পুংবীজ একত্র থাকে কোনও কোনও নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীতেও সেই রূপ দুই বীজের অধিষ্ঠান একত্রে দেখা যায়। কিন্তু বিকাশের উচ্চতর অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে অধিষ্ঠিত; ও তখন তাহারা গঠনে ও প্রকৃতিতে পরস্পরের সহিত অনেক প্রভেদ।

অভিব্যক্তিবাদের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই স্ত্রী পুরুষের গঠন ও কার্য্যে ভেদাভেদ আনিয়াছে এবং সেই মতেরই অনুসারে মানব নিম্নতর শ্রেণী হইতেই উদ্ভূত হইয়া—প্রাণীস্তরের উচ্চতম শ্রেণীতে অবস্থিত। তাহাদের সহিত কতক হিসাবে অনেক রকমে ভিন্ন হইলেও মোটের উপর কি প্রাণী কি উদ্ভিদ একই নিয়মে বাঁধা।

এই গেল উদ্ভিদ ও প্রাণীরাজ্যে স্ত্রী পুরুষের অভিব্যক্তির কথা। মনুষ্য সমাজের আদি অবস্থা হইতেই ক্রমে সমাজের পরিবর্ত্তন হইতেছে। স্ত্রীপুরুষ সন্তানসন্ততি লইয়াই সংসার ও অনেকগুলি সংসার লইয়াই সমাজ গঠিত। আদিম অবস্থায় স্ত্রী পুরুষের রীতিমত একত্র বাস ছিল না। সময় বিশেষে তাহারা মিলিত হইত ও তারপর কোনও সম্পর্ক থাকিত না। সন্তানপালন মাতাকেই করিতে হইত। ক্রমে একত্রবাসের সঙ্গে সঙ্গে পিতার উপর সন্তানের ভার পড়িল। তখন স্ত্রীলোক গরু বাছুরেরই মত স্বামীর সম্পূর্ণ স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহাদের গর্ভজাত পুত্রেরাও তখন মাতার নয়। অনেক স্ত্রী রাখা প্রচলিত ছিল ও যেমন যুদ্ধে ধনলুণ্ঠন হয় সেইরূপ স্ত্রী জাতিরও লুণ্ঠন প্রচলিত ছিল। তাহারাও বলবান জেতার সামগ্রী হইতেন। এবং তাহাদের গর্ভজাত ছেলে মেয়েদের জীবনের মরণের উপরও পিতার সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও দায়িত্ব আসিয়াছে। ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী জাতি এখন অনেক স্বাধীন।

ইউরোপে এখন কাহারও পক্ষে বহু বিবাহ করিবার অধিকার নাই। স্ত্রীজাতি স্বাধীন, শিক্ষিত ও আইন অনুসারে কারণ বিশেষে তাঁহারাও স্বামী ত্যাগ করিতে পারেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এ সম্বন্ধে স্বামীর স্বত্ব অনেক বেশী। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অমেরিকায় দেখ—উভয়েরই স্বত্ব সমান।

সমাজের এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান দিনে প্রধানতঃ স্ত্রীজাতির তত্রত্য অবস্থার উপরই দেশের উন্নতির অবস্থা নির্ভর করিয়াছে। সুধু একটি অন্যটির সঙ্গে যায় এমন নহে একটি অপরটির অনিবার্য্য কারণ। উপরে যে কয়টি কথা বলিলাম সকল দেশের পক্ষেই উহা সত্য তাহা শত শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায়। যাহাদের স্ত্রী স্বাধীনতা সত্ত্বেও এখনও উন্নতির কিছুই দেখা যায় না, ভবিষ্যতে তাহাদেরও একদিন আসিবে। আর যাহাদের সে ব্যবস্থা মোটেই নাই—নিঃসন্দেহ তাহারা পলে পলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শেষে বিলীন হইবে। আর এ ব্যাধিও অতিশয় দুরারোগ্য। বুদ্ধিকে এমন আঁধার করিয়া রাখে যে ব্যাধিকে ব্যাধি বলিয়াই চেনা যায় না! সমস্ত মুসলমান দেশে এই অবস্থা এবং আমাদের দেশেও এই অবস্থা বিদ্যমান। আমাদের দেশের যে নানা রকমের এত হীনতা তাহা নিঃসন্দেহ সেই কারণে উৎপন্ন। বিলাতে অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকায় যত কিছু জিনিষ দেখিবার আছে তাহার মধ্যে এই দৃশ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও মহান্। সমাজে স্ত্রীজাতির সেখানে কি প্রভাব! তাহাদের দেশের এত উন্নতি এত পরাক্রম নিশ্চয়ই সেই কারণের ফল।

সে দেশে রমণী ছেলেমেয়ের প্রকৃত যত্ন জানেন, তাই অল্প বয়স হইতেই সুস্থ বলবান ও সুশিক্ষিত হইয়া দেশের লোক এত প্রতাপশালী হয়। যেমন গানশিক্ষা, শেলাইশিক্ষা ও পড়িতে লিখিতে শিক্ষা তেমনি সংসাররক্ষা ও ছেলে মানুষ করাও বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়। এইরূপে শিক্ষিতা বলিয়া বালিকা যখন বড় হয় তখন তাহাদের

সন্তান সন্ততি অতি সুনিয়মে সুযত্নে লালিত পালিত হইয়া থাকে। অমন মাতার জন্যই অমন দেশ।

জন্মিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত সুব্যবস্থায় বাড়ীতে আপনাআপনিই ছেলেদের সুশিক্ষা হয়। তারপর তিন হইতে পাঁচ বৎসরের ভিতর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা চাই। সে দেশে সকলেই ছেলে মেয়ের শিক্ষা দিতে বাধ্য। আর শিক্ষাও বিনাবেতনে দেওয়া হয়। সেখানকার বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া আমি সকল স্থানেই তিন বছরের মেয়েকেও বিদ্যালয়ে দেখিয়াছি। তাহাদের তখন কোন বই পড়ান হয় না। সুধু তারা ছবি আঁকে, গান করে, ড্রিল করে ও খেলা করে। কাঠের ঘোড়া আছে তার উপর চড়ে, বল খেলা করে। কত ছোট মেয়ে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া আমাকে হাসিতে হাসিতে দেখাইল। বাহিরের আগন্তুক বা বিদেশী দেখিলেও তাহাদের ভয় বা জড়তা নাই। তাহারা স্বাস্থ্যেও যেন পরিপূর্ণ। অল্পক্ষণ পড়া, অল্পক্ষণ খেলা, কোনও রূপ বিশেষ শিক্ষা বা পরীক্ষার চাপ নাই। এইরূপে সে দেশের বালিকারা জীবনের প্রথম অবস্থা কাটায়।

পরে যেমন বড় হইতে থাকে নূতন নূতন বিষয় তাহাদের শিখান হয়। সবই আবশ্যকীয় বিষয়। আঁকিতে শিক্ষা, ঘর কন্না করা, সেলাই, গান, নাচ, বাজনা ও লেখাপড়া।

এইরূপ শিক্ষা তাহাদের ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চলে। এতদিনকার শিক্ষা সকলের পক্ষেই বেতনহীন ও সমান। মনুষ্য সমাজে থাকিতে গেলে যে সকল বিষয় অত্যাবশ্যক সেই গুলিই এই সময়ে শিখান হয়। তার পরে যাঁহারা কোনও বিশেষ বিষয় শিখিতে চান তাঁহারা সেই বিষয়ে শিখাইবার বিশিষ্ট স্থানে গিয়া শিখেন। কেহ কেহ বা কলেজে পড়িতে যান; কেহ বা চিত্রবিদ্যা শিখেন; এইরূপ। কিন্তু মধ্যবিৎ অবস্থার অনেক লোকেই কোনও না কোন অর্থকরী বিদ্যায় মনোযোগ দেন। সেরূপ বিদ্যাও অনেক আছে। তাহা দুই এক বৎসর মাত্র পড়িলে সকলেই স্বাধীন ভাবে কিছু কিছু উপায় করিয়া চালাইতে পারেন। সে দেশের লোকের প্রধান উদ্দেশ্য বয়স হইলে স্বাধীন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করা। কেহ কাহাকেও ভারগ্রস্ত করিতে চান না। ছেলেরা বড় হইলে পিতৃভবন হইতে আপনিই সরিয়া পড়ে, মেয়েরাও সাধারণতঃ কোন না কোন কাজ করিয়া অন্ততঃ নিজের খরচ চালাইতে চেষ্টা করেন!

এইরূপ বিধান স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের লোকের একান্ত অনুমোদিত, তাই সে দেশে স্ত্রীলোকের উপযোগী অনেক কাজও তাহাদের জন্যই পৃথক থাকে। পুরুষ কর্ম্মচারী নেওয়া হয় না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিসের অনেক কাজই স্ত্রীলোকের জন্য রাখিয়া দেন। টাইপ রাইটিং ও অন্যান্য কেরাণীর কাজও তাহাদের জন্য রক্ষিত। দোকানে জিনিস-বেচা-হোটেলে খানা জোগান ইত্যাদি অনেক কাজই তাঁহারা করিয়া থাকেন। যে সকল কাজ স্ত্রীলোকের উপযোগী সেই সকল কাজই তাঁহাদের জন্য রাখা হয়। ইহার মধ্যে অনেক কাজই ঘরে বসিয়া কাজ ও স্ত্রীসুলভ মর্য্যাদার উপযোগী। যে সকল দোকানে সুরা বিক্রয়

হয় সে সকল স্থানে লোক আকর্ষণ করিবার জন্য দোকানদারেরা অল্পবয়স্কা সুশ্রী বালিকা প্রায়ই বেশী মাহিয়ানা দিয়া রাখেন। ইহা অনেক হিসাবে ক্ষতিকর বলিয়া এখন আইন পাশ করিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

এইরূপ সহজ উপায়ে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের উপায় করিবার অবসর দেওয়াতে সে দেশে স্ত্রীজাতির কত মঙ্গল হইয়াছে। যে দেশে পরের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনও রকমে জীবনযাপন করিবার উপায় নাই সেখানে কি করিয়া সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতা জন্মিবে? সাধারণ স্ত্রী শিক্ষাই বা কি করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিবে। রমণীগণই বা কি করিয়া অশেষ গুণ-সম্পন্না হইয়া দেশের সকল হিতকর কার্য্যে সাহায্য ও উৎসাহ দিবেন? শিশুকাল হইতেই ছেলে মেয়েকে সুনিয়মে পালন করিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিবেন? "নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি।" এই বিষমাখা নিয়মটী আমাদের সমাজের অন্তরতম স্থল বিষে জর্জ্জরিত করিয়া আমাদের এমন জাতীয় দুরবস্থা আনিয়াছে।

আমি যাহাদের কথা বলিলাম ইহারা সে দেশের সাধারণ লোক। উচ্চতম শ্রেণী নহে। ইহাদেরই সংখ্যা সে দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অতি উচ্চতম শ্রেণীর রমণীদিগকে দূরে দূরে মাত্র দেখিয়াছি, বাগানে হাওয়া খাইতে, থিয়েটারের প্রথম শ্রেণীতে, এইরূপ। তাহাদের বিষয় আর বেশী কিছু জানি না। কেবল দেখিয়াছি, তাঁহারা বড়ই দেরীতে বিছানা হইতে উঠেন। প্রায় ১১টা ১২টার সময় কিছু প্রাতর্ভোজন করিয়া হাইড পার্কে বেড়াইতে আসিতেন। তাঁহাদের বেশ ভূষা আড়ম্বর বিহীন। অঙ্গে বেশী কিছু ভূষণ নাই। একটু লাল বা নীল বা অন্য কোনও রঙ্গের ফিতা পরিচ্ছদসংযুক্ত হইয়া, উচ্চ পদবীসূচক মুখের ভাবকে আরও সুন্দর করে। কিন্তু তাঁহারাও শিক্ষিতা এবং তাঁহারাও সকলে অলস নহেন।

ইংলণ্ডের লোকের কি মেয়ে কি পুরুষ তাঁহাদের সাধারণতঃ দৈনিক নিয়ম এই। সে দেশে সকলেই দেরিতে উঠে। উঠিয়াই পোষাক পরিয়া কিছু সামান্য ব্রেকফাষ্ট করিয়া কার্য্যে বাহির হয়। যথার্থ কার্য্য আরম্ভ হয় সে দেশে প্রায় বারটার সময়। ব্রেকফাষ্ট অতি সামান্য, খানকতক টোষ্ট, দুটা ডিম, কিছু মাছ ও এক পিয়ালা চা হইলেই হইল। কার্য্যস্থানের নিকটবর্ত্তী কোনও হোটেলে যাইয়া দুপুর বেলায় আহার হয়। তাহাকেই সাধারণতঃ লঞ্চ বলে। শস্তা হোটেল গলিতে গলিতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান্। দু আনা হইতে বার আনার ভিতরে অধিকাংশ লোকের আহার হয়। পরে পাঁচটা ছয়টার সময় দিনের কায শেষ হইলে সন্ধ্যাবেলা তাহাদের আমোদ করিবার সময়। অনেক রাত্রি অবধি আমোদ চলে। এই সময়েই নাচ গান থিয়েটার্ হয়। এগারটার সময় প্রায় সকল আমোদের স্থান বন্ধ হইয়া যায়। সুশাসিত রাজ্যে মানুষের চরিত্রের ও স্বাস্থ্যের জন্য সে নিয়ম রীতিমত পালিত হয়। সন্ধ্যার সময়েই সব মিটিং ও নানারূপ লেক্‌চার হয়। সে দেশে সাধারণ লোকদের বিদ্যাচর্চ্চা বা জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজ খরচে অনেক স্থানে সন্ধ্যার পর নানা বিষয়ে লেকচারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহাতে অল্প 'ফি'তে নানা বিষয়

শিখা যায়। অনেক লোকে দিনের কাজ সারিয়া, আমোদ করিতে না গিয়া এই সকল স্থানে জ্ঞানের কথা শুনিতে যান। তার ভিতর যত রমণী থাকেন, তাহাদের অনেকেই দোকান ঘরে বেচা কেনা বা অফিসে "কেরাণীর কাজ করেন"। তাঁহারা এই সকল স্থানে নিবিষ্ট চিত্তে লেক্‌চার শুনেন ও রীতিমত পকেট বহিতে নোট লিখিয়া নেন। ইউনিভারসিটি কলেজে যে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হইত তাহাতে বিস্তর রমণী আসিতেন। ছাত্রের সংখ্যা হইতে ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশী হইত।

আমার কালো রং ও মাথায় লম্বা চুল দেখিয়া তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি। অতি আগ্রহের সহিত সংস্কৃত ভাষা ও আমাদের দেশের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থার কথা তাঁহারা অনেকেই জানেন ও বড়ই সহানুভূতি করেন। কিন্তু বনবিহারিণী শকুন্তলা তাঁহাদের বিশেষ প্রিয়। একটি বালিকা ইংরাজী "ফনেটিক্" হরফে লেখা "শকুন্তলা" খানি খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন; যে স্থানে ভ্রমর আসিয়া ফুল ভ্রমে শকুন্তলার মুখে বসিতে যাইতেছে—সেই স্থানটি তাঁর বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আমি যখন সেই শ্লোকটির ছত্র কয়টি আবৃত্তি করিলাম; সংস্কৃত উচ্চারণ তাঁদের এতই ভাল লাগিল যে তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত কর্ণপাত করিয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

অসম্পূর্ণ।

সম্পূর্ণ তোমারে আমি পারি না ভাবিতে
তোমার আপন-টুকু আপন করিতে।
নিশা-শেষে সুরমের আধখানি কথা,
প্রণয়ের অশ্রু-মাখা সুমধুর ব্যথা;
কখনো আসিতে-যেতে সচকিত দেখা,
পরাণে আঁকিয়া তোলে কি রহস্য-লেখা!
কখনো, সহসা-দেখে-লাজে-থেমে-যাওয়া,
ঘোমটার ফাঁকে কভু হেসে হেসে-চাওয়া!
তরল, সুন্দর দৃষ্টি! নীরব আহ্বান,—
গোপন হৃদয়-তলে শত অভিমান!
আজীবন বহিতেছি যে প্রণয়-ভার,
তোমার অপূর্ব্ব প্রেম—প্রশান্ত অপার;
ঢাকিয়া রাখিবে চির মুগ্ধ আবরণে
সম্পূর্ণ ভাবিতে তোমা দিবে না জীবনে!

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পুরাতন বেথুন স্কুল।

বেথুন স্কুলের ছাত্রীসম্মিলনীতে পঠিত।

অদ্য এখানে পুরাতন ও নূতন ছাত্রীর সম্মিলন। অদ্যকার দিনে একবার অতীতের ও বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

আমি এই স্কুলের পুরাতন ছাত্রী। তখনকার সঙ্গে ও এখনকার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, তখন স্কুলের কি শোচনীয় অবস্থা ছিল আর এখন কি উন্নতি হইয়াছে। শুধু দেশে নয় সমস্ত সভ্য জগতের নিকট বেথুন কলেজ আজ সম্মানিত হইয়াছে। বাঙ্গালার দেশাচারে নিষ্পেষিত নারী জাতির মধ্যে এই কলেজ, জ্ঞান বিস্তার করিয়া পাশ্চাত্য জগতের নিকট গৌরব স্থল হইয়াছে। আমি যখন স্কুলে আসি তখন আমার সাত বৎসর বয়স। তখনকার কথা আমার সব মনে পড়ে। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নামক আর একটি যে স্কুল ছিল, তাহাতে বয়স্ক মেয়েরা শিক্ষা পাইত। সে স্কুল যখন এই স্কুলের সঙ্গে একত্র হয় তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। তখনি এই কলেজের উন্নতির সূত্রপাত হইল। শিক্ষা প্রণালী সব বদলাইয় নব প্রণালীতে শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমার মনে বড় আনন্দ হইল যে, আমি উচ্চ পরীক্ষা দিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় পিতা অসুস্থ হওয়াতে আমাকে লইয়া বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইলেন। আমার মনে একটা আঘাত লাগিল যে, আমার কিছুই লেখাপড়া হইল না।

আমি যখন স্কুলে আসি তখন দুই জন ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী ও একজন ফিরিঙ্গি শিক্ষয়িত্রী এবং একজন পণ্ডিত শিক্ষা দিতেন। এই স্কুলে একজন বৃদ্ধা ঝি ছিল। সে বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রত্যেক মাতাকে বুঝাইত যে কন্যাদের লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা সে খুব কৃতকার্য্য হইত। অনেক মেয়ে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইত। বোধ হয় শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে তাহার একটা বন্দোবস্ত ছিল। দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মেয়েরা এখানে পড়িত। স্কুল ছাড়াইয়া লইয়া পিতা মাতা তাহাদের বিবাহ দিতেন। আমি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছোট মেয়ে শরৎকুমারী আমরা তখনকার স্কুলের বড় মেয়ে ছিলাম। বার তের বৎসর আমাদের বয়স ছিল। তখন এ স্কুলে সামান্য লেখা পড়া হইত। উচ্চ শ্রেণীতে— নবনারী, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, ভূগোল, অঙ্ক ও থার্ড বুক এই পড়া হইত। একবার এই পর্য্যন্ত দুটী মেয়ের পড়া সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া বড় মেম ঠাট্টা করিয়া সে মেয়ে দুটিকে বলিলেন— "এখন তোমরা কলেজে ছেলেদের সঙ্গে পড় গিয়ে। তিনি জানিতেন না যে—

"যে বৃক্ষ রোপিছ তুমি ছাইবে সে বঙ্গ ভূমি!"

আজ বহু নারী কলেজে পড়িতেছে। সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছে। কি আনন্দ!

তখন নয়টার সময় স্কুলে আসিয়া মেয়েরা এগারটা পর্য্যন্ত খেলা করিত। স্কুল এগারটার সময় বসিত। মেয়েদের পড়া শুনা কেমন হইতেছে সে দিকে শিক্ষকদের কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না। আমি বাড়ীতে আসিয়া বইগুলি চাঙ্গারী চাপা দিয়া রাখিতাম, স্কুলে

যাইবার সময় তাহাই লইয়া যাইতাম। শিক্ষকেরা পড়া হইল কি না তাহার যত্ন লইতেন না। এক পড়াই আমাদের ২।৪ দিন থাকিত। কেবল পাঠ দিবার সময় মেয়েদের একবার মানেগুলা বলিয়া দিতেন। যে মেয়ের স্মরণ শক্তি প্রখর সে ক্লাশে উঠিতে সমর্থ হইত। তখন স্কুলের বড়মেম মধ্যে মধ্যে মেয়েদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের মায়েদের সঙ্গে দেখা করিতেন। যে দিন যে বাড়ী যাইতেন তাহার পুর্ব্ব দিন সে মেয়েকে বলিয়া দিতেন যে কল্য তোমাদের বাড়ী যাইব। মেমরা হিন্দি এবং এক একজন বাঙ্গালাও বলিতে জানিতেন। মেমরা যখন কার্য্যত্যাগ করিয়া বিলাত যাইতেন তখন এই গ্যালারিতে সকল মেয়েকে বেলা দুইটার সময় বসাইতেন। এবং একজন শিক্ষয়িত্রী নামের খাতা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এক একটী মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিতেন আর বড় মেম গম্ভীরমুখে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহাকে চুম্বন করিতেন। কোন কোন মেম কখনও কখনও কাঁদিয়া ফেলিতেন। অনেক ছাত্রীর মনে বড় মেমের বিদায়ের জন্য দুঃখ হইত। আমার মনে আছে এক একজন শান্তপ্রকৃতি মেমের জন্য আমার বড় দুঃখ হইত। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে কাঁদিয়া অধীর হইতাম। পিতা মাতা কত রকমে ভুলাইতেন। কিছুতে ভুলিতাম না; পরে আপনা হইতে বিষাদ কমিত।

যখন স্কুল বসিত তখন একটা সঙ্গীত হইত। সে গান সম্পূর্ণ মনে নাই। তাঁহার একটু মনে আছে—

আইস আমরা পাঠশালায় যাই,
ছোট ছেলে ছোট মেয়ে পাঠশালার মধ্যে তুষ্ট হয়।

কি যে অপূর্ব্ব গান! কিন্তু আমাদের ভাল লাগিত। যখন গ্যালারিতে আমরা আসিয়া বসিতাম, কিছুক্ষণ মেয়েরা বড় গোলমাল করিত, কিছুতে থামিত না, তখন পণ্ডিত আসিয়া মুখে একটা আঙ্গুল রাখিয়া গানের স্বরে বলিতেন—

চুপ চুপ কর চুপ, একেবারে কর চুপ,
কারণ শিক্ষক বলেন চুপ, চুপ চুপ চুপ।

তখন মেয়েরা ভয়ে চুপ করিত। একবার স্কুলে কথা হইল, যে মেয়ের গান ভাল হইবে তাহাকে বড় মেম মেডেল দিবেন। বড় মেমের সুন্দর মেয়েদের উপর কৃপাদৃষ্টি ছিল। স্কুলের মধ্যে একটী মেয়ে ছিল, সে দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু তাহার গলা মোটেই সুন্দর ছিল না। তবু যখন গেলারী শুদ্ধ সব মেয়েরা গান করিত; তিনি বলিতেন সেই মেয়ের গান ভাল। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা আড়ালে বলিতেন 'তাহা নয়'। কিন্তু বড় মেমের কাছে বলিতেন, হাঁ, ওর গানই ভাল। ইহাতে সে মেয়েটী প্রাইজের সময় স্বর্ণ মেডেল পাইল। মেমের পক্ষপাতিতাতে তখন রাগ ধরিয়াছিল; এখন মনে হয়, সৌন্দর্য্যের এমনি প্রভাব!

তখনও প্রাইজের সময় সমস্ত স্কুল সাজান হইত এবং কলিকাতার অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করা হইত। বড়লাট-পত্নী কিম্বা কন্যা আসিয়া প্রাইজ দিতেন। একবার প্রাইজের

সময় বড়লাট নর্থব্রুকের কন্যা আসিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য বড় মেম আমাদিগকে নিম্নলিখিত সঙ্গীত শিখাইয়াছিলেন—

নমস্কার, নমস্কার; সুমতি মিস ব্যারিঙ্গ,
এখন আমরা হর্ষিত হই, কারণ আপনার দর্শন পাই,
নমস্কার নমস্কার গুণবতী; দয়া কর এই বিদ্যালয়ের প্রতি। ইত্যাদি।

একবার কোন লাটপত্নী প্রাইজ হইবার সময় একটি মেয়েকে খুব গহনা পরিয়া আসিতে দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ কাহারু মেয়ে?" সেই হইতে প্রত্যেক প্রাইজের সময় শিক্ষয়িত্রীরা মেয়েদের যার যা গহনা আছে পরিয়া আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি দেখিতাম বড় লোকের মেয়েরা মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এত গহনা পরিয়া ঝনর ঝনর শব্দ করিয়া আসিত যে তাহাদিগকে একটা গহনাঢাকা জন্তু বিশেষ বলিয়া মনে হইত। এমন আড়ষ্ট হইয়া, অলঙ্কার হারাইবে ভয়ে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইত, যেন গহনার বোঝা নয়, সাক্ষাৎ দুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বেড়াইত। যার গহনা বেশী শিক্ষয়িত্রীরা তাহাকে প্রথম লাইনে বসাইতেন কেননা লাটপত্নীর নজর তার উপরে পড়িবে। প্রাইজের দিন লাটপত্নীর দর্শনের জন্য মেয়েদের সব সেলাই একটা টেবিলে সাজান হইত। সেলাই, কার্পেট বুনন, গলাবন্ধ, চাদরের ধার মুড়িয়া বখেয়া সেলাই। পড়ার পুরস্কারের চেয়ে সেলাইয়ের পুরস্কার যেন ভাল হইত বলিয়া মনে হয়। প্রাইজ সভা ভাঙ্গিবার সময় 'গড সেভ দি কুইন' গান হইত।

এক একদিন ক্লাশ বসিবার পূর্ব্বে শিক্ষয়িত্রীরা বলিতেন অদ্য তোমাদের ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের অনুকরণ করিতে হইবে। আমাদের তাহা এইরূপে শিখাইয়াছিলেন, প্রথম গ্যালারি শুদ্ধ মেয়ে মুখে হিস্ হিস্ শব্দ করিত, শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আমাদিগকে ইহার অনুকরণ করিতে হইত। পরে হাতের আঙ্গুল গ্যালারীতে ফেলিয়া টপ্ টপ্ শব্দ করিতে হইত। তাহা বৃষ্টির অনুকরণ। যখন সব মেয়ে বসিয়া গ্যালারীতে এক সঙ্গে পায়ের দুম্ দুম্ শব্দ করিত তখন তাহাই বজ্রের অনুকরণ হইত। তন্মধ্যে যে মেয়ের পায়ে মল থাকিত, শিক্ষয়িত্রীরা বড় খুসী হইয়া বলিতেন যে তার পায়ের শব্দের সঙ্গে বজ্রের শব্দের তুলনা হইতেছে। মলের সমাদর দেখিয়া প্রায়ই মেয়েরা মল পরিত।

একবার একজন বড় মেম গ্যালেরিতে দাঁড়াইয়া আমাদের ড্রিল করাইতেন। প্রথমে তিনি নিজে যে প্রকার করিয়া হাত ঘুরাইতেন আমাদেরও সেই প্রকার করিতে হইত। ইহাতে আমাদের বড় হাসি পাইত। কিন্তু কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিতাম। আবার গ্যালারি হইতে নামাইয়া সঙ্গে সঙ্গে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইয়া আনিয়া তবে ক্লাশে আমাদের পড়িবার হুকুম দিতেন। ইহাতে পাঠের অনেক সময় চলিয়া যাইত। তখন স্কুলের সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খলার সহিত হইত। এখন কত শৃঙ্খলার সহিত সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা কলেজের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যখন বঙ্গমহিলা স্কুল এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হইবার কথা হইল, আমার তখন একটু বেশী বয়স হইয়াছে, আমি স্পষ্টই বুঝিলাম সমস্ত শিক্ষয়িত্রী ও পণ্ডিত মহাশয়গণ বিরক্ত

হইলেন। তাঁহারা হয়ত ভাবিলেন কেন এতদিন ত বেশ ছিলাম; আবার দুইটা স্কুল একত্র হইয়া সব বদলাইয়া যাইবে। যাহা হউক দুইটা স্কুল এক হইয়া গেল; কয়েকজন পূর্ব্বের শিক্ষয়িত্রী আর কয়েকজন বঙ্গমহিলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রহিলেন। কিছু দিন এই ভাবে স্কুল চলিতে লাগিল। বঙ্গমহিলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মেয়েদের লইয়া ছুটির সময় নানা প্রকার ক্রীড়া করিতেন। আমাদের স্কুলের যে দুই এক জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে শিখাইয়া দিতেন, উহাদের চীৎকার করিয়া এই কথা বল বুড়মেয়ে বুড়ীমাগী নাচিতেছ, এই কথা বারে বারে বল। এ দলের মেয়েরা তাহাই বলিত। কিন্তু বঙ্গমহিলার শিক্ষয়িত্রী বাঙ্গলা বুঝিতেন না বলিয়া কিছুই বলিতেন না। পরে আমার খুব কঠিন পীড়ার জন্য তিন মাস স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আরোগ্য হইয়া আসিয়া দেখিলাম পুরাতন শিক্ষয়িত্রী কেহই নাই। কেনই বা থাকিবে। সদ্ভাব বিনা কি কাজ চলে? পূর্ব্বেকার শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলের উন্নতি বুঝিলেন না।

বাৎসরিক পরীক্ষার সময় কয়েকজন সহরের নামজাদা বাঙ্গালী আমাদের পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষার ফলে কোন মেয়ে সেদিন ক্লাশে উঠিতে না পারিলেও পরদিন তাহাকে ক্লাসে উঠাইয়া দেওয়া হইত।

আমরা বাড়ী যাইবার সময় গাড়ীতে খুব চীৎকার করিয়া পদ্যপাঠের পঁড়া মুখস্থ করিতাম। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে' ইত্যাদি আওড়াইতে আওড়াইতে বাটীতে আসিতাম। তখন সিডিসন ছিল না।

তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনায় কি আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা যাইতেছে। শিক্ষার প্রকৃত ফল আমাদের বঙ্গীয়া ভগিনীদের হৃদয়ে কি সুন্দর রূপে ফুটিয়াছে। আমাদের বঙ্গনারীরা বি, এ, এম্, এ, পাশ করিয়া কেমন সুশৃঙ্খলার সহিত এই কলেজের গুরুতর ভার চালাইতেছেন। এই কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কত মহিলা এক একটি গৃহকে সুখ-শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছেন। এবং পতি পুত্র, ভ্রাতাকে দেশের সৎকার্য্যের উপযোগী করিতেছেন। এ সকল দেখিয়া কাহার না প্রাণ আনন্দে পুলকিত হয়। এই স্কুলে এখন মেয়েরা কত বড় হইয়াও লেখা পড়া শিখিতেছেন। আদর্শ শিক্ষয়িত্রীদের পরিচালনায় তাঁহারাও কালে আদর্শ পরিবারে পরিণত হইয়া দেশের উপকারে আসিতেছেন। নারীজীবন যে আর অবহেলা অবজ্ঞার জীবন নয় তাহা দেশীয় লোকেরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন। রমণী সুশিক্ষিতা হইলে যে সংসারের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এই দৃষ্টান্ত এখন আর কেবল পাশ্চাত্য দেশের মধ্যেই আবদ্ধ নহে? আমাদের দেশে পুরাকালে তাহার কত প্রমাণ রহিয়াছে। এখন আবার দেশ তাহার প্রমাণ পাইতেছে। অতএব এই ক্ষেত্রে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণকে এবং লেডি প্রিন্সিপালমহাশয়া এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী-দিগকে ধন্যবাদ না দিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহারা যোগ্য হইয়া যে এই মহৎ ব্রত লইয়াছেন ইহাই আমাদের প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

আধুনিক জাপান।

পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার।

জাপানের অধিকাংশ পুরুষ এবং প্রায় সকল স্ত্রীলোকই তাহাদের দেশীয় পরিচ্ছদ বজায় রাখিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ—"কিমোনো", সূতা কিম্বা রেশমের লম্বা জামা, প্যাগোদা-ফ্যাশানের আস্তিন, রং খুব উজ্জ্বল নহে (লাল, ধূসর, শ্যামল); কেবল নর্ত্তকী ও শিশুদের পরিচ্ছদের রং এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল। শীতকালে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা, এইরূপ অনেকগুলি কিমোনো একটার উপর আর একটা চাপাইতে পারে। এই লম্বা জামার জেব্‌ আস্তিনের ভিতর দিকে। পুরুষেরা এই লম্বা জামার উপরে সরু একটা ক্রেপের কটিবন্ধ এবং স্ত্রীলোকেরা একটা চওড়া রেশমের কোমরবন্ধ ব্যবহার করে,—স্ত্রীলোকের এই কোমরবন্ধের সঙ্গে পিঠের দিকে একটা ছোট চৌকা বালিসের মত জিনিষ থাকে। স্ত্রীলোকদের কিমোনোগুলা খুব দামী; কিন্তু তাহাদের আকার বরাবর একই রকমের চলিয়া আসিতেছে; এই আকার বৎসরে বৎসরে বদ্‌লানো তাহারা আবশ্যক মনে করে না। তাহাদের নিকট এই আকারটী অতীব রমণীয়। এই পরিচ্ছদগুলি অনেক দিন টিকিয়া থাকে; অনেক সময় এই কোমরবন্ধগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে মা হইতে মেয়েতে বর্ত্তায়।

কিমোনোর নীচে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই, সাধারণতঃ সূতার কিংবা রেশমের কামিজ পরে এবং এই কামিজের নীচে মল্‌মল্‌ কাপড়ের এক প্রকার চওড়া কোমরবন্ধ থাকে। আমীরওম্‌রা ও ধনীলোকেরা, কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েই কিমোনোর উপরে অনেক সময় আর একটা আচ্ছাদন বস্ত্র পরে (হাওরি); তাহার তিনস্থানে পরিচ্ছদধারীর আভিজাত্য-সূচক চিহ্ন অঙ্কিত থাকে।

এতদিন পুরুষেরা একপ্রকার খোঁপা পরিত, খোলা মাথায় চলিত, মাথার উপর ছাতা ধরিত, কিংবা মাথায় মস্ত একটা খড়ের টুপি পরিত; আজকাল উহারা খুব ছোট করিয়া চুল ছাঁটে, এবং বড় বড় নগরে য়ুরোপীয় ধরণের কিনারা-ওয়ালা টুপী পরে। স্ত্রীলোকেরা ছাতা মাথায় দিয়া, নগ্নমস্তকে বাহির হয়, কেবল শীতকালে একপ্রকার কিনারাহীন টুপী পরে। উহারা খুব যত্ন করিয়া খোঁপা বাঁধে, খোঁপাটী যেমন সুন্দর তেমনি জটিল; কাঁটা এবং সোনা রূপা, কড়ি গালা, ঝিনুকের চিরুণীর দ্বারা বিভূষিত। স্ত্রীলোকের বয়স ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে এই খোঁপার একটু রকম-ফের হইয়া থাকে। খোঁপা বাঁধিতে অন্তত একঘণ্টা কিংবা দুইঘণ্টা লাগে; তাই অধিকাংশ জাপানী-রমণী সপ্তাহে শুধু তিন দিন খোঁপা বাঁধে। প্রাতঃকালে, যখন উহারা ঘর পরিষ্কার করে, তখন ধূলা লাগিবার ভয়ে একখানা রুমাল দিয়া খোঁপা ঢাকিয়া রাখে।

জাপানী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, এক প্রকার চর্ম্মপাদুকা (টাবি) ব্যবহার করে, উহা পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত প্রায় পৌঁছায় না, উহার দুইটা খোপ আছে; একটা খোপ বুড়-আঙ্গুলের জন্য, আর একটা খোপ অন্য আঙ্গুলগুলার জন্য। যখন গৃহ হইতে বাহির হয়, তখন উহারা একপ্রকার খড়ের খড়ম কিংবা কাঠের খড়ম পরিধান করে—এই খড়মের আকারে খুব একটা বিশেষত্ব আছে।

স্ত্রীলোকের খোঁপার কাঁটা ও চিরুণী যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে জাপানী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা কোন প্রকার অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করে না; উহারা না পরে কান-বালা, না পরে কণ্ঠমালা, না পরে ব্রোচ, না পরে বলয়, না পরে আংটী। য়ুরোপীয় ও অন্যজাতি হইতে এই বিষয়ে উহাদের বিশেষত্ব।

শিশুদের পরিচ্ছদ,—বয়স্ক লোকের পরিচ্ছদেরই ক্ষুদ্র নমুনা। কেবল রংগুলা (বিশেষতঃ কচি শিশুর পরিচ্ছদের) আরও উজ্জ্বল। মা-দিগের খেয়াল অনুসারে উহাদের চুলের ছাঁট, ও ভঙ্গী নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। পাছে হারাইয়া যায় এইজন্য উহাদের গায়ে অনেক সময় ধাতব পতর বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

খনক, কুলিমজুর, পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ীর পরিচালক—ইহাদের পরিচ্ছদ একটু বিশেষ ধরণের একটা ফতুয়া ও একটা পা-জামা; যে বাড়ীর চাকর সেই বাড়ীর নাম ফতুয়ার পিঠে বড় বড় চীনে অক্ষরে লেখা থাকে। মাঠময়দানে, কৃষকেরা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই প্রায় একইপ্রকার পাজামা ব্যবহার করে, গোল খড়ের টোকা মাথায় পরে; যখন বৃষ্টি হয়, তখন একটা বিপুল খড়ের চাদরে গাত্র আচ্ছাদন করে।

রাজবাড়ীর মহিলা ছাড়া, জাপানের আর সমস্ত রমণীই দেশীয় পরিচ্ছদ বজায় রাখিয়াছে; অধিকাংশ জাপানী পুরুষেরাও দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; কেবল সুবিধা মনে করিয়া য়ুরোপীয় টুপিটা গ্রহণ করিয়াছে। যেখানে বিদেশী দূতদিগের নিত্য যাতায়াত, সেই রাজ দরবারে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই য়ুরোপীয় পোষাক পরিতে বাধ্য; বোধ হয় জাপানের মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ভাবে যে, যদি তাহারা আমাদের মত পরিচ্ছদ পরিধান করে তাহা হইলে আমরা তাহাদের সহিত সমকক্ষভাবে ব্যবহার করিব। দেশীয় পরিচ্ছদ কি কিমোনো পরিলে যাদের এমন সুন্দর দেখায় সেই জাপানী রমণীরা কর্সেট ও অন্যান্য জটিল য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ বিশ্রী করিয়া পরিধান করে। আবার জাপানী রাজকর্ম্মচারীরাও আমাদের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে,—কেননা, তাহাদের আফিসে তাহারা টেবিল, চৌকি প্রভৃতি য়ুরোপীয় আস্‌বাব ব্যবহার করে এবং এই সকল বিলাতী আস্‌বাবের সহিত বিলাতী পোষাক মানায় ভাল। কিন্তু যখন তাহারা গৃহে ফিরিয়া যায়, তখন আবার প্রায়ই জাপানী পরিচ্ছদ পরিধান করে।

মোট কথা, আজকাল জাপানীরা য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ততটা পছন্দ করে না। অধিকাংশ জাপানীরাই দেশীয় পরিচ্ছদের গুণ, তুলনায় বুঝিতে পারিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে,

দেশীয় পরিচ্ছদের সুবিধা বেশী, উহা জাপানী-জীবনের সমস্ত খুঁটীনাটীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ;—যেমন মনে কর বালিসের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিবার অভ্যাস। তাছাড়া উহারা মনে করে, দেশীয় পরিচ্ছদ বেশী সাদাসিধা, বেশী মানান-সই, বেশী সুন্দর ; তাহাদের এই বিপুল ও সুরম্য জামায় মানবদেহ যেরূপ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হয় এমন আর কোন পরিচ্ছদে নহে। প্রাচ্যদেশের অনেকেই আমাদের পোষাককে বেশী আঁট সাঁট, হাস্যজনক ও নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করে। আমাদের কোর্ত্তা প্রভৃতির ছাঁট, গাউন প্রভৃতির চিরপরিবর্ত্তনশীল সজ্জাপ, পুরুষদের মাড়-দেওয়া ফ্রিল্‌ওয়ালা কামিজ, স্ত্রীলোকদের কোমর-সরু-করা কর্সেট্—কি যুক্তি, কি আরাম, কি সুরুচি কোন হিসাবেই উহাদিগকে সমর্থন করা যায় না।

কোন বিদেশে গেলে প্রথমেই সেখানে নূতন জিনিষ দেখিবার জন্য কৌতূহল হয়, সেই কৌতূহল নিবৃত্তি হইলেই, যাহা আরও রহস্যময়—সেই দেশের লোকের উপর কৌতূহলটা গিয়া পড়ে। প্রথমেই আমি একটী কথার উল্লেখ করিব ;—কি গার্হস্থ্য জীবনে কি সামাজিক জীবনে, আধুনিক জাপানীরা অনেকগুলি পূর্ব্বেকার আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়াছে। তাহাদের কতকগুলি প্রথা বড়ই অদ্ভুত :—

জাপানীরা যে বৎসরে জন্মগ্রহণ করে সেই বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে উহারা বয়সের আরম্ভ গণনা করে এবং প্রতিবৎসর ১লা জানুয়ারীতে উহাদের এক এক বর্ষ বৃদ্ধি হয় ; এই হিসাবে, যে শিশু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জন্মিয়াছে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাহার বয়স এক বর্ষ এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর আরম্ভেই তাহার বয়স দুই বর্ষ বলিয়া ধরা হয়।

জন্ম হইতে ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কালকে উহারা যৌবন, ২০ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত কালকে প্রৌঢ়, এবং ৪০ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত কালকে বার্দ্ধক্য বলে। ৬১ বৎসর বয়স হইলেই উহারা খুব গম্ভীরভাবে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করে। উহারা এই সময়টাকে নবজীবনের আরম্ভ বলিয়া মনে করে।

জন্মাইবার ৭ দিন পরে নবজাত শিশুর মাথা কামাইয়া দেওয়া হয়। এইটী শিশু-জীবনের প্রথম ঘটনা বা অনুষ্ঠান।

জাপানী শিশুরা দুই বৎসরের পূর্ব্বে মায়ের দুধ ছাড়ে না ; কখন কখন তিন বৎসর, কখন বা ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করে। কতকটা এই কারণেই জাপানী মা-রা এত শীঘ্র বুড়াইয়া যায়।

জাপানী শিশুরা সাধারণতঃ বেশ হৃষ্টচিত্ত। শুনিতে পাই, উহারা কখনই কাঁদে না। ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, উহারা অল্পই কাঁদে এবং উহাদিগকে কখনই কেহ কাঁদায় না। উহাদিগকে খুব কম বাধা দেওয়া হয়, উহাদিগকে স্বাধীন স্ফূর্ত্তির সহিত বাড়িতে দেওয়া হয়। আসবাবশূন্য খালি কামরায় উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেইখানেই উহারা ইচ্ছামত খেলিয়া বেড়ায়, দামী জিনিষপত্র ভাঙ্গিবার কোন ভয় থাকে না। সাধারণ লোকেরা, বড়

ভাই ও বড় বোন্‌দের পিঠে বাঁধিয়া দিয়া শিশুদিগকে রাস্তায় খেলিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। একজন জাপান-বাসী-য়ুরোপীয় লিখিয়াছেন, উহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন এক-দেহে-বদ্ধ প্রসিদ্ধ শ্যামদেশবাসী দুইটি যমজ।

জাপানীরা কি প্রণালীতে শিক্ষা দেয় তাহার আলোচনায় আমোদ আছে। জাপানে জাতীয় আদর্শ-নীতি রক্ষা করিবার জন্য, পরিবার ও বিদ্যালয় উভয়েই সচেষ্ট। জাতীয়তার ধর্ম্ম, মিকাডোর প্রতি ভক্তি, পূর্ব্বপুরুষের পূজা, পিতামাতা ও পিতামহপিতামহীদের প্রতি ভক্তি, নিস্বার্থপরতা ও বিশ্বস্ততা, সস্মিত সৌম্য ভাব, আত্মোৎসর্গ ও সাহস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ—জাপানী নীতির এই সমস্ত প্রধান অঙ্গ জাপানী পিতা সন্তানদিগকে শিক্ষা দেন।

শিশু বড় হইয়া উঠিলে পিতামাতা তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করে ; তখন কোন বন্ধুর প্রতি বিবাহের ভার দেওয়া হয়, এবং সেই বন্ধুটি পাত্রযুগলের সহায় ও আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। সেই বন্ধুই দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালায় ; সেই বন্ধুই ভাবী বরকে নিজের গৃহে কিংবা অন্য বন্ধুর গৃহে, - এমন কি, কখন কখন—থিয়েটার ও সাধারণের বেড়াইবার রাস্তায় আনাইয়া সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দেয়। ফলত, যুবাজনেরা আত্মীয়স্বজনেরই নির্ব্বাচন প্রায় গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন, তাহাদের মধ্যে উপঢৌকনের আদান প্রদান হয় ; যথা ;—পরিচ্ছদ কিংবা পরিচ্ছদ কিনিবার অর্থ, বিশেষ প্রকারের কতকগুলি মৎস্য, ইত্যাদি। তখন হইতেই তাহারা যেন বাগ্‌বদ্ধ এইরূপ বিবেচিত হয়।

বিবাহের দিনে, কনে সাদা কাপড় পরিধান করে ; জাপানীদের শোকের রং সাদা ; রংএর দ্বারা এইরূপ সঙ্কেত করা হয় যে, কনে তাহার নিজের পরিবারের পক্ষে এক প্রকার মৃত। মৃত ব্যক্তিকে ঘরের বাহির করিবার সময় যেরূপ ঘর ঝাঁটানো হয়, সেইরূপ কন্যা গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়ও ঝাঁট দেওয়া হয়। রাত্রি-সমাগমে, ঘটক ও তাহার স্ত্রী, কনেকে তাহার নূতন বাড়ীতে লইয়া যায়। বরের পরিবারের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলে, কনে তাহার সাদা কাপড় ছাড়িয়া ফেলে, এবং তাহার ভাবী স্বামী তাহাকে যে বস্ত্র উপহার দিয়াছিল সেই বস্ত্রটি পরিধান করে। তাহার পর বিবাহের ভোজ হয়, এই ভোজ বিবাহের একটী প্রধান অঙ্গ। নবদম্পতি তিন পেয়ালা সুরায় তাহাদের ওষ্ঠ আর্দ্র করে ; কনে এখন নিমন্ত্রণের কর্ত্রী, সুতরাং প্রথমে তাহাকেই সুরা পান করিতে হয়। ভোজের পর, নবদম্পতিকে বিবাহ কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। আবার ক্রমান্বয়ে নয়বার উহারা একএকটু সুরা পান করে। এইবার বর আগে পান করে, কেননা, এখন হইতে কনের উপর বরের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব।

তিন দিন পরে, নবদম্পতি কন্যার পিত্রালয়ে গমন করে। ইত্যবসরে, কনের আত্মীয়েরা জেলার কর্ত্তৃপক্ষকে বিবাহের সংবাদ দেয়। বিবাহের পর, নবদম্পতির ভ্রমণে বাহির হওয়ার প্রথা জাপানে প্রচলিত নাই।

সাধারণ লোকের মধ্যে এই অনুষ্ঠান অনেকটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে। তথা-কথিত বিবাহ অনেক সময় স্বাধীন মিলনের সাময়িক বন্দোবস্ত মাত্র।

একবার বিবাহ হইয়া গেলে, বিবাহিতা পত্নী শ্বশুরশাশুড়ীর দুহিতা বলিয়া বিবেচিত হয়। পতি ও শ্বশুরশাশুড়ী পত্নীর প্রণম্য ও পূজনীয়। পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধশান্তির অনুষ্ঠান যাহাতে বরাবর চলিতে পারে এই জন্য পুত্রসন্তান নিতান্তই আবশ্যক। যাহার পুত্র না হয়; সে দত্তক গ্রহণ করে; সেই দত্তককেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যায়, এইরূপে বংশ কখনই ধ্বংস হয় না। জাপানে সকল সমাজের মধ্যেই দত্তকগ্রহণ প্রথা খুবই প্রচলিত।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খুব জটিল ও গম্ভীর ধরণের। শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম ভেদে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার একটু ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। শিন্তোধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে শবকে আমাদের মত শবাধারে রাখিয়া গোর দেওয়া হয়। পুরোহিতদের বেশ বিন্যাস ও অদ্ভুত টুপি, শবদাহকদের সাদা কাপড়, এবং শ্মশানযাত্রাকালে যাত্রীদিগের হস্তে নিশান ও গাছের ডাল দেখিলেই বুঝা যায়, শিন্তোধর্ম্মাবলম্বীদের শব যাইতেছে। আবার, পুরোহিতদের টুপিহীন মুণ্ডিত মস্তক ও শবদাহকদের নীল বস্ত্র দেখিলেই বৌদ্ধশব বলিয়া চেনা যায়। বৌদ্ধ শবাধার সরু ও চৌকো; হাঁটু মাথায় এক করিয়া শবকে উহাতে বসাইয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ মনে করে, ইহা যোগাসনের অনুরূপ; আবার কেহ কেহ মনে করে,—মাতৃগর্ভে শিশু যে ভাবে অবস্থিতি করে ইহা তাঁহারই সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ।

শোকের সময়, সাদা কাপড় পরিতে হয়, মাংসাহারে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিতে হয়, মৃতদের সমাধিমন্দির দর্শন করিবার জন্য যাইতে হয়। সমাধিমন্দির দর্শনের জন্য কতকগুলি বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। মৃত্যুর পর সপ্তম ও পঞ্চত্রিংশৎ দিবস এবং প্রথম ও তৃতীয় সাংবৎসরিক দিবসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। শোকবস্ত্র কতদিন ধারণ করিতে হইবে, মৃত আত্মীয়ের সম্বন্ধ অনুসারে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত আছে। নিজের পিতামাতা কিংবা ধর্ম্মপিতামাতার জন্য তিন মাস, পতির জন্য ১৩ দিন, পত্নীর জন্য ৯০ দিন, পিতামহপিতামহীর জন্য ১৫০ দিন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য ৯০ দিন, অন্য সন্তানের জন্য ৩০ দিন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই সকল প্রথার সহিত য়ুরোপীয় প্রথার কোন সাদৃশ্য নাই। এমন কি, কোন কোন বিষয়ে জাপানী আচার ব্যবহার এত ভিন্ন, যে এই ভিন্নতা সম্বন্ধে সম্যকরূপে আলোচনা করিবার জন্য এক ব্যক্তি একটি পৃথক পুস্তক লিখিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা সেই পুস্তকের নাম দিয়াছেন —Japanese Topsyturvydom by Mrs. E.S Patton—"জাপানীর সব উল্টাপাল্টা"। এই উল্টাপাল্টার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাপানে, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কামরাগুলি বাড়ীর পিছনে থাকে; স্নানের পর জাপানীরা ভিজা গামছা দিয়া গা মোছে; ভোজনের পরে নহে—ভোজনের পূর্ব্বেই উহারা সুরাপান করে;

উহারা প্রথমেই মিষ্টান্ন ভোজন করে; ঘরে প্রবেশ করিবার সময় উহারা জুতা খুলিয়া আসে—টুপি খুলিয়া আসে না। ঘোড়-সওয়ার হইয়া উহারা রাস্তার দক্ষিণ পাশ দিয়া গমন করে; শেলাই করিবার সময় উহারা কাপড়ের উপর ছুঁচ না ফুটাইয়া ছুঁচের উপর কাপড় বিঁধাইয়া দেয়; আমাদের যে দিকে চাবি ঘোরে, উহাদের ঠিক তার উল্টা দিকে ঘোরে; অনেক যন্ত্রই উহারা উল্টাভাবে ব্যবহার করে; আমরা যাহাকে গ্রন্থের শেষ অংশ বলি, সেখান হইতেই উহাদের গ্রন্থ আরম্ভ হয়; আমরা যেখানে গ্রন্থের নাম লিখি, সেইখানে উঁহারা "সমাপ্ত" লেখে; পাদটীকাগুলি (ফুট নোট) পৃষ্ঠার উপরিভাগে লিখিত হয়—ইত্যাদি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অমরগুচ্ছ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি বালবিধবা। বিবাহের আনন্দ সঙ্গীত নীরব হইতে না হইতে নিরানন্দ ক্রন্দনে আমাদের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তখন শিশু বলিলেও হয়। আমার বয়স তখনও বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। পিতার সেই শোকপীড়িত মূর্ত্তি, মাতার সেই হৃদয়-বিদারক বিলাপধ্বনি মনে পড়িলে এখন আমি যন্ত্রণাকাতর হইয়া পড়ি, কিন্তু তখন সে সকল কিছুই আমার মর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই; নিজের পরিণাম বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত তখন আমার জন্মে নাই।

আমি পিতামাতার একটি মাত্র কন্যা; বড় সাধের আদরের কন্যা। আমার দুঃখে পিতা-মাতা আমাহইতেও অধিক কাতর। তাঁহাদের অজস্র করুণা শতসহস্রধারে অহরহ আমার প্রতি বর্ষিত, আমার কোন একটি সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তাঁহারা অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু এত আদর যত্নেও কি আমি সুখী?

বলা বাহুল্য, বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত আমি আর শ্বশুর গৃহে যাই নাই। বিধাতার বিধানে পিত্রালয়ই চিরদিন আমার আলয়। আহারে, সাজসজ্জায় পিতামাতা আমাকে এতদিন বিধবার আচার পালন করিতে দেন নাই। কিন্তু আমি বুঝিতে শিখিয়া অবধি তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিয়াও বিধবার আচার রক্ষা করিয়া চলি। ইহাতে লোকে আমাকে প্রশংসা করে, কিন্তু সেজন্য আমি চরিতার্থ জ্ঞান করি না। যাহার আসল সুখসম্পদ চলিয়া গিয়াছে, নকল সুখ সম্পদে তাহার তৃপ্তি কোথায়! তাহাতে কেবল অতিরিক্ত অনুতাপবেদনা জাগাইয়া তুলে। ভগবান আমাকে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তব্য পথে চলা আমার আয়ত্তাধীন, তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিব কেন?

স্বামীকে আমার মনে পড়ে না। যাহার অভাবে আমার সমস্ত জীবন শূন্য, তিনি কে তাহা

আমি ঠিক জানি না। তবুও তাঁহার স্মৃতিতে, তাঁহার ধ্যানে হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাই। ইহাই আমাদের আজন্ম শিক্ষা, চিরন্তন সংস্কার। তাহা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, পুণ্য কি পাপ সে তর্ক পর্য্যন্ত আমার মনে উদয় হয় না।—দুরাতীত সুখ স্বপ্নের ন্যায় কখনও কখনও বিবাহের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটি ছায়াময় মূর্ত্তি মনোপটে বিভাসিত হয়। তাহা জীবন্ত আকারে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দারুণ আকুলতা জন্মে। কিন্তু মনের আবেগ মনে রুদ্ধ করিয়া, অশ্রুমলিন নয়নের সমক্ষে তখন একখানি ফটোগ্রাফ আনিয়া ধরি।

ফটোগ্রাফ খানি আমার স্বামীদেবের, বহুদিনের তোলা, তাই রেখাবিলীন, অস্পষ্ট, লুপ্তসাদৃশ্য। এই ছবি তাঁহার একমাত্র স্মৃতি চিহ্ন, সুতরাং ইহার মত মূল্যবান বস্তু আমার আর কিছুই নাই। একটি ক্ষুদ্র চন্দনকাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে ইহা আমি বহু যত্নে তুলিয়া রাখি। বাক্সটি আমার শয়নকক্ষের কোলঙ্গায় থাকে। আমি যেখানেই যাই ইহাকে সঙ্গছাড়া করি না।

এই ছবিখানি অকুলসমুদ্রে ভাসমানা আমার জীবন তরণীর পক্ষে ধ্রুবতারা স্বরূপ। যে কারণেই হউক, যখন হৃদয়প্রাণ নিতান্ত শ্রান্তদুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস লোপ পায়, জীবন অসহ্য যন্ত্রণাময় এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার নিরাশা বলিয়া মনে হয়, তখন আমি এই ছবিখানি দেখি। ইহা কি সম্মোহন মন্ত্রপূতঃ জানি না, দেখিতে দেখিতে আমার দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইয়া উঠে, নৈরাশ্যাভিভূত প্রাণে আশা সঞ্চারিত হয়, অন্ধকার ভবিষ্যৎ আলোকরেখায় রঞ্জিত হইতে থাকে। মনে হয় ভগবান সত্যই নিষ্ঠুর নহেন; চির দুঃখ সংসারে নাই। অন্ধকার রজনী শেষে ঊষার আলোক অবশ্যম্ভাবী; প্রচণ্ড ঝটিকা-বসানে শান্তিমঙ্গল স্বতঃ উৎসারিত, আর এই বালিকার অদৃষ্টেই কি ভগবান চিরদুঃখ লিখি-য়াছেন! তাহা হইতেই পারে না। মনুষ্যের জীবন, জন্মজন্মান্তররূপ বৃহৎ উন্নতি গ্রন্থের এক একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ, এক পরিচ্ছেদে যদি বা হাহাকার অন্য পরিচ্ছেদে মহানন্দ। বিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আলয় নহে, হইতেই পারে না।

একবার আমি এই চন্দন বাক্সে আমার দেবপদতলে কতকগুলি ফুলঅর্ঘ্য রাখিয়াছিলাম। সচরাচর যেরূপ ফুলে লোকে দেবপূজা করে ইহা সেরূপ কোন ফুল নহে। জবার সৌন্দর্য্য কিম্বা গোলাপ বা শতদলের সুগন্ধ তাহাতে ছিল না। সেগুলি সামান্য শোভাময়, নির্গন্ধ, ক্ষুদ্র, পর্ব্বতকুসুম! সহজে শুখায় না তাই তাহার নাম অমর পুষ্প। আমাকে আনন্দদানের জন্য এক নির্ভীক হস্তে তাহা আহৃত হইয়াছিল।

আমি তখন বয়সে ষোড়শী, আমার ভ্রাতার সহিত নৈনিতাল পাহাড়ে বাস করি। দাদা পশ্চিম প্রদেশের সিভিলিয়ান, প্রায় প্রতি বৎসরেই গ্রীষ্মের সময় ছুটী লইয়া এইখানেই অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, দাদা দেশে ফিরিয়া বিদেশী আচার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যখন তাঁহার কাছে থাকি, ইংরাজের সহিত আমার আলাপ করিতে হয়। তবে এখানেও স্বদেশী পুরুষের নিকট আমি বাহির হই না।

সেদিন রবিবার। আহারান্তে আমরা কাচের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি। দাদা আরাম চৌকিতে শুইয়া গুড়গুড়ির নল টানিতে টানিতে ছবির কাগজ দেখিতেছেন—আর আমি তাঁহার পদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মোড়ায় বসিয়া, তাঁহার মুখনির্গত ধূমপুঞ্জের দিকে চাহিয়া তাহা হইতে নানারূপ ছবি সৃজনের প্রয়াস করিতেছি। এই সময় চাপরাশি আসিয়া দাদাকে একখানি কার্ড আনিয়া দিল। দাদা নাম পড়িয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, 'হাল্লো! কে এসেছে বল্ দেখি! এঞ্জেল্! সিপয়, তাঁকে এখানে আন।"

এঞ্জেল দাদার একটি বিলাতী বন্ধু। ইহাঁর গল্প দাদার মুখে যখন তখন শুনিতে পাই। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া আমিও আনন্দ সহকারে বলিলাম "মিষ্টার চাটার্য্যী, সত্য নাকি? তুমি দেখছি এবার তা হলে দেশে বসেই বিলাত উপভোগ করবে?"

এই বলিয়া আমি সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার মানসে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাদা আমার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "সে হবে না। তুই যেতে পাবিনে। এখানে ইংরাজের সঙ্গে দেখাশুনা করিস, আর এঞ্জেল আমার এত অন্তরঙ্গ বন্ধু—তার সঙ্গে দেখা না করলে সে কি মনে করবে বলদেখি? তোর থাকতেই হবে।"

এইরূপে আমি সেখানে রহিয়া গেলাম! অল্পক্ষণ পরেই দাদার বন্ধু গৃহাগত হইলেন এতদিন যাঁহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি, তাঁহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলাম।— ক্রমশঃ

শিশু।

শিশু তুমি! সাধু হয়ে জন্মেছ ধরায়,
যে দেখে তোমারে সেই তব গুণ গায়।
সোণা, মাটি তোমাকাছে সকলি সমান,
স্তুতি নিন্দা তুল্য, তথা মান অপমান।
যত পায় তত চায় সংসারী যে জন,
অল্পেতেই তুষ্ট তুমি, যোগীর মতন।
সহস্র সাধনা করে' আমরা না পাই,
স্বভাবে সে সব গুণ আছে তব ঠাঁই॥

ওই কচি মুখখানি আহা কি সুন্দর!
অদন্তের হাসি তাহে কিবা মনোহর।
কত বল ধরে খুকু, তোমার ক্রন্দন,
আমাদের কান্না শুধু অরণ্যে রোদন!
আধো আধো কথা তোর সুধা ঢালে প্রাণে,
—আমরা কতই বকি, কেবা তাহা মানে?
আমরা খাটিয়া মরি,—বেচারা গরীব,
—তোমারি সেবায় রত,—তুমিই মনীব!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—০—

লর্ড কর্জ্জন ও বর্ত্তমান অরাজকতা।

১৮৯৯ হইতে ১৯০৮।

লর্ড কর্জ্জন আগে লর্ডও ছিলেন না, ধনশালীও ছিলেন না। তিনি পারস্য দেশে গমন করিয়া তথাকার রীতিনীতি ও অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল কারণ। ইহা পাঠে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কোন রাজকার্য্য উপলক্ষে আমেরিকায় প্রেরণ করেন। সেখানে ওয়াসিংটন নগরে তৎকালের প্রেসিডেণ্ট ক্লিভল্যাণ্ডের হোয়াইটহাউস প্রাসাদে সেদেশের কোন ক্রোড়পতির কন্যা মিস লাইটারের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং পরে ইহাঁর পাণিগ্রহণে "রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব" একসঙ্গে লাভ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সৌভাগ্য দ্বারাই সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। এই বিবাহের ফলে দেশে আসিয়া তিনি ভারতের শাসনকর্তৃত্ব পদে বরিত ও লর্ড উপাধিরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতে আগমন করিলেন। ধনী-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে তদুপযোগী সমাদর, মর্য্যাদায় ভূষিত করিতে কর্জ্জনের কিরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল—দিল্লীর দরবার হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

তিব্বতে সৈন্যপ্রেরণ।

তিব্বতে সৈন্যপ্রেরণ লর্ড কর্জ্জনের একটি বিশেষ দুর্নীতি। তিব্বতদমন অভিপ্রায়ে কত অর্থ কত প্রাণ ধ্বংস হইল তাহার ঠিক নাই; কিন্তু শেষে ফললাভ হইল কি? কর্জ্জন বুঝিলেন, তিব্বতগ্রাস অসাধ্য, এবং সেই দুর্গম্য হিমপ্রদেশে বসবাস বা বাণিজ্যের আশাও দুরাশা মাত্র। তখন পণ্ডশ্রম বুঝিয়া মানে মানে সৈন্যগণ তিব্বতত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তিব্বত চীনের অধীনেই রহিয়া গেল।

কর্জ্জনকে বা ইংরাজনায়কদিগকে ধর্ত্তব্যরূপে এ নীতির ফলভোগ করিতে হইল না। গরীব ভারতবাসীই অকারণ ধনেপ্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এই দুর্নীতির পীড়ন সহ্য করিল। কিন্তু ইহাতে কি কর্জ্জনের চক্ষু ফুটিয়াছিল?

দিল্লীর দরবার।

১৯০৩

এমন জাঁকজমক সমারোহে ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন বাদসাহ দরবারমসনদে বসেন নাই। কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে, যুবরাজের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে, লর্ড কর্জ্জন আত্ম-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অভিনয় করিতে অবসর পাইয়া, জীবনের প্রধানতম ও প্রবলতম আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিয়া লইলেন। তখন রাজপুত্র ডিউক অফ্ কনোট সপত্নীক

এখানে আসিয়াছিলেন। দিল্লীতে দরবার উপলক্ষে বহুব্যয়ে নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদে কর্জ্জন সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন, আর রাজপুত্রের জন্য শিবির ব্যবস্থা হইল। দরবারে কর্জ্জন সস্ত্রীক স্বর্ণ সিংহাসনে আর ডিউক ও ডিউকপত্নী রৌপ্য সিংহাসনে বসিলেন। শাসনকর্ত্তা মণিময় অপূর্ব্বদর্শন ময়ূরপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, সস্ত্রীক সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের পূজা গ্রহণ করিলেন—আর রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূ তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহার অধিক সম্মান গর্ব্ব তাঁহার পক্ষে আর কি হইতে পারে? রাজপুত্রের প্রতি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে রাজভক্ত ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলেই সমভাবে ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল।

তাঁহার এই গর্ব্ব পরিতৃপ্তির জন্য, খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য ভারতের রক্ত শোষিত হইল। রাজন্যবর্গ ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রজাপীড়নে বাধ্য হইয়া পরস্পরকে জাঁকজমকে হারাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেশের টাকা জলের মত জলে গিয়া পড়িল।

ইহার পর ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইল। মহারাণীকে দেশের লোক আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করে; তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই প্রকৃত শোকময়, তাঁহার স্মৃতির জন্য কি রাজা কি প্রজা মুক্তহস্তে সাধ্যাতীত দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন ইহার সদ্ব্যবহার করিলেন না। যদি ভিক্টোরিয়াহলের পরিবর্ত্তে এই অর্থ, দেশের যথার্থ কোন উপকারকার্য্যে—দুর্ভিক্ষের জন্য বা শিক্ষার জন্য ব্যয় হইত তবেই, ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি সার্থক হইত, লর্ড কর্জ্জন সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইতেন।

ইউনিভার্সিটির আইন।

এই আইনের দ্বারা উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার মূল্য তিনি এত বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন যে সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে শিক্ষালাভ এখন দুরূহ। দেশের লোকে প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিল, কিন্তু প্রভু তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। আইন পাশ হইয়া গেল।

এই সঙ্গে রাজকীয় সংবাদপ্রচারনিবারণী আইন পাশ করিয়া রাজকার্য্যের যথাযথ সমালোচনা পর্য্যন্ত তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন—তাহাতে প্রাচ্যজাতির প্রতি যেরূপ অযথা নিন্দা বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার তীব্র জ্বালাও ভারতবাসী এখনো বিস্মৃত হয় নাই!

বঙ্গবিভাগ।

১৯০৪।

বঙ্গবিভাগ কর্জ্জনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ অমরকীর্ত্তি। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মিটিং করিয়া সমস্বরে এ সম্বন্ধে তাহাদের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল। তিনি সে আবেদনে, সে ক্রন্দনে

ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া এই দুর্নীতি কার্য্যে পরিণত করিলেন। বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল। দেশের লোক বজ্রাহত হইল। ইংরাজের ন্যায়বিচারে এতদিন যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাস টলিল। ইংরাজজাতির শাসনের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা ভ্রান্তি বলিয়া সকলের ভ্রম হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল লর্ড কর্জ্জনের শাসনে এইরূপে বঙ্গে সমূহ দুর্দ্দিন আনয়ন করিল।

বন্দেমাতরম্।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবরে বঙ্গবিভাগ হইল। সেদিন জাতীয় শোকপর্ব্বে নব উৎসবের সৃষ্টি। সেদিন বঙ্গের প্রতি বাজার, প্রতি দোকান বন্ধ, প্রতিগৃহে অরন্ধন; সকলে শোকউৎসবে এক হইয়া, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রাখি বাঁধিয়া, সমস্বরে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিল "বন্দেমাতরম্"। লর্ড কর্জ্জন তাঁহার দুর্নীতিতে ভারতে একতামন্ত্র জাগাইয়া দিলেন।

এই মন্ত্র উচ্চারণে বিদ্রোহিতা ছিলনা, তাহার অভিপ্রায়ও ছিল না; ছিল কেবল, সমস্বরে এই দুর্নীতির প্রতিবাদ, ইহাতে অসন্তুষ্টি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ, সকলে এক হইয়া দেশের হিতকল্পে কার্য্য করিবার এবং বিলাতী দ্রব্যের স্থলে দেশের দ্রব্য ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প।

অস্ত্রহীন শস্ত্রহীন এবং প্রধানতঃ ভারতের স্বল্পবুদ্ধি বালককণ্ঠে উচ্চারিত এই মন্ত্রে প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভীত-কম্পিত হইয়া উঠিলেন। কেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ভীরু বাঙ্গালীর এই মন্ত্র উচ্চারণ সহ্য করিতে না পারিয়া কর্জ্জন বোম্বাই হইতেই ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে তাঁহার সাহস হইল না। আসল কথা তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকে ভীত করিয়া তুলিল। তিনি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, লক্ষ কোটী প্রজার অন্তর্দাহ করিয়াছেন এই বোধই তাঁহাকে বঙ্গে মুখ দেখাইতে দিল না।

বরিসাল কন্‌ফারেন্স।

১৯০৫।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে লর্ড কর্জ্জন চলিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার রাজনীতি ভারতে স্থায়ী হইয়া গেল। তাঁহার ফলে, দেশের অসন্তুষ্টি, স্বদেশী আন্দোলন, ছাত্রগণের পথে ঘাটে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রোচ্চারণ বাড়িতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে ভীত হইলেন। শাসনকারী এবং শাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত পরিচয় থাকিলে গভর্ণমেণ্টের এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দেশের অবস্থা, দেশের লোককে প্রকৃত ভাবে জানেন না। অতএব এদেশের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিয়া বন্দেমাতরম্ উচ্চারণকারীদিগকে সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড দিতে লাগিলেন। বালকের কার্য্যে, কারণে অকারণে তাঁহারা বৃদ্ধের কার্য্যগুরুত্ব অর্পণ করিয়া বিষম শাসন আরম্ভ করিলেন। বিষময় ফল ফলিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে বরিসাল কন্‌ফারেন্স পুলিসের অন্যায় বাধাতে বন্ধ হইয়া গেল। নিরস্ত্র বালকগণ পুলিসের ভীষণ লগুড়াঘাতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। সেই সময় সেই অন্যায় পীড়নে একান্ত পীড়িত হইয়া বালক মনোমোহন সর্ব্বান্তঃকরণে অভিশাপ দিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়া আজ যে রক্তপাত করিলেন, এই রক্ত আমার ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃগণের দেহে একদিন প্রবল শক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া উঠিবে।

তখন একথা পীড়িতের আর্ত্তনাদ, পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ দেখিতেছি এইরূপ অত্যাচারঅবিচার শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মভীরু বঙ্গবালকগণকেও পাশ্চাত্য অরাজকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। বাহুবলহীন, পাঠানুরাগী, নিরীহ রাজভক্ত জাতিকেও জঘন্য বিদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজশাসন যে আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলকর, ইংরাজ রাজ্যলোপ কল্পনা করাও যে আমাদের পক্ষে অহিত জনক, এই ক্ষণিক অত্যাচারে তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া অবোধ বালকগণ হত্যারূপ পাপকার্য্য দ্বারা নিজের এবং দেশের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই! হায়! ইহা অপেক্ষা দেশের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে!

গভর্ণমেণ্টের প্রতি নিবেদন।

অন্যায় করিলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, পাপ করিলে দণ্ডভোগ অনিবার্য্য। গভর্ণমেণ্ট এই পাপলিপ্ত বালকগণকে শাস্তি দান করুন, সে বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। অপরাধীগণ অকাতরে অকুতোভয়ে তাহাদের স্বোপার্জ্জিত প্রাপ্যশাস্তি শিরোধার্য্য করুক, তাহাতেই দেশের মঙ্গল।

আমাদের কেবল গবভর্ণমেণ্টের প্রতি এইমাত্র নিবেদন, যাহারা এই রাজবিদ্রোহিতা-অপরাধে লিপ্ত, তাহারাই কি একমাত্র সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে এই কার্য্যের জন্য দায়ী? লর্ড কর্জ্জন প্রমুখ শাসনকর্ত্তাদিগের শাসননীতি কি এই কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট উত্তেজিত করে নাই? গভর্ণমেণ্ট আপনাকে বালকদিগের স্থলে একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। দেখিয়া, যাহাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলুন, ইহাই মাত্র আমাদের নিবেদন, আমাদের প্রার্থনা।

বাঙ্গালী স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ই[illegible]শাসনে শ্রদ্ধাশীল। যে কারণে তাহাদের মধ্যে কিয়দংশেরও এই আজন্মসংস্কার স্খলিত হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট সেই কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করুন; তাহা হইলেই রাজায় প্রজায়, পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন হইবে, অনুরাগের সম্পর্ক বর্দ্ধিত হইবে, অকারণ অমঙ্গল সমস্তই দুর হইয়া যাইবে।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে আমাদের কিরূপ হিতকারী তাহা যাঁহাদের কিছুমাত্র

স্থির বুদ্ধি আছে তাঁহারাই বুঝেন। আজ যদি ইংরাজ চলিয়া যান, আমরা কত বিপদে পড়িব কে বলিতে পারে? আমাদের চারিদিকে শত্রু; আজ আমরা যাহাদিগকে মিত্র মনে করিতেছি তখন তাহারাও শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা আপনারাই হয়ত তখন পরস্পরে খুনোখুনি করিয়া মরিব। কিন্তু আহত হইলে লোকের জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় লোক যুগযুগান্ত-আরাধনার বিজ্ঞতা, স্থৈর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। ইহাই সাধারণতঃ মনুষ্য স্বভাব। তবে সন্তান হইতে পিতার দায়িত্ব যেমন অধিক, প্রজা হইতে রাজার দায়িত্বও সেইরূপ গুরুতর। প্রতি কার্য্যে, প্রতি শাসনে সুনীতি সাম্যনীতি প্রকাশ দ্বারা রাজার প্রতি প্রজার বিশ্বাস স্থাপনের চেষ্টাই প্রকৃত রাজনীতি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য প্রাণাধিক সীতাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের আদর্শ রাজধর্ম্ম।

লর্ড কর্জ্জনের যথেচ্ছাচার নীতির পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট এই দিকে একটু লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই অচিরে শান্তি স্থাপন হইবে।

দুর্ভিক্ষে।

দাও মা খুলিয়া তব অক্ষয় ভাণ্ডার
হে জননি, অন্নপূর্ণা! দাও বরাভয়!
আজি লক্ষ লক্ষ প্রাণী—সন্তান তোমার—
হের মা তাদের দশা;—বিদরে হৃদয়!
করে তারা আর্ত্তনাদ অন্নের কারণে,—
বাঁচাও তাদের প্রাণ অন্ন বিতরণে!
না খেয়ে হয়েছে তারা অস্থিমাংসসার
কঙ্কালের মূর্ত্তি,—শুধু নিশ্বাস সঞ্চার!
দাও মা অভয় মন্ত্র সন্তানের কানে,
হাহাকার দূরে যাবে,—পুনঃ ধনে ধানে
পরিপূর্ণ বসুন্ধরা,—আনন্দে বিহ্বলা;—
আবার উঠিবে গীত "সুজলা সুফলা"!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

পথ ও পাথেয়।

জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে, তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হঠাৎ একটা ঘড়া উঠিল, এবং ঘড়ার মুখ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল, আরব্য উপন্যাসে এমনি একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে, এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এত বড় একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনো দিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষের নিমেষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যের সময় কথার এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সে জন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারিনা। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই অবিচলিত এবং নির্ব্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্দ্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করেনা কিন্তু সঙ্কটের দিনে তাহার মত শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে, দুর্ব্বল চিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্যকে ভুলাইবার জন্য কেবল কতকগুলা ব্যর্থ বাক্যের ধূলা উড়াইয়া আমাদের চারিদিকের আবিল আকাশকে আরো অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চঞ্চলতাকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোন প্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে—অতএব অদ্যকার দিনে হৃদয়াবেগ প্রকাশের উত্তেজনা সম্বরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্ত্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি ইহার মধ্যে নাই; এ কেবল অমুক দলের কীর্ত্তি; এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি এসব ভাল হইতেছে না; আমিত জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে।"

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্ব্বলতার পরিচয় সুতরাং

লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এই জন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালমানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন একটা হীনতা আসিয়া পড়েই—অতএব দুর্ব্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভাল।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্ম্মম রাজদণ্ড যাহাদের পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর কিছু বিচার না করিয়া কেবল মাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা। তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডলাঘবতার দিকে বিচলিত করিবে না। অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীরু স্বভাবের নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইবে। ব্যাপারটাকে আমরা যেমনি দোষাবহ বলিয়া মনে করিনা কেন, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্ভ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব কেন? সমস্ত দেশের মাথার উপরকার আকাশে যখন একটা রুদ্ররোষ রক্তবর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন একপ্রকার অসঙ্গত।

যিনি নিজেকে যতই দুরদর্শী বলিয়া মনে করুন না একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই। বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যুনাধিক পরিমাণে আছে কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্ব্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন একথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে। এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভৎসনা করিয়া বলা সহজ যে তোমরা যদি এতটা দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভাল হইত।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালী, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারিনা এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই। ইহা লইয়া বাবুসম্প্রদায় বিশেষ ভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভাষায় খোঁটা খাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলা দেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রু মিত্র কাহারো কোনো সন্দেহমাত্র ছিলনা! তাই এপর্য্যন্ত কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গিতে আমরা যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো বা পর কখনো বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালী বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্দ্ধাবাক্য বাহির হইত তখন

এই বলিয়াই বিশেষ ভাবে স্বজাতির জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরো উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র।

অতএব এ কথাটা সত্য যে, বাংলা দেশের মনের জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে প্রকার অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোনোদিন অনুমান করেন নাই। অতএব আজ আমাদের এই অকস্মাৎ বুদ্ধিবিকাশের দিনে, যাহাকে আমার ভাল লাগেনা তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচারসঙ্গত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাইনা। কিন্তু কেমন করিয়া কি ঘটিল এবং তাহার ফলাফলটা কি সেটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয়, তবে দয়া করিয়া একথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন, যে আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাববশতঃ যে আমি বিচারে ভুল করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদিবা গ্রাহ্য নাও করেন আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিবেন।

বাংলা দেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন্ বাঙালীর কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। অতএব যে চিত্তদাহ কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতিভেদে যাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানাপ্রকারে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এই প্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালীমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। আমরা কি করিব কি করিতে চাই সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জানি আমাদের মনে আগুন জ্বলিয়াছিল; সেই আগুন স্বভাবধর্ম্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্‌খানে কেরোসিন্ ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হোক্, কার্য্যকারণের পরস্পরের যোগে পরস্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক না কেন তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষতঃ কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই; লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্ব্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরো প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্ত্তমান সঙ্কটে রাজপুরুষদের কি করা কর্ত্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুরাশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতি পুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে ভুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা—কথা আরো একটু আছে, ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে সময়বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাত্ত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া—অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; একদিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্ত্তি ধরিতেছে, অন্য দিকে দুর্ব্বলের নিরাশ মনোরথ সফলতার কোনোপথ না পাইয়া প্রতি দিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে;—এ অবস্থায় সমস্যাটি ছোট নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুক চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেয়ালে চলিতেছে; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে;—মাঝি সহায় যদি হয় তবে ভালই, যদি নাও হয় তবু দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্যকে গালি পাড়িয়া কোনো সান্ত্বনা পাইবনা।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলে খেলা করা মাত্র। আমরা গবর্মেণ্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি এ সমস্ত কিছুই নয় এ কেবল দুই পাঁচ জন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি ত এ প্রকার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত এরূপ ফুৎকার-বায়ুমাত্রে আমরা গবর্মেণ্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও ফিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোথায় কি হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ববোধবিহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো সত্যকার সঙ্কটকে ঠেকানো যায় না—এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে

হইবে গবর্মেণ্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক্ এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনি মথিত করিতে থাক্ আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম্মনীতির স্থান আছে এ কথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্ম্মকে মান্য করা কার্য্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; তৎসত্ত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্ব্বলকে ধর্ম্ম মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয় এ ত ধর্ম্ম মানা নয় এ ভয়কে মানা।

অল্প দিন হইল যে বোয়ার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্ম্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে কথা কোনো কোনো ধর্ম্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘর দুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া নির্ব্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "মার্শাল ল" শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষ্যে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্ব্ব প্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ পুলিসের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্ব্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্ব্বরতাও এই জাতীয়। এই সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকার্য্যে বিশুদ্ধ ন্যায়ধর্ম্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোন অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্ব্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিকে নহে কর্ম্মবুদ্ধিকেও বিসর্জ্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এই জন্য দায়ী করা বলদর্পে অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে সকল লোক গুপ্ত পন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোন ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্ত্তমান, এ যুগে ধর্ম্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্যভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্ম্মভ্রংশতার যা দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্ব্বল, ধনী ও

শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্ম্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত সঙ্কটে পড়িয়া মানুষ যেদিন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, অধর্ম্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই বাঁধা গোলামী করে তাহা নহে, সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে এক-যোগে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রফা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্ম্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্ম্মকে জয়ী করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহের, বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক্ হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে এক দিন দিক্ হারাইয়া শেষে পথও পাইবনা কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনো দিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান জিনিষটা যে কতই বড় এবং কত দিকেই যে তাহার অগণ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত সে কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মত নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন একটি সুমহৎ কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানবসমাজের এত বড় একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে তাহার মাহাত্ম্য যেন এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোন প্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড় বড় শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকল গুলিরই কোনো না কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্মৃতির অতীতকালে কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্ণিবার তাড়নায় যে দিন আর্য্যজাতি গিরিগুহামুক্ত স্রোতস্বিনীর মত অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন সেই দিন ভারতবর্ষের আর্য্যঅনার্য্যসম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের উপ-ক্রমণিকা গান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে? বিধাতা কি তাহা শিশুর ধূলাঘর নির্ম্মাণের মতই আজ হঠাৎ অনাদরে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন?

তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভারগম্ভীর মেঘমন্দ্রের মত ধ্বনিত হইয়া এসিয়ার পূর্ব্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মঙ্গোলিয় জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূর জাপান পর্য্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম করিয়া দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যুদয় কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই পরিণামহীন পণ্ডতাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে? তাহার পরে এসিয়ার পশ্চিমতমপ্রান্তে দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল; সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি কোন একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র? ইহার মধ্যে নিত্য সত্যের কোন চির পরিচয় নাই? তাহার পরে য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটী বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। ভারতবর্ষে এক একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র নহে,—ইহারা পরস্পর গ্রথিত,—ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মত অন্তর্দ্ধান করে নাই,—ইহারা সকলেই রহিয়াছে; ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো দেশেই এত বড় বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই,—এত জাতি এত ধর্ম্ম এত শক্তি কোন তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই;—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্ব্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক প্রতাপ বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে, ব্রহ্মকে, জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্ম্মশালার কঠোর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক্—ভারত ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খৃষ্টান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে,—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানাদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিবেন না—ইহার মধ্যে যে বহুতর আপত্তি বিরোধ

লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না—করিলেও কোনো মতেই কৃতকার্য্য হইবেন না একথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্য্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জদ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাট নিত্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে—সমস্ত আঘাত অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতন-ভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ অধৈর্য্য অহঙ্কারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারতবিধাতার পদতলে নিজের নির্ম্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতীয় উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিত কোথায়? তাঁহারা যেখানেই থাকুন্ এ কথা আপনারা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবেন তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্ম্মনির্দ্দেশশূন্য স্পর্দ্ধাবাক্যের দ্বারা দেশের লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না—নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায় কোন একটা বিশেষ ঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া একমুহূর্ত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয় নিশ্চয় বুঝিতে হইবে হৃদয়াবেগকেই একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গমপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্ত-ভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থাগতিকেই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকার চেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমত বিচার করিয়া লওয়া বড় কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোন বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে 'অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে

প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাইনা বলিয়া আমরা মনে করি বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূলকারণ এবং উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহ্যভাবে দেখিয়া একথা ভুলিলে চলিবেনা যে, যে দেশের মর্ম্ম-স্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্ম্মকেই তাহাদের সৃজনী-শক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্ব্বিচার বিপ্লব, কোনমতেই কল্যাণ-কর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া গেল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আর কিছু না হউক সে জাহাজের খোলের তক্তাগুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না; যদি বা পূর্ব্বে ছিল এমন হয় তবে নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকার অলক্ষ্যে বসিয়া সে গুলা সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আল্গা তক্তার উপরে আর একটা আল্গা তক্তা ঠক্ঠক্ করিয়া আঘাত করিতে থাকে ঐ দম্কা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্ব্বনেশে জিনিষ নয়? আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই কি হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না? ভিতরে যখন এমন সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া ঢেউ বাঁচাইয়া স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি উত্তেজনাকে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়?

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি তখন আমাদের দেশের কোন দুর্ব্বলতা কোন ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি। আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধ মাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই যে কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এই প্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখিবার জন্য আর কোন গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই

চাহি না, অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি সে সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিম্বা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মত একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছে তখন তাহার মত মর্ম্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কি আছে! এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিবনা। ইহার মধ্যে মানব প্রকৃতির যে পরম দুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে বারম্বার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাইহোক, যেমন করিয়াই হোক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর হয় তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্ত্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্য্যে নানা উপকরণে নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সঙ্কীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেষিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই সুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে আরো অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যাদ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্য্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করেনা; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা

সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে যে মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ অবস্থায় মালীর উপর তাহার রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোট কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোন সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহার আধার গড়িতে হয়, শলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ প্রদীপের মুখে আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপরচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্য মাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে এমন করিয়া কখনই ঘরে আলো জ্বলিবে না কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। একথা ভুলিয়া যায় যে এই অস্বাভাবিক সুলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর একদিক দিয়া এমন করিয়া কষিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয় যে, গোড়াতেই তাহার দুর্ম্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত শস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধনবুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মত দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভাল জিনিষের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তাঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্যজ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধন প্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-শস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলি বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলি

সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি; সেটা রীতিমত পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোট নজরের লোক—তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলি ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম; মন্ত্র এই হইল—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছাসই সাধনা, "মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোন কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্ম্মের বাধা বিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাইত কর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি যে তাহার চেয়ে বড়। এই জন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারেনা। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্ম্মোৎসাহী প্রভুকেই বর্ত্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তাঁহারত সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাঁহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। এঞ্জিনে ষ্টিমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন জিজ্ঞাসা করা যায়, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে তখন আমরা উত্তর করি এ সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই—সময় কালে আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে—মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এঞ্জিনে দমই চড়াইতে থাকিব।

এ পর্য্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয় ত আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভফল প্রত্যাশা করিবার নাই?

নাই এমন কথা আমি কখনই মনে করিনা। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে

কি করিতে হইবে? কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষীণ প্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়াই দেয়; যে সকল সত্যকর্ম্মে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ জিনিষটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মত কাজ করে—তাহার অতিরিক্ত উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্ম্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য প্রথম যে একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্ম্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে, বিধাতানির্দ্দিষ্ট আমাদের সেই বিনাচেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো বা বন্দনা করিতাম কখনো বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত জগৎ আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল!

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল, আগেকার মত পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্য নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম, যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার ফল পাইতে থাকিব, এখনো ভাবিতেছি ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে, দুয়ের সামঞ্জস্য করিব কি করিয়া? ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাঁধিয়া? কিন্তু অভিমান দেরি সহিতে পারেনা, মত্ততা বলে আমার সিঁড়ির দরকার নাই আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধ্য সাধন ত সকলেই পারে অসাধ্য সাধনে আমরা এখনি জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজ

করিতেই চায়, সে ছোট্ হইতে বড় কিছুকেই অবজ্ঞা করেনা, কোনো কর্ত্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘুচেনা। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায় সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমান মাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে আমি হাঁটিয়া চলিবনা আমি ডিঙাইয়া চলিব। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য সকলের পক্ষেই যাহা খাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, ধৈর্য্যের প্রয়োজন নাই, অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি পরের শক্তির প্রতি গতকল্য অন্ধভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা লইয়া আস্ফালন করিতেছি। তখনো যথাবিহিত কর্ম্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল এখনো সেই চেষ্টাই বর্ত্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল ক্ষেতের ধারেও যায় নাই, বাপ চাষ করিত তাহারা দিব্য খাইত—বাপ যখন মরিল তখন ক্ষেতে নামিতে বাধ্য হইল কিন্তু চাষ করিবার জন্য নহে—তাহারা স্থির করিল মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ কথা শিখিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি একথা সহজে না শিখি যে দৈবধন কোনো অদ্ভুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সে ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে—তবে আঘাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপথে যতই অগ্রসর হইব ফিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অধৈর্য্য বা অজ্ঞানবশতঃ স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি নষ্ট হয়;—তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়—তখন ছোট ছোট বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্ম্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতি সুকুমার ছোট ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—দুঃখ আরো কত সহ্য করিতে হইবে জানিনা।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে কিন্তু দুর্ম্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্ম্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়;—ন্যায়ধর্ম্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্ম্মের স্থিরতা থাকেনা—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মব্যবস্থার সঙ্গে

আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে একথা নম্র হৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তি দ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারো পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

আমরা সাধ্যমত বিলাতী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্ব্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম—

নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে,—
মোটাবস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে;—

তখন লর্ড কর্জ্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্ব্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশীপণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি, দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যত বড় কাজই হউক্ লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে একথা আমি কোনো মতেই স্বীকার করিতে পারিনা। বিলম্ব ভাল, প্রতিকূলতা ভাল, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা, কর্ম্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন কোনো ইন্দ্রজাল ভাল নহে যাহা একরাত্রে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বাস দিয়া বলে আমাকে উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু হায়, মনে না কি ভয় আছে যে এক-মুহূর্ত্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টরের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য, অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই; সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায় আমরা পথ বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারিদিক হইতে সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসবিহীন দুর্ব্বলতা, স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভবুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতি সত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতালাভ করিব ইহা কখনো হইতেই পারেনা একথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানিনা এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট্ ব্যাপারটা অনেকস্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্যের নামে যখন অকর্ত্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেই জন্যই স্বাধীনতা-লাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতাধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি;—দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্ব্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্ম্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্ব লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামী শাসনপত্র সময় বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীন ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত প্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমরাও মতপ্রচার করিতে চাই কিন্তু আর সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ সৃজনশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই ত চারিদিকে! নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনো মতেই আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এদেশের পরাধীনতা মাথাধরার মত ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মত ইংরেজ গবর্মেণ্টরূপে বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে—ঐটেকেই যে কোনো-প্রকারে হোক্ টান মারিয়া ফেলিলেই পরমুহূর্ত্তে আমরা হাল্কা হইব। এত সহজ নহে! ইংরেজগবর্মেণ্ট আমাদের পরাধীনতা নয় তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণমাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমল দিবার মত অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগ সত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া

স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজরল্যাণ্ডেও ত একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে?

এমনতর নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি কিন্তু বিধাতার চোখে ধূলা দিতে পারিব না; বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য ত নানাপ্রকারে থাকে—যে পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে ত দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কিনা। সুইজর্ল্যাণ্ড যদি নানাজাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্ত্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্য-ধর্ম্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোট বড় বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া ত নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখিনা। চক্ষু বুজিয়া একথা বলিলে ধর্ম্ম শুনিবেনা যে আমাদের আর সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে কোনো মতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালীতে পাঞ্জাবীতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে একস্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্ম্ম-বশত ঘটে নাই—পরজাতির একশাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এম্নি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন ত বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না! অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা না কি গাছের অঙ্গ নহে এইজন্য যেমন ভাবেই থাক্, যত উপকারই করুক, সে ত গাছকে পীড়া দিবেই কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনি ঐ দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ঐ জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণ যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ কথা নিশ্চয় বলা যায় জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজশাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরেই জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত

করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটন-মূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজ ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে হইবে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্ব্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্ম্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোট বড় সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতররূপে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

একথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখনি চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনি এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি ত এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকেই ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

"ততদিনে যেমন করিয়া হৌক্ একটা কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই, আপাতত এই ভাবেই চলুক্" এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগ দ্বেষ ও ইচ্ছা অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রাষ্টি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় ব্যতীত ন্যস্ত ধনকে নিজের ইচ্ছামত যেমন তেমন করিয়া খাটাইতে পারেন না তেমনি দেশ যখন বহু লোকের এবং বহু কালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদূরদর্শী আপাতবুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারো নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতর নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্ত্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কর্ম্মের ফল যে আমার একলার নহে, দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারম্বার বলিয়াছি এবং বারম্বার বলিব—শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপদগ্ধ তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেল;—কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বত্র বিস্তৃত কর—এমন উদার করিয়া এত দূর বিস্তৃত কর যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু

মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে কিন্তু কখনই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না,—আমরা জয়ী হইবই,—বাধার উপরে উন্মাদের মত নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে কার্য্যসিদ্ধির সত্য সাধনাকে দেশের মধ্যে চির দিনের মত সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তর পুরুষদের জন্য শক্তিচালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ঐ যে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া জানিও না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়! কত যুগ হইতে কত বিপ্লবের আবর্ত্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ দেশের সিংহদ্বারে কত বড় বড় রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, অদ্যকার ক্ষুদ্র দিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সম্মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে? ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্ত্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎ লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানব চিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসঙ্কুল—এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতি বৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগম্ভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদিগকে দান করিবেন না? যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে, যাহারা দূর

হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্গার করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ুদ্বারা স্ফীত সংবাদ পত্রের মর্ম্মরধ্বনি—সেই বিলাতের টাইম্‌স্ অথবা টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়ার বিদ্বেষতীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশাঘাতের মত আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে? আর ইহা অপেক্ষা সত্যতর নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্রমুখ দিয়া কি এদেশে উচ্চারিত হয় নাই যে বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে? সেই সকল শান্তিগম্ভীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব—আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব তাহাতে শত্রুমিত্রে ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে, ক্ষমার বীর্য্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ আমরা তাহাকে কখনই অসাধ্য বলিয়া জানিব না—তাহাকে নিশ্চিতমঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইব। দুঃখ বেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ ভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া ও না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য্য মন্দির নানা ধর্ম্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব—নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টি-শক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্য্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে ভারতবর্ষের এই আভ্যন্তরিক অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই একসত্য সেই নিত্যসত্যকে দেখিতে পাইব ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন, স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্—তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে—তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্।—সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্যরক্ষার যিনি সেতু, ইঁহারই নাম সত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ণিমা-উপহার।

দিবসের গৃহকাজ সাঙ্গ করি দিয়ে,
এস, লক্ষ্মি, হাসিমুখে, এস কাছে, প্রিয়ে,
আমাদের দুজনার নিভৃত মন্দিরে,
নিঃশব্দে চরণে এস, হৃদয়ের তীরে!
সুখ-সুপ্ত বিশ্ব আজ মধুর স্বপনে,
আমরা কাটাব রাতি শুধু জাগরণে!
জ্যোৎস্নালোকে দুজনায় চাব মুখোমুখী
পরিপূর্ণ সুগভীর সুখে হ'ব সুখী।

দুখানি বাহুর মালা দিব পরাইয়া
তোমার ললিত কণ্ঠে; মধুর হাসিয়া,
তুমিও পরায়ে দিয়ো আলিঙ্গন-মালা
নীরবে আমার গলে;—অয়ি মুগ্ধাবালা!
কেহ কবনাক কথা; দুখানি হৃদয়
শুধু যুগ-যুগান্তের লবে পরিচয়!

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পুষ্পমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৫).

সেই দেশে যে, এক অজগর শঙ্খিনী, ক্ষেত ভাঙ্গে, খোলা ভাঙ্গে, গরু গোয়াল মনুষ্য খায়। খাইতে খাইতে প্রায় সব উজাড় করিল,—শঙ্খের এক এক ডাকে সাত গাঁয়ের মানুষ মূর্চ্ছা যায়। অজগর কেহই মারিতে পারেনা। রাজা বলিলেন,—"আট প্রহরের অষ্টঢালী সিপাই এই শঙ্খিনী যে, তোমাকে মারিতে হইবে।"

একদিন, দুইদিন, তিনদিন যায়, শঙ্খিনীর শব্দ শুনে কন্যা, শঙ্খিনীর খোঁজ আর পায়না। রাজ রাজত্ব উজাড়—যায় যায়;—অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে কন্যা জানিল, এক সরোবরে যে সেই শঙ্খিনী জল খাইতে আসে। তখন আট প্রহরের অষ্টঢালী বলিল,—"মহারাজ, এ ভাবে তো হইবেনা; আপনি আট দরজায় পাহারা দিন, তিন, দিন তিন রাত্রি আমার খোঁজ নিবেন না, আমি শঙ্খিনী মারিতে চলিলাম।"

কন্যা, রাজপুরীর বাহির সেই সরোবরের পাড়ে, তিন দিন তিন রাত্রির খোরাক নিয়া, গাছের উপর বসিয়া রহিলেন।

এক রাত্রি গেল, পরের দিনও গেল; রাত্রে, সেই অজগর যে, সাত শঙ্খে ডাক ফুকারিয়া সেই সরোবরের জল খাইতে আসিতেছে।

কন্যা শুনেন দূরে থেকেই, গাছ মড়্ মড়্ হাড় কড়্ কড়্,—বন জঙ্গল শাল তাল, যত গাছের ছাল ডাল, লেজের দাপ্‌টে উড়াইয়া নিয়া, শঙ্খিনী আসিয়া, পাড় পাহাড় ধ্বসাইয়া সরোবরের জলে নামিল।

তিন শোষে সরোবর 'কর্দ্দমশেষ' ছাড়িয়া, আবার শঙ্খিনী সোঁ সোঁ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতে কন্যা নামিয়া, যত মাটীর গাছ তুলিয়া মূল যোড়ন বাঁধন দিলেন, পড়ন্ত গাছে ঠেকা দিলেন, জীবন্ত যত গাছ, মূল সমানে তরোয়াল খানা এম্‌নি করিয়া পোঁচ্ দিলেন, যে, গাছ নড়ে তো গাছ পড়েনা; দিয়া, কন্যা আস্তে ধীরে খাওয়া দাওয়া করিয়া, আবার এক গাছে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাত্রে, আবার সেই শঙ্খিনী জলের তিয়াসে, আজ আসিতেই, আশে ঠেকে পাশে ঠেকে—হড়্ হড়্ মড়্ মড়্ বনের যত গাছ ছুঁইতে না ছুঁইতে, কাঁপিয়া ঝাঁপিয়া; ফণার নিকাশ না দিয়া, শঙ্খিনীর সাত পেঁচ চাপিয়া নিয়া পড়িল।

আর যায় কি,—হাজার পাঁজর থরে ভাঙ্গা, শঙ্খের শঙ্খ চুর, বিষ দাঁতে বিষ পুর, জিভের ফলা লেলিয়া পড়ে, ডাক ছাড়িয়া শঙ্খিনী, জড়া-জাপ্টা কুণ্ডলী পাড় পাহাড়ী নিয়া পড়িয়া

গেল, অমনি কন্যা, লাফ দিয়া নামিয়া শাণতরোয়াল শঙ্খিনীর ফলার চক্রে বসাইয়া দিলেন।

ওমা! অজগর না শঙ্খিনী, সাপের মূর্ত্তি যাদুকরী, অর্দ্ধেকখানা সাপ, অর্দ্ধেক খানা, সে-ই-মালিনী!! কন্যা, চীৎকার দিয়া উঠিলেন।

মালিনী বলিল,—"পুরুষ বেশে কোন্ সতী, যে হও সে হও, পাপের জন্মে মুক্তি নিলাম, তোমার হাতে নরকের দুয়ার এড়াইলাম।"

কন্যা থতমত, বলিলেন,—"সাপ দেখি না পাপ দেখি, মালিনী তবে তুমি কে?"

কাঁদিয়া মালিনী বলিল,—

(গীত)

"আপনি তিন সত্য করিলাম, আপন সত্য ভেঙ্গেছিলাম
মাগো, আমি! কোটালিনীর সাথে,
নিশিরাত্রে কন্যা খাইলাম মালিনী হইয়া জন্ম নিলাম,
সর্প হইয়া রাজ্য খাইলাম মা—
ওরে, মুক্তি হইলাম তোমার হাতে।"

আছাড় খাইয়া কন্যা মাটীতে পড়িয়া গেলেন।—

(গীত)

মাগো, এই না মায়ের বুকের দুধে, এই না মায়ের কোলে
ওরে এত যে বড় হইলাম রে আমি হায়রে!—
ওরে হায় হায় বিধিরে আমার!"

মালিনী বলিল,—"মা, তবে তুই আমার পুষ্প? বুকের ধন চোকের তারা তবে মা তোরে পাইলাম?—উঠ্ মা, সত্য যদি রাখিয়াছিস্, চোকের জল মোছ্, আর আমার নরক নাই। এই মা, সাপের মাথার শঙ্খ নে, কাটা ফণা তুলিয়া নে; এই ফুলের ডালা দিলাম; ফণা শঙ্খ রাজাকে দেখা'স্ আর এই ফুলের ডালা নিয়া।—

(গীত)

ওরে, সিপাই কোটাল, দেখিলেই আমি রে—
ওরে, মনের দুঃখে হায়,
ছাগল ভেড়া করে'রে আমি রেখেছি মন্দুরায়!—
ওরে কোটাল মত!

তাহার হাজার পাঁচ এক ছাগল সাপ হ'য়ে আমি পেটে দিয়াছি; বাকী শেষ এক ছাগল আছে আর সেই হাজার পাঁচ এক ছাগলের হাড় আছে, এই ফুলের ডালা নিয়া ভেড়ার মাথায় ফুল দিস্, হাড়ে ফুলের জল দিস্, দিয়া, সকলের মুক্তি দিস্।" বলিতে বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে মালিনী মাটীতে পড়িয়া গেল, আর মাটীর শরীর মাটীতে

মিশিল;—বনে বনফুলের এক গাছ কেবল ফুটিয়া রহিল! মাটী লুটাইয়া পুষ্পমালা কাঁদিতে লাগিলেন।

আর কাঁদিয়া কাটিয়া কি? চোকের জলে পথ বাধে, উকু ধুকু কন্যা রাজপুরীর পথে চলিলেন।

পুরীতে পৌঁছিয়া দেখেন, তখনো রাত আছে, চোকের জলধারা ছুটে, গা গতর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কন্যার কিবা স্থান কিবা ঠাঁই! ফুলের সাজিখান বুকে টানিয়া রাজমালঞ্চের এককোণে শয়ন নিলেন।

শুইতে শুইতেই কন্যার ঘুম আসিল।

মালিনীর মালী যে, ফল ফুল নিতে আসিয়া দেখে, সিপাইর পাশে শঙ্খিনীর সাত শঙ্খ ফণা। মালী ফুলের তলে ফণা নিয়া একেবারে রাজদুয়ারে হাজির দিল।—"মহারাজ কি সিপাই পাঠাইয়াছিলেন,—সে বেটা অষ্টঢালে ঢাল মাপে; ঢাল ঢুাল মোহর নেয়, আরাম করিয়া মালঞ্চে ঘুমায়;—এই দেখুন, রাজার রাজ্যের বৈরী অজগর শঙ্খিনী যে, আমি মারিয়া আনিয়াছি।"

রাজা বলিলেন,—"তাইতো! সাবাস্ মালী সাবাস্! কৈ সে সিপাই, তার গর্দ্দান দাও।"

"হা রে অষ্টদিনের অষ্টঢালী! এই মুখে আবার চা'র চৌষট্টি রণ!" সকল সিপাই আসিয়া কন্যার তাজ পোষাক ধরিয়া টান মারিল।

(গীত)

ওরে, খুলে' এলায় মাথায় বেণী, খুলে' এলায় বেশ রে শ্যাম!
দাঁড় কাকের ঠোঁটেতে যেমন, ফাটে ওরে, বর্ণ চোরা আম রে!
যেমন, শেওলা দলে পদ্মের বনরে, ডাঁটায় ডাঁটায় কাটা,
ওরে, ভোম্‌রায় ছুইতে পদ্ম ফোটেরে, জলে জোয়ার ভাটা
রে পুষ্পমালা!

চমকিয়া কন্যা উঠিয়া দেখেন,—যাঃ! লজ্জায় মাথা হেঁট মুখখান রাঙ্গা, কন্যা বলেন,—"ভাই সিপাই, যা' হইবার তা'তো হইল; তোমরা ভাই আমার ভাই বাপ, আমার সঙ্কটে তোমরা দাঁড়াবে কি না দাঁড়াবে?"

বুড়া সিপাই বলিল,—"হাঁমা, রাজার বিচারে যদি মাথা থাকে, তো আমরা তোমার আছি।"

তখন কন্যা, যে সাজ খুলিয়াছেন সে সাজ আর পরিলেন না, মাথা নীচু করিয়া ফুলের ডালা নিয়া রাজসভায় চলিলেন!

(১৬)

রাজার রাজসভা, ঢালী আছে, মালী আছে, সভাজন পাত্রমিত্র সকল নিয়া, রাজা সভা করিয়া বসিয়া আছেন, কন[illegible] নিয়া সিপাইরা সভায় খাড়া হইল।

রাজা তো দেখিয়াই অবাক!—"মালি, তোমার সিপাই কৈ? এ যে কার অঙ্কের ঘরণী!"

সকল সিপাই বলিল,—"মহারাজ, এই সেই সিপাই।"

রাজা মাথায় চাপড় গালে হাত, বলিলেন,—"কার ঘরের কাল সাপ, তুমি ঘরে কালী, বাহিরে কালী, নাম নিয়াছ অষ্টচালী, আগুনের আগুন, যমের যম, তুমি কার ঘরের আগুন কার ঘরে দিয়েছ, ভাণ্ডার লুটে নিয়েছ; কন্যা, তুমি ধন পাবেনা জন পাবেনা, আমার রাজ্যের বাহির হও।"

মুখ তুলিয়া কন্যা বলিলেন,—"মহারাজ, অরক্ষিতের বাপ মা, কথার মত কথা যদি হয়, তো, সে সব কথা মাথায় করি। তা, যখন বলিলেন, রাজ্যের আমি বাহির হ'ব; কিন্তু মহারাজ, আপনার মালীর কাছে একটী ছাগল আছে, হাজার পাঁচ এক ছাগলের হাড় আছে, তাহা পাইলেই আমি যাই।"

রাজা বলিলেন,—"মালী?"

মালী বলিলেন,—"মহারাজ, মিথ্যাকথা!"

কন্যা বলিলেন'—"মহারাজ, আচার বিচার রাজমুকুট,—শঙ্খিনী যে কাটিল তার কথা মিথ্যা, না, মালঞ্চে যে কুড়াইল তার কথা মিথ্যা?"

রাজা দেখিলেন,—"তাইতো! তবে শঙ্খিনী মালী কাটে নাই? বলিলেন,—"আচ্ছা পাইক বেহারা কে খাড়া? মালীর ঘরে কি আছে, আন।"

জনে জনে পাইক বেহারা ছুটিল। কন্যা বলিলেন, "মহারাজ, আজ থেকে চারদিন আমার ব্রত, চা'রদিনের দিন যে, মালীর ঘরের জিনিষ পাতি রাজ আঙ্গিনায় সারি দেওয়াইবেন।"

(১৭)

তারপর, সেই চা'রদিনের দিন তো এল।

ব্রতের যত যোগাড় নিয়া লোক জন সব বসিয়া আছে; হাজার পাঁচ এক ছাগলের হাড় সার'বন্দী আর কোটাল ছাগল যে, সকলের সামনে।

রাজা ডাক দিলেন,—"সিপাই না ঢালী কা'র কুলের কালী,—চা'রদিনের সুরু, বিচারে এসে খাড়া হও।"

কন্যা নাইয়া ধুইয়া, স্ত্রীবেশ পরিয়া ফুলের সাজি নিয়া আসিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, রক্ষিত অরক্ষিতের বাপ, আমি যে আমার ব্রতের কথা বলিতে চাই।"

সকলের কান মুখ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল; রাজা বলিলেন,—"বল।"

কন্যা বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, এই চন্দ্র সূর্য্য আছে, আগুন বাতাস আছে, জল জমী আছে,—আমি যে এক রাজার রাজকন্যা ছিলাম,—"

সকল লোক হা করিয়া গেল।—রাজা বলেন,—"চুপ্ চুপ্।" কন্যা কথা বলেন,—

"রাজার কন্যা ছিলাম, বাপ মা যে, আমি উদরে থাকিতেই কোটাল কোটালিনীর সঙ্গে এক সত্য করেন—" কন্যা কথা বলে আর সেই পাঁচ হাজার এক ছাগলের সারিবন্ধী হাড়ের উপর ফুল জলের ছিটা দেয়।—দিতে না দিতে, দেখিতে না দেখিতে পাঁচ হাজার এক ছাগল যে হাড় খট্ খট্ করিয়া মাংসে চামে জীয়ে উঠিল!

সকল লোকের মাথার চুল খাড়া! কন্যা তখন সাপ কাটার কথা বলিয়া বলিলেন— "মহারাজ, সেই যে মাসিনী আমার স্বামীকে ছাগল করিয়া রাখিয়াছিল—তাহার পরখ,— আপনার রাজ্যে যতটী নাপিত আছে, তা' আনান্।"

রাজা যত নাপিত আনাইয়া দিলেন।

তখন কন্যার কথামত এক এক নাপিতে আট আট গণ্ডা ছাগলের মাথা মুড়ায়, আর সব ছাগল সিপাই কোটাল হইয়া হইয়া খাড়া হয়!

পাঁচ হাজার এক সিপাই রাজার আঙ্গিনা ঘিরিয়া তরোয়াল ঝন্ ঝন্ দিয়া দাঁড়াইল;— রাজপুরী গুম্ গুম্!

তখন, নাপিত গিয়া এই সিং এই দাড়ী ঘন ঘন মাথা নাড়ে, কোটাল পুত্র ছাগলের মাথায় ক্ষুর ছোঁয়াইল।

ছোঁয়াতেই, রাজার মালী যে, আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িয়া ধড়ফড় করিয়া চীৎকার,—

(গীত)

"রাখ রাখ প্রাণ রাখ, কন্যারে, আমি তোমার যে পিতা—
তোমার পিতা রাজা আমি রে!
সময়ে ফলেনা বৃক্ষ অসময়ে ফলে,
তোমার বাপের পাপ ফলে এত কালেরে কন্যা!—
আজি হইব সত্য মুক্ত, আমি, হইয়া থাকিব পশুরে,
লোমে করিও মালার সূত্র তুমি সত্যের কন্যারে!
বনে আছে বনফুল রে কন্যা, তোমার মা,
সেই ফুলেতে করো রে মালা,
তবে হইব শাপে মুক্তরে আমরা, মাগো সত্যের কন্যা পুষ্পমালা রে!"

বলিতে না বলিতে মালী জটারোমে কটাপাক, সকল গায়ে হাজার শাঁখ—এক মস্ত ভেড়া হইয়া রাজার সিংহদুয়ারে গিয়া "ভ্যা ভ্যা" করিয়া ডাকিতে লাগিল,—কোটাল পুত্র ছাগল যে, যে কুমার সেই কুমার!

লোকজন সব থতমত। কন্যা বলিলেন,—"কুমার, তুমি সিংহদুয়ারে থাক; সিংহ দুয়ার ছাড়িয়া নড়োনা, আমি বনে দেখি বনফুল পাই কিনা।" কন্যা, দেব চলে কি দৈত্য চলে, সরোবরের সেইখানে গিয়া দেখেন, এক যে, 'বিকসিত' বনফুলের গাছ। কন্যা দুই হাতে যত ফুল তুলিয়া নিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

কন্যা বলিলেন,—"মহারাজ, দম ফাটে কি দম ছুটে—বড় আমি অস্থির আছি, যদি রাজআঙ্গিনার এক আঙ্গিনা আমাকে আজ ছাড়িয়া দেন।"

অবাক হইয়া সিপাই পাহারা সব সরিয়া গেল; রাজা, চা'র দরজার খাঁটি বন্ধ করাইয়া দিলেন।

তখন কন্যা, চারবার করিয়া চার দরজা দেখিয়া আসিলেন, শাঁখে পাঁচ ফুঁ দিলেন, ঘৃতের পঞ্চবাতি জ্বালিয়া, ঢাল ঢাল টাকা ঢালিয়া তাহারি উপর বসিয়া, সারাদিন ধরিয়া ভেড়ার লোমের সূতা পাকাইলেন!

সূতা পাকানো শেষ হইলে, কুমারকে চারিটী খাওয়াইলেন। খাওয়াইয়া, বলিলেন,—"কুমার, এই সূতায় আজ মালা গাঁথিব; একগাছি তোমাকে দিব এক গাছি আমি নিব,—এই মালার বদল হবে। বাপ মায়ের সত্য কুমার, আমার থাকিবে,—কিন্তু, তুমি একখানা খাঁড়া নিবে আমি একখানা খাঁড়া নিব,—আমার খাঁড়ায় যখন আমার বুক ছুঁইবে, তখন যদি, তোমার খাঁড়ায় সে খাঁড়া কাটিয়া আমায় রাখিতে পার, তবেই আমি তোমার! নইলে কুমার, যাহার জন্যে মা বনের ফুল, বাপ পশু, সে জীবন আমি রাখিব না।

১৮

কুমার সারাদিন আপন খাঁড়ায় ধার দিলেন। কন্যা চোকের জল দিয়া এক পাশে বসিয়া মালা দুই গাছি গাঁথিলেন।

তখন যত যত আভরণে কেশ বেশ করিয়া, কন্যা দুই খড়্গ নিয়া দুই আসনের মাঝখানে রাখিলেন।

দুই খড়্গ মাঝ খানে রাখিয়া, কন্যা বলিলেন,—"কুমার, মালা নাও।"

কন্যা কুমারের গলায় মালা দিলেন। কুমার কন্যার গলায় মালা দিলেন। দিয়াই, খড়্গ তুলিয়া নিয়া, কন্যা বলিলেন,—"কুমার! বাপ মায়ের দুয়ার খোলা,—রাজকুমারী চলিল!—"

খড়্গ বুকে পড়িতে পড়িতে কুমারের খড়্গ ঘুরে' এল,—অমনি সেই সময় রাজার সিংহদরজা ভাঙ্গিয়া শাঁখ শঙ্খ ঢাকের আওয়াজ,—"পুষ্প, পুষ্প!—কুমার, কুমার!!"

গীত।

"ওরে, রাখরে কন্যা রাখরে কুমার, আমরা, ফিরিলাম আপন দেশে,
সত্য পূর্ণ হইলরে আজি, আজি, চল আপন দেশেরে কন্যা-কুমার।"

দেখিতে না দেখিতে পুষ্পের বাপ, পুষ্পের মা—রাজা রাণী সিপাই সান্ত্রী দাস দাসী সঙ্গে ছুটিয়া আসিলেন,—পুষ্প দেখেন,—মা!—পুষ্প দেখেন,—বাবা!

ছুটিয়া আসিয়া মা পুষ্পকে কোলে নিলেন, ছুটিয়া আসিয়া বাবা পুষ্পের মাথার গন্ধ নিলেন, বলিলেন,—

"ধন্য মা তুই কন্যা পুষ্প, তোরি জন্যে শাপে মুক্ত,—

মা, চল্ এখন তোর রাজপুরীতে চল্।" কুমারকে বলিলেন,—"কুমার, তুমি আমাদের জামাই, আজ আমার ঘরে চল।"

সোরগোলে, রাজপুরীর রাজা, লোকজন আসিয়া দেখে,—এ—কি!!

তখন তো, সকল কথা প্রকাশ হইল; রাজপুরীর রাজা, পুষ্প মালার বাপ্ রাজাকে মহা সমাদরে আপন আসনের উপর সাত আসন সাজাইয়া, আসন দিলেন।

রাজপুরীতে ঢোল নহবৎ বাজিয়া উঠিল।

হাসি তামাসা কথা বার্ত্তায় ক'দিন গেল। দিন কত থাকিয়া, কন্যা কুমার লইয়া, সাজন বাজন অষ্টগাজন দিয়া, রাজা রাণী দেশে গেলেন।

রাজ্য ছিল খা খা; ঘুম থেকে উঠিয়া রাজ্যের লোক দেখে,—রাজ রাজ্য আজ ভরা ভরা!—"কেন রে!"—আসিয়া দেখে,—"হাঃ! কন্যা—জামাই নিয়া রাজা রাণী তো দেশে আসিয়াছেন!—দে ডঙ্কায় ঘা!"

যত দুয়ারে দুয়ারে ডঙ্কায় ঘা পড়িল, ঘুম থেকে উঠিয়া কোটাল কোটালিনী দেখে,—রাজপুরীর রত্ন কোটায় দুইজনে শুইয়া আছে।

তখন, কোটালিনী আবার দিদি হ'ল, কোটাল রাজার বেহাই হ'ল, যা'র যা'র সত্য পূর্ণ হ'ল; রাজা, কোটাল, রাণী, কোটালিনী, কন্যা, কুমার, রাজ্যের জন পরিজন নিয়া, সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

আর? তখন পুত্র সরোবরের জল মানুষে কলসে কলসে খায়!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

সম্পূর্ণ।

স্পর্দ্ধা।

১

আমি, মরণ আজিকে বরণ করিব
শরণ তবু না চাই।
আমি, নয়ন আগিকে দমন করেছি
অশ্রু তাহাতে নাই।
শত, বেদনা আমার কামনা আজিকে,
লাঞ্ছনা সুখে বহিব,
কভু, শরণ তবু না মাগিব।

২

আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর
সহায় চাহিনা দৈব;
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি
অশনি মাথায় লইব।
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
তবু, যন্ত্রণা তাহে নাই,
আমি বজ্র ধরিতে চাই।

৩

আজি বিশ্বে কারেও করিনাক ভয়,
—ভয়েরে করেছি জয়;
শাসন বাঁধন কিছুই জানিনা
ঝঞ্ঝা, প্রলয় লয়।
শয়ান শিয়রে কৃপাণ ঝুলিছে
মরণ নিঃসংশয়,
তবু, কারেও করিনা ভয়!

বিলাতের রমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আরও অনেক উপায়ে রমণীজাতি সে দেশে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অনেকে ছোট ছোট ছেলের শিক্ষা কার্য্যে রত। অনেকে রোগীর শুশ্রূষা করেন। তাহাদের নাম "নার্স"। অনেকে "হাউসমেড্" বা আমাদের দেশের চলিত ভাষায় "চাকরাণী।" এই একই কাজে এদেশের ও সেদেশের পদমর্য্যাদায় কত প্রভেদ।

ইয়োরপ আমেরিকার মত এমন সুন্দর করিয়া ছেলে মানুষ করিতে আর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। যিনি ছেলে মেয়ে পড়ান তিনি নিজে সে বিষয়ে স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া তবে সে কাজ করেন। ছেলে মেয়েগুলি যেন তাঁহারই সন্তান। ভালবাসা ও যত্নের সহিত অথচ প্রতি বিষয়ে সুনিয়মে তাহারা শাসিত। শিক্ষয়িত্রীর আদেশে তাহারা একত্রে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া যে সময়ের যে কাজ তাহা করে। তুমি সেখানে গিয়া শীত গ্রীষ্মের উপলক্ষ করিয়া কিছু কথা পাড়—কত কথা শুনিবে। সুমার্জ্জিত রুচির কত মিষ্ট কথা। ছেলেটির সঙ্গে যদি কথা কও বা ছোট মেয়েটিকে আদর কর বা তাদের একখানি চোকোলেট বা বিস্কুট দাও তবে তাহারা তোমায় ধন্য বাদ দিয়া তোমার সঙ্গে কেমন স্বাধীন ভাবে আলাপ করিবে। তুমি যে কোন দেশ থেকে এসেছ সে কথা তাদের জিজ্ঞাসা করিতে নাই সে হলো তোমার ঘরের কথা! পরচর্চ্চার অঙ্কুর মাত্র সে কথায় থাকিবে না। তুমি যদি আপনিই পরিচয় দাও ত তারা খুসী হবে।

তাহারা সৈনিকের মত শিশু বয়স হইতেই "ড্রীল" করে। কি ইস্কুলের কি ঘরের সকল শিক্ষা-নিয়ম গুলিই যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মত ধরা বাঁধা। এইরূপ কলের মত শিক্ষিত হইয়া দেশ শুদ্ধ ছেলে মেয়েরা সে দেশে অত উপযুক্ত হয়।

আর "নার্সের" কথা তো বলিয়া বুঝানই যায় না। সে মূর্ত্তি গুলি দেখিতে কি সুন্দর কি পবিত্র। একটি পা অবধি লম্বা কাল "কেপ বা পৃষ্ঠ বস্ত্র দিয়া অঙ্গ ঢাকা;—গলা ও হাতায় তুষার ধবল কলার ও কফ্—তাতে একটু কালো ফিতা বাঁধা। মাথায় একটি ছোট চেপ্টা রঙ্গের টুপী, ফিতা দিয়া গলার সঙ্গে বাঁধা" যেন "কুমারী মেরীর" মত পবিত্র মুখশ্রী। সে দেশে সেই কাজটি বড় ভাল কাজ বলিয়া বিবেচিত। সুধু অন্নের দায়ে নহে, ভাল ভাল ঘরের মেয়েরাও পরোপকার উদ্দেশ্যে ঐ কাজ করেন। । কি ধীর সহিষ্ণু ভাব! কি সুচারু সতর্ক-সেবা! মনে হয় স্বর্গের দূত আসিয়াই মানুষের যন্ত্রণা মোচন করিতেছেন। মুমূর্ষু রোগীকে ছোট চামচ দিয়া ঔষধ খাওয়াইবারই কি মধুর প্রণালী!

হাউস মেড্"বা ঝিদের কথা। আমরা একাজ কত হেয় মনে করি। কিন্তু সেই স্বাধীন

দেশে কোনও কাজেই পদমর্য্যাদার হানি হয় না। কাজের জন্য যতটুকু সম্বন্ধ, তাহার বেশী কেহ কাহারও উপরে নহে। প্রভুদের ভৃত্যের প্রতি একটি রূঢ় কথা নাই একটুও কর্কশ ব্যবহার নাই, সবই ভদ্রতা ও নরম আচরণ। আর আমাদের দেশে আমরা ঝি চাকরদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করি। ভারতবর্ষে বালবিধবাগণ অনেক স্থলে আত্মীয় গৃহে দাসীর মত থাকেন। চিরকালের জন্য তাঁহারা দীনভাবে অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন যাপন করেন। কিন্তু সে দেশে কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেই এত পরাধীন এত দুঃখী এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নহে। তাহাদের আশা ও উৎসাহে বুকভরা, হয়ত কিছুদিন নিজের বা অসহায় আত্মীয়দের অভাব মোচন করিবার জন্য কাজ করিয়া কিছু সংস্থান করিয়া লন। দিনরাত ক্রীতদাসীর মত থাকিতে হয় না। মিছামিছি বা অল্প দোষে তিরস্কৃত হইতে হয় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুচারু রূপে নিয়মিত কর্ম্মগুলি সমাধা করিয়া তার ছুটি। ঝি চাকরের তত্ত্বাবধান করিতেও সে সোনার দেশে কত হিতকর সমিতি আছে। তাহাদের কেবল চেষ্টা, এই সকল শ্রেণীর লোকের উপর অত্যাচার বারণ করা, ও তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা। কাজ করিতে করিতে কাহারও কোনও অসুখ হইলে প্রভু তাহার চিকিৎসার ও ভরণ পোষণের ব্যয় ভার বহন করিতে বাধ্য। আর যদি তার এমন কোন অনিষ্ট হয় যাহা তাঁহারই অবহেলায় হইয়াছে তিনি তার জন্য ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য।

দুটি একটি ঘটনা আমি নিজে যাহা দেখিয়াছি তা বলি। আমাদেরই বাড়ীতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক কাজকর্ম্ম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা একজন মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন সওদাগর লোক। কিন্তু স্বামী একটি স্কুলে সামান্য বেতনে কাজ করিতেন। পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজনের বারণ না শুনিয়াও তিনি এই গরিব লোকটিকে আজ এক বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ইনফ্লুয়েনজা হওয়াতে কিছুদিন শয্যাগত থাকার পর ভাল করিয়া সারিবার পূর্ব্বেই কাজে যোগ দেন, এবং দু এক দিনের মধ্যেই বাতে পঙ্গু হইয়া পড়েন। এখন তিনি চলৎশক্তিহীন। সংসার আর চলে না, কাজেই স্ত্রীকে এইরূপ কাজ করিতে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি সুস্থদেহে ও সুস্থমনে দিনের কিছুক্ষণ কাজ করিয়া পুনরায় বাড়ী গিয়া চলৎশক্তিহীন স্বামীর সেবা করিতেন। পরে "লণ্ডন কউণ্টি কউনসিলের" যে কমিটি আছে তাঁরা এই কথা শুনিয়া তাহার যথার্থ অবস্থা অনুসন্ধান করিতে আসিল ও সব দেখিয়া শুনিয়া তার স্বামীর খোরাকির জন্য ১০ সিলিং সপ্তাহে ব্যবস্থা করিয়া দিল আর চিকিৎসা ও ঔষধের জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া গেল।

ঝি-চাকর রাখিতে এত খরচ যে অনেকেই তা রাখেন না। নিজেরাই সাধ্যমত ঘরের কাজ করেন। অনেকে বাড়ী ভাড়া করিয়া আপনারা সপরিবারে থাকেন ও অন্য লোক-দিগকে অপরাংশে ভাড়াটে রাখেন। তাতেই তাঁহাদের সংসার চলে। তিন চারিটি বা ততোধিক লোক রাখিয়া তাহাদের সকল সরবরাহ করা বড় সোজা কথা নহে—বাড়ীর

মেয়েরা তাই সব করেন। সারাদিন এইরূপ কাজ করিয়া দিনান্তে সুন্দর বেশ ভুষা করিয়া তাঁহারা আমোদ করিতে বাহির হন। তখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদিগের সহিত তাঁহাদিগের কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। অমন যে পরিপাটি বেশভুষা তা নিজের হাতেই কার্য্যের অবসরে অতি কম খরচে তাঁহারা করিয়াছেন। যেমন সুব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের মেহনৎ করিবার ক্ষমতা তেমনি কার্য্য সমাপ্তে আমোদ আহ্লাদ করিবারও আগ্রহ। তাঁহারা কিরূপ অন্তরের সহিত সে সময়টি উপভোগ করেন। তাহাতেই দিনের শ্রান্তি ও কষ্ট দুর হইয়া যায়। আমরা অমন পরিশ্রমও করিতে পারি না, আর অন্তরের সহিত আনন্দও করিতে পারি না—সে সময়েও মনে দুশ্চিন্তা থাকে। যাঁহাদের ঘরে ছেলে মেয়ে আছে তাঁহারা অতি যত্নে তাহাদের মানুষ করেন। তাহাদের সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন ও কখঁনও অযথা আদর দেন না। তারা যে সব কাপড় চোপড় পরে তা প্রায় সবই মার হাতের সেলাই করা। এইরূপ সবাই কার্য্যে রত বলিয়া অতি অল্প খরচেও চালাইতে পারেন।

অবসর থাকিলে সে দেশে কেহই প্রায় ঘরে বসিয়া থাকেন না। সকলেই বাহিরে বেড়াইতে যান। কিন্তু প্রায়ই একা নয়। একজন মহিলা একজন পুরুষের বাহুমধ্যে হস্ত রাখিয়া ক্ষিপ্র পদবিক্ষেপে—মধুর অনুচ্চ স্বরে আলাপ করিতে করিতে চলেন। দেখিলে বুঝা যায় যে—মনে কত আনন্দ ও দেহে কত বল!

শনিবারে অর্দ্ধেক দিন কাজ করিতে হয় ও রবিবারে পূরা ছুটি। এই সুনিয়ম পালিত হওয়ায় সমাজের যে কত হিত হইয়াছে তা বলিবার নহে। ছয় দিন খাটিয়া এক দিন একেবারে বিশ্রাম স্বাস্থ্য ও মনের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। ইউরোপের অনেক দেশেই এই বিশ্রামের অবসরটী সকলেই সদ্ব্যবহার করেন। সে সুশাসিত রাজ্যে তার জন্য কত সুনিয়ম বাঁধা। সে দিন সব রেল কোম্পানী কম ভাড়ায় যাত্রিদের সহরের বাহিরে লইয়া যায়। শনিবারে যাইয়া সোমবারে ফিরিলেই এক ভাড়ায় যাতায়াত চলে, তাই এই দুই দিন সহর হইতে রাশি রাশি লোক সমুদ্র ধারে ও অন্যান্য স্থানে বেড়াইতে যান। সে দৃশ্য দেখিতে কি সুন্দর। এক হাতে দস্তানা অন্য হাতে হ্যাণ্ড ব্যাগ্ তাহাতে দু একটি কামিজ ও কোট, তা ছাড়া চিরুণী বুরুস ইত্যাদি এবং একখানি নভেল। ইহা ছাড়া অন্য মোট সঙ্গে কিছুই নাই। সেখানে হোটেলে সস্তায় সব বন্দোবস্তই আছে।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ ডিভনসায়ারে টর্কী নামক স্থানে আমি একবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সে স্থানটি এত গরম যে সেখামে কচু গাছ তালগাছ বাহিরেই জন্মায় ও দুপর বেলা বাহিরে বেড়াইতে হইলে ছাতা মাথায় দিতে হয়। সেই কারণে যক্ষ্মাকাশগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ইহা ভাল স্থান। সেখানে "মিক্ষ্ট বেদীং" বা একত্র স্নান একটি দেখিবার জিনিষ। মেয়ে পুরুষে ছোট হাত পা কাটা কাপড় পরিয়া এক সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দিতে দিতে ভাল ভাল পদ্য ও জাতীয় সঙ্গীত একত্রে আবৃত্তি করে।

লণ্ডনের মত বড় ও জনতা পূর্ণ সহর আর পৃথিবীর কোথাও নাই। সেখানকার লোকসংখ্যা কলিকাতার অপেক্ষা ৬ গুণ বেশী। অথচ সহরেও কত যে বাগান ও বেড়াইবার স্থান আছে তা বলা যায় না। গলিতে গলিতে ছোট বড় পার্ক—কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! তাহার স্থানে স্থানে ফুল গাছ, মধ্যে মধ্যে ছেলেদের দৌড়াদৌড়ী খেলিবার প্রশস্ত স্থান। বাগানে এখানে সেখানে দুই একখানি করিয়া বেঞ্চ। সুস্থ সবলকায় লোকেরা বেড়াইতে যাইয়া বেঞ্চিতে বসিতে বড় ভাল বাসেন না। কেহ কেহ বা সেই স্থানেই বসিয়া খবরের কাগজ বা বই পড়েন। এই অবসরের সময় তুমি আলাপ করিতে চাহিলে সহজেই আলাপ হয়।

আমাদের দেশের লোকে যে সেদেশে গিয়া এত মুগ্ধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ সেদেশের মহিলাগণের অমায়িক আতিথ্য যত্ন।

আমাদেরই একটি প্রতিবাসিনী "মিসেস্ ডিকক্" নাম্নী এক রমণীর কথা বলি। তিনি একজন দোকানদারের স্ত্রী। আমাদের দেশে এ কথা শুনিলেই মনে হয় তিনি বড়ই গরীব ও নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোক। সেখানে তা নয়। তাঁহারা মধ্যবিৎ অবস্থার লোক, অথচ অতিশয় মার্জ্জিত ও সুসভ্য। তাঁর দুটি মেয়ে একটী ছেলে। বড় মেয়েটি ঠিক যেন মোমের পুতুলের মত। তিনি একাই সংসারের সকল কাজ করিতেন, ছেলেদের গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইতেন। স্বামী কাজ হইতে ফিরিয়া আসিলে ছেলে গুলিকে লইয়া তাঁর কাছে আগুনের পাশে বসিয়া মধুর আলাপ করিতেন। গৃহে কোনও অতিথি আসিলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি সঙ্গীতে অতি নিপুণা ছিলেন কিন্তু তাঁহার সরল মিষ্ট কথা সঙ্গীত হইতেও আমার অধিক মিষ্ট লাগিত। আসিবার সময় তাঁহাদের সকলের সঙ্গে একত্রে একখানি ফোটো লইয়াছিলাম; তাহাতেই তাঁহাদের কত আগ্রহ কত আনন্দ।

আমি শেষে যাঁহাদের বাড়িতে থাকিতাম তাঁহারা সব চমৎকার লোক। বিধবা গিন্নি ও তাঁর একটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। তাঁহারা বড়ই আমোদপ্রিয়। অবসর-কালে সে বাড়ীতে সঙ্গীত অনবরতই চলিত। আঠার বছরের বালিকার সুকণ্ঠ সঙ্গীত পিয়ানোর ঝঙ্কারে মিলিত হইয়া কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিত।

তিনি নানা ভাবের গান গাহিতেন, শিশুদিগের সঙ্গীত, হাস্য সঙ্গীত, ধর্ম্ম সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, সকল সঙ্গীতই তাঁহার নিকট শুনিতাম। গান গুলি আমার খাতায় সব লেখা আছে। এখন অবসর মত নির্জ্জনে বসিয়া পড়ি, আর সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে।

"When other lips and other,
heart their tales of love shall tell,
Will you remember me."

মেয়েরা তাই সব করেন। সারাদিন এইরূপ কাজ করিয়া দিনান্তে সুন্দর বেশ ভূষা করিয়া তাঁহারা আমোদ করিতে বাহির হন। তখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদিগের সহিত তাঁহাদিগের কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। অমন যে পরিপাটি বেশভূষা তা নিজের হাতেই কার্য্যের অবসরে অতি কম খরচে তাঁহারা করিয়াছেন। যেমন সুব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের মেহনৎ করিবার ক্ষমতা তেমনি কার্য্য সমাপ্তে আমোদ আহ্লাদ করিবারও আগ্রহ। তাঁহারা কিরূপ অন্তরের সহিত সে সময়টি উপভোগ করেন। তাহাতেই দিনের শ্রান্তি ও কষ্ট দূর হইয়া যায়। আমরা অমন পরিশ্রমও করিতে পারি না, আর অন্তরের সহিত আনন্দও করিতে পারি না—সে সময়েও মনে দুশ্চিন্তা থাকে। যাঁহাদের ঘরে ছেলে মেয়ে আছে তাঁহারা অতি যত্নে তাহাদের মানুষ করেন। তাহাদের সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন ও কখনও অযথা আদর দেন না। তারা যে সব কাপড় চোপড় পরে তা প্রায় সবই মার হাতের সেলাই করা। এইরূপ সবাই কার্য্যে রত বলিয়া অতি অল্প খরচেও চালাইতে পারেন।

অবসর থাকিলে সে দেশে কেহই প্রায় ঘরে বসিয়া থাকেন না। সকলেই বাহিরে বেড়াইতে যান। কিন্তু প্রায়ই একা নয়। একজন মহিলা একজন পুরুষের বাহুমধ্যে হস্ত রাখিয়া ক্ষিপ্র পদবিক্ষেপে—মধুর অনুচ্চ স্বরে আলাপ করিতে করিতে চলেন। দেখিলে বুঝা যায় যে—মনে কত আনন্দ ও দেহে কত বল!

শনিবারে অর্দ্ধেক দিন কাজ করিতে হয় ও রবিবারে পূরা ছুটি। এই সুনিয়ম পালিত হওয়ায় সমাজের যে কত হিত হইয়াছে তা বলিবার নহে। ছয় দিন খাটিয়া এক দিন একেবারে বিশ্রাম স্বাস্থ্য ও মনের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। ইউরোপের অনেক দেশেই এই বিশ্রামের অবসরটী সকলেই সদ্ব্যবহার করেন। সে সুশাসিত রাজ্যে তার জন্য কত সুনিয়ম বাঁধা। সে দিন সব রেল কোম্পানী কম ভাড়ায় যাত্রিদের সহরের বাহিরে লইয়া যায়। শনিবারে যাইয়া সোমবারে ফিরিলেই এক ভাড়ায় যাতায়াত চলে, তাই এই দুই দিন সহর হইতে রাশি রাশি লোক সমুদ্র ধারে ও অন্যান্য স্থানে বেড়াইতে যান। সে দৃশ্য দেখিতে কি সুন্দর। এক হাতে দস্তানা অন্য হাতে হ্যাণ্ড ব্যাগ্, তাহাতে দু একটি কামিজ ও কোট, তা ছাড়া চিরুণী বুরুস ইত্যাদি এবং একখানি নভেল। ইহা ছাড়া অন্য মোট সঙ্গে কিছুই নাই। সেখানে হোটেলে সস্তায় সব বন্দোবস্তই আছে।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ ডিভনসায়ারে টর্কী নামক স্থানে আমি একবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সে স্থানটি এত গরম যে সেখানে কচু গাছ তালগাছ বাহিরেই জন্মায় ও দুপুর বেলা বাহিরে বেড়াইতে হইলে ছাতা মাথায় দিতে হয়। সেই কারণে যক্ষ্মাকাশগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ইহা ভাল স্থান। সেখানে "মিকৃষ্ট বেদীং" বা একত্র স্নান একটি দেখিবার জিনিষ। মেয়ে পুরুষে ছোট হাত পা কাটা কাপড় পরিয়া এক সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দিতে দিতে ভাল ভাল পদ্য ও জাতীয় সঙ্গীত একত্রে আবৃত্তি করে।

লণ্ডনের মত বড় ও জনতা পূর্ণ সহর আর পৃথিবীর কোথাও নাই। সেখানকার লোকসংখ্যা কলিকাতার অপেক্ষা ৬ গুণ বেশী। অথচ সহরেও কত যে বাগান ও বেড়াইবার স্থান আছে তা বলা যায় না। গলিতে গলিতে ছোট বড় পার্ক—কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! তাহার স্থানে স্থানে ফুল গাছ, মধ্যে মধ্যে ছেলেদের দৌড়াদৌড়ী খেলিবার প্রশস্ত স্থান। বাগানে এখানে সেখানে দুই একখানি করিয়া বেঞ্চ। সুস্থ সবলকায় লোকেরা বেড়াইতে যাইয়া বেঞ্চিতে বসিতে বড় ভাল বাসেন না। কেহ কেহ বা সেই স্থানেই বসিয়া খবরের কাগজ বা বই পড়েন। এই অবসরের সময় তুমি আলাপ করিতে চাহিলে সহজেই আলাপ হয়।

আমাদের দেশের লোকে যে সেদেশে গিয়া এত মুগ্ধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ সেদেশের মহিলাগণের অমায়িক আতিথ্য যত্ন।

আমাদেরই একটি প্রতিবাসিনী "মিসেস্ ডিকক্" নাম্নী এক রমণীর কথা বলি। তিনি একজন দোকানদারের স্ত্রী। আমাদের দেশে এ কথা শুনিলেই মনে হয় তিনি বড়ই গরীব ও নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোক। সেখানে তা নয়। তাঁহারা মধ্যবিৎ অবস্থার লোক, অথচ অতিশয় মার্জ্জিত ও সুসভ্য। তাঁর দুটি মেয়ে একটী ছেলে। বড় মেয়েটি ঠিক যেন মোমের পুতুলের মত। তিনি একাই সংসারের সকল কাজ করিতেন, ছেলেদের গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইতেন। স্বামী কাজ হইতে ফিরিয়া আসিলে ছেলে গুলিকে লইয়া তাঁর কাছে আগুনের পাশে বসিয়া মধুর আলাপ করিতেন। গৃহে কোনও অতিথি আসিলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি সঙ্গীতে অতি নিপুণা ছিলেন কিন্তু তাঁহার সরল মিষ্ট কথা সঙ্গীত হইতেও আমার অধিক মিষ্ট লাগিত। আসিবার সময় তাঁহাদের সকলের সঙ্গে একত্রে একখানি ফোটো লইয়াছিলাম; তাহাতেই তাঁহাদের কত আগ্রহ কত আনন্দ।

আমি শেষে যাঁহাদের বাড়িতে থাকিতাম তাঁহারা সব চমৎকার লোক। বিধবা গিন্নি ও তাঁর একটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। তাঁহারা বড়ই আমোদপ্রিয়। অবসর-কালে সে বাড়ীতে সঙ্গীত অনবরতই চলিত। আঠার বছরের বালিকার সুকণ্ঠ সঙ্গীত পিয়ানোর ঝঙ্কারে মিলিত হইয়া কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিত।

তিনি নানা ভাবের গান গাহিতেন, শিশুদিগের সঙ্গীত, হাস্য সঙ্গীত, ধর্ম্ম সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, সকল সঙ্গীতই তাঁহার নিকট শুনিতাম। গান গুলি আমার খাতায় সব লেখা আছে। এখন অবসর মত নির্জ্জনে বসিয়া পড়ি, আর সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে।

"When other lips and other
heart their tales of love shall tell,
Will you remember me."

শ্রীপঞ্চমী।

মাঘমাসের শেষ; বেলা একটু বড় হইয়াছে; তবু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণী যখন আহার করিয়া উঠিলেন, তখন বেলা প্রায় ৪টা। পানছেঁচাটুকু মুখে দেওয়া হইলে আঁচল-খানি ভাল করিয়া গায়ে দিয়া সেজবৌয়ের ৮ মাসের মেয়েটিকে কোলে করিয়া গৃহিণী বলিলেন "ও বৌয়েরা, খইয়ের মোয়াগুলো তোরা বেঁধে তোল, আমি একবার ছোটদের বাড়ী থেকে আসি।"

নাকে বড় বড় মুক্তার নথ, অল্প একটু ঘোমটা দেওয়া, লালপেড়ে শাড়ী পরা, একটী প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা আজ এত অবেলায় না গেলে হ'ত না; পরশু শ্রীপঞ্চমী, সর্দ্দার খুড়োর নৌকো হয় তো আজই আস্‌বে, তরিতরকারী গঙ্গাজল সব রাখান ঢাকান, আপনি না হ'লে কে ক'রবে।" শুনিয়া গৃহিণী একটু উগ্রস্বরে বলিলেন "তোমার বাছা ঐ এক কথা—আমি কি আর ম'রবো না, চিরদিন তোমাদের এই ঘর ঘরকন্না নিয়ে থাক্‌বো? ও সব এখন তোমার কর্‌বার কথা। এমন বৌ কলিকালে কেউ দেখে নাই! বেটার বৌ হ'ল, নাতী নাত্নী হ'ল নাতজামাই হ'ল, তবু এক হাত ঘোমটা! সর্দ্দারের নৌকো আসে তুমি সব তুলিয়ো পাড়িয়ো, আমি একবার থপ্ করে' আসি—যাব আর আস্‌বো। শ্রীপঞ্চমীর পরদিনই ছোটরা সব বিদেশে যাবে, আজ না গেলে আর এ দুদিন যেতে পাব না।"

একটি অষ্টমবর্ষীয়া নববিবাহিতা বালিকা বলিল "হাঁ বড় মা, এবার এখনও ঠাকুর এল না কেন গা?" গৃহিণী ঈষৎ বিরক্তিস্বরে বলিলেন "এবার শুধু দো'ত পূজো হবে।" মেয়েটি বিস্মিত হইয়া বলিল "ওমা! ঠাকুর আসবে না তবে কি রকম পূজো হবে! কেন বড় মা ঠাকুর আসবে না?" গৃহিণী বলিলেন "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম!—বলেন এবার তোর 'বেতে' ঢের খরচপত্র হয়েছে, এখন হাতে পয়সা কড়ি নেই, তাই দো'ত পূজো করেই সারবেন, ঘটাঘটি হবে না।" বালিকা বলিল "পো মশাইয়ের হাতে ঠাকুর পূজোর যদি পয়সা নেই তবে আমার "বেতে" অত বড় যজ্ঞি করলেন কেন?" হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন "ভাল জ্বালা! আমি যত তাড়া ক'রছি তত বকিয়ে মারছে! স্কুলে পড়ে' শুনে মেয়েগুলো অত্যন্ত বেহায়া হয়েছে, লজ্জা সরমের নাম নেই! এখন আয়লো, আমার সঙ্গে যাস্ তো আয়"। এই বলিয়া গৃহিণী নাত্নী কোলে করিয়া ও পৌত্রের নববিবাহিতা কন্যা নন্দরাণীকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

কর্ত্তা কৃষ্ণকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কেশবপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ, বয়স পঁচাত্তরের কম হইবে না। বৃহৎ পরিবার—সাত পুত্র, পাঁচ কন্যা, ছয়টি পুত্রবধূ, তাহাদের সন্তান সন্ততি প্রভৃতি। লোকে বলিত 'বাঁড়ুয্যের খুব কপাল জোর, যেমন লক্ষ্মী ভাগ্যি, তেমনি ষষ্ঠী ভাগ্যি।' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চারিটী পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হওয়ায় সংসারের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

তাঁহার পুত্রেরা কর্ম্মস্থানে থাকেন কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রাদি বাড়ীতে থাকে—বিদেশে বধূদের পাঠাইতে বন্দ্যোপাধ্যায় বড় বিরক্ত হ'ন, সেজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রেরা সর্ব্বদা পরিবার সঙ্গে রাখিতে পারেন না। বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি পুত্র এখনও পড়াশুনা করে; কনিষ্ঠের বিবাহ হয় নাই, আগামী বৎসরে হইবে।

গত পৌষমাস হইতেই গৃহস্থের বড় ঝঞ্ঝাট পড়িয়াছে। উঠানে রাশি রাশি ধান আসিয়া পড়িতেছে, গোলাজাত হইতেছে, সিদ্ধ হইতেছে, শুখাইতেছে। সরিষা, কলাই ঝাড়া হই-তেছে, অড়হর ভাঙ্গা হইতেছে; দুটো ঢেঁকি অনবরত খাটিতেছে,—সম্বৎসরের খাবার ঝাড়া বাছা তোলা রাখা ঢাকা,—তাহার উপর মাঘমাসের প্রথম ভাগেই কর্ত্তার বড় আদরের প্রথম পৌত্রের প্রথম সন্তান নন্দরাণীর বিবাহের আয়োজন,—পরিবারের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

মাঘমাসের ৫ই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ঘরদ্বারগুলি মেরামত হইয়াছে, চালে নূতন খড় দেওয়া হইয়াছে,—কর্ত্তা বলিয়াছেন "আমার জীবনের এই শেষ খড় দেওয়া, ঘর মেরামত করা, তাই এমন পুরু করে' এবার খড় দিচ্ছি যে, দশ বছর আর না সারাতে হয়।" তবু কাজের শেষ নাই—এখনও ২।৪টি মজুর রোজ খাটিতেছে এখনও গাড়ী গাড়ী কাঠ আসিতেছে ও চেলা করা হইতেছে; বর্ষাকালের জ্বালানী কাঠ এই সময় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

নন্দরাণীর বিবাহে কর্ত্তা সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়াছেন, বলিয়াছেন 'আর কতদিন বা বাঁচবো, নন্দরাণীর বিয়েটি আমি থাকৃতে দিয়ে গৌরীদানের ফললাভ করিলাম, আমার ইহজন্মের কাজ শেষ হইল।'

দেখিতে দেখিতে সরস্বতী পূজা উপস্থিত। বিবাহে অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া, প্রতিমা না আনিয়া সঙ্ক্ষেপে সরস্বতী পূজা সারিবেন বলিয়া গৃহিণীর কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হইয়াছেন।

সন্ধ্যা হয় হয়—অনেকগুলি গরু বাছুর আসিয়া গোয়ালে প্রবেশ করিল; ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হইতেছে, শাঁখ বাজিতেছে, ধূনার গন্ধে মনকে পবিত্র স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়াছে, —এমন সময় গৃহিণী ত্রস্তে ব্যস্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ও সেজবৌমা তোর মেয়ে নেগো, দুটো কথা কহিতে না কহিতে বেলা একেবারে গেল। গোয়ালঘরে সাঁজাল দেওয়া হয়নি,—অমনি ভাতখেগো কাপড়েই বেরিয়েছি"। বলিয়া, মেয়েটিকে একজনের কোলে দিয়া, তাড়াতাড়ি কতকগুলি শুষ্ক কুচা কাঠ ও খড় কুটা লইয়া, গোয়ালে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া, একটা গামছা হাতে করিয়া ঘাটে চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা সন্ধ্যাবন্দনা করিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন; বধূরা সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া ঘরে গিয়াছে। খড়ের ঘর বটে কিন্তু কপাট জানালা সব কাঠের—কয়দিন হইতে কন্‌কনে শীত পড়ায় আঁচলে আর শীত মানে না, তাই সকল ঘরেরই কপাট বন্ধ। বাহিরের কাজ শেষ

করিয়া সকলেই আপন আপন ঘরের কাজে নিযুক্ত। কেহ রান্না চড়াইয়াছে, এখনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভাতের জন্য বায়না করিবে। কেহ তরকারী কুটিতেছে,—কেহ বাট্না বাটিতেছে, ঠক্ ঠক্ করিয়া হলুদ ছেঁচার শব্দ হইতেছে,—কেহ বিছানা করিতেছে,—কেহ কাচা কাপড়গুলি আলনায় গুছাইয়া তুলিতেছে,—কেহ বা নন্দরাণীর বিবাহের গল্প করিতে করিতে সন্তানকে স্তন্যদান করিতেছে,—এমন সময় গৃহিণীর স্বর কাণে গেল, "ওগো তোরা আয় গো, কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে, গোয়ালের চাল ধরে' উঠেছে।"—তখন যে যেখানে যে কাজে নিযুক্ত ছিল সমস্ত ফেলিয়া, ঝড়ের মত ছুটিয়া, উঠানে বাহির হইয়া দেখে গোয়ালের চাল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে,—গৃহিণী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গোয়ালে প্রবেশ করিয়া গরুগুলির দড়ি খুলিয়া দিতেছেন ও "কি করলুম, হাতে করে' সোণার সংসারে আগুন দিলুম, হায় হায় হায়"! বলিয়া রোদন করিতেছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত নথ নাকে রমণীটী ছুটিয়া গোয়ালে প্রবেশ করিলেন এবং "মা কি করেন, শীঘ্র বাহিরে আসুন।" বলিয়া, গৃহিণীর হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলেন। গৃহিণী তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "বড় বৌমা, তোদের সব পথে বসালুম গো, হাতে করে' ঘরে আগুন দিলুম"! বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

"ভয় কি! ভয় কি! রামা ভুতো হরে কাটারী আন্, চাল কেটে ফেল্" বলিতে বলিতে কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন। রামা ভুতো হরে পেঁচো কাটারি লইয়া চাল কাটিতে আসিল বটে, কিন্তু তখন কাহার সাধ্য চালে উঠে! রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা খোলা কেরোসিন ছিল, একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন তাহাতে পড়িল অমনি রান্নাঘর ঢেঁকিঘর দাউ দাউ করিয়া উঠিল। বুঝিয়া বুঝিয়া বাতাস জোরে বহিতে লাগিল—শত জিহ্বা বাহির করিয়া সর্ব্বভুক্ অগ্নিদেবতা মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে লাগিল।

মহিলাদের হায় হায় রব, বালক বালিকাদিগের ক্রন্দন, প্রতিবেশীদের 'জল আন্, কলসী কই, কাটারী খানা দে, জিনিসপত্র বাহির কর, গোলা বাঁচা, কলাগাছ কাট্, লেপ তোষক যত আছে ভিজিয়ে ভিজিয়ে চালে দে' প্রভৃতি কোলাহলে, বাঁশ ফাটার চট্ পট্ শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। কর্ত্তার পুত্র পৌত্রেরা কেহই বাড়ীতে ছিলেন না,—কেহ বিদেশে, কেহ অভ্যাস মত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন,—এমন অঘটন যে ঘটিবে তাহা স্বপ্নের অগোচর। সুতরাং প্রতিবাসীরা তাঁহাদের নিজ নিজ ঘরদ্বার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতে আসিতে দুই তিনখানি ঘর জ্বলিয়া উঠিয়াছে; সে সকল ঘরের কোন জিনিস পত্রই বাহির হইল না,—অন্যান্য ঘরের জিনিস পত্র বাহির হইল বটে কিন্তু কতক ভাঙ্গা কতক ছেঁড়া, কে কোথায় কি ফেলিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। কর্ত্তা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "দেখিস্ বাপ, জিনিস বাঁচাতে গিয়ে যেন কারো প্রাণহানি হয় না।" নামাবলীখানি গায়ে দিয়া তিনি সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তাহাই গাত্রে রহিয়াছে। শুভ্র কেশ, ললাটে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, চারি দিকে অগ্নি নৃত্য করিতেছে, তাহারই মাঝে ঊর্দ্ধনেত্রে কর্ত্তা দাঁড়াইয়া, যেন মূর্ত্তিমান অগ্নিদেবতা!

দেখিতে দেখিতে একখানির পর একখানি ঘর অগ্নির প্রতাপে সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছে। কত কালের যত্নসঞ্চিত খাগড়াই বাসন, কাঞ্চন নগরের থালা, ঢাকাই বাটা, বড় বড় পিতলের হাঁড়ী থালা গামলা,—কত শতরঞ্চ, গালিচা, আসন, পিঁড়ি—কত শাল, রুমাল, ঢাকাই সাড়ী, বেনারসী জোড় ভস্মরাশিতে পরিণত হইল তাহা অন্যে জানিবে কি গৃহস্থ স্বয়ংই জানেন না। তাঁহারা বিহ্বলনেত্রে অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া আছেন—আর এইটুকু মাত্র অনুভব করিতে পারিতেছেন, পরিধানের বস্ত্রখানি ব্যতীত 'আমার' বলিতে আর তাঁহাদের কিছুই নাই।

অভুক্ত অবস্থায় ও অনিদ্রায় কর্ত্তাগৃহিণী, বড়বধূ ও বাড়ীর পুরুষগুলি বাহির বাড়ীর উঠানে রাত্রিযাপন করিলেন। মহিলা ও বালকবালিকাদের ছোট কর্ত্তারা (কর্ত্তার খুড়-তুত ভাই) লইয়া গিয়া আশ্রয় দিয়াছেন,—কর্ত্তাকে কিছুতেই কেহ লইয়া যাইতে পারেন নাই। "এ বয়সে ভিটা ছেড়ে আমি কোথাও রাত্রিবাস করিব না" বলিয়া তিনি উঠানে বসিয়া পড়ায়, গৃহিণী প্রভৃতি তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিলেন।

প্রভাত না হইতে হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর মত তাঁহার পরিবারস্থ সকলে এক বস্ত্রে, শুষ্ক মুখে অনাথা ভিক্ষুকের ন্যায় যখন আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় বিজয়া দশমীর দিন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া যাহারা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়—ইহারা কি তাহারাই! তাঁহারই প্রাণের প্রাণ, প্রাণাধিক ধন! কাঁদিয়া গৃহিণী বলিলেন "ওমা, তোরা ভিখারিণী হয়েছিস্ মা! হাতে করে' তোদের পথে বসিয়েছিরে।" গৃহিণীর রোদনের সঙ্গে সঙ্গে রোদনের মহা কোলাহল উত্থিত হওয়ায় অশ্রু মোচন করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "কর কি গিন্নি! ছি ছি, কিসের ভিখারিণী? ভয় কি—ওমা তোদের যার যা গেছে সব আমি দেব, ভয় কি! আমি থাকতে তোদের কিসের ভাবনা—যে ঘর গেছে তার চেয়ে ভাল ঘর হবে। হরেন্দ্র নরেন্দ্র ওঠ বাপ,—আজকের মধ্যে একখানা ঘর তোলা চাই'ই চাই। ভগবানকে স্মরণ করে' সকলে কাজে লেগে যাও—কারো যে প্রাণহানি হয় নাই, এই মনে করে' তাঁর চরণে প্রণাম কর।" সকলে তাঁহার সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে পর তিনি বলিলেন, "আমার মা যশোদা নন্দরাণী কই মা?" কর্ত্তার কনিষ্ঠ পুত্র "আয় নন্দা বাবার কাছে আয়", বলিয়া লোকারণ্যের মধ্য হইতে নন্দরাণীকে বাহির করিয়া আনিল,—নন্দা চোক মুছিতে মুছিতে পিতার পিতামহের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কর্ত্তা তাহাকে শান্ত করিবেন কি তাঁহার নিজেরই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। গৃহিণী বলিলেন "সব যাক্, কিন্তু নন্দার গহনাগুলি যে গেল এই আমার প্রাণে সহিতেছে না। বিয়ের এক বৎসরের মধ্যে কি বিয়ের কনের গহনায় আগুন ছুঁতে আছে! মনে কত যে অমঙ্গল গাহিতেছে! আহা কচি ছেলে কাঁদবে না, অমন সব নতুন গহনা।" কর্ত্তা বলিলেন কাঁদিস্‌নে মা, আমি আবার তোকে সব গহনা দিব।" বলিতে বলিতে একজন একটি বাক্স

হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল "এই নন্দার গহনার বাক্স পাওয়া গেছে।" সত্যই নন্দার গহনার বাক্স অভগ্ন অক্ষত অবস্থায় অগ্নিকবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছে! দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন "বাঁচিলাম, আর আমার কোন খেদ নাই—মা দুর্গা দুর্গতিহারিণি, এই জন্যেই তোমাকে সকলে দুর্গতিনাশিনী বলে মা।"

তখন প্রভাত-সূর্য্য দশদিক আলোকিত করিয়া স্বভাবতঃই সকলের মনে বলদান করিতেছে—আবার নিরাশার অন্ধকার ঘুচিয়া সকলের মনে আশার আলোক দেখা দিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অনেকেই ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া কর্ম্মান্তরে মন সংযোগ করিল। কর্ত্তা নন্দরাণীকে মৃদুস্বরে বলিলেন "কেন যশোদারাণি, কিসের জন্যে তোমার এত দুঃখু? সবাই খেলতে গেল তুমি কেন গেলে না মা? তোর গহনা তো সব পাওয়া গেছে!" তখন নন্দরাণী ধীরে ধীরে বলিল "আমার পুতুলের বড় বাক্সটা পুড়ে গেছে।"

কর্ত্তা। আবার হবে পুতুলের বাক্স, তার জন্য ভাবনা কি?

নন্দা। তাতে যে আমার কত ভাল ভাল পুতুল ছিল তেমন আর হবে না।

কর্ত্তা। সে কি মা? আর হবে না? কেন হবে না? আমি আজই সব আনিয়ে দেব।

নন্দা। বড়মা যে বল্লেন তোমার হাতে পয়সা নেই বলে সরস্বতী ঠাকুর আনা হয়নি, তুমি পয়সা কোথা পাবে?

কর্ত্তা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি মিথ্যাকথা বলিয়াছি, আমি প্রবঞ্চক, দেবতার সহিত শঠতা করিতে গিয়াছিলাম তাই দেবতা আমাকে এই শাস্তি দিলেন। দেবতার পূজার পাঁচ শত টাকা ফাঁকি দিয়াছি, তাই আমার দশ হাজারে ঘা পড়িল। বাপ সকল—যাও আগে সরস্বতী প্রতিমা আন, এই ভস্মস্তূপের উপর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিব, নচেৎ দেবতার ক্রোধের শাস্তি হইবে না"। বলিয়া নন্দাকে কোলে টানিয়া লইয়া গাহিয়া উঠিলেন—

"কোথায় গো মা নন্দরাণী, কোলে নে তোর নীলমণি!"

আঁখি।

কি মন্ত্র মোহন, মরি, আঁখির ভিতরে,
চঞ্চল, সলিল অই অপূর্ব্ব শোভন!
একটিও বাণী যবে নহে মুখরিত;
কহে হৃদয়ের কথা কত যে গোপন!
কখনো উজল কভু বিষাদে মলিন
হৃদয়ে যে ভাব উঠে, ফুটে তার ছায়া,—
মরমের কথা তা'ও নিমেষে বিলীন।
আঁখিতে ফুটিয়া উঠে কি যে মোহ, মায়া!
স্বর ক্ষীণ, ভাব তুচ্ছ, কুটিল অন্তর
মুখের কথা যে,—তায় নাহিক বিশ্বাস;
আঁখি শুধু, আঁখি শুধু নির্ম্মল সভায়
হৃদয়ের গান গাহে,—স্বরূপ উচ্ছাস!

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক জাপান।

(ফেলিসিয়ঁ শালের ফরাসী হইতে)

আচার ব্যবহার, আমোদ উৎসব।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টতা ও হৃষ্টচিত্ততা এই তিনটী গুণের জন্য জাপানীরা বিখ্যাত; এই তিনটি উঁহাদের বহু পুরাতন জাতীয় গুণ। উঁহাদের কতকগুলি আচার ব্যবহারে এই গুণগুলি বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।

জাপানীদের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। প্রায় সকল গৃহেই, সকল পান্থশালাতেই এক একটা স্নানাগার আছে। একটা গরম উনানের উপর একটা বড় কাঠের টব থাকে। উহারা খুব গরম জলে স্নান করে। স্নানাগারের দরজা কখনই তালা চাবি দিয়া বন্ধ করে না। আমাদের লজ্জার কিংবা আমাদের নির্লজ্জতার কতকগুলা ধরণধারণ জাপানীদের নিকট একেবারেই অজ্ঞাত। "জাপানে নগ্ন লোক প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের দিকে কেহই তাকাইয়া দেখে না"। এই সব গৃহ ও পান্থশালার স্নানাগার ছাড়া, আরও অনেকগুলি সরকারী স্নানাগার আছে। টোকিওতে ১১০০ সরকারী স্নানাগার। খুব নিম্ন শ্রেণীর জাপানীরাও—পুসু পুসু গাড়ি-পরিচালক "কুরু-মাইয়া"রাও—দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়া স্নান করে; অনেকেই তিন চারিবার স্নান করে। প্রসিদ্ধ জাপানবাসী অধ্যাপক চেম্বার্লেন বলেন, কোন সুদূর গ্রামের কতকগুলি চাষা দৈহিক অপরিচ্ছন্নতার জন্য আমার নিকট মাপ চাহিল:

—"আমরা গ্রীষ্মকালে বড়ই অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকি; গ্রীষ্মকালে আমাদের এত কাজ, দিনের মধ্যে কেবল দুইবার মাত্র স্নান করিতে পাই।"

—"আর শীতকালে?"

—"ওঃ! শীতকালে আমরা চার পাঁচ বার স্নান করি।"

এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের দরুন, জাপানী জনতা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন প্রীতিজনক এমন আর কোথাও দেখা যায় না। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাদের গাত্র হইতে জিরানিয়ম পুষ্পের মৃদু গন্ধ যেন অনবরত বাহির হয়।

বলা বাহুল্য এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসটি য়ুরোপের আমদানী নহে, বরং য়ুরোপীয়েরা যদি এই বিষয়ে জাপানীদের অনুকরণ করে ত ভাল হয়।

জাপানী ভদ্রতাও য়ুরোপীয় ভদ্রতার অনুকরণ নহে। জাপানীরা আলিঙ্গন করে না, হস্ত পীড়নও করে না। জাপানীরা খুব সম্মানের সহিত প্রণাম করে—অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করে; যখন দাঁড়াইয়া থাকে, তখন খুব নত হইয়া প্রণাম করে এবং সেই সময়ে একটা সুখময় নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়; যখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া থাকে, তখন একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে—মাদুরে মুখ ঠেকে। গৃহস্বামী সম্মানপাত্র অতিথিকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ

করে, এবং অতিথি না উঠিলে কখনই আগে দাঁড়াইয়া উঠে না। উহারা অনেক প্রকার ভদ্রতার 'বুলি' ব্যবহার করে। বুলিগুলি খুব অদ্ভুত, খুব মজার-ধরণের, খুব চিত্তাকর্ষক! মনে কর, পান্থশালার পরিচারিকা হাঁটু গাড়িয়া তোমার পার্শ্বে বসিয়া আছে, তুমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছ :—"মাননীয় চা কিম্বা মাননীয় পিষ্টক আমাকে একটু দিতে আজ্ঞা হোক্।"

সুদূর প্রাচ্যখণ্ডের সমাজ উচ্চনীচতার সোপানপরম্পরায় গঠিত হইলেও উহাদের ভদ্রতায় কেমন একটা সাম্যের ভাব লক্ষিত হয়, এবং য়ুরোপীয় সমাজ গণতন্ত্রিক হইলেও, উহাদের ভদ্রতায় একটা রূঢ় প্রভুত্বের ভাব প্রকাশ পায়। ইহা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। চির প্রথা অনুসারে জাপানীরা তাহাদের দৈনিক জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যে কেমন একটি মাধুর্য্য, কেমন একটা হৃদ্যতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। মারামারির দৃশ্য, ঝগড়াঝাঁটির দৃশ্য প্রায় দেখা যায় না। ধমকধামকও ঠাণ্ডাভাবে হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়দিগকে সহজে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া জাপানীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়; উহারা ইহাকে স্থূল প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া মনে করে। জাপানীদের কতকগুলি অভ্যাস আছে যাহা অতীব মনোরম ও সুকুমার। একটা দৃষ্টান্ত :—কেনা-বেচার বাণিজ্য ব্যাপারে এক প্রকার কঠোরতা আছে যাহা জাপানীদের সূক্ষ্ম মর্ম্মে আঘাত করে। এইরূপ বাণিজ্য ব্যাপারে যখন পরস্পরের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হয় উহারা তখন হৃদ্যতা বিনিময়ের অবসর খোঁজে। কোন একটা সওদা হইয়া গেলে, শুধু মূল্য দিলেই সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া উহারা মনে করে না; তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ করিতে হইবে, একটু ভদ্রতার অঙ্গভঙ্গী করিতে হইবে, মুখে একটু হাসির ভাব আনিতে হইবে। পুরাতন আদর্শের জাপানী হোটেলে, হোটেলকর্ত্তা ঠিক্‌ঠাক্ দাম ধরিয়া বিল প্রস্তুত করেন; হোটেলে অতিথি আপন ইচ্ছাসুখে হোটেলকর্ত্তাকে স্বল্পাধিক মূল্যের একটা "চায়ের উপ-ঢৌকন" প্রদান করেন। ইহাই হোটেলকর্ত্তার প্রধান লভ্য। ইহার প্রতিদান স্বরূপ, হোটেলকর্ত্তা বহু ধন্যবাদ সহকারে কতকগুলি ছোট ছোট জিনিস উপহার দেন; যথা,—হাত-পাখা, পিষ্টকাদি, বড় বড় ফুলকাটা গাম্‌ছা ইত্যাদি। এইরূপ উপহারের আদান প্রদানে ক্রেতা বিক্রেতার কঠোর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়া বন্ধুতার বিনিময় হয়।

এই পুরাতন ভদ্রতা প্রায় সকলেই সহজভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে জীবনের কতটা মাধুর্য্য সম্পাদিত হয়,—যাহারা জাপানীদের মধ্যে বাস না করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বোঝা সুকঠিন। কোন কোন স্থলে জাপানী ভদ্রতায়, কেবল অন্তরের সূক্ষ্মতর সাধুভাব প্রকাশ পায়। উহারা বৃদ্ধগণের প্রতি যারপর নাই সম্মান প্রদর্শন করে, উহাদের কোন ইচ্ছাই অসম্পন্ন রাখে না; জাপানীদের এই ভাবটি বড়ই হৃদয়স্পর্শী। বৃদ্ধ হইয়াছি, প্রতিদিন একটু একটু করিয়া মরিতেছি, মৃত্যুর শেষদিন আসন্ন—এইরূপ অনুভূতিতে যে কষ্ট, ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট মানবের কিছুই নাই। যে জীবন শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে সেই জীবনের শেষ দিনগুলির কষ্ট উপশমের জন্য যাহারা চেষ্টা করে তাহাদের চেষ্টায় কেমন একটি সুন্দর

সদয়ভাব—সাধুভাব প্রকাশ পায়! জাপানী ভদ্রতা এক এক সময়ে উচ্চতম ধর্ম্মের আকার ধারণ করে,—আত্মশাসন,—আত্মসংযমের আকার ধারণ করে। আপনার কষ্ট প্রকাশ করিলে পাছে অন্যে কষ্ট পায়, এইজন্য উহারা আপনার কষ্ট চাপিয়া আপনাকে কষ্ট দেয়। স্মিত হাস্যের মধ্যেও কখনও আত্মবিসর্জ্জন প্রকাশ পায়—বীরত্ব প্রকাশ পায়। জাপানে হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করাই শিষ্টাচারের একটা বিশেষ লক্ষণ। একজন জাপানী আপনার প্রিয় জনের মৃত্যু সংবাদ সুস্মিতমুখে অপরকে জানাইতে পারে। নিজ দুর্ভাগ্যের অনিবার্য্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সে বন্ধুদের মনোকষ্ট এইরূপে নিবারণ করে। তাহার পর একান্তে গিয়া আপনার দুঃখকষ্টে গা ঢালিয়া দেয়; কেন না তখন সে নিশ্চয় জানে যে জগৎ তাহার অশ্রু দেখিতে পাইতেছে না; সে চাহে না যে তাহার দুঃখে, অন্যের সুখের কিছুমাত্র লাঘব হয়।

অতি ভদ্র, সর্ব্বদাই হাসি মুখ,—এই জাপানীদের মত হৃষ্টচিত্ত জাতি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। একটা সমস্ত জাতি কি করিয়া এইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইল? জাপানীর আমোদ আহ্লাদের মধ্যে যে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ পায়, তাহা কতকগুলি সহজ হৃদয়ভাবের সম্মিলনে উৎপন্ন। সেই হৃদয় ভাবগুলি;—দেশভক্তি, প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, পরিহাস রসিকতা, দয়া, পরহিতৈষিতা। প্রথমতঃ জাপানীরা তাহাদের দেশের জন্য গর্ব্বিত,—দেশকে তাহারা প্রাণের সহিত ভালবাসে, জাপানী জাতি বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে। তাহার পর, জাপানীরা প্রকৃতির বিবিধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে, এবং এই প্রকৃতির ধ্যানেই তাহাদের মুখ্য সুখ ও আনন্দ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে উহারা কিরূপ মুগ্ধ হয় তাহা উহাদের চমৎকার শিল্প সামগ্রীতেই প্রকাশ পায়। হাস্যজনক ব্যাপারে, অদ্ভুত অসঙ্গত কার্য্য দেখিলে উহাদের খুব আমোদ হয়। হাস্যজনক অতিরঞ্জিত চিত্র—সংএর ছবি—ভাঁড়ামি (Caricature) দ্বাদশ শতাব্দি হইতে জাপানে চলিয়া আসিতেছে,—ইহাতে জাপানী জাতির পরিহাস-রসিকতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। অবশেষে, উহারা, সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধকে সুচারু শিষ্টাচারের দ্বারা বিভূষিত করে।

জাপানীদের আমোদ প্রমোদ য়ুরোপীদের আমোদ প্রমোদ হইতে স্বতন্ত্র। উহারা সুরা পানে মত্ত হয় না। আমি তিন মাস কাল জাপানে বাস করিয়াছি, এই তিন মাসের মধ্যে আমি কেবল একটা জাপানীকে মাতাল হইতে দেখিয়াছিলাম; সেও যেখানে য়ুরোপীয়েরা কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছে সেই 'কোবে' নগরের একটা ইংরাজি সুরাপান-শালা হইতে তাহাকে নির্গত হইতে দেখিয়াছিলাম। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া জাপানীরা মৃগয়ার নিষ্ঠুর আমোদে প্রবৃত্ত হয় না। স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট কন্‌ফিউসের এই মতটি এখনো প্রচলিত রহিয়াছে। জাপান-রমণীরা গৃহের মধ্যে একেবারে অবরুদ্ধ না থাকিলেও অধিকাংশ সময় তাহারা গৃহেই যাপন করে। স্ত্রীলোকের রাজদরবার ও কোন কোন বিশেষ মণ্ডলী ছাড়া লোকালয়ে বাহির

হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার কিংবা 'বল্'-নৃত্যে যোগ দিবার প্রথা নাই। রাজ দরবারে মধ্যে-মধ্যে 'বল্'-নৃত্য ও উৎসবাদি হইয়া থাকে, তাহাতে কতকগুলি য়ুরোপীয়ও নিমন্ত্রিত হয়।

ধনীদের প্রিয় আমোদ—বড় বড় ভোজ দেওয়া। 'গেইশা'দের কথাবার্ত্তায়, নৃত্যগীতে সেই ভোজের উৎসব খুব সজীব হইয়া উঠে। এই গেইশা-শ্রেণী বেশ্যা শ্রেণী (জোরো) হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ইহারা দেশের বাছা বাছা সুন্দরী,—এবং খুব সুশিক্ষিতা। ইহারা কথাবার্ত্তা কহিতে শিখে, নাচিতে শিখে; শিলাই করিতে শিখে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে শিখে। ইহারা জাপানী সমাজের শোভা ও আনন্দ। উহাদের নৃত্য শুধু কতকগুলি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী, এবং উহাদের নৃত্যে পদ বিক্ষেপ অপেক্ষা বাহুবিক্ষেপই সমধিক; সাধারণতঃ এই সকল নৃত্য এক প্রকার মূক অভিনয়; কোন ঐতিহাসিক কিংবা ঔপন্যাসিক ঘটনা উহারা এইরূপ নৃত্যের দ্বারা অভিনয় করে। এই সকল উৎসবে কতকগুলি গেইশা নৃত্য করে, কতকগুলি গেইশা "শামিসা" ও "কোটো" যন্ত্র বাজায় কিংবা নৃত্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গান করে।

কি ধনী কি দরিদ্র—জাপানী মাত্রেই নাট্যাভিনয়-ভক্ত। (এই বিষয় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব)। সকলেই কুস্তি-লড়াই দেখিতে ভাল বাসে। কুস্তি-পালোয়ানদিগের একটা বিশেষ শ্রেণী আছে। উহারা পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে এই কাজ করিয়া আসিতেছে। অন্যের তুলনায় উহাদের শরীর প্রকাণ্ড। এক প্রকার চক্র অঙ্গনের মধ্যে, অসংখ্য লোকের সম্মুখে, প্রায় নগ্ন হইয়া উহারা মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের পাশে একজন মধ্যস্থ বিচারক থাকেন,—তাঁহার হাতে একটা হাত-পাখা থাকে। যে যোদ্ধা, পর-পর তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর জয়লাভ করে, সেই বিজয়ী বলিয়া পরিঘোষিত হয় ও জয়মাল্য লাভ করে।

জাপানীদের একটা সেরা আমোদ—পদব্রজে ভ্রমণ। ইহার মত সহজ মানসিক আমোদ আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। নেত্র সমক্ষে উপস্থিত বিবিধ পরিবর্ত্তনশীল চিত্র উপভোগ করা, যেখান দিয়া চলিতেছ, সেই স্থানের দ্রব্য সামগ্রী, লোকজন, জনতা, বাড়ী, মন্দির, অরণ্য, জীবজন্তু, পুষ্প, প্রস্তর, মেঘ প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হওয়া, বিশ্বপ্রকৃতির এক একটী ক্ষণিক দৃশ্য যাহা কখন আর ফিরিয়া আসিবে না, সেই সকল দৃশ্যের ক্ষণিক সৌন্দর্য্য আস্বাদন করা, সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থকে আদরের সহিত গ্রহণ করা, ভাল বাসা,—ইহাই জাপানী ধরণের ভ্রমণ।

জাপানীরা প্রথমত নিজ নগর সমূহের বড় বড় রাস্তায়—যেমন মনে কর,—টোকিও, নাগোইয়া, অসকা কিংবা কিয়োটো নগরের, বাজার ও নাট্যশালার রাস্তায় ভ্রমণ করে। সেখানে যাহা কিছু দেখে তাহাতেই তাহারা যারপরনাই আমোদ পায়। অধিকাংশ লোকেই সপরিবারে আইসে; পিতামহ প্রভৃতি বৃদ্ধ আত্মীয়দিগকে খুব যত্নের সহিত

আগ্‌লাইয়া রাখে, উজ্জ্বল রঙের কাপড়-পড়া শিশুদিগকে, পিতা মাতা, ভাই কিংবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাঁধে করিয়া লইয়া যায়। পুস্‌পুস্‌-গাড়ী (কুরুমা) ঐ ভীড় ঠেলিয়া, ভীড়ের মধ্য দিয়া চলিতেছে। স্মিতমুখী নর্ত্তকীরা (গেইশা) স্বকীয় ব্যবসা-সূচক উজ্জ্বল রঙের পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিতেছে। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় বাজার এবং অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান। **Impressionist** চিত্রকরের আঁকা ধ্যাবড়া রঙের ছবির মত, ইতস্ততঃ ঐ সকল দোকানের বহু-রঙা কাগজ-লণ্ঠনের আলোর ধ্যাবড়া ছায়া পড়িয়াছে। দোকানের সম্মুখে সজ্জিত কাপড়গুলা রমণীরা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতেছে, জিনিসের দামদস্তুর লইয়া কসাকসি করিতেছে, আর কেবলি হাসিতেছে। দীপালোকিত উদ্যানে গিয়া, উহারা—বরফ, চিনি ও সোডা দিয়া প্রস্তুত কুল্পি-বরফ সেবন করিতেছে।

জাপানে লোকপ্রিয় বিবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান ঘন ঘন হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবেই জাপানীদের আমোদপ্রিয়তার পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। অনেক সময় এই উৎসব জাপানের কোন বিশেষ অঞ্চলের উৎসব। এই সাম্বৎসরিক উৎসবের সময়, লোকেরা দল বাঁধিয়া কোন-একটা মন্দির প্রদক্ষিণ করে; রাস্তাগুলা দীপালোকিত ও বিভূষিত হয়। ছোট-ছোট পাঁচ-রঙা পতাকা গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়; রং মেলানো কাগজের লণ্ঠনসকল প্রতি গৃহদ্বারের সম্মুখে স্থাপিত হয়, তাহার উপর লাল কিংবা নীল কাগজের ছোট ছোট ঢাকা চড়াইয়া দেওয়া হয়। রাস্তাগুলা—বিশেষতঃ সায়াহ্নে—একটা অপূর্ব্ব অবাস্তব ভাব ধারণ করে। কাগজ, কাঠ, পাথর, পালোক, খড়,-প্রভৃতি খেলো জিনিসের উপর শিল্প চাতুর্য্য প্রযুক্ত হইয়া উহাই রমণীয় ও ক্ষণভঙ্গুর সৌন্দর্য্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। এবং কি ধনী কি দরিদ্র কয়েক দিন ধরিয়া সকলেই সায়াহ্নে উহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে।

কতকগুলি উৎসব, জাপানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৩ মার্চ্চ তারিখে, ক্ষুদ্র বালিকাদের উৎসবে, অসংখ্য পুতুল ও খেল্‌নার প্রদর্শনী হয়। ৫ই মে তারিখে, বালকদের উৎসবের দিনে, সমস্ত নগর ও গ্রামে, জাপানীরা তাহাদের গৃহের সম্মুখে একটা বংশদণ্ড স্থাপন করে; তাহার মাথায়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উজ্জ্বল রঙের কাগজের মাছ জুড়িয়া দেয়; ঐ মাছগুলা বাতাসে ফুলিয়া উঠে ও নড়িতে থাকে। বাড়ীতে যতগুলি ছেলে ততগুলা মাছ রাখা হয়; যেমন স্রোতের বাধা সত্ত্বেও মাছ নদী বাহিয়া চলে, সেইরূপ সন্তানেরা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইবে, পিতামাতারা এই শুভাকাঙ্ক্ষা এই প্রকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ দিন সহরের সমস্ত লোক, এই কৃত্রিম মৎস্যের অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য, পার্শ্ববর্ত্তী কোন একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর আরোহণ করে। এইরূপ স্বাস্থ্যকর সস্তা আমোদ আহ্লাদের প্রাচুর্য্য জাপানী জীবনের একটা বিশেষত্ব। বিশেষত পল্লীগ্রামের মাঠ ময়দানেই জাপানীরা বেড়াইতে ভালবাসে। জাপানের বাহ্য প্রকৃতি অতীব রমণীয়! জাপানীরা এই প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুরাগের দৃষ্টিতে দর্শন করে। তথাকার 'আভ্যন্তরিক সমুদ্রের' স্বচ্ছ নীলিমা, ফুজিয়ামার চূড়াস্থিত চিরনীহারের শুভ্রতা, নিকো ওয়ামাদার পবিত্র

অরণ্যের রহস্যময় ভাব উহারা বড়ই ভালবাসে। বিশেষত সেই সকল ভূখণ্ড উহারা দেখিতে ভালবাসে—যেখানকার দৃশ্য সমধিক পরিবর্ত্তনশীল;—যথা, পদার্থ সমূহের চঞ্চল বিচিত্র আভা, মেঘের চলিষ্ণুতা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সদ্যঃ পতিত বরফের উজ্জ্বলতা। উহারা জীবজন্তুর গতিবিধি, পক্ষী কিংবা কীটের গতিবিধি শিল্পীর দৃষ্টিতে দর্শন করে। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি, সারস পক্ষীরা সরকারী উদ্যানের দেবদারু ও প্রস্তরময় দীপ স্তম্ভের মধ্যে বিচরণ করিতেছে—খুব নিম্নশ্রেণীয় জাপানীরাও সেই দৃশ্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছে।—যে সব জিনিসের প্রতি খুব সুকুমার-রুচি য়ুরোপীয়েরাও উদাসীন, সেই সব জিনিসের সম্বন্ধে জাপানীরা ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে; পাথরের আকার ও গঠন তাহারা খুব মনোযোগের সহিত দেখে; এবং তদনুসারে তাহাদের সৌন্দর্য্যের তারতম্য নির্দ্ধারণ করে।—বিশেষতঃ ফুলের উপর তাহাদের খুব আসক্তি। শোণিতাপ্লুত যুদ্ধ বিগ্রহ কিংবা দুঃখাবহ রাজ বিপ্লবাদির সাম্বৎসরিক উপলক্ষে আমাদের দেশে যেরূপ উৎসব হয়,—সেইরূপ জাপানীদের লোকপ্রিয় জাতীয় উৎসব সকল কতকগুলি বিশেষ ফুলের উদ্গম-কালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সব ছোট খাট জিনিসেই জাপানীদের মনের অন্তস্তল প্রকাশ হইয়া পড়ে,—উহাদের সরস কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। উহারা ফেব্রুয়ারী মাস হইতে উৎফুল্ল-হৃদয়ে ফুলগাছের ফুল দেখিবার জন্য ও তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিবার জন্য দলে দলে বাহির হয়। কত পুরাতন গানে এই সৌরভের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এপ্রিলের আরম্ভে ‘চেরি-’গাছের ফুল, মের আরম্ভে ‘অ্যাজালে’ ও ‘গ্লিসিন’ গাছের ফুল ও অগষ্ট মাসে পদ্মফুল দেখিবার জন্য উহারা বাহির হয়। শরৎকালে ‘মেপ্‌ল্‌’-গাছের লাল পাতা দেখিতে যায়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহটা গাঁদা-ফুল ফুটিবার সময়! বড় বড় সহরের আশপাশে, অমুক-অমুক গ্রাম অমুক-অমুক ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ। কি সরকারী উদ্যান—কি ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব উদ্যান—জাপানী উদ্যানমাত্রই আমাদের উদ্যান হইতে ভিন্ন। সরু সরু বালির রাস্তা, ‘পাইন’ ও মেপ্‌ল্‌ গাছ, বড় বড় গাছ, বেঁটে গাছ, ঝোপ্‌ঝাপ্‌, (এই ঝোপ্ ঝাপ্‌গুলা, ফুল ও পাতার রং দেখিয়া নির্ব্বাচিত হয়) একটি ঝিল্‌, কতকগুলি ছোট ছোট স্রোতস্বিনী, কতকগুলি সেতু; কতকগুলি শৈল স্তূপ, কতকগুলি পাথরের লণ্ঠন, সিন্তোধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার মন্দির:—এই সকল অপরিহার্য্য উপাদান প্রত্যেক জাপানী-উদ্যানে না থাকিলেই নয়, এবং এই সমস্ত ছবির মত সাজানো থাকে। ওসাকা নগরের একটা চা-বাগান বর্ণনা করিয়া একজন জাপানী বন্ধু আমাকে লিখিয়াছিলেন,—“আর দুই সপ্তাহের মধ্যেই, আইরিস্‌ ফুলের প্রথম ফুল ফোটা দেখিবার জন্য, ওসাকার সমস্ত অধিবাসী এখানে সমবেত হইবে।”—যে স্থান এইরূপ সুন্দর ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ, কিংবা যেখানকার দৃশ্য মহান্‌—যেখানে অরণ্য আছে দ্বীপ আছে, সরোবর কিংবা ঝরণা আছে, সেইখানেই এক একটা মন্দির নির্ম্মিত হয়! জাপানীরা সপরিবারে সেইখানে যাইতে ভালবাসে; পিতামহ প্রভৃতি বৃদ্ধ আত্মীয়দিগকে ও সমস্ত ছোট ছেলেদিগকে সেইখানে লইয়া যায়; এই তীর্থযাত্রায় তাহাদের খুব আমোদ হয়।

প্রথমেই উহারা দেবতাদিগকে প্রণাম করে। মন্দিরের সম্মুখে যে সব নুড়ি বিছানো থাকে, সেই সব নুড়ী যাত্রীদের পদভরে কড়মড় শব্দ করিতে থাকে, উহারা যে দেবদর্শনার্থ আসিয়াছে, এইরূপে দেবতাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়;—পান্থশালায় ঘণ্টা বাজাইয়া ও হাততালি দিয়া যেমন চাকরদের ডাকা হয়, সেইরূপ যাত্রীরা ঘণ্টা বাজাইয়া ও হাত তালি দিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করে; তাহার পর যাত্রীরা দেবতাদের নিকট একটা ছোটখাটো প্রার্থনা করে এবং হাসিমুখে দানাধারের মধ্যে কিঞ্চিৎ অর্থ গুঁজিয়া দেয়। বিশেষত পুরাতন খোদাই-কাজ, সোনার গিল্টিকরা গালার কাজ, “কাকেমোনো” দেখিবার জন্যই উহারা মন্দিরে আসে। অবশেষে উহারা সকলে মিলিয়া সপরিবারে, গল্প করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে ঐ পবিত্র স্থলের পার্শ্ববর্ত্তী ‘চা গৃহে’ গমন করে।

অধিকাংশ তীর্থ স্থানই মন্দির ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মিলিত সৌন্দর্য্যে অতীব রমণীয়। লোকে যে বলে, জাপানীর বাস্তু নক্‌সার কল্পনা ঠিক্ যেন ছবি—একথা খুবই ঠিক্। উহার রং ও রেখাগুলি কেমন সুন্দরভাবে বিন্যস্ত; উহাদের নিকট মূল-ইমারতের যতটা গৌরব, ইমারতের প্রাকৃতিক অলঙ্কারগুলিরও ততটা গৌরব। সাধারণতঃ সুন্দর রঙে রঞ্জিত কাঠের কিংবা গালার সুন্দর দ্বার প্রকোষ্ঠগুলি কোন একটা পাহাড়ের উপর, একটার উর্দ্ধে আর একটা মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষ শাখার মধ্য হইতেও দেখা যায়, লাল গালার দেবালয় সকল আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। নিক্কোর মন্দিরগুলি একটা পাহাড়ের উপর খাড়া হইয়া রহিয়াছে। এক প্রকার আশ্চর্য্য তরুপুঞ্জের দ্বারা পাহাড়টা আচ্ছন্ন,—অসংখ্য স্রোতস্বিনীর জলে পরিসিক্ত; আবার য়ামাদার মন্দিরগুলি একটা রহস্যময় অরণ্যের হৃদয়-দেশ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। সব চেয়ে, মিয়া-জিমার মন্দিরটি আমার ভাল লাগে; এই মন্দির-টি একটা পর্ব্বতময় দ্বীপের পার্শ্বদেশ হইতে উঠিয়াছে; দ্বীপটি দেবদারু ও মেপ্‌ল্‌-গাছে আচ্ছন্ন: মধ্যকার ইমারৎটি জল স্থলের সীমান্ত দেশ হইতে যেন সমুত্থিত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে বহুমূল্য পুরাতন চিত্র সকল সংরক্ষিত। উহার প্রধান দ্বার প্রকোষ্ঠটি খোলা-সমুদ্রের উপর খামখেয়ালিভাবে অবস্থিত; অসংখ্য প্রস্তরময় লণ্ঠনের বীথি দিয়া অন্যান্য দ্বারে উপনীত হওয়া যায়; সেখানে হরিণেরা প্রশান্তভাবে বিচরণ করিতেছে; যাত্রীদের যাতায়াতে তাহারা ভয় পায় না; সেখানকার বায়ু অতীব স্বচ্ছ; সমুদ্র সুন্দর নীল; সুঁড়ি-সমুদ্রের অপর পারে, সুদূরে বেগুনী রঙের পর্ব্বতমালা; এবং মাছ ধরা নৌকাদের চতুষ্কোণ খড়ের পা’ল, উজ্জ্বল সৌর কিরণে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। এই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে জাপানের পুরাতনভাব যেরূপ জাজ্জ্বল্যমান এমন আর কোথাও নহে।

এই সকল মন্দিরে আসিয়া জাপানীরা সেরা-সেরা শিল্প সামগ্রী ও সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধনেত্রে দর্শন করে। ধর্ম্মভাব ও পিতৃপুরুষদের কীর্ত্তি চিন্তা, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গভীরতা ও রহস্যকে আরও যেন বর্দ্ধিত করে, আরও যেন ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলে। এই জাপানী তীর্থ যাত্রা শুধু ভ্রমণ মাত্র নহে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানচিন্তার ভাব আছে, নিঃস্বার্থ হৃদয়-

ভাবের সংস্রব আছে। যে জাতি সর্ব্বান্তঃকরণে শিল্পী সেই জাপানীদের নিকট এই তীর্থযাত্রা একটা চূড়ান্ত আমোদ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অমর গুচ্ছ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এক সপ্তাহ তিনি আমাদের অতিথি হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের মত ক্ষণস্থায়ী অতি ক্ষুদ্র একটি মাত্র সপ্তাহ; কিন্তু এই কালবুদ্বুদবিন্দুর সংস্পর্শে, আমার সুপ্তহৃদয় কি অভিনব মধুর অভিজ্ঞতায়, কি অসীম সুখ হিল্লোলে চঞ্চল, জাগরিত হইয়া উঠিল। বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে—সে সপ্তাহ এমন আত্মহারাভাবে কাটিয়াছিল যে আমার সেই প্রতিদিন পূজ্য ছবিখানি পর্য্যন্ত দেখিতে মনে পড়ে নাই।

অতিথি যে কয়দিন ছিলেন প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু কথাবার্ত্তা কিছুই প্রায় হইত না। দাদাতে তাঁহাতে ইংলণ্ডের গল্প করিতেন, আমি মুগ্ধ কর্ণে শুনিয়া যাইতাম। কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত,—কিন্তু কে জানে কেন জিহ্বাগ্রে আসিয়া সমস্তই নীরব হইয়া পড়িত।

অতিথি দূরে থাকিলে কত প্রশ্ন, কত কথা মনে মনে রচনা করিয়া রাখিতাম, কিন্তু তাঁহার পদ শব্দ শুনিলেই হৃৎপিণ্ডে শোণিতরাশি এমন বেগে উথলিয়া উঠিত যে মনে হইত সে শব্দ যেন তাঁহার কাণে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতেছে। আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতাম। অতিথি নিকটে আসিয়া প্রতিদিন একটি দীনা, মলিনা, বাকশক্তিহীনা বালিকাকে মাত্র দেখিতেন! দেখিয়া কি মনে করিতেন তিনিই জানেন।

সকলেই বলিত আমাদের অতিথি বেশ সুপুরুষ। আমি মনে করিতাম তাঁহার মত সুন্দরপুরুষ সংসারে দ্বিতীয় নাই। যখন ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাকে একত্র দেখিতাম তখন আমার নয়নে নক্ষত্র বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভা পাইতেন। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিতে, ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আমার কখনও সাহস হইত না। নয়নে নয়ন সংলগ্ন হইলেই দৃষ্টি আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িত। এই চকিত দর্শনেই কি মহাপুলক শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিত! জানিনা পূর্ণ দর্শনে, পূর্ণ বাক্যালাপে ইহা হইতেও অধিক সুখ সম্ভব কিনা!

সপ্তাহ প্রায় কাটিয়া আসিল। অতিথির বিদায়ের আর একটি দিন মাত্র বাকী আছে। দাদা সেই দিন আমাদিগকে লইয়া টাইগারহিলে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নইনিতালের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম টাইগারহিল। এখান হইতে তুষারাচল শ্রেণী—অতিশয় সুবিস্তৃত ও

মনোহররূপে নেত্রগোচর হয়। দারজিলিং গিয়া সিঞ্চলশিখর হইতে প্রত্যুষে মেঘশূন্য নির্ম্মল দিগন্তে নব সূর্য্যকিরণদীপ্ত তুষারশৃঙ্গরাজির শোভা যিনি না দেখেন তাঁহার যেমন দারজিলিং যাত্রা বৃথা, টাইগারহিল হইতে হিমালয় শোভা না দেখিলে নইনিতাল যাত্রাও সেইরূপ সুসিদ্ধ হয় না।

আমরা পরদিন স্নিগ্ধ সূর্য্যালোকসিঞ্চিত প্রাতঃকালে ফুল্ল-বসন্তশোভিত পার্ব্বত্য পথে সুন্দর দৃশ্য ও সুগন্ধ বায়ু উপভোগ করিতে করিতে শিখর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

শিখর পথ স্থানে স্থানে প্রশস্ত, স্থানে স্থানে অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এবং সর্ব্বত্রই কষ্টকর চড়াই। যাত্রাকালে দাদারা অশ্বারোহণে আমার ডাণ্ডির দুইপার্শ্ব অবলম্বন করিয়া চলিলেন,—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তফাৎ হইয়া পড়িলাম। অশ্বারোহী দুইজন কখনও আমার পাশে, কখনও সম্মুখে, কখনও নিকটে, কখনো দূরে, কখনও আবার বাঁক পথে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন —কিন্তু পথিপার্শ্বের দৃশ্যমান গোলাপ পুষ্পোত্থিত সুরভির ন্যায়, এবং দূরাগত অদৃশ্য বসন্তহিল্লোলের ন্যায়—দূরে বা নিকটে সর্ব্ব সময়েই আমি তাঁহাদের নৈকট্য অনুভব করিতেছিলাম।

বসন্তকালে নৈনিতালের মত রমণীয়শোভা অন্য কোন পাহাড়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পর্ব্বতের ঢালু অঙ্গে, উচ্চশৈলে, পথের আশেপাশে, সম্মুখে পশ্চাতে, যেখানে সেখানে, নবপল্লবিত, শৈবালজড়িত শ্যামকান্তি তরুরাজি। তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, শাখায় পাতায়, বন্য গোলাপলতা জড়িত বিজড়িত হইয়া একে দুয়ে, স্তবকে গুচ্ছে, ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। আমার মনে হইতে লাগিল, নাজানি এ কোন মায়াকাননের মধ্য দিয়া, কোন পরীরাজ্যের দিকে প্রধাবিত হইয়াছি!

নয়নদৃষ্টিতে প্রতি পলকে পলকে অলকার এই সৌন্দর্য্য বিকাশ, নিশ্বাসের আকর্ষণে আকর্ষণে এই সুরভি উচ্ছ্বাস, এবং জানিনা ইহা ছাড়া আর কি, আমাকে সুখোন্মত্ত করিয়া তুলিল। অতি সুখে আত্মহারা হইয়া ভুলিয়া গেলাম আমি বিধবা। এতদিনের সযত্ন অভ্যস্ত আত্মসংযম এক মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলিয়া বালিকা-স্বভাব সুলভ চপল বাসনায় আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি স্বহস্তে কতকগুলি গোলাপ তুলিবার মানসে ডাণ্ডিওয়ালাদিগকে ক্ষণকালের জন্য ডাণ্ডি নামাইতে বলিলাম।

কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালাদিগের এখন গোলাপবাগানে কাটাইবার সময় নহে। স্কন্ধের বোঝা যথাস্থানে নামাইতে পারিলেই তাহারা আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচে। অতএব আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া হন হন করিয়া চলিতে চলিতে তাহারা বলিল—"উপরে ঢের ফুল আছে, সেখানে গিয়া তুলিলেই হইবে।"

কি করিব? সেই আশাতে প্রলুব্ধ হইয়া অগত্যা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কখন যে শিখরে আসিয়া পড়িয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! সহসা একস্থানে ডাণ্ডিওয়ালাদের সমতান শব্দ অকারণে যেন নীরব হইয়া গেল, আর তন্মুহূর্ত্তে ডাণ্ডিখানাও তাহাদের স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূমে নামিয়া পড়িল। চমকিয়া উঠিলাম, মনে হইল একি এ কোথায় নামাইতেছে! কিন্তু অশ্বারোহীগণকে নিকটে দেখিয়া মুহূর্ত্তে আশ্বস্ত বোধ করিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কি মনোমুগ্ধকর চমৎকার দৃশ্য! চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম কি যেন ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের পদতলের পাহাড় দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, আমরা তুষারদৃশ্য সম্মুখে করিয়া এক সমুচ্চ চূড়ায় চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি। তুষারাচল শ্রেণী, দিগ্বলয় বিলোপ করিয়া উচ্চনীচ শত শৃঙ্গে, স্তরে স্তরে, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে, নীল শুভ্র মেঘাম্বরে—হীরকমণ্ডিত স্তম্ভ শোভায়, শত নক্ষত্রদীপ্তিতে অপূর্ব্ব গম্ভীর মহিমায় বিভাসিত! ইহাই কি কৈলাশ! আমরা কি সহসা জীবন্মুক্ত, সশরীরে দেব-নিকেতনে আগমন করিলাম! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বিভ্রম হইতে লাগিল, ভয় হইতে লাগিল এখনি এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভৃত্যগণ আগে হইতে আসিয়া একটি ক্ষুদ্র শিবিরে খাদ্যাদি প্রস্তুত রাখিয়াছিল।—সেখানে বিস্তর কালক্ষেপ না করিয়া যথা সম্ভব শীঘ্র আমরা বাহিরে প্রত্যাগমন করিলাম। ডাণ্ডিওয়ালাদিগের আশ্বাস বাক্য তখন স্মরণ হইল; আমি চারিদিকে গোলাপ লতার অন্বেষণে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু হা অদৃষ্ট! গোলাপফুল ত দূরের কথা, কোনফুলই সেখানে দৃষ্টি গোচর হইল না। এমন কি শিখরতলে তরুলতার শ্যাম শোভা পর্য্যন্ত নাই, ক্ষুদ্র তৃণ গুল্মাদিতেই মাত্র তাহা আবরিত।

ডাণ্ডিওয়ালাদিগের প্রতারণা বুঝিয়া তাহাদের উপর মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম।—কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাই তাহাদের চূড়ান্ত অপরাধ হইলেও বাঁচিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিতে না বাজিতে তাহারা আমাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।—বলিল, নিম্ন পথে অন্ধকার হইয়া গেলে বিপদ সম্ভাবনা। আমি ভাবিলাম—আবার একটা প্রতারণা, এ কেবল আমাদিগকে শীঘ্র গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ফন্দী মাত্র।

কি করিয়া আমি তাহাদের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব! ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা কি করিয়া তখন আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে? আমি যে তখন সংসারানভিজ্ঞ, নিতান্ত অদূরদর্শী, ষোড়শবর্ষের বালিকা মাত্র। আমি তখন কেবল অনুভব করিতেছিলাম আমার অন্তর বাহিরের মধুরতা, আমার মোহময়, সুখময় অস্তিত্ব। তাহার পরপার দর্শনের ক্ষমতা আমার তখন কোথায়? বর্ত্তমান সুখে মাত্র আমি তখন পূর্ণ ভাবে জাগ্রত, জীবন্ত, মগ্ন।

কিন্তু আমার ইচ্ছা আমার অসন্তোষ প্রকাশের সাহস আমার নাই। বালিকা হইলেও আমি যে বিধবা, চিরদিন সুখের ইচ্ছা গোপন করিতে অভ্যস্ত। আজ সহসা

এ বাসনা জানাইলে দাদা কি মনে করিবেন? আর অতিথিই বা কি মনে করিবেন? তথাপি আমি আজ মৌন থাকিতে পারিলাম না, দাদাকে আগ্রহে বলিলাম; "দাদা আর একটু বেড়ান যাক্, নিদেন আমরা একটুখানি বরঞ্চ হাঁটিয়া নামি, ঐ মাইল ষ্টোনের কাছে গিয়া ডাণ্ডিতে উঠিব।" দাদা তাহাতে হাসিয়া সম্মত হইলেন। আমরা তিনজনে হাঁটিয়া নামিতে লাগিলাম, ভৃত্যেরা আমাদের অনুবর্ত্তী হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমরা শতপদ নামিয়াছি কি না সন্দেহ, দেখিলাম আমাদের বামদিকে, অদূরের একটি শৈল গাত্রে কতকগুলি ফুল ফুটিয়া আছে। আজ আমার কি হইয়াছে কে জানে! এত-দিনের সযত্নরুদ্ধ মনোদ্বার এই মুগ্ধ শিখরবায়ুতে সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়া বুঝি আর স্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত হইতে চাহে না! আমি লজ্জা সঙ্কোচ ভুলিয়া স্বাভাবিক উচ্ছাস ভরে বলিয়া উঠিলাম,—"দেখ দাদা দেখ, কি সুন্দর ফুল!"

দাদা বলিলেন—"তাইত! কিন্তু তুই গোলাপ খুঁজছিলি, ও ত গোলাপ নয়।" আমি বলিলাম—"তবুও কি সুন্দর! তুলিবার যো নেই—না! যে দূরে!"

ইহাতে কি কাহারো প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরোধ ব্যক্ত হইল? কে জানে। অতিথি আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"এমনি কি দূরে; আমি আনিতেছি।" বলিয়া তিনি কাহারো নিষেধ বাক্য স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বেই সোৎসাহে ক্ষিপ্রপদে খদে নামিতে আরম্ভ করিলেন।

যে পাহাড়ে ফুল ফুটিয়াছিল তাহা আমাদের দূরবর্ত্তী না হইলেও একটি স্বতন্ত্র শৈল। এদিক দিয়া সম্ভবত কেহ সেখানে যায় না—উভয় পাহাড়ের মধ্যে কোন পদচিহ্নই নাই। অতএব পথ যাহা তাহা সমস্তই বিপথ, প্রথম কিয়দংশ ঢালু পিচ্ছিল অবরোহণ, পরে দুরূহ আরোহণ, এবং উভয় পাহাড়ের সন্ধিস্থলে প্রস্তরস্তূপ পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র পয়োপ্রণালী। বর্ষাকালে তাহা জলপূর্ণ হইয়া থাকে, এখন উহার কোথাও স্বল্পজল, কোথাও একেবারে শুষ্ক। তিনি এইরূপ বিপদসঙ্কুল, বিপর্য্যয় পথে কখনো দ্রুত অবতরণে কখনো সুধীর আরোহণে, কখনো বৃক্ষশাখা ধরিয়া, কখনও সাবধানে প্রস্তরখণ্ডে পদরক্ষা করিয়া গম্যস্থান উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

প্রশান্ত প্রভাতে সহসা ঝটিকা সূচনা দেখিলে লোকে যেরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠে, দাদা এই কাণ্ড দেখিয়া সেইরূপ বিব্রত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমিই এই অনর্থের মূল,—আমাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু ক্রোধে, তিরস্কারে কিছুতেই এখন আর এ কর্ম্মফল খণ্ডিত হইবার নহে, হঠাৎ যেন এই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, আমার প্রতি তাঁহার জনান্তিকে ভর্ৎসনা সংহরণ পূর্ব্বক, তিনি অতিথিকে, প্রকাশ্য উৎসাহ বাক্যে এই দুঃসাহসিক কার্য্য সমাধায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

আর আমি? পাঠিকা কি আমার তখনকার মনের অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন? সত্যই আমি তাঁহার এই বিপদের কারণ। তাহা ভাবিয়া আমি কি ভয়ে অনুতাপে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলাম? মোটেই নহে। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে, মুগ্ধনেত্রে তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাতে ভয় বা অনুতাপের লেশমাত্র মিশ্রিত ছিল না। যদি শাখা হইতে শাখান্তরে হস্তচালনার সময় হস্ত স্খলিত হয়, যদি শৈল হইতে শৈল খণ্ডে পদরক্ষার সময় পদচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য। কিন্তু শিশু যেমন অগ্নিকে সম্মুখে দেখিয়াও তাহার দাহিকাশক্তিতে অজ্ঞান থাকে, আমিও সেইরূপ এই বিপদ প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহার সম্ভাবনা বোধ করি নাই। তাঁহার এই দুঃসাহসপূর্ণ গতিতে, বীরত্বপূর্ণ অঙ্গচালনায়, আমি কেবল তখন চৌম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া একটি পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার এই পৌরুষিক তেজ উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়া, জীবনে এই প্রথম আমি আমার অন্তর্নিহিত রমণী-শক্তির আস্বাদ লাভ করিলাম। তাহা কি সুমধুর! কি উপাদেয়! কি মোহময়!

তিনি যখন এই বিপদরাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফুল আহরণপূর্ব্বক নিরাপদভূমিতে পদার্পণ করিলেন, তখন যেন আমার চৈতন্যোদয় হইল। সেই সম্ভাবিত বিপদ কল্পনা করিয়া তখন আমার ভয়ের সঞ্চার হইল, তাঁহাকে বিপদমুক্ত দেখিয়া আমি রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলাম।

অতিথি আমাদিগের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্য দিগন্তে নামিয়া পড়িল। তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়াই ভ্রাতা আমাকে ডাঙিতে উঠিতে আজ্ঞা করিলেন। যাহার জন্য এত কষ্ট করিয়া তিনি ফুল তুলিলেন, এখন আর তাহার হস্তে সেগুলি সমর্পণ করিবার অবসর ঘটিল না। তাঁহার নৈরাশ্য কল্পনা করিয়াই বোধ হয় ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমি নিঃশব্দে ডাঙির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

কলিকাতা—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

ওরাওন জাতি।

ওরাওন জাতি ছোট নাগপুরের কৃষিজীবি সম্প্রদায়। ইহাদের কোন লিখিত ইতিহাস নাই এবং ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কথা বলিয়া থাকে; এমন কি স্থান বিশেষে ইহারা বিভিন্ন নামেও অভিহিত হয়। এই জাতির পুরাতন কাহিনী যাহা প্রাচীন ওরাওনদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে এইটুকু বুঝিতে পারি যে—কর্ণাট তাহাদের আদিম বাসভূমি। তথা হইতে নর্ম্মদা নদীর কূল বাহিয়া ইহারা শোন নদীর তীরে বিহার প্রদেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। কিন্তু মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাহারা শাহাবাদ হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, একভাগ গঙ্গার ধার দিয়া রাজমহল গিরি-প্রান্তে উপনীত হয়। এই দলের বর্ত্তমান জাতির নাম—মালী। অপর দল শোন বাহিয়া পালামৌ অতিক্রম করিয়া কোয়েলের পূর্ব্বদিক্ দিয়া ছোট নাগপুর মানভূমির উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯০১ সনের আদম শুমারীর গণনায় বঙ্গদেশে ওরাওনদের সংখ্যা ৬০০০০০ নির্ণীত হয়, ইহার অর্দ্ধেক এক রাঁচি জেলাতেই বাস করে। এতদ্ব্যতীত তথায় ৬০০০০ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ওরাওন আছে। সেই বৎসর প্রায় বিংশ সহস্র ওরাওন কুলিরূপে আসামের চা বাগিচায় নিযুক্ত ছিল।

ওরাওন শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কিছু ফল পাওয়া যায় না। এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বাদিম মূল পুরুষের নাম রায়োনা; সম্ভবতঃ এই নাম হইতেই রাওন বা ওরাওন শব্দের উৎপত্তি। ইহারা কুরুক্ষ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কঙ্কন প্রদেশ ইহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান ছিল। যাহাই হউক, আমাদের বোধ হয়, 'ওরাওন' শব্দে 'পার্ব্বতীয় লোক' ইত্যাকার অর্থ সূচিত হইত। আসাম, ভূটান, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ওরাওন আছে তাহারা 'ধাঙ্গোড়' নামে অভিহিত হয়। কোন কোনও স্থানে ইহারা 'কোল' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা দ্রাবিড়ীয় বংশসম্ভূত।

ডালটন্ মহোদয়ের Ethnography of Bengal গ্রন্থে ওরাওনদিগের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎপাঠে উহাদের সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহাদের আচার ব্যবহার, পূজা-অর্চ্চনা, ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। রিজলী সাহেবের Tribes and Castes of Bengal পুস্তকেও ইহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কিন্তু পরলোকগত পি, ডেহোন মহোদয় এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রে ওরাওনদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক ব্যবহার, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে যেরূপ মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বর্ণনাতে অনেক নূতন বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আমরা তাহার কোন কোন অংশ সংকলন করিয়া ভারতীর পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

উৎপত্তি। ওরাওনগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানে যে, তাহাদের সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তির নাম রাওন; তিনি দক্ষিণ প্রদেশের প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাহারা একটী প্রাচীনগাথা 'পাল-খাস্না' উৎসবের সময় 'ধর্ম্মেশ' দেবতার সম্মুখে আবৃত্তি করে,—তাহা হিন্দু রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বিষয়ক পৌরাণিক উপাখ্যানের বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র। তাহাদের এই গাথা ও পৌরাণিক লঙ্কার অধিপতি রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ উপাখ্যান প্রায় অভিন্ন। যাহা হউক্ তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা অবশেষে রুইদাসে গিয়া উপনীত হয়, এবং হিন্দু বা মুসলমানদের (ঠিক বলিতে পারে না) আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার মানসে তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। প্রথমতঃ দু'একটি ক্ষুদ্র সংগ্রামে তাহারা বিপক্ষগণকে পরাজিত করে। একদা এক উৎসব দিনে তাহারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আছে, এমন সময় শত্রুগণ সহসা আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকার করিল, সম্মুখে যাহাকে পাইল তাহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিল। কেহ কেহ পলায়ন করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু বিপক্ষেরা পলাতকগণের অনুসরণ করায় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া একদল পলামৌ অভিমুখে প্রস্থান করে, আর একদল রাজমহল গিরিশ্রেণী-অভিমুখে পলায়নপর হয়। শেষোক্তেরা এখন সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি হইয়া 'মালী' নামে পরিচিত হইতেছে। প্রথম দল পলামৌ যাইয়া গ্রীষ্মাধিক্য-বশতই বোধ হয়, তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ না করিয়া গিরিশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক লোহারদাগায় উপস্থিত হইয়া মুণ্ডাদিগের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে।

যাহারা মুণ্ডা ও ওরাওন এই উভয় জাতির বিবরণই অবগত আছেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না যে, মুণ্ডাগণ এই নবাগত জাতিকে নিজের দেশে বসবাস করিবার অধিকার দিয়া ধীরে ধীরে নিজেরাই অন্যত্র প্রস্থান করে। এখনো এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন দেশে, যেখানে বন-জঙ্গল কাটিয়া নূতন আবাসের স্থান প্রস্তুত হইয়াছে, ওরাওনগণ তথায় বাস করিতে যায় এবং তাহাদের সংখ্যাধিক্য-বশতঃ অচিরেই এই নূতন স্থানে প্রাধান্য বিস্তার করে। অপর পক্ষে মুণ্ডারা অতিরিক্ত রক্ষণশীল এবং অপরিচিতের সহিত বাস করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক বলিয়া ওরাওনগণকে পরিত্যাগ করিয়া অপর জঙ্গলাভিমুখে প্রস্থান করে। মুণ্ডারা জমিদার ও ভূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় ঘৃণা করে; তজ্জন্য সম্ভব হইলে এক নির্জ্জন কোণে থাকিয়া তাহাদের সামান্য বাস্তুভিটা ও জমি জমা লইয়া নিষ্করে ভোগ-দখল করিতে চেষ্টা পায়। কোন নূতন গ্রাম পত্তন হইলে জমিদার তাহা অধিকার করেন, সুতরাং তাহারা উহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়—এ কথা কিছুই অসম্ভব নহে। অপর পক্ষে দাসত্বে চিরাভ্যস্থ ওরাওনগণ সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। অবশ্য ইহার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস নাই, তবে 'ভুনিয়ার' দিগের অবস্থা দেখিয়া এইরূপই অনুমিত হয়।* বারওয়ে, শেচারি ও শিরগঞ্জের প্রথম অধিবাসী—ভুনিয়ার নামে অভিহিত

* Colonel Dalton ইহাদিগকে Bhunhiers নামে অভিহিত করিয়াছেন।

হইয়া থাকে, ঐ শব্দের অর্থ প্রথম বাসিন্দা বা অধিবাসী। ছোটনাগপুরের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পূর্ব্বোক্ত দেশত্রয়, মুণ্ডা ও ওরাওনগণের প্রথম অধিকৃত প্রদেশ পলামৌ হইতে পালকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত গিরিশ্রেণী কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়াছে। যে দুই একজন মুণ্ডা এই গিরি শ্রেণী অতিক্রম করিয়া বারওয়ে, শেচারি প্রভৃতি প্রদেশে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করে, এই ভুনিয়ারগণ তাহাদেরই বংশসম্ভূত। উভয় জাতিরই আচার-ব্যবহার প্রাচীন জনশ্রুতি প্রভৃতি অভিন্ন। ইহা কি অসম্ভব যে, ওরাওনগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাহারা লোহারদাগা হইতে পালকোট অভিমুখে বিস্তৃত হইয়া পড়ে আর কতিপয় মুণ্ডা, বারওয়ে ও শেচারির ভ্রাতৃবৃন্দকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করায় সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়? ওরাওনগণ কুক্‌রা (Kukra) ছাড়িয়া, ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতশৃঙ্গাবলী উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে শেচারি ও বারওয়েতে (Barway) আসিয়া আবাস নির্ম্মাণ করে। ইহারা নিম্ন ভূমি এবং মুণ্ডারা উচ্চ ভূমি বা পর্ব্বতের উপরিভাগ অধিকার করে। কর্ণেল ডাল্‌টন ভুনিয়ারদিগকে পৃথক জাতি বলিয়াছেন কিন্তু যাহারা কিয়দ্দিবস ঐ প্রদেশে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা এ অভিমত স্বীকার করেন না। বারওয়ের প্রাচীন ব্যক্তিরা এখনো বলিয়া থাকেন যে, বাল্যাবস্থায় নাগপুরের মুণ্ডাদের সহিত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ব্যবহার তাঁহারা দেখিয়াছেন। মুণ্ডাদের নিকট হইতে শিরগঞ্জের ভুনিয়ারগণই অধিক ব্যবধানে বাস করে, তদ্ধেতু কেবল ইহাদের নাম মাত্র শুনা যাইত। এখনো শেচারিতে ভুনিয়ার ও মুণ্ডারা অভিন্নভাবে পরিচিত এবং বারওয়ে—প্রাচীন সম্প্রদায়দিগের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া তথায় তাহারা একমাত্র মুণ্ডা নামে পরিচিত। এক্ষণে তাহারা মুণ্ডাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায় তাহাদের নিজের ভাষা হারাইয়াছে এবং প্রাচীন কিম্বদন্তী ও দেবতা পরিত্যাগ করায় একটী পৃথক্ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনো ইহারা বলিয়া থাকে যে, নাগপুরে যাইয়া তাহাদের জ্ঞাতিবর্গকে সকল বিষয় বুঝাইয়া বলিলে, তাহারা ইহাদিগকে এক জাতি বলিয়াই বিবেচনা করে কিন্তু ইহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান নাই।

পল্লী সংস্থান। কোন কোন পল্লীতে ওরাওনরা একত্র হইয়া বাস করে; স্থান-বিশেষে একশত বা দুইশত ঘর ওরাওন এক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করে। অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন গৃহ থাকে। ইহারা অতিশয় এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহাদের পাড়ার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবার কোন সুগম পথ থাকে না। অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ রাস্তা দিয়া পরস্পরে গৃহে গমনাগমন করে। অপরিচিতের পক্ষে দিবাভাগেই এই পথ দিয়া যাতায়াত করা কষ্টকর, রাত্রির কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। মিঃ ডোহান লিখিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের পক্ষে ওরাওনদিগের পল্লী গোলকধাঁধা বিশেষ। কোন ইংরেজকে এই পল্লীতে যাতায়াত করিতে হইলে একজন পথ-প্রদর্শকের সাহায্য-গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এতদ্ব্যতীত ইহারা

অতিশয় কদর্য্যভাবে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, বর্ষাকালে বারিধারা সহসা এই পল্লীভেদ করিয়া প্রস্থানের অবসর পায় না, বহুদিন পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল এই গোলকধাঁধায় যেন দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক ওরাওন পরিবারে ৫।৬টী করিয়া শূকর থাকে, এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত তাহারা অন্যান্য পশ্বাদিও পালন করে। বর্ষার সময় এই সকল পশু একহাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়াইয়া যে, কি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পর নানাপ্রকার পদার্থ পচিয়া যে দুর্গন্ধ বহির্গত হয়, তাহা অপরিচিতের নাসারন্ধ্রে তীব্র ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু শূকর-সমূহ ও ওরাওন-শিশুগণ এই বর্ষার সময়েও মহা হৃষ্টচিত্তে দলবদ্ধ ভাবে নানা প্রকার ক্রীড়া নিরত-ভাবে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে।

ওরাওনদের বাসগৃহগুলি ক্ষুদ্রায়তন এবং সেগুলির উচ্চতাও অধিক নহে। সাধারণতঃ পনর ফিট্ দীর্ঘ, সাত ফিট উচ্চ এবং ছয় ফিট প্রশস্ত চারিখানি মাটীর দেওয়ালের উপর তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই দেওয়াল চতুষ্টয়ের একখানির মধ্য স্থলে সাড়ে চারি ফিট পরিমাণ ফাঁক থাকে তাহাই দরজা। ইহারা ঘরে অতিরিক্ত মাটী তুলে না অর্থাৎ সমতল ভূমি হইতে গৃহ উচ্চ করে না। এই ঘরের উভয় পার্শ্বে বারান্দার ন্যায় একটু উচ্চ স্থান থাকে, তাহাতেই শূকরগুলি সারা দিনরাত মারামারি ও চীৎকার করিতে থাকে।

গৃহখানি তিনটী অংশে বিভক্ত; একভাগে গো-মহিষাদি ও ছাগল থাকে। এই অংশের মধ্যস্থলে গোটাকতক বাঁশ দিয়া বিভাগ করা হয়; তাহারই এক অংশে গো মহিষ ও অপর দিকে ছাগল থাকে। গৃহাভ্যন্তরে এই অংশে প্রবেশের নিমিত্ত বংশ-নির্ম্মিত একটী করিয়া দ্বার থাকে। গৃহের অপর প্রান্তের অংশটি ভাঁড়ার ঘররূপে ব্যবহৃত হয়। দ্রব্য সামগ্রী রাখিবার মৃৎপাত্র ও ভাণ্ড সমূহ এবং কাঁসা ও পিতলের বাসনগুলি একত্রে গায়ে গায়ে সাজান থাকে। গৃহের মধ্য-স্থলে যে অংশটি থাকে, তাহাই ওরাওনদের রান্নাঘর ও বৈঠকখানা। সচরাচর এক এক কক্ষে তিনটী করিয়া চুল্লী থাকে; রান্নার সময় অর্দ্ধশুষ্ক কাষ্ঠ ইন্ধন-স্বরূপ নিয়োজিত করে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, পাকের সময় উহাদের সকলেই কাশিতে ও হাঁচিতে থাকে এবং চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ কক্ষটিতে ধূম বহির্গমের সামান্যমাত্রও ছিদ্র থাকে না। তাহাদের এই গৃহের প্রবেশ-দ্বারের উপর কোনরূপ আবরণী থাকে না, কেবলমাত্র একটা কাঠের মোটা গুঁড়ি ঐ স্থানে এমনি ভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, যে ঐ কাষ্ঠগোলক আপনাআপনি ঘুরিতে থাকে, ইহাকে 'কাপর পোরা' বলে; ইহার অর্থ 'কপাল-ভাঙ্গা।' তাৎপর্য্য এই যে, অসাবধানতা ক্রমে কিম্বা দ্রুতবেগে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেই এই ঘূর্ণমান কাষ্ঠদণ্ডের আঘাতে কপাল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়।

বিবাহ প্রসঙ্গ। ওরাওন যুবক যুবতীর বিবাহ ব্যাপারে কোনই স্বাধীনতা নাই, জনক জননীর আদেশেই সমস্ত নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বাল্য বিবাহ ইহারা পছন্দ করে না, একটু বেশি বয়সে যুবক যুবতীর বিবাহ হয়, ইহাই তাহাদের আন্তরিক কামনা। তাহা হইলেও সচরাচর ষোড়শবর্ষ বয়সে বালকের এবং চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে।

পুত্র ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই তাহার জনক জননী বিবাহের পাত্রীর অন্বেষণে নিযুক্ত হয়। তাহারা মনোমত পাত্রী দেখিতে পাইলে পাত্রীর পিত্রালয়ে যাইয়া, তাহার জনক জননীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে। কন্যাকর্ত্তা প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে বর দেখিবার জন্য একটী দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। ধার্য্য দিনে পাত্রীর পিতা বা অপর যে কর্ত্তা থাকে, বরের গৃহোদ্দেশ্যে বহির্গত হয়। পথিমধ্যে তাহারা নানারূপ মঙ্গলামঙ্গল নিদর্শন দেখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। শৃগাল পথের দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে গমন করিলে, মৃৎপাত্রে কোনো রমণী ভস্ম ও বস্ত্র লইয়া গেলে, মৃতপ্রাণীকে সৎকারের নিমিত্ত লইয়া যাইতে দেখিলে, সর্প বা শকুন রাস্তা অতিক্রম করিলে, বৃক্ষ হইতে শাখা বা ফল চ্যুত হইলে, শৃগাল বা পেচক চীৎকার করিলে তাহারা যাত্রা অমঙ্গল জনক বলিয়া বিবেচনা করে। অপর পক্ষে কোনো রমণীকে জলকুম্ভ লইয়া যাইতে দেখিলে বা গোবরের চাপড়া দিতে দেখিলে, বাম হইতে দক্ষিণে শৃগাল গমন করিলে এবং মর্কট রাস্তা অতিক্রম করিলে—যাত্রা শুভ বলিয়া তাহাদের ধারণা হয়। এই শুভাশুভের নিদর্শন আরো আছে, বাহুল্য বোধে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

কন্যাকর্ত্তা বর-গৃহে পদার্পণ করিলেই, পথিমধ্যে শুভাশুভ কি কি নিদর্শন অবলোকন করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। কোনো একটী অশুভ চিহ্ন দেখিয়া থাকিলে, এ বিবাহ দেওয়া উচিত নহে বলিয়া তাহারা উভয় পক্ষই স্থির করে। তাহারা এই সময় বলিয়া থাকে,—"ভাই, পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, এ বিবাহ সংঘটিত হয়; তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, তৎবিপরীত কোনো কার্য্য করা আমাদের উচিত নহে।" আর যদি কোনো অশুভ নিদর্শনই কন্যাকর্ত্তা পথিমধ্যে দেখিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহারা সকলে মিলিয়া পানাহার করতঃ 'পণ-বান্ধি'র জন্য একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করে।

পণবান্ধি বা মূল্যনির্দ্ধারণ। প্রথম মিলনের আট দিন পরে সচরাচর এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ধার্য্যদিনে বরের পিতা গ্রামের অপর কতিপয় মাতব্বর ব্যক্তির সমভিব্যাহারে আড়াই মন ধান্য, দেড় মন গম কিছু উরিদ ও অড়হর লইয়া কন্যার আলয় অভিমুখে যাত্রা করে। প্রথম দিনের মূল্যের নিমিত্ত এই দ্রব্যগুলির প্রয়োজন হয় এবং এই দিন হইতে উভয় কর্ত্তা অর্থাৎ বরের পিতা ও কন্যার পিতা পরস্পরকে 'সামদি' বলিয়া অভিহিত করিতে আরম্ভ করে। এইদিন প্রদোষে আর কিছুই হয় না; পরদিবস প্রাতঃকালে কন্যার মাতা, গ্রামের অপরাপর কর্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া বরের পিতার পদ প্রক্ষালন ও তৈলমর্দ্দন

করিয়া দেয়। বরের পিতা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ নগদ একটী মুদ্রা দান করে এবং বিবাহের দিনে আর চারিটী দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইহাকেই 'পণবান্ধি' বলে। তৎপরে আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হয়। গ্রামের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়; দুইটী বালক আগন্তুক-দিগকে তৈল মর্দ্দনে নিযুক্ত থাকে। পল্লীর প্রত্যেক সমর্থ পরিবার হইতে—এক হাঁড়ি করিয়া চাউলসিদ্ধ মদ্য সংগৃহীত হয়; তৎপর সকলে একত্রে বসিয়া পান ও আমোদ প্রমোদ করিতে আরম্ভ করে। একাল পর্য্যন্ত পাত্রীর কোন কার্য্য ছিল না, এই সময় অকস্মাৎ সে এক হাঁড়ি মদ মাথায় করিয়া জনতার মধ্যে দেখা দেয়; তদ্দর্শনে সকলেই তাহার প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকে। বালিকা মদ্যভাণ্ডসহ জনতা ভেদ করতঃ তাহার ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, শ্বশুর তাহার মস্তক হইতে হাঁড়িটী নামাইয়া লইয়া স্নেহালিঙ্গন করতঃ একটী মুদ্রা প্রদান করে; এবং ভোজন ও আমোদ প্রমোদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাত্রী তাহার ভাবি শ্বশুরের পায়ের নিকট বসিয়া থাকে। সমস্ত গ্রামবাসী একত্রে পান ও গল্প গুজব করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া ক্রমশঃ এতই উচ্চ স্বরে কথা কহিতে থাকে যে তখন একজনের কথা অপরে কিছুমাত্র শুনিতে পায় না। এই সময় কৌতুক দেখাইবার অভিপ্রায়ে প্রাচীনা ওরাওন রমণীরা পত্রনির্ম্মিত চিত্তাকর্ষক টুপি পরিধান করতঃ মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে, সয়তানীর ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গি করিতে করিতে তৃণ নির্ম্মিত খর্ব্বাকার এক মূর্ত্তি বহন করিয়া আনয়ন করে। এই মূর্ত্তি ভাবি জামাতার বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই রমণীগণকে দেখিলে ঠিক যেন প্রাচীনা যাদুকরী বলিয়া মনে হয়; তাহারা মত্তাবস্থায় নানাপ্রকার অনিষ্ট করিয়া থাকে। এ সময়ে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর সহিত এই রমণীগণের অসভ্যভাষায় যে কথোপকথন হয় ও এ সময় তাহারা যে সকল অশ্লীল গান করে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। এইরূপে 'পণবান্ধি' উৎসব সম্পন্ন করিয়া আগন্তুকগণ স্বস্ব গৃহে গমন করে। ইহার ২।৩ বৎসর পরে উদ্বাহ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে কন্যার পিতা বৎসরে দুইবার করিয়া বরের পিতার গৃহে নিয়মিত দর্শন দিয়া থাকে; একবার আষাঢ় মাসে, ইহাকে আষাঢ়ী বলে; এবং আর একবার অগ্রহায়ণ মাসে; ইহাকে অগ্রাণী দেখা বলে। এই দুই আমোদের সময় বরের পিতাই আগন্তুকগণের তৃপ্ত্যর্থে মদের সরবরাহ এবং ছাগ বা শূকর বধ করিয়া থাকে।

ঘরবাড়ী। বিবাহের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আর একবার ইহাদের সম্মিলন ও আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে; উহাকে 'ঘরবাড়ী' বলে। এই দিন কন্যার পিতা গ্রামের 'পাঁচকে' (অর্থাৎ পাঁচজন ব্যক্তিকে লইয়া বিবাহের দিনস্থির করিতে বরের পিত্রালয়ে গমন করে। এবং এই উৎসবের জন্য পনর হাঁড়ি মদ্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও প্রায় প্রত্যেকেই এক এক হাঁড়ি মদ স্বস্ব গৃহ হইতে আনিয়া থাকে। কাযেই এ সময় মদের স্রোত বহিয়া যায়। নিমন্ত্রিত সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বর কন্যার পিতা বৈঠকের মধ্যস্থলে পৃথক একখানি মাদুরে উপবেশন করে, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা

উভয়ে দণ্ডায়মান হইলে জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হয়। তখন তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া একজন অপরকে বলে,—"উপরে পরমেশ্বর, নীচে এই পাঁচ; যে যাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক থাকো, এই সময় কর। লৌহের সহিত গ্রথিত বস্তু পৃথক করা যায় কিন্তু চর্ম্মের সহিত একীকৃত বস্তু বিচ্ছিন্ন করা যায় না।" তদুত্তরে অপর জন ঐ কথাই আবৃত্তি করতঃ শেষে বলে,—"এখনই সত্যকথা বলিবার সময়।" তৎপরে আগন্তুক সকলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে 'হোগিয়া, হোগিয়া'। তখন দুইটী বালক আসরে যাইয়া উভয় বৈবাহিককে তৈল মাখাইয়া দিলে পানাহার আরম্ভ হয়। পরদিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদের আমোদ প্রমোদ চলিতে থাকে। এই উৎসবে কতিপয় শূকর ও শূকর-শিশু নিহত হইয়া থাকে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

অশেষ।

বসন্তের ব্যাকুলতা
নিদাঘ ধরে রাখে,
মুকুল খসে, তরুণ ফল
ভরিয়া উঠে শাখে।
গন্ধটুকু ঝেড়ে ফেলে,
ঝরে পুষ্প দল;
বর্ণ গন্ধ মধু রসে
পূর্ণ হয় ফল!

শরতের ব্যাকুলতা
কোথায় এর শেষ!
শূন্য আজি সুদূর নভ,
মেঘের নাই লেশ!
কোথায় ফুল কোথায় পাতা
রিক্ত তরুগুলি!
জীর্ণ পত্রে পৃথ্বী ছায়
উড়িয়া চলে ধূলি!

১৯০০।

ব্যর্থ।

আজি এ পরাণে যত কথা ফুটে
শুধু অশ্রু হয়ে পড়ে টুটে টুটে
বাঁধিতে পারি না তায়!

শেফালি ফুটেছে কানন মাঝারে
রিক্ত তরু শাখে পথের কিনারে
বায়ু করে হায় হায়!

আজিকে উদাস শারদ আকাশ,
আলোক আঁধার বিজুলি বিকাশ
আসে যায় অনিয়ত!

বিফলে বাজাও বাঁশী আন মনে
কপোত গাহিছে অদূর বিজনে
এক সুরে অবিরত!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অমর গুচ্ছ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশীর চন্দ্র, ঠিক পূর্ণচন্দ্র বলিয়াই ভ্রম হইতেছিল। অসম্পূর্ণকলা—তবুও পূর্ণোজ্জ্বল পরমসুন্দর শশিকলা কখনও শুক্ল কখনও নীল, কখনও কৃষ্ণ মেঘের মধ্য দিয়া তরতর বেগে ভাসিতে ভাসিতে, ক্ষণে ক্ষণে দূরের ও নিকটের পর্ব্বতমালা ম্লান মধুর সৌন্দর্য্যে প্লাবিত করিয়া, আবার ক্ষণে ক্ষণে চারিদিক জলদ আবরণে ঢাকিয়া, সহসা পর্ব্বত আড়ালে লুক্কায়িত হইয়া পড়িতেছিল। ডাণ্ডিওয়ালারা যেন চন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া তাহার অপেক্ষাও তরতর বেগে ছুটিতে ছুটিতে আমাদের উদ্যানতলে আসিয়া আমাকে নামাইয়া দিল। জ্যোৎস্না-পুলকিত, সুগন্ধ-আকুলিত কাননখানি হাসিতে হাসিতে আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রীতিময়, সৌন্দর্য্যময়, জীবন অস্বাভাবিক সুখময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি একবার অতৃপ্তনয়নে চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বাটী-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভৃত্যকে ডিনার আনিতে আদেশ করিয়া, অসমাপ্ত গৃহকার্য্য যথাশীঘ্র সমাপ্ত করিয়া ড্রয়িংরুমে আগমন করিলাম। অতিথিও প্রায় তখনি এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে সেই ফুলগুচ্ছ, নয়নে বীরগর্ব্ব, অধরে আনন্দ হাস্য, তাঁহাকে কি সুন্দর, কি সাহসী, কি সুখী দেখাইতেছিল। মানুষ যে এত সুন্দর হইতে পারে, দেবকল্পনা ছাড়াইয়াও ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা ইহার আগে জানিতাম না। কেহ বলিলে বিশ্বাসও করিতাম না।

তিনি নিকটে আসিয়া হস্তেধৃত ফুলগুলি আমার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, "এই নিন্ আপনার ফুল। ইহা কিন্তু গোলাপ নহে, অমর গুচ্ছ।"

ফুলগুলি গ্রহণ করিলাম, নীরবে গ্রহণ করিলাম। একটিও কথা ফুটিল না, আমার জন্য এত কষ্ট করিয়া তিনি ফুল তুলিয়াছেন, একটি মৌখিক ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। কম্পিত দেহে, সলজ্জ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ফুলগুলি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথমবার তাঁহার দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি পূর্ণভাবে স্থাপিত হইল, হস্তে হস্ত স্পর্শ হইল, শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক পুলক প্রবাহ উথলিত হইয়া উঠিল, বায়ুমণ্ডলী কি এক মোহময় ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; তাহার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়া আমি বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম।

সহসা সে মোহ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ডিনারের ঘণ্টার শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। দাদাও তখনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিথির সাহসের প্রশংসা করিতে করিতে, তাঁহার হাত আপনার বাহু-মধ্যে টানিয়া লইয়া ভোজন গৃহে যাত্রা করিলেন। আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। এখানে আসিয়া তাঁহারা খাইতে বসিলেন, আমি বিধবা, তাঁহাদের সহিত একত্রে খাই না, আমি বসিয়া তাঁহাদের আহার দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ সমস্ত দিনের আনন্দভাব কেমন করিয়া কে জানে ধীরে ধীরে অর্দ্ধ বিষাদভাবে

পরিণত হইয়া পড়িল। অতিথিকে যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দাদা নানা কথা কহিয়া সে ভাব দূর করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, কিন্তু অতিথি অন্যদিনের ন্যায় পূর্ণহৃদয়ে তাহাতে যোগদান না করিয়া সংক্ষেপ উত্তরে মাত্র তাঁহার কথার সায় দিয়া যাইতেছিলেন। আহারান্তে অধিকক্ষণ তিনি ড্রয়িংরুমে বসিলেন না, জিনিসপত্র গুছাইতে হইবে বলিয়া শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করিলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। আমরা সেকৃহ্যাণ্ড করিতাম না; যাইবার সময় অন্য দিনের ন্যায় হাসিয়া তিনি আমাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর একটু থামিয়া good bye বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সেই হাসির মধ্যে, দৃষ্টির মধ্যে, বিদায় বাক্যের মধ্যে, এমন কি গমনের মধ্যেও যেন প্রচ্ছন্ন বিষাদ ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহা কি সত্যই তাঁহার মনের ভাব? না আমার নিজের মনের ছায়া মাত্র! পরদিন প্রত্যুষে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি যখন নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলাম—তখন আত্মদমন অসাধ্য হইয়া উঠিল! হৃদয় যন্ত্রণায় শতধা বিদীর্ণ হইয়া উঠিতে চাহিল, বন্যার ধারায় অশ্রু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন সুখোচ্ছাসে যাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম দুঃখের সময় আবার তাঁহাকে মনে পড়িল। এতদিন পরে পুনরায় আমার চন্দন বাক্সের সেই ছবি খানি বাহির করিয়া, মেরি মূর্ত্তির পদতলে অনুতপ্ত রোমান ক্যাথলিকের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া আমার মনের পাপবেদনা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

সেই অনুতাপ অশ্রুতে কি হৃদয় জ্বালা নিবৃত্তি হইয়া গেল? সেই আন্তরিক প্রার্থনায় কি তখনি আমি অসীম যন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভ করিলাম? হায়! কত কাল বাড়িয়া তবে বৃক্ষ ফল লাভ করে! কত কাল চলিয়া তবে নদী সমুদ্রে মিলিত হয়! আর মনুষ্যের বাসনাই কি মুহূর্ত্তে সফল হইবে? তাহার প্রার্থনাই কি ভগবান তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিবেন? তপস্যা বিফল হইবার নহে, ভগবৎপ্রসাদ মিথ্যা নহে; কিন্তু সকল সফলতার মূলেই ধৈর্য্য, আত্মদমন ও কালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। আমি ছবিখানি পুনরায় বাক্সে তুলিবার সময় অনুতপ্ত হৃদয়ের উপহারস্বরূপ সেই ফুলগুলি আমার পুণ্য মন্দিরে রাখিয়া দিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবার যখন তাঁহাকে দেখিলাম তিনি একা নহেন। দাদার বিবাহ উপলক্ষে আমরা বাটী যাত্রা করিতেছিলাম তিনি তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া এলাহাবাদ যাইতে-ছিলেন; বাঁকিপুর ষ্টেসনে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাদের সহিত আমাদের দেখা। তখনো ট্রেন ছাড়িতে কিছু বিলম্ব ছিল, তাঁহারা ততক্ষণ আমাদের গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। দাদা তাঁহাকে বিবাহিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে, বিবাহের নিমন্ত্রণ পান নাই বলিয়া সকৌতুক অভিযোগ বাক্যে কহিলেন "চিরদিন থেকে এই ভোজটার দিকে হাপ্রত্যাশ করে চেয়ে আছি—আর শেষে কি না ছোকরা বন্ধু বান্ধবদের একেবারেই ফাঁকি দিয়ে—একা একাই মেঠাইগুলো পার করলে হে; আপনিই বিচার করুন দেখি মিসেস চাটর্জ্জি,—এ

কি রকম ভয়ঙ্কর ফাঁকি,—এর শাস্তি আপনি কি ব্যবস্থা করেন ?" মিসেস চাটার্জ্জি, নববধূ,—নববিবাহের আনন্দ তাহার সুসজ্জিত পরিচ্ছদ হইতে, মুখে চোখে, ভাবভঙ্গিতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মধুর হাসি হাসিয়া, স্বামীর দিক হইতে দাদার দিকে চাহিয়া মৃদু প্রফুল্লস্বরে বলিলেন, "তা যদি বলিলেন, তাহলে আমিও বলি, আপনি একলা ফাঁকে পড়েন নি, আপনার বন্ধুটি তাঁর বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ না করে, আমাকেই বেশী রকম ফাঁকি দিয়েছেন। যা কিছু যৌতুক পাওয়া যেত তা থেকে আমি একেবারেই বঞ্চিত!"

দাদা তাঁহার বন্ধুর এই অপরাধ—নিতান্তই অমার্জ্জনীয় জ্ঞান করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং অবিলম্বে ছয় মাস ফাঁসিতে দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বিচারকের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন। সকলের হাস্য কৌতুক থামিলে আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মিসেস চাটার্জ্জি, আমি আপনার জন্য একটি যৌতুক রাখিয়াছি।"

আমার লেখার বাক্সটি আমার কাছেই ছিল, মিসেস চাটার্জ্জির সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি তাহা হইতে আমার চন্দন বাক্সটি তুলিয়া, অমর ফুলগুলি বাহির করিয়া লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি সেগুলি হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কি চমৎকার অনুকরণ! ঠিক যেন আসল ফুল!"

আমি বলিলাম,—"সত্যই আসল ফুল, অনুকরণ নহে।" তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যই আসল ফুল! আমি ত কখনও এরূপ ফুল দেখি নাই! ইহার নাম কি!"

"অমর পুষ্প!"

"বেশ ত নামটি,—যেমন ফুল তেমনি নাম! কোথায় পাওয়া যায় ?"

"ইহা পর্ব্বতের ফুল, পর্ব্বত ভূমিতেই পাওয়া যায়।"

"কতদিন তুলিয়াছেন ?"

"প্রায় ছয় মাস।"

"এখনো এমন ভাল আছে, আশ্চর্য্য ত! দেখুন মহাশয়, এমন সুন্দর ফুল কখন ও দেখিয়াছেন কি ? পরুন না!" স্বামী চকিত নেত্রে ফুলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে একবার বলিলেন—"হাঁ বেশ"! কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষার জন্য তাহা গ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। স্ত্রী বড় আগ্রহে স্বামীকে তাহা দিতে গিয়াছিলেন, স্বামীর ব্যবহারে নিরুৎসাহ ক্ষুণ্ণ হইয়া অভিমান ভরে বলিলেন—"আচ্ছা বাবু থাক্—তোমায় পরতে হবে না—আমি না হয়"—তাঁহার কথা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। সহসা প্রকাণ্ড শব্দে ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তিনি চকিতে নীরব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বামী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"চল চল, আর সময় নেই, ও সব হবে এখন।" ত্বরিত বিদায় গ্রহণে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন; একবার, দুইবার, তিনবার বাজিয়া ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেল, গাড়ীও পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

* * * * * *

সে রাত্রে আমি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখিলাম।—মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনী, চারিদিকের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই ঘন ঘোর নিবিড় গহনের মধ্যে একজন দেবপুরুষ আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া শূন্যমার্গে উঠিলেন; আমরা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে, ব্যোম হইতে ব্যোমে ভাসিয়া চলিলাম। ভাসিতে ভাসিতে একটি অত্যুচ্চ শৈল শিখরে আসিয়া তিনি যখন আমাকে নামাইয়া দিলেন তখন মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকের তিমির আবরণ অপসৃত হইয়া গেল; দিক দিগন্ত বিভাসিত এক অপূর্ব্ব আলোকে সেই দেবপুরুষ আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিলেন। এ কি ইনি কে ? ইনি যে আমার স্বামী দেবতা! আমার সেই যত্নরক্ষিত ছবিখানির যে ইনি সাকার প্রতিরূপ! কেন তবে ইঁহাকে এতদিন মৃত মনে করিয়াছি! ইঁহার জীবন্ত মূর্ত্তি যে আজি আমার নয়নে প্রত্যক্ষ বিরাজিত, ইঁহার বরবপুর স্পর্শে যে আজি আমার সমস্ত ভ্রান্তি দূর করিতেছে! এতদিন তবে আমি বৃথা কষ্ট করিয়াছি কেন ? অতিরিক্ত সুখোচ্ছ্বাসে আমি বিহ্বল হইয়া উঠিলাম, অমনি সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।—জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম অশ্রুধারায় নয়ন ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা সুখাশ্রু বা দুঃখাশ্রু কে বলিবে ?

সমাপ্ত।

ক্ষুদ্রজীব। (Microbe)

জগৎ চৈতন্যময়, এখানে অচেতন কিছুই নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম! সুতরাং সবেই চেতন। আধুনিক বিজ্ঞানও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। *

জগতে সকলই অণু, পরমাণু, পরম পরমাণুর † সমষ্টি। এ সকল কি ? ইহারা জ্ঞান চৈতন্যের অবস্থান্তর মাত্র ‡। এ কথা এ দেশে বহু পুরাতন।

সকলই যদি চেতন হইল, সকলই যদি জ্ঞানময় হইল, তবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবেরও যে জ্ঞান থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। জ্ঞান বিরহিত চৈতন্য হইতেই পারে না। যেখানে চৈতন্য, সেইখানেই জ্ঞান; পরিস্ফুট হউক, আচ্ছন্ন হউক জ্ঞান থাকিবেই। চৈতন্যই জগতে একমাত্র সত্তা; তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি আনন্দ। সুতরাং চৈতন্য জ্ঞানময়। জীব যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহার জ্ঞান থাকিবেই।

জগতে ক্ষুদ্র জীবের সংখ্যা অগণ্য। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্রজীব বর্ত্তমান। ইহারা দ্বিবিধ; কতকগুলিকে উদ্ভিদ ও অপরগুলিকে জন্তু বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যেও কেহ ছোট, কেহ বড়; কিন্তু সকলেই এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিলে দেখাই যায় না। ইহাদিগের অনেকের আয়তন মনে ধারণা করা অসম্ভব। সূচীর ছিদ্র

* The modern conception of matter tends to make the whole world alive.
J. A. Thomson.

† Ion.

‡ For that rason we regard matter, or the electrons of which matter is composed as Mixed Stuff. Origin of Life. P. 338.

কত ক্ষুদ্র; তাহার মধ্য দিয়াই এক সঙ্গে যাহারা লক্ষ লক্ষ গলিয়া যাইতে পারে, তাহাদিগের আয়তন কি মনে কল্পনা করা যায়! ইহাদিগের মধ্যে অনেক জীব এইরূপ * আয়তনের। এত ক্ষুদ্র দেহেও জীবন্ ধারণ ও বংশরক্ষণোপযোগী সমস্ত অঙ্গই আছে। ইহারা কেহ বা এক কৌষিক, অপরে বহু কৌষিক। যাহারা বহু কৌষিক, তাহাদিগের দেহ-কোষ ও বংশরক্ষক কোষের † গঠনও জটিল। এত জটিলতা,—ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেহে! তার পর অনেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতি পরিস্ফুট, উদর বিলক্ষণ ভোজনপটু, মুখ (এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের দিনেও) প্রায় সর্ব্বগ্রাসী ‡। এত ক্ষুদ্র দেহে এ সকল পৃথকরূপে অবস্থিত! স্থান কৈ? থাকে কোথায়? ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি এই সকল অতীব ক্ষুদ্র জীবকেও কিরূপভাবে নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

আবার, ইহাদিগের মধ্যেও জাতি ভেদ আছে; সকলে এক জাতীয় নহে। উহারা উদ্ভিদ ও জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহারা এত দুর জাত্যভিমানী যে, এক জাতীয়েরা অপর জাতীয়ের সহিত একত্র বাস কিম্বা পান ভোজন করিতে সম্মত হয় না। একখানি কাচের রেকাবে বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদ্র জীবকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত (culture) করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহারা পৃথক পৃথক জাতি পৃথক পৃথক স্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকে। এক স্থানে আনিয়া দিলেও সরিয়া গিয়া পৃথক স্থানে অবস্থিতি করে। ইহাদিগের মধ্যে গোরা আদ্মি, কালা আদ্মির প্রভেদ আছে কি না, জানি না। কিন্তু পরস্পরের সম্প্রীতিটা উহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। যা'ক! কিন্তু ইহারা নিজ নিজ জাতি চিনিয়া লয় কেমন করিয়া? ইহারা নিশ্চয়ই আপন আকৃতি জানে; নতুবা স্বজাতির ও পরজাতির সহিত প্রভেদ করিতেই পারিত না। এত ক্ষুদ্রেরও আত্ম-পরিচয় আছে!!

তাহার পর ইহাদিগের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতি উদরপরায়ণ; সর্ব্বদাই আহারান্বেষণ করে; তথাপি শাস্ত্রবহির্ভূত খাদ্যে ইহাদিগের মতি নাই। ইহাদিগের স্মৃতি শাস্ত্রে যেরূপ আহার যে জাতীয়ের পক্ষে বিধিবদ্ধ আছে, ইহারা কদাচও তাহা লঙ্ঘন করে না। যদি মানব জাতীয় কোন দুষ্ট বৈজ্ঞানিক গোপনে ইহাদিগের খাদ্যের সহিত অখাদ্য মিশ্রিত করিয়া দেয়, উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলে; এবং অখাদ্য স্পর্শও করে না; কেবল নিজের খাদ্যটী গ্রহণ করে। উহারা যে বুঝিতে না পারিয়া অখাদ্য গ্রহণ করতঃ পরে তাহা ত্যাগ করে, এমন নহে। উহারা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে; সেই হেতু অখাদ্য স্পর্শই করে না। য়্যাল্‌বুমেন্ (Albumen) এবং পাথুরে কয়লার চূর্ণ এক সঙ্গে মিশাইয়া

* They are so small that millions of them may swine through the eye of a needle. Miero-Organisms P. 34 (Griffiths).

† যে কোষ দেহ গঠন করে, তাহা দেহরক্ষক (Somatic) কোষ; আর যাহাতে বংশ রক্ষা হয়, তাহা বংশরক্ষক (Reproduction) কোষ।

‡ যাহাদিগের এ সকল আছে।

দিলে কয়লার চূর্ণ পরিত্যাগ করতঃ য়্যাল্‌বুমেনই আহার করে। যা' পায়, তা'ই খায়—এ কথা মানব শিশুর প্রতি প্রযুজ্য হইলেও উহাদিগের প্রতি প্রযুজ্য নহে। উহারা স্ব স্ব আহার বাছিয়া লইতে পারে।* এ শক্তি কি?

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইহাদিগের আত্ম পরিচয় আছে। এখন দেখিতেছি ইহাদিগের বস্তুজ্ঞানও আছে। কিন্তু ইহাদিগের রণনীতির কথা মনে করিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে গোপনে অপর জীবদেহে প্রবেশ করিবার সুবিধা এমন কাহারও নাই। চিরাতীত কাল হইতেই ইহারা এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে। ইহারা গোপনে জীবদেহে প্রবেশ করে; তখন বুঝা যায় না। তার পর ক্রমে ক্রমে আশ্রয়দাতার প্রাণ সংশয় করিয়া তুলে। মানব জাতির মধ্যে ইহাদিগের উপমেয় আছে কি না, তাহা বলা বিপজ্জনক; এখন ত বলিবই না। কিন্তু ইহারা একবার জীবদেহে প্রবেশ করিতে পারিলে আর নিস্তার নাই। তবে, ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে। কেহ নিরীহ, আশ্রয়দাতার কোনই উৎপাত করে না; অথবা অপরের আশ্রয় গ্রহণই করে না। কিন্তু অনেকেই অপর জীবদেহে নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে। ইহাদিগকে মারাত্মক বলা যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর—যাহাতে বাঙ্গালী জাতিকে প্রায় নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র জীবেরই কর্ম্ম। নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, খক্‌খক্ কাশি, (whooping cough) হাম্, বসন্ত, উপদংশ, মেহ, প্লেগ, ডিপ্‌থিরিয়া বা গলহারী, কুষ্ঠ, ধনুষ্টংকার ইত্যাদি নানাবিধ পীড়া, এই সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবেরই কর্ম্ম। ইহারা দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবার পর ক্রমে আপন ধ্বংস-ক্রিয়া বিকাশ করে, কিন্তু দেহরক্ষক রক্তকীটগণ (Phagocytes) সহজে তাহা করিতে দেয় না। উহারাও ক্ষুদ্র, এবং উহারাও কীট। কীট হইল ত কি? সহজে আপন আবাস-ভূমি আগন্তুককে বিধ্বস্ত করিতে দিবে, এতদূর কাপুরুষতা কীটেরও নাই। রক্ত কীটগণ প্রাণান্ত সংগ্রাম করে; যদি পরাস্ত হয়, আগন্তুকগণ দেহকে যমালয়ে প্রেরণ করে। আর যদি প্রবিষ্ট ক্ষুদ্র কীটগণই পরাস্ত হয়, তবে দেহ রোগমুক্ত হয়। এ কথা চিকিৎসা শাস্ত্রের। ইহাতে আমাদিগের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র কীটগণের রণ-নীতির প্রতি লক্ষ্য করুন। উহারা প্রত্যেকেই সেনা ও সেনাপতি। শত্রু হস্তে কাহারও নিধন হইলে, অপরে তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান অধিকার করে। রক্তকীটগণ যতই অধিক সংখ্যায় ইহাদিগকে আক্রমণ করে, ইহারাও রণস্থলেই বংশবৃদ্ধি করতঃ † ততই অধিক সংখ্যায় রক্তকীটগণকে আক্রমণ করে। ক্ষুদ্রকীটগণ রক্তকীটের দেহ সংলগ্ন হইয়া এমনই আঁকড়াইয়া ধরে, যে একের প্রাণান্ত না

* Microbes are capable of discriminating between bites of albumen and particles of coal. * * * They do not feed blindily upon their way. They exercise a choice. Micro-organisms. P. 120.

† একটী ক্ষুদ্রজীব হইতে অহোরাত্রিতে ৮০,০০০০০ লক্ষ ক্ষুদ্রজীব উৎপন্ন হয়। কেহ বা তাহার অধিক উৎপন্ন করে।

হইলে অন্যে কখনই ছাড়ে না। রক্তকীট ও ক্ষুদ্রকীটের সংগ্রাম অতি ভীষণ।* একের জয়ে রোগমুক্তি, অপরের জয়ে মৃত্যু।

এই সকল ক্ষুদ্র কীটের দেহ ও মনের কথা ভাবিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহা-দিগেরও মানসিক শক্তি আছে, মানসিক ক্রিয়া আছে। ইহারা ভাল আহার, মন্দ আহার বাছিয়া লইতে পারে; নিজ জাতি অপর জাতি বুঝিতে পারে। নিজ জাতীয়ের সঙ্গে আনন্দ উৎসব, ক্রীড়া কৌতুক করে *। অপর জাতীয়ের সহিত মেশামেশি করে না। ইহারা আহারান্বেষণের নিমিত্ত অপর জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তকীটগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হয়; এবং তাহাতে যেরূপ বিক্রম, দৃঢ়তা ও প্রাণ পণ প্রদর্শন করে, তাহা লর্ড কিচনারেরও অনুকরণীয়। এ সকল গুণের উপর ইহাদিগের একতা বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। এই সমস্ত গুণ কি? ইহা কি আধ্যাত্মিক গুণ নহে? আমি বলি ইহা তাহাই †। অন্ততঃ ইহা যে ঐরূপ গুণের পূর্ব্বাভাস, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে অদ্যকার মত তাঁহাকে আমি আর কিছুই বলিব না। ইতি।

শ্রীশশধর রায়।

ঘটনাচক্র।

স্বামী ও স্ত্রীতে একদিন মহাতর্ক বাধিয়াছিল। তর্কের বিষয়টী খুব জটিল না হইলেও কথার উপর কথা পড়িয়া আসল জিনিসটী জট পাকাইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে এ রকম তর্ক প্রায়ই হয়, কিন্তু নিষ্পত্তি কখনও হয় না। কারণ স্বামী যাহা মীমাংসা করেন তাহা আদপেই স্ত্রীর ইচ্ছার অনুরূপ হয় না এবং স্ত্রীর যাহা মন্তব্য তাহা এমনই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক যে স্বামীর মত বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই গ্রাহ্য করিতে পারেন না। এইরূপে দুইটি প্রাণী চিরকাল পাশাপাশি থাকিয়া নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়াই চলিতেছিল; কিন্তু দুইটি সমান্তরাল সমরেখার মত তাহাদের মতের মিল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছিল না।

রামলোচন বাবু সেকালের লোক হইলেও অনেক বিষয়ে একালের লোকের মত ছিলেন। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক বিষয়ে তিনি ঠিক সেকালের মত পরিপোষণ করিতেন না। নয় বছরের কন্যার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বড়

* আমি অণবীক্ষণের মধ্যে জল বিন্দুতে কয়েকটী ক্ষুদ্র জীব দেখিয়াছি, তাহারা পরস্পর দৌড়াদৌড়ি ও তাড়াহুড়া করিতেছিল; আর ঘোড়দৌড় খেলার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্র দিতেছিল।

† They (microbes) exercise a choice, and as Dr. G. J. Romanse F. R. S. has observed the power of choice may be regarded as the criterion of Psychic faculties. I bid P. I20.

দেখা যাইত না, কিম্বা অল্প বয়স্ক পুত্রকে সংসারী করিয়া পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ব্যগ্রতাও বিশেষ ছিল না। তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া একটু বড় করিয়া বিবাহ দিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ছেলেদের বেলায় বলিতেন যে রীতিমত অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারা পর্য্যন্ত বিবাহ করা উচিত নহে।

অন্যান্য মতের অপেক্ষা তাঁহার এই শেষোক্ত মতের একটু বিশেষ দৃঢ়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, বয়স একুশ পার হইতে চলিল, গৃহিণীর সোহাগ মিশ্রিত অনুরোধ, অভিমান সঞ্জাত ক্রোধ, ঘটক-ঘটকীর প্রাত্যহিক উত্যক্ততা এ সমস্ত কিছুই রামলোচনকে সংকল্পভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। পুত্রের বিবাহের কথা উঠিলেই তিনি সে কথা চাপা দিয়া বলিতেন—"নরেন টাকা-কড়ি আনুক, উপায় করুক, তবে বিবাহ করিবে। এত তাড়াতাড়ি কেন? এখন হইতে একটা গলগ্রহ জুটাইয়া দিয়া আমি তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মাটি করিতে পারিব না,—পিতা হইয়া তাহাকে দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিতে পারিব না।"

গৃহিণী কিন্তু একথা কিছুতেই বুঝিতেন না। একটি পুত্রবধূ ঘরে আনিবার জন্য তিনি দিন দিন অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, তাই প্রতিদিন পুত্রের বিবাহের কথা লইয়া স্বামীর সহিত তর্ক বাধিত। স্বামী কোনো দিনও বিবাহের সম্মতি দিতেন না, স্ত্রীও সে কথার পুনরুত্থাপন না করিয়া ছাড়িতেন না। স্বামী যখনই বলিতেন—"অর্থোপায় না করিয়া বিবাহ করাতে আমাদের দেশের দৈন্য দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; পুত্রের বিবাহ দিবার সময়ে প্রত্যেক পিতা মাতার একথা ভাবা উচিত।" স্ত্রী অমনি পাল্টা জবাব দিয়া বলিতেন—"আজ পর্য্যন্ত কেহ এ বিষয়ে ভাবিল না, আর তোমার ছেলের বিবাহের সময় তোমার মাথায় যত ভাবনার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—যত সব অনাসৃষ্টি কথা!—কই তুমি নিজে বিবাহ করিবার সময় ত একথা চিন্তা কর নাই, তখনত তুমি উপায়ের 'উ'—পর্য্যন্ত জানিতে না—তার জন্য তোমার এমন কি দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইতেছে।"

রামলোচনবাবু এ কথায় একটু থতমত খাইয়া যাইতেন, স্ত্রীর দৃষ্টান্তকে অমান্য করিবার যো নাই, লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি এত সহজে পরাজয় মানিবার পাত্র নহেন, তিনি বলিতেন,—"সে কাল কি আর এখন আছে।"

স্ত্রী উত্তর করিতেন—"কাল আবার গেল কোথায়—তখনও যেমন চন্দ্রসূর্য্য উঠিত এখনও তেমনি উঠে, তখনকার মত এখনও দিন রাত্রি আছে; ছেলের বিবাহ দিবার বেলায় তুমিই কাল ঘুরিয়ে দিচ্ছ বইত নয়।"

স্বামী একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"চন্দ্রসূর্য্যের পানে চেয়ে ত আর মানুষের পেট ভরে না। তখন চারি টাকায় একটা লোকের ভরণপোষণ চলিত, এখন চল্লিশ টাকাতেও কুলায় না। তখন লোকে যা উপার্জ্জন করিতে পারিত এখন তার সিকিও পারে না।" এ কথা সমর্থনের জন্য তিনি দুই একটি দারিদ্র্যনিপীড়িত প্রতিবাসীর কথা উল্লেখ করিতেন।

স্ত্রী বলিতেন—"ও সব অদৃষ্টে করে, তার জন্য স্ত্রীপুত্র দায়ী হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষের লক্ষ্মী; স্ত্রীর সঙ্গে ঘরে লক্ষ্মী আসেন—স্ত্রী-অভাবে পুরুষরা লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়া থাকে।"

রামলোচন বাবু রাগিয়া উঠিয়া বলিতেন—"তোমার মত মূর্খকে তর্কে বুঝান যায় না। উপার্জ্জনহীন ব্যক্তি সংসারের বোঝা ঘাড়ে করিয়া দিন দিন দৈন্যের সাগরে কেমন করিয়া ডুবিতেছে তাহা অদূরদর্শী, ভালমন্দবিচাররহিত স্ত্রীলোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আমি তর্ক করিতে চাহিনা—আমার এক কথা, এখন নরেনের বিবাহ দিব না।"

স্ত্রী বড় অভিমানিনী ছিলেন, স্বামীর রূঢ়বাক্যে তাঁহার চক্ষে জল আসিত, তিনি ধীরে ধীরে স্বামীর সম্মুখ হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেন। তর্ক এমনি করিয়াই শেষ হইত।

(২)

রামলোচন বাবু সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, নরেন অর্থোপার্জ্জন না করিলেও পিতৃ অর্থে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। তত্রাচ তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে চাহিতেন না তাহার কারণ, তিনি নিজে যে অভিমতকে ভাল বলিয়া সকলের কাছে প্রচার করিতেন তাহা নিজে অমান্য করা তিনি হীনচিত্তের পরিচয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মনে মনে গর্ব্ব ছিল, তিনি একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, তিনি সে গর্ব্বের হানি করিতে চাহিতেন না। কথায় বার্ত্তায়, আলাপে ব্যবহারে তিনি প্রকাশ করিতেন যে, সমাজের মধ্যে যে কুপ্রথা আশ্রয়লাভ করিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে তিনি কিছুতেই প্রশ্রয় দিবেন না। সমাজের যে অংশ জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, প্রাণপণ শক্তিতে তিনি তাহার সংস্কার করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার এই বাক্যের সহিত তিনি নিজের দৈনন্দিন কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেন। পুত্রকে উপায়ক্ষম করিবার জন্য তিনি যে এত ব্যস্ত ছিলেন তাহার আরো এক কারণ,—তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, নিজের অর্জ্জিত অর্থ দেশের কোন হিতকল্পে দান করিয়া যাইবেন।

হিন্দুর অন্তঃপুর কঠিন ছাঁচে গঠিত; তাহার পরিবর্ত্তন করা অনেকের অসাধ্য। রামলোচন বাবু নিজের সংসার মধ্যে বহিঃ-সমাজ সংক্রান্ত সংস্কার যত সহজে করিতে পারিতেন, অন্তঃ-সমাজে তেমন পারিতেন না; তাঁহার যুক্তি তাঁহার শাসন অন্তঃপুরের কঠিন প্রাচীরে লাগিয়া নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিত। তাঁহার পত্নীর বুদ্ধির প্রাখর্য্য যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু সে প্রাখর্য্য অন্তঃপুরের মধ্যে অজ্ঞান তিমিরাবৃত গুপ্ত অনিষ্টের উপর আলোকবর্ষণ করিতে পারিত না; সে গুলি তাঁহার স্বামী চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও তিনি দেখিতে পাইতেন না, দেখিতে পাইলেও তাহার অনিষ্টতা স্বীকার করিতেন না। এই রকমে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন ও পরিরক্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

পত্নী স্বামীর সকল উৎপাত মার্জ্জনা করিতেন কিন্তু পুত্রের বিবাহের আপত্তিতে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা ছিল না, একটিমাত্র পুত্র। পুত্রের সহিত একটি ছোট বালিকার বিবাহ দিয়া তাহাকে কন্যাবৎ প্রতিপালন করিবেন, এ আশা তাঁহার বহু

দিনের সঞ্চিত। তিনি অনেক দিন হইতে বাড়ীর মধ্যে একটি অবগুণ্ঠনহীন ক্ষুদ্রবধূর ছুটা-ছুটী, খেলা-ধূলা, আদর-আব্দার কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। ভাবী বধূর জন্য কত রাশি রাশি খেল্‌না, কত রকমের কাপড় জামা সঞ্চিত হইয়া আছে, তাঁহার যখন যে জিনিসটি চোখে ভাল ঠেকিয়াছে তাহা সেই অনাগত বধূটীর জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।—নানা উপাদানে ও আড়ম্বরে একটি খেলা ঘর প্রস্তুত, কিন্তু খেলিবার প্রাণীটির অভাবে তাহা ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে! এত করিয়া যে আশা পুষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, কেবল স্বামীর একটা অকারণ জেদের জন্য তাহা ফলবতী হইতে পারিতেছে না—এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিত।

এক একদিন ছাদে উঠিয়া যখন দেখিতে পাইতেন ব্যাণ্ডের বাদ্য ও আলোকমালায় বেষ্টিত হইয়া বর বিবাহ করিতে যাইতেছে তখন তাঁহার মনে হইত, কবে তাঁহার পুত্রটীও এমনি করিয়া একটি সোণার চাঁদ বধূ আনিতে যাইবে। তিনি অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া আছেন, আর পারেন না;—নরেন এম এ পাশ করিবে, ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, অর্থোপার্জ্জন করিবে, ওঃ সে অনেক দিনের কথা!

(৩)

ঘটকীর মুখে একটি বালিকার বিবরণ শুনিয়া তাহাকে পুত্রবধূত্বে বরণ করিবার জন্য রামলোচন-গৃহিণীর বড় ইচ্ছা হইতেছিল। তাঁহার এ ইচ্ছার প্রধান কারণ বালিকাটী পিতৃমাতৃহীনা; তাঁহার মনে হইতেছিল, তাহাকে পাইলে, আদর যত্ন ও স্নেহের প্রাবল্যে তিনি তাহার মাতার স্থান শীঘ্রই অধিকার করিতে পারিবেন। মেয়েটির প্রতি গৃহিণীর মাতৃ-স্নেহ আপনাআপনি উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল! বালিকার নাম শুভা, সে তাহার এক দরিদ্র মাতুলের গৃহে প্রতিপালিত। মাতুলের এমন সংস্থান নাই যে, নিজের পুত্রকন্যাগুলিকে রীতিমত গ্রাসাচ্ছাদন দিতে পারেন, কাজেই শুভা সেই সংসারে দুর্ব্বিসহ ভারস্বরূপ বিবেচিত হইতেছিল। আশ্রয়হীনা, স্নেহবঞ্চিতা, বুভুক্ষু বালিকা যেখানে আশ্রয় স্নেহ ও অন্নের জন্য আসিয়াছিল সেখানে তাহা দুষ্প্রাপ্য। গৃহিণীর ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাকে এই দারিদ্র্যের মরুভূমি হইতে উঠাইয়া ঐশ্বর্য্যের শ্যামলস্নিগ্ধ ক্রোড়ে স্থাপন করেন। কিন্তু হায়! সে অভিলাষ পূর্ণ করিবার কোন উপায় দেখিতেছিলেন না।

গৃহিণী শুভাকে দেখিয়া আসিলেন। তাহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা তখন অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীকে হৃদয়বান ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন, সেই জন্য মনে করিলেন দুঃস্থ পরিবারের করুণ আবেদন হয়ত স্বামীর ধনুর্ভঙ্গ পণ টলাইতে পারে,—শুভার মাতুলানীকে বলিয়া আসিলেন, যেন তাঁহারা কর্ত্তার কাছে গিয়া নিজেদের দুঃখকাহিনী জানাইয়া বিবাহের জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়া পড়েন।

কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। শুভার মাতুল একদিন আসিয়া রামলোচনের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি গরীব, আমায় রক্ষা করুন, শুভাকে আপনার গৃহে স্থান দিন, নইলে আমি মারা যাই।"

মাতুলের কাতরতায় রামলোচন দুঃখ অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য নিজের সংকল্পে জলাঞ্জলি দিতে মন সরিল না। তিনি নিজে দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, দরিদ্রপরিবারের কন্যাকে পাত্রস্থ করা কি কষ্ট তাহা তিনি জানিতেন, কারণ বাল্যাবস্থায় তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিবার সময় পিতার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার নিদ্রাবিহীন রজনীযাপন, চিন্তাভারাক্রান্ত শুষ্ক বিশুষ্ক মুখ, অর্থসংগ্রহের বিফল চেষ্টায় রাত্রিদিন ব্যতিব্যস্ততা দেখিয়া তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পরে এ কষ্টের প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবেন;—নিজের পুত্রের বিবাহ দরিদ্র কন্যার সহিত দিবেন, এক কপর্দ্দকও আকাঙ্ক্ষা করিবেন না।

কিন্তু এখন কার্য্যক্ষেত্রে বাল্যকালের সেই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে পরিণত বয়সের সমাজ-হিতসংকল্প দণ্ডায়মান। চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সে প্রতিজ্ঞার মূল্য অপেক্ষা এখনকার সংকল্পের মূল্য অনেক অধিক;—তাহা এত সহজে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না। শুভার মাতুলকে একেবারে মনঃক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলেন না, বিবাহের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া বিদায় করিলেন; যাইবার সময়ে তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"কিন্তু আমি একটা সর্ত্ত রাখিতে চাই,—আপনাকে কোন উপার্জ্জনক্ষম পাত্রকে কন্যাদান করিতে হইবে, কেবল কুলগৌরবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। ইহাতে যদি বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়, আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি।"

রামলোচন পত্নীর আশা পূর্ণ হইল না। এত করিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীকে সেই কঠোর পণ হইতে এক পদও সরাইতে পারিলেন না।

(৪)

একমাত্র পুত্র বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মাতার পূর্ণস্নেহটুকু ভোগ করিতেছিল। মাতা তাহাকে এখনও পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র শিশুটির মত পালন করিয়া আসিতেছিলেন। পুত্রের সকল পরিচর্য্যা তিনি নিজের হাতে করিতেন। আহার শয়ন প্রভৃতির তত্ত্বাবধান নিজে না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে নরেন গৃহকর্ম্মে বালকের মত অপটু রহিয়া গিয়াছিল, বিদ্যাচর্চ্চায় জ্ঞান বাড়িতেছিল কিন্তু পরনির্ভরতায় নিতান্ত নিঃসহায়ের অবস্থা হইতে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে নাই। পরিবার কাপড় জামা না ঠিক করিয়া রাখিলে তাহার জনসমাজে বাহির হওয়া দুর্ঘট হইত; পাঠের পুস্তক ও লেখার কালি কলম এমন ভাল গুছান না পাইলে নিশ্চয় তাহাকে সবগুলি পরীক্ষায় ফেল হইয়া আসিতে হইত।

নরেনের পাঠগৃহ তাহার মা প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া দিতেন। কালেজের নোট বইয়ের ভ্রষ্টপাতা, তর্জ্জমা ও এক্সারসাইসের খাতা, পাঠ্যপুস্তক সংবাদপত্র এবং নানা বিষয়ক ইংরাজী বাঙ্গালা লেখা চোতা কাগজ ঘরময় ছড়ান থাকিত। আলগা কাগজ বাতাসে উড়িয়া বেড়াইত, মা সেগুলি প্রতিদিন উঠাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া দিতেন। কাজের সময়

নরেন যখন এই সব কাগজ পত্র খুঁজিয়া পাইত না, তখন জননীর নিকট অনুসন্ধান করিলে তিনি বাহির করিয়া দিতেন।

একদিন কাগজের জঞ্জাল সরাইতে সরাইতে হঠাৎ নরেনের হাতের লেখা এক টুকরা কাগজ নরেনের মাতার চোখে পড়িল। সেই কাগজের উপরিভাগে লিখিত একছত্র তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল,—"প্রিয়তমা মঞ্জরি"। তিনি তাড়াতাড়ি তাহা উঠাইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিলেন "প্রিয়তমা মঞ্জরি, যে কথা বহুদিন হৃদয়ের মধ্যে গোপন রাখিয়াছি, প্রতিদিন আশার বারিসিঞ্চনে যাহাকে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছি; যে কথা মুখে প্রকাশ না করিলেও নয়নের দৃষ্টিতে এবং মুখভাবের মধ্যে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা গোপন করিতে যাইয়া কেবলই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি সেই কথা আজ তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইব; আমি তোমায় ভালবাসি, আমার জীবনমরণের দেবী তুমি; প্রাণের মধ্যে প্রেমের মন্দিরে তোমায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

* * * *

পত্রখানি গৃহিণীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। তিনি তাহা বারম্বার পাঠ করিয়া বুঝিলেন উহা প্রেমপত্র। আজ চিঠির মধ্যে বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্র এক রমণীর প্রেমে পড়িয়াছে। বিনা কারণে তাহার মনে এই রকমেরই একটা আশঙ্কা অনেকদিন হইতে অস্পষ্টভাবে জাগিতেছিল, কিন্তু কোন বিশেষ প্রমাণ ছিল না বলিয়া সেটাকে আমল দিতে পারেন নাই। কিন্তু মঞ্জরী কে? সে ত তাঁহাদেরই নিকটতম প্রতিবাসীর কন্যা নহে? নরেনের পড়িবার ঘরের জানালার সামনেই তাহারও পড়িবার ঘর, তাহার সহিত প্রণয় হওয়াত একেবারে অসম্ভব নয়। এই কথাগুলি গৃহিণীর মনের মধ্যে বৈদ্যুতিক বেগে বহিয়া গেল।

(৫)

রামলোচন বাবুর বাড়ীর ঠিক পার্শ্বেই বিনোদবিহারী বাবুর বাসা। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার এক অবিবাহিত যুবতী কন্যার নাম মঞ্জরী এবং এই মঞ্জরীর উদ্দেশ্যেই যে নরেনের প্রেম-পত্র লিখিত সে বিষয়ে গৃহিণীর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না।

ছেলেদের অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে তাহারা স্বভাব-চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে না, এইরূপ একটা সংস্কার গৃহিণীর বরাবর ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ক্ষুধার উদ্রেকে যেমন আহারের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, যৌবনের বিকাসে তেমনি বিবাহেরও আবশ্যক আছে। তাহাকে অমান্য করিতে গেলেই সে কুফল প্রসব করিবে। সেই কারণে তাঁহার পুত্রের প্রণয় ব্যাপার তিনি নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইহাতে নরেনকে দোষী বলিয়া মনে মনে স্বীকার করিতে চাহিলেন না, যত অপরাধের ভার স্বামীর স্কন্ধে অর্পণ করিলেন।—তিনিই ত যত নষ্টের মূল, যথা সময়ে বিবাহ দিলে ত আর এ কাণ্ডটা ঘটিত না। পুত্রের বিবাহের পক্ষে তাঁহার সব যুক্তি স্বামী এতদিন অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই

বারকার এই ঘটনায় যে তিনি জয়লাভ করিবেন এই কথা মনে করিয়া তিনি একটু আনন্দ অনুভব করিলেন।

গৃহিণী ভাবিয়া দেখিলেন, এ প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল বিবাহ। কিন্তু মঞ্জরী ব্রাহ্মকন্যা তাহাকে বিবাহ করিলে পুত্রের জাতি যাইবে। জাতিপাত তাঁহার কাছে বড় সামান্য জিনিষ নহে, সেটাকে তিনি অত্যন্ত ভয় ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। জাতিত্যাগ করার চেয়ে তাঁহার কাছে হেয় ও পাপকর্ম্ম আর কিছুই নাই—তিনি জীবিত থাকিতে ইহা কিছুতেই হইতে দিতে পারিবেন না। পুত্র ব্রাহ্ম-বিবাহ করিলে তাহাকে আর আপনার সংসারে রাখা চলিবে না, নিতান্ত পরের মত বাহিরে রাখিতে হইবে—যে পুত্র হৃদয়ের গ্রন্থিতে শত বন্ধনে আবদ্ধ কেমন করিয়া তাহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিবেন!

গৃহিণী যখন পুত্রের হাতের লেখা সেই চিঠি স্বামীর নিকট উপস্থিত করিলেন তখন তিনি চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এরূপ ঘটনা যে ঘটিতে পারে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অনুপযুক্ত অবস্থায় বিবাহ অমঙ্গলজনক এ সম্বন্ধে তিনি কৃতনিশ্চয় ছিলেন; কিন্তু জিনিষটার সব দিক ভাল করিয়া দেখেন নাই,—এখন বুঝিতে পারিলেন, ইহার আর একটা এমন দিক আছে—যাহা রক্ষা করিয়া না চলিলে অধিকতর অমঙ্গল হইতে পারে। এখন তাঁহার ক্রটী সংশোধন করিয়া লওয়া দরকার তাহা বুঝিলেন।

রামলোচনের হৃদয় যতই উদার থাকুক পুত্রকে ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করিতে দিবেন, এত উদারতা তাঁহার ছিল না। তাহা হইলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ সমাজ-ছাড়া কার্য্যে দেশের উপকার হয় না।

গৃহিণী বলিলেন—"এখন কি করিবে?"

রামলোচন উত্তর দিলেন—"নরেনের এতদিন বিবাহ না দিয়া ভাল করি নাই, এখন সে কাজটা শীঘ্র সারিয়া লইতে হইবে।"

রামলোচনের পত্নী মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে স্বামীর উপর আজ অনেক দিনের শোধ তুলিবেন। কিন্তু তিনি যখন নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইলেন তখন আর তাঁহার উপর রূঢ়তা করা চলে না। সফল মনোরথ হইয়া হৃষ্টমনে তিনি গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী ব্যাপারটা যত সোজা ভাবিলেন, রামলোচন তেমন ভাবিলেন না। নরেন যদি মঞ্জরীকে সত্যই ভালবাসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত বিবাহ হইতে, প্রতিনিবৃত্ত করা সহজসাধ্য হইবে না। এ অবস্থায় তাঁহার পুত্র পিতার নির্ব্বাচিত পত্নী যদি না গ্রহণ করে তবে কি হইবে? এই সব কথার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। নিজ দোষের একটা অনুশোচনা অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু দোষ যখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে তখন তাহার বিনাশসাধন কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসাধ্য হইবে না, এই বলিয়া মনে ভরসা বাঁধিলেন।

(৬)

গৃহিণী একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা নরেন! আমার অনেক দিনের সাধ, তোর বিবাহ দিয়া একটি বধূ লইয়া ঘরসংসার করি, আমি একটি মেয়ে দেখিয়াছি খুব সুন্দরী, তুই বলিস্ ত বিবাহের সব ঠিক করি।"

নরেন বলিল—"বিবাহের কথা এখন তুলিয়ো না মা! সামনে পরীক্ষা আসিতেছে, ওসব কথা ভাবিবার অবসর নাই।"

মা বলিলেন—"বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুই পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাস্ করিবি; আমার কথা রাখ, বিবাহ কর্।"

নরেন বলিল—"না, না সে কিছুতেই হইতে পারে না, এখন ঐ সব গোলোযোগ ঘটাইয়া আমার পরীক্ষাটা মাটি করিয়া দিয়ো না।"

গৃহিণী ভাবিলেন, পরীক্ষার কথা ওজরমাত্র, পুত্র মঞ্জরীর রূপে তন্ময় হইয়া আছে। এখন সে তন্ময়তা ভঙ্গ করিতে হইলে আর একটি অধিকতর রূপসী চোখের সমুখে ধরা আবশ্যক, তাই বলিলেন—"মেয়ে নিখুঁৎ সুন্দরী,—একবার দেখ্‌বি।"

নরেন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"আমার বক্তব্য যাহা বলিয়াছি—ওসব কথা লইয়া আর বিরক্ত করিও না।"

গৃহিণী মনে করিলেন, বেশী পীড়াপীড়িতে নরেন হয়ত একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে, তাই আর কিছু না বলিয়া চাপিয়া গেলেন।

রামলোচন স্ত্রীর নিকট পুত্রের বিবাহে অনিচ্ছার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাহার শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ইহাতে তাঁহাকে দৃঢ়চিত্ত করিয়া তুলিল।

তাঁহার একবার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, নরেনের যদি মঞ্জরীর সহিত সত্যই প্রণয় হইয়া থাকে তবে তাহার অনিচ্ছায় অন্য মেয়ের সহিত বিবাহ দেওয়াটা কি ভাল, তাহাতে ছেলের জীবন চিরদিনের জন্য অসুখী করিয়া তুলিবেন না ত? কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ বুদ্ধি পরামর্শ দিল,—বালকের প্রণয় কেবল চোখের নেশা; বিবাহিত জীবনের আবর্ত্তে পড়িলে দুই দিনেই তাহা ছুটিয়া যাইবে, তাহার জন্য ভাবনা নাই। এখন যাহাতে সে অপরিণত বুদ্ধির বিভ্রমে পড়িয়া অপকর্ম্ম করিয়া না বসে তাহাই দেখিতে হইবে। পুত্রের অজ্ঞানকৃত ভুল যদি তিনি নিজ হস্তে সংশোধন না করিয়া, তাহার প্রতি ঔদাসিন্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে পিতৃকর্ত্তব্য অবহেলা করা হইবে। কিন্তু নরেন যদি তাঁহার শাসন অগ্রাহ্য করে? কিন্তু তাই বলিয়া, আপত্তির আশঙ্কায় চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে পারেন না।—চেষ্টা তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাহার পর যদি ব্যর্থমনোরথ হন তাহা হইলে পুত্রের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের হাতে সঁপিয়া দিবেন—তিনি আর কি করিতে পারেন?

তখন, স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ আঁটিয়া স্থির করিলেন যে ছেলের বিবাহের সকল উদ্যোগ গুপ্তভাবেই করিতে হইবে। শেষে জিনিষটাকে এতদুর পাকা করিয়া পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত

করিবেন যে, তখন বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। নরেন্দ্রকে ঘিরিয়া ফেলিয়া আবদ্ধ করিবার জন্য পিতা ও মাতা মিলিয়া নানা আকর্ষণ ও প্রলোভন দিয়া তাহার চতুষ্পার্শে একটি দুর্ভেদ্য জাল রচনা করিতে লাগিলেন।

(৭)

নরেন রাশ মানিয়াছে। পাশ হইবার পর পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করায় পিতা মাতার ইচ্ছায় সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

নরেনের গাত্র হরিদ্রার দিন রামলোচন পত্নীর মুখে আর হাসি ধরে না। বহুদিনের আশা আজ ফলবতী হইবে, শুভা তাহার ঘরে আসিতেছে, তিনি আনন্দ একপ্রকার দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কি রকম করিয়া ছেলের বিবাহটা খুব জাঁকাইয়া তুলিবেন মনে সেই কথাই কেবল আলোচনা করিতেছেন।

এই চিন্তার সঙ্গে, মঞ্জরী কুহকিনী তাঁহার ছেলেকে ভুলাইয়া গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য মনে একটা পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিতেছেন। ছেলের বিবাহ ভালয় ভালয় চুকিয়া যাউক, বউ দেখাইয়া মঞ্জরীর কাছে প্রতিপন্ন করিবেন, তাহার মায়াবিকতা তিনি কেমন করিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন!

নরেন বিবাহে আর আপত্তি না করায় রামলোচন বাবু কতকটা সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহার একটা ঘোরতর দুর্ভাবনা কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এতদিনের সংকল্প ইহাতে ভাঙ্গিয়া পড়ায় বড়ই দমিয়া গিয়াছিলেন।

বিবাহের আয়োজন-উদ্যোগের কাজ-কর্ম্মে যখন ব্যস্ত তখন নরেন আসিয়া মা'কে বলিল —"মা! একটুকরা কাগজ খুঁজে পাচ্ছিনা, তুমি রেখেছ কি?"

গৃহিণী বলিলেন—"কি কাগজ বাবা!"

নরেন—"একখানা চিঠি।"

মা।—"কার চিঠি?"

নরেন একটু থতমত খাইয়া গেল; সে মঞ্জরীর উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিখানা খুঁজিতে আসিয়াছিল। মার সমক্ষে প্রণয়-লিপির কথাটা উল্লেখ করিতে কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। একটু আম্‌তা আম্‌তাস্বরে বলিল—"মঞ্জরী বলে উপরে লেখা আছে।" মঞ্জরীর বিশেষণটা বলিতে লজ্জা হইতে লাগিল।

মা—"সে চিঠি আমি রেখেছি, তোর তাতে দরকার কি?"

নরেন মাথা চুলকাইয়া বলিল—"বিশ্বদর্পণের সম্পাদক আমায় একটা উপন্যাসের জন্য বড় তাগাদা দিচ্ছেন; গল্পটা লিখে রেখেছিলুম তার সব পাতাগুলি পাচ্ছি, কেবল একখানা পাচ্ছিনা।"

মা—"সে চিঠিত মঞ্জরীকে লিখ্‌ছিলি, তোর উপন্যাসের সঙ্গে তার সংস্রব কি?"

নরেন—"মঞ্জরী আমার উপন্যাসের নায়িকা।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সদুপায়।

বরিশালের কোনো একস্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতী লবণের চেয়ে শস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতী লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতী কাপড় বা লবণ ব্যবহার করেনা তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেকস্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশন ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড় কথাটা কি তবে আমি এই উত্তর দিব যে—বাংলাদেশকে দুইভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগপ্রকাশ করাটা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কি? সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এমন কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব্ব ও অপূর্ব্ব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্ব্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্ম্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি—সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশতঃ হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙালী হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য-দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুতেই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারীগণ বাঙালীর প্রতিবেশী এবং বাঙালী অনেক দিন হইতেই বেহারীদের সঙ্গে কারকারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে বেহারীর সৌহৃদ্য নাই সে কথা বিহারবাসী বাঙালীমাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালী হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামীদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলা দেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালীও বেহারী উড়িয়া এবং আসামীকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাদ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড় নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্ব্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সারভাগ শুষিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালীর বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশের মত এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতী বর্জ্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হোক্ না, তাহার চেয়ে বড় আবশ্যক আমাদের পক্ষে কি ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট্ ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে কোনো প্রকারেই হোক্ বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা সুবিধা অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর কোনো ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্ম্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষ্যে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মত কাপড় পরাইতে কত দূর পারিলাম তাহা জানিনা কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—একি ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্ব্বেও অত্যন্ত বেশি ছিলনা, এখনো একমুহূর্ত্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।"

কখনো যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপনলোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয়, যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না! উল্টা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানব প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্য্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে;—আমরা যখন নীচে আছি তখন উপরওয়ালার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে আমরা যে, মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের

যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ কোন দিন দিই নাই অতএব হঠাৎ আমরা যখন তাহাদিগকে বেশি দামে দেশী কাপড় পরিতে বলিলাম তখন যদি তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করে তবে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলে যে অমনি তখনি কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতর ঘটে না। আমরা যে-দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাঁহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরুক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় "ভাই" শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কাণে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মা শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্য দেশের সাধারণ গণ-সমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য্য হইয়া মনে করি সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভাব, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি।

ইহার ফল এই হইয়াছে, যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরাজি-পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি যাহারা আত্মহিত বুঝে না, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মত ধৈর্য্য আমাদের নাই;—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়;—কাজ ফাঁকি দিবার জন্য পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনি এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনি প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কি অমূল্য

ধন তাহা আমরা জানিনা। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয় অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফঃস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোন একটি বড় বাজারের লোকে নোটিশ পাইয়াছে যে যদি তাহারা বিলাতী জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষের আমদানী না করে তবে নির্দ্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী জমিদারদের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটিশ দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্ব্বক বিলাতী জিনিষ খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন দেশের হিতসাধনের উপলক্ষ্যে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা;—ইঁহারা বলেন মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনই হইবে না সে কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না; "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য যে কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না" দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এত বড় অহিত আর কিছুই নাই। দেশের একপক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র

জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মত পশুর মত আবদ্ধ করিবে ইহার মত ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবেনা—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এই প্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনো প্রকার আপসে অধিকার প্রাপ্তির মূল্য বোঝে না—তাহারা জোরকেই মানে—তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে কিন্তু আমরা ত প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতাকে চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে কর্ত্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধোর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্য্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কি কাপড় পরিবে বা কি নুন খাইবে তাহাকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনো মতে আমার মতে ভিড়াইবার আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্ত্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্ব্বক চেষ্টা করিতেছিনা—আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি তখনি সে বুঝিবে আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত

ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখনি সে বুঝিবে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটবড় সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারী উড়িয়া অথবা অন্য যে কোনো ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনি সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবেনা। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্য পদার্থ মানুষ—সেই সত্য পদার্থ মানুষের হৃদয় বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না; বরঞ্চ উল্টা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবেনা যে, অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভারগ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মত তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ঙ্কর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্ব্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এইরূপ ধর্ম্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসঙ্গতি স্থান পায় না. একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া

তুলে। অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্য্যই দুর্ব্বলতা; প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কার করে; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে সয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে; কোনো একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটু মাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিতে কতকটা কৃতকার্য্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্ম্মের পথ। কিন্তু ধর্ম্মের পথ দুর্গম—দুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোষিক অহংকারতৃপ্তিতে নহে অহংকার বিসর্জ্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুর্গম পথে পান্থ।

কেবা আছ—কই পথ—
বলে দাও—বলে দাও ত্বরা;
উদ্বেলিত হৃদয় আবেগে
চূর্ণ আজি সব বাঁধা ধরা;

লঙ্ঘি বলে পাষাণ প্রাকার
তরঙ্গিনী উন্মাদিনী সম,
বহু দূরে এসেছি ছুটিয়া
না মানে বারণ—গতি মম!

বল ত্বরা, কে আছ কোথায়,
বলে দাও, যাব কোন্ পথে;
কে যে টানে, মহা আকর্ষণে,
নাহি শক্তি ক্ষণ স্থির হ'তে।

কি জানি কি মত্ততার ঘোরে,
অপূর্ব্ব কি উত্তেজনা বশে,
স্থানচ্যুত উল্কাপিণ্ডসম
পড়েছি গো বহির্দ্দেশে খসে;

নাহি ছিল আত্মা নিজবশে,
যাত্রাকালে ছিল না সময়,
পথাপথ করিবারে স্থির
পাথেয় বা করিতে সঞ্চয়!

অহো, এতদুরে ভেঙ্গেছে চমক,
মহাভ্রান্তি হয়েছে স্মরণ,
নাহি পথ, পাথেয় সম্বল,
মধ্যপথে কি করি এখন?

নাহি তুচ্ছ জীবনের ভয়,
মৃত্যু-ভয়ে নহি মাত্র ভীত;
প্রাণান্তেও ফিরিব না আর,
যেতে হবে—এ কথা নিশ্চিত।

বল তবে কি করি উপায়?
জান যদি ভাল পথ অন্য,
দেখাইয়ে সাথে চল নিয়ে
দাও আর পাথেয় সামান্য!

আধুনিক জাপান।

(লে ফেলেসিয়ঁা হইতে)

শিল্পকলা ও নাট্যাভিনয়।

জাপানী-জীবনের কি সুন্দর সরলতা! অতি ক্ষুদ্র জিনিষের খুঁটিনাটির মধ্যেও কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা! উহাদের আমোদ প্রমোদের মধ্যে দয়ার বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশ, রসিকতার বিকাশ কেমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়;—জাপান যেন একটা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য, যেখানে আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম বাসনা সমূহ প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। আমি জাপানে তিন মাস ছিলাম—এই শত দিন,—সুসম্বদ্ধ, রমণীয় অপূর্ব্ব স্বপ্নের মত কি দ্রুতভাবেই কাটিয়াছিল! ইহার আকর্ষণ এড়ানো অসম্ভব। যে একবার সেখানে যায়,—তার মনে হয়, কেন আরও কিছুদিন সেখানে থাকিলাম না। কাহারও কাহারও জাপানের প্রতি এতদূর টান্ যে সেখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য, তাহারা নিজের জীবন পরিবর্ত্তন করিতেও ইচ্ছা করে।...

জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া, William Morris কৃত "অজানা দেশের সংবাদ" নামক উপন্যাসটি আমি পুনর্ব্বার পাঠ করিলাম। ঐ "শোশ্যালিষ্ট" কবির বর্ণিত স্বপ্নপুরীর অধিবাসীদিগের আদর্শসমাজটি খুব ভিন্ন ধরণের হইলেও, এক বিষয়ে জাপানীদের সহিত বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সেই একই রকমের সরল সুন্দর সাংসারিক জীবন; সেই একই রকম বাহ্য প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, সেই একই রকম শিল্পীজনোচিত মনোভাব; সেই একই রকম আচার ব্যবহারের মাধুর্য্য, সেই একই রকম সৌজন্য ও হৃদ্যতা; সেই একই রকম স্বভাব-সুন্দর সরল নীতিতন্ত্র; সেই একই রকম আনন্দের ভাব, সেই একই রকম জীবনের প্রতি আসক্তি; "পার্থিব জীবনের সকল বিষয়েই আমরা খুব তীব্র সুখ অনুভব করি···ওঃ! আমরা পৃথিবীকে, ঋতুদিগকে, বাতাসকে বড়ই ভালবাসি! আমরা পৃথিবীকে ভালবাসি, এবং পৃথিবী হইতে যাহা কিছু প্রসূত হয়, পৃথিবীতে যাহা কিছু জীবন ধারণ করে,—তাহাদেব সকলকেই আমরা ভালবাসি! কেবল সেই ভালবাসা যদি আমরা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতাম, কথায় ব্যক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি সুখেরই হইত!···"

উইলিয়াম মরিসের এই স্বপ্নের মধ্যে একটা নির্ভীকতা আছে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে যে স্বপ্ন রাজ্যটি অবস্থিত, সেই স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া অবধি আমাদের য়ুরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমিও ঐরূপ সুখস্বপ্ন দেখিয়া থাকি; জাপান দেখিয়া অবধি, উন্নততর ভাবী মনুষ্যসমাজের একটা ছবি আমার মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

দুঃখযন্ত্রণার নিষ্ঠুর দৃশ্য এখনও আমাদের মনকে ব্যথিত করে। যাহাতে একটি ক্ষুদ্র দল, তাহাদের অপ্রকৃতিস্থ শূন্যগর্ভ জীবন সুখ সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারে, এই জন্য অধিকাংশ লোকই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত খাটিয়া মরিতেছে,—তাহাদের না আছে অবসর, না আছে আনন্দ। একদিকে,—যাহারা না খাটিয়াই সমস্ত পাইতেছে, তাহাদের বিলাসবিভব শিল্পসৌন্দর্য্যহীন! আর একদিকে—যাহারা কিছুই না পাইয়া কেবলই

খাটিতেছে, তাহাদের ভীষণ দারিদ্র্য। একদিকে ধনাঢ্যদিগের কঠোর ঔদাসীন্য; আর এক-দিকে দরিদ্রদের অসূয়া বিদ্বেষ। সৌন্দর্য্যেরও অল্পতা, মঙ্গলেরও অল্পতা। শ্রান্ত শ্রমীদিগের দুঃখ-ক্লেশ, ভোগক্লান্ত বিলাসীদের বিষাদ—এ উভয়ই একইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, বর্ত্তমান সমাজটা নিতান্তই অসঙ্গত এবং এই সমাজ মানুষকে কখনই সুখী করিতে পারে না।

ভরসা করি, সমাজের রোগ কোথায় সমাজের নেতারা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন এবং তদনুসারে অবশ্যই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন; তাঁহারা ক্রমে এই অন্যায়মূলক কদর্য্য সমাজকে রূপান্তরিত করিবেন; যে পরিমাণে দুঃখদারিদ্র্য কমিতে থাকিবে, সেই পরিমাণে বিলাসেরও লাঘব হইবে। অবশেষে সকলেই সাদাসিধা ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। জাপান দেখিয়া অবধি আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস যে, এইরূপ সাদাসিধা ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিল্প অনুশীলনের সুবিধা হইবে, সাম্যমূলক সৌজন্য সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইবে এবং এইরূপেই সকলে প্রকৃত সুখ লাভ করিবে।

জাপানীরা যেমন একদিকে তাহাদের সাংসারিক ও নৈতিক জীবনের মুখ্য জিনিসগুলি বজায় রাখিয়াছে, সেইরূপ তাহাদের শিল্পের পুরাতন রূপ ও গঠনগুলির প্রতি তাহাদের সমাদর ও অনুরাগ এখনও পূর্ব্বেরই মত আছে।

জাপানে চিত্রকর্ম্ম বাস্তুবিদ্যারই যেন একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার; প্রাচীনকালের যেগুলি উৎকৃষ্ট চিত্ররচনা, তাহার দ্বারা উহাদের প্রাসাদ ও মন্দিরাদি বিভূষিত। যাহারা গভীর ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত সেই (Tosa) তোসার চিত্রকর-সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তিই অঙ্কিত করিয়াছে। কানোর (Kano) সম্প্রদায়, বিশেষরূপে, চিত্রের বিষয়গুলা বহিঃপ্রকৃতি হইতে গ্রহণ করিয়াছে; এইগুলি ভূখণ্ডের দৃশ্য, সুন্দর চন্দ্রের দৃশ্য, বিষাদময় বরফের দৃশ্য; ফুলের ছবি, তৃণের ছবি, জীবজন্তুর-ছবি, বিশেষতঃ চমৎকার পাখীর ছবি। তাহার দৃষ্টান্ত, কিওটো নগরে নিশি-হঙ্গানজী (Nishi Honganji) নামক যে প্রকাণ্ড দেবালয় আছে, সেখানে পর-পর এই চিত্রগুলির তারিফ্ করা যায়;—ফুটন্ত চেরী, Clematis নামক সুগন্ধী লতাগাছ, সোয়ান্-হাঁস, বুনো রাজহাঁস, বাঁশগাছ ও চড়াই পাখী, Chrysan-theme নামক এক প্রকার হল্‌দে ফুল-বিভূষিত ঘর, কাঠের উপর খোদাই কাজ। এই সমস্ত পুরাতন চিত্ররচনার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব; রেখা বিন্যাসের কিরূপ সংযত ভাব, চিত্রিত জীবজন্তু ও পদার্থ সমূহের কিরূপ মুখশ্রী, গম্ভীর রংগুলা কিরূপ সুস্পষ্টভাবে সুমিশ্রিত, চিত্রগুলির মধ্যে কি অপূর্ব্ব কবিত্ব প্রকটিত—ইহাই শুধু আভাস-ইঙ্গিতে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

যেখানে প্রবেশের বাধা নাই—সেই সব দেবালয়ে এই পুরাতন উৎকৃষ্ট চিত্রগুলি, যেন সাধারণের সম্পত্তি এই ভাবে সংরক্ষিত। প্রকৃতিকে যেমন সকলেই উপভোগ করিতে পারে, সেইরূপ ইহাদিগকেও প্রতিদিন সকলেই উপভোগ করিতে পারে; প্রকৃতির ন্যায় এই চিত্র-রচনাগুলি সকলেরই সাধারণ উপাস্য জিনিষ। এই সব ওস্তাদের হাতের রচনাগুলি দেখিবার

জন্য কত লোক সেখানে গমন করে। প্রায়ই কলা-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আদর্শরূপে এই সকল চিত্রের নকল করিয়া থাকে। কোন কোন জাপানী চিত্রকর, য়ুরোপীয় ধরণেও চিত্র রচনা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে আনাড়ীর হাত প্রকাশ পায়। সপ্তদশ শতাব্দীর বড় বড় চিত্রকরদের চিত্রিত অনেকগুলি ছবি—লোক-প্রিয় ছাপা-চিত্রের জন্য ও গৃহবিভূষণী শিল্পকলার জন্য গৃহীত হইয়াছে। কোন গালার বাক্সের উপর, কিংবা কোন আধুনিক কাপড়ের উপর যে ছবির নক্সা দেখিয়া আমরা তারিফ্ করি, হয়ত তাহা উৎকৃষ্ট প্রাচীন চিত্রকর তান্যু কিংবা ওক্রিয়োর রচনা হইতে অথবা বাস্তবতন্ত্রী (Realistic) সম্প্রদায়ের একজন প্রধান চিত্রকর হকুসাইর রচনা হইতে গৃহীত।

অভিজাতবর্গের মধ্যেই এই পুরাতন উৎকৃষ্ট শিল্পকলার বেশী আদর। হরিউজি নগরে একদিন আমি ব্যারন্ কিতাবাতাকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; ইনি জাপানের একজন প্রাচীন "দাইমিও;"—সামন্ত শাসন-আমলের একজন সেকেলে বড় আমীর; ১৮৬৮র রাষ্ট্রবিপ্লব তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, অথচ তাঁহার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তাঁহার বৈঠকখানা ঘরটি খুব সাদাসিধা ধরণের, কিন্তু কতকগুলি অপূর্ব্ব ও চমৎকার শিল্পসামগ্রীর দ্বারা বিভূষিত। তাঁহার খাবার ঘরটিতেও আসবাবের কোন আড়ম্বর নাই। যখন তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিলাম, দুইশত বৎসরের পুরাতন গালার ছোট ছোট বাটিতে অন্নব্যঞ্জনাদি আনীত হইল। তিনি জাপানের পুরাতন শিল্পকলার বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাদের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে তিনি জ্বলন্ত অনুরাগের সহিত বলিলেন:—"পুরাতন শিল্পকলা, 'নীতি-প্রতিবিম্বিত' শিল্পকলা, উচ্চকুলের উপযোগী শিল্পকলা,—এই সমস্ত শিল্প-কলার বিষয়গুলি খুব উচ্চ ও মহৎ।" আমার দুর্ভাগ্য,—আমি দোভাষীর মুখ দিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম, "বাস্তবতন্ত্রী চিত্রকর-সম্প্রদায়ের এই যে লোকপ্রিয় ছাপা-চিত্রগুলি দেখিতেছি এগুলি বড়ই সুন্দর"—আমার এই কুরুচি দর্শনে, বৃদ্ধ ব্যারন্ আমাকে শিষ্টতার সহিত ভর্ৎসনা করিলেন:—"য়ুরোপীয়দের শিল্পকলা হদ্দ দুইশত কিংবা তিনশত বৎসর পুরাতন, কিন্তু আমাদের শিল্পকলা পঁচিশ-শ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে; অতএব, য়ুরোপীয়দের রুচি যে আমাদের মত এখনও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই—ইহা স্বাভাবিক।" * * *

জাপানের অভিজাতবর্গ যেরূপ জাপানের পুরাতন চিত্রাদির পক্ষপাতী, সেইরূপ জাপানের সাধারণ লোক, প্রাচীন ছাপা-ছবির অনুরাগী। অষ্টাদশ শতাব্দিতে, ও সমস্ত উনবিংশতি শতাব্দির মধ্যে,—হকুসাই, উতামারু, তৈয়োকুনি, কুনিসাদা প্রভৃতি বড় বড় চিত্রকর,—দৈনিক জীবনের অনেকগুলি সুপরিচিত দৃশ্য, রঙ্গিন্ ছাপা-ছিত্রে খুব কবিত্ব-সহকারে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। জাপানের এই বাস্তব-তন্ত্রের চিত্রকর্ম্মে বাস্তবের অনুকরণ আছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বজনবিদিত সামান্য ধরণের বাস্তবতা নহে;—কবিত্ব আছে কিন্তু তাহাতে কবিত্বের ন্যাকামি নাই। এ গুলি লোকপ্রিয় হইলেও উহার মধ্যে ইতরামি কিংবা গ্রাম্যতা নাই। ছোট ছোট দোকানের মাদুরের উপর কয়েক ঘণ্টা কাল উবু হইয়া বসিয়া, ঐ ছাপা-চিত্রগুলি ঘাঁটিয়া

ঘুঁটিয়া না দেখিলে, উহার মধ্যে কত বিষয়-বৈচিত্র্য আছে তাহার ধারণা হয় না। উহার মধ্যে দেখিতে পাইবে সমস্ত পৌরাণিক জাপানের চিত্র, সমস্ত ঐতিহাসিক জাপানের চিত্র, সমস্ত আধুনিক জাপানের চিত্র:—উহার মধ্যে সাধারণ লোক আছে, চাষা আছে, অভিনেতা আছে, পুরোহিত আছে, আমির-ওমরা আছে, অভিজাতবর্গের দীর্ঘমুখী মহিলা আছে, গাল-ফুলো সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে আছে; নর্ত্তকী, বেশ্যা, ঘর বাড়ী, চা-গৃহ, নাট্যালয়, দেব মন্দির, ফুজিয়ামা পর্ব্বত, মাঠ ময়দান, বৃষ্টি, বরফ, জীবজন্ত, সমস্ত ফুলের ছবি আছে। এই নানা রঙ্গের রঙ্গিন্ ছাপা চিত্রগুলি বাস্তবের হুবহু নকল, অথচ তাহাতে বেশ একটা কবিত্বের আকর্ষণ আছে; উহাদের টাট্‌কা রঙ্গের দরুণ, কতকটা 'জল চিত্রের' মত দেখায়; উহাদের নক্‌সা-কল্পনা খুব জীবন্ত ধরণের; চিত্রকর, দুই একটা বাছা-বাছা রেখা টানিয়া, মুখশ্রীর দুই একটা প্রধান জিনিস্ আঁকিয়া, কোন জটিলতম পদার্থেরও ভাব ভঙ্গী, ও এমন-কি গতি পর্য্যন্ত লোকের মনে অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই সুন্দর শিল্পরচনা-গুলি খুব সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়—হদ্দ দুই চারি আনায়; দেশের মধ্যে এই সকল ছবি খুব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ এইগুলি মধ্যবিত্ত লোক ও জনসাধারণের মধ্যে খুব প্রবেশ করিয়াছে; ছোট ছোট দোকানদার, কারিগর, অভিনেতা, বেশ্যা—ইহারাই হকুসাইর পসার রাখিয়াছে। আজিকার দিনেও অনেক দোকানে ও অনেক বাড়ীতে এই সব সুন্দর প্রকৃতির নকল ও জাপানী জীবনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানী নাট্যের উপরেও কোন প্রকার য়ুরোপীয় প্রভাব আসিয়া পড়ে নাই।—প্রথমতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নাটক, বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পৌরাণিক নাটকগুলিই মন্দিরের অভ্যন্তরে অভিনীত হয়:—মুখে-রং-মাখা কিংবা মুখস্-পরা অভিনেতারা, রেশম ও জরির পুরাণো-ধরণের পরিচ্ছদ পরিয়া, গলাভাঙ্গা কর্কশস্বরে সেকেলে ভাষায় কথা কহে;—এ ভাষা, এখনকার জাপানীরা বুঝে না। উহাদের বিরল ও বিলম্বিত অঙ্গভঙ্গীই উহাদের হৃদয়ের প্রচণ্ড রুদ্ধ আবেগ পরিব্যক্ত করে; গ্রীক্ ট্রাজেডির মত, কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা 'কোরস্' থাকে। এক দিন কিওটো নগরে, নিশিহোঙ্গাজী নামক একটি বৌদ্ধ মঠের ভিক্ষুর সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখি, ঐরূপ একটি ধর্ম্ম-নাটক (নো) অভিনয় হইতেছে। আমি লৌকিক চীনদেশের হৃদয়দেশ ক্যান্টন নগরে গিয়াছি, গূঢ় রহস্যময় ভারতবর্ষের বারাণসী নগরে গিয়াছি, কিন্তু এখানকার অভিনয় দেখিয়া আমার মনে যেরূপ একটা উৎকট বিদেশীভাব—দুরত্বের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল এমন আর কোথাও হয় নাই। * * *

কাওয়ানামী ও সাদা-য়াকো কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিতান্ত আধুনিক ধরণের নাটকাদির কথা যদি ছাড়িয়া দেও, এখনও জাপানে লৌকিক নাটকগুলাও সেকেলে ধরণে অভিনীত হইয়া থাকে। নাট্যালয়টা খুব সাদাসিধা ধরণের কাঠের বাড়ী; নাটকের প্রধান দৃশ্যগুলি নাট্যালয়ের মুখ-ভাগে পেরেক দিয়া আট্‌কানো। এই দৃশ্যগুলি দুর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে কতকগুলা বাঁশ পোঁতা,—বাঁশের উপর কতকগুলা বহুরঙা পতাকা;—সেই পতাকার গায়ে, সুন্দর চীনে অক্ষরে, অভিনেতাদের গুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখন কখন, লোকপ্রিয় রঙ্গালয়ে, অভিনেতারা সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, আড়ম্বর সহকারে জনতার সম্মুখ দিয়া যাত্রা করে; অথবা একটা যবনিকা তুলিয়া দেওয়া হয়; সেই সময় পথ-চল্‌তি লোকেরা অভিনয়ের আরম্ভটা দেখিতে পায়, তাহার পর, যে সময় অভিনয়টা খুব মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে, অমনি যবনিকা ফেলিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরে, দর্শকেরা মাদুরের উপর উবু হইয়া বসিয়া আছে, পাইপ্ সেবন করিতেছে, চা পান করিতেছে, বাতাবিলেবু খাইতেছে। রঙ্গমঞ্চটি একটা ঘুরন্ত তক্তা, প্রতি অঙ্কের অবসানে মঞ্চটা ঘুরিয়া যাইতেছে, এবং সেই সঙ্গে পুরাতন দৃশ্য ও পুরাতন অভিনেতার অন্তর্ধান এবং নূতন দৃশ্য ও নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইতেছে। অভিনেতারা, সেকেলে ধরণের জমকালো পোষাক পরিয়া, বিশুদ্ধ জাপানী ভাবের প্রেমনাট্য সকল অভিনয় করে। যোশিবারার বেশ্যারা এই সকল নাটকের প্রধান নায়িকা। উহারা ঐতিহাসিক নাটকেরও অভিনয় করে; এই সকল নাটকে প্রাচীন জাপানের বীরপুরুষদিগের সাহসের কাহিনী বিবৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাহ্ণ দশটা হইতে সায়াহ্ন ১০টা পর্য্যন্ত এই সকল নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু কাহারও ক্লান্তি বোধ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, কি পুরাতন জাপানী চিত্র, কি পুরাতন ছাপা-ছবি, কি নাট্যাভিনয়,—এই সব বিষয়ে জাপানীদের পুরাতন রুচি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের সাহিত্যের প্রতি উহারা উদাসীন; আমাদের সঙ্গীতবাদ্য উহাদের নিকট অর্থহীন কোলাহল; আমাদের গান গাইবার ধরণটা উহাদের নিকট এতই হাস্যজনক যে তাহা শুনিয়া উহারা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠে। আজকাল জাপানী শিল্পকলার অবনতি হইতেছে এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হইতেছে এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই।

বিসর্জ্জন।

হৃদয় নিকুঞ্জ আজি মহা অন্ধকার!
আর ত যায় না দেখা, রবিকর, চন্দ্রলেখা;
ঘিরেছে জলদ ঘন, প্রলয় আকার!
নাহি ফুল্ল-ফুলহাসি, আশার মুকুলরাশি,
প্রবল ঝটিকা বলে ছিন্ন ছারখার!
নীরব বিহঙ্গগীতি উন্মাদ-উল্লাস প্রীতি;
শূন্য স্তব্ধ শোকাচ্ছন্ন হৃদয় আগার!
কি দিয়ে তবে গো দেবি সেবিব তোমায়?
দেবতারে কোন প্রাণে রেখে দেব অযতনে,
এ ভগ্ন মন্দির ছাড়ি যাও সেথা হায়!
তোমার পদারবিন্দ লভিতে সেবকবৃন্দ
কঠোর আয়াসে যেথা তোমারে ধ্যেয়ায়!

আমার কিছুই নাই দিব উপহার!
নাই অর্ঘ্য নাই ভক্তি, নাই পুণ্য নাই শক্তি
শুধু নয়নের নীর শুধু হাহাকার!
কেমনে সে অশ্রু দিয়ে, শোকগুচ্ছ বেঁধে নিয়ে
অর্পিব তোমারে শুধু পরিশ্রান্তি ভার!
তাই মুছি আঁখিনীর—নত করিতেছি শির
কর আশীর্ব্বাদ, দাও চরণের ধূলি।
ঘুচুক এ অন্ধকার, এসো মাগো পুনর্ব্বার,
পূজিব ষোড়শোপচারে, সিংহাসনে তুলি।

শ্রীতরুণচন্দ্র ফুকণ।

সময়াভাব।

(১)

কৃষ্ণনগরের উকিল হরনাথ বসু জমিদার ঘরে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছিলেন! মিষ্টকথা ও মিষ্টান্নে তাঁহার জমিদার বেহাইনের কোন দিন মনস্তুষ্টি করিতে ত পারিতেনই না, উপরন্তু গঞ্জনার বাণীলাভ হইতে কখনো বঞ্চিত হইতেন না। মেয়েটী শাশুড়ীর তীব্র শ্লেষোক্তিতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া যখন মাতাকে লিখিল, "মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে যেমন করে হোক্ একবার নিয়ে যাও, আমার বড় মন কেমন করে;" তখন স্নেহশীলা মা'র প্রাণ নিতান্তই কাতর হইয়া উঠিল। পত্নীর একান্ত অনুরোধে হরনাথ জমিদারের মোটা থাম ও প্রকাণ্ড গেটযুক্ত অট্টালিকায় মাথা গলাইয়া নানাবিধ কাতর উপরোধেও তাঁহার আদরিণী অভিমানিনী কন্যা সুরমাকে স্বগৃহে দুইদিগের জন্যও আনিবার অনুমতি পাইলেন না, বরং তাহার পরিবর্ত্তে বড় মানুষ কুটুম্বিনীর নিকট বেশ চড়া রকমের পাঁচ কথা শুনিয়া ঘরে ফিরিলেন। সেইদিন তিনি স্থির বুঝিলেন যে আপনার চেয়ে বড় ঘরে কুটুম্বিতা করা কিছু নয়; পর ত আপন হয়ই না তাহার উপর আপনটিও পর হইয়া যায়। ইহাপেক্ষা ছোট ঘরে কাজ করাই শ্রেয়।

এই সিদ্ধান্ত ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, হরনাথ বাবু তাঁহার ছোট মেয়ে প্রমীলাকে গরীবের ঘরে সমর্পণ করাই স্থির করিলেন।—নানাস্থানে অনুসন্ধানের পর জারুলগাঁয়ের ভুবন দত্তের পুত্র শচীনাথের সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল!

ভুবন দত্ত পল্লীবাসী গৃহস্থ, গ্রাম্য জমিদারের গোমস্তাগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জমিদারের গোমস্তারা সাধারণত যেমন কলহপ্রিয় প্রজাপীড়ক ও দুর্দ্দান্ত হয় তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; বহুদিন হইতে তিনি গোমস্তাগিরি করিয়া আসিতেছেন কিন্তু সেই পনেরো টাকা বেতনে কায়ক্লেশে দুটি অন্নবস্ত্রের সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন মাত্র। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বতন গোমস্তা রতন চৌধুরী এই পনেরো টাকা বেতনে দোলদুর্গোৎসব পর্য্যন্ত করিতেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার বাসায় দুবেলা বিশখানি পাত পড়িত, ধূমধামের অন্ত ছিল না; লোকে বিস্মিত হইয়া বলাবলি করিত, চৌধুরী মহাশয়ের সার্থক গোমস্তগিরি করা! ভুবন দত্ত এ সকল কথা শুনিয়া হাসিতেন; লোকে ভাবিত লোকটী বড় কৃপণ। অনেকেই ভূতপূর্ব্ব গোমস্তার কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত এবং বলিত "এমন গোমস্তা আর হবে না"।—এমন কি রতন দুটাকা আদায়ের চেষ্টায় যে সকল প্রজার পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই তাহারাও এখন বলে—"লোকটীর কি প্রভাবই ছিল, বাঘে গরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে গিয়াছে!" সুতরাং তাহাদের মতে ভুবন দত্ত নেহাত কাপুরুষ, সিক্তমার্জ্জার! সাধারণ লোকের বিচার এইরূপই হইয়া থাকে।

(২)

ভুবন দত্তের পুত্র শচীনাথ রায়গঞ্জের মাইনর স্কুলে পড়িত। মাসীর বাড়ী থাকিয়া সে লেখাপড়া করিত। মাসীর পুত্রকন্যা ছিল না, শচীনাথকেই তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। তাহার পড়া শুনা খরচ পত্রের জন্য ভুবন বাবুকে কষ্ট পাইতে হইত না। কখন কখন পুত্রের জলখাবারের জন্য টাকাটা সিকেটা পাঠাইয়া দিতেন—কার্ত্তিক মাসে নূতন খেজুরে গুড়ের 'পাটালি'; মাঘ মাসে 'কুমড়াবড়ি' প্রভৃতি দিয়া ছেলের তত্ত্ব লইতেন মাত্র। শচীনাথের একালের ছেলেদের মত কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। সে কোনদিন পান্তাভাত খাইয়াই স্কুলে যাইত কোন দিন বা সকাল সকাল স্নান করিয়া আসিয়া মেসো মহাশয়ের নৈশভুক্তাবশিষ্ট বুটের ডাল ও রুটিতে মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিত এবং গরম মুড়ি ও লঙ্কামরিচে তাহার বৈকালিক জলযোগ সম্পন্ন হইত। 'সুছেলে' বলিয়া শচীনাথের পাড়ায় একটা নামডাক ছিল এবং অদৃষ্টগুণে হরনাথ বসুর চোখে পড়িয়া যাওয়ায় পাড়ার সকলে শচীনাথের এই উন্নতিতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

বিবাহ অন্তে, হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী নব জামাতার পাঠ এবং সুখসচ্ছন্দতার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করিলেন। নির্জ্জনে পাঠের জন্য তাহাকে একটি সুসজ্জিত কক্ষ ছাড়িয়া দিলেন, তাহার ফরমাস্ খাটিবার জন্য স্বতন্ত্র ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট হইল, পড়াইবার জন্য যথানিয়মে মাষ্টার আসিতে লাগিল। এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটিকে নাগরিক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের জামাতার যোগ্যবেশে সাজাইবার জন্য অনুষ্ঠানের সামান্য ত্রুটিটুকু পর্য্যন্ত রহিল না।

কিন্তু অধিক চটকাইলে লেবু তিক্ত হইয়া যায়। শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহাকে এত আদর যত্ন করেন, দাসদাসীগণ এত সম্মান দেখায়, ক্লাশের ছেলেরা তাহার চকচকে বার্ণিশ করা জুতা, বিচিত্র মোজা, সুন্দর ইস্ত্রি করা সার্ট এবং পুষ্পশুভ্র কোঁচানো চাদরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে তখন আপনার প্রথম জীবনের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হয় এবং মেশোমহাশয়ের উচ্ছিষ্ট বাসি রুটির কথা মনে হইলে লজ্জায় মরিয়া যায়! এখন সে সঘৃত অন্ন ও গল্দা চিংড়ীর মুণ্ড পরিপাক পূর্ব্বক ডেপুটি বাবুর ভাই ও মুন্সেফ্ বাবুর পুত্রের সহিত বাবুগিরিতে সমান "পোজিসান্" রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।

যে সকল ছাত্রের 'পোজিসান' রক্ষার দিকে ঝোঁক বেশী সরস্বতীর খাতির তাহাদের দ্বারা সকল সময় সমান রক্ষা হয় না। ক্রমে এমন হইল যে শীতের সময় হিমে তাহার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইত এবং গ্রীষ্মের সময় ঘরের মধ্যে সে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেও গায়ের সার্ট খুলিত না, পাছে গাত্র হইতে কোনরূপ পাড়াগেঁয়ে গন্ধ প্রকাশ পায়।

হরনাথ বাবু সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন হিতোপদেশে এই বিষয়টার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ মেধাবী জামাতা শ্বশুর মহাশয়ের এই স্নেহাতিশয্যের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া প্রচুর দীর্ঘশ্বাস ও অজস্র অশ্রুবর্ষণে আপনার ক্ষুব্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত করিয়া দিল। হরনাথ বাবু সে দিন প্রতিজ্ঞা করিলেন জামাতাকে

আর কখনো এরূপ কিছু বলিবেন না! এতদিনে তাঁহার বিশ্বাস হইল, পরের ছেলে কখনই আপন হয় না, তা সে জমিদারের ছেলেই হোক্ আর ভিখারীর ছেলেই হোক্!

এদিকে পুত্রের অদর্শনে শচীনাথের পিতামাতা নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। শচীনাথ ইদানীং বাড়ীতে পত্র লেখাও প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে! অবশেষে পূজার বন্ধ হইল। ভুবন দত্ত শচীনাথকে গৃহে পাঠাইবার জন্য হরনাথ বাবুকে বিস্তর অনুনয় করিয়া পত্র লিখিলেন,—হরনাথ বাবুর অবশ্য ইহাতে এতটুকু আপত্তি ছিল না,—তিনি জামাতার মতিগতি দেখিয়াও জামাতাকে আবার একবার ভাল করিয়া বুঝাইলেন। শচীনাথ পিতার এই ঘোরতর বেয়াদপি ও পাড়াগেঁয়েমি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পর দিনই খুব তাড়া দিয়া পিতাকে এক পত্র লিখিল, "সময় নাই, অসময় নাই, কেবলি বাড়ী যাবার জন্য এত লেখালেখি কেন? আমি কি জলে পড়িয়াছি! এ বৎসর পরীক্ষা দিতে হইবে—এখন পড়া বন্ধ করিয়া পাড়াগাঁয়ে গিয়া বসিয়া থাকিলেই কি চতুর্ভুজ হইব! মা যে আমাকে দেখিবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহাকে বলিবেন এখন আমি কিছুতেই বাড়ী থাকিতে পারিব না।"

পত্র পাইয়া ভুবন বাবু বিস্মিত হইলেন। পুত্রের স্নেহহীন কঠোর কথা শুনিয়া মাতার হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল,—তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল,—পাছে অশ্রুপাতে পুত্রের অকল্যাণ হয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বস্ত্রপ্রান্তে নয়ন মুছিয়া কহিলেন—"আহা চিরকাল পড়া পড়া করে বাছা আমার অস্থির। পরীক্ষাটা চুকে গেলেই আবার ছেলে আমার কোলে আসবে!" শচীনাথের পরীক্ষা শেষ হইলে একদিন শ্বাশুড়ী কহিলেন, "তোমার মা তোমাকে দেখিবার জন্য বড় অস্থির হয়েছেন—একবার দু-দিনের জন্য ঘুরিয়া আসিলে হয় না? এখন ত পড়াশুনার ঝঞ্ঝাট নাই!"

ইহার পর একবার বাড়ী না যাওয়া বড়ই খারাপ দেখায়। শচীনাথ বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পোর্টম্যাণ্টোর ভিতর ইস্ত্রি করা সার্ট আধ ডজন, পঞ্জাবি আধ ডজন, খান কতক কোঁচান ধুতি ও চাদর, আয়না, চিরুণি, ব্রুস, সাবান, এসেন্স, টুথ-পাউডার প্রভৃতি আসবাব লইয়া শচীনাথ পিতৃসন্দর্শনে চলিল।

তখন চৈত্র মাস। বসন্ত কাল। প্রকৃতিদেবী পল্লীগ্রামকে অপূর্ব্ব ভূষায় ভূষিত করিয়াছেন, নৌকা হইতে নামিয়া শচীনাথ মাঝির মাথায় পোর্টম্যাণ্ট চাপাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। মাঠের মধ্য দিয়া সরুপথ—উঁচু নীচু, কোথাও বা আঁকা-বাঁকা! একদিকে যতদূর দেখা যায় শুধু গোধূমক্ষেত্র। সুবর্ণ গোধূমশীর্ষ ধরণীর সুকোমল পট্টবস্ত্রের স্বর্ণাভ অঞ্চলের ন্যায় বিছানো রহিয়াছে, অন্যদিকে ঘন অড়হরবনের নিবিড় ঝোপের মধ্যে বসিয়া শ্যামা শিষ দিতেছে, দহিয়ালের গানে মুক্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে এবং ফিঙে পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া খানিকদূর ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিতেছে। অড়হর বনের ধারে একদল কৃষকবালক "ডাণ্ডাগুলি" খেলিতেছিল ও শিমুলগাছের লোহিত পুষ্প স্তবকের ভিতর হইতে একটা কোকিল 'কু-উ' 'কু-উ' শব্দে এই উদাস উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহার উচ্ছ্বলিত হৃদয়ের

আবেগপূর্ণ সঙ্গীত-লহরী ঢালিয়া দিতেছিল। ক্রমে গ্রামপ্রান্তে আমবাগানের অন্তরালে সূর্য্য অস্তে গেলেন! পুরবধূবর্গের শঙ্খরোলে ও প্রদীপালোকে প্রতি ভবন যখন মুখরিত ও আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে শচীনাথ আপনার পিতৃভবনে পদার্পণ করিল। মাতা বহুদিন পরে পুত্রকে নিকটে পাইয়া তাহাকে কোথায় রাখিবেন, কি দিয়া আপনার স্নেহতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবেন তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছিলেন; কিন্তু এই স্নেহাতিশয্য শচীনাথের নিকট নিতান্ত অনাবশ্যক ও বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। শচীনাথের ছোট ছোট ভাইবোনগুলি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের এই বিচিত্রবেশধারী দাদাটির প্রতি নিতান্ত বিস্ময় সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল—তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে সে তাহাদেরই একজন; এই ইস্ত্রি করা শক্ত প্লেটের নীচে কেমন করিয়া একখানি স্নেহকোমল, প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয় থাকিতে পারে! মা যখন কোলের ছেলেটিকে আদর করিয়া কহিলেন, "খোকনমণি, দাদার কাছে যাবে না?" তখন সেই ধূলিলাঞ্ছিত হস্তপদ, অপরিচ্ছন্ন বালক কিছুতেই সেদিকে অগ্রসর হইল না, শুধু মায়ের কোল ঘেঁসিয়া অবাক হইয়া একদৃষ্টে দাদার পানে চাহিয়া রহিল।

পিতৃগৃহে আসিয়া শচীনাথের পদে পদে অসুবিধা হইতে লাগিল। চেয়ার ভিন্ন অন্য আসনে বসা তাহার অভ্যাস ছিল না, জীর্ণ সতরঞ্চি ও মোটা মাদুর তাহাকে বিষম বিব্রত করিয়া তুলিল; রাত্রে জীর্ণ গৃহে মৃৎপ্রদীপের মিটমিটে আলো তাহার চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্যের একটা নিরানন্দময় ম্লান যবনিকা বিস্তীর্ণ করিয়া দিল এবং একখানি ভগ্নপাদ তক্তাপোষ ও মলিন শয্যা মাতৃস্নেহরসে সিক্ত হইলেও কিছুতেই তাহার চক্ষে নিদ্রা আনয়ন করিতে পারিল না! তাহার মনে পড়িতেছিল তখন শশুরগৃহের সেই আর্সিখড়খড়িযুক্ত বড় জানালা, দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ একটা সম্পদের দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য! শচীনাথ পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল—"এখানে আর একদিন থাক্‌লে আমি ভেপ্‌সে মারা যাব!" মাতা ও পিতার কাতর স্নেহানুরোধও তাহার শৈশবের ক্রীড়া-ভূমি পল্লীগ্রামে আর একদিনও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ফল বাহির হইল। শচীনাথ নিজের, পিতৃপিতামহের ও শ্বশুর শাশুড়ীর মুখোজ্জ্বল করিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল! যাহারা বলিত বড়ঘরে বিবাহ করিয়া শচীনাথ বহিয়া গিয়াছে তাহাদের মুখে কালি পড়িল।

এইবার কলিকাতায় পড়িবার পালা! প্রেসিডেন্সি কলেজে না পড়িলে সুবিধা হইবে না, অগত্যা ডেপুটি বসুর ভাই, মুন্সেফ বসুর পুত্র প্রভৃতির সহিত শচীনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে চলিল! সকলে মিলিয়া এক মেস খুলিলেন, নাম দিল—'এঞ্জেল মেস'! অল্পকাল মধ্যেই শচীনাথ পুরারকম 'সহুরে' হইয়া উঠিল। ফ্যাসানে, সহুরে ছাত্রগণকে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সাম্য এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বীজ তাহার হৃদয়ে বহুপূর্ব্বেই লিপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে অনুকূল জলবাতাসে তাহার উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা

সতেজে গজাইয়া উঠিল এবং পিতামাতার দোষে বাল্যকালে মনের মধ্যে বিনয়, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি যে সকল আগাছা জন্মিয়াছিল অল্পদিনের মধ্যে তাহা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল! এখন তাহার সম্মুখে পল্লীগ্রামের কথা উঠিলে তাহার নাসা সর্ব্বাপেক্ষা কুঞ্চিত হয় এবং 'তাহার দেশের' কথা পড়িলে অসঙ্কোচ নিন্দাবাদে তাহার উৎসাহের সীমা দেখা যায় না! কলিকাতায় আসিয়া শচীনাথ বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পিতার নিকট হইতে ক্রমাগত পত্র আসিলে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সে কদাচ দু-একছত্র উত্তর লিখিত। এখানে ক্রিকেট, ফুটবলের ম্যাচ, গালগল্প, থিয়েটার, মিটিং প্রভৃতি লইয়া সে এতটা ব্যস্ত থাকিত যে পত্র লিখিবার অবকাশই তাহার ঘটিয়া উঠিত না!

এদিকে নানাবিধ দুর্ভাবনা ও খেদে শচীনাথের মাতা একদিন রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন ভুবন বাবু পত্নীর সবিশেষ আগ্রহে পুত্রকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া দু'একদিনের জন্য তাহাকে গৃহে আসিবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিলেন। শচীনাথ লিখিল—'এখন যাইবার সময় একেবারে নাই!'

ভুবনদত্ত ম্লানমুখে পত্নীর নিকট পুত্রের পত্র পাঠ করিলেন। পত্নী বলিলেন, 'নাগো, তুমি ভাল করে লেখনি—তা'হলে কি আমার অসুখ শুনে, বাছা আমার একবার না এসে থাকতে পার্ত্ত? তুমি নিজে একবার যাও—তাকে নিয়ে এস না!' পত্নীর কাতর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ভুবন বাবু একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুত্রকে আনিবার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

* * * * * *

সেদিন শনিবার। ক্লাশের নন্দসিংহের বিবাহ হইয়া গিয়াছে; তদুপলক্ষে আজ সে বাগানে বন্ধুবর্গকে প্রীতিভোজ দিতেছে! এঞ্জেল-মেসের ছাত্রগণ সাজসজ্জায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কাহারও মাথার উপর ঘন ঘন ব্রুস চলিতেছে, কেহ দর্পণে মুখশ্রী দেখিতে-ছেন ও কত রকমের মুখভঙ্গী করিতেছেন, কেহ দেহাদি মার্জ্জন করিতেছেন; কেহ পাম্প-শূর ধূলা স্বহস্তেই ছাড়িতে বসিয়াছেন,—টেবিলের উপর মিল্ক অব রোজ, সুগন্ধি সাবান, 'অটোডিরোজ' প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে; সুগন্ধে কক্ষ পরিপূর্ণ—আনন্দে সকলের হৃদয় ততোধিক পূর্ণ! এমন সময়ে দ্বার সন্নিধানে পথশ্রান্ত চিন্তাকুল শীর্ণদেহ বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ডাকিল—'শচীনাথ,—বাবা!—'

গৃহের সমস্ত আনন্দধ্বনি ও হাস্যোচ্ছাস মুহূর্ত্তের মধ্যেই স্তব্ধ হইয়া গেল,—সকলে অবাক হইয়া সেই মলিনবস্ত্রপরিহিত পল্লিবাসীর ম্লানমুখ ও নিষ্প্রভ চক্ষুর প্রতি কৌতূহলচিত্তে চাহিয়া রহিল। শচীনাথ নিমেষে অপ্রতিভ হইয়া তৎপরমুহূর্ত্তেই বৃদ্ধকে ইঙ্গিত করিয়া একেবারে একটা নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গেল, বৃদ্ধ কাতরভাবে কহিল, "বাবা, একবার বাড়ী চল—তোমার মার জীবন সংশয়—তোমাকে একবার দেখার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছেন—" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু শচীনাথের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হৃদয় ইহাতে বিচলিত

হইবার নহে! সে কহিল 'আমিত লিখেইছি আমার এখন সময় নেই' আমার এক বন্ধুর বিয়ে, তারি জন্যে আমি ভারী ব্যস্ত—আজ party, কাল থিয়েটার—"

পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "চল বাবা, নহিলে আর দেখতে পাবে না তোমাকে"—ভুবনদত্তের চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়িল। শচীনাথ উত্তপ্তভাবে কহিল "অসম্ভব! আজ আমি Partyতে না গেলে সে ভারী দুঃখিত হবে! আমার সঙ্গে তার বড্ড বন্ধুত্ব, আর বিশেষ যখন কথা দেওয়া গেছে, তখন তার নড়চড় করাটা ভদ্রতা হবে না। পারি ত দুচার দিন বাদে বরঞ্চ বাড়ী যাব।" এই কথা বলিয়া শচীনাথ সে গৃহ পরিত্যাগ করিল। একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "বুড়োটা কেহে?" অবজ্ঞার সহিত শচীনাথ কহিল, "ও আমাদের জমিদারের গোমস্তা, কি একটা দরকারে কলকেতায় এসেছে।" চতুর্দ্দিক আনন্দ-কলরবে মুখরিত ও এসেন্সের গন্ধে সুরভিত করিয়া সকলে নিমন্ত্রণ রক্ষায় বহির্গত হইয়া গেল!

বৃদ্ধ ভুবনদত্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কিয়ৎক্ষণ কত কি ভাবিলেন পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "হা ভগবান!"—এই একটি নিশ্বাসে ও একটিমাত্র কথায় তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিল। সে সময় পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া ট্রামগাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে, ফেরিওয়ালারা জিনিষ পত্র মাথায় লইয়া হাঁকিয়া চলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে একটা কর্ম্ম, আনন্দের প্রবাহ উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে, শুধু এই নিরানন্দ মর্ম্মাহত বৃদ্ধের হৃদয়ে এক নির্ম্মম পুত্রের হৃদয়হীনতা তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় বিঁধিতেছিল; হায় এই কি তাঁহার সারাজীবনের আশার অবলম্বন বিনীত ধীর পুত্র!

পরদিন প্রভাতে পুত্রমুখসন্দর্শন প্রত্যাশায় উন্মুখী পত্নীর নিকট আসিয়া পুত্রের নির্ম্মম ব্যবহারের কথা বলিতে গিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া আকুল হইল। রোগক্লিষ্টা ব্যথিতা রমণীর চক্ষুপ্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাঁহার পাণ্ডুর বিশীর্ণ গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল,—নিতান্ত আর্ত্তকণ্ঠে তিনি কহিলেন—"দুঃখিনী বলে কি অপরাধ করেছি বাবা, যে একবার দেখা দিলিনে! গরীব বলে কি পেটের ছেলেও পর হ'ল—হা মধুসূদন!" সন্ধ্যার সময় অভাগিনীর চক্ষুদ্বয় মুদিয়া আসিল,—জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া চারিদিক যখন অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল তখন প্রিয়তম কণ্ঠের একটি উপেক্ষার বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল—"এখন সময় নেই, সময় নেই!" মুদ্রিতনয়না অভাগিনী মুমূর্ষু কণ্ঠে একবার মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"সময় নেই, সময় নেই"!

পুত্রবৎসলা দুর্ভাগিনী নারী যখন পুত্রের এই নির্ম্মম কঠোর উপেক্ষার বাণীটিকে মহাপথের একমাত্র পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ইহ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার 'পাব্লিক-স্পিরিট' পুত্রটি কলিকাতার উৎসবভবনে, সখের থিয়েটারে, ষ্টেজের পার্শ্ব হইতে রুমাল নাড়িয়া জনৈক অভিনেতার অভিনয়চাতুর্য্যের উপলব্ধি-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন; আর কোন বিষয় ভাবিবার তাঁহার সময় ছিল না!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ধনিয়া স্থত্ত।

(মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন।)

পালী।

১ ধনিয়ো গোপোঃ

"পক্কোদনো দুদ্ধখীরোহহমস্মি
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,
ছন্না কুটী, আহিতো গিনি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

২ ভগবাঃ

অক্কোধনো বিগতখিলোহহমস্মি (১)
অনুতীরে মহিয়' একরত্তিবাসো,
বিবটা কুটী, নিব্বুতো গিনি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

৩ ধনিয়ো গোপোঃ

"অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে,
কচ্ছে রূঢ়তিণে চরন্তি গাবো,
বুটিটম্ পি সহেয়্যুম্ আগতম্,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

৪ ভগবাঃ

"বদ্ধা হি ভিসী সুসঙ্খতা
তিণ্ণো পারগতো বিনেয্য ওঘম্,
অত্থো ভিসিয়া ন বিজ্জতি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

৫ ধনিয়ো গোপোঃ

"গোপী মম অস্‌সবা অলোলা, (২)
দীঘরত্তম্ সমবাসিয়া মনাপা,
তস্‌স ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

বঙ্গানুবাদ।

১ গোপাল ধনিয়া

"পক্ক অন্ন, গাভী দুগ্ধ আছি খেয়ে পিয়ে,
মহীতীরে ভাইবন্ধু মিলি করি বাস;
কুটীর ছায়িত, অগিনি আহিত,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

২ বুদ্ধদেব

"অক্রোধ বন্ধনশূন্য আমি যে এখন
মহীতীরে সবেমাত্র একরাত্রি বাস;
গৃহ অনাবৃত, অগ্নি নির্ব্বাপিত,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

৩ ধনিয়া

"অন্ধক-মশক হতে মুক্ত ধেনুগুলি
তৃণচ্ছন্ন গোচরণে চড়িয়া বেড়ায়,
আসুক্ না বৃষ্টি, না করিবে দৃষ্টি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

৪ বুদ্ধদেব

"নৌকাখানি সুগঠন, বাঁধা আটে ঘাটে,
বড় বড় ঢেউ ঠেলি তাহে হৈনু পার;
নৌকায় এখন, কিবা প্রয়োজন,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

৫ ধনিয়া

"গোপী মম সুচরিতা পতিব্রতা সতী,
একত্রে করিনু ঘর দীর্ঘকাল ধরি;
নাহি তার নামে, নিন্দা শুনি কাণে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

(১) বিগতখিলো।
এই শব্দটী বেদ ও পালি সাহিত্য উভয়ে ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে "কীল"—গ্রাম্য ভাষায় "খিল"। ইহার অর্থ গরু বাঁধার খুঁটি। তাহা হইতে, বাধা, বন্ধন। ফজবোল সাহেব ধনিয়া সূত্তের অনুবাদে (S. B. E Series Vol & **Part II.**) অর্থ করিয়াছেন "Stubbornness" কিন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।
(২) অস্‌সবা অলোলা। অস্‌সবা=আশ্রবা, "বচনে স্থিতা"।
ইহার আর এক অর্থ হয় "অশ্রবা" non-corrupt=সতী। অলোলা=অচঞ্চলা।

৬ ভগবাঃ

"চিত্তম্ মম অস্‌সবম্ বিমুত্তম্
দীঘরত্তম্ পরিভাবিতম্ সুদন্তম্,
পাপম্ পন মে ন বিজ্জতি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

৭ ধনিয়ো গোপোঃ

অত্ত-বেতন-ভতোহহমস্মি
পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা,
তেসম্ ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

৮ ভগবাঃ

"নাহম্ ভতকোহস্মি (৩) কস্‌সচি,
নিব্বিটঠেন চরামি সব্বলোকে,
অত্থো (৪) ভতিয়া (৫) ন বিজ্জতি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

৯ ধনিয়ো গোপোঃ

অত্থি বসা (৬) অত্থি ধেনুপা,
গোধরণিয়ো পবেনিয়ো পি অত্থি,
উসভো পি গবম্পতি চ অত্থি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

১০ ভগবাঃ

"ন' অত্থি বসা, ন' অত্থি ধেনুপা, (৭)
গোধরণিয়ো (৮) পবেনিয়োপি ন' অত্থি,
উসভো পি গবম্পতীধ ন' অত্থি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

১১ ধনিয়ো গোপোঃ

"খীলা নিখাতা অসম্পবেধী,
দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠানা,
ন হি সক্‌খিস্তি ধেনুপাপি ছেত্তুম্,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।"

৬ বুদ্ধদেব

"চিত্ত মম সংযত স্বাধীন; বহুকাল,
বহু তপস্যায় তায় আনিনু স্ববশে,
তাহে পাপ-লেশ না করে প্রবেশ,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

৭ ধনিয়া

"আপন অর্জিত ধনে চালাই সংসার,
পুত্রগণ নীরোগ সবল; নিন্দা কোন
তাহাদের নামে, শুনি নাই কাণে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

৮ বুদ্ধদেব

"কারো নহি বৃত্তিভোগী, আপনার প্রভু,
অবাধে আপন মনে ভ্রমি সর্ব্বলোকে;
দাসত্বে কি কাজ বল মোর আজ,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

৯ ধনিয়া

"আছে গাভী দুগ্ধবতী, আছে বৎস কত,
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও আছে হেথা,
বৃষভ গোপতি, আছেও তেমতি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

১০ বুদ্ধদেব

"নাহি গাভী দুগ্ধবতী, না আছে বাছুর,
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও নাহি মোর;
নাহিও তেমতি বৃষভ গোপতি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

১১ ধনিয়া

"সুদৃঢ়-নিখাত খীলা কিছুতে না টলে,
নব এই মুঞ্জদাম, এমনি কঠিন
বাছুরে ছিনিতে নারে কোনরীতে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

(৩) ভতক=ভৃতক, বেতনভুক্, বৃত্তিভোগী। (৪) অত্থো=প্রয়োজন।
(৫) ভতিয়া=ভৃত্যা, ভৃতি অর্থাৎ বেতন দ্বারা। (৬) বসা=বৃষা গাভী। (৭) ধেনুপা=বৎসগণ।
(৮) গোধরণীয়ো পবেনিয়ো। গরুর ধারণ বা আচ্ছাদনের জন্য প্রবেণি অর্থাৎ আস্তরণ বা কম্বল।
ফজবোল সাহেব অর্থ করিয়াছেন—**I have cows in calves and heifer** ইহার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

১২ ভগবাঃ

"উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি
নাগো পুতিলতম্ ব্ দালয়িত্বা,
নাহম্ পুন উপেস্সম্ গব্ভসেয্যম্,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।"

১৩ * * * * *

নিন্নঞ্চ থলঞ্চ পুরয়ন্তো
মহামেঘো পাবস্সি তাবদেব
সুত্বা দেবস্স বস্সতো
ইমম্ অথম্ ধনিয়ো অভাসথঃ—

১৪

"লাভাবত নো অনপ্পকা
যে ময়ম্ ভগবন্তম্ অদ্দসাম,
শরণম্ তম্ উপেম চথ্খুম্,
সথা না হো হি তুবম্ মহামুনি।

১৫

গোপী চ অহঞ্চ অস্সবা,
ব্রহ্মচ্চরিয়ম্ সুগতে চারমসে,
জাতি মরণস্স পারগা
দুঃখস্স অন্তকরা ভবামসে।"

১৬ মারো পাপিমাঃ—

নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি,
উপধী হি নরস্স নন্দনা,
ন হি সো নন্দতি যো নিরুপধী।"

১৭ ভগবাঃ

"সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি,
উপধী (৯) হি নরস্স সোচনা,
ন হি সো সোচতি যো নিরূপধীতি।"

ইতি।

১২ বুদ্ধদেব

"বৃষভ বন্ধন কাটি পলায় যেমতি,
যেমতি বিহরে নাগ বিদলি লতিকা,
প্রমুক্ত উদাস, কাটি গর্ভবাস,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

১৩ * * * * *

উচ্চ নীচ সর্ব্বস্থল করিয়া প্লাবন
বরষিল মহামেঘ উঠিয়া তখন;
দেখিয়া ধনিয়া, বিগলিত হিয়া,
বুদ্ধদেবে এই ভাবে করে নিবেদন;—

১৪ ধনিয়া

"সামান্য এ লাভ নহে, ওহে ভগবন্,
পাইনু যে ইথে মোরা তব দরশন;
রাখ হে সুগতে, শরণ-আগতে,
ও-পদে আশ্রয় আজি দেহ মহামুনি।"

১৫

"আমি ও গৃহিণী মম, ধরি ও চরণ
ব্রহ্মচর্য্য আচরিব করিলাম পণ;
জনম মরণ, কাটিয়ে বন্ধন,
তরি যাব, হবে সব দুঃখ বিমোচন।"

১৬ পাপবুদ্ধি মার

"পুত্রবান্ পুত্রলাভে হয় পুলকিত,
গোপাল গোধনলাভে তেমনি হর্ষিত;
আসক্তি হইতে হয় নরের নন্দন,
অনাসক্ত নিরানন্দে কাটায় জীবন।"

১৭ বুদ্ধদেব

"পুত্রবান্ পুত্রশোকে সদাই কাতর,
গোপাল গোধন তরে ব্যথিত অন্তর;
আসক্তিই মানবের দুঃখের কারণ,
অনাসক্ত জনে দুঃখ না হয় কখন।"

ইতি।

(৯) উপধি নিরূপধী।
উপধি—বৌদ্ধদর্শনের ইহা একটি প্রয়োজনীয় শব্দ—ইহার অর্থ সংসার সম্পদ, ভেদক দ্রব্য, মায়া, আসক্তি।
উপধি=আসক্তি। নিরূপধি=অনাসক্ত।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

হত্যাকার্য্যই অমঙ্গলজনক, বোমা নিক্ষেপে হত্যার প্রয়াস ঘোরতর অমঙ্গলের সংঘটয়িতা। একদিকে দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিভেদে নরহত্যা ইহাতে অনিবার্য্য অন্যদিকে এইরূপ গুপ্ত হত্যায় জনসাধারণের মনে যেরূপ বিভীষিকাময় অশান্তি বিস্তার করে, তাহা অতিশয় শোচনীয়। দেশের হিতসংকল্পী বালকদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া আমরা যারপর নাই সন্তপ্ত হইয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি কেবল ইহাই নহে, ডাকাতী, লুটপাট করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা ইহাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেশের আশা ভরসা কোথায়! "অন্যায় অত্যাচারকে কার্য্যোদ্ধারের নীতি করিলে দেশের মঙ্গল না হইয়া কেবল উচ্ছৃঙ্খলতাই বর্দ্ধিত করিবে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামকরূপে কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ততায় পরিণত হইয়া মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারি হৃদয় বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।" ইহা রবীন্দ্রনাথের উক্তি।

কিন্তু নরেন্দ্র যে সকল বিজ্ঞ লোককে এই কার্য্যের উত্তেজক বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, তাঁহারা এতদুর দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ হইবেন যে নিরীহ অসহায় দেশের লোকের প্রতিও অত্যাচার অনুমোদন করিবেন, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অরবিন্দকে যাঁহারা জানেন—তাঁহারাও মনে করেন হত্যা কিম্বা চৌর কার্য্যে অনুমোদন করা ইঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু লোকে কি সম্ভব বা অসম্ভব মনে করে তাহার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। তাহা বিচারে প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে অপরাধী নরেন্দ্র মুক্তির অভিপ্রায়ে এখন যাহা বলিবে প্রচুর প্রমাণ ব্যতিরেকে সে সকল কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা সাধারণ সহজ বুদ্ধির কথা এবং ইংরাজ আইনেও এইরূপ বলে। নরেন্দ্রের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফে যেরূপ খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছে, অরবিন্দের পক্ষেও সেইরূপ কোন খ্যাতনামা উপযুক্ত ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইলেই তখন তাঁহার কূট প্রশ্ন ও বক্তব্য শুনিয়া বিচারক সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারিবেন।

অরবিন্দের ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনী সুযোগ্য ব্যারিষ্টার নিয়োগে ভ্রাতার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ জন্য সাধারণের নিকট অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু শুনিতেছি অনেকেই এজন্য দান করিতে ভীত। আমরা এ ভয়ের কারণ বুঝিতে পারি না। অরবিন্দ যতক্ষণ বিচারে রাজবিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন না হন ততক্ষণ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইংরাজি আইনই এইরূপ। এমন কি ক্ষুদিরাম খুণ করিয়াছে এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করিলেও জজ কর্ণডাফ উকীলদিগকে তাহার পক্ষ সমর্থনে অনুরোধ করেন। জষ্টিস নর্ম্মাণকে যে খুন করিয়াছিল সে রক্তাক্ত হস্তে ধরা পড়িলেও তাহার পক্ষে এখানে কৌন্সিলি দাঁড়াইয়াছিলেন। যে সকল অপরাধে নির্ব্বাসন বা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা সেই সকল স্থলে এইরূপই নিয়ম। ইংরাজের আইন যে এ সম্বন্ধে কতদূর ন্যায়করুণাসঙ্গত তাহা ইহা দ্বারা দেখা যায়। নির্দ্দোষিতা প্রমাণের অবসর না দিয়া কাহাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না। তবে অরবিন্দের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য দেশের লোক সাহায্য করিলে গভর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ

হইবেন ইহা মনে করাও গভর্ণমেণ্টের ন্যায়পরতার উপর সন্দেহ প্রকাশ। এ সময়ে কি দেশী কি বিদেশী ন্যায়ানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীমতী সরোজিনীকে মুক্ত হস্তে ভিক্ষা দেওয়া উচিত।

এমপায়ার সংবাদপত্র তীব্র কটাক্ষে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছে যে, নাম লুকাইয়া দান করিবার কারণই এই যে, তাহারা অরবিন্দকে দোষী ভাবিতেছে। হায়! সত্যের প্রতি ইহারা কি এতই অন্ধ!! গভর্ণমেণ্ট যাহাকে সন্দেহ করেন তাহাকে নির্দ্দোষ বিশ্বাসে অর্থ সাহায্য করিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় পাছে গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইতে হয় এই আশঙ্কাই যে এই কার্য্যের কারণ তাহাত একজন বালকেও বুঝিতে পারে। তবে এরূপ ভীরুতা দেশের লোকের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার বিষয় এবং গভর্ণমেণ্টের প্রতিও মর্য্যাদাজনক নহে। নরেন্দ্র যখন অন্য সুশীল সজ্জনকেও তাহাদের দলে টানিতেছে, তখন এ পক্ষীয় ব্যারিষ্টারের কূট প্রশ্নে ইহার সত্য মিথ্যা মীমাংসিত না হইলে গভর্ণমেণ্টকে লোকে পক্ষপাতী বিবেচনা করিতে পারে। তাহা প্রার্থনীয় নহে। গভর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আমরা এরূপ বলিতেছি।

যে দিন হইতে বোমা বিভ্রাট ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতে দেশের সকলেই দুঃখ-সাগরে মগ্ন। বালকদিগের এ কিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি! তাহারা দেশের মঙ্গলে ব্রতী হইয়া অমঙ্গলকেই বরণ করিয়া বসিল! অত্যাচার নিবারণ মানসে অত্যাচারেই ব্রতী হইল। ভারতের যথার্থই দুর্ভাগ্য! বোমা নিক্ষেপের প্রথম ভয়ঙ্কর ফল নিরীহ অসহায় মহিলা দুইটির জীবননাশ। ইহাঁরা আবার কাহার স্ত্রী কাহার কন্যা? কনগ্রেসের পক্ষপাতী, ভারতের বিশেষ বন্ধু, সহৃদয় কেনেডি মহোদয়ের। এই হত্যায় কাহার না অন্তর্দাহ হইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে দুর্ম্মতি বালকগণের বুদ্ধির প্রতি ধিক্কার না জন্মিয়াছে! যদি তাহারা ন্যায় পথে থাকিয়া দেশের কার্য্যে প্রাণপাত করিতে পারিত তাহা হইলে তাহাদিগের জীবনপাত সার্থক হইত—এবং দেশে সাধুদৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারিত! হায়! এখন তাহাদের এই কার্য্যফলে অনর্থক দোষীর সহিত কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও অসহ্য পীড়ন সহ্য করিতে হইতে পারে, এবং এই পীড়নের শেষ কোথা, ভাবিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে! ইহা হইতে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার ইহা শিক্ষা লাভ করা উচিত, যে এরূপ কোন অন্যায় গর্হিত উপায়ে আমাদের পরিত্রাণ হইবে না। আমাদের পরিত্রাণ একতায়। অবৈধ গুপ্ত উপায় অবলম্বনে রাজবিদ্রোহী বালকেরা সেই একতার মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছে।

আমাদের মধ্যে চিরদিনই এই একতার অভাব। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করাই আমাদের ধর্ম্ম। চণ্ডাল যবন ম্লেচ্ছ—এ সকল নাম ঘৃণাসূচক সম্ভাষণ। নীচ বর্ণের হিন্দু গৃহে আসিলেও গৃহের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমরা দূষিত বিবেচনা করি। ইংরাজের শিক্ষাতেই এত দিনে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি একতা ভাল। হিন্দু মুসলমান সকলেই ইহার একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে "ভারতীয় সমগ্র মুসলমান সমিতি" নামক সমিতির একটি শাখা স্থাপিত হইল। ইহার একটি উদ্দেশ্য ভারতের সর্ব্বজাতির মধ্যে সদ্ভাব এবং

ঐক্যস্থাপন।—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রদ্ধাস্পদ আমির আলি সভাপতির আসনে বসিয়া এইরূপ বলিয়াছেন; "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয় এই কয় বৎসর ধরিয়া অনবরত আমি সেই চেষ্টা করিতেছি। কারণ ভারতে সর্ব্বসাধারণ জাতির স্বার্থমঙ্গল একই সূত্রে গ্রথিত।" কিন্তু ইচ্ছা এইরূপ হইলেও কার্য্যতঃ আমরা ত প্রতিদিন তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছি। বঙ্গচ্ছেদের পর হইতে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাবের আশা প্রতিদিন ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশহিতৈষীগণও ভেদ বুদ্ধিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। সাম্যপন্থী চরমপন্থীর অনৈক্য বশতঃই কনগ্রেসের পতন এবং সর্ব্বসাধারণকে তুচ্ছ করিয়া এই বালক বিদ্রোহীগণ দেশপাতে প্রবৃত্ত!

ইংরাজ শাসনই আমাদের প্রকৃত হীনতার কারণ নহে। যদি কখনও সত্য সত্য জাতিবর্ণ-নির্ব্বিচারে আমরা সমগ্র ভারতবাসী দৃঢ়গ্রথিত প্রাচীরের ন্যায় এক হইতে পারি, তখনই সহস্র ঝটিকাঘাতে অটল থাকিয়া, আমরা একটা মহৎজাতি হইতে পারিব। বাস্তবিকই ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের শত্রু নহেন, আমাদের অনিষ্ট করাই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, আমাদের মঙ্গলের প্রতিও গভর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন। ইংরাজ অধীনে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, নানাবিষয়ে দেশের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তবে এ গভর্ণমেণ্ট আমাদের আদর্শ রামরাজ্য নহে ইহা সত্য। যেখানে শাসয়িতা এবং শাসিতের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ ঘটে সেইখানেই আমরা পেশিত হই। কিন্তু এরূপ অত্যাচার স্বজাতিশাসিত রাজ্যেও হইয়া থাকে। আয়ারল্যাণ্ড, পারস্যদেশ, রুষিয়া তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আসলকথা ক্ষমতাশালী ও অক্ষমের মধ্যে, প্রভু ও দাসের মধ্যে, শাসয়িতা ও শাসিতের মধ্যে এরূপ দ্বন্দ্ব চিরকালই থাকিবে। বৈধ উপায়ে, বিচার বুদ্ধিতে, একতায়, দৃঢ়সঙ্কল্পে কাজ করিলে কতক পরিমাণ অত্যাচার অবিচার আমরা নিবারণ করিতে পারি। যোগ্যতার জয় সর্ব্বত্র। যেমন, শুনিয়াছি কোন কোন ইংরাজি ব্যাঙ্ক স্বদেশী ব্যবসায়ে ক্ষতি সম্ভাবনা না থাকিলেও টাকা ধার দিতে চাহে না। দেশী ব্যাঙ্ক খুলিয়া সহজেই আমরা এরূপ নির্ভরতা ছিন্ন করিতে পারি। দেশের সাধারণ লোকের এদিকে অনেক পরিমাণে লক্ষ্য পড়িয়াছে। কিন্তু অল্প জমিদারদিগকেই এদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। যখন ধনী মধ্যবিত্ত সকলে মিলিয়া দেশের এইরূপ উন্নতির লক্ষ্যে আপনাপন স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবেন তখনি আমরা অধীন হইয়াও যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করিব। যদি আমরা মনে করি এরূপ একযোট হইয়া কাজ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহা হইলে জাতিগত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র!

ইংরাজের অন্যায় কার্য্যেও দেশের লোক একযোট হইয়া প্রতিবাদ করিলে স্থলবিশেষে কিরূপ সুফল হয় ব্রানসনের প্রতি দেশীয় এটর্নি ও প্লীডারগণের বয়কট তাহার একটী দৃষ্টান্ত। অনেক স্থলে সমবেত প্রতিবাদে আপাততঃ কোন ফল দৃষ্ট না হইলেও তাহার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অন্যায় দেখিলে যেমন তাহার প্রতিবাদস্বরূপ আমাদের অসন্তোষ প্রকাশ আবশ্যক

তেমনি বিনা কারণে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও সুনীতি সঙ্গত নহে। রাজা প্রজার মধ্যে সদ্ভাব সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় এবং উভয় পক্ষ হইতেই ইহার চেষ্টা আবশ্যক।

নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল সংসারে নাই। আমরা যাহাকে খুব অমঙ্গল জ্ঞান করি তাহার মধ্য হইতেও ক্রমশ একটু মঙ্গল ফুটিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর বোমা বিপ্লবের ফলে রাজা প্রজা উভয়েরই জ্ঞানচক্ষু খুলিবে এইরূপ আশা করা যায়। দুর্ব্বুদ্ধি প্রজাগণও এরূপ কার্য্যের ভীষণতা উপলব্ধি করিবে এবং রাজাও বুঝিতে পারিবেন একমাত্র দলননীতিই রাজ্যশাসনের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে।

বর্ত্তমান অরাজকতার জন্য গভর্ণমেণ্টও যে দায়ী রাজনীতিবিশারদ চিন্তাশীল অনেক ইংরাজই এখন এই কথা বলিতেছেন। কোন বিপ্লব হইলেই বুঝিতে হয় রাজব্যবহারজনিত অসন্তোষই তাহার মূল কারণ। ইহা বুঝিয়া তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করাই রাজ কর্ত্তব্য। লর্ড কর্জ্জন প্রমুখ গভর্ণমেণ্ট প্রজার সমবেত ইচ্ছায় তাহার ন্যায়-আবেদনে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য প্রকাশ করিয়াই দেশে যে অসন্তোষ অশান্তির কারণ ঘটাইয়াছেন এ ঘটনা তাহারই ফল।

ভারতবর্ষ লক্ষকোটি লোকের নিবাসভূমি। এই কোটি কোটি লোকের মধ্যে মুষ্টিপরিমেয় নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ যদি এইরূপ আকারে তাহার অসন্তোষ প্রকাশ করে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বিশেষতঃ যাহারা এ কার্য্য করিয়াছে তাহারা সকলেই প্রায় অপরিণত-বুদ্ধি, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালক। এখন যদি এইরূপ দুই চারিটা বাতুল ভ্রান্ত বালকের আচরণে এবং মুক্তিলোলুপ নরেন্দ্রের কথায় গভর্ণমেণ্টও যথেচ্ছাচারী বালকের ন্যায় সামান্য ছুতানাতায় প্রজাদলন আরম্ভ করেন তবে গভর্ণমেণ্টও অকারণে প্রজাপীড়নের কারণস্বরূপ হইবেন। দেশের লোক সত্যই ইংরাজ রাজ্যের ধ্বংস চাহে না।—নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই আমরা তাহা চাহিনা,—আমরা জানি আমরা এখনো সেজন্য প্রস্তুত নহি,—তাহাতে আমাদেরই অমঙ্গল। তবে আমরা কি চাই? আমরা একটু সুবিচার চাই, আমরা রাজনৈতিক উচ্চাধিকার চাই—আর মানুষে মানুষের নিকট যে আচরণ প্রত্যাশা করে আমরা ইংরাজের নিকট সেই আচরণটুকু চাই—প্রভু ও দাসসম্পর্কের পরিবর্ত্তে রাজাপ্রজায় বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু চাই। দেশের লোক অতি অল্পেই সন্তুষ্ট। যাঁহারা বলেন—'তাহা নহে'—তাঁহারা ভুল বলেন। ফ্লেচার—ব্রজেন্দ্রকিশোরের মোকদ্দমায় ক্লার্ককে সামান্য পাঁচশত টাকা দণ্ড করিয়াছেন, ইহাতেই লোকে সন্তুষ্ট। ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে কিন্তু কর্ণডাফ যেরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন—তাহাতে সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কর্ণডাফের ন্যায় যদি সকলেই সহৃদয় পক্ষপাতশূন্য সুবিচারক হইতেন তাহা হইলে আমাদের আপেক্ষ বা অসন্তোষের কোনই কারণ থাকিত না। অপরাধী বা নিরপরাধ নির্ব্বিভেদে দেশের সকল লোকই এখন বিপন্ন। সমস্ত দেশে আশঙ্কা অশান্তি হাহাকার উত্থিত। সুবিচারের আশা সকলেরই মন হইতে অন্তর্হিত। এ সময় যদি গভর্ণমেণ্ট দলননীতির পরিবর্ত্তে লর্ড ক্যানিংএর অনুকম্পাপূর্ণ সুবিচার নীতির অবলম্বন করেন, তবেই প্রজার মন স্থায়ীবিশ্বাস, ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে; হাহাকার রবের পরিবর্ত্তে বৃটিশরাজের জয় জয়কারে রাজ্য ধ্বনিত হইতে থাকিবে।—

কলিকাতা—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

চন্দ্রমণ্ডল জীব নিবাসের উপযোগী কি না?

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রলোকেও মনুষ্যাদি প্রাণী এবং উদ্ভিদাদি আছে কি না এ বিষয়ে বহুকালাবধি আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। মৃত্যুর পরে সাধু ব্যক্তিদিগের কেহ কেহ চন্দ্রলোকে যাইয়া থাকেন, এরূপ বিশ্বাস পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরও ছিল। পাশ্চাত্য দেশেও অনেকে মনে করিতেন যে চন্দ্র মণ্ডলে মানুষ আছে। অনেক গ্রন্থকার চন্দ্রে ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক বহু উপাখ্যানও রচনা করিয়াছেন। কেহ বা কল্পনাশক্তিকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়া চন্দ্রমণ্ডলবাসী মনুষ্যগণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বীয় সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহারা সন্তোষ জনক কোনও যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। যে দিন সুবিখ্যাত পণ্ডিত গ্যালেলিও দূরবীক্ষণের আবিষ্কার করিয়া লোকের দূরদৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন—সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। যখন লোকে তাঁহার সেই অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাহার মধ্যে শৈলমালা, বিশাল সমতল ভূমি, ও * সমুদ্রাদি দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের কল্পনা ও অনুমান এক অপূর্ব্ব প্রভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল,—চন্দ্রমণ্ডলে জীবনিবাস সম্বন্ধে আর তাহাদের কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল—দূরবীক্ষণের শক্তি বাড়িতে লাগিল, এবং সুসময়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিউটন আবির্ভূত হইয়া অপূর্ব্ব জ্ঞানালোক বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন লোকের নয়ন সমীপে বহুকালের অমীমাংসিত অনেক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল,—নিউটনের আলোকতত্ত্ব ও মহাকর্ষণের নিয়ম জগতের মোহান্ধকার দূরীভূত করিয়া দিল, তখন লোকে দেখিতে পাইল পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের অনেক অনুমানই অমূলক। চন্দ্রমণ্ডলে প্রাণিনিবাস সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্তও অসত্য বলিয়া ইঁহাদের ধারণা জন্মিল। ইঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন, চন্দ্রলোকে তরু নাই, লতা নাই, তথায় মাঠে ঘাস নাই, ক্ষেত্রে শস্য নাই, পর্ব্বতাদিতে পশু নাই, পৃষ্ঠে মনুষ্য বা সমুদ্রে জল নাই, আকাশে বায়ু নাই, আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুদ্গম নাই, জোতিষ্ক জীবনের অভিব্যক্তি-ফলে চন্দ্র এখন একটি নির্জ্জীব জগতে পরিণত হইয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল এক্ষণে একটি ভয়াবহ স্থল। সূর্য্যোদয়ে উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, আর অস্তগমনের পরেই উহার স্পর্শ তুষারশীতল হইতে থাকে। বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তই এইরূপ। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে এই সকল মন্তব্যের অনুকূল যুক্তিগুলি কি, এবং তাহাদের প্রামাণিকতাই বা কতদূর।

জল এবং বায়ু না থাকিলে তরুলতা কিম্বা মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের জীবন ধারণ সম্ভবে না, ইহা একটি সহজ সত্য। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন চন্দ্রে জল এবং বায়ুর অভাব, সুতরাং তথায় জীবজন্তুর বাসও অসম্ভব। তাঁহারা বহুবার দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ

* তথা কথিত সমুদ্রগুলি অধুনা জলশূন্য; ইহাই বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতদিগের অনুমান।

করিয়াছেন, কিন্তু ইহার চতুষ্পার্শ্বে কখনও মেঘসঞ্চারের লক্ষণ দেখিতে পান নাই। তথায় জল এবং বায়ু থাকিলে মেঘোৎপত্তিরও সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলের সমীপে সঞ্চরমান মেঘমালাদ্বারা তাহাদের দৃষ্টি কখনও প্রতিহত হয় নাই, চন্দ্রের যে পৃষ্ঠটি আমাদের দৃষ্টি পথে পড়ে, তাহার সমুদায় অংশই সুস্পষ্ট ভাবে দেখা গিয়াছে। পৃথিবীর সমীপবর্ত্তী অন্যান্যগ্রহও পরীক্ষা করা হইয়াছে কিন্তু তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে মেঘসঞ্চারের লক্ষণ বুঝিতে পারা গিয়াছে; মেঘাবরণ হেতু ইহাদের অনেকস্থল অনেক সময় অদৃশ্য থাকে। মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। বৃহস্পতি প্রভৃতি দূরবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহেও মেঘ সঞ্চার দেখা গিয়াছে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী চন্দ্রে ইহার চিহ্নমাত্র দেখা যায়না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে চন্দ্রমণ্ডলে জল বায়ু নাই; সুতরাং উহা উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের জীবন ধারণের উপযোগী নহে। কিন্তু আমরা কেবল মাত্র একটি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চন্দ্রে জল ও বায়ুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহাদের অন্যান্য যুক্তিগুলি কি?

তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এইরূপ;—প্রায় সকল গ্রহের চতুর্দ্দিকেই বায়ুমণ্ডল আছে, তাহাতেই গোধূলির উৎপত্তি হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলে কখনও গোধূলি দৃষ্ট হয় না, সুতরাং চন্দ্রে বায়ু নাই। সকলেই জানেন দিবা ও রাত্রির সঙ্গম সময়ে যে অস্পষ্ট আলোক দেখা যায়, উহাই গোধূলির আলোক। উষা এবং প্রদোষই এই গোধূলির সময়। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এই গোধূলির সহিত বায়ু মণ্ডলের কি নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা জানি, সূর্য্যের বিদ্যমানতা ও অভাবেই আমাদের দিবা ও রাত্রির উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেখানে সূর্য্যোদয়ের অভাব সেই খানেই অন্ধকার। কিন্তু প্রত্যুষকালে এবং প্রদোষ সময়ে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাইনা, তবে এই দুই সময়েও আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আলোক পাইয়া থাকি কেন? তাহার উত্তর এই যে, যদিও এসময়ে সূর্য্যরশ্মি আমাদের নিকট পতিত হয় না, কিরণের সরল রেখাগুলি পৃথিবীর চক্রাকার বক্র পৃষ্ঠে বাধা পায়, তবু তখনও উহারা ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুস্তরে পতিত হইয়া তাহাকে আলোকিত করে; সেই আলোকেরই কিয়দংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে আসে, তাহাতেই আমরা কিঞ্চিৎ আলোক পাই। বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ সর্ব্বদাই সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে, সুতরাং তখন অপরার্দ্ধ সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকারাবৃত থাকিবার কথা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঘটে না, আলোকিতার্দ্ধের সীমান্তরেখা অতিক্রম করিয়াও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত স্থান মৃদু বা অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত থাকে; সুতরাং কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, পৃথিবীমণ্ডলে অন্ধকার ও আলোকের সঙ্গম-রেখা বা দিবারাত্রির সন্ধিস্থল তত সুস্পষ্ট নহে। কোথায় যে আঁধারের শেষ ও আলোকের আরম্ভ, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বায়ুর বিদ্যমানতাই যে ইহার মূলীভূত কারণ, এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলেরও অর্দ্ধাংশ পরিমাণ সর্ব্বদা সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে। সুতরাং অপরার্দ্ধ এখন অন্ধকারাবৃত। কিন্তু দেখা যায় যে চন্দ্রে

আলোকিতার্দ্ধের সীমান্ত রেখার অব্যবহিত পরেই অন্ধকার, তথায় গোধূলির ক্ষীণালোক আদৌ দৃষ্ট হয় না—অন্ধকার ও আলোকের সঙ্গমরেখা এখানে সুপরিস্ফুট। এই রেখার এক পার্শ্ব উজ্জ্বল, অন্যপার্শ্ব সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। অষ্টমী তিথির চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখ, অর্দ্ধভাগে আলো, অপরার্দ্ধে অন্ধকার। আরও দেখিবে এই অন্ধকারের তীক্ষ্ণতা সর্ব্বত্র সমান; গোধূলির ক্ষীণালোক কুত্রাপি নাই। গোধূলির কারণ বা উৎপাদক বায়ুমণ্ডল। যে স্থলে কার্য্যের অভাব, তথায় কারণেরও অভাব বুঝিতে হইবে। চন্দ্রে গোধূলি নাই, সুতরাং তথায় বায়ুমণ্ডলও নাই, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

তাঁহাদের তৃতীয় প্রমাণ এই ঃ—চন্দ্র নিজ কক্ষায় ভ্রমণ করিতে করিতে যখন পৃথিবী ও কোন একটি নক্ষত্রের সমসূত্রে আসে তখন চন্দ্রাবরণে আমরা ঐ নক্ষত্রটির তিরোভাব (ocultation) দেখিতে পাই আবার যখন চন্দ্রের আড়াল হইতে বাহির হইয়া নক্ষত্রটি পুনঃ প্রকাশমান হয়, তাহাও দেখিতে পাই। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই তিরোভাব ও পুনরাবির্ভাবের ঠিক মুহূর্ত্ত ও তিরোধান সময়ের স্থিতিকাল, এ সমুদায়ই নির্ণয় করিতে পারেন। চন্দ্রমণ্ডলে বায়ু থাকিলে এই স্থিতিকালের নির্ণীত পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইত। একটি পাত্রে একটি মুদ্রা রাখিয়া পাত্রটিকে কিঞ্চিৎদূরে স্থাপন করিলে আমরা সহজ দৃষ্টিতে উহাকে দেখিতে পাইনা, কিন্তু পাত্রটিতে জল ঢালিয়া দিলে মুদ্রাটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে, যাহা দৃষ্টির অন্তরালে ছিল তাহাই এখন আলোকের বক্র গতিবশতঃ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়। পাত্রস্থ জল ও বাহিরের বায়ুর ঘনত্বের ন্যূনাধিক্য বশতঃ যেমন আলোকের এইরূপ বক্রগতি হয়, ঊর্দ্ধতন ও নিম্নস্থ বায়ুর ঘনত্বের বিভিন্নতা বশতঃ বায়ুমণ্ডলেও তদ্রূপ আলোকের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলে বায়ু থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রটির চন্দ্রাবরণে প্রবেশের কিছুক্ষণ পরেও উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। আবার চন্দ্রাবরণ হইতে পুনরায় বাহির হইবার পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎকাল আমরা নক্ষত্রটিকে দেখিতে পাইতাম, সুতরাং তিরোভাবের পূর্ব্বনির্ণীত স্থিতিকালও এইভাবে কমিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষেত্রে সময়ের কোনরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, সুতরাং চন্দ্রমণ্ডলে বায়ুর অভাবই ইহাতে সপ্রমাণ হয়।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, আলোক যতই গভীর বায়ুরাশি ভেদ করিয়া আসে, ততই তাহার তীক্ষ্ণতা কম হয়। মধ্যাহ্নাপেক্ষা প্রভাতে ও সায়াহ্ন সময়ে সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে। এই দুই সময়ে সূর্য্যালোক তির্য্যক্ ভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় বলিয়া, উহাকে গভীরতর বায়ুসাগর ভেদ করিয়া আসিতে হয়। গভীর বায়ুরাশির স্বচ্ছতা কম, সুতরাং আলোকের তীক্ষ্ণতাও সেই জন্য হ্রাস হয়। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যকে রক্তবর্ণ দেখিবার উহাই কারণ। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে উহার স্বচ্ছতাও কমিতে থাকে। চন্দ্রে যদি বায়ু থাকিত, তাহা হইলে যখনই কোন নক্ষত্রকে এই বায়ুর মধ্যদিয়া দেখা যাইত, তখনই উহার আলোকের তীক্ষ্ণতা কম বোধ হইত। এবং নক্ষত্রটিকে ক্রমে

যতই চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী দেখা যাইত, ততই চান্দ্রবায়ুর গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে উহার আলোকেরও হ্রাস দেখা যাইত, নক্ষত্রটি ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া পরিশেষে কিয়ৎকালের জন্য চন্দ্রাবরণে তিরোহিত হইত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এরূপ অবস্থাপন্ন নক্ষত্র স্বীয় উজ্জ্বলতা অব্যাহত রাখিয়া হঠাৎ চন্দ্রান্তরালে ডুবিয়া যায়, আবার তথা হইতে বাহির হইবামাত্রই আমাদের নিকট ঠিক পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হয়। এই পরীক্ষাটি সকলেই করিয়া দেখিতে পারেন। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে চন্দ্রে বায়ুর অভাব; বায়ু থাকিলেও তাহা এত সামান্য যে উহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

বায়ু না থাকিলে ভূপৃষ্ঠে জলও থাকিতে পারে না। বায়ুরাশিই জলকে স্থির রাখে। বায়ুমণ্ডলেই জলীয় বাষ্পরাশি আশ্রয় পায় এবং পুনরায় নৈসর্গিক নিয়মবশে বৃষ্টি, শিশিরাদি-রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়; বায়ুরাশি না থাকিলে প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে জলরাশি বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া যাইত; সুতরাং জল ও বায়ুর একের অভাবে অন্যেরও অভাব বুঝিতে হইবে।

উল্লিখিত প্রমাণগুলিতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, চন্দ্রমণ্ডলে জল ও বায়ুর অভাব। পণ্ডিতগণ বলেন, যদিও তথায় কিয়ৎ পরিমাণে জল থাকে, তাহা উক্ত মণ্ডলস্থ তথাকথিত সাগরগুলির গর্ভে, অতি নিম্নপ্রদেশে খুব অল্প পরিমাণেই আছে এবং তদুপরিস্থ বায়ুর পরিমাণও তদনুরূপ কম—সুতরাং তথায় প্রাণিগণের জীবন রক্ষা হওয়া কিছুতেই সম্ভবে না। এই সব কারণেই তাঁহারা চন্দ্রকে একটী নির্জীব জগৎ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহে বায়ু ও জলের অস্তিত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা মনে করেন উক্ত দুই মণ্ডলেই প্রাণী আছে। অধুনা অনেক পণ্ডিত দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন যে, মঙ্গলগ্রহে জীবের বাস আছে। জীবন ধারণের উপযোগী জল বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর যে উহা প্রাণিশূন্য রাখিয়াছেন এরূপ অনুমানও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকটি যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা বলেন যে মঙ্গলগ্রহে, মনুষ্যাপেক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত কোন জীব আছে। কিন্তু চন্দ্রকে ইঁহারা তরুলতা প্রাণিশূন্য বলিয়াই মনে করেন। চন্দ্রেও পূর্ব্বে যথেষ্ট জল ও বায়ু ছিল, কিন্তু কালবশে, প্রাকৃতিক নিয়মে, উহাদের অভাব ঘটাতে উহা এক্ষণে প্রাণিবাসের অযোগ্য হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে বহুযুগ পরে পৃথিবীকেও চন্দ্রের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। গ্রহ ও উপগ্রহাদির জীবনে এরূপ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে চন্দ্রের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং তথায় পৃথিবীর ন্যায় তরুলতা বা জীব জন্মিতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রে যদি যৎসামান্য জল এবং বায়ুই থাকে, তাহা হইলে তাহাতে যে কোন প্রকারের জীবই থাকিতে পারে না, ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। ক্ষুদ্রশক্তি মানব আমরা ঈশ্বরের মহীয়সীশক্তির সম্যক্ ধারণা করিব, এরূপ সম্ভাবনা কোথায়? তাঁহার সৃষ্টিরহস্যের

কতটুকু আমরা বুঝিতে পারি। অল্প পরিমাণ জল বায়ুতেই জীবন ধারণ করিতে পারে, এমন প্রাণীও তথায় বাস করিতে পারে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের পৃথিবী ত অতি নগণ্য! বিশাল বারিধি তীরস্থ একটি বালুকাকণা যেমন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় উহা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর. কত কোটি কোটি পৃথিবী এই অনন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কে তাহার সংখ্যা করিবে? এবং তাহাদের উপাদানাদিও কত বিভিন্নরূপ হইতে পারে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? ভিন্ন উপাদানবিশিষ্ট, ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবীতে, কত বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন প্রকৃতির তরুলতা জীব জন্মিতে পারে, কে জানে! কত উন্নততর জগতে কত উন্নততর জীব বাস করিতেছে, ইহা নির্ণয় করা কাহার সাধ্য! জল এবং বায়ু এই দুই উপাদান ভিন্ন কোন প্রকার জীবেরই প্রাণধারণ সম্ভবে না, ইহা বিশ্বাস করিলে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টার অনন্তশক্তিতে সন্দেহ করা হয়। মহাকবি টেনিসন বলিয়াছেন;—

"This truth within thy mind rehearse
That in a boundless universe
Is boundless better and boundless worse.
Think you this mould of hopes and fears
Could find no statelier than his peers
In yonder hundred million spheres?"

চন্দ্রমণ্ডলে জীব আছে কি না, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ অদ্যাপি কেহ দিতে পারেন নাই। আজও দুরবীক্ষণের এরূপ উন্নতি হয় নাই যে তথায় কোনরূপ জীব বাস করিলেও তৎসাহায্যে তাহাদিগকে দেখা যাইবে বা উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ থাকিলেও তাহা দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। কিন্তু উত্তরোত্তর বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইতেছে দিন দিন আমরা যেরূপ অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে দুরবীক্ষণের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি করা যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে যে চন্দ্রসম্বন্ধীয় এই রহস্যের মীমাংসা হইবে না, এ কথা বলা যায় না।

হাম্বির।

(মুকুট-উদ্ধার)

একদিকে শেরোনাল বলে একখানি ছোট গ্রাম, আর একদিকে আরাবল্লী পর্ব্বত মাঝখানে পাথরে গাঁথা কৈলোরের কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ি ভীলদের শাসনে রাখবার জন্যে এই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারাণারা বছরের মধ্যে প্রায় চারমাস এইখানে কাটাতেন, সে সময়ে কেল্লার শ্রীই ছিল এক। তারপর পাহাড়িগণও ক্রমে যখন শত্রুতা ছেড়ে বশ্যতা মান্‌লে তখন আর বড় একটা এখানে আসবার প্রয়োজন হত না,

ক্বচিৎ দুএক রাজকুমার শীকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন মাত্র। কেল্লাও ক্রমে ভেঙ্গেচুরে বনে জঙ্গলে আর কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের মাঝে চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে পাঠানযুদ্ধের সময় একদিন এই কেল্লায় এসে আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কি দুঃখে কেটেছিল কে বলবে! মাথার উপরে ফাটা ছাত বহে বৃষ্টির ধারা পড়ছে, ঘরের কোণে কোণে ইন্দুরের খুট্‌খাট্, বাদুড়ের ঝটাপট্,—রাজার ছেলে, রাজার বৌ তারি মাঝে ভিজা মেঝায় খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কম্বল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নাই, রাজা রাণী ঘোড়ার কম্বলে বসে আছেন! মেবারের রাণা অজয়সিংহ, আজ তিনি কোথায় সোণার সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রাণীমা দুই রাজকুমার অজিমসিংহ ও সুজনসিংহকে নিয়ে কোথায় গজদন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের এই দুর্দ্দশা! গ্রামবাসিরা তখনি যত্ন করে কেল্লা পরিষ্কার করতে লাগল, ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের বড় বড় জোতদার গজদন্তের খাট পালঙ্ক, কিংখাবের শোজনী, জরীর চাঁদোয়া, শ্বেতচামর, চন্দনের পাখা, রূপার প্রদীপ, সোণার বাটা হাজির করলে। ক্ষেত ক্ষেতের চাষির মেয়েরা তরিতরকারি, ঘিয়ের মটকি, ঘোড়ার ঘাস, দুধ দেবার গাই নিয়ে হাজির হল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাজে সরঞ্জামে লোক লস্করে কেল্লার শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী তাদের রাজার মুখে, রাণীর মুখে, কচি কচি দুই রাজকুমারের মুখে হাসি দেখে ঘরে এল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় দিনে দিনে অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনও পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না। তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন,—হায়! "সূর্য্য এখন রাহুগ্রস্ত, কবে এ গ্রহণ শেষ হবে কে জানে, আর কত দিন—আর কত দিন?"

দিন যেতে লাগলো কিন্তু যে সুদিনের প্রতীক্ষায় অজয় সিংহ রইলেন সে সুদিন বুঝি আর এল না। পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার কত্তে তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোকবল অর্থবল কোথায়! বড় আশা ছিল দুই পুত্র অজিম আর সুজন বড় হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা কর্‌বে কিন্তু হায় বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলেন।

সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লী পর্ব্বতের শিখতে শিখরে কাজলের মত ছায়া ফেলেছে, গ্রামের উপর ক্ষেতের উপর দিয়ে আলো আঁধারের খেলা চলেছে; দুই রাজকুমার শিকারে গিয়েছেন, রাজা রাণীতে মহলের ভিতরে একলা আছেন। সন্ধ্যা হল কুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রাণী মা এক একবার খোলা জানলায় চেয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটুখানি সোণার ঢেউ উঠল, সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রাণীমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারে বারে

জানলার পানে চেয়ে দেখছেন; রাজা বল্লেন "তোমায় আজ অন্যমনা দেখছি যে?" "কে জানে প্রাণটা কেমন কর্‌ছে" বলে রাণীমা উঠে গেলেন। দাসী এসে ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল, টুপ্‌টাপ্ করে ক্রমে বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি নাবল। রাণীমা মলিন মুখে ফিরে এসে বল্লেন "এরা যে দুই ভায়ে সকাল থেকে শিকারে গেল এখনো এলো না কেন?" রাণা বলে উঠলেন সেকি এখনও এরা ফেরেনি? এই ঝড় বৃষ্টিতে দুজন কোথায় রইল?" বল্‌তে বল্‌তে কেল্লার উঠানে লোকের কোলাহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে চন্দ্রোদয় হচ্চে। রাজা রাণী দেখলেন গ্রামবাসী জনকয়েক কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আস্‌ছে। একজন দাসী তাড়াতাড়ি এসে খবর দিলে "রাণীমা দেখুন গিয়া বড়কুমার অজিম বাহাদুরের কি হয়েছে!" বল্‌তে বল্‌তে লোকজনে ধরাধরি করে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা রাণী শুনলেন, পাহাড়ের উপর শিকার কর্ত্তে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভীলসর্দ্দার—তার ছেলের সঙ্গে সুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে কি ঝগড়া হয়, ক্রমে লড়াই বাধে, বড়কুমার ছোটকুমারকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন। রাণা বল্লেন "আর সুজন সিং তিনি কোথায়?" লোকজনেরা মাথা চুলকে বল্লে "আজ্ঞে তিনি ভালই আছেন, আমাদের আগে পাঠিয়ে দিলেন, নিজে একটা চটিতে একটু বিশ্রাম কর্‌ছেন, এলেন বলে" পথের ধারের চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া—রাণা বুঝলেন, বুঝেই বল্লেন "বিপদের সময় বিশ্রাম না কল্লেই নয়?" লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা রাণী রাজবৈদ্য আর দু একজন দাসী অচৈতন্য অজিম সিংহকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্র রাজকুমারের চেতনা হল না। রাজবৈদ্য ঘাড় নেড়ে বল্লেন "আঘাত সাঙ্ঘাতিক"। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা খাঁচা ছেড়ে পাখী যেমন উড়ে যায় তেমনি রাজকুমারের সেই সোণার দেহ ছেড়ে প্রাণপাখী চলে গেল।

তারপর দিনেরপর দিন কাটতে লাগল, অজয় সিংহ শোকে দুঃখে নিরাশায় দিন দিন ম্রিয়-মান হতে লাগলেন আর সেই দুর্দ্দান্ত মুঞ্জ ডাকাত দিনে দিনে প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে ঘরে বিষম উৎপাৎ আরম্ভ কর্‌লে। এমন কি দুরন্ত ডাকাত এসে একদিন কৈলোরের কেল্লা পর্য্যন্ত লুট করে গেল। ডাকাতের সর্দ্দার সে রাত্রে রাজভাণ্ডার লুট করে চিতোরের সোণার রাজমুকুট মহামূল্য রাজছত্র কেড়ে নিয়ে পলায়ন কর্‌লে। অজয় সিংহ হলেন বৃদ্ধ মৃতপ্রায় আর সুজন বাহাদুর নেশাখোর, সিদ্ধির খেয়ালে দিবারাত্রি মত্ত। দুরন্ত ডাকাতকে কেবা শাস্তি দেয় প্রজালোককে কেবা রক্ষা করে? এক দিকে পাঠানের উৎপাৎ আর এক দিকে মুঞ্জ ভীলের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ওদিকে আবার চারিদিকে খবর হল রাণা আর অধিক দিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ! রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল, সকলেই বল্‌তে লাগল—এতদিনে সূর্য্যবংশের গৌরব বুঝি শেষ হয়, সুজন বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এই দুরবস্থা সেই সময় উজলা গ্রাম থেকে লছমীরাণী হাম্বিরকে নিয়ে

কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রাণার আত্মীয় স্বজন দেশের সর্দ্দার সামন্ত যে যেখানে ছিল রাণাকে দেখবার জন্য উপস্থিত, বুড়ো রাণা বাহির মহলে যেতে পারেন না অন্দরেই সভা করে বসেছেন এমন সময় হাম্বির এসে প্রণাম কর্‌লেন। রাণা আশীর্ব্বাদ করে হাম্বিরকে কাছে বসালেন। হাম্বিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে পড়ল—সেই নাক, সেই চোক, দাদার মত তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনি মধুর গম্ভীর। আজ অজয় সিংহের মনে হল, তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একটি চামড়ার থলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন—এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা লেখা রইলো, আর এই থলিতে একখানি ছোরা রইলো, হাম্বির বড় হলে এ দুটী তাকে দিও। রাণা অজয় আজ তাঁহার সমস্ত সামন্ত সর্দ্দারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর করা সেই চিঠি হাম্বিরের হাতে দিয়ে বল্লেন "বৎস, পড়ে দেখ তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কি।" পত্রে লেখা ছিলঃ—

শ্রীরাম জয়তি—

শ্রীগণেশপ্রসাদ শ্রীএকলিঙ্গপ্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রীঅরিসিংহ আদেশতুঃ—

অতঃপর অজয়সিংহজি ও মেবারের দশ সহস্র অধিকারের সামন্ত সর্দ্দার ও জনপদবাসিদিগকে আমার আদেশ এই যে, পাঠান যুদ্ধে সঙ্কটসমরে ভবানীমাতার ইচ্ছায় যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচার মত অজয়সিংহ ভাইজি একলিঙ্গজির দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া যথাবিধি প্রজাপালন ও কার্য্য চালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী লছমীরাণী শিশু পুত্র হাম্বিরকে লইয়া যাহাতে সুখে সচ্ছন্দে উজলা গ্রামে বাস করিতে পারেন, সে জন্য উজলা গ্রাম ও তৎসংলগ্ন জমীজমা রাণীর নিজনামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস মত দেওয়ানীর বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু অতঃপর সিংহাসন লইয়া হাম্বির ও ভাইজির সন্তানগণের মধ্যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইনিমিত্ত আমার শেষ অনুরোধ এই যে—আমাদের মেবারের সামন্ত সর্দ্দার মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ উপযুক্ত বোধে যাহাকে দেওয়ানীতে বহাল করিবেন তিনিই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইবেন। হাম্বির ও অন্যান্য কুমারগণের প্রতি আমার আদেশ এই যে, তাঁহারা এই উত্তরাধিকার সূত্র লইয়া বিবাদ না করেন; দেশের সঙ্কট অবস্থা, এ সময় গৃহবিবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসন্তান এই গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকিবে ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি

পত্র পাঠ শেষ হলে রাণা সকলের দিকে চেয়ে বল্লেন, "এখন কি করা কর্ত্তব্য? তোমরা সকলেই উপস্থিত; আমার ইচ্ছা, সিংহাসন হাম্বিরের বা সুজন সিংহের এ বিষয়ে এই সভাতেই একটা মীমাংসা হয়ে যাক্। আমি বুঝেছি আমি আর অধিকদিন নেই, অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোন এক কুমারের হাতে দেওয়ানীর ভার দিয়ে সুখে মরতে চাই; এখন

দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা বিচার কর"। সেই সময় পেট-মোটা, নেশায় ঢুলু ঢুলু, রক্ত-চক্ষু সুজনসিং রাজসভায় প্রবেশ কল্লেন। রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। দুই দল; একদল বল্লে, সুজন বাহাদুরকেই সিংহাসন দেওয়া উচিৎ, একেতো তিনি বয়সে বড়, তাছাড়া রাজ্য চালাতে হলে বাহুবলের প্রয়োজন এবং সুজন বাহাদুর যে একজন প্রকৃত পালোয়ান সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নাই। আর একদল বলে উঠল, শুধু কি বাহুবলের কর্ম্ম! রাজ্য চালাতে হলে ধৈর্য্য চাই বুদ্ধি চাই; সৈন্যই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজে লড়াই করতে হল তবে আমরা আছি কি করতে? আমরা তো বলি হাম্বিরকেই রাজা করা উচিত। কারণ বাহুবল তত না থাকলেও রাজগুণ তাঁর যথেষ্ট আছে। অন্য দল থেকে অমনি উত্তর হল, বাপুহে যে দিন-কাল পড়েছে তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছেনা, এখন পাঠানদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই দিতে হ'বে; আমরা এমন রাজা চাই যে একাই একশো পাঠান ঠেকাতে পারে। দুই দলে প্রচণ্ড তর্ক। শেষ হাতা-হাতি হবার জোগাড়। অজয়সিংহ বল্লেন, তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি শোন, তোমরা তো জান ভীল-সর্দ্দার মুঞ্জ সেদিন কেল্লা লুট করে গেছে, আমাদের সাধ্য হয়নি তাকে বাধা দেওয়া; সে রাত্রে এই কেল্লা থেকে চিতোরের রাজছত্র আর রাজমকুট নিয়ে ডাকাতেরা পলায়ন করেছে; শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি মুঞ্জ নাকি রাজছত্র আর রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাণা বলে প্রচার করছে! সূর্য্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাম্বির আর সুজন দুজনেই এখন উপযুক্ত। দুজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ডসমেত মুকুট আনতে পারেন তিনিই রাজ্যের অধিকারী হউন। দুরাত্মা ভীল যে মাথায় মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহস পায় সে মাথা শীঘ্র আমি চাই চাই, নচেৎ আমার জীবনে মরণে শান্তি নাই; মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্ত্তমান থাকতে মুকুট উদ্ধার না হয় তবে জানব সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ হয়েছে, রাজ্যে আর বীর নাই; রাজসিংহাসন ভীল আর পাঠানেরই পাওয়া শ্রেয়। কেল্লার যত সৈন্য যত অস্ত্র আছে দুই রাজকুমার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন; আজ সভা ভঙ্গ কর।" তুমুল কোলাহলে রাজসভা ভঙ্গ হল।

পর দিন সকালে উঠে হাম্বির একখানা পুরাণো তরোয়াল আর ছোরায় শান্ দিচ্ছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের দেওয়া আর তলোয়ার খানা উজলা গ্রামের দাদামশায় হাম্বিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। হাম্বির বসে বসে অস্তর শান্ দিচ্ছেন এমন সময় লছমী রাণী এসে বল্লেন, এখানে বসে কি কচ্ছিস? হাম্বির বল্লেম, জাননা মা, ডাকাত ধরতে যেতে হবে তাই অস্তর দুখানায় শান্ দিয়ে নিচ্ছি। লছমী রাণী বল্লেন, হা কপাল তুমি এখন অস্তরে শান্ দিচ্ছ, আর ওদিকে সুজনসিং যে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে সে তো কাযের লোক দেখি, লোকে কেবল তার মিথ্যে দুর্ণাম রটায় বুঝলেম।

হাম্বির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, তাইতো মা দাদাতো আমায়

ডেকে গেলেন না? রাজত্বিটা দেখছি আমার কপালে নেই, যাইহোক আমি ছাড়ছিনে। এই কথা বলে হাম্বির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ারে শান্ দিতে লাগলেন।

রাণি-মা বল্লেন, যা যা বেলা হল, এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ ছুখানায় শান্ দিচ্ছি।

হাম্বির উঠে গেলেন আর লছমীরাণী বসে বসে অস্তরে শান্ দিতে লাগলেন! রাজপুতের মেয়ে বাটনাবাটা কুটনো কোটার চেয়ে অস্তরে শান্ দেওয়া ভাল বোঝেন; তাঁর হাতে পড়ে অস্তর খানা কিছুক্ষণের মধ্যে চক্ চকে ঝক্ঝকে হয়ে উঠল। হাম্বির ফিরে এলে রাণী মা তাঁর হাতে ছোরাখানা দিয়ে বল্লেন দেখ দেখি, এখানায় আঁকা বাঁকা যেন কিসের দাগ দেখছি. বোধ হয় যেন ফাট ধরেছে। হাম্বির ছোরা খানা নিয়ে এদিক ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেলনা, মনে হল যেন, ছোরার ফলকটার একদিক থেকে আর একদিকে পর্য্যন্ত একটা আঁকা বাঁকা ফাট। ফাট কি রক্তের দাগ কিম্বা কিছু হরপ চেনা যায় না। হাম্বির বল্লেন তাইতো এটা তো কিছু বোঝা গেলনা, ভাল করে দেখতে হবে; এবারকার মত এইটাতেই কায চলে যাবে; মা তুমি অস্তর খানা আমার ঘরে রেখে এস, আমি একবার মহারাণার সঙ্গে দেখা করে আসি, একটা ভাল ঘোড়া নিতে হবে।

অজয় সিংহ নিজের মহলে আরাম কর্ছিলেন হাম্বিরকে আস্তে দেখে বল্লেন, সেকি তুমি যাও নাই! সুজন তো অনেকক্ষণ রওনা হয়েছে। হাম্বির বল্লেন, "আজ্ঞে একটা ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালে রওনা হব।" অজয় সিংহ বল্লেন, "লোকজন তো সব বড়কুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনে যাবে কেমন করে? আজ সবুর করে দোসরা লোকের বন্দোবস্ত করে তবে যেও।" হাম্বির বল্লেন, "আজ্ঞে একজন শিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি সেই আমাকে পথ দেখাবে; আমি মনে করেছিলাম লোক জন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলেম যে মুঞ্জ ভীল যে প্রকার দুর্দ্দান্ত, লোক জন নিয়ে তাকে পারা অসম্ভব, কৌশলে কার্য্যসিদ্ধ করা ছাড়া উপায় নাই।"

অজয় সিংহ হাম্বিরের বুদ্ধির প্রশংসা কল্লেন। আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন, "জয়ী হও সুখী হও। কিন্তু খুব সাবধানে চলবে, লোকে না বলে যে আমি তোমায় একলা পাঠিয়ে বিপদে ফেল্লেম। পাছে তুমি রাজ্য পাও কেবল সেই ভয়ে সুজন সিং তোমায় না নিয়েই আগে ছুটেছে। এর বিচার পরে করব, এখন তুমি বেশ ধীরভাবে কাজ করো, মুঞ্জ ডাকাতের হাতে আমার অজিমের প্রাণ গেছে, এখনো তার শোক আমি ভুলতে পারিনি মনে রেখো।"

হাম্বির প্রণাম করে বিদায় হলেন।

ওদিকে সূর্য্যোদয় না হতে সুজনসিং নিজের বন্ধু বান্ধব আর সৈন্য সামন্ত নিয়ে চলেছেন। আজ তিনি ভারি ব্যস্ত। বেলা ১১টার পূর্ব্বে যার কোন দিন ঘুম ছাড়ত না আজ তিনি ভোর হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাম্বিরকে ডেকে নিয়ে যান তার পর্য্যন্ত সময় হল না। দুএক সামন্ত জিজ্ঞাসা কল্লেন, কই ছোট কুমার গেলেন না? সুজনসিং হেঁকে বল্লেন, তিনি

একটু আরাম কচ্চেন, চল আমরা আগে যাই, তিনি আহারাদি করে পরে আস্বেন এখন।" অমনি একজন খোষামুদে পারিষদ বলে উঠলো, চলুন আমরা আগেতো গিয়ে ডাকাতের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোট কুমার এসে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবেন!" অন্য জন বল্লে, "হঃ রাণার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে, একি যার তার কর্ম্ম? বুকের পাটা চাই, ডাকাত ব'লে ডাকাত, মুঞ্জ ডাকাত, নামে সব দেশ শুদ্ধ থরহরি কম্প! তাকে ধরতে কিনা ছোট কুমার? হাতি মার্তে পতঙ্গ! ওর মধ্যে কোন এক মন্ত্রীর পুত্তুর বলে উঠল, 'নাহে না বুড়ো রাণাকে তোমরা দোষ দিও না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম্ম? কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার বুঝলে কি না'! সুজন সিংহ হেসে বল্লেন 'নাহে না, তোমরা জান না, হাম্বিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে, তবে কি জান ছেলেমানুষ এখনও হাড় পাকে নাই, আমি এইবার লড়াই থেকে এসেই তাকে রীতিমত কুস্তি শেখাবার বন্দোবস্ত কর্ছি দেখ না।' এইরূপ কথাবার্ত্তায় বড়কুমারের দল চলেছে।

এদিকে হাম্বির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, লছমী রাণী এসে বল্লেন 'কৈ তোর যাবার কি হলো? তোর লড়ায়ে যাবার কোন চেষ্টাই দেখিনে যে, ভয় পেলি নাকি! এই যে বল্লি ঘোড়া ঠিক করে যাচ্ছি, আর ঘরে এসে ঘুম দিচ্ছিস্?"

হাম্বির একটুখানি হেসে বল্লেন 'রোসো মা ডাকাত ধরতে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার. একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও। একি একটা বুনো শুয়োর যে যাব আর অমনি জনারের আগায় গেঁথে আন্বো?' লছমী রাণী বুঝলেন, হাম্বির মুখে তামাসা কচ্ছেন কিন্তু মনে মনে যেন কি একটা মৎলব স্থির করে রেখেছেন—তিনি হাম্বিরের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'বটে! আমার সঙ্গে তামসা হচ্ছে? একটা জনারের শিষ দিয়ে বুনো শুয়োর তো গেঁথে আন্, তবে বাহাদুরী বুঝি। দেখা যাবে এইবার তুমি কতদুর কি কর। এখন বল্ দেখি তোর মৎলবটা কি?" তারপর মায়েতে ছেলেতে সেই নির্জ্জন ঘরে সারাদিন কত কি পরামর্শ হল।

সন্ধ্যা হয় হয়, রাণী বল্লেন 'তুই তবে প্রস্তুত হ আর বিলম্ব কর্লে রাত্রি হয়ে পড়বে। হাম্বির বল্লেন 'আর প্রস্তুত কি, এই যেমন আছি তেমনি যাব, দেখতো মা আমার সেই বেতো ঘোড়াটা এল কি না?" ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল, হাম্বির সেকেলে তলোয়ার খানা কোমরে গুঁজে, সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল, সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেলেন। দুই প্রহর রাত্রে হাম্বিরের সেই বেতো ঘোড়া ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ কল্লে। [ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিস্মৃত স্মৃতি।

(১)

সেদিন ভোরের বেলা একটি মৃদু স্নিগ্ধ সুবাস ও একটি সুকোমল স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সহসা কেজানে কেমন করিয়া মনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। শরতের এই আধ ফোটো ফোটো আলোক আঁধারের মিশ্রনে, আধ স্বপ্নে আধ জাগ্রতে এই সুখদা সপ্তমী ঊষায় আজ আবার বহু দিবসের একটা বিস্মৃত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। তন্দ্রা-জড়িত মুদ্রিত নেত্রে আমি বলিয়া ফেলিলাম "মন্দা, তুমি কখন এলে?" আমাকে যে স্পর্শ করিয়াছিল সে কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

"মণ্ডা! মণ্ডা কি দাদা বাবু! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি বুঝি মণ্ডা মিঠাইএর স্বপন দেখ্‌ছো? হ্যাঁ দাদাবাবু মণ্ডা বুঝি কারু কাছে আপনি আসে?"

স্বপ্ন টুটিয়া গেল চমকিয়া চোখ মেলিলাম। কই কে কোথায়! দূরে পূজাবাড়িতে সপ্তমীপ্রভাতে দেবীপ্রতিষ্ঠার বাজনা বাজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রামকে জাগরিত ও মুখরিত করিতেছে। তখন সবে ভোর হইয়াছে মাত্র। খোলা জানালার মধ্য দিয়া শিশিরসিক্ত শিউলি ফুলের গন্ধ মাখিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছিল। পূর্ব্ব গগনে নীলিমার উপর দিয়া ঊষার কনক কিরণ-ছটা জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সদ্যোজাগ্রত পাখীর দল তখনও প্রভাত বন্দনা শেষ করে নাই। আর আমার প্রিয়তমা নাতিনী শৈলবালা হাসিয়া হাসিয়া আমাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছিল, আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া আকস্মিক আবেগ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুই আজ এতো সকালে উঠেছিস যে?" শৈল বলিল,—"আজ যে দুর্গা পূজো, আমি বাবুদের বাড়ী ঠাকুর দেখতে যাচ্চি; তুমি যাবেনা দাদাবাবু?" আমি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম,—"তুই যা দিদি, আমি যে বুড় মানুষ এতো সকালে আমি কি যেতে পারি, একটু বেলায় তোমার মামা আমার মাকে দর্শন করিয়ে আন্‌বে এখন।"

শৈল তখন ভারি ব্যস্ত, সে আর বিলম্ব করিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; পরণের নূতন সাড়ি ও হাতের নূতন কেনা ঢাকাই শাঁখা একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটু খানি গম্ভীরচালে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে যে নূতন জিনিষ গুলো পরিয়াছে তাহার উপর আমার ক্ষীণ দৃষ্টি যাহাতে নিবদ্ধ হয় যে বিষয়ে তাহার বেশ একটু সতর্কতা দেখিলাম। কিন্তু প্রশংসাসূচক শব্দগুলা আমার ওষ্ঠাগ্রে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গেল।

আজ এই শরৎ প্রভাতের নিদ্রাঘোরে এই পরিচিত কচি হাতখানির একটি কোমল স্পর্শ সহসা এতকাল পরে যে দিনের স্মৃতি পুনর্জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল সেদিন আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, তাহা আমার জীবন ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়, প্রথম যৌবনের নূতন উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনী। এখন আমার বয়স ৬০এর উপর তখন এই আমিই ২৬ বৎসরের যুবা পুরুষ ছিলাম। তাহার পর ৩৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

আমাদের বাড়ী এই গ্রামেই। এই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা পল্লীখানি তখন এমন করিয়া ডিগুপ্ত ও কুইনিন্ পীলবিক্রেতার খাসমহল হইয়া দাঁড়ায় নাই। ছোলা আদা চিরেতা ও পলতালতার চেয়ে তখন গ্রামবাসিরা অন্য খাদ্যের বেশি ভক্ত ছিল। সবচেয়ে তখন সুবিধা ছিল যে, গ্রামে ফাঁড়িদারের আস্তানা ও রেলওয়ের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। তখনকার লোকেরা কথায় কথায় পুলিষ ডাকিতে সুযোগ পাইত না, মণিহারীর দোকান লুঠ করিয়া ঘরে তুলিবার তখন সুবিধাই ঘটিতনা, ভাইকে ভাইএর নামে ফৌজদারী না করিয়া তখন সালিসী মানিত হইত; তখনকার লোকেরাও মাতাল হইত বটে তবে তাহাতেও পয়সা খরচটা কিছু কম হইত। সেই আমাদের সেকেলে গ্রামখানি এখন তোমাদের মনে বিভীষিকার উদয় করিতেছে বটে কিন্তু আমাদের চোখে বড়ই আদরের ধন ছিল।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমি কলিকাতায় চাকরী করিতাম। সমস্ত হপ্তাটি সেখানে যেমন কেন থাকিনা শনিবার রাত্রি দশটার সময় নৌকা হইতে নামিলেই মনে একটা নুতন উদ্যম ও বল জাগিয়া উঠিত। তারপর প্রতীক্ষিত দুইখানি হৃদয়ের স্নেহ-সেবায় শ্রান্তি ক্লান্তি মুহূর্ত্তে অবসিত হইয়া যাইত।

গৃহে আসিয়া গোপনে বলিতাম "মন্দা তুমি কি ওষুধ জানো বলো দেখি? তোমার হাতখানা গায়ে পড়বামাত্র আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায়।" বাড়ীতে মা ও স্ত্রী ছাড়া আর কেহ ছিলেন না।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে আমি নিঃসন্তান। মা ইহা লইয়া আজ কাল সর্ব্বদাই অবিবেচক একচোখো দেবতা ও আমার স্ত্রী মন্দাকে তিরস্কার করিতেন, এবং 'এই বাঁজা তালগাছ নিয়ে কি করবো' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সে বেচারাকে মনঃপীড়িত করিয়া তুলিতেন। ঠাকুর দেবতা ও সন্ন্যাসী ফকীরের ঔষধ, মন্ত্র, কবচ, মাদুলিতে যখন কিছুই হইল না তখন হতাশ হইয়া শেষে আমায় ধরিয়া পড়িলেন "তুই আবার বিয়ে কর্"। আমি কথাটা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম। পরে চুপ করিয়া থাকিলাম, অবশেষে রাগ করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কোন মতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে, পুত্র কন্যা না জন্মিলেও মানুষের বেশ সুখ শান্তিতে দিন কাটিতে পারে। মা কিছুতেই থামিলেন না। প্রতিদিন অনুরোধ, উপরোধ, কান্নাকাটি বাড়িয়াই চলিল, যে গৃহ আমার শান্তি কানন ছিল এখন তাহাই তিক্ত হইয়া উঠিল; আর যেন সেখানে তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করে না। একদিন স্ত্রীকে বলিলাম—

"মন্দা! আমি এখন আর দিন কতক বাড়ী আস্‌বো না মনে করছি; তুমি আমার জন্য ভেবোনা যেন"।

মন্দাকিনী একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" আমি উত্তর দিলাম, "মা বড্ড বাড়াবাড়ি জেদ আরম্ভ করেছেন"। "তাতো জানি, তা সে জন্য বাড়ী আসা বন্ধ করবে কেন?"

"কি করি বলো ক্রমাগত মার কান্না আর সহ্য হয় না।"

মন্দাকিনীর মুখ খানা অকস্মাৎ মলিন হইয়া গেল, অন্তঃস্থলের অভ্যন্তর হইতে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল—"বেশতো তাঁকে খুসী করোনা।"

আমি তাহার অভিমান-ক্ষুণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে তাহাকে বুকে টানিয়া বলিলাম—

"তাই কি মনে হয় মন্দা? আমায় এম্‌নি পাষাণ্ড বলে তুমি মনে করো?" একান্ত নির্ভরতার সহিত আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না"।

তাহাই করিলাম দুই হপ্তা আর বাড়ী গেলাম না। এই সময় সুক্ষণ কি কুক্ষণ জানিনা—আমার উপরওয়ালা পেন্‌সন লওয়ায় আমার পদোন্নতি হইল। তখনকার বাঙ্গালিগৃহস্থের ২৫০৲ টাকা নিতান্ত অল্প আয় নহে, কারণ তখন টাকায় /৫ সের করিয়া চাল বিক্রয় হইত না, দুধের নির্জ্জলা ভাগের দাম ছিল এক আনা সের। বাড়ী গিয়া মাকে সুসংবাদে তুষ্ট করিলাম, মা প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাই জন্যে বুঝি আসতে পারনি?

মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিয়া কাশিয়া উত্তরটাকে চাপিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাহাতে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্তে পাপ হইতে বিরতি ঘটিল বলিয়া বড় ভরসা রহিল না। মন্দার সহিত পরামর্শ করিয়া মাকে বলিলাম—

বারমাস আর একা পড়ে থাকতে পারিনে, একটা বাসা করি, তোমরাও সেখানে চলো।" মা প্রস্তাবটা উঠিতেই আপত্তি তুলিলেন—"ঘরসংসার ঠাকুর দেবতা এ সব কে দেখে কে শোনে, তা কি করে হবে! তাছাড়া সে শুনেছি সব মেলেচ্ছর দেশ! সেখানে গেলে নাকি জাত জন্ম কিছুরি বিচার থাকে না।"

অবশেষে গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শনের লোভে সম্মত হইলেন। স্থির হইল নবান্নের পর একদিন বাসা ঠিক করিয়া আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইব। ফিরিবার সময় আমার স্ত্রী বলিল—শীঘ্র নিয়ে যেও একা আর থাকতে পারিনে"। আদর করিয়া তাহার বিরহাশঙ্কায় ম্লান মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম "তা আর বলতে হবে না"।

একটি চলনসই রকম বাড়ী শীঘ্রই পাওয়া গেল। তখন কলিকাতার ছোট বাড়ীর ভাড়া এখনকার মতন অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে নাই। ১৫ টাকা ভাড়াতে বেশ বাসোপযোগী বাসা পাইলাম। দেশে আসিয়া শুনিলাম এক আত্মীয়ের বাড়ী বিবাহ, মা সে বিবাহে উপস্থিত না থাকিলে চলিবে না। আমি কলিকাতায় লইয়া যাইতে জেদ করিলে মা বলিলেন—

"তাকি হয় তাহলে লোকে বলবে চাক্‌রে ছেলের গুমোরে জ্ঞাত কুটুম মানলে না। বাপরে তোকে কেউ গাল দেবে সে আমি সহ্য করতে পার্ব্বো না।" ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দাকে বলিলাম,—"তুমিই না হয় চলো, মার যাবার ইচ্ছা নাই।" সে চোখের জল গোপন করিয়া গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল।" লোকে নিন্দা করিবে, মা রাগ করিবেন।" বলিতে বলিতে চোখ দিয়া টস টস করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল! পুত্রহীনা তাহার প্রাণের সবটুকু প্রেম এক জায়গায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল। সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম "আচ্ছা এবার এসে নিশ্চয়ই মার মত করাব।"

(২)

আমার বাসার দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নূতন ধরণের সাজসজ্জা পরিয়া দণ্ডায়মান ছিল। প্রথম দিনেই জানিয়াছিলাম সে বাটী এক পূর্ব্বাঞ্চলবাসী জমীদারের। তাঁহার নাম হীরালাল গঙ্গোপাধ্যায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছি,—মন অত্যন্ত নিবিষ্ট থাকাতে কখন অস্তগত সূর্য্যের শেষ রক্তিমাটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নিবিড় হইয়া আসিয়াছে তাহা জানিতেও পারি নাই। অবশেষে যখন লেখার অক্ষর-

গুলা চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া আসিল, তখন মুখ তুলিয়া এই পরিবর্ত্তনটুকু বুঝিতে পারিলাম। একজন বন্ধুর বাড়ী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যাইবার কথা ছিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই পার্শ্বের ছাদে দৃষ্টি পড়িয়া গেল। একটা মধুর কলহাস্য ও মলের রুণু ঝুণু ধ্বনি ইতিপূর্ব্বেই মধ্যে মধ্যে কানে আসিতেছিল, এখন দেখিলাম সেই তানলয়সমন্বিত শব্দসমূহের সৃষ্টিকারিণী কয়েকটি ছোট বড় মেয়ে। একটি কিশোরী আর একটি ছোট মেয়েকে ধমক দিয়া বলিতেছিল—

"আঃ সুবর্ণ! কি ছুটাছুটি করছিস, ওখানে একজন বাবু রয়েছেন, তিনি কি মনে করবেন বল দেখি?" সুবর্ণ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল "ওটা যেন মেজদির শ্বশুর বাড়ী তাই কি মনে করবে বলে ভয় হচ্চে!"

আমি তাহাদের পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু এই মন্তব্য শুনিয়া একবার না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেখিলাম, উপহাসাস্পদ মেজদি আরক্তমুখে আমার দিকে একবার কটাক্ষ করিয়াই লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া লইল। আমিও আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

শুনিয়াছিলাম হীরালাল বাবুর মেয়ে অনেকগুলি আর সবগুলিই প্রায় অবিবাহিতা। তাহার কারণ কতকটা হীরালাল বাবুর নব্যতন্ত্রপ্রিয়তা এবং অনেকখানি তাঁহাদের কন্যের কৌলিন্য। স্বঘরে সুপাত্র পাওয়া তখন একপ্রকার দুষ্প্রাপ্যই ছিল।

নূতন বাসায় আসিবার পর একমাস হইয়া গিয়াছে। পৌষ মাস লক্ষ্মী পূজা ইত্যাদি নানা কারণে মা বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে সম্মত হন নাই, আমি এখনও একাকী।

কিন্তু একা হইলে কি হয় পাশের বাড়ীর ছেলেদের কল্যাণে আমার নির্জ্জন বাসা বড় একটা নিস্তব্ধ থাকিতে পায় না। তাহাদের পাঠের ধ্বনি, মেয়েদের মেম শিক্ষয়িত্রীর যিশুর গান এবং তাহাদের সমন্বিত কণ্ঠে "There is a happy land far away" ইত্যাদি আমার ঘরখানিকে মুখরিত করিয়া রাখিত। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে হীরালাল বাবুর খুব বেশি রকম অনুরাগ ছিল। মেয়েদের লেখাপড়া তখনকার দিনে আজিকালিকার মতন সুলভ ছিল না, তাই হীরালাল বাবুর মেয়েরা এ বিষয়ে একটু নাম কিনিয়াছিলেন। ঠিক আমার সম্মুখের ঘরেই তাহারা সকাল সন্ধ্যায় পড়িতে বসে; অনেক সময় আমাকে জানালার নিকটে গিয়া অপ্রতিভ ভাবে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। মেয়েগুলি কুমারী হইলেও সব কয়টিকেই আর বালিকা বলা চলে না। হীরালাল বাবুর দুইটি ছেলে। বড় ননিলাল কোথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গিয়াছে, ছোটটি হিন্দু স্কুলে পড়ে। লোকে বলিত হীরালাল বাবুর বাড়ী লক্ষ্মী সরস্বতী একসঙ্গে বাঁধা আছেন

সরস্বতী পূজার পর মা আসিলেন। এবার আমি নিজে আনিতে যাই নাই আমার এক কলিকাতা দর্শনলোলুপ জ্ঞাতি ভ্রাতাকে ভার দিয়াছিলাম। মা আসিলেন, কিন্তু মন্দার আসা হইল না। আমাকে বিস্মিত দেখিয়া মা আপনিই বলিলেন—

"বউমার মার বড়ড় ব্যায়রাম বলে তাঁকে নিতে লোক এসেছিল; কি করি না পাঠালে ভাল দেখায় না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে কল্পনার মধুর চিত্রখানার উপর কালি পড়িয়া গেল। মার উপর ক্ষুণ্ণ অভিমানে নীরব হইয়া রহিলাম। মা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন "রাগ কল্লি ?" নিবিড় অভিমানে উত্তর দিলাম "না"।—মনে মনে বলিলাম "যদি তুমি আগে চলে আসতে মন্দা !"

এক দিন সন্ধ্যার পর নিজের নির্জ্জন বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছি—

"মন্দাকে আর কতদিন সেখানে রাখিব। তাহার মা এখনও তো রোগমুক্ত হন নাই, কি উপায় করা যায়। এমন সময় বাহির হইতে কে আমায় ডাকিল "বিপিন বাবু ! বাড়ী আছেন ?"

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না চিনিলেও গলার স্বরে হীরালাল বাবুকে চিনিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া গেলাম। যথোচিত আদর আপ্যায়িতের পর তিনি প্রথমে বাজে কথাই কহিতে আরম্ভ করিলেন। কতদুর পড়িয়াছি ? বাড়ী কোথায় ? বর্ত্তমান সমাজ ইত্যাদি, অনেক কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি নাকি বিয়ে করতে চাও ?" আমি বিস্ময়ের সহিত কহিলাম 'কে বলিল ?' আমার স্বরে অথবা দৃষ্টিতে তিনি একটু যেন অপ্রতিভ হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন "শুনিলাম পুত্র হয় নাই বলিয়া তুমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক।" সাবধানে উত্তর দিলাম,—"মার সেইরূপ ইচ্ছা বটে, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত নহি।" হীরালাল বাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন "কেন বাপু ! তোমার মায়ের এ ইচ্ছা তো কিছু অসঙ্গত নয় ! বংশ রক্ষার জন্য তোমার আবার বিবাহ করাই তো উচিত।" কি গ্রহ ! একজন অপরিচিত সম্প্রতি শ্বশুরক তাঁহারও আমাকে এই উচিত শিক্ষাটুক দিবার জন্য অনিদ্রা রোগ জন্মিয়াছে ! বিনীতভাবে উত্তর করিলাম,—"আপনার মুখে একথা সাজে না, আপনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করেন শুনিয়াছি। আমার নিরপরাধিনী পত্নীর প্রতি যে অত্যাচার হইবে তাহার জন্য দায়ী কে ? আর পিতৃপুরুষ, তাঁহারা অবশ্যই আমাকে এ জন্য ক্ষমা করিবেন।" উত্তেজিত স্বরে আমার অতিথি বলিয়া উঠিলেন "থাম বাপু ! তোমরা নব্যরা সব জিনিষের কেবল একটা দিক দেখো। স্ত্রীশিক্ষা এক জিনিষ ও কুলধর্ম্ম পালন অন্য। শিক্ষার সহিত ধর্ম্মকে এক করিও না। স্ত্রীর চেয়ে পিতৃপুরুষকে ছোট করিও না, তাহাতে অধর্ম্ম হইবে। আমরা সে কালের লোক সব সহিতে পারি ধর্ম্মের অবমাননা সহিতে পারি না ; পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ইহা শাস্ত্রের বচন।" তিনি উঠিলেন। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিন্তু আপনি এসকল কথা কেন বলিতেছেন ?" তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া বলিলেন—"না কিছু নয়, কথাটা শুনিয়াছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম। বিশেষ তুমি পাড়ায় আসিয়াছ পরস্পরের সংবাদ সর্ব্বদাই তো রাখা উচিত।"

বুঝিলাম কিছু যেন গোপন করিলেন। একবার একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদিত হইল। কিন্তু কি অভাগ্য ! সে কোন কাজের কথা নয়।

(৩)

মা আসার পর রোজ রোজই প্রতিবাসী-মেয়েরা বেড়াইতে আসিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতিদিন ভাল ভাল মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি আমাদের বাড়ী আসিতে আরম্ভ হইল। হীরালাল বাবুর স্ত্রী মায়ের গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শনে প্রায়ই সঙ্গিনী করিতেন। সিদ্ধেশ্বরী মদনমোহন দর্শনেও বঞ্চিত করিতেন না। নিত্য সেখান হইতে পূজার ফুল বিল্বপত্র ও গঙ্গামৃত্তিকা গঙ্গাজল আসিত। মেয়েরা তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিয়া উপকথা শুনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, ছোট খুকিটি তাঁহার কোলে নহিলে ঘুমাইতে চাহিত না, এমনি অনেক বাধ্য

বাধকতার মধ্যে দিয়া তাঁহাদের প্রণয় নিত্যই চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কদিনেই তাঁহারা মিষ্টান্ন ও মিষ্টকথায় মাকে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কয় ঘণ্টা গৃহে থাকিতাম তাঁহাদের সুখ্যাতি শুনিতে শুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিত।

'অধর্ম্ম কথা বলিতে নাই' সমাদরটা যে মা'ই একা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাও নয়। আমিও ইতিমধ্যে কোননা কোন একটা উপলক্ষ্যে দুই তিন বার বড়লোকের অন্দরে জামাই আদরে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, খাদ্যদ্রব্যের প্রচুরতর আয়োজন সত্বেও চারিদিকের দ্বারান্তরালবর্ত্তী অস্ফুট হাস্যসংযুক্ত ফুস্‌ফুসানি ও অলঙ্কারশিঞ্জন আমার হস্ত ও জিহ্বাকে কেমন যেন জড়িত করিয়া তুলিতেছিল ও উদরে যথেষ্ট ক্ষুধা থাকিতেও পাতে যথেষ্ট আহার্য্য ফেলিয়া উঠিতে হইয়াছিল।

সে দিন সকাল সকাল আফিস হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া সবেমাত্র জলযোগ করিতে আসনে আসিয়া বসিয়াছি, এমন সময় আমার পিছনদিক্ হইতে কে ডাকিল "মাসিমা।" ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম হীরালাল বাবুর বাড়ীর জানালার নিকট হইতে সেই মেয়েটি সরিয়া গেল, মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বলিলেন—

"কি বলচো মা হিরণ। বিপিনকে আবার লজ্জা" ! "মা আজ আপনাকে একবার আসতে বল্লেন, যদি সুবিধা হয়তো ঝিকে পাঠাবেন"। অন্তরাল হইতে এই কথাগুলি শুনা গেল, মা উত্তর করিলেন "তা যাবো মা যাবো"। যাকে হীরালাল বাবুর স্ত্রী দিদি বলিতেন, সেই সম্পর্কে তিনি তাঁহার ছেলেমেয়েদের মাসিমা। মা ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম "কে মা ?" মা বলিলেন "ওবাড়ীর বাবুর মেজ মেয়ে। দিব্যি মেয়েটি না ?" "হাঁ, তা ওঁর কোথায় বিয়ে হয়েছে ?" "বিয়ে ! বিয়ে তো হয় নি। ওঁরা মস্ত কুলীন কিনা—এই এই আগাদেরি পাল্টি ঘর, তাই অমন মেয়েরও বর মিলছে না।"

মার এই কথায় আমি যেন চমকিয়া উঠিলাম। সেদিন সহসা হীরালাল বাবুর আগমন ও আমার প্রতি অযাচিত উপদেশের অর্থ এখন পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইয়া গেল। হাসিও আসিল, সকলেই নিজের স্বার্থ বুঝিয়া উপদেষ্টা হন ! এমন সময় মা বলিলেন—

"বাবা, আমার তো দিন ফুরিয়ে এলো, খেয়া নৌক ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একবার চড়ে বসলেই হয়। তা এসময়েও কি তুই আমার শেষ সাধ পূর্ণ করবি নি রে ! তুই যখন এক বছরের তখন তোর মামা মারা যান, তোর বাপ তো মরণের তিনদিন আগে পর্য্যন্ত আমাদের উদ্দিশ নেন নি। সেই তোকে কত দুঃখে, কত কষ্টে মানুষ করলুম ; কাট্‌না কেটে পড়ালুম, বে'থা দিলুম। মনে বড় আশাই ছিল পৌত্তুরের মুখটি দেখে মনিষ্যি জন্ম সার্থক করবো, তা সে সাধে তো বিধাতা ছাই ফেল্লেন ! তা বিপিন ? কখনও তো তোর কাছে কিছু দাবী করিনি, এই কথাটা তুই কি কিছুতেই রাখবিনি ?"

আজ মার কাতরস্বরে আমি যেন আর অবিচল থাকিতে পারিলাম না, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—

"আচ্ছা মা ! এবারও যদি ছেলে না হয় ?" মা ঈষৎ আশ্বস্ত হইলেন, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তা নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে, গণৎকাররা সুবাই বলছে বৌমা বাঁজা।"

আবার বলিলাম "না মা বেশ স্বস্তিতে আছি, মিথ্যে ঝগড়া কোঁদল ঘরে ডেকে আনা, তাছাড়া লোকেই বা বলবে কি ? অমন ঝঞ্চাটে আর কাজ নাই।"

"লোকে কি বল্‌বে! কুলীনের ছেলের যে একটা বে করায় গাল লাগে তা জানিস? তোর বাপ পিতেমর কতো গুলো করে বে ছিল শুনেছিস্‌ তো? লক্ষ্মী বাবা আমার আর অমত করিস্‌নে; ওঁরা বড় ব্যস্ত হয়েছেন আজি আমি ওঁদের বলি গিয়ে"।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—

"কারা ব্যস্ত হয়েছেন? কি তুমি বল্‌ছো মা আমিতো কিছু বুঝ্‌তেই পারছি না!"

মাও বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—

"কেন হীরালাল বাবু তোকে কি বলেন নি? তাঁরা যে হিরণের সঙ্গে তোর বে দিতে চান?"

আমার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল,—"সে কি! অমন মেয়ে সতীনের হাতে দিতে চান কি দুঃখে?

মা ঈষৎ গর্ব্বের হাসি হাসিলেন,—

"কুলীনের ঘরে অমন পাত্তর কটা আছে? সতীন! কুলীনের মেয়ের একটা সতীন আবার সতীন! "আচ্ছা উনি যে কুল মানেন? মা বলিলেন "ওমা তা মান্‌বে না! মেয়েদের ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি পড়ায় ঐ যা,—নইলে এদিকে ওরা খুব হিঁদু! মা রয়েচে কিনা, দেশে দোল দুর্গোৎসব সব হয়। তা তুই বিয়ে করবি কিনা বল; আহা মেয়ে ত না যেন পরী!

তাহা আমিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার সলজ্জ দৃষ্টির বিশ্বস্ত আত্মীয়তাভাবটা আমাকে একটু বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে দৃষ্টি যতই মনে পড়িতেছিল তাহার মধ্যে সুকুমার হৃদয়ের নবীন আশা, বিশ্বাস, নবপ্রস্ফুট প্রেমভাব প্রকাশিত দেখিয়া একটি সুকোমল করুণায় আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। মা আমাকে নীরব দেখিয়া কি ভাবিলেন কে জানে, আবার বলিলেন,—"মন ঠিক করে ফেল বাছা; আর না বলিসনে।"

আমি যেন চমকিয়া উঠিলাম, আমার ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় জাগ্রত অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিলাম "না মা তা কি হয়! তাহলে"—মা আমাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া বলিলেন,—

"ওকথা শুনব না বাছা। তোকে বিয়ে করতেই হবে। আমাকে ওরা ডাকছে আমি যাই"।

মা চলিয়া গেলেন আমি ভাবিতে লাগিলাম,—না মন্দার নিকট অবিশ্বাসী হইব না। সেকালের নিয়ম সেকালে চলিতে পারে তাহা একালে আর চলে না! বিধাতা যে অভাগিনীকে মাতৃত্বের গৌরব-আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন আমি তাহাকে কোন প্রাণে স্বামীপ্রেম হইতে বঞ্চিত করিব! ভগবান আমাকে এই পাপ চিন্তা হইতেও যেন রক্ষা করেন।"

(৪)

ফাল্গুনমাস গিয়া চৈত্র ও চৈত্র মাস গতে বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল, কিন্তু মন্দার আর আসাই হইল না। তাহার মার রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে গ্রাম্য কবিরাজ বলিয়াছেন আর বেশি দিন রোগী টিঁকিবেন না। মায়ের ইচ্ছা মৃত্যুকালে কন্যা কাছে থাকে। আমার শ্বাশুড়ির দুইটি কন্যা ভিন্ন আর কোন সন্তান ছিল না; মন্দা ছোট। বড় মেয়ে সৌদামিনী অগণ্য সপত্নীশ্রেণীর মধ্যে সন্তানের মাতা বলিয়া নিজের সিংহাসন অটল করিয়া লইয়াছিল। সে আসিতে পারে না কাজেই মন্দা না থাকিলে তাঁহার মুখে একটু জল দেয় এমন কেহ ছিল না। দোলের বন্ধে তাহাদের বাড়ী গেলাম। মন্দা ম্লানমুখে বলিল,—

"আবার এসো; আমাদের আর কে আছে!" বলিলাম 'মাকে না হয় কলিকাতায় নিয়ে চলো না।'

সে আগ্রহে সম্মত হইলেও শ্বাশুড়ী কোন মতেই জামাইবাড়ী আসিতে সম্মত হইলেন না। ফিরিয়া আসিলাম, দুর হইতে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, মন্দা ঊষাকালের পল্লবিনী-লতার ন্যায় কুটির দ্বারে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যায় সে তেমনি নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। অনুতাপে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার বিষাদ-মলিন মুখের ছবিখানা মনের ভিতর আনিয়া নিজেকে শত ধিক্কার দিলাম।

জ্যোৎস্নারাত্রে সম্মুখের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া মা শুইয়াছিলেন। আমি কাছে গিয়া বসিলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা কোন কথা বলিলেন না; মনে হইল তিনি এমন কিছু কথা বলিতে চাহেন যাহার জন্য চেষ্টা করিয়া কথা খুঁজিতে হইতেছে। আমিও চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তার পর হঠাৎ মা বলিয়া ফেলিলেন;—

এদিককার তো সবি একরকম ঠিক হয়ে গেছে; কালই তবে হলুদ দেওয়া যাক্‌।

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম; নির্ব্বাক হইয়া মার দিকে চাহিলাম। মা বলিলেন,—

"তোকে বলিনি বাছা, তা তাদের ধরাপাকড়ায় আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। আর তোকেও সেদিন নিমরাজি দেখলুম। পরশু সন্ধ্যেবেলাই লগ্ন আছে।" আমি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম "না মা আমি বিয়ে করছি না।" মা বলিলেন "সেও কি কথা! আমি মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছি! কাল গায়ে হলুদ!"

"কেন তুমি আমায় না বলে কয়ে এতোকাণ্ড করেছ? একি অন্যায় কথা! আমায় একবার জানাবারও দরকার হলো না? তা বেশ করেছো আমি বিয়ে কিছুতেই করছি না।" মা রাগিয়া বলিলেন "তবে যা খুসী তাই করোগে বাছা! আমার যেমন মরণ নেই তাই তোমাদের কথায় থাকতে গেছলুম। আমি দাসী বাঁদি আমি কোথাকার কে যে আমার কথা থাক্‌বে। ঘাট হয়েছে আর কখনো কিছু বল্‌বোনা বাছা; বৌকে এনে তোমাদের ঘরকন্না সব বুঝে নাও, আমি চলে যাই।"

মা নিজের ঘরে গিয়া ঝনাৎ করিয়া খিল দিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে ফিরাইতে গেলাম না। আমি তো অপরাধী নই, একজন মানুষের হৃদয় দুইভাগ করা সম্ভব নয়, বিবাহ এক-জনকে ভিন্ন দুইজনকে করা যায় না। এ বিবাহ অসম্ভব, ইহাতে আমার যত লাঞ্ছনা সহিতে হয় সহিব, বিবাহ করিতে পারিব না।

সমস্ত রাত জাগিয়া চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। চাঁদ ডুবিয়া গেল, নক্ষত্র সকল ক্রমে ক্ষীণজ্যোতি হইয়া আকাশের অনন্ত নীলিমার মধ্যে মিলাইয়া পড়িতে লাগিল, রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার শব্দ উঠিল, আমি ঘরে আসিয়া ক্লান্ত মস্তক বাম হস্তে রক্ষা করিয়া বিছানার উপর পড়িলাম। ক্রমে চোখ তন্দ্রায় জড়াইয়া পড়িল হঠাৎ ঊষাকালে জানালার দিকে চুড়ির শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, পাশের বাড়ীর ঠিক সম্মুখের ঘরেই কি একটা কাজ লইয়া হিরণ্ময়ী প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দিদি তাহাকে ধরিয়া কানে কানে কি একটা বুঝি তামাসা করিতেছে, তাই দুজনে একটু সোহাগের টানাটানি হইতেছিল। সহসা আমার উপর চোখ পড়ায় সে একটুখানি সলজ্জ মধুরহাসি হাসিয়া পরমুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল।

হয়তো জ্বালানই হয় নাই, নয়তো নিবিয়া গিয়াছে। গোলমাল ও হায় হায় শব্দে বুঝিলাম আমিই ইহার কারণ। সম্মুখেই কে একজন ভৃত্যদের প্রতি কি আদেশ প্রচার করিতেছিল আমি তাহাকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"বিয়ে হয়ে গেছে?" সে ব্যক্তি চমকিয়া আমার দিকে ফিরিয়া কহিল 'কে বিপিন বাবু না?' চিনিলাম ইনি কর্ত্তার বড়ছেলে ননিবাবু। ননি ডাকিল "বাবা!"

তারপর আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। পথের মধ্যেই গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, তিনি গভীর আনন্দে যেন আকাশের চাঁদ পাইয়াছেন এমনি ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"তুমি এসেছ! আঃ আমি বাঁচলুম! আর একটু হলেই আমার সর্ব্বনাশ হচ্ছিল! এসো এসো!"

আমি সদৃঢ়ভাবে বলিলাম "এখনও সময় আছে আপনি অন্য পাত্র সন্ধান করুন, আমি বিবাহ করিতে পারিবনা।"

"কি তুমি পারবে না? জুয়াচোর, ছোটলোক, এমনি করে ভদ্রলোকের জাত নষ্ট করা! জীন তোমায় পুলিশে সোপর্দ্দ করবো—"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলাম "আমার কি দোষ? আপনি একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরামর্শ করে অনর্থক আমার ঘাড়ে এই দায় চাপাতে বসেছেন, আমাকে পূর্ব্বে কি ঘুণাক্ষরেও কিছু জানান হয়েছিল, জুয়াচুরি ধরিতে গেলে আপনিই জুয়াচোর!"

হীরালাল বাবু একেবারেই নরম হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে এসো, অবস্থা দেখেও যদি তোমার দয়া না হয় তাহলে যা ইচ্ছা করো।"

এই বলিয়া আমাকে লইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেটা সম্প্রদান গৃহ। সেই ঘরে শালিগ্রাম শিলা সম্মুখে লইয়া এক সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় পুরোহিতের পার্শ্বে রক্তবর্ণের বারাণসী চেলী পরিয়া ষাট কি তাহার চেয়েও দু এক বৎসরের অধিক বয়স্ক এক ব্যক্তি বরের আসনে বসিয়া আছে। তাহার নরকঙ্কালের মত জীর্ণ বক্ষপঞ্জরের উপর এক ছড়া খুব মোটা ফুটন্ত মল্লিকার গোড়ে মালা দুলিতেছিল। আমি দেখিয়াই শিহরিয়া দুই পা পিছাইয়া গেলাম। হীরালাল অন্যদিকের দ্বার খুলিয়া আমায় যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, কলের পুতুলের মতন আজ্ঞা পালন করিলাম। দেখিলাম চেলির শাড়ীপরা কনে পিঁড়ির উপরে বসিয়া আছে, আরো দুই চারি জন পুরমহিলা তাহার চারি দিকে ঘেরিয়া অস্ফুট বিলাপ বাক্যে বলিতেছিল—

মাগো হিরণের ভাগ্যে কি এই ছিল! তার চেয়ে কেন সে আইবড় রইল না।" হীরালাল বাবু কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "মা হিরণ! আমায় অভিসম্পাত করিস নে মা; তোকে বাধ্য হয়েই আমায় রামু খুড়োর হাতে দিতে হলো, ইনি কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হলেন না। আর তো স্বঘর পাত্র কোথাও পেলেম না, আমি কি করবো!"

হিরণ্ময়ী মুখ তুলিয়া করুণনেত্রে বাপের দিকে চাহিল, দেখিলাম চন্দন চিত্র ভাসাইয়া তাহার আরক্ত কপোল বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘরের মধ্যের একটা স্ফুটতর বিলাপ কাতরোক্তি ঢাকিয়া ফেলিয়া একজন রমণী উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন,

"ওগো তোরা আমার হিরণকে এর চেয়ে শ্মশান ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়ে আয়গো, এমন করে জীয়ন্তে দগ্ধ করিস্‌নে।" হীরালাল বাবু অশ্রুরুদ্ধ কাতরনেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। আমি আতঙ্কে বলিয়া ফেলিলাম "আমি সম্মত, আমি বিয়ে করতে সম্মত। "কন্যাকর্ত্তা সাগ্রহে আমায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন" এসো আর সময় নাই।"

প্রত্যুষে কাহারো আপত্তি না মানিয়া বিবাহের কাপড় বদলাইয়া ফেলিয়া ষ্টেশনে গেলাম। হুগলী পৌছিয়া নৌকায় হালিসহরে যাইব, ঘাটে অত্যন্ত গোলমাল ও জনতা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসেচ্ছু হইয়া নিকটে গেলাম। শুনিলাম কাল একটি স্ত্রীলোক ও একজন বৃদ্ধ লোক বৈকালে গঙ্গাপার হইতেছিল সেই সময় অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া তাহাদের নৌকা ডুবি হইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে আমার বক্ষের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোত জমাট বাঁধিয়া গেল। উৎকণ্ঠাকে কোন মতে রুদ্ধ রাখিয়া যেখানে মৃতদেহ ঘেরিয়া লোক জমা হইয়াছিল, সেখানে গেলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম শত বজ্রাঘাতের চেয়েও তাহা অসহ্য, সেই স্পন্দহীন, প্রাণহীন পরিত্যক্ত দেহ আমারি অভাগিনী পত্নী মন্দার! সে মুখে শান্তির নিবিড় ছায়াতল হইতে যেন উপহাসের মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিয়া সগর্ব্বে বলিতেছিল—

"আমি সহিব না বলিয়াছিলাম, দেখো দেবতাও আমার সে প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিতে সহায় হইয়াছেন! আর তুমি অবিশ্বাসী; তোমার প্রতিজ্ঞা এখন কোথায় ভাসিয়া গেল!" সমস্ত পৃথিবী তখন আমার চোখে ঘুরিতেছে! নিজের অক্ষমণীয় অপরাধের ভারে মৃতমুখের দিকে চাহিতেও যেন আমার সাহস ছিল না। সে জীবিত থাকিলে হয়তো ঠিক সবটাই আমার অপরাধ বলিয়া ধরিতাম না, কিন্তু এখন যেন কোথাও ইহার ক্ষমা খুঁজিয়া পাইলাম না।

মন্দা গেল, আবর্ত্তমান কালের প্রবাহে পরে পুত্র কন্যা বধূজামাতা পরিবৃতা হিরণ্ময়ীও তাঁহার সোণার সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! মন্দার শোক ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া মিলাইয়া আসিয়াছিল, হিরণের শোক ও স্মৃতি এখনও এই জীর্ণ পঞ্জরের স্তরে স্তরে কাঁটার মতন বিঁধিয়া রহিয়াছে।

আজ আবার কত দিন পরে অতীতের ধূলিজাল সরাইয়া একখানা পুরাতন পর্দ্দা যেন এই একটিমাত্র স্নিগ্ধস্পর্শনে খসিয়া পড়িল। আজ আবার যেন মনের মধ্যে সেদিনকার শোক-নৈরাশ্য এবং অনুতাপের চিত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ আর তাহা তেমন করিয়া দগ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। আজ সেই বিষাদের মাঝখানে একটু সাফল্যের আনন্দও অনুভূত হইল। সেদিন যে হাহাকার বুকে বহিয়া অপরাধের কালিমালিপ্ত মুখে ডাকিয়াছিলাম— "একি করিলে ভগবান্! হিরণ্ময়ীকে আমায় কেন দেখাইলে?" আজ এই শরতের হৈম-প্রভাতে দৌহিত্রী শৈলের দিকে চাহিয়া বলিতে সক্ষম হইলাম, তুমি মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটাও তাহা তাহারি শুভের জন্য। তুমি ধ্রুব, তুমি শুভ, আমরা তোমায় চিনি না তাই তোমার কার্য্যকেও চিনি না।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

সন্ধ্যা।

অসীম মমতাময়ী জননীর মত
হে সন্ধ্যে গভীর প্রেমে আঁখি করি নত
সুদূর পশ্চিম হ'তে শঙ্কিত চরণে
ধীরে ধীরে চলে এস ; স্নেহ আলিঙ্গনে
অলস তনয়ে তব করিয়া বেষ্টন
সযতনে রেখে দাও চিরপুরাতন
তব অন্ধকারে ; ধরার কঠিন রীতি
সদাই লইছে কাড়ি হৃদয়ের প্রীতি
শান্তি আশা নিদ্রা-তন্দ্রা ; এসো গো হেথায়।
তব কোলে রাখি মাথা প্রশান্ত আশায়
ঘুমায়ে পড়িব আজি ; যে দারুণ ব্যথা
হৃদয়ে রয়েছে লাগি, শুধু তব কথা
প্রসন্ন স্নেহের সুরে শুনালে আমায়
বহু দূর চলে যাবে ; মুগ্ধ সান্ত্বনায়
লয়ে যাও তুমি মোরে সংসার বাহিরে
অনন্ত করুণাময় বিস্মৃতির তীরে।

শ্রীতরুণরাম ফুকণ

সন্ধ্যায়—

জগতের কাজ সারি সহস্র কিরণ
অস্তমিত, ক্ষীণতেজে পশ্চিম গুহায় ;
জুড়াল ধরণী বহু সহি উৎপীড়ন ;
সুশীতল সন্ধ্যানিলে আমোদিত কায়া
ফুটিল তারকারত্ন গোধূলি ললাটে,
আরক্তিম সুষমায় রঞ্জিত আকাশ ;
ছুটিল গোপাল ছাড়ি শ্যাম শষ্পমাঠ ;
পাখী গায় নীড়ে বসি বিভুর মহিমা !
বুঝে কি তির্য্যক জাতি, গৌরব তাঁহার !
তারকা, ভাস্কর, চন্দ্র, অনন্ত শিখায়
যাঁহার অতুল কীর্ত্তি না পারে ঘোষিতে,
ক্ষুদ্র পাখী তুমি ধন্য. তব ক্ষুদ্র গীতে
তাহাই ঘোষণা কর নিখিল জগতে !
হয় যদি পুনরায় অবনী ফিরিতে,
তবে যেন প্রভু ঐ পাখীর মতন
মনোসাধে পাই তব গরিমা গাইতে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

মিলনের আশা।

যেথা তব সাথে যুক্ত এ মোর হৃদয়
সেথা লহ দয়াময় !
জীবব্রহ্ম সুখাভাবে কিবা শোভা পায়,
মন দেখিবারে চায়।
সাকার ও নিরাকার কভু একাকার
আহা হবে কি জীবনে ?
কোন্ আত্মতলদেশে, জ্ঞানসীমা শেষে
বল, যাইব কেমনে !

শুধু কামনার বলে, ভূমা নাহি মেলে,
যদি বল দাও নাথ,—
করি নিত্য উপাসনা, কঠিন সাধনা,
লব তোমার সাক্ষাৎ॥
যদি এ জীবন-নদী, না পায় জলধি,
তবু তোমার কৃপায়
দূর পরজন্মে কোন, ঘটায়ো মিলন,
রব আশায় আশায়॥

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী।

আধুনিক জাপান।

(ফরাসী হইতে)

ধর্ম্ম।

পুরাতন জাপানের যে তিনটী প্রধান ধর্ম্ম, আধুনিক জাপানে সেই তিনটী ধর্ম্ম এখনও রহিয়াছে :—শিন্তোধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও কংফুৎচু ধর্ম্ম।

শিন্তোধর্ম্ম বিশেষরূপে Kamisদিগের ধর্ম্ম—প্রেতাত্মাদিগের ধর্ম্ম। মৃত্যুর পরেও প্রেতাত্মারা জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের আচরণের উপর দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের আমোদ-আহ্লাদে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাদের দুঃখকষ্টে ব্যথিত হয়েন ; এবং তাঁহারাই প্রাকৃতিক ঘটনা সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ; তাঁহারাই জগৎকে জীবজন্তুতে পূর্ণ করেন, ক্ষেত্রভূমিকে উর্ব্বরা করেন, ঋতুপর্য্যায় আনয়ন করেন, দুর্ভিক্ষ ও উৎপাৎ-আদি সংঘটিত করেন। মঙ্গল ও অমঙ্গলের সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা যে তাঁহারা,—জীবিত ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিলে, তাঁহাদিগকে উপহার দিলে, তাঁহারা মঙ্গল বিধান করেন ; তাহাদিগকে বিস্মৃত হইলে, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলে, তাঁহারা অমঙ্গল আনয়ন করেন। শিন্তোধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষ করিয়া তাহাদের নিজ পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মাদিগের পূজা করে ; তাহার পর, নিজ বংশোদ্ভূত প্রেতাত্মাদিগকে,—পরিশেষে, সম্রাটের পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মাদিগকে পূজা করে। মিকাডোর পিতামহীর নাম "আমাতেরাসু"—তিনি উদীয়মান সূর্য্যের দেবতা। পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতির সম্মান করা, তাহাদের উচ্চ নৈতিক আদর্শকে রক্ষা করাই তাহাদের ধর্ম্মনীতি। জাপানের মৃতেরাই জীবিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। নিজ আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশে, জাপানী জাতির উদ্দেশে, প্রাণ দিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতত প্রস্তুত থাকা চাই।

ইহাই পুরাতন জাপানের আদিম ধর্ম্ম, কিংবা দেশপূজাধর্ম্ম বলিলেও হয়। এখন জাপান কতকটা য়ুরোপীয়-ভাবাপন্ন হইলেও শিন্তোধর্ম্মই জাপানে রাষ্ট্রীয়ধর্ম্মরূপে ঘোষিত হইয়াছে। আধুনিক জাপানের অনেকগুলি ব্যাপার, এই পুরাতন ধর্ম্মের মুখ্য ভাবসমূহের সহিত জড়িত।

তাহার দৃষ্টান্ত, যখন কোন রাজকর্ম্মচারীকে, তাহার মৃত্যুর পরেও, "উদীয়মান সূর্য্য" নামক উপাধি-সোপানের কোন উচ্চতর ধাপে উন্নীত করা হয়,—তখন তাহার মূলে এই ধর্ম্মবিশ্বাসটি দেখিতে পাওয়া যায় যে মৃত্যুর পরেও মানুষের প্রেতাত্মা মানুষের মধ্যেই অবস্থিতি করে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া, চীন ও কোরিয়ার পথ দিয়া, জাপানে প্রবেশ করে ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নবম শতাব্দীর আরম্ভ ভাগে। গোড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম একটা উচ্চ দার্শনিক ও নৈতিক মতবাদরূপে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়। বুদ্ধদেব এই সমস্যাটি জগতের সম্মুখে ধারণ করিলেন :—অন্যের দুঃখ কষ্ট কিরূপে নিবারণ

করা যায়? দুঃখ কষ্ট হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়? এই অনিত্য জীবনে, দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই; রোগের দুঃখ, বার্দ্ধক্যের দুঃখ, অনিত্য পদার্থসমূহ হইতে দুঃখ, মৃত্যুভয় হইতে দুঃখ। এত দিন ধরিয়া মানুষ এত অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিয়াছে যে তত বারিবিন্দু সমুদ্রেও নাই। জন্মই দুঃখের মূল; জীবনের তৃষাই জীবনের মুল। মৃত্যুর পর আমরা অন্য দেহের মধ্যে আবদ্ধ হই; আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্য অনুসারে, পুনর্জ্জন্ম হইয়া আমাদের উন্নতি অথবা অধোগতি হয়। কি করিয়া এই দুঃখময় সংসারাবর্ত্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?—জ্ঞানের দ্বারা দীক্ষিত হইলে, জগৎ সত্য নহে বুঝিতে পারিলে, তবেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যাহা সত্য, তাহাই স্থায়ী; কিন্তু এই জগতের কিছুই স্থায়ী নহে; অতএব অন্তর হইতে জীবনের সমস্ত তৃষ্ণা নির্ম্মূলিত করিতে হইবে; তাহা হইলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নির্ব্বাণ কি?—না, সমস্ত-ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইয়া আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা, যখন অব্যক্তিগত নির্ব্বিশেষ সত্তার মধ্যে বিলীন হয়, তখনই আমরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। নির্ব্বাণতত্ত্ব আমাদের বুদ্ধিতে ধারণা করা অসম্ভব, সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা ছাড়া ইহা আর কোন প্রকারে ব্যক্ত করা যায় না। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হয়। এই সুসমাচারটি বুদ্ধদেব জগতে আনিয়াছেন; বুদ্ধদেবই পরম জ্ঞানী, বুদ্ধদেবই জগতের পরিত্রাতা।

বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবর্ত্তিত হইলে পর, বৌদ্ধমতের সমগ্রতা জাপানে পূর্ণরূপে রক্ষিত হইতে পারে নাই। লোকের নিকট প্রচার করিবার সময় অন্ততঃ, নির্ব্বাণতত্ত্বকে এক পাশে ফেলিয়া রাখা হয়। মোটামোটি ধরিতে গেলে, জাপান পিতৃপুরুষের পূজা-ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছে। ৮০০ বৎসরের কাছাকাছি কোন এক সময়ে, কবদাইশী এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শিন্তোধর্ম্মের সমস্ত দেবতাই বুদ্ধের অবতার। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মৃত মনুষ্যেরা, প্রেতাত্মারূপে অবস্থিত করে—শিন্তোধর্ম্মের এই মতটির সহিত জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের ঐক্য হয়; তবে, জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম আরও এই কথা বলেন যে, সেই সকল প্রেতাত্মা, পরে আবার দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্চ নিঃস্বার্থ নীতির উপদেশ দেন এবং বলেন যে আমাদের অহংবৃত্তি অজ্ঞানতা-প্রসূত ও নিতান্তই অসার।

এতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানীদের উপর প্রভূত প্রভাব প্রকটিত করিয়া আসিয়াছে। এখনও জাপানীদের মধ্যে অনেক বৌদ্ধ আছে। ঠিক এইসময়েই আবার বৌদ্ধধর্ম্মের পুনর্জাগৃতি আরম্ভ হইয়াছে। জাপানে শিন্-শু নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু বৌদ্ধ-সম্প্রদায় আছে; গোড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যাহা ছিল, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অতিদার্শনিক, সন্ন্যাসাশ্রিত, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ মত সকল পরিবর্জ্জন করিয়া, এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের শুধু নীতিগুলিই গ্রহণ করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে ‘লৌকিক ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক উন্নতির খুব অনুকূল সন্দেহ নাই; কিয়োটো নগরে, নিসি-হঙ্গাঞ্জির মন্দিরে, এই সম্প্রদায়ের একজন

বুদ্ধিমান পুরোহিতের সহিত আমি বাক্যালাপ করিয়া সুখী হইয়াছিলাম। আমাদের Sarbonne কালেজের তিনি একজন পুরাতন ছাত্র। এই নব-বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি তাঁহার নিকট অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার কথায় এই ধর্ম্মের প্রতি আমার কতকটা অনুরাগও জন্মিয়াছিল। প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল দার্শনিক কূটতত্ত্ব, ও কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এই সম্প্রদায় আত্মোৎসর্গের নীতি, দয়ার নীতি, চারিত্র-মাধুর্য্যের নীতি স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, জাপানে শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মেরই জীবনী শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; এক্ষণে জাপানে তিন লক্ষ দেবালয় কিংবা মঠ্ এবং দেড় লক্ষ পুরোহিত কিংবা ভিক্ষু আছে; প্রায়ই নূতন নূতন মন্দির গঠিত হইতেছে; পুরাতন মন্দিরগুলিতে এখনও বহু লোকের যাতায়াত আছে; অধিকাংশ জাপানী, জাতীয় শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মেরই সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলে।

কংফুচু ধর্ম্মকে ধর্ম্ম না বলিয়া বরং একটি দার্শনিক পদ্ধতি বলাই সঙ্গত। গোড়ায় চীন হইতে উৎপন্ন হইলেও, এই দর্শনতন্ত্রটি আশ্চর্য্যরকম প্রত্যক্ষবাদাশ্রিত। যাহার বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না সেই, পরলোকের কথা লইয়া ব্যাপৃত থাকায় কি লাভ? এই পৃথিবীর ব্যাপার-সকল বুঝা এত কঠিন এবং উহা এত গুরুতর যে উহার প্রতি আমাদের সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপুরুষদিগকে পূজা করা, তাঁহাদের হইতে প্রবাহিত প্রথা ও নিয়মাদি পালন করা, বৃদ্ধদিগকে ভক্তি ও পিতামাতার সেবা করা, রাজার আজ্ঞাবহ হওয়া—ইহাই কংফুচুর সমস্ত নীতিতন্ত্র। এইরূপ ধর্ম্মের মধ্যে, না আছে জাতিভেদ, না আছে পুরোহিত। জন্ম মৃত্যু বিবাহ সংক্রান্ত গুরুতর অনুষ্ঠান সকলও পুরোহিতের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃদ্ধগণের অধিষ্ঠানে এবং পূর্ব্বপুরুষদের ধ্যানধারণায়, এই সকল গম্ভীর অনুষ্ঠানের উপর যেন একটা ধর্ম্মের ভাব আসিয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে কংফুচু ধর্ম্ম প্রথম-শতাব্দিতে জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই ধর্ম্মটি সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; এখনও কৃতবিদ্যদের মধ্যেই ইহার যাহা কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি; শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই, প্রায় তাহারই কংফচুর ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

পক্ষান্তরে, য়ুরোপীয় ধর্ম্ম—খৃষ্টধর্ম্ম, আধুনিক জাপানে আদৌ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। মিশানারিরা প্রচারকালে ধর্ম্মমতের অনেকটা বাদ-সাদ দিয়াও, অনেক চেষ্টা,—অনেক অর্থব্যয় করিয়াও অতি অল্প লোককেই খৃষ্টান করিতে পারিয়াছেন। তা ছাড়া, কোন-কোন জাপানী, পাদ্রিদের নিকট য়ুরোপীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ও বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই কিছুকালের জন্য খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, পরে আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যায়।

জাপানের কৃতবিদ্যমণ্ডলী, খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানকে খাড়া করিয়া দেয়। জগৎ হইতে,—অনন্ত জীবন-প্রবাহ হইতে পৃথক্ একজন স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এই

করা যায় ? দুঃখ কষ্ট হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায় ? এই অনিত্য জীবনে, দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই ; রোগের দুঃখ, বার্দ্ধক্যের দুঃখ, অনিত্য পদার্থসমূহ হইতে দুঃখ, মৃত্যুভয় হইতে দুঃখ। এত দিন ধরিয়া মানুষ এত অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিয়াছে যে তত বারিবিন্দু সমুদ্রেও নাই। জন্মই দুঃখের মূল ; জীবনের তৃষাই জীবনের মূল। মৃত্যুর পর আমরা অন্য দেহের মধ্যে আবদ্ধ হই ; আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্য অনুসারে, পুনর্জন্ম হইয়া আমাদের উন্নতি অথবা অধোগতি হয়। কি করিয়া এই দুঃখময় সংসারাবর্ত্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ?—জ্ঞানের দ্বারা দীক্ষিত হইলে, জগৎ সত্য নহে বুঝিতে পারিলে, তবেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যাহা সত্য, তাহাই স্থায়ী ; কিন্তু এই জগতের কিছুই স্থায়ী নহে ; অতএব অন্তর হইতে জীবনের সমস্ত তৃষ্ণা নির্ম্মূলিত করিতে হইবে ; তাহা হইলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নির্ব্বাণ কি ?—না, সমস্ত-ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইয়া আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা, যখন অব্যক্তিগত নির্ব্বিশেষ সত্তার মধ্যে বিলীন হয়, তখনই আমরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। নির্ব্বাণতত্ত্ব আমাদের বুদ্ধিতে ধারণা করা অসম্ভব, সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা ছাড়া ইহা আর কোন প্রকারে ব্যক্ত করা যায় না। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হয়। এই সুসমাচারটি বুদ্ধদেব জগতে আনিয়াছেন ; বুদ্ধদেবই পরম জ্ঞানী, বুদ্ধদেবই জগতের পরিত্রাতা।

বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবর্ত্তিত হইলে পর, বৌদ্ধমতের সমগ্রতা জাপানে পূর্ণরূপে রক্ষিত হইতে পারে নাই। লোকের নিকট প্রচার করিবার সময় অন্ততঃ, নির্ব্বাণতত্ত্বকে এক পাশে ফেলিয়া রাখা হয়। মোটামোটি ধরিতে গেলে, জাপান পৃতৃপুরুষের পূজা-ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছে। ৮০০ বৎসরের কাছাকাছি কোন এক সময়ে, কবদাইশী এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শিন্তোধর্ম্মের সমস্ত দেবতাই বুদ্ধের অবতার। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মৃত মনুষ্যেরা, প্রেতাত্মারূপে অবস্থিত করে—শিন্তোধর্ম্মের এই মতটির সহিত জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের ঐক্য হয় ; তবে, জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম আরও এই কথা বলেন যে, সেই সকল প্রেতাত্মা, পরে আবার দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্চ নিঃস্বার্থ নীতির উপদেশ দেন এবং বলেন যে আমাদের অহংবৃত্তি অজ্ঞানতা-প্রসূত ও নিতান্তই অসার।

এতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানীদের উপর প্রভূত প্রভাব প্রকটিত করিয়া আসিয়াছে। এখনও জাপানীদের মধ্যে অনেক বৌদ্ধ আছে। ঠিক এইসময়েই আবার বৌদ্ধধর্ম্মের পুনর্জাগৃতি আরম্ভ হইয়াছে। জাপানে শিন্-শু নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে ; গোড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যাহা ছিল, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অতিদার্শনিক, সন্ন্যাসাশ্রিত, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ মত সকল পরিবর্জ্জন করিয়া, এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের শুধু নীতিগুলিই গ্রহণ করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে ‘লৌকিক ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক উন্নতির খুব অনুকূল সন্দেহ নাই ; কিয়োটো নগরে, নিসি-হঙ্গাঞ্জির মন্দিরে, এই সম্প্রদায়ের একজন বুদ্ধিমান পুরোহিতের সহিত আমি বাক্যালাপ করিয়া সুখী হইয়াছিলাম। আমাদের Sarbonne কালেজের তিনি একজন পুরাতন ছাত্র। এই নব-বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি তাঁহার নিকট অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার কথায় এই ধর্ম্মের প্রতি আমার কতকটা অনুরাগও জন্মিয়াছিল। প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল দার্শনিক কুটতত্ত্ব, ও কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এই সম্প্রদায় আত্মোৎসর্গের নীতি, দয়ার নীতি, চারিত্র-মাধুর্য্যের নীতি স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, জাপানে শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মেরই জীবনী শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; এক্ষণে জাপানে তিন লক্ষ দেবালয় কিংবা মঠ্ এবং দেড় লক্ষ পুরোহিত কিংবা ভিক্ষু আছে ; প্রায়ই নূতন নূতন মন্দির গঠিত হইতেছে ; পুরাতন মন্দিরগুলিতে এখনও বহু লোকের যাতায়াত আছে ; অধিকাংশ জাপানী, জাতীয় শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মেরই সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলে।

কংফুচু ধর্ম্মকে ধর্ম্ম না বলিয়া বরং একটি দার্শনিক পদ্ধতি বলাই সঙ্গত। গোড়ায় চীন হইতে উৎপন্ন হইলেও, এই দর্শনতন্ত্রটি আশ্চর্য্যরকম প্রত্যক্ষবাদাশ্রিত। যাহার বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না সেই, পরলোকের কথা লইয়া ব্যাপৃত থাকায় কি লাভ ? এই পৃথিবীর ব্যাপার-সকল বুঝা এত কঠিন এবং উহা এত গুরুতর যে উহার প্রতি আমাদের সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপুরুষদিগকে পূজা করা, তাঁহাদের হইতে প্রবাহিত প্রথা ও নিয়মাদি পালন করা, বৃদ্ধদিগকে ভক্তি ও পিতামাতার সেবা করা, রাজার আজ্ঞাবহ হওয়া—ইহাই কংফুচুর সমস্ত নীতিতন্ত্র। এইরূপ ধর্ম্মের মধ্যে, না আছে জাতিভেদ, না আছে পুরোহিত। জন্ম মৃত্যু বিবাহ সংক্রান্ত গুরুতর অনুষ্ঠান সকলও পুরোহিতের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃদ্ধগণের অধিষ্ঠানে এবং পূর্ব্বপুরুষদের ধ্যানধারণায়, এই সকল গম্ভীর অনুষ্ঠানের উপর যেন একটা ধর্ম্মের ভাব আসিয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে কংফুচু ধর্ম্ম প্রথম-শতাব্দিতে জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই ধর্ম্মটি সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল ; এখনও কৃতবিদ্যদের মধ্যেই ইহার যাহা কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি ; শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই, প্রায় তাহারই কংফচুর ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

পক্ষান্তরে, য়ুরোপীয় ধর্ম্ম—খৃষ্টধর্ম্ম, আধুনিক জাপানে আদৌ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। মিশানারিরা প্রচারকালে ধর্ম্মমতের অনেকটা বাদ-সাদ দিয়াও, অনেক চেষ্টা,—অনেক অর্থব্যয় করিয়াও অতি অল্প লোককেই খৃষ্টান করিতে পারিয়াছেন। তা ছাড়া, কোন-কোন জাপানী, পাদ্রিদের নিকট য়ুরোপীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ও বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই কিছুকালের জন্য খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, পরে আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যায়।

জাপানের কৃতবিদ্যমণ্ডলী, খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানকে খাড়া করিয়া দেয়। জগৎ হইতে,—অনন্ত জীবন-প্রবাহ হইতে পৃথক্ একজন স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এই

আনুমানিক সিদ্ধান্তটিকে, প্রত্যক্ষবাদমূলক—গোচরবাদমূলক বিজ্ঞান পরিবর্জ্জন করে। আবার খৃষ্টধর্ম্মের "মৌলিক পাপ" ও "অনন্ত নরকের" মতবাদ—সাধারণ লোকের নিতান্তই অরুচিকর। মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই মন্দ, জাপানীরা একথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। এ কথা তাহারা বুঝিতে পারে না যে,—কতকগুলি লোককে বাছিয়া লইয়া, বাকী সমস্ত মনুষ্যকে অনন্ত নরকে নিঃক্ষেপ করিবার জন্যই ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। —সপ্তদশ শতাব্দির আরম্ভে, Francois xavier-এর নিকট জাপানীরা এই ধরণের কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল:—যদি ঈশ্বর নরক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন; আবার যদি তিনি অগত্যা নরক সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন। যে সকল পাদ্রি, প্রচারের জন্য জাপানে প্রথমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ তর্কবিতর্কে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তরবর্ত্তী প্রচারকেরাও এই কঠিন ধর্ম্ম-সমস্যার কি কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সে যাহাই হউক, এ কথা ঠিক্ যে, জাপানীরা এখনও খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা তাহাদের পুরাতন ধর্ম্মেরই পক্ষপাতী।

আদর্শ-জননী।

আইলা যখন বীর করিতে বন্দন
পুলকে জননী পদ, জননী তখন
কহিলা গম্ভীরে—"জননী জনমভূমি
সমান দোঁহার মূল্য জান পুত্র তুমি!
জনম ভূমির তুমি করি অপমান
এসেছ আমারে বৎস দেখাতে সম্মান!
যে জন দেশের শত্রু, শত্রু সে আমার—
এ চরণে তব পুত্র নাহি অধিকার!" *

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

* কেয়স্ মারসিয়স্ করিওলেনস্ (Caius Marcius Coriolanus)—রোমের একজন বিখ্যাত পেট্রিসিয়ান্ সৈন্যাধ্যক্ষ। (Patrician General.) কোন কারণ বশতঃ তিনি স্বদেশ হইতে পলায়ন করেন এবং ভলসিয়ান (Volscian) দিগের সহিত যোগদান করিয়া স্বদেশের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য চালনা করেন। যখন তিনি রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রোমবাসী অত্যন্ত ভীত হইল এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বহু চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে তাঁহার মাতা ও পরিবারবর্গ শোক চিহ্ন পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। করিওলেনস্ জননীকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু জননী সতেজে বলিয়া উঠিলেন "Dont kiss me till I know whether you are an enemy or a son" "আমাকে চুম্বন করিও না, যতক্ষণ না আমি জানিতে পারি, তুমি শত্রু কিম্বা পুত্ররূপে আসিয়াছ।" উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কবিতাটি রচিত।

ভারতের ডাক প্রথা।

সুচারুভাবেই হউক আর বিশৃঙ্খলভাবেই হউক, মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের আমলেই এদেশে ডাক-প্রথার প্রথম সৃষ্টি হয়। সম্রাট বাবরের চিঠিপত্র থানেশ্বর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত রীতিমত মোহর করিয়া, চর্ম্মনির্ম্মিত থলির ভিতর পুরিয়া হরকরাগণ বহিয়া লইয়া যাইত, এরূপ প্রমাণ আছে। সম্রাট হুমাউনের সময়েও এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল। সম্রাট সেলিমের আমলে ঘোড়ার ডাক চলিত তাহার বহু অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। মোগল কুলতিলক সম্রাটপ্রবর আকবরের সুখময় রাজত্ব কালে, সুবুদ্ধিমান হিন্দু মন্ত্রিদিগের পরামর্শ মতে একপ্রকার নূতন প্রথার ডাক সৃষ্টি হইয়াছিল, অনেকে বোধ হয় তাহা অবগত নহেন। এই প্রথায় মনের কথা সম্পূর্ণ ভাবে অভিব্যক্ত হইত না সত্য কিন্তু যে উদ্দেশ্যের জন্য এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। একটা পর্ব্বতের উচ্চশিখরে এক ব্যক্তি একটা সুবৃহৎ কাচ হাতে লইয়া দাঁড়াইত, ঐ প্রকাণ্ড কাচের এক দিক অতীব উজ্জ্বল লোহিত রঙে এবং আর এক দিক "জিয়াফৎ" নামক পাতার রসে মাখান থাকিত। পাহাড়োপরি দণ্ডায়মান লোকটা যদি লাল দিকটা দেখাইত তাহা হইলে দূরবর্ত্তী অপর পাহাড়ের লোকেরা তাহা দেখিয়া স্থির করিয়া লইত, শস্যের মূল্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। যদি জিয়াফৎ রং দেখাইত তাহা হইলে বুঝিত শস্যের মূল্য কম হইয়া গিয়াছে। জিয়াফৎ পাতার রস কোন দ্রব্যে মাখাইয়া রৌদ্রে ধরিলে তাহা সোণার ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বলপ্রভা-সমন্বিত হইয়া উঠে, এইজন্য হিন্দু বণিকেরা অতি পুরাকাল হইতে ঐ পাতার রস এপ্রকার সংবাদপ্রেরণে ব্যবহার করিতেন। এইরূপে পাহাড়ে পাহাড়ে সমাচার পৌঁছিয়া অবশেষে নগরে নগরে সম্বাদটি বিস্তৃত হইত, ক্রমে গ্রামের মহাজন, আড়তদার, সওদাগর ও সাধারণ লোকমধ্যে ইহা প্রচারিত হইত। কিন্তু ইহাতে পত্রের কার্য্য হইত না, পত্রাদি বহনের জন্য আকবর বাদসাহের সময়ে ঘোড়ার ডাকের প্রথা বিদ্যমান ছিল। পাঠান সম্রাট সেরসাহ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে ডাকের সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করেন। পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা সমুদয় ভারতবর্ষে অথবা ইহার প্রধান প্রধান স্থান সমূহে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে সর্ব্বত্র এক প্রাচীন ও প্রশস্ত সরকারী বর্ত্ম দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। এই রাস্তা প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। ইহার শাখা প্রশাখা অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হরিদ্বার, তীর্থক্ষেত্র যাইবার পথে রুড়কি নাম্নী নগরী মধ্যে গঙ্গার খালের ধারে ইহার পরিসমাপ্তি। তথায় একটা পাথরের উপর ইংরাজী ভাষায় বড় বড় অক্ষরে খোদা আছে Here ends the Old Grand Trunk Road—এইস্থানে পুরাতন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সমাপ্ত হইল। বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত এই রাস্তার আদি ভাগ; এই রাস্তা সম্রাট সেরশাহ সর্ব্বপ্রথমে ডাকের সুবিধার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ডাকবাহকগণের এবং পথিকদিগের সুবিধার জন্য সুপণ্ডিত

ও বদান্য সেরসাহ এই সুদীর্ঘ পথের পার্শ্বে অত্যুচ্চ মহীরুহ, সুগভীর কূপ, পান্থশালা, নেমাজ পড়িবার "দর্গা" প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই রাস্তা দিয়া সরকারী চাপরাসীরা ডাক বহিয়া লইয়া যাইত এবং বিশেষ "জরুরি" সমাচার হইলে অশ্বারোহীরা বহন করিত। সম্প্রতি বিলাতের জগদ্বিখ্যাত "টাইম্‌স্‌" সংবাদপত্রের পরিচালকগণ Historians' History of the world নামক যে বিরাট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহার দ্বাবিংশ খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—During the sovereignty of Sher-Sha, constant communication between the capital and the remote cities was maintained by a system of footrunners whose aggregate speed said to have surpassed that of a swift horse. বুম্‌ফিল্‌ড সাহেবের Annals of the Lower Provinces of Bengal নামক গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় "মুসলমানদের শাসনকালে ঘোড়া ও মানুষ এই দুই উপায়ে ডাকের কার্য্য সম্পন্ন হইত, কিন্তু যদি কোন উচ্চশ্রেণীর নবাব বাহাদুর সম্রাটপ্রবরকে কোন পত্র পাঠাইতেন তাহা হইলে সুবর্ণনির্ম্মিত হাওদায় ঐ চিঠি বাহিত হইত। যে সে ব্যক্তি পত্র দিলে যদিও তাহা ডাকখানা গ্রহণ করিত না কিন্তু জমিদার, তালুকদার, সর্দ্দার, পত্তনিদার, হাফেজ, হাজী, মৌলবী, ইমাম, কাজি, কোতায়াল, সুবেদার, ফৌজদার, আড়তদার, মুন্সী, উচ্চশ্রেণীর বণিক বা ব্যবসায়ী, মহাজন, শেট, রাজপুরোহিত কিম্বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চিঠি পত্র দিলে তাহা সরকারী ডাকখানা গ্রহণ করিত। যে সকল স্থানে ডাকঘর ছিল, উহাতে সম্ভ্রান্ত পথিকেরাও আশ্রয় গ্রহণ করিবার অধিকারী ছিলেন। ইউরোপীয়েরা, বিশেষতঃ ইংরাজেরাও এদেশে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ঐ ডাকঘরগুলিকে কয়েক বৎসরের জন্য পোষ্টাফিসরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেকালে জঙ্গলী লোকেরা প্রায়ই ডাকবাহকের কার্য্য করিত। সাঁওতালেরা এই কার্য্যে অত্যন্ত "পাকা" ছিল। পার্ব্বত্য সাঁওতাল জাতির মধ্যে অদ্যাপি একটা পুরাতন ডাকের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার নাম "বেড়ু"। পার্ব্বত্য রাজাদের শাসনে থাকিয়া ইহারা অত্যন্ত দ্রুতপদে ও দক্ষতা এবং সাবধানতার সহিত ডাকের কার্য্য সম্পন্ন করিত। ইহারা মাসে তিন টাকা বেতন এবং ৪টা মুর্গী বা মোরগ "বক্‌শিস্‌" পাইত। সর্দ্দার বাহকগণ (Runner) এতদ্ব্যতীত প্রতিমাসে ৶ সের লবণ এবং ১২ সের চাউল অধিক প্রাপ্ত হইত।

খৃষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দ হইতে রাউল্যাণ্ড্ হিল সাহেব বিলাতে যে প্রথার প্রচলন করেন, আমাদের দেশের আধুনিক ডাকখানার তাহাই আদর্শ। ঐ বৎসরে ডিউক অব্ রিচ্‌মণ্ড্ নামক ইংলণ্ডের মহা ঐশ্বর্য্যশালী ও সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পুরুষ ডাকঘরের ভার গ্রহণ করিয়া পোষ্টমাষ্টার জেনেরেলের কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয়েন। তিনি ১৮৩৯ অব্দের ১৭ই আগষ্ট দিবসে এই বিষয়ের এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লয়েন। এই আইনবলে বৃটিশাধিকৃত প্রায় সমুদয় রাজ্যে ডাকঘরের সৃষ্টি হয় এবং সুবুদ্ধিমান হিল সাহেবকে তদানীন্তন পার্লামেণ্ট প্রায় দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক ও নাইট উপাধি দান করেন। এই আইনের বলে বিলাতের

সুবিখ্যাত ও সুরম্য ডাক প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় এবং স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডদেশের সহিত ইংরেজের সদ্ভাব সুদৃঢ় হইয়া যায়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ডাক টিকিটের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হয়; ১৮৪১ অব্দে মণিঅর্ডার, ১৮৪৮ অব্দে বুকপোষ্ট, ১৮৬১তে সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক এবং ১৮৭৩তে টেলিগ্রাফ বিভাগের জগৎমনোমোহক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমেরিকায় ১৮৫৩ অব্দের পূর্ব্বে ডাকঘরের প্রথা অতীব অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া বোধ হয়। ফ্রান্সদেশে যাহা কিছু সুবন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা ইংলণ্ডের অনুকরণ বলিলেই হয়। জর্ম্মনিদেশে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মেতিয়াশের শাসনকালে কাউণ্ট ডি ট্যাকশীষ নামক ধনবান জমিদারের বুদ্ধি কৌশলে এক্ প্রকার ডাকপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু ১৮৪১ অব্দের পূর্ব্বে তথায় রীতিমত ডাকঘর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হলণ্ড, হঙ্গেরী, ইটালী ও রুসিয়াদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত ঘোড়ার পৃষ্ঠে হরকরাগণ ডাক বহিয়া লইয়া যাইত। ইউরোপের সর্ব্বত্র ডাকঘরের সুচারু বন্দোবস্ত হইবার পরে জনসাধারণের পত্রাদি প্রাপ্তি ও প্রেরণের কিরূপ আশ্চর্য্য সুবিধা হইয়াছে, নিম্নলিখিত একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাদ্বারা পাঠক মহাশয়েরা তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। ইউরোপের জনসংখ্যার মধ্যে প্রত্যেক সহস্র ব্যক্তি গড়ে এই পরিমাণে পত্র প্রাপ্ত হয়েন।

	১৮৫৩ সালের পূর্ব্বে। (প্রত্যেক মাসে)	১৮৫৩ হইতে ১৯০৬ অব্দ পর্য্যন্ত। (প্রত্যেক মাসে)
সুইজর্লণ্ড	৮২৩৯	১৩৪৫৩
আমেরিকা	৪৪০৪	১৬১৬১
হলণ্ড	৪৩৬৭	৭৬০৯
বেলজম্	২৬১৩	৫০১১
ইংলণ্ড	৭০৫৫	১৯০৫৩
রুশিয়া	৪১৩২	৯৯৭১
ইটালী	৩৯৮১	৫০৯২
ফ্রান্স	৪৪০৪	৯০৮২

বৃটিশ ভারতে যদি প্রজার সংখ্যা ২৬ কোটী ধরা হয় তাহা হইলে গড়ে প্রত্যেক লোক নিম্নলিখিত সংখ্যায় প্রতি সালে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন।

	১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বে	১৯০৫ অব্দে
বাঙ্গালা মায় বেহার উড়িষ্যা ও আসাম	প্রতি ১৷৵ মাসে একখানি	প্রতি মাসে ৭৷০ খানি
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	প্রতি দুই মাসে একখানি	প্রতি দুই মাসে ৯৷ খানা
মান্দ্রাজপ্রদেশ	প্রতি আড়াই মাসে একখানি	প্রতি আড়াই মাসে তিন খানি
মধ্যভারত	প্রতি চার মাসে একখানি	প্রতি মাসে ৫৷ খানি
মধ্যপ্রদেশ	বৎসরে তিন খানি	বৎসরে ৮ খানা
রাজপুতানা	৯৷ মাসে একখানি	বৎসরে আড়াই খানা
পঞ্জাব	৫৷ মাসে একখানি	সাড়ে পাঁচ মাসে ৪ খানি
পশ্চিমাঞ্চল মায় অযোধ্যা	প্রতি তিন মাসে একখানি	প্রতি মাসে আড়াই খানা

ভারতবর্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট খৃষ্টিয় ১৮৪১ অব্দে সর্ব্ব প্রথম ডাকের বন্দোবস্ত করেন। তখন ডাকের টিকিট ছিল না এবং গ্রামের কোতোয়াল (থানার দারোগা) গণের অধীনে ডাকবিভাগ সংস্থাপিত ছিল। দুরত্ব অনুসারে পত্রপ্রেরকের নিকট হইতে অগ্রিম দাম লইয়া চিঠি গ্রহণ করা হইত। তখন অধিকাংশ স্থানে বলদ-শকটে ডাক বাহিত হইত। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত এই ডাক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাওড়া হইতে রাণিগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে পর, এইটুকু স্থানের পত্রাদি রেলগাড়ীতে যাইত, বাকী স্থানে শকটেরই বন্দোবস্ত ছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ডাকপ্রথার প্রচলিত হয়। তখনও থানার পার্শ্বে ডাক থাকিত, কিন্তু ১৮৬৭ অব্দ হইতে থানার সহিত ডাক বিভাগের সম্পর্ক একেবারে রহিত হইয়া যায়। কিন্তু তখনও পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উষ্ট্রের ডাক বন্ধ হয় নাই। মিয়ানমীর হইতে পেশোয়ার, দালগুরাবাদ হইতে শিয়ালকোট, অমৃতসহর হইতে পাঠানকোট, কর্ণাল হইতে দিল্লী, জোনপুর হইতে কাশী, কণোজ হইতে ফৈজাবাদ, জব্বলপুর হইতে নাগপুর, অম্বালা হইতে সিমলা, ইন্দোর হইতে খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থানে উটের ডাক চলিত। বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলায় সর্ব্ব প্রথমে রেলের সৃষ্টি হয় সুতরাং এইখান হইতেই প্রথমে রেলপথে ডাক চলিতে আরম্ভ হয়। কোন কোন স্থানে অশ্বতর নামক পশুর পৃষ্ঠে ডাক বাহিত হইত। কয়েকটি স্থানের নামোল্লেখ করিতেছি—কারাগোলা হইতে সিলিগুড়ি, মোরাদাবাদ হইতে কোলাহুংগু, আলমোরা হইতে নইনিতাল, এটা-নগরী হইতে মৈনপুরী, মেদিনীপুর হইতে সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি।

ক্রমে ক্রমে ডাকবিভাগের এমন অসাধারণ উন্নতি হইতেছে যে, গতবর্ষে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় ১৯২ কোটি পত্র বিলি হইয়া গিয়াছে এবং সমুদয় খরচ বাদে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর একাদশ সালের মধ্যে নয় কোটির অধিক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে ভারত-সমুদ্রোপরিস্থিত সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে ছয় দিনে চিঠি যায় এবং কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ হইতে পাঁচ দিনে পত্র আইসে। কলিকাতা হইতে সিমলা পাহাড়ে ৪৯ ঘণ্টায় এবং ঊনবিংশ দিনের মধ্যাহ্নকালে লণ্ডননগরে আমাদের চিঠিপত্রাদি পৌছে। ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী প্রতিমাসে ডাক বিভাগের জন্য গড়ে অর্দ্ধ পয়সা ব্যয় করিতে বাধ্য হয়েন। ডাকঘরের অধীনে ১৯০৪ অব্দে ১৮৫৯টা তার আফিশ ছিল, ১৯০৭ অব্দে তিন সহস্রের অধিক হইয়াছে। এই তিন হাজার তার কার্য্যালয়ে ১৯০৭ সালে ৩৯ লক্ষ সমাচার পৌঁছিয়াছিল এবং এখান হইতে ২৭ লক্ষ সমাচার বিলি হইয়াছিল। সম্বাদগুলি প্রেরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ৩৪ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়েন। এখন ডাকঘরে চিঠি পত্রাদি ছাড়া টেলিগ্রাম, প্যাকেট, পার্শেল, রেজেষ্ট্রী, ইনসুরেন্স, সেভিংস ব্যাঙ্ক, কোম্পানীর কাগজের ক্রয় বিক্রয়, কুইনাইন বিক্রয়, জাহাজের টিকিট বিক্রয়, মণিঅর্ডার, ভেলুপেয়েবল, প্রভৃতি কত রকমের যে বন্দোবস্ত আছে তাহার ঠিক নাই।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মেয়ে-যজ্ঞি।

মেয়েযজ্ঞি বলিলেই বুঝিতে হইবে বিশৃঙ্খলার সমষ্টি! প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, মলের রুণু ঝুনুতে, চুড়ির ঝন্ ঝন্ শব্দে যজ্ঞিবাড়ী সরগরম। পিছলে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, অথচ হাতে অনেক কাজ তাড়াতাড়ি করিতেই হইবে—সুতরাং কেহ আছাড় খাইয়া লোক হাসাইতেছে,—কাহারও ঢাকাই সাড়ীতে কাদা লাগায় মন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছে, কোন ছেলে "সন্দেশ খাব রে" বলিয়া সেই কাদাতেই গড়াগড়ি দিতেছে।

একটী ঘরে বড় বড় বঁটি পাতিয়া সধবা, বিধবা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, কুৎসিতা, সুন্দরী মহিলারা তরকারী কুটিয়া ঝুড়ি ঝোড়া বোঝাই করিয়া দিতেছেন হাসি গল্পের বিরাম নাই। বাঙ্গালীর মেয়েরা প্রত্যেকেই ইংরাজ মহিলাদের মত সুস্বরের প্রতি মনোযোগিনী নহেন, সুতরাং কেহ বা কোকিল কণ্ঠে কেহ বা মোটা গলায় উচ্চস্বরে কথা কহিতেছেন।

শিশু সন্তান আসিয়া মাতাকে বিরক্ত করিতেছে—অনেকক্ষণ মায়ের ভ্রূক্ষেপই নাই—হাতে কাজ মুখে গল্প ঠোঁটে হাসি—যখন ছেলে পঞ্চম স্বরে—'মা খাবার দেনা আ-আ'—বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে দু একটা চড় দিল বা মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল—তখন মা, 'আ মোলো যা হতভাগা ছেলে, তর সয় না', বলিয়া ক্ষুদ্র হাতের মৃদু চড়ের ঋণ সুদশুদ্ধ ফেরত দিয়া আবার গল্পে মনোনিবেশ করিলেন! কেহ বা 'এই যে বাবা দিচ্ছি, খাবার দিচ্ছি চল, ক্ষিদে পাবেই ত', বলিয়া গল্পের হারাণ-খেই খুঁজিয়া লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলে কাঁদিয়া 'যজ্ঞি বাড়ী' বলিয়া জানান দিতে লাগিল।

আর একটা ঘরে বালিকারা ও ছোট ছোট বধূরা পান সাজিতেছে; ঘোমটার প্রান্তে হাসিমাখা লাল লাল ঠোঁটের উপর নোলকটি ঝুলিতেছে। হাত দুখানি চুণ খয়েরের দাগে রঞ্জিত; মাঝে মাঝে নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকলের বিষম ভাবনা হইতেছে যে এই হাত লইয়া কেমন করিয়া লোকের সামনে বাহির হইবে—কেহ বা "কি করে এ দাগ উঠবে ভাই" বলিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছে। কেহ বা দাগ উঠিবার উপায় বলিয়া দিতেছে। এই ঘরে শিশুর কলরব বড় একটা নাই,—যদি কোন শিশু "দিদি নে-না" বলিয়া আসিতেছে অমনি তাহার 'দিদি' 'যা যা ঐ ঘরে মা আছে যা' বলিয়া সদাই বিদায় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে।

এমন সময় ডাক পড়িল "ওরে এই বেলা সবাই ভাত খেয়ে নে-না গো—এখনি যে সব মেয়েরা আসতে আরম্ভ করবে, দুটো বেজে গেছে।"

দালানে সারি সারি কলা পাতায় ভাত ও পাঁচ সাত প্রকার তরকারি একটু একটু দিয়া পাতা সাজান আছে,—ভাত শুকাইয়া চাল হইতেছে, যে আসিতেছে সে বসিতেছে। কেহ ডাকিতেছে 'ও সেজ বৌ আয় না'—কেহ ডাকে 'নদিদি শীগ্গির নে না ভাই খেয়ে, না হলে যে কারো চুল বাঁধা হবে না।' কাহারও ডাকাডাকিতে সাড়া নাই, পাতা পড়িয়া আছে। যাহাদের অর্দ্ধেক আহার হইয়াছে তাহারা ডাকিল 'ও ঠাকুর আর কি আছে নিয়ে

এস না।' ঠাকুর এক পিতলের হাতা লইয়া আসিয়া সকলকে এক এক হাতা দিয়া গেল। "ও ঠাকুর এদিকে এদিকে" "ও ঠাকুর আর একখানা মাছ ভাজা দাও না।" "ও ঠাকুর মাছের ঝোলের মুড়োটা লক্ষ্মীর পাতে দাও—কাঁটার মাছ একখানা খুঁজে দাও ত।" ঠাকুর পরিবেশনে আসিলেই বধূরা ঘোমটার মাত্রা বাড়াইয়া হাত গুটাইয়া আহার বন্ধ করিতেছে, মেয়েরা চাহিয়া চাহিয়া খাইতেছে।

ভাত খাওয়ার পালা শেষ হইতে না হইতে একে একে নিমন্ত্রিতারা আসিতে আরম্ভ করিলেন। একজন তাঁহাদের দেখিয়া "ঐরে কারা এল, ওঠ ওঠ আর দই খায় না।" কেহ ত্রস্তে উঠিয়া পড়িল, কেহ গল্প বন্ধ হওয়ায় এইবার ভাল করিয়া কাজে মনোনিবেশের অবসর পাইয়া, দইটা বেশ হয়েছে জেঠাই মা, আর এক খুরি দাও ত, বলিয়া প্রচুর দই খাইয়া লইল। একটী করিয়া শিশু প্রায় সকলের পাশে আছেই—কারো পাশে বা দুটি। মা এখন বিশেষ মনঃসংযোগে ছেলেকে আহার করাইতে লাগিল, কেহ উঠিতে বলিলে বলে, এই যে ছেলেটা খাচ্ছে, খাওয়া হোক্ উঠি। নিজেও যে না খাচ্ছেন এমন শপথ করা যায় না।

এদিকে ত্বরিতাগত মহিলারা আপাদমস্তক বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া জড়ভরতের ন্যায় উচ্ছিষ্টের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন—কোন দিকে যাই। গৃহিণীরা দুই সন্দেশের হাঁড়ী হাতে পরিবেশনে ব্যস্ততার সহিত বলিতেছেন "এস এস—চল চল উপরে চল"। কিন্তু উপরের সিঁড়ির সন্ধান কে দেয়? সুতরাং নিমন্ত্রিতারা দাঁড়াইয়া আহার দেখিতেছেন। ইহাতে ২।১ জন শীঘ্র আহার শেষ করিয়া—পিসিমা যেন কি, এঁদের নিয়ে বসাও না গা, বলিয়া হাত ধুইতে গেল। তাহারা যখন হাত ধুইয়া আসিল তখন আরও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছেন। তখন একজন "আসুন আসুন আপনারা এই দিকে এখন আসুন"—বলিয়া উপরে লইয়া একটী ঘরে বসাইলেন। যাহারা পূর্ব্বের পরিচিতা তাহারা আসিয়া সিঁড়ি, ঘর, মাজুর খুঁজিয়া লইয়া একরকম বসিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মহিলারা প্রায়ই পরস্পরে পরস্পরের অপরিচিত;—মূক ও বধিরের ন্যায় বসিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন। যদি কেহ কাহাকেও পরিচিতা পাইয়া থাকেন তবে তিনি দুই এক কথা কহিয়া সকলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

এমন সময় গৃহিণীদের কাহারও বন্ধু অথবা মেয়েদের শ্বশুর বাড়ীর কুটুম্ব বা পিত্রালয়ের কেহ আসায় তাঁহাদের কল্যাণে গৃহিণীদের কেহ একবার আসিয়া সকলকেই সমভাবে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন—একজন আসিয়া পান দিয়া গেল। যাঁহারা সকাল সকাল আসিয়াছেন—মনোগত বাসনা যে সকাল সকাল ফিরিবেন। গতিক দেখিয়া বুঝিলেন যে সে আশা বৃথা!—

বাড়ীর মেয়েদের মধ্যাহ্নের আহার ও বৈকালিক বেশভূষা সমাপ্ত হইতে পাঁচটা বাজিল। তখন একটী গলাখোলা লাল বডি বা হাতকাটা কাল জ্যাকেটের সঙ্গে কেহ নীলাম্বরী কেহ ঢাকাই কেহ শান্তিপুরে ডুরে পরিধান করিয়া ২।৪ খানি অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া

এ ঘর ও ঘর হইতে নিমন্ত্রিতাদের সংগ্রহ করিয়া উঠানে লইয়া গিয়া বসাইতে লাগিলেন; সেখানে শতরঞ্চির উপর পরিষ্কার চাদর পাতা। এক পাশে কারচোপের কাজের বিছানা তাহাতে আইবড় ভাতের বা বৌভাতের বা 'সাধের' 'কনে' উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা হইয়া বসিয়া আছে,—সম্মুখে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ পুষ্পাধারে বড় বড় দুটি গোলাপ ফুলের তোড়া। এক পাশে নাচের বাজনা বাজিতেছে, কতকগুলি কাল' কাল' মোটা সোটা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঢোলোক মন্দিরা ও বেহালা বাজাইতেছে। ৩।৪ জন নাচওয়ালী আবাহু, আকণ্ঠ, আপাদ মস্তক অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ বা সিগারেট খাইতেছে, কেহ পান খাইতেছে। নিমন্ত্রিতাদের আসিতে দেখিয়া দুই জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নানা অঙ্গভঙ্গিসহকারে নাচ গান জুড়িয়া দিল ও নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের অতি নিকটে আসিয়া পেলার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে উঠান ভরিয়া গেল, আতর গোলাপ ফুলের মালা ও তোড়া বিতরণে নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনা করা হইল। এখন যাঁরা আসিতেছেন তাঁহাদের কোন চিন্তা নাই যে কোথায় বসিব। প্রবেশপথে ও ঘাটিতে ঘাটিতে বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। যে কেহ গাড়ী বা পাল্কি হইতে নামিতেছেন অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া উঠানে বসান হইতেছে। আসর জমজমাট, হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া পাল ভেদ করিয়া ছড় ছড় করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হৈ হৈ করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল, এবং 'নরেন কোথা গেলি' 'খুকি ঝিয়ের কোলে যা' 'হরে রুমাল খানা মাথায় দে' 'রোগা ছেলে ভিজে গেল ও মা কি হবে, আজ সবে দুটি ভাত দিচ্ছি'। বলিতে বলিতে মহিলারা ঘরের ও বারান্দার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। বেনারসী, ক্রেপ, বোম্বাই প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র ভিজিল। হুড়াহুড়ি, কলরব, কাদার পিচ্ছিল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কে কাকে দেখে! তারই মাঝে নাচওয়ালিরা ভাঙ্গা গলায় চেঁচাইতেছে ওগো মেয়েদের দালানে বসাও না। তাহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে, হীরা মুক্তা ও প্রচুর সোনায় ভূষিতা মহিলাদের দেখিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল যে প্রচুর পেলা পাইবে—কিন্তু—হায় রে বৃষ্টি!—

বারান্দায়, দালানে ও ঘরে ঘরে খাদ্যের পাতা সাজান হইয়াছে, তিল মাত্র স্থান নাই যে মহিলারা আশ্রয় লয়েন, তা আবার গানের মজলিস বসিবে!

বৃষ্টির প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া বাড়ীর মেয়েরা অভ্যাগতদিগের হাত ধরিয়া সযত্নে আহারে বসাইলেন এবং বৃষ্টিতে সকলের বড়ই কষ্ট ও ক্ষতি হইল বলিয়া দুঃখ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গোলোযোগে পরিবেশনে অনেক ত্রুটি হইতে লাগিল—কেহ লুচি পাইল, কচুরী পাইল না, সন্দেশ পাইল ত রসগোল্লা পাইল না।

রান্না হইয়াছে পোলাও, কালিয়া, চিংড়ির মালাই করি, মাছ দিয়া ছোলার দাল, রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের দাল, আলুর দম, ছোকা, মাছের চপ্, চিংড়ির কট্‌লেট্, ইলিস ভাজা, বেগুণ ভাজা, শাক ভাজা, পটল ভাজা, দই মাছ, চাটনি, তারপর লুচি, কচুরি, পাঁপর

ভাজা ; এক খানি সরাতে খাজা গজা নিম্‌কি রাধাবল্লভি, সিঙ্গাড়া, দরবেশ মেঠাই ; একখানা খুরিতে আম, কামরাঙ্গা, তালশাঁস ও বরফি সন্দেশ ; আর একখানায় ক্ষীরের লাড্ডু, গুঁজিয়া গোলাপজাম ও পেরাকী। ইহার উপর ক্ষীর, দধি রাবড়ি ও ছানার পায়স। বাবুদের জন্য মাংসের কোর্মা ছিল কিন্তু মেয়েরা অনেকেই মাংস খান না এজন্য তাহা মেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না। আহার্য্য প্রচুর ও অনেক প্রকারের সুতরাং পরিবেশনে বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও প্রত্যেকেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল।

এইবার বাড়ী যাওয়ার পালা। ‘‘গাড়ী কই” ‘‘খোকা কোথা” “খুকির গলার হার কে নিলে ?” কিছুই খুঁজিয়া মিলিতেছে না ! বৌমার হীরার ধুকধুকি নাই, টেঁপির মাথার টুপির ল্যাজ ছেঁড়া, গিন্নির নাকের নথের নোলোক পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে।” অমিয় জুতা হারাইয়া শুধু মোজা পায়েই আমার জুতো ও—ও—ও—ও করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

গিন্নির বকুনি, কর্ত্তার ক্রোধ শান্ত হইতে রাত ১২টা বাজিল। জুতার শোক ভুলিয়া অমিয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত। একজন বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতেছে, জয় যদু নন্দন জগত জীবন—।

দূরে অতি-দূরে।

“দিবস হানিছে তপ্ত বায়ুকণা
পাখী ফিরে নীড়ে বিবশ উন্মনা
মুখরা মেদিনী বিশ্রাম মগনা
হে পান্থ তরুণ কোথায় ধাওঁ ?
দিগন্ত ঝলকে প্রখর কিরণে,
কোথা যাও হেন দ্রুত চরণে ?
সিক্ত ললাট শ্রান্তি সিঞ্চনে ;
ক্ষণ তরে রহ, হেথা দাঁড়াও।
হের কিবা ছায়া তরু বীথি তলে,
হের কিবা শান্তি সরোবর জলে,
হের কি অমিয়া পল্লবে ফলে ;
আঁখি তুলে মরি ! বারেক চাও।
হে পথিক তুমি কোথায় যাও ?
“নানা যাব আমি দূরে অতি দূরে,
ধ্রুব তারা মোর আঁখি পথে ঘুরে,
মোর স্থান ঐ উচ্চ গিরি পুরে ;
পুরবাসি কেন মোরে ফিরাও !”
“হায় !—কে তুমি গো পান্থ, বিদেশবাসি ?
হের রবি ওই নামে অস্তাচলে,
ঘনায় আঁধার দিবসের ভালে,
আবরিয়া পথ সুতিমির জালে
নিভাইছে বিশ্ব-আলোক হাসি !
হায় !—তুমি কোথা যাও বিদেশবাসি ?
দীপমালা কিবা শোভে ঘরে ঘরে,
মাতা, ভগিনীর, প্রিয়া প্রেমাদরে
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিয়াছে ভ’রে
স্বরগের সুখ অমৃত রাশি !
হায় ! তুমি কোথা যাও বিদেশবাসি ?
ঘুমঘোরে ঢুলে পড়ে দুনয়ন !
রচিয়া দিতেছি কোমল শয়ন,
ধন্য মানিব শূন্য জীবন
অতিথি সেবায় হরষে ভাসি।
এস মোর ঘরে বিদেশবাসি।
তৃষাতুর তব পাণ্ডু ওষ্ঠদল

তৃষাতুর তব আঁখি-উৎপল
তৃষাতুর তব হৃদি বক্ষতল
পান কর সুধা তিয়াষ নাশি !
হায় ! কোথা যাও যুবা, বিদেশবাসি ?
“না না যাব আমি দূরে অতি দূরে,
ধ্রুবতারা মোর আঁখি পথে ঘুরে,
মোর স্থান ঐ উচ্চ গিরি পুরে,
যাও বালা নিয়ে রূপের হাসি।”
“হায় ! কেগো বাছা তুমি বাছনি কার ?
মেঘমন্দ্ররবে ঝড় আসে সাজি,
আছাড়িছে ভুমে শাখা তরু রাজি,
এস গো অতিথি মোর কাছে আজি,
হায় ! এ সময়ে কেন ঘরের বার !
হের গগনের সুকুটিল ভাল !
স্তূপ পরে স্তূপ রচে ঘন জাল !
চমকে নয়ন তড়িৎ বিশাল !
ঝরণা প্রবাহে বরিষে ধার !
কেগো বাছা তুমি বাছনি কার ?
‘‘নানা যাব আমি দূরে অতি দূরে,
ধ্রুবতারা মোর আঁখি পথে ঘুরে,
মোর স্থান ঐ উচ্চ গিরিপুরে,
যাও মাতা, স্নেহে ডেকোনা আর !”
দূর দিগন্তে ডোবে চন্দ্রকলা,
টুটে তম, ফুটে অরুণা উজলা,
ম্লান ধ্রুবতারা গগনে অচলা
ঊষার আলোকে পড়িল ঢাকি।
দিবস রজনী ছুটিয়া ছুটিয়া,
শ্রান্ত পান্থ গিরি-তলে পঁহুছিয়া
মৃত্যুময় ঘুমে পড়িল লুটিয়া
‘‘দূরে অতি দূরে”—সুধীরে হাঁকি।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ-জায়া।

আমাদের কর্ত্তব্য।

“তোমরা এ সকল অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলে কেন ?” নর্টনের এই প্রশ্নে নরেন্দ্র গোস্বামী উত্তর করিয়াছিল ‘‘গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্য।”

দুই চারিখানা অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার কল্পনা মনে আঁটে তাহারা উন্মাদ নহে ত আর কি ?

প্রফুল্ল চাকি ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করিবার সময় এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া মরিল, “তুমি বাঙ্গালী হইয়া এই কাজ করিলে ?”

ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে ? এই ভ্রান্ত বালকেরা মনে করিয়াছিল তাহারা সুশাসন ও স্বরাজপ্রাপ্তির জন্য যে বিদ্রোহনীতির অবলম্বন করিতেছে, তাহা দেশের জনসাধারণের অনুমোদিত ; কেবল সাধারণ সকলেই এজন্য প্রাণ দিতে পারেনা, উহারা তাহাদের হইয়া জীবন বলিদান ব্রত গ্রহণ করিল।

বালক বুদ্ধির প্ররোচনায়, অসংযত কল্পনার মাদকতাসেবনে উন্মত্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা প্রকৃত কার্য্যের পথ ছাড়িয়া বিপথে ছুটিল। তাহাদের পরিশ্রম বিফল, সাধনা অসিদ্ধ, উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া পড়িল।

কর্জ্জনের বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থার সময় ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে জাতীয় ভ্রাতৃভাবের জ্বলন্ত উদ্দীপনা, স্বদেশী ব্রত গ্রহণ ও প্রচারের একান্ত একাগ্রতা দেখা গিয়াছিল। ১৬ই অক্টোবর ভারতবাসীর একটি স্মরণীয় দিন। সেইদিনকার বিরাট জনতায়, বয়ন শিল্পের উন্নতি সংকল্পে লোকে চাঁদা দিয়া চাঁদা নিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকেরা এই সময় পদব্রজে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। বেঙ্গল টেক্‌নিকাল বিদ্যালয়, ন্যাসনাল কলেজ, ন্যাসলান ফণ্ড, প্রভৃতি সেই সময়কার উৎসাহের ফল। ইহা ছাড়া বঙ্গলক্ষ্মীমিল, ছোট ছোট বয়ন বিদ্যালয়, নানারূপ কলকারখানা স্থাপন, এবং স্বদেশীব্রত গ্রহণের উৎসাহে দেশ তখন জাগ্রত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা দেখিতেছি সেই উৎসাহ বহ্নি উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর প্রভায় প্রজ্জ্বলিত না হইয়া সমভাবেই যেন অবস্থিত রহিয়াছে; সেই আগ্রহ স্রোত দিন দিন প্রবলতর ও পরিবর্দ্ধিত প্রবাহে সমগ্র বঙ্গভূমিকে উর্ব্বরা না করিয়া স্রোতের জল যেন একস্থানেই আটকা পড়িয়া গিয়াছে! ধনী, শ্রমজীবি, বা চাকুরে লোকের উৎসাহ স্বাভাবিক নিয়মে শিথিল হইয়া পড়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যে সকল নব্যদল দেশব্রত গ্রহণ করিয়া এই কার্য্যেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদেরও যেন এ সকলদিকে পূর্ব্বের প্রাণপণ উৎসাহের অভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া তাঁহারাও কি প্রকৃত কার্য্য ভুলিয়া থাকিবেন; তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অবহেলা করিবেন!

বঙ্গচ্ছেদের সময় স্বদেশী ব্রত গ্রহণের আরম্ভে আমরা যে পথ ধরিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় পথ। দেশে নানারূপ কল কারখানা, নানারূপ শিল্পের যাহাতে উন্নতি হয়, স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জ্জনের যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার দিকেই আপাততঃ আমাদের বিশেষ রূপে মনোযোগী হইতে হইবে। কিন্তু এখানেও ধৈর্য্যের আবশ্যক। দোকানদারের বিদেশী জিনিষ নষ্ট করিয়া, লোককে স্বদেশী গ্রহণে বাধ্য করিলে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। একদিকে সকলকে বুঝাইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, অন্য দিকে দ্রব্য সুলভ করিবার ব্যবস্থা করা চাই। বস্তুতঃ মূল্য সুলভতাই স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশী বর্জ্জনের সহজ এবং স্থায়ী উপায়।

বস্ত্রের কল বহুব্যয়সাধ্য। তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় বয়ন শিল্পের শিক্ষার আয়োজন করা উচিত। গ্রামে গ্রামে চিনির ছোট ছোট কল সহজেই হইতে পারে। বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, কলকৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিলে তাহারা যে শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোমা শিখিতে বালকগণ যদি বিলাত যাইতে পারে তবে ব্যবসায় বাণিজ্য কলকারখানা শিখিতে কেনই বা বিলাত যাইতে পারিবে না। আসল-কথা এই দিকে আকাঙ্ক্ষার গতি হওয়া আবশ্যক। শুনিতে পাই, এ দেশে কাচের চুড়ি বিক্রয় করিয়া বিদেশীগণ কোটি কোটি মুদ্রা দেশে লইয়া যান। ইহা বস্ত্রাদির ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নহে, সখের জিনিষ। ছেলেরা বুঝাইয়া অনেককেই ইহার ব্যবহারে নিবৃত্ত

করিতে পারেন। আর দেশে যাহাতে ইহা প্রস্তুত হয় বড়লোকেরা তাহার চেষ্টা করুন। কল-কারখানা ছাড়া কতপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্র এ দেশে পড়িয়া আছে তাহার ঠিক নাই। বিলাতি হইতে মাছ ফল দুধ প্রভৃতি নানাদ্রব্য এ দেশে টিনে আবদ্ধ হইয়া আসে, তাহার কৌশল শিখিয়া আসিলে আমাদের দেশের মাছ ফল প্রভৃতি বিদেশে পাঠাইয়া আমরা বিস্তর লাভ করিতে পারি। একান্ত প্রাণে, ধীর অধ্যবসায় সহকারে এইরূপ কার্য্যে মনোযোগী হইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর অতি সহজভাবে জাতীয় উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইতে থাকিবে। যোগ্যতার জয় সর্ব্বত্র। ইংরাজ শাসনে উৎকণ্ঠিত হইবার কোনই আবশ্যক দেখি না। ভারতে বিদেশীশাসনের আবশ্যক আছে তাই তাহারা আছে; আবশ্যক বন্ধ হইলে আপনা হইতেই তাহারা চলিয়া যাইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। কেমন করিয়া তাহারা যাইবে আমরা জানিনা, তাহা ভাবিবার দরকারও নাই। যখন অনাবশ্যক হইল, তখন রোম আপনা হইতে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বোয়ারদিগকে পরাজয় করিয়াও ইংরাজ শেষে তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। কোন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সমগ্র সুইজরল্যাণ্ড যখন এক বাক্যে বলিল আমরা নরওয়ের অধীনতা মানিব না, তখন তাহাই হইল, ইহার জন্য একবিন্দু রক্তপতন হয় নাই।

প্রাকৃতিক নিয়ম পাশ্চাত্যজাতির উপর একরূপ, প্রাচ্যজাতির উপর অন্যরূপ নহে। আমরা যোগ্য হইলে আপনা হইতেই স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইব। সকলেই জানেন, হলাণ্ড সমুদ্রের সমতলভূমি। এই সমুদ্র কৌশলে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া হলাণ্ডবাসী ইহা বাসযোগ্য করিয়াছে। ইয়োরুপ আমরিকা পরিশ্রমপটু, অধ্যবসায়নিপুণ বলিয়াই বিজ্ঞান, শিল্পে, বাণিজ্যে সকল বিষয়েই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতেছে। মহৎজাতি হইবার গুণ সকল আমরা আয়ত্ত করিতে পারিলে কে আমাদের অধীন করিয়া রাখিতে পারে?

কিন্তু আমাদের গোড়াতেই গলদ। জাতিগঠনের প্রকৃত চেষ্টা আমাদের নাই বলিলেই হয়। চরিত্রবল বৃদ্ধির চেষ্টাই প্রকৃত জাতি গঠনের চেষ্টা। আধুনিক শিক্ষার ফলে বালকদিগের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য দেখা যায় তাহা চরিত্র বল নহে। পূর্ব্বকালে বালকগণের গুরুভক্তি প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু অধুনা বহুস্থলে নব্যদল স্ববুদ্ধি গর্ব্বে অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞলোকদিগকেও যেরূপ অশ্রদ্ধা অমান্য করে তাহা জাতীয় উন্নতির অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের ছাত্রগণ কিরূপ বাধ্যতার সোপান দিয়া চরিত্র বল সঞ্চয় করে তাহা আমাদের শিক্ষার বিষয়। ইয়োরপ আমেরিকার প্রতি গৃহে, প্রতি স্কুলে বালক বালিকাদিগকে যেরূপ শাসননিয়মে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্যসাধন অতি সহজ হইয়া আসে। একজন আমেরিকাবাসী গল্প করিতেছিলেন, প্রতি স্কুলে বালকগণ অগ্নি পরীক্ষা দিতে বাধ্য। পাড়ায় আগুণ লাগিলে কিরূপে তাহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া অগ্নি হইতে দ্রব্যাদি রক্ষা করিবে অতি কঠোর নিয়মে তাহারা সে শিক্ষা পায়। এই শিক্ষার ফলে কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে শ্রেণীবদ্ধ বালকেরা প্রাণের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সদর্পে অনলে বিচরণ করে।

আর এ দেশে পথে কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে লোকে জনতা করিয়া দাঁড়াইয়া দেখে কিন্তু বিপদে পড়িবার সম্ভাবনায় অসহায়কে রক্ষা করিতেও অগ্রসর হয় না। আমাদের দেশের প্রবাদই এই, চাচা আপন বাঁচা ; আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

স্বেচ্ছাসেবকদল পরোপকার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল যে প্রশংসার কাজ করিতেছেন এমন নহে ; যথার্থই জাতি গঠনের সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ইহা একটি উপায় মাত্র। সর্ব্ববিষয়ে আমাদের জাতিগঠনের চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের মহিলাগণ শিক্ষিত না হইলে যথার্থ জাতিগঠন হইতে পারে না। কিন্তু এতদ্দিনেও আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে ! গুরুকুল সমাচার পত্রে এ সম্বন্ধে একজন যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন যে, "যদিও চরমপন্থীগণ প্রজাতন্ত্র, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি বিষয় লইয়া খুব আন্দোলন করিতেছেন কিন্তু তথাপি জাতিভেদ সংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহারা নারীগণের অন্তঃপুরকারাগৃহের বাহিরে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ভোগের বিরোধী অথচ তাঁহারা পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের নীচ জাতীয় দেশবাসীকে স্পর্শ করিতেও সঙ্কুচিত হন অথচ সর্ব্ব বিষয়ে ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকারপ্রার্থী এবং রেলওয়ের কোন গাড়ি কেবল সাহেবদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট দেখিলে সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্বেতাঙ্গের বিন্দুমাত্র প্রভুত্ব সহ্য করিতে চান না অথচ অন্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াই ব্রাহ্মণগণ সমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সংস্কার কেবল এক বিষয়ে নহে। সকল বিষয়েই হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল লোকে সমাজ প্রভুত্বে পীড়িত, রাজনৈতিক অধীনতা তাহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। যাঁহাদের নিকট মনুষ্যের কোন রকম দাসত্ব একান্ত অসহ্য তাঁহারাই বিধাতার আশীর্ব্বাদে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য পাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা সত্ত্বেও রোমে দাসত্ব ছিল। যে সমস্ত লোক পুরোহিতগণের ইঙ্গিতে অন্ধভাবে পরিচালিত এবং তাঁহাদের আদেশ নির্ব্বিবাদে আনতমস্তকে পালন করে তাহারা স্বেচ্ছাচার অথবা নিয়মতন্ত্রে গঠিত প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া দ্বিধাশূন্য ভাবে রাজপুরুষগণের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লয়। অতএব কেবল মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন কখনই সাধারণকে স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃভাবের কল্যাণময় পথে আনয়ন করিতে পারিবে না।"

নির্ভর।

তুমিত বাসিছ ভাল দিবস রজনী,
তুমিত দেখিছ আমি জানি বা জানি।
তুমি দেছ দুঃখে সুখ, তাই কাঁদি হাসি,
তুমি দেছ আশা তৃষা, তাই ভালবাসি।

আঁধার হৃদয়ে জ্বালি' বিশ্বাসের আলো—
তুমি দেখাইয়া দেছ কি মন্দ কি ভাল।
নির্ব্বাচিয়া দে'ছ পথ প্রশস্ত উদার--
আমি যদি ভুল করি সে দোষ কাহার!

রাজ্যের কথা।

তিলক। মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক সম্প্রতি বিদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ছয় বৎসর নির্ব্বাসন এবং সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রকৃত রাজবিদ্রোহীজনের দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া উচিত এ বিষয়ে কাহারো মতভেদ হইতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বিচারে স্বদেশবৎসল তিলকেরও বিদ্রোহিতা প্রমাণ হইলে ভারতবাসীর ক্ষোভের কারণ থাকিত না। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত সুবিচার তাঁহাকে দান করা হয় নাই এই বিশ্বাসে সমগ্র ভারতবর্ষ আজ শোকনিমগ্ন। কেশরী পত্রে মহারাষ্ট্রি-ভাষায় লিখিত যে সকল মন্তব্যের জন্য তাঁহাকে এইরূপ সুকঠোর দণ্ড বিধান করা হইল,—বিচারক এবং জুরীগণ প্রায় সকলেই সেই ভাষায় অনভিজ্ঞ। ইংরাজি অনুবাদ মাত্র পড়িয়া তাঁহারা নিষ্পত্তি করিলেন, তিলক দোষী। তিলক পক্ষ হইতে মহারাষ্ট্রি ভাষাবিৎ সাধারণ জুরির প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু বিচারক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিশেষ জুরির আহ্বান করেন। তিলকমহোদয় নিজে দক্ষতাসহকারে কয়দিন ধরিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া দেখাইলেন যে, "বিদ্রোহিতা প্রচারের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় তাঁহার ছিলনা ; ভারতবিদ্বেষী ইংরাজপত্র সম্পাদকগণ ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যেরূপ অযথা বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছেন, স্বরাজপ্রার্থী দেশীয়মাত্রকেই দলন-নীতি-নিপীড়িত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যেরূপ উত্তেজিত করিতেছেন তিনি সেই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আলোচনা করিয়াছেন মাত্র।" সে বক্তৃতা দেশের লোকের মনে তাঁহার নির্দ্দোষিতা বদ্ধমূল করিয়া দিল, কিন্তু বিচারে অব্যাহতি পাওয়া দূরে থাক্—সুকঠোর দণ্ডে তিনি দণ্ডিত হইলেন।—ইহাতেই ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে প্রপীড়িত বোধ করিতেছে। বিদ্রোহিতা অভিযোগে ইংলণ্ডে ১২ জনে গঠিত সাধারণ জুরি দ্বারা অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির সমকক্ষ দ্বাদশ ব্যক্তির জুরি দ্বারা বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাঁরা একবাক্যে উহাকে নির্দ্দোষ বলিলে সে মুক্তিলাভ করে,—আর জুরির মধ্যে একজনেরও মতভেদ হইলে—নূতন জুরি দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার হইয়া থাকে, কিন্তু সে দণ্ডনীয় হয় না।

তিলকের মকদ্দামায় নয় জন জুরি ছিলেন ; তাহার মধ্যে সাত জন ইংরাজ, দুই জন পার্সি। এই নয় জনের মধ্যে দুই জন তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। ইংলণ্ডে এ অবস্থায় তাঁহার পুনর্ব্বিচার হইত। কিন্তু তাহা দূরে থাক্ এস্থলে তিলক-পক্ষের ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা অর্থাৎ সাধারণ জুরি কর্ত্তৃক তাঁহার বিচার লাভের আবেদন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য হইল। কেন যে বিচারক এরূপ করিলেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য ! অতি দুঃখে হাসিও পায় ! অথচ জজ দাবার রায় দিবার সময় তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি যথাসাধ্য সুবিচার এবং লঘু দণ্ড দান করিলেন।" সাধারণ মহারাষ্ট্রি-জুরি নামঞ্জুর, এবং ছয় বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড, সুবিচার এবং লঘুদণ্ডই বটে ! আমাদের দেশে ছাড়া এরূপ বিচার আর কোন দেশেই হইতে পারিত না !

তিলকের নির্ব্বাসন দণ্ডে বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি নানা স্থানের লোকে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। রাজসৈন্য বন্দুকের গুলিতে বোম্বাইয়ের দশ হাজার নিরস্ত্র লোকের বিদ্রোহ দমনে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বহু লোক হত ও আহত হইয়াছে। সাধারণ লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাঁহার নির্ব্বাসনে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি যে দেশের সর্ব্ব সাধারণের কত দূর শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগভাজন এই ঘটনাই তাহার প্রকৃত সাক্ষী। কিন্তু ইংরাজ বলেন, ইহা সাধারণের হৃদয়ভাবপ্রসূত আচরণ নহে ; শিক্ষিত লোকেরাই তাহাদিগকে এই কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছে। ভালবাসা বা ধর্ম্মের উত্তেজনা না হইলে কাহারো কথায় যে শত সহস্র লোকে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, ইহা ত কেহ কখনও দেখে বা শুনে নাই ? গভর্ণমেণ্ট এরূপ কথায় না ভুলিয়া ন্যায়করুণাসঙ্গত নীতিতে দেশের লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া দেশে শান্তি পুনঃ স্থাপিত করুন ইহাই আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ।

চিতেম্বরম পিলে। কেবল তিলক মহোদয় নহেন, দেশমঙ্গল উদ্দেশ্যে যাঁহারাই সাহস করিয়া এ সময় কিছু বলিয়াছেন, তাঁহারাই বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। পরঞ্জপে, শিবমহোদয়, চিদম্বরম্ পিলে

প্রভৃতি অনেকেই বিদ্রোহিতা অপরাধে গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত চিদম্বরম্ পিলে মহোদয়ের শাস্তি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। ইংরাজ জজ পিন্‌হে পিলেমহোদয়ের দুইটি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রত্যেকটিতেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু বিস্মিত ভারতবর্ষ পিলেমহোদয়ের অপরাধ কি তাহা আজও ভাল করিয়া বুঝিল না। কেবল রাজদণ্ড শুনিল মাত্র। পিলেমহাশয় প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারই অদম্য উৎসাহবলে টুটিকরিন্ স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানি প্রবল প্রতিযোগিতায় বিদেশী ব্যবসায়ী দলকে পরাস্ত করিয়া ভারতসমুদ্রে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। স্বজাতিকে এইরূপ দেশ মঙ্গল কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছিলেন—এই অপরাধেই কি আইনের নাগপাশে বন্ধন করিয়া কর্ম্মবীরকে সমুদ্র-মধ্যস্থ জনহীন সুদূর দ্বীপে জন্মের মত নির্ব্বাসিত করা হইল? জজ পিন্‌হে পিলের প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড দিবার একটি কারণ এই উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহাতে দেশে ফিরিয়া আর তাঁহার বীররূপে পূজা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহা হইবে না সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গীহীন বিজন দ্বীপেও কোটি কোটি ভারতবাসীর মর্ম্মবেদনা অর্ঘ্যরূপে তরঙ্গমুখে উত্থিত হইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিবে। দাক্ষিণাত্যকেশরী তিলক দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন—"যিনি জাতিবিশেষের ভাগ্যবিধাতা, তাঁহার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমি যে কর্ম্মে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি,—যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় আমার দণ্ড গ্রহণেই সে কর্ম্মের সাফল্য অধিক, তাহা হইলে তাহাই হউক। সেরূপ ক্ষেত্রে আমার স্বাধীনতা নিশ্চিতই আমার বাঞ্ছনীয় নহে!" ইহা সাধকের হৃদয়োত্থিত ভক্তিবাণী! ভক্তি-পরীক্ষার জন্য চিরদিনই ভগবান ভক্তের মর্ম্মে আঘাত দিয়া থাকেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশী নারায়ণ কর্ণের দান-শীলতার পরীক্ষার জন্য স্বকরে তাঁহার প্রিয়পুত্রকে ছেদন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ বলি না পাইলে দেবতা তৃপ্ত হন না। হে তপস্বী ভারত, বুঝি তোমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যগুলি দেব চরণে নিবেদন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাই হউক, তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় ইহাতেই পূর্ণ হইবে।

আলিপুরে মোকদ্দামা। আলিপুর আদালতে, বোমা প্রস্তুত অপরাধে অভিযুক্তদিগের মকদ্দমা এখনো শেষ হয় নাই। এ কোর্টের বিচার অন্য কোর্টে গমন করিলে আসামীগণ অব্যাহতি পাইবে কি না জানি না,—কিন্তু আমরা একটুখানি অব্যাহতি পাই। বিচারালয় আমরা ধর্ম্মাধিকরণ বলিয়াই জানি। দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য। বিচারক এবং রাজকৌন্সিলি উভয়েই এই লক্ষ্যের সাধকরূপে উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত। বড় বড় ইংরাজ জজেরা রাজকৌন্সিলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—"অভিযুক্তব্যক্তিকে, যে কোনরূপে দোষী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা রাজকৌন্সিলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। বিচারক যাহাতে সুবিচারে পারক হন এই লক্ষ্য মনে রাখিয়া, মকদ্দমার সমস্ত অবস্থা নিরপেক্ষ অথচ পরিষ্কাররূপে দেখানই তাঁহার কর্ত্তব্য।" কিন্তু নর্টন যেরূপ করিয়া মকদ্দমা চালাইতেছেন তাহা এই নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ছলেবলেকৌশলে আসামীদিগের দোষ সাব্যস্ত করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। ভাবে, বাক্যে, প্রশ্নে, উত্তরে, আকারে, ইঙ্গিতে কোনরূপেই তিনি তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। ইহার উপর—বিপক্ষের কৌন্সিলির প্রতি অযথা বাক্যবাণ প্রয়োগ—এবং সাক্ষী আসামী সকলের প্রতিই তাহার সুরুচিবহির্ভূত, ব্যঙ্গময় উক্তি শুনিতে শুনিতে মাতৃ-অঙ্গে শিশুরও রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। একজন সাক্ষীর নাম পিনাকপাণি, নর্টন বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—আমি ভাবিয়াছিলাম—"পিনেকোপাণি"। একজন সাক্ষী বান্ধবভাণ্ডারের নাম উল্লেখ করিল—তিনি বলিলেন—"ওঃ আমি বলি বুঝি বান্দর!" তিনি ভাবেন বড় রসিকতাই করিতেছেন,—কিন্তু এইরূপ ভাঁড়ামিতে তিনিই যে নিজে শেষোক্ত সম্ভাষণের যোগ্য হইয়া পড়েন ইহা বুঝিবার ক্ষমতাটুক পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। আশা করি জজের কোর্টে তিনি এইরূপ রসিকতা করিতে সাহসী হইবেন না। অন্ততঃ হাইকোর্টে হ্যারিসন রোডের মকদ্দমায় ত তাঁহার এ মূর্ত্তি দেখা যায় নাই।

আলিপুরকোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট নর্টনের এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি এবং অভদ্রজনোচিত আচরণে কেন যে প্রশ্রয় দেন ইহা

আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। এমন কি রাজদরবারে দাঁড়াইয়া নর্টন রাজঅপমানজনক আচরণ করিলেও তিনি কথা কহেন না। নর্টন কোর্টে হাইল্যান্‌ডার রেজিমেন্টের নামস্বাক্ষরিত এই মর্ম্মের এক পত্র পাইলেন, "কোন বাঙ্গালী যদি আপনার বা অন্য কোন ইংরাজের কেশ স্পর্শ করে তাহা হইলে সাত দিন ধরিয়া কলিকাতার পথে বাঙ্গালী যাহাকে দেখিব তাহাকে খুন করিব, বাঙ্গালীর রক্তে পথ ঘাট প্লাবিত করিয়া তুলিব।" এই পত্র পড়িয়া নাকি নর্টন মহা উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "সত্যই যদি ইহা হাইল্যান্‌ডার রেজিমেন্টের পত্র হয় তবে আমি তাহাদিগকে ভোজ দিব"।

প্রকাশ্য বিচারালয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস ভরে নর্টন এই কথা বলিলেন, আর বিচারক ইহাতে একটি কথা কহিলেন না! তাঁহার এই ব্যবহারকে কেহ যদি নীরব অনুমোদন বলে—তাহা হইলে কি অসঙ্গত হয়? ব্রিটিসসম্রাটের নিকট ভারতবাসীও প্রজা, ইংরাজও প্রজা—যদি দেশের লোকে ইংরাজবিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করে তাহাও যেমন দণ্ডনীয়—ইংরাজ দেশের লোকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিলে তাহাও তেমনি দণ্ডনীয়। যদি এক জাতির বিরুদ্ধে অন্যের ঘৃণাদ্বেষ উত্তেজিত করা সিডিসন হয় তবে ইহাও কি সিডিসন নহে? সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে বিচারাসনে বসিয়া নর্টনকে এরূপ স্থলে শাসন না করাতে বিচারক কি সম্রাটেরই অপমাননা করিলেন না! আমরা যদি এই সব বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করি—তাহাতেও কি আমরা সিডিসন অপরাধে অভিযুক্ত হইব?

হ্যারিসন রোডে বোমার মোকদ্দামা। হাইকোর্টে এ মকদ্দামার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বিচারে তিনজন আসামী মুক্তি লাভ করিল; তিন জনের প্রতি সপরিশ্রম সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ষষ্ঠ আসামী উল্লাসকর দত্তকে জুরিগণ একবাক্যে দোষী বলিয়াছেন; সুতরাং তাহার প্রতি এ দণ্ড অন্যায়দণ্ড নহে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীর দোষ সম্বন্ধে জুরিগণের মতভেদ দেখা যায়।—প্রথম আসামী নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তকে একজন জুরি নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। আর দ্বিতীয় আসামী ধরণীধর সেন গুপ্তকে,—তাহার একটি অপরাধে—সমগ্র জুরি, আর একটি অপরাধে তিনজন জুরি নির্দ্দোষ বলিয়াছেন; এ অবস্থায় অন্ততঃ পক্ষে দ্বিতীয় আসামীর অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। ইহা সত্ত্বেও চিফ্ জষ্টিস রামপেনির এই বিচারে দেশের লোক অসন্তুষ্ট নহে। বিচারকালে—এবং তাঁহার রায়ে তিনি বেশ ধীর শান্ত ও নিরপেক্ষ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। যাহারা মুক্তির আদেশ পাইয়াছে, তাহারা পরে আলিপুর হইতেও মুক্তি পাইয়াছে।

শিব, পিলে, তিলক প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রতি যে কিরূপ অবিচার এবং গুরুদণ্ড বিধান করা হইয়াছে—এই শাস্তি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

ক্ষুদিরাম।—ক্ষুদিরামের ক্ষমার আবেদন অগ্রাহ্য হইল। ১১ই আগষ্ট তাহার ফাঁসি হইয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত সে যেরূপ অটল বীর ভাব দেখাইয়াছে তাহাতে জনসাধারণ মুগ্ধ! নরেন্দ্র গোস্বামী প্রাণের মায়াতে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সকলের হেয় পাত্র হইয়াছে, আর ক্ষুদিরাম নির্ভীকতা দেখাইয়া সকলেরই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন ক্ষুদিরাম তাহার উকীলকে বলিয়াছিল—"রাজপুত ললনার চিতারোহণের ন্যায় আমি নির্ভয়ে মরিব।" এই অপরিণত বুদ্ধি ভ্রান্ত বালককে যদি রাজপক্ষ ক্ষমা করিয়া অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ড দান করিতেন, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে ইহার প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান করিতেন, তবে আসলে শাস্তি কম দেওয়া হইত না, অথচ গভর্ণমেণ্ট ইহাতে খুবই সুনাম লাভ করিতেন। ন্যায়করুণানীতির দ্বারা ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিবার ইহাই উত্তম অবসর। ইহা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট যে স্থায়ী সুফল লাভ করিবেন, বিপরীত নীতিতে তাহা হইতেই পারে না; ইহা একটা সহজ সত্য। লর্ড ক্যানিংএর নিকট এখনো দেশের লোক কৃতজ্ঞ। ইহা বুঝিতেছেন না দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই দুঃখিত।

দুর্গাচরণ সান্যাল। হাইকোর্টের বিচারে ইঁহার চারিবৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হইয়াছে। উচ্চ আদালতে লোকে উচ্চ বিচারই প্রত্যাশা করে, আজকাল সমস্তই বিপরীত। দুর্গাচরণ বাবু একজন সম্ভ্রান্ত উকীল, তিনি তাড়াতাড়িতে ট্রেণ ধরিতে বাধ্য হইয়া রাত্রে ভ্রমবশতঃ দারজিলিং মেলের প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায়

উঠিয়া পড়েন। দুইজন সাহেব যাত্রী হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গে একজন লোককে ডাকগাড়ির মধ্যে দেখিয়া খুনী চোর ভাবিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। সাহেবদের কথা,—তিনিই অগ্রে কুকরি দিয়া তাহাদিগকে মারিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আত্মরক্ষার্থে তিনি তাহাদিগকে হঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,কুকরি তাঁহার সঙ্গে ছিল না—সে সাহেবদেরই জিনিষ।—

এই অপরাধে বগুড়ার সেসন জজ ইঁহাকে দুই বৎসরের কারাদণ্ড দেন। ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করায় জজ উড়রুক ইঁহাকে নির্দ্দোষ এবং মুক্তির যোগ্য মনে করেন, কিন্তু জজ গাইট বলেন, ইহার পুনর্ব্বিচার হওয়া উচিত। জজদিগের মতভেদে চিফ জষ্টিস গাইটের পক্ষাবলম্বন করায়, মকদ্দমা আলিপুরে পুনর্ব্বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। সেখানে পাঁচজন জুরির মধ্যে চারজন ইহাকে নির্দ্দোষ বলিলেও জজ বিচক্রফ্‌ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় এ মকদ্দমা হাইকোর্টে প্রেরণ করেন, হাইকোর্টে জষ্টিস ব্রেট ও রাইভ্‌স দুই বৎসরের স্থলে ইঁহাকে ৪ বৎসরের কারাদণ্ড দিয়াছেন।

জষ্টিস ব্রেট তাঁহার রায়ে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন "দুর্গাচরণ কেন যে সাহেবদের খুন করিতে গেলেন—এ কার্য্য করিবার তাঁহার অভিপ্রায় কি, তাহা কিছুই বুঝা যায় না—ইহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে, জেলে যেন ইহার পরীক্ষা করা হয়।"

ইহাকেই বলে 'জেডউড' বিচার, আগে দণ্ড তাহার পর মীমাংসা। দুর্গাচরণের পক্ষে একার্য্য করিবার সম্ভাবনা না দেখিয়াও বিচারক এই অসম্ভব সম্ভব বোধ করিলেন কেন? না দুইজন ইংরাজ যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। সে দুইজন ইংরাজ দুর্গাচরণের সম্পূর্ণ অপরিচিত তাহাদের সহিত তাঁহার কোন শত্রুতাই ছিল না, যদি কেবল ইংরাজ মারাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এজন্য ট্রেণে উঠিয়া অবসর খুঁজিবার ত আবশ্যক ছিল না। বৃদ্ধ দুর্গাচরণ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুলেখক, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বজীবনেও উন্মাদরোগ বা ঔদ্ধত্যের কোন পরিচয় কেহ পায় নাই। এস্থলে কেবল দুইজন ইংরাজের কথায় ইনি দোষী সপ্রমাণ হইলেন। ইহাই ন্যায়বিচার বটে! বিচারক যদি ইঁহাকে উন্মত্ত বলিয়াই ঠাওরাইলেন তবে আবার দণ্ড কেন? উন্মত্তের ত কার্য্যাকার্য্যের দায়ীত্ব নাই। দেশের লোকের মনে ইনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বিবৃত করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট ইঁহার জন্য মুক্তির আবেদন করিতেছেন।

পার্লামেণ্টে ভারতপ্রসঙ্গ। গত ৩০শে জুন লর্ড কর্জ্জনের সহিত লর্ড মর্লির বেশ একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। লর্ড কর্জ্জনের অভিপ্রায়;—উচ্চ শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ কর; সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা একেবারে রহিত করিয়া দাও, রাজপুরুষদিগের হস্তে ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দাও ইত্যাদি ইত্যাদি! লর্ড মর্লি কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের মতের পোষকতা না করিয়া বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে "বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটা বড়ই ভুল হইয়াছে। এবং ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিবার কোন কারণ নাই।" ২৩শে জুলাই তারিখের পার্লামেণ্ট-সভায় ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারী মিঃ বুকানন ঠিক ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আপনার করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা। ঐ আশ্বাসবাণী কার্য্যত পরিণত হইলে ইংলণ্ডের গৌরব এবং সিংহাসন ভারতবর্ষে যে সুদৃঢ় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পার্লামেণ্ট সভায় মিঃ রদারফোর্ড তিলকের দণ্ড কমাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মিঃ বুকানন বলেন যে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের লঘুতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়।—সম্প্রতি লণ্ডনের সুবিখ্যাত "দি ষ্টুডিও" নামক মাগাজিনে মিঃ হাভেল কলিকাতার আর্ট স্কুলের ভারতবর্ষীয় চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুললিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং তাঁহার শিষ্য নন্দলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর অঙ্কিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন—বার বৎসর পূর্ব্বে আমি ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে ইউরোপীয় চিত্র শিখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিতে ইউরোপীয় ভাব সমূহ কখনই সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারে না। সে কারণে ভারতীয় চিত্র

সম্বন্ধে অন্য একটি বিভাগ খুলিবার ইচ্ছা করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমি প্রাচীন মোগল রাজত্বে অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র পাইলাম। সেই চিত্রগুলি দেখিয়া শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথের মতিগতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। ইউরোপীয় আদর্শ ত্যাগ করিয়া তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তারপর তিনি ভাইস প্রিন্সিপালের পদে ব্রতী হইলেন। এবং আমি অবকাশ লইবার পর তিনি এখন স্কুলের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। এই তিন বৎসর মধ্যে তিনি নিজের এবং তাঁহার ছাত্রগণের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে ভারতবাসীরা ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা চিত্রবিদ্যায় হীন। কিন্তু তাহাদের এ ধারণা ভুল। বাঙ্গালী ছাত্রেরা কেবলমাত্র শিক্ষার দোষে হীন হইয়া আছে নচেৎ তাহাদের প্রতিভা ইউরোপকে ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিতে পারে। শ্রীযুত অবনীন্দ্র নাথ "আরঙ্গজীব দারার ছিন্নমুণ্ড পরীক্ষা করিতেছেন" এই চিত্রটি অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের পাশ্চাত্য জগতে চিত্রকরেরা অনেক সময় চিত্রের বাহ্যিক ভাবের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হ'ন কিন্তু ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা চিত্রের মানসিক ভাবগুলি পরিস্ফুট করিতে অধিকতর যত্নবান। আমার বিশ্বাস যে যদি পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যা প্রাচ্যের ভাব গ্রহণ করে তাহা হইলে অবশ্যই অধিকতর উন্নত হইবে। আজকাল আর্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ছাত্রদিগকে আগ্রা, এলোরা, অজণ্টা দেখিতে প্রেরণ করেন। গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকা অপেক্ষা সাধারণের সহানুভূতিতে যে আর্ট স্কুল অধিকতর উন্নত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বদেশী কোম্পানী।—বোম্বাই প্রদেশের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্ট্রার ১৯০৭-০৮ সালের যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে 'স্বদেশীর' স্রোত কিরূপ প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে—তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। তিনি বলেন, "যে নূতন কোম্পানি সকলের প্রতিষ্ঠায় এই অফিসের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯০০-০১ সালে এই অফিসে ৭৮০০ টাকা আয় হইয়াছিল। কিন্তু এই বৎসরে ৬৯টি ট্রেডিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ২৪,০০০ টাকা আয় হইয়াছে।"

বেলুচিস্তানে বিপ্লব।—বেলুচিস্তানে নূতন বিপ্লব উপস্থিত। খিলাতের শাকা খাঁ কালোয়ানের একটি রমণীকে হরণ করিয়াছেন। এই রমণীর উদ্ধারের জন্য কালোয়ানবাসী সকলে খিলাত আক্রমণ করিতে উদ্যত। ইংরাজ শাকা খাঁকে সাহায্য করিতে অগ্রসর। ব্যাপার কত দূর গড়াইবে তাহা জানিনা। একজন রমণীর উদ্ধার সংকল্পে এইরূপ আত্মোৎসর্গ দেখিলে কে না মুগ্ধ হয়!

পারস্য। তাব্রিজে গোলযোগ ক্রমশঃই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি এক বিপ্লবে দুইশত লোক খুন হইয়াছে। উত্তেজিত জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভের জন্য উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। শাহ মহোদয় এ যাবৎ কাল অসিবলে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু এখন ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছেন যে প্রজার হৃদয়-জয় করা ভিন্ন দেশে অথণ্ড শান্তি স্থাপনের অন্য কোন উপায় নাই। তিহারাণ সহরে নূতন মন্ত্রীসভা বসিয়াছে। বোধহয় সত্বরেই পারস্য অন্তর্বিদ্রোহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। এখন জগতে প্রজাশক্তি অভ্যুত্থানের যুগ!

তুরস্কে নব পার্লামেণ্ট! তুরস্কে পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। এত দিন ধরিয়া মাসিডোনিয়ার শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে গোলযোগ হইতেছিল, তাহা মুহূর্ত্তে সমস্ত মিটিয়া গেল! স্বদেশের উদ্ধার কল্পে মাসিডোনিয়ায় একটি যুবকসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমিতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্য্যতৎপরতার গুণে তুরস্ক নব জীবন প্রাপ্ত হইল। এই সমিতির সভ্যগণ প্রথমে বিদ্রোহী হইয়া দলে দলে প্রজাসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। ইহাদিগের দমনের নিমিত্ত তুরস্ক সুলতান ওসমান ফেজীকে প্রেরণ করেন! কিন্তু অকৃতকার্য্য ফেজীকে ইহারা বন্দী করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রাখে। এ সংবাদে সুলতান অতীব বিচলিত হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিলেন। সৈয়দ পাশা তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইলেন। পরিশেষে বুদ্ধিমান সুলতান প্রজা সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য কনষ্টাণ্টিনোপল সহরে পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার সম এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বিপ্লব অন্তর্হিত হইল। বহুদিনের পর মুসলমান খৃষ্টান এক প্রাণে মিলিত হইয়া দেশের হিতে প্রবৃত্ত হইল। সুলতানের জয় ধ্বনিতে তুরস্কের আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মাসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, সর্ব্বিয়া সর্ব্বত্রই আজ আনন্দের মহারোল।

—*—

পূর্ব্ব ও পশ্চিম।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস ?

একদিন যে শ্বেতকায় আর্য্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মত সরাইয়া দিয়া ফলশস্তে বিচিত্র, আলোকময়, উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি, শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্য্যেরা অনার্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্য্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ ছিল তখনো অনার্য্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তারপর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল ; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে একথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্য্যেরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে শুভ্রতা মলিন হইয়াছে ; এবং আর্য্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে ; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্ব্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে ? বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস ? হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দুমুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে যে বিশ্বকর্ম্মা মানবসমাজকে সঙ্কীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহঙ্কারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন ?

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি

আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সব চেয়ে বড় করিয়া আলোচিত হইতেছে তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকীল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, নয় ইংরেজ, নয় আর কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান গাড়িয়া বসিবে একথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহঙ্কার ; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহাই নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে,—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে ; নিজেকেই ব্যক্তি হিসাবেই হউক্ আর জাতি হিসাবেই হউক্ জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা অলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে—পৃথিবীতে আজ সে দম্ভের মূল্য কি ? রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্ব্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল তাহাতে রোমকের অহঙ্কার অসম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে ? গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে ;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু, মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্ত্তমান বিশেষ আকারটিকে একবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিবনা, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে খণ্ড সামগ্রী কোনো মতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিঁকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সেই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবেনা, যাহা

কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত ইতিহাসে বিধাতা তাঁহাকে আঘাতের পর আঘাতে, হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জ্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্ব্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষ ভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর কেহ পদার্পণ করিবেনা, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে, এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্ব্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা ত পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিবনা। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজকে সর্ব্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্ত্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে? পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের নানা পরিবর্দ্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্ত্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে, আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মত জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে পর্য্যন্ত না সফল হইবে, জগৎ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে পর্য্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে পর্য্যন্ত না সার্থক হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মনুষ্যের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কি অধিকার আছে? বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে? একি আমাদেরই ভারতবর্ষ? সেই আমরা কাহারা? সে কি বাঙালী, না মারাঠি, না পাঞ্জাবী; হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড "আমরার" মধ্যে যে কেহই মিলিত হউক্, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরও যে কেহ আসিয়াই এক হউক্ না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে আর থাকিবে কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্ব্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন;—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন; ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে দেশেই যে কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কারবশত মহাকালের অভি-

প্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মত তিনি বিদ্রোহ করেন নাই ; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মত বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রাণাডে পূর্ব্ব পশ্চিমের সেতু-বন্ধন-কার্য্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা শক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব, রাণাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহার-বিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসের যে উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতা সাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড় তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্ব পশ্চিমের আদান প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভাল করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যেদিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব্ব পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা

নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমনি করিয়া, যে জিনিষটা বড় তাহাকে আমরা ছোটর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্ব্বত্রই ব্যথা পাইতেছে ; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে এই মিলন চেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি ত কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন কি, অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করিব ? তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই ? কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র ? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানাশক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্ত্তমান বিরোধের আবর্ত্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল ? এই বিরোধের তাৎপর্য্য কি তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলন সাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম ; আমাদের বিচার বুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল ; এমন করিয়া যথার্থ ভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বল আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বল, তাহা উপার্জ্জনের অপেক্ষা রাখে—অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে—কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এই জন্য কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্ব্বিচারে নির্ব্বিরোধে দুর্ব্বলভাবে দীনভাবে

যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মুল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিস পোষাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্বর্ত্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্ব্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এই জন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোন মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মত আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলি পূরণ করেন নাই।

যে শক্তি নব্যভারতের আদি অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংরেজ ভারতবাসীর যে বিবাদ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব;—ইংরাজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু একটি মাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়-বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্য ভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংশ্রব না ঘটে; ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানতঃ আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্র চালকরূপে তাহাকে আফিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয় ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহৃত হইয়া পৃথক্ হইয়া থাকি তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্ব্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ

এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরাজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড্ হেয়ারের মত মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন—তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজ জাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকট আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব্ব করিয়া ইংরেজের দিক্ হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্ব্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্রেরা তাহা করে না; তাহারা গ্রাস করে তাহারা ভোগ করে না। সে কালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত সেক্সপীয়র বায়রণের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, সদাগর বল, পুলিসের কর্ত্তা বল, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না—সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে খর্ব্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভাল আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন ত মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্ত্তে বিচার এবং আইন রুটির পরিবর্ত্তে পাথরেরই মত। সে পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান্ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্যক্ মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যতকিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন না একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দ্দাম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেই জন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে এ সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্য ভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার যাহা কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই—এবং বোঁটার বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণাম হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সে জন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে তাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্তহস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বারবার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে ভাল তাহা আরামে গ্রহণ

করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকুরীর লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করি। ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারাই ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপ-প্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তুলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয়, তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারিদিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্ত ভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দুর পর্য্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এইখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ সমাজ, হয় সিভিলিয়ান সমাজ, নয় বণিক সমাজ, নয় সৈনিক সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রের সংস্কারসকল সর্ব্বদাই তাহাদের চারিদিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারিদিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এদেশের হাওয়ায় কেবলি কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলো আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষ সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না; এই জন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে, তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; যে বিচারে ন্যায়ধর্ম্মের সঙ্গে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিবে সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি দুর্ব্বলতা বশতই ইংরেজের ইংরেজত্ব উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, সেই জন্যই যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেই জন্য পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড় সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্ব্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা কিছু দুঃখ অপমান। এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন কি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সে জন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না, কোন মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে, যে ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্যাগশীলতা দ্বারা শ্রেয়কে বরণ

করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য, আমাদের সমস্ত সামর্থ প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতি সাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তা বশত নিজেরা দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না; এবং ভারতবর্ষ কেবলি বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্ম্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না, এই জন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এই জন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন বর্ত্তমানে ভারত ইতিহাসের যে পর্ব্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

ধ্রুবতারা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। মূল্য ১॥• টাকা। গ্রন্থখানিতে পাশাপাশি হিন্দু ও ব্রাহ্মগৃহের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আজিকার স্বার্থসংঘর্ষের দিনে যখন ভ্রাতা ভ্রাতার সুখে ঈর্ষ্যান্বিত ও অনিষ্ট সাধনে পশ্চাৎপদ্ হন্ না তখন উপেন্দ্রনাথের একান্নবর্ত্তী ও অতিথিপরায়ণ পরিবারটির প্রতি চাহিলে সত্য-সত্যই চোখ জুড়াইয়া যায়। হিন্দুগৃহের অশিক্ষিতা কিশোরী বধূ বনলতার পতিপ্রেম—স্বামীর নিকট তাহার সঙ্কোচ লজ্জা অভিমান প্রভৃতি বঙ্গের পল্লীগৃহের নিখুঁত ফটো। উপেন্দ্রনাথের চিত্রে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণের আশা উদ্যম উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিও লেখক অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। অশিক্ষিতা বনলতার সহিত যখন উপেন্দ্রনাথের বিবাহ হইল, উপেন্দ্রের তখনকার মনের অবস্থা ব্রাহ্মপরিবারস্থ শিক্ষিতা চারুলতার সংস্পর্শে আসিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার হৃদয়ে ইহাতে ক্রমশ কিরূপ ক্ষোভ কিরূপ অতৃপ্তি জাগাইয়া তুলিল, তাহা লেখক দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। বনলতা, উপেন্দ্র, বড়মা, চারুলতা, পরেশচন্দ্র, শ্যামচাঁদ ও তাঁহার গৃহিণীর চরিত্রগুলি, যেমন স্বাভাবিক তেমনি চিত্তাকর্ষক। যে যে অংশে বাংলার সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বঙ্গ সাহিত্যের অপূর্ব্ব সামগ্রী।

পল্লিচিত্রাঙ্কনে লেখক যেমন পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার অনভিজ্ঞতা তেমনি হাস্যজনক এবং ব্রাহ্মগৃহের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতদোষে অস্বাভাবিক

ও বিকৃত হইয়াছে। চকারভর্ত্তির সহিত প্রভাবতীর নির্লজ্জ ব্যবহার ও অরুণের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর হোয়াইট ভিলার ডিনার-পার্টিতে মহিলাগণের বিশ্রম্ভালাপ নিতান্ত অসহ্য! যাঁহারা এরূপ ডিনার-পার্টিতে গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন এখানকার আতিথ্য, আলাপ, কথাবার্ত্তা অতিশয় সৌজন্যব্যঞ্জক ও সুখজনক, ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ বা নিন্দা গ্লানির কোনরূপ হীনতাই থাকে না। প্রভাবতীকে নিতান্ত শয়তানীর বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে—অথচ তাহাকে এত কুৎসিত না করিলেও লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। চকারভর্ত্তির সাহিত প্রভাবতীর বীভৎস ব্যভিচারের চিত্র আঁকিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। অন্ততঃ যতীন্দ্র বাবুর উপন্যাসে যে সে চিত্র দেখিতে হইবে এমনটি কল্পনা করি নাই। সকল সমাজেই ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোক আছে। কিন্তু এক সমাজের ভাল 'সেটের' সহিত অপর সমাজের মন্দ 'সেটের' তুলনা সঙ্গত বা সমীচীন নহে। ব্রাহ্ম-চিত্রটুকু কোনমতে যেন কালিমাময় করিয়া তুলাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য—বইখানি পড়িলে লোকে এইরূপ মনে করিবে। যাহা হউক এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতীর পাঠকবর্গকে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঘটনা-বৈচিত্র্যে পুস্তকখানি বিশেষরূপে প্রশংসনীয়; এই ৩৬৫ পৃষ্ঠব্যাপী উপন্যাসখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

হোমশিখা।—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত; সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য এক টাকা। নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের লিরিক্-পাঠে জ্বালাতন বঙ্গসাহিত্যের পাঠক পাঠিকা সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতা গ্রন্থে একটু মনোরম বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইবেন। অনেকের বিশ্বাস মামুলী প্রেমের কবিতা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ক কবিতা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না;—আমরা তাঁহাদিগকে 'হোমশিখা' পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রেমের কবিতার চর্ব্বিত চর্ব্বণের প্রলোভন ছাড়িয়া নবীন কবি যে সুন্দর ও মহান ভাবের সাধনায় নিরত হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কল্যাণসাধন হইবে, ভরসা করা যায়। স্থলবিশেষে কবি ভাবকে অনাবশ্যকভাবে পল্লবিত করিয়াছেন সেগুলি সংক্ষিপ্ত ও মার্জ্জিত হইলে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত। যাহা হউক আমরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি ও কবির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত।—শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, প্রণীত। মূল্য ১।০। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যগণ বাঙ্গালার ইতিহাস,—বাঙ্গালীর পুরাবৃত্তের সঙ্কলনের জন্য অধ্যবসায়ের সহিত নিযুক্ত হইয়াছেন, দেশের সুলক্ষণ। বাস্তবিক, এমন একখানি ইতিহাস নাই যাহা পড়িয়া যথার্থ অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী হৃদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, বাঙ্গালীর ইতিহাসে হয়ত যুদ্ধ বিদ্রোহ বিপ্লব বিরল হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস একেবারে হীন নহে। বাঙ্গালীর এত জাতিবিভাগ কোথা হইতে আসিল, বাঙ্গালী আদৌ আর্য্যবংশোদ্ভব কি না—বাঙ্গালীর শক্তি ও জ্ঞান কখন উন্মীলিত হইতে আরম্ভ হইল—সে সব কথা প্রচলিত ইতিহাসে নাই। অথচ সে গুলি ইতিহাসের অন্তর্গত। শুধু ইতিহাস নহে বাঙ্গালার ভৌগলিক বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষিত যুবকগণেরও অজ্ঞাত। বাঙ্গলার নদ-নদীর নাম অনেকেই অবগত নহেন! পরেশ বাবু বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে বাঙ্গালার ভুগোলের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া অনেক অভাব মোচন করিয়াছেন। লেখক এই গ্রন্থে অনেকস্থলে মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়! আমরা একথা বলিতেছি না—যে তিনি সকল স্থলেই সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তবে এই জটিল তত্ত্বে তিনি যথেষ্ট বিচার নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরেশ বাবুর মতে কায়স্থগণ যথার্থ ক্ষত্রিয় নন্। এ বিষয়ে তিনি নগেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় কি না—এ মীমাংসায় বাঙ্গালীর বিশেষ কিছু উপকার আছে মনে হয় না তবে সত্যের অনুসন্ধান অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে পরেশ বাবু 'বাঙ্গালা' (আধুনিক বাঙ্‌লা বা বাংলা) শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহা দিয়াছেন তাহা এই;—"ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই বঙ্গদেশ 'বাঙ্গালা' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে মৃত্তিকার উচ্চ আল বা বাঁধ ছিল। তজ্জন্য আলবিশিষ্ট বঙ্গ "বঙ্গালা" বা "বাঙ্গালা" নামে প্রসিদ্ধ হয়। আইন-ই-আকবরীর গ্রন্থকার বাঙ্গালা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি করেন। কুলগ্রন্থে এক স্থানে লিখিত আছে—

"বন্দ্য বঙ্গে বাস পার্শ্বে বাঙ্গালার আলি"! বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের নাম প্রথমে বাঙ্গালা হয়, পরে সমস্ত বঙ্গদেশ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়।

এই গ্রন্থে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত সংকলিত হইয়াছে। আশা করি শীঘ্রই আমরা ইহার উত্তরখণ্ড দেখিতে পাইব। গ্রন্থের একটী সামান্য ত্রুটি এই যে ইহার প্রথমে একটী সূচি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অনেক নুতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি এবং প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পৌরাণিক ব্রতকথা।*

১

কৈলাসে একদিন ঠাকুর ও ঠাকুরাণী বসিয়া পাশা খেলিতেছেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সেবার্থ ফুল তুলিতেছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন—"দেখ দিখিন বামুন বুড়ো কার হার কার জিত?" বুড় প্রমাদ গণিলেন, ঠাকুরকে হারালে ঠাকুর শাপ দেবেন, ঠাকুরুণকে হারালে ঠাকরুণ ভস্ম করবেন। শাপ দেওয়া ভাল না ভস্ম করা ভাল? শাপ দিলে পৃথিবীতে রব ভস্ম কল্লে উড়ে যাব, অতএব শাপ নেওয়াই ভাল।

বিচারে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ঠাকুরকে হারাইয়া ঠাকরুণকে জিতাইলেন। ঠাকুর ক্রোধে হতজ্ঞান, এতবড় আস্পর্দ্ধা! পাজী বেটা! শাপ দিলেন, "স্ত্রীকে জেতালি, স্বামীকে হারালি, বেটার গায়ে কুষ্ঠি হো'ক। কুড়ি নাড়, কুড়ি চাড়, কুড়ির সেবা বার বছর কর।" তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ, স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে ভূতলে পড়িলেন, রাখ গো বাপ্, দুর্গা গো মা! শাপ দিলে বর দিলেনা, পরিত্রাণ কর গো, ব'লে চেঁচাতে লাগলেন্।

২

ঠাকুর বলেন, আমি পৃথিবী ভ্রমণে যাব, ঠাকরুণ বল্লেন, আমি তোমার সঙ্গে যাব। 'না ছি! বাপ রে? তা হবেনা, মেয়ে মানুষ, বামা লোক, তোমায় নিয়ে পথ চলা হবে না, পথে নানা বিভীষিকা ঘটাবে।'

ঠাকুরাণী নাছড়বান্দা, স্ত্রীজাতি কিনা,—"না, আমি যাবই, না যদি সঙ্গে নাও, কাঁটার মত ছুঁচলো হয়ে তোমার পায়ে যাব, পানের মত চেটালো হয়ে তোমার কোঁচায় যাব, আমি যাবই যাব।" এড়ান নাই, বিড়ান নাই, দেখে ঠাকুরকে শেষে হার মানতে হল।

"তা যাবে যদি একান্তই, আমার কথা শোনো পৃথিবীর তিনদিক্ চেয়ো, একদিক্ চেয়ো না।"

তবু ঠাকুরাণীর আবদার, "যাব ভ্রমণে, আমার যাখুসি তাই করব, সে আমি বুঝব।" দুজনে গেলেন ভ্রমণে, ঠাকুরাণী পৃথিবীর তিনদিক্ চেয়ে দেখলেন, চারিদিকেই সুখ সম্পত্তি, কারো ছেলের বে হচ্চে, কারো মেয়ের বে হচ্চে, কারো ছেলের ভাত হচ্চে, কারো ছেলের পৈতে হচ্চে, সুখের আর অবধি নাই, ঠাকুরাণী বড় সন্তুষ্ট, 'পুর্থিবীতে' নরলোক বড় সুখে আছে দেখে বড় সুখী হলেন। স্ত্রী স্বভাবের দোষ, ঠাকুরাণীকেও ছাড়ে না,

"যে দিক্ চাইতে ঠাকুর মানা করেছেন, সে দিকে কি আছে দেখি!" সে দিক দক্ষিণ দিক্, দক্ষিণ দিক চেয়ে দেখলেন, কুড়ে বুড় কাঁদছেন রাখ গো বাপ, দুর্গা গো মা! শাপ দিলে বর দিলেনা, পরিত্রাণ কর গো।"

ঠাকুরাণী সেখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাব না।" ঠাকুর চমকিত, "কেন কি হোল?"

"ঐ যে কুড়ে বুড় তোমার স্মরণ করে চেঁচাচ্চে, ওকে ভাল কর ত তোমার সঙ্গে যাব, নইলে যাব না।"

* রাখ্ দুর্গার ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে সতের ধান ও সতের গাছি দুর্ব্বা সংগ্রহ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয় এবং পূর্ণিমাতে প্রবন্ধ লিখিত নিয়মে পূজা উদযাপিত করিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত চারিমাস এইরূপে এই ব্রত করিতে হয়। অধুনা ইহার প্রচলন প্রায় নাই, পল্লীগ্রামে কোথাও দৃষ্ট হইতে পারে।

হতাশে ঠাকুর বল্‌লেন "তখনি ত বলেছিলুম, মেয়ে মানুষ বামালোক, তোমায় নিয়ে পথ চলা হবে না, পথে নানা বিভীষিকা ঘটাবে। এখন কি করি তা বল? আমি যারে শাপ দিয়েছি তারে ত বর দিতে পারি না।" *

"শাপের কর্ত্তা তুমি, বরের কর্ত্তা আমি।"

কোথা পান কালী,. কোথা পান কলম, কিসে বরপত্র লিখেন? বট পত্র ছিঁড়ে বরপত্র করলেন, কড়ে আঙ্গুলটি কলম কর্‌লেন, নয়নের কাজল দে পত্রখানি লিখে দিলেন, সিঁথের সিঁদুর দে পত্রখানি পাট করলেন।

এক সত্যিকালের কাক যাচ্ছিল, দেখে বল্লেন, "সত্যিকালের কাক তুমি, সত্যিকারের কাক হও, পত্রখানি তুলে নাও, কুড়ের বুকে ফেলে দাও।" সত্যিকালের কাক তা কাণে শুন্‌লেন মনে ধর্‌লেন, পত্রখানি তুলে নিলেন, কুড়ের বুকে ফেলে দিলেন।

ঠক্ করে গায় পড়লো, কুড়ে বলে, কে মারে গোলা, কে মারে গুলি? "কেউ মারেনা গোলা, কেউ মারেনা গুলি, পড়োশুনো বুড় বামন, পড়ে শুনে দেখ।" পড়োশুনো বুড় বামন, পড়ে শুনে দেখলেন, ঠাকুরের শাপ, ঠাকরুণের বর। আনন্দে তাঁর চক্ষের জল পড়লো। উরু চিরে পত্রখানি রেখে দিলেন।

হাতাহাতি করলেন, নখানখি জুখলেন, অগ্রহায়ণ মাস পেলেন, অমাবস্যা পেলেন, সতের গাছি দুর্ব্বা তুললেন, সতেরটি ধান আর কোথাও পান না।

এক সত্যিকালের টিয়া পাখী এক শীষ ধান মুখে করে উড়ে যাচ্ছিল,

"সত্যিকালের টে তুমি, সতিকারের টে হও, ধান শীষটি ফেলে দাও। সত্যিকালের টে তা কাণে শুন্‌লেন, মনে ধর্‌লেন, ধানশীষটি ফেলে দিলেন! বুড় সতের ধান সতের দুর্ব্বা তুললেন, ১৬ দিনে সতের কথা শুন্‌লেন, একদিনে দুই কথা শুন্‌লেন, আগে খেলেন গুলি শুলি।

ক্ষীরের গুলি শুলি আর কোথায় পাবেন, সতেরটি বালির গুলি শুলি করে দেবতাকে নিবেদন করলেন, "মা, বালির গুলি শুলি কি মানুষে খেতে পারে?" করুণাময়ীর করুণ দৈববাণী হোল, "বালির গুলি শুলি খাবে কেন? ক্ষীরের গুলি শুলি খাও।" ক্ষীরের গুলি শুলির ভাব উড়তে লাগলো।

আগে খেলেন গুলি শুলি, দোজে খেলেন পায়স ভাত, তে'জে খেলেন দইভাত, সম্পূর্ণ খেলেন পুলি, কার্য্য হল সমাকুলি, রাখ্ দুর্গা অনুকূলি, লাল ফুল জোড়া কলা, রক্ত চন্দন কাঁচা দুধ, কাম সিঁদুর চিনি চাঁপাকলা। পূজো আচ্ছা দিলেন, ঠাকুর ঠাকরুণ ঘটে এসে বস্‌লেন, টাটে দিলেন ভর, পূজো আচ্ছা খেলেন, পরিতোষ হলেন, "কও কুড়ে বুড় বামুন কি বর চাও?" "এই বর চাই মা! আমার কুড়ি গুলি চামড়ি চামড়ি হোক, রাজকন্যা ইচ্ছামতী আমার সঙ্গে স্বয়ংবরা হোক।" তথাস্তু বললেন, অন্তর্ধ্যান হলেন। কুড়ি গুলি চামড়ি চামড়ি হোল, বুড় রাজপথে পড়ে রইলেন।

৩

রাজকন্যা, সদাগরের কন্যা, পাত্রের কন্যা ও কোটালের কন্যা, চার কন্যা পড়তে যান।

কুড়ে বুড় পথ আগলাইয়া পড়িয়া আছে। "ওরে কুড়ে! পথ ছেড়ে দে।"

"আমার অঙ্গে নাইক শক্তি আমার অঙ্গ লজ্ঘে যাও ইচ্ছামতি!" 'বাপ্‌রে! ব্রাহ্মণ নারায়ণ, বিষ্ণুর সমান, তোমার অঙ্গ লজ্ঘে যাব! নাই ধর্ম্ম জ্ঞান? পথ ছেড়ে দাও।' তিন কন্যা ডিঙ্গিয়ে গেলেন, রাজকন্যা দাঁড়িয়ে রইলেন।

* ঠিক বুকাননের যুক্তি! ইহারা যে দেবতার বংশ ইহা হইতে স্পষ্টই তাহার প্রমাণ হইতেছে। ভাং সং

'বুড় আমায় পথ ছেড়ে দাও।' 'তবে আমার সঙ্গে যদি এক সত্য কর তো পথ ছেড়েদি।' কিছুতে পথ ছাড়বেনা দেখে রাজকন্যে সত্যি কল্লেন। এক সত্যি, দুসত্যি, তিন সত্যি কর্‌লেন। কুড়ে পথ ছেড়ে দিলেন। অর্দ্ধেক পথ গেলেন ফিরে কুড়ের কাছে এলেন। 'কুড়ে! আমায় কি সত্যি করালে তা বল? হাতি চাইলে, না ঘোড়া চাইলে, না দোলা চাইলে? না ধন চাইলে না দৌলত চাইলে? কি চাইলে তা বল?' 'হাতিও চাইনি, ঘোড়াও চাইনি, দোলাও চাইনি, ধনও চাইনি, সম্পত্তিও চাইনি, কিছুই চাইনি। আমি তোমাকে এই সত্য করালুম, তুমি আমার সঙ্গে স্বয়ংবরা হবে।' 'আ সর্ব্বনাশ! এমন সত্যি কেন্ করালে? এক রাজার ঝি আমি, আর এক রাজার বউ হব, সোণার খাটে শোব, রূপার খাটে পা মেল্‌ব, দাসী চাকরে সেবা করবে—না আমার কর্ম্মে এই ছিল, কুড়ি নাড়ব, কুড়ি চাড়ব, কুড়ির সেবা করব।

সেদিন আর রাজকন্যার পড়িতে যাওয়া হল না। সত্যে বদ্ধ হয়েছেন, উপায় নাই, বাড়ী ফিরে গেলেন, শয়ন ঘরে কপাট দিয়ে শুয়ে রইলেন।

রাজা অপুত্রক, একশত রাণীর মধ্যে এক কন্যে, কেউ ইচ্ছামতীর নাবার জো করছেন, কেউ পূজার জো করচেন, কেউ খাবার জো করচেন, ক'রে ঘর বার ক'রছেন অন্য দিন ইচ্ছামতী এতক্ষণ আসেন আজ কেন আসছেন না? গিয়া দেখেন, যে ইচ্ছামতী শয়নঘরে কপাট দিয়ে শুয়ে আছেন। কেন মা! কে হেলেচে? কে ফেলেচে? কে বড় বোল ব'লেচে?

"কেউ হেলে নি, কেউ ফেলে নি, কেউ বড় বোল বলে নি, রাজার ঘরের ঝি আমি—এতবড় কন্যে অবিবাহিতা রয়েছি, আজ বড় লজ্জা পেয়েছি।"

"ওঠ মা, নাও, পূজা আহ্নিক কর, খাও, সঙ্গের সখীদের নিয়ে আমোদ প্রমোদ কর। রাজা রাজভোলায় ভুলে রয়েছেন, আজ রাজা আসুন, রাজার সাক্ষাতে বলব এখন।" তখন ইচ্ছামতী উঠলেন, নাইলেন, পূজা আহ্নিক কর্‌লেন, খেলেন, সখীদের নিয়ে খেলা করতে লাগলেন।

৪

রাত্রি হয়েছে, রাজা বসেছেন খাটে, রাণী বসেছেন পাটে! "মহারাজ আজ একটা কথা বলব, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?" "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।"

"তুমি রাজভোলায় ভুলে রয়েছ, এত বড় কন্যা তোমার ঘরে অবিবাহিতা রয়েছে, লোকে নিন্দে কর্‌ছে, আমরা পেটে অন্ন জল দি কেমন করে?" "সত্যি বলেছ, আমি ভুলে রয়েছি এতকাল। কাল সকালে যার মুখ দেখব তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেব।" রাজার যেই সত্য করা অমনি ওদিকে কুড়ে বুড় ভগবতীর বরপুত্র ধীরে ধীরে এসে রাজার সিংহ দরজায় শুয়ে রইল।

প্রভাত হয়েছে, রাজা রাম রাম দুর্গা দুর্গা বলে গা তুললেন, গাড়ু নিলেন গামছা নিলেন, সিংহ দরজায় মুখ ধুতে চললেন। কুড়ে বুড় রাজাকে যেমন দেখলেন, অমনি মুখের কাপড় খুলে ফেললেন। রাজা গাড়ু আছড়ে ফেললেন, গামছা আছড়ে ফেললেন, ফিরে রাণীর কাছে এলেন।

"ছি ছি রাণি কি কর্‌লুম্! একটা কুড়ে বুড়, কি জাত তার ঠিক নেই, তার মুখ দেখলুম।" "দেখলে দেখলে তাতে ক্ষতি নাই, স্বয়ম্বরা কন্যা আমার স্বয়ংবরা হবে. যারে মনে ধরবে তার গলায় বরমালা দেবে।" "ভাল বলেছ; স্বয়ংবরের জোগাড় করি তবে।"

স্বয়ংবরের যোগাড় করলেন, দেশে দেশে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন, রাজসভা, দেবসভা,

গন্ধর্ব্বসভা, পণ্ডিতের সভা—চারি সভা সাজালেন। কাপড়ের ফরমাস দিলেন, ফুলের মালার ফরমাস দিলেন, আর আর বিবাহের সব উদ্যোগ আয়োজন কর্‌লেন।

এদিকে কুড়ে বুড় আস্তে আস্তে গিয়ে এক মালিনীর মালঞ্চে শুয়ে রয়েচেন, মালিনীর মালঞ্চে বার বছর ফুল ফোটেনা, ফুল ফুটে ধবলাকার হয়েচে। যত সব রাখালের পাল চেঁচাচ্চে, "ও মালিনি! তোর মালঞ্চে ফুল ফুটেচে।"

"মর সর্ব্বনাশির বেটারা! ঠাট্টা করিস্? বারবছর আমার মালঞ্চে ফুল ফোটেনা।"

"মর্ মাগী! দেখগে যা।" গিয়ে দেখেন, ফুল ফুটে ধবলাকার হয়েছে! আহ্লাদে চখের জল পড়্‌লো, কোন ভাগ্যিধর আজ আমার মালঞ্চে এসেছেন, মালঞ্চে ফুল ফুটেচে! দেখেন এক কুড়ে বুড় শুয়ে রয়েছেন। গলায় কাপড় দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। "বাবা! তুমি কে তা বল?"

"আমি কেউ নই মা. আমি তোমার বোন্‌পো, তুমি আমার মাসী।" "এস বাবা এস" ব'লে আদর অপেক্ষা ক'রে ঘরে নে গেলেন, পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধলেন, আদরে আদরে বোন্‌পোকে খাওয়ালেন, খাইয়ে দাইয়ে ফুলের মালা গাঁথতে লাগলেন। "মাসি! তুমি কার ফুলের মালা গাঁথ?" রাজকন্যা ইচ্ছামতী স্বয়ম্বরা হবে তার জন্য ফুলের মালা গাঁথি। "মাসি, মাসি! আমিও গাঁথব।"

"তা কি করে হবে, তুমি কুড়ে বুড়, তুমি কি ফুলের মালা গাঁথতে পার? রাজবাড়ী অপমান করবে।" "হোক মাসি আমি গাঁথব।" এড়ান নাই বিড়ান নাই, ফুলের মালা গাঁথতে বস্‌লেন। বিনি সুতোর চমৎকার এক ছড়া হার গাথলেন। ফুলের মালা নিয়ে মালিনী রাজবাড়ী গেলেন, মালা দেখে রাণীরা অবাক্, 'মাসি মাসি এ ফুলের মালা কে গেঁথেছে তা বল?'

"কেউ গাঁথে নি মা! আমি গেঁথেছি।" "কখনও তুই গাঁথিসনি, কে গেঁথেছে তা বল?" "ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?" "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।" "আমার এক বোন্‌পো এসেছে সেই এ মালা গেঁথেছে।"

একগুণ সিধে দিতেন, দুগুণ সিধে দিলেন, ভাল কাপড়খানা দিলেন, টাকা কড়ি দিলেন, মালিনীকে তুষ্ট করে বিদায় কর্‌লেন।

"মাসি মাসি, রাজার বাড়ী কিসের গোল দেখে এলে তা বল?" "রাজকন্যা ইচ্ছামতী স্বয়ম্বরা হবে সেই গোল দেখে এলুম।" "মাসি আমি যাব।" "বাপরে! তুমি কুড়ে আতুর হাতি ঘোড়ার চাপে কোথায় মারা যাবে, তুমি কি যেতে পার?" "হোক মাসি! আমি যাব।"

এড়ান্ নেই বিড়ান নেই, যাবেনই। ক্ষারখোর দিয়ে বস্ত্রখানি পরিস্কার করে দিলেন, চন্দন ঘোষে ফোঁটা কেটে দিলেন, ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিলেন, দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলেন। কুড়ে সিং-দরজা দে ভিড়ের জন্য পথ পেলেন না, নর্দ্দামার ভেতর দে গলে গিয়ে এক তুলসী মঞ্চে ঠেস্ দে বসলেন।

এদিকে ইচ্ছামতীকে সখীরা কেউ গা মুছিয়ে দিচ্চেন, কেউ চুল বেঁধে দিচ্চেন, কেউ অলকা তিলকা পরিয়ে দিচ্চেন, কেউ অলঙ্কার বস্ত্র পরিয়ে দিচ্চেন। সাজসজ্জা হোল আশে নিলেন বামন, পাশে নিলেন দাসী।

ফুলের মালা নিলেন, চন্দনের বাটি নিলেন, বস্ত্রযোড় নিলেন, নিয়ে স্বয়ম্বরসভায় চললেন। রূপের ছটায় সভা আলো! কেউ গলা বাড়িয়ে দিলেন—

"রাজকন্যা ইচ্ছামতি! আমি বড় রূপবান্ আমার গলায় দাও বরমালা।" কেউ গলা বাড়িয়ে দিলেন, "রাজকন্যা ইচ্ছামতি আমি বড় ধনবান, আমার গলায় দাও বরমালা!" কেউ গলা বাড়িয়ে দিলেন, "রাজকন্যা ইচ্ছামতি! আমি বড় গুণবান আমার গলায় দাও বরমালা।" কোন দিকে কারো পানে চাইলেন না, চারিদিক চেয়ে দেখলেন, কোথাও কুড়ের দেখা পেলেন না, তিনবার ধর্ম্ম সাক্ষী কর্‌লেন "হে ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী, আমি কোথাও কুড়ের দেখা পেলুম না।" তিনবার ধর্ম্ম সাক্ষী কর্‌তেই কুড়ের দিকে নজর পতন।

যত দেখলেন ছার খার, কুড়েকে দেখলেন উত্তম বর।

কুড়ের পায়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিলেন, কাপড়ের জোড় দিলেন, ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিলেন, সাতবার প্রদক্ষিণ কর্‌লেন, বাঁদিকে গে বসলেন।

যত রাজা পাত্র হাততালি দিয়ে উঠলো, "ছ্যা! ছ্যা! ছার রাজার বাড়ীর ঝি জন্মেছে কুলের অঙ্গার।"

এত রাজা রয়েছে কারে মনে ধরলো না, একটা কুড়ে আতুর কি জাত তার ঠিক নেই, তার গলায় দিলে কন্যা বরমালা! যে যার ঘরে গেল, রাজার যজ্ঞ পচতে লাগলো।

মনের ঘেন্নায় রাজা অন্তঃপুরে রাণীর কাছে গেলেন। রাণী এ কন্যার আর মুখ দর্শন কর্‌বো না, এ কন্যা হতে আমার যজ্ঞ নষ্ট হোল, কুলে কলঙ্ক পড়্‌লো। এত রাজপাত্র কারে মনে ধরলো না, একটা কুড়ে আতুর কি জাত তার ঠিক নেই তার গলায় দিলে বরমালা? ইচ্ছামতীকে বারবছর বনবাস দেব। কোটালকে ডেকে হুকুম দিলেন, "কোটাল! ইচ্ছামতীকে বারবছর বনবাস দে এস।" কোটাল খিড়কীর দোর দে ঝিজামাইকে মার কাছে নে গেলেন। মার প্রাণ, ঝিজামাইকে আদর অপেক্ষা করে ঘরে নিলেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধলেন, আদরে আদরে ঝিজামাইকে খাওয়ালেন, বার বছরের খাই খরচ দিলেন, বার বছরের খোর পোষাক দিলেন, দিয়ে কাঁদতে লাগলেন, "মা! তোমাকে বনে দিয়ে কি করে থাকব?" কি করবে মা, তোমার কর্ম্মে যা ছিল তা হোল।"

কোটাল ইচ্ছামতীকে অজগরবীজ বনে নে গেলেন, লতার বাঁধুনি, পাতার ছাউনি, ভেরেণ্ডার খুঁটি, তালপাতার আগড় দে একখানি কুড়ে বেঁধে রেখে এলেন। কাঁদতে লাগলেন, "ঠাকুরকন্যে এতকাল তোমার নুন খেলুম আজ তোমাকে বনবাস দিলুম।" "তুমি কি করবে বল, আমার কর্ম্মে যা ছিল তা হলো।"

বার বছর উতরে গেছে, দেবতা বর্ষেচে, ঘরখানি ছেঁচচেন, দোরে বসে কাঁদছেন। "কেন ইচ্ছামতী কাঁদ?" "আমি যে কাঁদি তার আবার জিজ্ঞাসা? এক রাজার ঝি আমি, আর এক রাজার বউ হব, সোণার খাটে শোব, রূপার খাটে পা রাখব, দাসী চাকরে সেবা কর্‌বে—না আমার কর্ম্মে এই ছিল, কুড়ে নাড়বো কুড়ে চাড়বো, কুড়ের সেবা বার বছর কর্‌বো। "কুড়ে উরুত চিরে ভগবতীর বরপত্রখানি ফেলে দিলেন, পড়োশুনো রাজকন্যে, পড়ে শুনে দেখো।" রাজকন্যে পড়ে শুনে দেখলেন, ঠাকুরের শাপ ঠাকুরুণের বর।

হাতাহাতি করলেন, নখানখি জুখলেন, অগ্রহায়ন মাস পেলেন, অমাবস্যা পেলেন, সত্তের ধান সত্তের দুর্ব্বা

TORN PAGES

তুললেন। ষোল দিনে সতের কথা শুনলেন, একদিনে দুই কথা শুনলেন। আগে খেলেন গুলি গুলি, দোক্তে খেলেন পায়েস ভাত, তে'জে খেলেন দই ভাত, সম্পূর্ণ খেলেন পুলি, কার্য্য হল সমাকুলি, রাখদুর্গা অনুকুলি। লালফুল, জোড়-কলা, রক্তচন্দন কাঁচাদুধ, ঝুম সিঁদুর চিনি চাঁপা কলা। পুজো আচ্ছা দিলেন, ঠাকুর ঠাকরুন ঘটে এসে বস্‌লেন, টাটে দিলেন ভর, পুজো আচ্ছা খেলেন, পরিতোষ হলেন, "কও মা ইচ্ছামতি, কি বর চাও?" "এই বর চাই মা, আমার স্বামী আতুর ঘুচে চতুর হোক, কুড়ে ঘুচে মদনমোহন হোক, ষোল সতর বয়স হোক, আড়াই হাত কেশ হোক, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় মুর্ত্তি হোক, মদন কামদেব পুরুষ হোক। বন ঘুচে সহর হোক, স্বর্ণময় অট্টালিকা পুরী হোক, হাতি শালে হাতী হোক, ঘোড়াশালে ঘোড়া হোক, রাম লক্ষ্মণ গোলা হোক, সোনার খাটে শুয়ে রূপার ঘাটে পা মেলি, দাসী চাকরে সেবা করুক, পাট কাপড়ে রাত্রি বাস করি।" ইত্যাদি। ইচ্ছামতী আর কিছু বাকী রাখলেন না, এক রাত্রির মধ্যে রাজা ও রাজধানীর ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করলেন। ভগবতী পূজায় তুষ্ট, তথাস্তু বললেন, অন্তর্ধ্যান হলেন। রাত্রির মধ্যে সব হয়েছে, প্রভাতে দাসীরা ডাক্‌চে, "ঠাকরুণ, ওঠ গো!" চাকরেরা ডাকচে, "ঠাকরুণ ওঠ গো!" উঠে যা চেয়েছিলেন, সব পেলেন, সুখের আর অবধি নাই! এত সুখ এত সম্পত্তি তবু একদিন বারান্দায় বসে চক্ষের জল ফেলচেন! "এত সুখ, এত সম্পত্তি, তবু কেন ইচ্ছামতি কাঁদ"? এত সুখ এত সম্পত্তি, তবু এখনো অপুত্রবতী। "তার আর দুঃখ কি?

"যে ব্রত করে কন্তে পেয়েছি তোমারে, যে ব্রত করে হয়েছি সুন্দর, যে ব্রত করে এত সুখ এত সম্পত্তি, সেই ব্রত কর হবে পুত্রবতী।"

এক বছর গেলো, ফিরে বছর এলো, আবার সেই ব্রতের অনুষ্ঠান, সতর ধান ও দুর্ব্বা তুল্লেন, হাতাহাতি কর্‌লেন, নখানখি জুখ্‌লেন আর যা যা করার সব করলেন।

তখন ঠাকুর ঠাক্‌রুণ পাটে এসে বস্‌লেন, টাটে দিলেন ভর, পূজো আচ্চা খেলেন, পরিতোষ হয়ে বল্লেন,—কও মা ইচ্ছামতি, কি বর চাও?

"এই বর চাই মা! অপুত্রবতী আছি, পুত্রবতী হই।" তথাস্তু বললেন অন্তর্ধ্যান হলেন। ইচ্ছামতী গর্ভবতী হলেন, তিনমাসে কাণাকাণি, চারমাসে জানাজানি, পাঁচ মাসে কাঁচা সাধ, সাত মাসে পঞ্চামৃত খেলেন, আট মাসে আট ভাজা খেলেন, দশ মাসে প্রসব হলেন। কমল দলের মত তিন পুত্র এক কন্যা হোল। এক পুত কোলে একপুত দোলে, একপুত সোনার ভাঁটা খেলে। সুখের ষোল কলা পূর্ণ, এত সুখ, এত সম্পত্তি, এস ইচ্ছামতি! পাশা খেলি। পাশা খেল্‌তে বস্‌লেন, খেলতে খেলতে হাতের পাশা আচড়ে ফেল্‌লেন। "এত সুখ সম্পত্তি, কোলে পুত্তুর, তবু কেন কন্তে পাশা আচড়ে ফেল্‌লে? তবু কেন কাঁদ?" আমি যে কাঁদি তার আবার জিজ্ঞাসা? বার বছর মা বাপ বনবাস দিলেন, এত সুখ সম্পত্তি, কোলে পুত্তুর কিছু না টের পেলেন। "তার আর ভাবনা কি?

যে ব্রত করে কন্যে পেয়েছি তোমারে, যে ব্রত করে হয়েছি সুন্দর, যে ব্রত করে এত সুখ সম্পত্তি, যে ব্রত করে হয়েছ পুত্রবতী, সেই ব্রত কর, অস্মরণ বাপ মার স্মরণ হবে।"

তখন আবার সেই ব্রতের অনুষ্ঠান হোল। দেবী নাটাপানা চোখ কল্লেন, বাটাপানা মুখ কল্লেন, রাজার শিওরে স্বপ্ন দিলেন, রাণীর শিওরে স্বপ্ন দিলেন, ইচ্ছামতীর খবর নিবি ত

নে, নইলে তোকে স্বপুরী ধ্বংস করব। সকাল হয়েছে, রাজা রাম রাম দুর্গা দুর্গা বলে গা তুল্লেন, "রাণি আজ বড় দুঃস্বপ্ন দেখেচি, আজ ইচ্ছামতীকে স্বপ্ন দেখেছি।" রাণীরা বল্‌লেন মহারাজ! আমরাও বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। সখীরা বললেন, "মহারাজ ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?" "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।" আমরাও কাল ইচ্ছামতীকে স্বপ্ন দেখেচি। "ডাক কোটালকে," কোটালকে ডাকালেন, "কোটাল আমার ইচ্ছামতীর খবর এনে দিবিত দে, নইলে তোকে স্বপুরী এক গর্ত্তে করব।" কোটাল বলে, সে কি মহারাজ! তখন বল্লে, ইচ্ছামতীকে বনে দিতে, এখন বলছ তারে এনে দিতে। তাকে বাগে খেয়েচে কি গণ্ডারে খেয়েছে কি সাপে খেয়েচে, তারে এখন কোথা পাব? "যেখান থেকে পাও, সেখান থেকে নিয়ে এস।" কোটাল গিয়ে তখন ঘরে কপাট দে শুয়ে রইলেন মনের দুঃখে। কোটালের স্ত্রী কোটালের নাবার জো করেচেন, পূজোর জো করেচেন, খাবার জো করেচেন, আনাদিন রাজবাড়ী থেকে আসেন, আজ কেন এলেন না? দেখেন শয়ন ঘরে কপাট দিয়ে শুয়ে রয়েচেন। "কেন গা! কি হয়েচে?" এমন অবিচারী রাজার দেশে আর থাকা না, তখন বল্লেন ইচ্ছেমতীকে বনে দিতে, এখন বলচেন তারে এনে দিতে। বার বছর হয়ে গেছে, তারে বাগে খেয়েচে, কি সাপে খেয়েচে, কি গণ্ডারে মেরেচে তারে এখন কোথা পাব? "তার আর কি? ওঠ, নাও, পূজো আহ্নিক কর, খাও, সাতদিনের কড়ার করে নাও, সাতদিনের পথ খরচ নাও, যে পথে থুয়ে এয়েছ, সেই পথে যাও, যে বনে থুয়ে এসেছ সেই বনে যাও, পাও ভালই, না পাও, এ রাজার দেশ ছেড়ে অন্য রাজার দেশে যাব।" ভাল বলেছ! উঠ্‌লেন, নাইলেন, পূজো আহ্নিক করলেন, খেলেন, ফিরে রাজার বাড়ী গেলেন, সাতদিনের কড়ার কর্‌লেন, সাত দিনের পথ খরচ নিয়ে এলেন, যে পথে থুয়ে এসেছেন, সেই পথে যান, যে বনে থুয়ে এসেচেন, সেই বনে যান। দেখেন, বন ঘুচে বাজার হয়েছে, সহর হয়েছে, নগর হয়েছে, স্বর্ণময় অট্টালিকা পুরী হয়েছে। এ বাজার কার? কুড়ে রাজার। এ নগর কার? কুড়ে রাজার। এ অট্টালিকা কার? কুড়ে রাজার। তবে ইচ্ছেমতীর উদ্দেশ পেয়েচি! পুষ্করিণীর ধারে গে বসে রইলেন, দাসীরা সব ইচ্ছেমতীর নাবার জল তুলছেন। "মাঠাকরুণরা কার নাবার জল তোল?" রাজকন্যা ইচ্ছামতীর নাবার জল। "তাঁরে বল্‌তে পার, ঘাটে একটী লোক বসে রয়েছে, তোমায় দেখতে চেয়েছে।" "বাপরে! তাঁ আমরা কেমন করে বলব?" কোটাল হাতের আংটি খুলে কলসীর জলে ফেলে দিলেন। ইচ্ছামতীর মাথায় জল ঢালতে আংটি ঠক্ করে গায়ে পড়লো। "মর হারামজাদীরা! কি এনেছিস? গেঁড়ি এনেছিস, না গুগ্‌লি এনেছিস্? দেখে আনিসনি?" মাঠাকরুণ গো! ভয়ে কবো না নির্ভয়ে কব? "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।" গেঁড়িও আনিনি, গুগলিও আনিনি, ঘাটে একটি লোক বসে রয়েচে, হাতের আংটি খুলে জলে ফেলে দিয়েছে। বাপের কোটালের হাতের আংটি দেখে চিন্‌লেন, আপনার কোটাল পাঠিয়ে দিলেন, বাপের কোটালকে ডাকিয়ে আন্‌লেন, হাত মুখ ধোবার জল দেওয়ালেন, নাওয়ালেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধলেন,

TORN PAGES

আদরে আদরে খাওয়ালেন, খাইয়ে দাইয়ে জিজ্ঞাসা পড়া করলেন, "কও কোটাল! বাপ কেমন আছেন, মা কেমন আছেন, সখীরা সব কেমন আছেন, রাজার রাজ্যের লোকজন কেমন আছে?" বাপ যা কখন দেখেনি, তাই দিলেন, মা যা কখনো দেখেনি, তাই দিলেন, মান্‌টা পানাপানটা দিলেন, বেলটা পানাসোটা দিলেন, অলঙ্কার বস্ত্র দিলেন, বাপের কোটালকে তুষ্ট করে বিদায় কর্‌লেন। এদিকে রাজা বললেন, "দেখ দেখিন কোটাল বেটা হরষে আসচে কি বিরসে আসচে?" বিরসে আসবে কেন মহারাজ? হরষে আসচে। "কও কোটাল! আমার ইচ্ছামতী কেমন আছে?" মহারাজ! ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব.? "নির্ভয়ে কও।" মহারাজ! তোমার রাজ্যে যা দেখিনি ঠাকুরকন্যার রাজ্যে তা দেখে এলুম, তোমার রাজ্যে যা খাইনি, ঠাকুরকন্যার রাজ্যে তা খেয়ে এলুম, তোমার ঘরে পুত্তর দেখিনি, ঠাকুরঝির ঘরে. তিন পুত্ত্‌ুর এক কন্যে দেখে এলুম, এক পুত কোলে, এক পুত দোলে, এক পুত সোণার ভাঁটা খেলে। সুখের আর অবধি নাই, কুড়ে-টাকে মেরে ফেলেচে, কোন রাজপুত্র নিয়ে রয়েচে।" রাজা বল্লেন, আমি দেখতে যাব, রাণীরা বল্লেন, আমরা ইচ্ছামতীকে দেখতে যাব, সখিরা বল্লেন, ইচ্ছামতীর সুখ সৌভাগ্য হয়েচে কোলে পুত্তুর হয়েছে আমরা সব দেখ্‌তে যাব। হাতি ঘোড়ার দাপটে বন বাদাড় ভাঙ্গ্‌তে লাগ্‌লো, নগর টল মল কর্‌তে লাগলো।

ইচ্ছামতী ছেলে কোলে নিলেন, পিঁড়ি মাথায় নিলেন, জলের ঝারি হাতে করলেন, ক'রে বাপ মাকে এগিয়ে আনতে গেলেন। বাপ বল্লেন, 'ছিছি মা! তোমার ছেলে কোলে নেব না, তোমার জলে পা ধোব না, তোমার পিঁড়িতে বসবো না, কুড়েটাকে মেরে ফেলেচ, কোন রাজা পাত্র নিয়ে রয়েছ?" ছেলে আচড়ে ফেল্লেন, পিঁড়ে আচড়ে ফেল্লেন, জলের ঝারি আচড়ে ফেল্লেন, কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গেলেন। স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ইচ্ছেমতী কাঁদ?" আমি যে কাঁদবো, তার আর জিজ্ঞাসা? এতকাল পরে বাপ মা এলেন। বাপ হয়ে মিছে অপবাদ তুলে দিলেন। "দিলেন দিলেন মিছে অপবাদ তুলে, তায় ক্ষতি কি? বাপ মাকে অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া ক'রে দাও, অন্য জায়গায় খাই খরচ দাও, দিয়ে, যে ব্রত করে কন্যে পেয়েচি তোমারে, যে ব্রত করে হয়েচি সুন্দর, যে ব্রত করে এত সুখ, এত সম্পত্তি, যে ব্রত করে হয়েছ পুত্রবতী, যে ব্রত করে তোমার অস্মরণ বাপ মার স্মরণ হয়েচেত সেই ব্রত করে অপ্রত্যয় বাপ মার প্রত্যয় জন্মাও।" ভাল বলেছ, আবার হাতাহাতি করলেন, নখানখি জুখলেন, শেষে পুজা গ্রহণে দেবী পরিতুষ্ট হয়ে যখন ইচ্ছামতীকে বর দিতে চাইলেন, তখন ইচ্ছামতী বল্‌লেন, "বর চাই না মা শাপ চাই, আমার স্বামী যেমন কুড়ে ছিলেন তেমনি কুড়ে হোন, বনের মাঝখানে তেমনি একখানি কুঁড়ে হোক, আমার অপ্রত্যয় বাপ মার প্রত্যয় হোক।" দেবী তথাস্তু বললেন। কুড়ে বুড় কুঁড়ের মধ্যে রোগের যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগ্‌লেন। প্রভাতে রাজা গেছেন পুকুর ঘাটে মুখ ধুতে, রাণীরা গেছেন মুখ ধুতে ইচ্ছেমতীও গেছেন ঘাটে মুখ ধুতে। রাজা বল্লেন, মা! কাল রাত্তিরে তোমার

হাতিঘোড়ার চেঁচানিতে সারারাত ঘুমুতে পাইনি। ইচ্ছেমতী বললেন, "হাতীই বা চেঁচাবে কেন ঘোড়াই বা চেঁচাবে কেন? তোমাদের জামাই চেঁচিয়েচে, তোমরা অপ্রত্যয় বাপ মা প্রত্যয় করে নাও।" দেখে শুনে অপ্রত্যয় বাপ মার প্রত্যয় জন্মাল, গলায় কাপড় দে যোড়হাত করে তখন ইচ্ছেমতীকে বল্‌লেন "মা! তুমি কে? তা বল?" আমি কেউ নই বাবা, তোমারই কন্যে, আমি এক ব্রত করি, সেই ব্রত মাহাত্ম্যে আমার এত সুখ সম্পত্তি হয়েছে, স্বামী ভাল হয়েছে, কোলে পুত্তুর হয়েছে। রাণীরা বল্লেন, "মা তুমি যদি এমন ব্রত জান, তবে আমরা কেন অপুত্রবতী আছি, আমাদের শিখিয়ে দাও আমরাও পুত্রবতী হই। রাজা বল্লেন, আপনার দুঃখ সইতে পারি, জামাইয়ের দুঃখ দেখতে নারি, আগে জামাই ভাল কর মা। "এখন কেমন করে ভাল হবেন, এক বছর থাকুন, অগ্রাণ মাস আসুক, তখন ভাল হবেন।" বৎসরান্তে আবার অগ্রহায়ণ মাস আসিল, তখন একশত রাণী পুত্র কামনায়, ইচ্ছামতী স্বামীর আরোগ্য কামনায় সতর ধান সতর দুর্ব্বা তুল্‌লেন, ষোল দিনে সতর কথা শুন্‌লেন, পূর্ণিমায় ব্রত সমাধা কর্‌লেন। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার করিয়া এই ব্রতকথা শুনিতে হয় এবং পূর্ণিমার দিন দুইবার শুনিতে হয়। পূজা গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবতী বলিলেন, কও মা ইচ্ছেমতি! কি বর চাও? তখন ইচ্ছামতী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার কামনা জানালেন। একশত রাণী বললেন, আমরা অপুত্রবতী যেন পুত্রবতী হই। দেবী তথাস্তু বলে অন্তর্ধ্যান হলেন। ইচ্ছামতীর স্বামী আবার ভাল হলেন। এক-শত রাণী গর্ভবতী হলেন, তিনমাসে কানাকানি, চারমাসে জানাজানি, পাঁচ মাসে কাঁচা সাধ, সাত মাসে পঞ্চামৃত, নয় মাসে সাধ খেলেন, দশ মাসে প্রসব হলেন। একশত রাণীর একশত পুত্র হোল, সুখের আর সীমা নাই। রাজা বল্লেন, সব সাধ পূর্ণ হয়েচে, এত সুখ সম্পত্তি ভোগ হল, আর কেন, চল মা ইচ্ছামতি স্বর্গে যাই। "এখুনি কেন স্বর্গে যাবেন, আর কিছুদিন থাকুন, বউরান্না ভাত খান। তখন স্বর্গে যাবেন।" ছেলের বে দিলেন বউ হোল, ঝিয়ের বে দিলেন জামাই হোল, ভাইয়ের বে দিলেন ভাজ হোল, বাপের রাজ্য আপনার রাজ্য এক কল্লেন, বউরান্না ভাত খেলেন। তারপর একশত রাণী, দুই রাজা, ইচ্ছামতী স্বর্গ কামনায় ধান দুর্ব্বা তুললেন।

হাতাহাতি করলেন, নখানখি জুখলেন, অঘ্রাণ মাস পেলেন, অমাবস্যা পেলেন, সতর ধান সতের দুর্ব্বা তুললেন, ষোল দিনে সতর কথা শুনলেন, এক দিনে দুই কথা শুনলেন, আগে খেলেন গুলি গুলি, দোজে খেলেন পায়স ভাত, তে'জে খেলেন দই ভাত, সম্পূর্ণ খেলেন পুলি, মা দুর্গা অনুকূলি, কার্য্য হল সমাকুলি, লাল ফুল জোড়া কলা, রক্তচন্দন কাঁচা দুধ, কাম সিন্দুর চিনি চাঁপা কলা, পূজো আচ্ছা দিলেন, ঠাকুর ঠাকুরুণ ঘটে এসে বস্‌লেন, টাটে দিলেন ভর, পূজা আচ্ছা খেলেন. পরিতোষ হলেন, কও মা ইচ্ছামতি কি বর চাও?

"এই বর চাই মা, পৃথিবীতে এসে সকল মনস্কাম পূর্ণ হয়েচে, আর কিছু চাই না, স্বর্গ কামনায় ধান দুর্ব্বো তুলেচি, আমরা স্বর্গে যাব।" তথাস্তু বললেন, চুয়াচন্দনের ছড়া পড়ল, আলোক রথ নামল, ধবল ছত্র নামল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, একশত রাণী, দুই রাজা, ইচ্ছামতী সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

শ্রীসুশীলাবালা দেবী।

নির্ব্বন্ধ।

(১)

তখনো রাত্রি শেষ হয় নাই। উষার আলোকচ্ছটার উপর একটা সুনিবিড় কৃষ্ণমেঘ ঘন আবরণ বিস্তারের উপক্রম করিতেছিল। ভোরের পাখীগুলা বাহির হইতে না পাইয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া বাসার মধ্যে ডানা ঝট্‌পট্ করিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন কি একটা প্রলয় আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

আট বৎসরের পুত্র মধুকে সঙ্গে লইয়া কিনু মাছ ধরিতে বাহির হইল। এই ঝড়ের মুখ, কিন্তু না বাহির হইলেও নয়! পরদিন বেলা দশটার মধ্যে বাবুদের বাটী মৎস্য যোগাইতে হইবে; বিবাহের আনন্দোৎসব উপলক্ষে গ্রামে একটা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল।

স্ত্রী তারিণী কিনুকে বলিয়া দিল, "দেখিস্, যে মেঘ করেছে, বেশী দূর যাস্‌নে আর মধুকে সাবধান, ছেলে মানুষ!"

কিনু যখন ঘাটে যাইয়া ডিঙ্গি খুলিল, তখন মৃদু শীতল পবন বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। মধু ডাকিল, "বাবা!" "কেন?" "উঃ, কি মেঘ করেছে! এখনি ঝড় উঠবে যে!" পিতা আশ্বাস দিল, কহিল, "ভয় কি, আমি আছি! কত ঝড়ে আমি একলা বেরিয়েছি! আমাদের কি ঝড়জলের ভয় করলে চলে!"

তখন অদূরে জমিদারবাটী হইতে নহবতের মিষ্ট রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছিল। কিনু কহিল, "আমাদের একটু বেলা হয়ে গেছে; ঐ শোন্ শানাই বাজছে!" "বেশ, না বাবা? ফিরে এসে কিন্তু বাজনা শুনতে যাব, কেমন?" "আচ্ছা!"

(২)

কিনুর ডিঙ্গি বাঁকের মুখ পার হইতে না হইতে চারিধার কাঁপাইয়া ভীষণ ঝড় উঠিল। মধু ভয়ে তাহার পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। কিনুরও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। চারিধার ধোঁয়ার মত হইয়াছে! অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না! শুধু বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ও সফেন উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস বিশাল নদীবক্ষে যেন দৈত্যের অট্টহাসির মত ভীষণ মনে হইতেছিল! এমন কত ঝড়ে কিনু মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু কখনো এত ভয়ে ত সে কাতর হয় নাই! আজ যে মধু সঙ্গে আছে, তাহাদের একমাত্র পুত্র বড় আদরের মধু! তাহার উপর তারিণী অত করিয়া সাবধান হইতে বলিয়া দিয়াছে! হায় কেন সে এই বিপদে মধুকে সঙ্গে লইয়া আসিল! বাহির হইবার সময় ত বিপদের গুরুত্বটা এমন করিয়া অনুভব করিতে পারে নাই! নৌকার হাল ছাড়িয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণ বলে সে মধুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, ডাকিল, "বাবা, মধু!" মধু কোন উত্তর দিল না। সে কথা কহিতে পারিতেছিল না; ভয়ে কাঁপিতেছিল।

সহসা একটা তরঙ্গের আঘাতে ছোট ডিঙ্গি উল্‌টাইয়া গেল। প্রবল দৈত্যের মত একটা জলোচ্ছ্বাস মধুকে কিনুর বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইল। দূরে করুণ কণ্ঠে শব্দ হইল, "মা গো!" কিনু চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মধু, বাবা!" কেহ সাড়া দিল না—ঝটিকার ভীম গর্জ্জনে তাহার চীৎকারধ্বনি কোথায় মিলাইয়া গেল!

(৩)

তারিণী উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে কুটীরের দ্বারে স্বামী পুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। সন্ধ্যার শাঁক বাজিয়া উঠিয়াছে, এখনো কাহারও দেখা নাই! জমিদারবাটি হইতে লোক আসিয়া মাছের জন্য তিন চার বার তাগাদা করিয়া গিয়াছে। একটা অজানিত ত্রাশঙ্কায় তারিণীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল! সে ভাবিতেছিল, "কটা পয়সার জন্য কেন তাদের এ বিপদের মুখে পাঠালুম! ওগো দেবতা, তাদের ফিরিয়ে আনো!"

পাগলের মত কিনু আসিয়া ডাকিল, "তারিণি!"

তারিণী চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, "আঃ, এসেছিস্ বাঁচলুম! মধু কোথা? তাকে দিয়ে মাছ পাঠিয়ে দিছিস্ বুঝি—মাছের জন্য তিন চার বার লোক এসে ফিরে গেছে!"

কিনুর পা কাঁপিতেছিল, গা টলিতেছিল। তারিণী কহিল, "মর্ অমন কচ্ছিস্ যে! মদ খেয়েছিস্ বুঝি?"

কিনু কহিল, "তারিণি, আমাকে ধর্। মধু ফিরেছে?"

তারিণী কহিল, "ফিরেছে কি? কখন সে ফিরলে;——?"

"ফেরেনি? তবে বুঝি, মধু—"

স্বামীর হাত ধরিয়া তারিণী কহিল, "তবে কি মধু? বল্ শীগ্‌গির—"

স্ত্রীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কিনু কহিল,—"নেই! মা গঙ্গা তাকে নিয়েছে।"

ঘৃণার সহিত স্বামীকে ঠেলিয়া তারিণী কহিল, "বলিস্ কি, এঁ্যা! আর তুই—"

কিনু কহিল, "ফিরে এলুম!" কিনু কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তাকে সমস্ত দিন ধরে আতি পাতি খুঁজলুম, পেলুম না! বুকের মধ্যে পুরে রেখেছিলুম তাকে কে যেন ছিনিয়ে নিলে! আমি ধরে রাখতে পারলুম না কিছুতে। তুই অমন করিস নে তারিণি, আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে!" কিনু বসিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

তারিণী কর্কশ স্বরে কহিল, "তুই স্বচ্ছন্দে চলে এলি! যা, তাকে খুঁজে আন্—যেথা থেকে পারিস্ ফিরিয়ে আন্—"

কিনু কহিল, "পেলুম না, তাকে পেলুম না কিছুতে—"

"যা ফের ভালো করে খুঁজগে যা! নির্লজ্জ তাকে ফেলে কোন্ মুখে তুই ফিরলি?"

"আচ্ছা, আবার যাচ্ছি—যদি তাকে পাই তবেই ফিরবো, নইলে—"

কিনু চলিয়া গেল। তারিণী স্থিরদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। বাবুদের বাড়ী হইতে গদা আসিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, "এখনো ফেরেনি কিনু! এই বিভ্রাট ঘটালে মাছ নিয়ে! ভাগ্যিস্ আমি পুকুরে জাল ফেলালুম—জুয়াচুরির আর জায়গা পায়নি বেটা!"

(৪)

স্বামীপুত্রের প্রতীক্ষায় দ্বার প্রান্তে বসিয়াই তারিণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে নিজে একবার অনুসন্ধানে বহির্গত হয় কিন্তু মনে হইতেছিল, 'যদি মধু ইহার মধ্যে আসিয়া পড়ে! তাহার মধু নাই, ইহা কি সম্ভব!

নিদ্রাভঙ্গে তারিণী দেখিল, ঊষার মৃদু আলোক ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে,—কই এখনো ত তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না! সে অস্থির চিত্তে বাহির হইয়া পড়িল।

নদীর কিনারা ধরিয়া সে একেবারে বাবুদের বাঁধানো ঘাটের উপর আসিয়া পড়িল। পথে কাঁটায় তাহার পা ছড়িয়া গিয়াছে, কাদায় কাপড় ভরিয়া গিয়াছে। ঘাটের ধাপে বাবলা গাছের ঝোপের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে, কি ও? ছুটিয়া গিয়া তারিণী দেখে, তাহারি হতভাগ্য স্বামী! নিস্পন্দ দেহ, মৃত্যুস্পর্শে বিকৃত হইয়া গিয়াছে! সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তখন নানা রাগিণীর আড়ম্বরে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে! বাবুদের বাড়ী হইতে মেয়েরা 'জল সহিতে' আসিয়াছে! বিচিত্র বেশধারিণী রঙ্গিণীগণের মুখরিত উৎসবকোলাহলে কেহ জানিতেও পারিল না যে, যে উৎসবের আনন্দচ্ছটায় তাহারা অপূর্ব্ব পুলকে উচ্ছ্বসিত এক দরিদ্রা নারী সেই উৎসবেরই একটি নির্ম্মম ইঙ্গিতে স্বামীপুত্রহীনা, নিতান্ত দুর্ভাগিনী! এই বিশাল জগতে আপনার বলিতে তাহার আজ আর কেহ নাই!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মিলনে বিরহ।

তোমারে কি ভালোবাসি?
—তোমারেই বটে!
ভালোবাসি প্রাণপণে। রহিলে নিকটে,
সব জ্বালা ভুলে' যাই। তোমারি দর্শনে,
—নাহি জানি কেন, কোন্ অজ্ঞাত কারণে—
এ বিষণ্ণ মনে মোর আসে প্রসন্নতা;
হৃদয়ের অন্তস্তলে সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা
সেইক্ষণে দূরে যায়। তোমারে লভিলে
এ বিশুষ্ক হিয়া মম আনন্দ সলিলে
পূত, পূর্ণ হ'য়ে উঠে। তোমারেই আমি
আত্ম-বিস্মরিয়া, সত্য, নিত্য দিন-যামি'
অকপটে বাসিয়াছি ভালো।
কিন্তু, তবু,
কেন নাহি জানি, মোর মনে জাগে কভু
এমনো আশঙ্কা—যেন মোর প্রেমাঞ্জলি
ঢালি বটে তোমা'পরে, যায় যেন চলি'
তাহা কোন্ সুগভীর রহস্য-মাঝার
স্বপ্নসম লীন হ'য়ে;—সে পূজা-সম্ভার
যেন তুমি নাহি পাও।
ঊষা-রবি-করে
হরিত নিকুঞ্জ-বনে যবে 'থরে থরে'
অপরূপ, মধু-গন্ধি ফুটে ওঠে ফুল;
যবে সুধা-স্বাদ-মত্ত, বিভ্রান্ত, ব্যাকুল
ভ্রমর গুঞ্জরি' ফেরে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে

'গুণগুণি'; যবে এই সৌন্দর্য্য-পাথারে
পরিস্নাত প্রজাপতিগুলি কাঁপি কাঁপি'
বেড়ায় সুখের মত; নীলাম্বর-ব্যাপী
অসীম মাধুর্য্য-রসে বিহঙ্গনিচয়
বিশ্ব চিত্ত বিমোহিয়া, সারা ধরাময়
গে'য়ে ওঠে ভাষাহীন, প্রাণোন্মাদী গান;
যবে শিহরিয়া উঠে', কাঁদাইয়া প্রাণ
গন্ধবহ দিব্যানন্দে, মন্থর আবেশে
বহে' যায় ধীরে ধীরে; যবে হেসে' হেসে'
সূর্য্য-করে ঝলকিয়া শরতের নদী
চলে' যায় পারাবারে; যবে নিরবধি
প্রসন্ন, নিবিড় শ্যাম, বিমুক্ত গগনে
শুধুই উচ্ছ্বসি' ওঠে আবেগ প্লাবনে
অপূর্ব্ব ঝঙ্কার সহ অনন্তের প্রাণ
সৌন্দর্য্য লহরী সম; যবে অবসান
সকল হীনতা-গ্লানি এ আনন্দ-মাঝে,
তখন জাগিয়া উঠে', প্রিয়ে তব কাছে
ছুটে' আসি ক্ষিপ্তপ্রায়। মোর সেইক্ষণে
মনে হয়—হে সুন্দরি, ও দু'টি চরণে
যেন এ সৌন্দর্য্যরাশি পড়ি'ছে মূর্চ্ছিয়া
অতুল্য আধার লভি'; যেন তোমাকেই
করি'ছে বন্দনা শান্ত প্রেমভরে এই
নিখিল-সংসার; যেন তুমি কেন্দ্রসম
টানি'ছ তোমারি মাঝে এই অনুপম
মাধুরী-বিন্যাস রাশি! হে মোর মোহিনি,
হে সৌন্দর্য্য-সারভূত-নির্য্যাসরূপিনী,
মধুময়ি, মনোময়ি, আমিও সেক্ষণে
উদ্দাম আগ্রহ ভরে, সুখের বেদনে
একান্ত ব্যাকুল হ'য়ে, ও রূপ-প্রভায়
—তন্ময় প্রণয়বশে লভিতে তোমায়—
চাহি' তব স্পর্শমাত্র, কাছে ছুটে' আসি।
স্পর্শে করি অনুভব—তুমি মোহ নাশি'
তেমনি সম্মুখে মোর রহেছ জাগিয়া;
তুমি আর কেহ নহ—তুমি মোর প্রিয়া,
গুণময়ী সেই মোর সামান্যা মানবী,
—সেই তুমি! আমি শুদ্ধ সেই ভক্ত কবি
কল্পনা-বিভ্রান্ত, মূঢ়! ক্ষণেকো না যে'তে
এই ভ্রান্তি—অর্থহীন স্বপ্ন—নিশ্বাসেতে
কোথায় মিলা'য়ে যায়! হারাইয়া ফেলি'
স্বপ্ন-স্মৃতি, পুনঃ অনিমেষ নেত্র মেলি'
চে'য়ে চে'য়ে দেখি তোমা'পানে। ধীরে হায়,
মনে হয়—ভালো আমি বেসেছি তোমায়,
আর কাহারেও নহে, বেশি কিছু নয়!
বিহ্বলতা দূরে গিয়ে চিত্ত শান্ত হয়,
কর্ম্মে পুনঃ দেই মন।
কর্ম্মের সাগরে
বহুক্ষণ মগ্ন রহি', একদিন ওরে,
লভিয়া তোমারে কাছে বিরহের পরে,
একান্ত আগ্রহে, যেই ক্ষুব্ধ প্রীতিভরে
বক্ষে টেনে' লইলাম, অমনি আবার
মনে হ'ল—যেন বক্ষে নাহি তুমি আর,
বেদনা-আধার সম কি যেন আমারে
করিতেছে নিপীড়ন; যেন সে আধারে—
যা'রে আমি চাই—একান্ত দুর্লভ হ'য়ে
সে যেন লুকায়ে আছে;—তুমি সেথা নাই!
আলিঙ্গনে বুঝি—যেন দেহ-কারাগারে
রেখে'ছে সংগুপ্ত করি' সুধার ভাণ্ডার;
আমি যেন চাহি—সেই-(ই) অমৃত-মাঝার
নিমগ্ন, বিলীন হ'তে; তব এই দেহ
যেন তা'র বাধা! যেন মোর প্রীতি-স্নেহ
নহে তব তনু লাগি, চাহিনা তোমারে;
চাহি—অন্য কোন কিছু, কিম্বা সেই তা'রে
—যা'রে আমি নাহি চিনি! তুমি তা'রি যেন
শুদ্ধ এক প্রতিবিম্ব, নাহি জানি কেন

চাহিতেছ—তবু ওই দেহ-অন্তরালে
তাহারেই ঢাকিবারে। যে কিরণ ঢালে
ওই আঁখি তাহা যেন নহেগো তোমারি;
যেন তুমি—তুমি নহ; যেন তব মাঝে
কে যেন দুর্লভ হ'য়ে লুকাইয়া আছে!
চাহি আমি—সেই তাঁরে তোমারে লঙ্ঘিয়া;
চাহি—লভিবারে সেই প্রচ্ছন্ন অমিয়া,
তোমারেই আমি নাহি চাহি।
অনিবার
এইমত ভ্রান্তিসনে চেতনা আমার
জাগিতেছে অন্তর-জীবনে। প্রেমময়ি,
যবে তোমারেই মোর বক্ষে টেনে' লই
চির-সুধাময়ী জ্ঞানে, বক্ষে রুদ্ধ করি'
দেখি—তুমি ব্যবধান! আলিঙ্গন মোরে
ক্ষণে ক্ষণে কহে যেন—তোমারি ভিতরে
আরো কোথা কিছু আছে, চাহি চরাচরে
সে অজ্ঞাত বাঞ্ছিতেরে; তুমি যেন নহ
আমার সে লক্ষ্য-মণি; তুমি বার্ত্তাবহ,
যেন গো আভাস তা'রি!
—স্বপ্ন ভেঙে' যায়।
আবার জাগিয়া উঠি উদাসের প্রায়!
এ কেমন প্রেম-লীলা?—কি জানি কেমন!
ব্যবধান জাগাইয়া দেয় আলিঙ্গন!
প্রেমের সম্ভোগে বাড়ে প্রেমের পিপাসা;
ভালবাসি, ভালবাসি,—নাহি মেটে আশা!
কিন্তু, হায়—এ জ্বালা যে সহা নাহি যায়
অন্তরের অন্তঃপুরে! সন্দেহ-দোলায়
সতত দুলি'ছে চিত্ত! কা'রে আমি চাহি?
—তোমারে? কি, তোমা'মাঝে কিছু—যার নাহি
কোনই সন্ধান বিশ্বে?
ভ্রান্তির কুহকে
আজো তাই, মূঢ় সম এসেছি এ লোকে
তোমারে দেখিতে তবু; জানিতে নিশ্চয়—
আমার যে, প্রিয়তম আর কেহ নয়,
সে শুদ্ধ তুমিই প্রিয়ে!
কিন্তু, তবু, হায়—
বড় ব্যথা! এ বেদনা বলা নাহি যায়!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বুকে।

শ্রান্ত দুটি আঁখি!
ধীরে ধীরে পড়ে ঢ'লে, আয় বুকে রাখি!
ঘুমো তুই ঘুমো!
পড়ুক চাঁদিনী মুখে, দিয়ে যাক চুমো!

কাল কেশভার!
অকাতরে আছে পড়ে, কনকেরি হার!
তবে ভুলে থাক!
দূরে যেতে হবে, ভেবে কেঁদে উঠ নাক!

নিস্পৃহ।

ওগো সাকি,
বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শারদ বিভবে,
রিক্ত শূন্য হেমন্তের বিপন্ন বিপ্লবে
নিত্য নিশিদিন তুমি অম্লান গৌরবে,
দ্রাক্ষারসে পাত্র খানি পরিপূর্ণ করে'
হাসিয়া তুলিয়া দাও পান্থজন করে!

পূর্ণপাত্রে ফেনরাশি উথলিয়া উঠে,
বিহ্বল বুদ্বুদ জাল পড়ে টুটে টুটে,
আগ্রহে তৃষ্ণার্ত্ত মুখে রক্তবর্ণ ফুটে;
তুমি স্থির শান্ত দৃষ্টি প্রসন্ন অধর,
নির্ম্মল নিস্পৃহ মুখ কোমল সুন্দর!

কাব্যে বর্ষাচিত্র।

বায়স্কোপের চিত্রচিহ্নিত কাচফলকের ন্যায় দ্রুতমৃদু-নৃত্যে সমগ্র বর্ষের ইতিহাসে যে ঋতুবৈচিত্র্য বিকশিত হইয়া উঠে, আফিস্ আদালতের কাজ, রৌপ্যচক্রের পুচ্ছে অবিরাম নৃত্য, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সকলে সে দিকে বড় একটা নজর করিতে পারেন না।

গ্রীষ্মের শুভ্রধূসর উত্তপ্ত খরতর রৌদ্রচূর্ণের আলিঙ্গন, বরষার গুরুমন্দ্র, স্নিগ্ধ বারিবর্ষণ, শরতের মেঘান্তরালে সুনীল আকাশ, হেমন্তের নীহার-যবনিকার চঞ্চলক্রীড়া, শীতের সুপ্ত প্রাণীরাজ্য, এবং বসন্তের গৌরবমুক্ত দক্ষিণ পবন—এ সমস্ত আমরা প্রতিদিন তেমন করিয়া অনুভব করি আর নাই করি ঋতুমাত্রেরই যে মানব হৃদয়ের উপর একটা নিবিড় গোপন আকর্ষণ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি যত উচ্চ কবি তিনি তত বিচিত্রসুন্দররূপে এই সত্য চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ষা ঋতু সম্বন্ধে নানাদেশের কবিগণ কি কাহিনীপ্রচার করিয়াছেন এই প্রবন্ধে আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব। ইউরোপের বর্ষা-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কবিচিত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভারতকার্য্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ভারতবর্ষের কাব্যে ইহার স্থান দেখিয়া বিস্মিত চমকিত হইতে হয়।

ঋষিযুগের আরম্ভ হইতে ভারতের মেঘমন্দ্র, উদ্দামপবনস্রোতঃ ঝঙ্কারমুখর বৃষ্টিপাত, বিদ্যুতের হিরণ্যশাখাজালজড়িত বিরাট বর্ষার প্রাচুর্য্য, ইহার সমারোহ ও ঐশ্বর্য্য সাহিত্যে অবিনশ্বর চিহ্নপাত করিয়া গিয়াছে। এই বর্ষা যখন অন্তহীন উন্মত্তবৈচিত্র্য লইয়া সৃষ্টির উপরে ঝাঁপিয়া পড়ে তখন ভারতের চিত্তস্রোত শিখীর ন্যায় নৃত্য করিয়া উঠে।

ঋক্‌বেদের ঋষিকবিগণ ইন্দ্রের বজ্র আকাশেরচিত মেঘতোরণ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া ক্লান্ত হন নাই। ঋক্‌বেদের চিত্র উল্লেখ করিয়া মোক্ষমূলর বলেন—Clouds, storms, rain, lightning and thunder were Spectacles that above all others impressed the imagination of the early Aryans and busied it most in finding terrestrial objects to compare with their evervarying aspect.

Science of Language Vol ii.

যাঁহারা ক্ষিতিকে শুধু মৃত্তিকা মনে করেন নাই, অপ্‌কে শুধু জল মরুৎকে কেবল হাওয়া বলিয়া তৎসম্বন্ধে যাবতীয় বক্তব্য নিঃশেষ করেন নাই, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ যাঁহাদের কাছে শুধু অভিধানের একটী কথায় পর্য্যবসিত না হইয়া তদপেক্ষা নিবিড়তর সামাজিকতা সৃজন করিয়াছে, তাঁহাদের কাছে মেঘমন্দ্র বা বৃষ্টিপাত সেণ্টিগ্রেড্ থারমমিটার বা ব্যারোমিটারের বিষয় মাত্র নহে। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, পর্জ্জন্য প্রভৃতি আদিত্যগণ যাঁহাদের চোখে সৃষ্টির প্রতিপলকে ধরা দিত তাঁহারা শীর্ষোপরি প্রসারিত সুনীল আকাশের শান্তরাজ্যে বর্ষার বিপুল কল্লোলে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

ঋক্‌বেদের বর্ষাগাথা আলোচনা করিতে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পিতৃপিতামহগণ বর্ষাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের প্রত্যেক সূক্ষ্মপেলব কম্পনরেখা আমাদের হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করিয়া দেয়।

ঋকবেদের প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় সূক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ সূক্ত পর্য্যন্ত ইন্দ্রস্তবের গাথাগুলি হইতে বোঝা যায়, আর্য্যহৃদয়ে বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্রের কিরূপ শ্রেষ্ঠ আসন ছিল। প্রথম মণ্ডল কেন সমগ্র ঋক্‌বেদ ইন্দ্রের স্তবে মুখরিত। অশরীরীকে শরীরী কল্পনা করিয়া, অমানুষী প্রকৃতিকে মানুষী কল্পনা করিয়া, অনাত্মীয়কে আত্মীয়তা বন্ধনে বাঁধা,—অন্য কথায়, বসুধাকে এতটা কুটুম্ব মনে করা কেবল ভরেতবর্ষের পক্ষেই সম্ভবে।

চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ান্তর্গত ৩২ সূক্ত হইতে একটি চিত্র উপস্থিত করার প্রলোভন হইতেছে :—

> অদর্দ্দরুৎসমসৃজোবিখানি ত্বমর্ণবান্বদ্বধানাঁ অরমণাঃ।
> মহাংতমিংদ্রপর্বতং বি যদ্ব সৃজোবি ধারা অবদানবংহন্‌॥ ১
> ত্বমুৎসাঁঋতুর্ভিবদ্বধানাঁ অরংহ উধ পর্বতস্য বজ্রিন্‌।
> অহিং চিদুগ্র প্রযুতং শয়ানং জঘন্বাঁ। ইংদ্র তবিষীমধন্বাঃ। ২

হে ইন্দ্র তুমি মেঘকে বিদীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া জলনির্গম-মার্গ উন্মুক্ত করিয়াছ। তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বৃষ্টিধারা পাতিত করিয়াছ। তুমি দানবকে সংহার করিয়াছ। 'হে কুলিশধারি! তুমি বর্ষাকালে নিরুদ্ধ জলদজালকে নির্ম্মুক্ত করিয়াছ। তুমি মেঘের ভীমবল সংবর্দ্ধন করিয়াছ।

সোজাসুজি মেঘ হইতে বৃষ্টিপাতের কথায় আকাশের সহিত এই ঘনপরিচয়, উহার প্রাণগত দৈবীশক্তির অমোঘচাঞ্চল্য শ্রী কল্পনা, ধূসর-শুভ্র, তরঙ্গকুঞ্চিত কাশকুসুমখচিত তোরণের ন্যায় অভিনব সিংহদ্বার কল্পনা সহজ নহে। গুরুগর্জ্জনক্লান্ত চিত্ত যেমন শরতের প্রারম্ভে সূর্য্যরশ্মি-সমাগম দেখিয়াও অব্যক্ত অস্ফুট বর্ষার মোহকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে না তেমনি যখন আকাশে গুরুগুরু গর্জ্জনধ্বনি সহ বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে এক নিবিড় আয়োজন চলিতে থাকে, ইন্দ্র-দ্বারা নির্ম্মুক্ত জলদ জলধারায় সিঞ্চিত হইয়াও আর্য্যগণ ঐ আয়োজনকে ভুলিতে পারেন নাই।

সেই নিবিড়কৃষ্ণ দানবের সহিত ইন্দ্রকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। ইন্দ্রের মহার্হ রহস্যময় বজ্র তাহার উপর নিপতিত না হইলে আর্য্যগণ তুষ্ট হইতে পারিতেন না। এই কল্পনার আনন্দ ব্যোমরাজ্যে সঞ্চিত মেঘপুঞ্জ বর্ষণের আশায় তৃষ্ণার্ত্তচিত্তে থাকিত।

এই তৃষ্ণার এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। আকাশের মেঘগর্জ্জন এখনও ভারতের শিরায় উপশিরায় পুলক সঞ্চার করিয়া দেয়। আমাদের এই শুভ্র শৈশব স্পন্দন এখনও লুপ্ত হয় নাই। এইজন্য যথার্থ ভারতের কবিকথায় অলব্ধস্পর্শ সবুজমসৃণ অরণ্যবনের মাঝে রাখাল বালকের মণ্ডলনৃত্যে অঙ্কিত চক্ররেখার ন্যায় বর্ষার ভাব, পারস্য গালিচার বর্ণ বৈচিত্র্যে চিহ্নিত ও উপ্ত হইয়া গেছে।

বর্ষাঋতুর এই বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশে ভারতের কোন উল্লেখযোগ্য কবি প্রতিভার অভাব দেখান নাই।

ভারতের অতুল সম্পদ্‌ কাব্যখনি-রচয়িতা বাল্মীকি ও বেদব্যাস ভারতের ভাবগঙ্গোত্রী শিখরের প্রথম অমৃতস্বাদ লাভ করিয়া দুই হস্তে লক্ষনির্ঝরে সেই কাব্য পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। বাল্মীকির পুঞ্জীভূত কাব্যস্তবকের আড়ালে বরষার হেমধারা কি মধুর স্মিতহাস্যে দেখা দেয় তাহা সাধকমাত্রেই অনুভব করেন। সেই প্রাচীন মহর্ষি কবির নববর্ষাগম-চিত্ররচনাব্যস্ত, শুভ্র জটাজুট-গম্ভীর, গৈরিক দুকূল-পরিহিত ভাববিক্ষোভবিধুর উর্দ্ধদৃষ্টি কি বিরাট কি মহান্‌ এবং অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধরসে ভরপুর!

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অষ্টাবিংশসর্গে যে বর্ষা চিত্র আছে তাহা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিবার প্রলোভন হইতেছে কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য পাঠকদিগকে রামায়ণের উল্লিখিত স্থানের প্রতি মনোযোগ দান করিতে বলি। উহার অমরতা ও নবীনতা সহস্র বৎসরের পরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্ষা বর্ণনার এমন সারল্য কোথায় দেখি নাই। কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিই—"গিরিতুল্য মেঘসমূহদ্বারা আকাশস্থলী আবৃত হইয়াছে। সন্ধ্যাকাশদ্বারা অরুণবর্ণ ও প্রান্তভাগে পাণ্ডুবর্ণ স্নিগ্ধ মেঘস্বরূপ ছিন্নকপাটদ্বারা যেন অম্বরের ব্রণস্থান আবৃত করিয়া রহিয়াছে।" ০ ০ মেঘের উদর হইতে নির্গত কর্পূরলিপ্ত জলের ন্যায় শীতল ও কেতকীর গন্ধযুক্ত বায়ু অঞ্জলি দ্বারা ব্যজন করার সুযোগ ঘটিয়াছে। মেঘরূপ কৃষ্ণাজিনধারী, ধারারূপ যজ্ঞোপবীত বিশিষ্ট, গুহামুখে পবনশব্দ বিশিষ্ট, পর্ব্বতসমূহে অধ্যয়নকারী বটুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই বর্ষাকালে আবাসস্থলী বিদ্যুৎরূপ সুবর্ণকশা দ্বারা তাড়িত হইয়া হৃদয়ে বেদনার সহিত ঘোরতর শব্দ করিতেছে।" ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যও বর্ষাসৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! সাহিত্যাকাশের সকল জ্যোতিষ্কের আলোচনা আনন্দের ব্যাপার হইলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভব নহে। হিমালয়ের অসংখ্য শিখর শৃঙ্গ থাকিলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা, কৈলাস কিম্বা সর্ব্বোচ্চ গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের উচ্চতা দ্বারাই হিমালয়ের উচ্চতা নির্ণীত হয়।

অতএব কবিগুরু কালিদাসের কাব্যসাহিত্যের উল্লেখই আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনার পক্ষে যথেষ্ট। বর্ষার সহিত কালিদাসের কিরূপ ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধন এবং ঘনতর প্রেমসম্পর্ক ছিল, মায়াপুরীর মেঘদূতখানি তাহার পরিচয়। এই কাব্য রচনার প্রতি পল্লবে কালিদাসের ফুল্ল অথচ সংযত আনন্দ প্রস্ফুট হইয়া উঠে।

মেঘরাজ্য ইতিপূর্ব্বে এত সহজে কাহারও কাছে ধরা দেয় নাই। গ্রীষ্মের শেষদিনও কবি এবং কবিকল্পিত যক্ষের হৃদয়ে আঘাত করে নাই। কিন্তু আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কেহই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। চন্দ্র দেখিয়া যেমন সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে যক্ষও তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রথম দিবসের জন্য কি তৃষ্ণা! বলা বাহুল্য এই কান্তাবিরহ-

বিধুর যক্ষকে কালিদাস হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে চলিবে না। ইহা কালিদাসেরই আত্মপ্রকাশ!

একে ত' বর্ষার মেঘবৈচিত্র্য তদুপরি কালিদাসের হৃদয়চিত্র সারল্য, মাধুর্য্য এবং সৌরভ মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব স্বষ্টিরচনা সম্ভব হইয়াছে।

মেঘদূত হইতেই মন্দাক্রান্তা ছন্দের স্বপ্নালস মদিরতা প্রথম আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছে এবং উহার মন্দগতির তরল তালে 'জীবনতরী' ভাসাইবার সংকল্প জাগিয়াছে। মেঘদূতে অনুসৃত হইয়াই মন্দাক্রান্তা ছন্দ আজ অন্বর্থ হইয়াছে।

বর্ষার মেঘহিল্লোলে কবি কেবল একাকী উদ্দাম ও উন্মত্ত হইয়া উঠেন নাই। জীবজগতেও চির আনন্দহিল্লোল-বিকীর্ণ করিয়াছেন।

> মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং, বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সুগন্ধঃ।
> গর্ভাধানক্ষণ পরিচয়ান্নুনমাবদ্ধমালাঃ, সেবিষ্যতে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥
> কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছীলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং, তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণ সুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
> আর্কৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদ পাথেয়বন্তঃ, সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ॥

বর্ষার তুমুল আন্দোলনে উড্ডীনকেতু মেঘসম্রাট একাকী থাকিতে পারে না। সৃষ্টির পত্রে পত্রে প্রাণীরাজ্যে নবমেঘ দর্শনের জন্য সাজসজ্জার ধূম পড়িয়া যায়! এই অলঙ্করণের শিঞ্জিতধ্বনি নূতন ছন্দে স্বাগতাহ্বান ঝঙ্কারিয়া তোলে। স্ফটিকশুভ্র সলিললোভী চাতকের কাকলি মেঘধ্বনির তরঙ্গে আত্মহারা হয়, উহা দিগ্বিদিক্ ভুলিয়া অখ্যাত পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য মেঘের পদাঙ্কপথে ছোটে। ফেনশুভ্র বলাকাশ্রেণী আকাশে অভিনব তোরণ নির্ম্মাণ করিতে থাকে এবং চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। ঘন মেঘের স্নিগ্ধনিবিড় নীলছায়ায় সমগ্র শুভ্র বিহগরাজ্য ফুটিয়া উঠে।

কুঙ্কুমরক্তচঞ্চু, জবালোহিতচরণ রাজহংস মৃণাল ও কিসলয়মাত্র সম্বল করিয়া সর্ব্বত্র এমন কি কৈলাস পাদমূল পর্য্যন্ত মেঘের পশ্চাতে ছোটে।

এই আলেখ্যশ্রেণীর চিত্রণে কালিদাসের ক্লান্তি নাই, উত্তরোত্তর নব নব দৃশ্যপট উপস্থিত হইতেছে। আকাশরাজ্যে দেবাঙ্গনাগণ দেখিলেন পবন বুঝিবা কোন শৈলের শৃঙ্গ উড়াইয়া নেয়। বর্ষার মেঘ কেবল নরনারীর নহে দেবদেবীরও একান্ত-দ্রষ্টব্য ব্যাপার হইয়া উঠে।

> অদ্রে শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংবিদিত্যুন্মুখীভি দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
> স্থানোদস্মাৎ সরসিনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং, দিঙ্নাগানাং পথিপরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপনং॥

তারপর—

> রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষমেতদ্ পুরস্তাৎ, বল্মীকাগ্রা প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য।
> যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে, বর্হেণেব স্ফুরতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥

নীল-পীত-হরিৎ-শ্যামল-লোহিত রত্ন-নির্ঝর-বিচ্ছুরিত ইন্দ্রধনু বর্ষার বিজয়কেতুর ন্যায় জ্ঞান হইয়াছে। কত পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগবিদ্রুমের কান্তি তন্তুজালে

গ্রথিত হইয়া গেল। শুধু অরণ্যে শিখিকলাপের প্রাচুর্য্যে এই অসংখ্য রত্নের প্রতিবিম্ব-সিক্ত জয়কেতু উড্ডীন হয় নাই, আকাশেও তা'র প্রতিচ্ছায়া দেখা যাইতেছে।

চাতক এবং বলাকাশ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—কিন্তু শিখিরাজ্য হইতে কেকারব বাকি আছে। যক্ষ বলিতেছে;—

> তৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং য়িয়াসো কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
> শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ, প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশুব্যবসেৎ।

নব আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়া উজ্জয়িনীতে আনন্দ কোলাহল ছুটিত। কুটীরে, হর্ম্ম্যে, প্রাঙ্গণে, প্রমোদশিখরে, গবাক্ষে গবাক্ষে উৎসাহ সঞ্চার হইত।

নব মেঘের পদে পদে এত প্রলোভন, সৃষ্টির সর্ব্বত্র বিকশিত সৌন্দর্য্যজগৎ হইতে ইহার এত আহ্বান রহিয়াছে যে আকুলহৃদয় যক্ষের ভয় হইল পাছেবা মেঘ গন্তব্যস্থানে না পৌছিতে পারে।

কবিকথায় দেখা যাইতেছে নববর্ষায় ভারতের প্রাণ কিরূপ বিচলিত। আম্রকূট, চিত্রকূট, বিন্ধ্যপর্ব্বত, রেবানদী গম্ভীর ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং কুন্দ শিরিষ, কদম্ব, মাধবী, কুরুবক, অশোক প্রভৃতি প্রিয়দর্শন পুষ্পরাজ্য আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিত। [ক্রমশঃ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন বিএ, বি-এল।

আধুনিক জাপান।

(ফরাসী হইতে)

বলসঞ্চয় ও আত্মরক্ষণের চেষ্টা।

অতএব দেখা যাইতেছে, পুরাতন সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু অত্যাবশ্যক, বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত, ও অন্তরতম, তাহার সমস্তই আধুনিক জাপান রক্ষা করিয়াছে; সাংসারিক জীবনের কার্য্যপ্রণালী,—গৃহ, আস্বাব, খাদ্য, পরিচ্ছদ, হৃদয়ের ভাব, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদ, শিল্পচর্চ্চা, ধর্ম্ম—যাহা কিছুর সহিত আভ্যন্তরিক জীবনের সম্পর্ক, জাপান তাহার সমস্তই বজায় রাখিয়াছে। আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু আমাদের ভিতরকার জিনিস্, জাপানীরা সে সমস্ত ইচ্ছা করিয়াই উপেক্ষা করিয়াছে; উহাদের বিবেচনায়,—আমাদের সভ্যতা, উহাদের সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, স্থূলতর; উহাদের ন্যায় তেমন মানসিক নহে; তবে কেন উহারা ঐ সভ্যতার কিয়দংশ গ্রহণ করিল?

যে রাষ্ট্রবিপ্লব পুরাতন জাপানকে ওলট্ পালট্ করিয়া দিয়াছে, তাহার উৎপত্তির ইতিহাস নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

১৮৫৩ পর্য্যন্ত, জাপানের দ্বার রুদ্ধ ছিল, কোন প্রকারে য়ুরোপীয় প্রভাব জাপানে প্রবেশ

করিতে পারে নাই। ১৮৫৩ অব্দে, মার্কিণের যুক্তরাজ্য, কমডোর পেরীর নেতৃত্বাধীনে, জাহাজের একটা বহর জাপানে প্রেরণ করে, এবং মার্কিণ বাণিজ্যের সুবিধার্থে জাপানের কতকগুলি বন্দর খুলিয়া দিবার জন্য দাবী করে। জাপান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে করিল,—উহাদের সঙ্গে জোরে পারিবে না, কাজেই বন্দরগুলি অগত্যা খুলিয়া দিতে হইবে! দুই বৎসর পরে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ঐ একই উপায়ে, একই প্রকার অধিকারের দাবী করিল। তখন জাপানের চৈতন্যোদয় হইল। জাপানীরা বুঝিল, শুধু একটা মানসিক উচ্চ আদর্শ লইয়া থাকিলেই চলিবে না, ভৌতিক বল সঞ্চয় করা নিতান্তই আবশ্যক। নীতি, শিল্পকলা ও ধর্ম্মবিষয়ে জাপানীজাতি যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, যদি উহারা সৈন্যবল ও অর্থবল অর্জ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে বিদেশীয়দের আক্রমণ হইতে কখনই রক্ষা পাইবে না; সম্ভবত স্বাধীন জাপানরাজ্য, ঐ সকল য়ুরোপীয় জাতিদের উপনিবেশরাজ্যে পরিণত হইবে, এবং ঐ সকল তথাকথিত "রক্ষক" জাতিদের অধীনে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। জাপানীরা ভাবিল,—বিদেশী প্রভুর অধীনে আসিলে, উহারা নিজের জীবনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে, নিজের আচার ব্যবহার, নিজের রুচি, নিজের হৃদয়ভাব বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইবে। প্রাচীন সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্যই উহারা স্বাধীন থাকিতে ইচ্ছুক হইল; স্বাধীন থাকিবার উদ্দেশ্যেই উহারা বলবান হইতে ইচ্ছুক হইল, এবং বলবান হইবার জন্যই—যে সভ্যতা জবরদস্তি করিয়া উহাদের ঘাড়ে চাপানো হইতেছিল, সেই সভ্যতার কিয়দংশ উহারা অনুকরণ করিবে বলিয়া স্থির করিল।

যাহাতে-করিয়া য়ুরোপ বলবান ও স্বাধীন হইয়াছে, য়ুরোপের শুধু সেইটুকুই জাপান অনুকরণ করিয়াছে।

প্রথমেই, জাপান দেশরক্ষণের যাহা অপরিহার্য্য উপায়,—সেই সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজের বন্দোবস্ত করিল। ১৮৬৬র আরম্ভে, য়ুরোপীয় ধরণে জাপানী সৈন্য তৈয়ারি করিবার জন্য, কতকগুলি সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠাইয়া দিতে সোগুন (জাপানের অধিনায়ক) ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে। যুদ্ধ বাধিলে, অধুনা জাপান, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত, সুপরিচালিত ন্যূনকল্পে ৫ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারে। জাপানের নৌ-বহরের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি সেরা-সেরা শক্তিমান বর্ম্মাবৃত যুদ্ধজাহাজ ও অনেকগুলি "টর্পিডো" আছে। য়ুরোপীয় যুদ্ধ-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেও, জাপানীরা,—কষ্টসহিষ্ণুতা, নিয়ম শাসনের বশ্যতা, ত্যাগস্বীকার, স্বজাতিনিষ্ঠা প্রভৃতি পুরাতন জাতীয় সদ্‌গুণ সকল বজায় রাখিয়াছে। যাহারা উহাদিগকে চীনদেশে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই উহাদের বীরত্বের প্রশংসা করে; আবার কেহ কেহ, উহাদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী নৃশংসতারও উল্লেখ করে; চীন, ফর্ম্মোজা ও কোরিয়া দেশে উহারা যে সকল নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা প্রাচীন জাপান-ইতিহাসের ভীষণ নিষ্ঠুর-দৃশ্য সকল স্মরণ করাইয়া দেয়।

য়ুরোপের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য জাপান, বলশালী সৈন্য ও

যুদ্ধের জাহাজ প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সামরিক বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করিবার পর, জাপানী-চরিত্র একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গোড়ায়, জাতীয় মান-মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য ও শান্তির সময়ে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই সৈন্য প্রস্তুত করা হয়; ক্রমে উহারা দেখিল, যুদ্ধবিগ্রহ ও দিগ্বিজয়ের পক্ষে সৈন্যই প্রকৃষ্ট উপায়। জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এই ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে, যে স্বদেশানুরাগ গোড়ায় ন্যায়ানুগত ও এমন কি—উৎপীড়িত জাতিদিগের 'ব্যথার ব্যথী' ছিল, পরে তাহাই আততায়ী, সংগ্রামপ্রিয় ও নৃশংস হইয়া উঠিল। এইরূপে জাপানে একটা অভিনব আকারের সাম্রাজ্যিকতা,—'পীত' সাম্রাজ্যিকতা গজাইয়া উঠিয়াছে। এই সাম্রাজ্যিকতাকে (pan-japanism) স্বর্ব্বজাপানী-সঙ্ঘ বা সর্ব্বজাপানীর জোট বলা যাইতে পারে।

জাপানীরা দেখিল, সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজের বন্দোবস্ত করিলেই যথেষ্ট হইবে না, য়ুরোপের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক দৌত্য-সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্যক। য়ুরোপীয় রাজ্যসমূহ যাহাতে জাপানের প্রতি সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করে, এই অভিপ্রায়ে, তাহাদের মনে এই ধারণাটি জন্মিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, জাপান তাহাদেরই মত আধুনিক ভাবাপন্ন। এই হেতু, জাপানী রাষ্ট্রনীতি ও জাপানী শাসনতন্ত্রকে য়ুরোপীয় ধরণে পরিণত করা আবশ্যক হইল। জাপানের সম্রাট, সূর্য্যনন্দন মিকাডো, তাই জাপানে, য়ুরোপের অনুরূপ নিয়মতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন। আধুনিক জাপানের আইন-কানুন ও ব্যবস্থা-সংহিতা প্রস্তুত করিবার জন্য, ফরাসী ও জর্ম্মাণ ব্যবস্থা-শাস্ত্রবেত্তাদিগের উপর ভার দেওয়া হইল। এক্ষণে, সমস্ত য়ুরোপীয় দেশের ন্যায় আধুনিক জাপানেও একটা পার্লামেণ্ট আছে, বিবিধ রাজনৈতিক দল আছে, সংবাদ পত্রাদি আছে; আধুনিক জাপানের নিজস্ব রাষ্ট্রনীতিবেত্তা আছে; নিজস্ব মন্ত্রী আছে, নিজস্ব রাজদূত আছে।

তা'ছাড়া, এই ধার-করা ব্যবস্থাগুলি, জাপানী ভাবে ও জাপানী বিশেযত্বে কিরূপ উপরঞ্জিত, তাহা আলোচনা করিতে একটু কৌতূহল হয়। উহাদের রাজনৈতিক পক্ষগুলা, এক এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া থাকে। পুরাতন জাপান ইতিহাসে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আধুনিক জাপানেও গবর্ণমেণ্টের প্রতিবাদী-পক্ষের কর্ত্তা—কোন স্থানীয় গোষ্ঠী, কিংবা সেই গোষ্ঠীর প্রধানেরা। সাবেক "দাইমিয়ো"দিগের ন্যায় এখনকার রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ পুরুষেরা, আপনাদের চারি পাশে অস্ত্রধারী লোক রাখিয়া থাকেন, এবং এই বিভিন্ন অস্ত্রধারীদলের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্পন্ন হয়।—যে সকল আইন-কানুন য়ুরোপীয় ব্যবস্থা-সংহিতা হইতে গৃহীত, তাহার মধ্যেও কতকটা নিছক জাপানী ভাব আছে। তাহার দৃষ্টান্ত, জাপানে উপপত্নী গ্রহণ আইনসম্মত, এবং পত্নী যদি অতিরিক্ত ঈর্ষা কিংবা বাচালতা প্রকাশ করিয়া, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি যথোচিত শিষ্ট ব্যবহার না করে, তাহা হইলে আইন-অনুসারে পতি, স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। দৌত্যকার্য্যের বাহ্য ধরণ-ধারণ য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেও,—জ্বলন্ত জাতীয়ভাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সকল কার্য্যে পরিণত

করিবার জন্য, জাপানীরা দৌত্যকার্য্যে যেরূপ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রাচ্য। তাহার দৃষ্টান্ত,—য়ুরোপীয় রাজশক্তিদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া, এবং সেই সুবিধা পাইয়া, জাপানীরা য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে এই সম্মতি আদায় করিয়া লইয়াছে যে, জাপানী বিচারকেরাই য়ুরোপীয়দিগকে বিচার করিবে। এই বিষয়সম্বন্ধে, জাপানীরা য়ুরোপীয়দের সহিত যে চুক্তি করিয়াছে তাহা য়ুরোপের পক্ষে বড় একটা গৌরবজনক নহে—সেই চুক্তি, "নূতন সন্ধি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে;—য়ুরোপীয়েরা, জাপানের কোন জমি কখনই অধিকার করিতে পারিবে না, কিন্তু জাপানীরা, য়ুরোপের সর্ব্বত্রই জমি লইতে পারিবে। এই সকল বিষয়ে সুসিদ্ধ হওয়ায়, জাপানী দৌত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এখন আরও বেশী দূর হাত বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন অনেক জাপানীই এই সুখস্বপ্নের কল্পনা করে;—কোরিয়াতে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, জাপান চীনে অগ্রসর হইবে; চীনে গিয়া চীনের অসংখ্য লোককে বিদ্যাশিক্ষা দিবে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিত করিবে, চীনকে সামরিক বলে ও আর্থিক বলে বলীয়ান্ করিবে। তাহার পর আধুনিক জাপান, আধুনীকৃত চীনের সহিত সন্ধিসূত্রে মিলিত হইয়া, অত্যাচারী য়ুরোপীয়দিগের হস্ত হইতে সমস্ত এসিয়াকে উদ্ধার করিবে; ফিলিপাইন্ হইতে মার্কিণদিগকে,—ইন্দচীন হইতে ফরাসীদিগকে,—ভারত হইতে ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিবে; উদীয়মান সূর্য্য-সাম্রাজ্যের আশ্রয়াধীনে, প্রাচ্যখণ্ড প্রাচ্য-বাসীদিগেরই জন্য,—এই মানস-সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত করিবে।

এই বিশাল আদর্শটী কোনও কালে—কোনও দূর ভবিষ্যতেও যে কার্য্যে পরিণত হইবে একথা এখন মনেও ভাবা যায় না। এখন জাপান রুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, জাপানের বল পুনঃসঞ্চিত হইতে,—ও কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াকে হজম করিতে এখনও অর্দ্ধশতাব্দি এবং চীনকে য়ুরোপীয় ধরণে পরিণত করিতে এখনও এক শতাব্দি লাগিবে সন্দেহ নাই। দুই শতাব্দির মধ্যে—যখন য়ুরোপীয় জাতিরা স্বকীয় বৃহৎ সামাজিক সমস্যা-সমূহের মীমাংসায় ব্যাপৃত থাকিবে, তখন তাহারা স্বকীয় অধীন উপনিবেশ রাজ্য সমূহকে অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে আরও সহজে সম্মত হইবে। যাহাই হউক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, জাপানীরা যখন পীতজাতিদিগের উদ্ধারের কথা চিন্তা করে, তখন সেই সঙ্গে উহারা সর্ব্বজাতীয় ন্যায়-ধর্ম্ম ও মানব-সাধারণ সাম্যের কল্পনাও অন্তরের মধ্যে পোষণ করে। অপর জাতিসমূহের ভৌতিক ও নৈতিক দুরবস্থার উপর, চিরকালের জন্য, স্বকীয় প্রাধান্য স্থাপন করায় য়ুরোপের কোন অধিকার নাই। জাপানীরা য়ুরোপকে জয় করিবে কিংবা য়ুরোপকে (শব্দটা বড়ই অদ্ভুত ও অস্পষ্ট) "পীত বিপদে" বিপন্ন করিবে—একথা তাহারা মনেও করেনা; "শ্বেত বিপদ" হইতে পীতজাতিরা যাহাতে উদ্ধার পায়—তাহারা শুধু ইহাই চাহে। তাহাদের এই ইচ্ছা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার চরণে, তাহারা দাসবৎ পূজাঞ্জলি প্রদান করেনা। যদি কখনও জাপানীদের স্বপ্নকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়, যদি কখনও উহারা এসিয়া হইতে য়ুরোপীয়দিগকে বিদূরিত করিতে পারে, তখন য়ুরোপ জাপানকে যে য়ুরোপীয় করিয়া তুলিয়া ছিল—য়ুরোপ তাহারই ফলভোগ করিবে।

যাহাই হউক, জাপানীরা স্বকীয় রাষ্ট্রনীতি ও শাসনতন্ত্র আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে বলিয়া একটা গর্ব্ব অনুভব করে; এবং এই গর্ব্ব উহাদের জাতীয় ভাবকে আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে, উহাদের সাম্রাজিক উচ্চাকাঙ্খাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। তবে এ কথাও বলি, পার্লেমেণ্টতন্ত্রের প্রভাবে ও সংবাদ পত্রাদির প্রভাবে, কতকগুলি লোকের মধ্য হইতে বিশ্বস্ততা, শোভনসুন্দর শিষ্টতা, সৌম্য প্রফুল্লতা—এই সকল পুরাতন জাপানী সদ্‌গুণ অন্তর্হিত হইয়াছে।

সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাপানকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে, জাপানকে রূপান্তরিক করিতে হইলে, প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। মূলধন যোগাইবার জন্য বিস্তৃত বাণিজ্য ও য়ুরোপীয় ধরণের বৃহৎ শ্রমশিল্পের আয়োজন আবশ্যক। কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানী-বানিজ্য খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। ১৯০০ অব্দে জাপানের রপ্তানি ৫৪ কোটী ফ্রাঙ্ক (এক ফ্র্যাঙ্ক প্রায় ॥০ আনা) ও আমদানি, ৮ কোটী ফ্রাঙ্কে উঠিয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানীরা, বৃহৎ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, গতিবিধির সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। বাণিজ্য-জাহাজে উহাদের যে মাল বোঝাই হয় তাহার পরিমাণ ইংরাই মধ্যে আমাদের অর্দ্ধেকের উপর। বড় বড় জাপানী বাষ্পীয় পোত, কোরিয়া ও চীনে মাল ও যাত্রী বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং মার্সেই ও লণ্ডনে নিয়মিত-রূপে যাতায়াত করে। ১৯০০ অব্দে, জাপানের অভ্যন্তরে, প্রায় ৪০০০ কিলোমেটর পরিমাণ রেলপথ পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং ২০০০ কিলোমেটর পরিমাণ রেলপথ তখন প্রস্তুত হইতেছিল। আমাদের দেশে যে মূল্য দিয়া রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর কাম্‌রায় উঠা যায়, জাপানে সেই মূল্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠা যায়। বৈদ্যুতিক তারও শাখাপ্রশাখায় খুব বিস্তার লাভ করিয়াছে। কোনও নগরের অভ্যন্তরে, দশকথার তারের খবর পাঠাইতে হইলে, ১৫ সেন্‌টিম্ (এক Centime এক পেনিরও কম) এবং নগর হইতে নগরান্তরে তারের খবর পাঠাইতে হইলে ৩৪ সেন্‌টিম্ লাগে। অনেকগুলি নগরে টেলিফোনের বন্দোবস্ত ও অনেকগুলি নগরে বিজ্‌লীর বন্দোবস্ত আছে। বড় বড় সহরে ট্রাম চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

এই বৃহৎ বাণিজ্যের খোরাক যোগাইবার জন্য, জাপান, য়ুরোপীয় ধরণে বড় বড় কল্‌কার্‌খানা খুলিয়াছে। ওসাকা, কিয়োটা ও টোকিয়োতে এইরূপ কল্‌কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৯ অব্দে প্রায় ২০০০ 'চিমনি, ৪৫০ এর অধিক বয়লার, ও ৪০০ এঞ্জিন ছিল। এই সকল কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যজাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ১০ বৎসরের মধ্যে রেশম ও তুলাজাত কাপড় দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ৫০ কোটী হইতে ৫০০ কোটিতে উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক ও শাসনসম্বন্ধীয় প্রয়োজন বশতই জাপান যেরূপ য়ুরোপীয় সৈন্য ও

যুদ্ধজাহাজের বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেইরূপ দায়ে পড়িয়াই জাপান, য়ুরোপীয় ধরণের শিল্পবাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছে। জাপান এতদিন যাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল—ভয় হয় পাছে সেই প্রাচ্য পুরাতন সভ্যতা, আধুনিক জাপান বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। তাহা হইলে, জাপানী কৃষকের জীবন রূঢ় হইলেও তাহাতে যে সুস্থ স্বাধীন শোভন ভাব ছিল, সেই ভাবটুকু নষ্ট হইবে এবং আধুনিক জাপানের কলকারখানায় বাস করিয়া শ্রমজীবিদিগের অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিবে। জাপানে যে তিন মাস ছিলাম, সেই সুমধুর ভ্রমণকালের মধ্যে আমি কলকারখানায় যে সময়টা অতিবাহিত করিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে জাপানী ধরণের প্রফুল্ল হাস্যময় জীবন, আর শ্রমজীবীদিগের মধ্যে য়ুরোপীয় ধরণের বিষাদগম্ভীর ভাব—এই উভয়ের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহা নিতান্তই কষ্টকর। কলকারখানা হইতে ধূম-নল উত্থিত হইয়া, জাপানের সুন্দর দৃশ্যগুলিকে পরিম্লান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রমশিল্পের মনুষ্যত্ব-নাশক নিষ্ঠুর য়ুরোপীয় পদ্ধতি, এই সুখী জাতিকে নিষ্পেষিত ও উহাদের আনন্দকে হ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তারপর জাপান, সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্ম ও শিল্পবাণিজ্যাদিকে য়ুরোপীয় ধরণে পরিণত করিবার জন্য,—কর্ম্মচারী, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, ডাক্তার, সওদাগর, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি যোগাইবার জন্য, শিক্ষার নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিল। এই শিক্ষাপদ্ধতির মূলভাবটি—বৈজ্ঞানিক হিসাবে আধুনিক, ও নৈতিক হিসাবে পুরাতন-প্রথানুগত। এক্ষণে জাপানীরা য়ুরোপ ও আমেরিকার উৎকৃষ্ট পাঠশালা সমূহের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; বালক বালিকা মাত্রই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে আইনের দ্বারা বাধ্য—যদিও এই নিয়ম এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই; উহারা বালক বালিকার জন্য মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয় ও বালকদিগের জন্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। উহারা পাঠশালায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, য়ুরোপীয় ধরণে যেমন একদিকে বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেছে, সেই সঙ্গে জাপানের চিরপ্রথানুগত পুরাতন নীতি-শিক্ষাও বজায় রাখিয়াছে। "এমন কি, পাঠশালাতেও, ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় পিতৃপুরুষের পূজা হইয়া থাকে, এবং জাপানীরা জাতীয় ইতিহাসকে ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় পবিত্র বলিয়া মনে করে।" উহাদের প্রাথমিক পাঠশালার একটা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এইরূপ আছে ঃ—"জাপানীরা কেবল ধর্ম্মানুরাগের দ্বারাই পরিচালিত হয়, পক্ষান্তরে, নীচ-প্রকৃতি য়ুরোপীয়েরা কেবল ভৌতিক সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখই অন্বেষণ করে।"

আধুনিক বিজ্ঞানের অনুশীলন, জাপানীদের চিন্তাপ্রবাহ ও হৃদয়ভাবের উপর কিরূপ প্রভাব প্রকটিত করিবে—বলা কঠিন, কিন্তু এ কথা এখনই বলা যাইতে পারে,—জাপানের বিদ্যালয়ে যেরূপ দেশানুরাগ-উদ্দীপক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে ঐ শিক্ষা উহাদের জাতীয় ভাবকে আরও গভীর, এবং আরও পরাক্রমণকারী করিয়া তুলিবে। বিদেশীয় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে,—জাপানীদের মধ্যে, শুধু ছাত্রেরাই, জাপানী-সুলভ মাধুর্য্য সহকারে বৈদেশিকদিগের প্রতি যথারীতি শিষ্টতা প্রদর্শন করে না। এ একটা ছোট কথা, কিন্তু ইহা

হইতেই বুঝা যায়, জাপানের য়ুরোপীয় ভাব আসলে জিনিসটা কি! ইহা নিশ্চিত,—যদি জাপানীরা কোন কোন বিষয়ে আমাদের অনুকরণ করিয়া থাকে, তবে এ কারণে নহে যে, তাহারা মনে করে, আমরা জাপানীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আধুনিক জাপান—পুরাতন প্রাচ্য সভ্যতা ও আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার অদ্ভুত মিশ্রণ; কিন্তু এক হিসাবে বলিতে গেলে, এই মিশ্রণের একটা নির্দ্দিষ্ট ভাগ-পরিমাণ আছে—সে ভাগ-পরিমাণ, জাপানের জাতীয় ভাবই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। জাপানের য়ুরোপীয় অনুকরণ নিতান্তই ভাসা-ভাসা, উহা জাতি-সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হয় নাই; জাপানীরা ইচ্ছা করিয়াই এই য়ুরোপীয় অনুকরণকে একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। জানিয়া বুঝিয়াই উহারা, য়ুরোপীয় সভ্যতার কোন কোন অংশ গ্রহণ ও কোন কোন অংশ বর্জ্জন করিয়াছে। প্রাচীন জাপানী সভ্যতার যেগুলি মুখ্য জিনিস্—সেই বাহ্য জীবন প্রণালী—গৃহ আসবাব খাদ্য, পরিচ্ছদ; সেই আভ্যন্তরিক জীবনের ব্যাপারসমূহ—রীতি নীতি আচার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদ; শিল্পকলা, ধর্ম্ম—ইহার সমস্তই জাপানীরা বজায় রাখিয়াছে।

কতকগুলি আধুনিক কার্য্যপ্রণালী ও অনুষ্ঠানের প্রভাবে, জাপানের মানসিক চিন্তা ও হৃদয়ভাবের উপর যদি কোন পরিবর্ত্তন আসিয়া থাকে ত সে পরিবর্ত্তন বোধ হয় জাপানের অজ্ঞাতসারে এবং নিশ্চয়ই জাপানের অনিচ্ছাসত্বে হইয়াছে; "আমরা যেমন আমাদের কার্য্যের প্রভু, আমাদের কার্য্যও সেইরূপ আমাদের প্রভু;" রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্ত্তন-প্রসূত মানসিক ও নৈতিক পরিণামের সীমা নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। সে যাহা হউক, এখনও আধুনিক জাপান, য়ুরোপ অপেক্ষা পুরাতন জাপানেরই অধিক নিকটবর্ত্তী।—যাহাতে করিয়া য়ুরোপীয় রাজ্যসকল সবল ও স্বাধীন হইয়াছে, জাপান সেই সকল জিনিষই য়ুরোপের নিকট হইতে ধার করিয়াছে, যথা,—সৈন্য, যুদ্ধের জাহাজ, রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী, বাণিজ্য, শিল্প, ও শিক্ষা। আপনার ধরণে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও আপনার ধরণে চিন্তা করিবার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই জাপান কোন কোন বিষয়ে য়ুরোপের অনুকরণ করিয়াছে। যে সকল চিরন্তন অভ্যাস তাহাদের ভালবাসার জিনিস, সেই সকল অভ্যাসকে বজায় রাখিবার জন্যই জাপান আপনাকে রূপান্তরিত করিয়াছে; জাপানের য়ুরোপীয় অনুকরণ,—জাপানী জীবনের শ্রেষ্ঠতার নিকট একপ্রকার পূজাঞ্জলি প্রদান করা বলিলেও হয়। ভাল করিয়া জাপানী ভাব বজায় রাখিবার জন্যই জাপান, য়ুরোপীয় আকার ধারণ করিয়াছে।

হাম্বির

(মুকুট উদ্ধার)

আরাবল্লী পর্ব্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার, তুহাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়াটাকে একদিকে ছেড়ে দিয়ে, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন; ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল! শিকারের সন্ধানে বাঘ যেমন ফেরে তেমনি সেই অন্ধকার বনে হাম্বির নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে—গিরি নদীর পারে পারে, ঘন বনের ধারে ধারে, ডাকাতের সন্ধান করে চল্লেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্ব্বতের গহ্বর—এমনি ভাবে হাম্বিরের দিনের পর দিন কাটতে চল্লো। সে সব মহাবনে মানুষ চলাচল নাই, দিবা রাত্রি সেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ ভালুকের গর্জ্জন। দিনের পর দিন হাম্বির সেই সকল মহাবনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; বনের আর অন্ত নাই! একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি, বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব! হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে মনে ভাবছেন—দূর কর ছাই, ডাকাতের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? আজতো এই অন্ধকারে পথ চলা অসম্ভব, আজ রাত্রি দেখছি এই গাছেই কাটাতে হলো; উঃ বনের তলায় মশাগুলো ভন্ ভন্ করে ডাকছে দেখ! আবার ওই যে বাঘের গর্জ্জন ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে, এত মশার ভন্‌ভনানি আর বাঘের ডাক কোন দিন তো শুনিনি! যাই হোক আজ রাত্রে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়, এ বনটায় তত গাছ পালা নেই কিন্তু জীব জন্তু ঢের দেখছি। হাম্বির নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন। অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙ্গল। হাম্বির দেখলেন আকাশের এক দিকে রাঙ্গা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাম্বির উঠে বসলেন; কিন্তু সকাল হল তো পাখী ডাকে না কেন? আকাশের মাঝে চাঁদ যে এখনো ঝল্‌মল্ করছে! তবে ভ্রম হল নাকি? হাম্বির বেশ করে চারিদিক দেখতে লাগলেন। সেই সময় তুজন মানুষে সেই শাল গাছের তলায় কিছু বলাবলি কচ্ছে শোনা গেল। লোক তুটার কথা বোঝা গেল না কিন্তু তু'একবার মুঞ্জ ডাকাত আর সুজন বাহাতুরের নাম স্পষ্ট শোনা গেল। হাম্বির কাণ পেতে শুনতে লাগলেন তুই পাহাড়িতে কথা হচ্ছে—'ওরে ভাই বদরী তুই এখনও সর্দ্দারকে মুঞ্জু মুঞ্জু বলিস তাইতেই সেতো চটে'। 'মুঞ্জুকে মুঞ্জু বলব না তো কি? সে কি জানেনা যে আমি তার হলেম চাচা?'—'ওরে ভাই সেকি এখন চাচা ফাচা মানে, যেদিন থেকে সে ওই রাজপুত গুলো আর রাণার ছেলেকে হারিয়ে লড়াই জিতেছে সেই দিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গিয়েছে; সে চায় এখন আমরা তাকে রাণা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।'—'রেখেদে তোর রাণা, কোথাকার কুমার? আমি তাদের চিরকাল বলব মুঞ্জু আর

ভুঞ্জু'—'তবে ভাই রঞ্জু আজ তুই লাচ দেখতে চলচিস্ কেন? সর্দ্দার আজ মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে তোকে দেখলেই মাথা কাটবে'।—'ওরে একি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টক্ করে হাড়িকাটে মাথা দেবে, চল এখন নাতনীর বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক, বাজে কথায় কেবল রাত কাটালি।' লোক তুটা হন্ হন্ করে উত্তর মুখো চল্লো। হাম্বির এতক্ষণে বুঝলেন তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন; মাদলের তুমাতুম আর ঝাঁঝরের ঝুমাঝুম্ দুর থেকে বাঘের গর্জ্জন আর মশার ভন্‌ভনানির মত শোনা যাচ্ছে, মশালের আলো আকাশের একদিক রাঙ্গা করে তুলেছে। হাম্বির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সেই লোক তুটার সঙ্গ নিলেন।

কত দিন কেটে গেছে। সুজন বাহাতুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাম্বিরের কিন্তু এখনও কোন খবর নাই। সকলেই বলছে তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছেন। এমন সময় মহারাণার সভায় হাম্বিরের এক পত্র এল। হাম্বির উজলা গ্রাম থেকে লিখছেন—তিনি উজলা গ্রামে মুঞ্জু বাহাতুরকে মেবারের রাণা করে রাজসিংহাসনে স্থাপন করেছেন আর নূতন রাণা মুঞ্জ হাম্বিরকে কৈলোরের কেল্লা ও একশ খানা গ্রাম জাইগীর দিয়েছেন; অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভাল নচেৎ লড়াই নিশ্চয় এবং মুঞ্জু বাহাতুর স্বশরীরে স্বগণে এসে কেল্লা দখল করবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। শুনে সুজনসিং বলে উঠলেন—দেখলে ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে! সে কি মনে করেছে তুমুটো ডাকাত নিয়ে মেবার দখল করবে! আমি থাকতে?

অজয় সিংহ বল্লেন—এতো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কি হাম্বিরেরই লেখা? রাজমন্ত্রী বল্লেন, কথাটা যদিও বিশ্বাস যোগ্য নয় কিন্তু বলাও যায় না, আমার মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভাল, আজকালের ছেলেকে বিশ্বাস নাই। সুজনসিংহ বল্লেন, তবে একবার মেবারের সমস্ত সর্দ্দারকে খবর পাঠানো যাক? অজয় সিংহ বল্লেন, তাতে কাজ নাই একি পাঠান বাদশা আসছে সে সামন্ত সর্দ্দারদের খবর পাঠাতে হবে! সকলকে সাবধান থাকতে বল আর হাম্বিরকে লিখে দাও সে যেন এমন তুঃসাহসের কায না করে, সঙ্গে সঙ্গে এক দল সৈন্য নিয়ে তুমি উজলাগ্রাম থেকে ডাকাতের দলকে দুর করে হাম্বিরকে ধরে আন। সুজনসিংহ সে আজ্ঞা বোলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুঞ্জ ডাকাতের হাতে একবার পড়েছিলেন, সে যে কেমন ডাকাত বেশ চিনেছেন, ঘরে গিয়েই তিনি রাজবৈদ্যকে দিয়ে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড় অসুস্থ কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হয়, ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না? অজয় সিংহ বল্লেন, আচ্ছা তাই হবে। সেইদিন রাত্রে অজয়সিংহ লছমী রাণীর সঙ্গে দেখা কল্লেন, হাম্বিরের পত্র দেখালেন। অন্দর মহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাম্বিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন; তাঁর উপর হুকুম রইল হাম্বিরের পরামর্শ মত খুব সাবধানে কায করবে। এদিকে উজলা গ্রামে শেয়াল রাজার মত মুঞ্জ বাহাতুর রাজসিংহাসন আলো করে বিরাজ কচ্ছেন; ডাইনে বামে গম্ভীরমল আর

চুয়োমল দুই মন্ত্রী কানে কলম গুঁজে বসে আছেন, আর রাজসভায় আছেন উজলা গ্রামের দুএক পেটমোটা জোতদার, দুচার কাল মুস্কো ভীল আর আমাদের হাম্বির। একজন গরীব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি রাজার লোক বেঁধে এনেছে, মুঞ্জ রাজা হুকুম দিলেন, ওর মাথা কাট। অমনি হাম্বির কানে কানে বল্লেন, এরকম কল্লে প্রজালোক খাপ্পা হবে, কিছু বখসিস্ দিতে হুকুম হোক। অমনি দুই মোহর ইলাম হয়ে গেল; গরীব এসে দুই হাতে সেলাম বাজিয়ে বিদায় হল। মনে মনে বল্লে, রাজাতো হাম্বির এটাতো ডাকাতের সর্দ্দার, ওর কি মায়া দয়া আছে। নাকে দড়ি দিয়ে লোক যেমন ভালুক নাচায় তেমনি হাম্বিরের হাতে ভীল রাজার অবস্থার ব্যবস্থা হতে লাগ্‌লো। এই সময়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জবাহাদুরের সঙ্গে দেখা কল্লেন, কথা স্থির হল—মহারাণা কৈলোরের কেল্লা হাম্বিরকে দিয়ে নিজে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে কাশী বাস করুন। তাঁর খরচপত্র রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়াই স্থির। এদিকে হাম্বির ভীল রাজার হয়ে রাজ্য শাসন করুন সেজন্য তাঁকে সমস্ত খরচ খরচা বাদ মাসিক দশ হাজার তন্‌খা ও চিতোরের কেল্লা জাইগীর দেওয়া যাবে। চুয়োমল সনন্দ লিখে দস্তখতের জন্য হুকুম পেশ কল্লেন। হজুর তো লিখতে জানেন কত? কলম হাতে হাম্বিরের দিকে চাইলেন; হাম্বির বল্লেন এসব পাকা দলিলে কলমের সই দেওয়া ভাল নয়, এতে মহারাজের পাঞ্জা মোহর থাকাই উচিত। মুঞ্জ বাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দাখিলের দুই পিঠে হাতের ছাপ লাগালেন। সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হয়ে বাসায় এলেন। সেনাপতি চলে গেলে মুঞ্জ বাহাদুর হাম্বিরের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বল্লেন, এতো বড় মজা, লড়াই নেই হাঙ্গামা নেই এক হাতের ছাপায় কায উদ্ধার; দিল্লীর বাদসাহকে এমনি একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরটা দখল নিলে হয় না? হাম্বির বল্লেন, আগে মেবার দখল হয়ে যাক, তার পর দিল্লী পর্য্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে; এখন একটু আমোদ আহ্লাদের হুকুম হোক, রাণার সেনাপতি আমাদের জাঁক জমকটা একবার দেখে যাক! মুঞ্জ বল্লেন বন্ধু তুমি যেমন বোঝ কর, কিন্তু দেখো মাদোলের বাজনা আর মহুয়ার কলসীটা ভুলো না, এ দুটো না থাকলে আমোদ হবে না। হাম্বির ভয়ে ভয়ে মহুয়ার কলসী ও দলে দলে মাদোলের ব্যবস্থা কল্লেন। উজলা গ্রামে ভীল রাজার রাজপ্রাসাদে আমোদের ফোয়ারা খুলে গেল; হাম্বির এল্লেন, সেনাপতি এলেন, গম্ভীর মল চুয়োমল এলেন, এল গ্রামের প্রজালোক, পাড়া প্রতিবাসী যে যেখানে ছিল, আর সঙ্গে এল সাদা কাপড় পরে ও ভদ্রলোক সেজে এক দল রাজপুত সেনা। রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে গ্রামবাসীরা যে যার ঘরে গিয়েছে, ভীলের দল মহুয়ার কলসী জড়িয়ে যেখানে সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই সময় একটা চটের থলিতে ভীল সর্দ্দারের কাটা মাথা নিয়ে বেতো ঘোড়ায় চড়ে হাম্বির কৈলোরের মুখে চল্লেন। সেনাপতির উপর ভীল রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল। হাম্বির যেমন সন্ধ্যাবেলা কৈলোর থেকে বেরিয়েছিলেন ঠিক তেমনি সন্ধ্যাবেলা আর একদিন সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে রক্তমুকুট সমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন, কেল্লায় জয়জয়কার পড়ে গেল।

মহারাণা ভীলের কাঁচা রক্তে হাম্বিরের কপালে রাজটীকা লিখে দিয়ে বল্লেন, বৎস রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টিকাড়োর ব্রত সাঙ্গ কর্‌তে হয়, আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার টিকাড়োর উদ্‌যাপন হল, আজ থেকে সিংহাসন তোমার; কিন্তু মনে রেখো মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখন পাঠানের হস্তগত।

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মহিলাশিল্পসমিতি।

সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে দেশ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে পূজনীয়া মাতৃদেবী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ১২১৩ সালে কলিকাতা নগরীতে সখিসমিতি নামে একটী মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে তখন প্রায় প্রতি বৎসরে মহিলাশিল্পমেলা নামে যে একটি শিল্পপ্রদর্শনী হইত তাহা বোধ হয় এখনো অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। এই প্রদর্শনীর দৃষ্টান্ত হইতেই পরে জাতীয় সম্মিলনীর সময় ভারতশিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

অনাথা বিধবা এবং দরিদ্রা কুমারীকন্যাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া পরে তাহাদিগের দ্বারা অন্তঃপুরে শিক্ষা বিস্তার করা সমিতির একটী উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উহাদিগকে আশ্রয় ও ভরণ পোষণ দানের নিমিত্ত যেরূপ অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে না পারায় কয়েকটী বালিকাকে শিক্ষাদান করিয়াও সমিতি অন্তঃপুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শিল্পসমিতি সখিসমিতিরই নূতন সংস্করণ। কেবলমাত্র মহিলাসম্মিলন উদ্দেশ্য সখিসমিতির মধ্যে রাখিয়া উহার অন্যান্য উদ্দেশ্য শিল্পসমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে একার্য্যে প্রথম পদক্ষেপে আমরা যে ভুলচুক করিয়াছি যে সকল জ্ঞানের অভাবে সখি সমিতির উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে তখন সাধিত হয় নাই, তাহার সংশোধনে, নব অভিজ্ঞতায় নব উদ্যমে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, শিল্পশিক্ষাদানই যে শিল্পসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য নামেতেই তাহার প্রকাশ।

১২১৩ সালের বৈশাখ মাসে শিল্পসমিতির তত্ত্বাবধানে ৯ নম্বর শিবনারায়ণ দাসের লেনে মহিলাশিল্পাশ্রম নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে আবশ্যক বুঝিলে কুমারীদিগকেও আশ্রয় দেওয়া হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা অনাথা বিধবাদিগেরই আশ্রয়স্থান। আমাদের দেশের বিধবাদের দুঃখকষ্ট বিশ্বজনবিদিত। এই আশ্রমে আশ্রিত হইয়া শিল্প শিক্ষা লাভে তাঁহারা যদি অন্ততঃ পক্ষে নিজ নিজ জীবিকার সংস্থানও করিতে পারেন তাহাতেও দেশের মহামঙ্গল। অতএব শিল্পসমিতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, বিধবাশ্রম স্থাপন। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অন্তপুরের মহিলাদিগকে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা দান।

এই উদ্দেশ্যে শিল্পাশ্রমে প্রতিদিন বারটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত দৈনিকছাত্রীর সমাগম হয়। পুরমহিলাগণের সুবিধা বুঝিয়াই এইরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে গৃহ কার্য্যের পর স্কুলে আসিয়া পুনরায় যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। মধ্যের অবসর সময় টুকু মাত্র শিক্ষাতে অতিবাহিত হয়।

আজকাল এই দুর্ম্মূল্যের দিনে শিল্পশিক্ষায় গৃহস্থ পরিবারের কিরূপ সুবিধা হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। একদিকে নিত্য ব্যবহার্য্য মোজা পিরাণ প্রভৃতি বস্ত্র মহিলাগণ নিজে প্রস্তুত করিয়া সংসারের ব্যয় লাঘব করিতে পারেন, অন্যদিকে নানারূপ সূক্ষ্মশিল্প প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলেও তাঁহাদের বেশ লাভ হইতে পারে।

যে গৃহে অভাব নাই সেখানেও শিল্পশিক্ষা অনাবশ্যক নহে। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য চর্চ্চা। ধনীললনাগণের মধ্যেও সর্ব্বদেশেই কলাবিদ্যা শিক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। অতএব ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র নির্ব্বিশেষে পুরমহিলা মাত্রেরই জন্য এই শিল্প-বিদ্যালয় উন্মুক্ত। নিম্নলিখিত শিল্প সকল এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১।	ক।	বস্ত্রবয়ন ও সূতাকাটা		গ।	সঙ্গীত ও যন্ত্র-আলাপন
	খ।	কলের মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি		ঘ।	নানাবিধ কারু কার্য্য
	গ।	লেস	৩।	ক।	রন্ধন
	ঘ।	কাটা কাপড় ও পোষাক		খ।	শুশ্রূষা
২।	ক।	রেখা চিত্র ও তৈল চিত্র		গ।	স্বাস্থ্যরক্ষা
	খ।	খোদাই ও গঠন কার্য্য		ঘ।	সহজ চিকিৎসা

শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য সাধন অভিপ্রায়ে কয়েকটী পাশ্চাত্যরমণী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন। কোন বঙ্গসন্তান মাতৃভূমির মঙ্গলকামনায় কষ্ট স্বীকার করিলে তিনি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন হইতে পারেন কিন্তু ধন্যবাদের পাত্র নহেন। তাঁহার ত্যাগস্বীকার তাঁহারই ভ্রাতাভগিনীর জন্য। তাহাই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু বিদেশী লোক আমাদের জন্য যখন কষ্ট স্বীকার করেন তখন তাহার প্রতি আমাদের ধন্যবাদ স্বত উৎসারিত হইয়া উঠে, কেননা তাঁহারা তখন পরকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ মহত্ত্ব এখন এত বিরল!

বস্তুত পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের এত ঘনিষ্ঠতাতেও যে প্রেমের মিলন নাই, ইহাই আমাদের প্রকৃত দুর্ভাগ্য। পূর্ব্বে বরঞ্চ অনেক ইংরাজ আমাদের দেশকে নিজের দেশ জ্ঞান করিয়া এদেশের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন। হেয়ার সাহেব ও বেথুন সাহেব তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আজকাল সেই প্রেমের মিলনের অভাবেই দেশে এত উৎপাৎ। কিন্তু একদিন পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের সত্যভাবে মিলন ঘটিবেই। যতদিন তা না হয় ততদিন ভারতের অব্যাহতি নাই। ইহা পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবিষ্যৎ-বাণী। এই বিষম অনৈক্যের দিনেও কয়েকটী সহৃদয়া ইংরাজ ললনা যেরূপ আন্তরিকভাবে আমাদের সহিত যোগদান

করিয়া সমিতির উদ্দেশ সাধনে যত্নবতী হইয়াছেন, তাহা এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ব্বসূচনা মনে করা যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত মহিলাগণ শিল্পাশ্রমের পরিচালিকা।

শ্রীমতী মহারাণী কুচবেহার	মিসেস হোয়উড
শ্রীমতী মহারাণী মৌরভঞ্জ	মিসেস কে পি গুপ্ত
শ্রীমতী মহারাণী অধিরাণী বর্দ্ধমান	মিসেস শিশির মল্লিক
লেডী হ্যামিণ্টন	মিসেস পিক
শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী দেবী	মিসেস আর সি দত্ত
শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী	মিসেস জে এল দত্ত
শ্রীমতী যাদুমতি দেবী	মিসেস এন দাস
শ্রীমতি ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরাণী	কুমারী কুমুদিনী মিত্র
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	মিসেস এস পি সিংহ
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী
মিসেস এন এন বানার্জি	সম্পাদিকা।
মিসেস চ্যাপমান	

ইহা ব্যতীত শিল্পসমিতির একটী সহায় সমিতি আছে। ইহার মেম্বরগণ পুরুষ। যে সকল কাজ বাহিরে গিয়া মহিলাগণ নিজে করিতে পারেন না, সেই সকল কার্য্যে ইহাঁরা তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। এবং সমিতির যে সকল মহিলার ইহাঁদিগের নিকট বাহির হইতে আপত্তি নাই তাঁহারাই ইহাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করেন। এই উপায়ে সমিতির কার্য্য সুশৃঙ্খলারূপে সাধিত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য এ বিদ্যালয় কেবল মহিলাদিগের দ্বারাই পরিচালিত। এবং হিন্দু বিধবাগণ হিন্দু ভাবেই এখানে থাকেন। যে কোন মহিলা ইচ্ছা করিলে উক্তভবনে আসিয়া ইহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া যাইতে পারেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ এই আশ্রম দর্শন করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এখন এই আশ্রমে ত্রিশটি কন্যা বাস করেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুবিধবা এবং ইহাদের ব্যয়ভার সমিতিই বহন করে। দৈনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এখন প্রায় ৫০টি। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের জন্য প্রতিদিন বহু অনাথা, বিধবা ও দৈনিক ছাত্রীর আবেদন পাওয়া যাইতেছে। অথচ অধিক ছাত্রী গ্রহণের অর্থই অধিক অর্থব্যয়। অধিক বিধবা লইতে হইলে বিধবা নিবাসে স্থান বাড়াইতে হইবে সে জন্য বড় বাড়ীর আবশ্যক, তাহা ছাড়া তাহাদের ভরণ পোষণ ব্যয়, দৈনিক ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের যাতায়াতের গাড়ীর ব্যয় প্রভৃতি বাড়ান চাই। অতএব সমিতির আয় বৃদ্ধি না হইলে আর অধিক ছাত্রী গ্রহণ একরূপ অসম্ভব।

আপাততঃ এই আশ্রম ও স্কুলের জন্য প্রতিমাসে প্রায় হাজার টাকা খরচ পড়ে।

গভর্ণমেণ্ট এ জন্য চারিশত টাকা দান করেন বাকী ৬০০ শত চাঁদা করিয়া তুলিতে হয়। চির কাল কিছু এরূপ চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া কোন আশ্রম বা বিদ্যালয় স্থায়ী হইতে পারে না। আশ্রমের একটি নিজস্ব বাটি, এবং ইহা রক্ষার জন্য কতকটা মূলধন আবশ্যক। *

বোম্বাই অঞ্চলে কেবল একটি নহে, তিনটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিতে অর্থাভাব হয় নাই, আর বঙ্গদেশে এই একটি মাত্র বিধবাশ্রম যদি অর্থাভাবে স্থায়ী না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীর লজ্জার সীমা থাকিবে না। আমরা বহু আশা করিয়া আজ দানশীল, করুণহৃদয় ভ্রাতা-ভগিনীদের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আসিয়াছি। এই সৎকার্য্যে অল্প বিস্তর যিনি যাহা দান করিবেন তাহাতেই তাঁহার পুণ্য সঞ্চয় হইবে; দেশের অনাথা ভগিনীদিগের আশীর্ব্বাদ শত-ধারায় তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবে। দানমুদ্রা ভারতী-সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেই হইবে। ভারতীতে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার থাকিবে। শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী—সম্পাদিকা শিল্পসমিতি।

অনন্ত রূপ।

আমি চাই একা তোমা করিবারে ভোগ—
বিশ্বের জনতা সাথে নাই মোর যোগ;
তাই মোর ক্ষুদ্র বুকে সঙ্কুচিত রূপে
অলস বৈচিত্র্যহীন জাগ তুমি চুপে।
হোথায় নিখিলমাঝে শব্দে রূপে ঘ্রাণে,
কত না বিচিত্র শোভা কত নব তানে;
কত শান্তি কত যুদ্ধ কলহ মিলনে,
কত জাতি সমাজের উত্থান পতনে,
সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম্মেতে,
নির্ভীক স্বদেশবীর-পুণ্যরক্তপাতে,
সাধকের সাধনায়, কবির সঙ্গীতে,
কত রূপে জাগিতেছ সে অনাদি হ'তে!
এ মোহ স্বার্থের গণ্ডী যতই বিস্তারি
তত ও অনন্ত রূপ বিস্ময়ে নেহারি!

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

শুকতারা।

তুমি কি গগনকোলে শান্ত শুকতারা
ঢাল স্নিগ্ধ সুবিমল কিরণের ধারা?
ঊষার নীহার জলে সদ্য স্নান করে,
কোন গুপ্ত তপোবনে, কি পূজার তরে,
কার ধ্যানে মগ্ন রহি সমস্ত দিবস
নিশিতে উঠিছ লয়ে শরীর অলস!
কোন রবি সমাদরে দিয়াছে তোমায়
আপন অঙ্গের প্রভা আঁধার নিশায়;
কোন শশধর কোলে সিত সন্ধ্যাবেলা
অস্থির সংসার সুখে করি অবহেলা,
নীরবে মস্তক রাখি করিয়া শয়ন
দূর ধরণীর পানে ফিরাও নয়ন?
হেথা বসি কতজন তোমার বদন
পলক বিহীন নেত্রে করিছে দর্শন।

শ্রীতরুণ রাম ফুকন।

---

* আমরা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে শিল্পসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যকলাপাদির পরিচয় দিলাম। যদি কেহ আশ্রম ও স্কুলের নিয়মাবলী ও আয়ব্যয় প্রভৃতির সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পত্র লিখিলে সমিতির একখানি কার্য্যবিবরণীপত্রিকা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে।

দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ আজ কাল ভারতের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ এ দেশে বর্ষাভাবের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ। কিন্তু নৈসর্গিক বিঘ্নবিপত্তি সকল দেশেই হইয়া থাকে। ইউরোপে যে আদৌ বর্ষাভাব হয় না, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু এই এক ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও বর্ষাভাবের অনিবার্য্য ফল দুর্ভিক্ষ এরূপ পরিলক্ষিত হয় না। ইটালীর সুধী কাউণ্ট ক্যাভুর বলিয়াছিলেন, ইউরোপে দুর্ভিক্ষ হওয়া অসম্ভব। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ক্যাভূরের কথার সারবত্তা ও সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। ইউরোপ কেন যে দুর্ভিক্ষব্যাধিমুক্ত, আর ভারত কেন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, ইহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। যদি দুর্ভিক্ষ বর্ষাভাবের অনিবার্য্য ফল হইত, তাহা হইলে ইউরোপেও দুর্ভিক্ষ দেখা যাইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখন বর্ষাভাব ভারতের দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ নহে। বাজারে শস্য নাই, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষে ঘটে না। দুই এক বৎসর শস্য না জন্মিলেও দেশ বিদেশে আমরা শস্য পাঠাইতে পারি। আমাদিগের কৃষক, শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা যে অন্নাভাবে হাহাকার করে, তাহা শস্যের অসদ্ভাবে তেমন নহে। জগতের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতে প্রচুর শস্য থাকে, মহার্ঘতাও নাই। তথাপি হতভাগ্য ভারতের দরিদ্রগণ যে কাতরস্বরে অভাবের দারুণ তাড়নায় আর্ত্তনাদ করে, হা অন্ন হা অন্ন করিয়া পাষাণেরও হৃদয় বিদীর্ণ করে, ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণকায় পুত্রকলত্রের মুখ চাহিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করে, তাহার কারণ কি? অর্থের অভাবই সকল অনর্থের মূল। গৃহে অর্থ নাই, বাজারে ঋণ পাওয়া যায় না, হাল গরু বেচিয়া তৈজস পত্র বাঁধা দিয়া যত দিন আপনারা চালাইতে পারে চালায়। পরিশেষে "যা করেন জনার্দ্দন" বলিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। এ সকল কল্পনার কথা নহে, কবির স্বপ্ন নহে। দিন দুই আনা ব্যয়ে যাহাদিগের "রাজার হালে" দিন কাটে, তাহারা অন্নকষ্টে অনশনে প্রাণত্যাগ করে, ইহা কি শাসন-প্রণালীর গৌরবের কথা? দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজারক্ষার জন্য রাজার কিরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে প্রাচ্যনীতির সহিত প্রতীচ্য নীতির প্রভেদ নিতান্ত সামান্য নহে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভারতের ভূতপূর্ব্ব হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গ প্রজা-পুঞ্জকে রাজস্ব প্রদানের দায় হইতে একেবারে মুক্তি প্রদান করিতেন, অধিকন্তু তাঁহারা বিপন্ন প্রজার রক্ষার জন্য রাজকোষ হইতেও মুক্ত হস্তে অর্থ ও অন্ন দান করিতে প্রায় কখনও কৃপণতা করিতেন না। পূর্ব্বে ইংরেজরাজও নিজেই ভারতে অন্নরক্ষা করিতেন, তখন বৃটীশ ভারতের বড় বড় সহরে সরকারী পাকা গোলা বা শস্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটনার পাকা গোলা এখনও আছে; নাই কেবল তাহার শস্য। যাহা পাটনায় ছিল, তাহা অনেক সহরেই ছিল। শস্য সঞ্চয় এখনও যে, এ দেশে ইংরেজরাজ করেন না, এরূপ নহে। কলিকাতার কেল্লায় প্রভূত খাদ্য শস্য মজুত থাকে। উদ্দেশ্য, যদি কখনও দুর্গ শত্রুসেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ

গভর্ণমেণ্ট এ জন্য চারিশত টাকা দান করেন বাকী ৬০০ শত চাঁদা করিয়া তুলিতে হয়। চির কাল কিছু এরূপ চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া কোন আশ্রম বা বিদ্যালয় স্থায়ী হইতে পারে না। আশ্রমের একটি নিজস্ব বাটি, এবং ইহা রক্ষার জন্য কতকটা মূলধন আবশ্যক। *

বোম্বাই অঞ্চলে কেবল একটি নহে, তিনটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিতে অর্থাভাব হয় নাই, আর বঙ্গদেশে এই একটি মাত্র বিধবাশ্রম যদি অর্থাভাবে স্থায়ী না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীর লজ্জার সীমা থাকিবে না। আমরা বহু আশা করিয়া আজ দানশীল, করুণহৃদয় ভ্রাতা-ভগিনীদের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আসিয়াছি। এই সৎকার্য্যে অল্প বিস্তর যিনি যাহা দান করিবেন তাহাতেই তাঁহার পুণ্য সঞ্চয় হইবে; দেশের অনাথা ভগিনীদিগের আশীর্ব্বাদ শত-ধারায় তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবে। দানমুদ্রা ভারতী-সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেই হইবে। ভারতীতে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার থাকিবে। শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী—সম্পাদিকা শিল্পসমিতি।

অনন্ত রূপ।

আমি চাই একা তোমা করিবারে ভোগ—
বিশ্বের জনতা সাথে নাই মোর যোগ;
তাই মোর ক্ষুদ্র বুকে সঙ্কুচিত রূপে
অলস বৈচিত্র্যহীন জাগ তুমি চুপে।
হোথায় নিখিলমাঝে শব্দে রূপে ঘ্রাণে,
কত না বিচিত্র শোভা কত নব তানে;
কত শান্তি কত যুদ্ধ কলহ মিলনে,
কত জাতি সমাজের উত্থান পতনে,
সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম্মেতে,
নির্ভীক স্বদেশবীর-পুণ্যরক্তপাতে,
সাধকের সাধনায়, কবির সঙ্গীতে,
কত রূপে জাগিতেছ সে অনাদি হ'তে!
এ মোহ স্বার্থের গণ্ডী যতই বিস্তারি
তত ও অনন্ত রূপ বিস্ময়ে নেহারি!

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

শুকতারা।

তুমি কি গগনকোলে শান্ত শুকতারা
ঢাল স্নিগ্ধ সুবিমল কিরণের ধারা?
ঊষার নীহার জলে সদ্য স্নান করে,
কোন গুপ্ত তপোবনে, কি পূজার তরে,
কার ধ্যানে মগ্ন রহি সমস্ত দিবস
নিশিতে উঠিছ লয়ে শরীর অলস!
কোন রবি সমাদরে দিয়াছে তোমায়
আপন অঙ্গের প্রভা আঁধার নিশায়;
কোন শশধর কোলে সিত সন্ধ্যাবেলা
অস্থির সংসার সুখে করি অবহেলা,
নীরবে মস্তক রাখি করিয়া শয়ন
দূর ধরণীর পানে ফিরাও নয়ন?
হেথা বসি কতজন তোমার বদন
পলক বিহীন নেত্রে করিছে দর্শন।

শ্রীতরুণ রাম কুকন।

---

* আমরা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে শিল্পসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যকলাপাদির পরিচয় দিলাম। যদি কেহ আশ্রম ও স্কুলের নিয়মাবলী ও আয়ব্যয় প্রভৃতির সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পত্র লিখিলে সমিতির একখানি কার্য্যবিবরণীপত্রিকা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে।

দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ আজ কাল ভারতের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ এ দেশে বর্ষাভাবের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ। কিন্তু নৈসর্গিক বিঘ্নবিপত্তি সকল দেশেই হইয়া থাকে। ইউরোপে যে আদৌ বর্ষাভাব হয় না, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু এই এক ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও বর্ষাভাবের অনিবার্য্য ফল দুর্ভিক্ষ এরূপ পরিলক্ষিত হয় না। ইটালীর সুধী কাউণ্ট ক্যাভুর বলিয়াছিলেন, ইউরোপে দুর্ভিক্ষ হওয়া অসম্ভব। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ক্যাভুরের কথার সারবত্তা ও সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। ইউরোপ কেন যে দুর্ভিক্ষব্যাধিমুক্ত, আর ভারত কেন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, ইহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। যদি দুর্ভিক্ষ বর্ষাভাবের অনিবার্য্য ফল হইত, তাহা হইলে ইউরোপেও দুর্ভিক্ষ দেখা যাইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখন বর্ষাভাব ভারতের দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ নহে। বাজারে শস্য নাই, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষে ঘটে না। দুই এক বৎসর শস্য না জন্মিলেও দেশ বিদেশে আমরা শস্য পাঠাইতে পারি। আমাদিগের কৃষক, শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা যে অন্নাভাবে হাহাকার করে, তাহা শস্যের অসদ্ভাবে তেমন নহে। জগতের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতে প্রচুর শস্য থাকে, মহার্ঘতাও নাই। তথাপি হতভাগ্য ভারতের দরিদ্রগণ যে কাতরস্বরে অভাবের দারুণ তাড়নায় আর্ত্তনাদ করে, হা অন্ন হা অন্ন করিয়া পাষাণেরও হৃদয় বিদীর্ণ করে, ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণকায় পুত্রকলত্রের মুখ চাহিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করে, তাহার কারণ কি? অর্থের অভাবই সকল অনর্থের মূল। গৃহে অর্থ নাই, বাজারে ঋণ পাওয়া যায় না, হাল গরু বেচিয়া তৈজস পত্র বাঁধা দিয়া যত দিন আপনারা চালাইতে পারে চালায়। পরিশেষে "যা করেন জনার্দ্দন" বলিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। এ সকল কল্পনার কথা নহে, কবির স্বপ্ন নহে। দিন দুই আনা ব্যয়ে যাহাদিগের "রাজার হালে" দিন কাটে, তাহারা অন্নকষ্টে অনশনে প্রাণত্যাগ করে, ইহা কি শাসন-প্রণালীর গৌরবের কথা? দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজারক্ষার জন্য রাজার কিরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে প্রাচ্যনীতির সহিত প্রতীচ্য নীতির প্রভেদ নিতান্ত সামান্য নহে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভারতের ভূতপূর্ব্ব হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গ প্রজা-পুঞ্জকে রাজস্ব প্রদানের দায় হইতে একেবারে মুক্তি প্রদান করিতেন, অধিকন্তু তাঁহারা বিপন্ন প্রজার রক্ষার জন্য রাজকোষ হইতেও মুক্ত হস্তে অর্থ ও অন্ন দান করিতে প্রায় কখনও কৃপণতা করিতেন না। পূর্ব্বে ইংরেজরাজও নিজেই ভারতে অন্নরক্ষা করিতেন, তখন বৃটীশ ভারতের বড় বড় সহরে সরকারী পাকা গোলা বা শস্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটনার পাকা গোলা এখনও আছে; নাই কেবল তাহার শস্য। যাহা পাটনায় ছিল, তাহা অনেক সহরেই ছিল। শস্য সঞ্চয় এখনও যে, এ দেশে ইংরেজরাজ করেন না, এরূপ নহে। কলিকাতার কেল্লায় প্রভূত খাদ্য শস্য মজুত থাকে। উদ্দেশ্য, যদি কখনও দুর্গ শত্রুসেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ

হয়, তাহা হইলেও, দুর্গস্থ সেনানীদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে না। কেল্লার গোলায় চাউল গম মজুত হয়। মধ্যে মধ্যে পুরাতন শস্য বিক্রীত এবং নূতন ক্রীত হইয়া থাকে। খাদ্যার্থ পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবও যথেষ্ট থাকে। কেবল যে, কলিকাতার দুর্গেই এইরূপ খাদ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, এরূপ নহে। সকল দুর্গে—সেনানিবাসে এইরূপ সঞ্চয় হইয়া থাকে। কেবল প্রজা রক্ষার জন্য শস্য সঞ্চয়ের পক্ষেই অবাধবাণিজ্য তাহার অন্তরায়।

ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, রপ্তানি বন্ধ করিলে অনিষ্ট হইবে। এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রপ্তানি বন্ধ করিলে যদি অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইষ্ট কিসে হইবে স্থির করা উচিত নহে কি? গবর্ণমেণ্ট কি মনে করেন যে, শস্যের মূল্য যেমন আপনা হইতে বাড়িয়া গিয়াছে, সেইরূপ আপনা হইতেই কমিয়া আসিবে? যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে যতদিন দেশের পূর্ব্ব অবস্থা না ফেরে, ততদিন প্রজার জীবন রক্ষার উপায় কি? বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের খাজনা ছাড়িয়া দিতে নিতান্ত কাতর। যতক্ষণ প্রজার জীবন ধারণের কোনও উপায় বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ তাঁহারা প্রজাকে এরূপে সহায়তা করা আলস্যের প্রশ্রয় বৃদ্ধিকর বলিয়া মনে করেন। 'রিলিফে' যাহারা কার্য্য করিতে যায়, তাহারাও নানা কারণে যথেষ্ট পারিশ্রমিক লাভে বঞ্চিত হয়, গবর্ণমেণ্ট যাহা বা দান করেন অনেক কর্ম্মচারী তাহাতে ভাগ বসায়! এইরূপে গড়ে দরে তাহাদের ভাগ্যে এক গাঁ মাগিলেও যা সাত গাঁ মাগিলেও তাহাই দাঁড়ায়।

জমীদার অজন্মার বৎসর খাজনা আদায় করিতে পারেন না। কিন্তু কৈ সেজন্য জমীদার ত কখনও না খাইয়া মরেন না? তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু অনাহারে নিশ্চয়ই থাকিতে হয় না। জমীদারের ঘরে সঞ্চিত শস্য আছে, অথবা শস্য ক্রয়োপযোগী সঞ্চিত ধন আছে, তাই তাঁহাকে অনাহারে মরিতে হয় না। প্রজার ঘরে সঞ্চিত শস্য বা ধন সংস্থান নাই, তাই সে অনাহারে মরে। তাহার উপর কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেই ঋণ জালে আবদ্ধ হইয়া মহাজনদিগের নিকট জমাজমি বন্ধক রাখিতে বাধ্য হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কর্ত্তৃপক্ষ প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে অসমর্থ হইলে, তাহাদিগের মহাজনদিগের নিকট হইতে খাতকের দেয় সরকারি খাজনার টাকা বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। অধমর্ণের খাজনার জন্য উত্তমর্ণের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করা বিধিসঙ্গত হইলে রামের অপরাধে শ্যামকে ফাঁসী দেওয়া অবৈধ হইবে না। তথাপি খাজনা আদায়ের জন্য ইংরাজ রাজ্যে এরূপ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। *

ইতিহাস দেখাইতেছে, পাঠান মোগল অধিরাজত্বের সময়ে, প্রদেশীয় শাসন-কর্ত্তারা, দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্টের সূচনা মাত্রেই স্বরাজ্যের অন্নরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইতেন। বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গে এই জন্যই, তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ হইতে পাইত না। এখনকার মত শস্য রপ্তানি ছিল না। প্রদেশীয় শস্যে

* এ কথা কতদূর সত্য, আমরা অবগত নহি। ভাঃ সং

প্রদেশবাসীদের স্বচ্ছন্দে চলিত। প্রভূত শস্য সঞ্চিত থাকিত, অন্নকষ্টের পথ রুদ্ধ ছিল। মোগল সম্রাট আরঙ্গজীবের সময়ে, তাঁহার বঙ্গীয় রাজপ্রতিনিধি নবাব শায়েস্তা খাঁ "টাকায় আট মণ চাউল" দেখিয়া, ঢাকা হইতে প্রস্থান সময়ে ঢাকার পশ্চিম তোরণ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, এই তোরণ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তোরণের অলিন্দ-দেশে কি আদেশ বাক্য খোদিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন, "যে শাসন কর্ত্তার সময়ে আবার টাকায় আট মণ চাউল সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য হইবে, তিনিই ঢাকার এই রুদ্ধ তোরণ দ্বার মুক্ত করিতে পারিবেন, অন্যথা এই দ্বার রুদ্ধই থাকিবে।" প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বঙ্গের মোগল রাজপ্রতিনিধি সরফরাজ খাঁ আবার এক টাকায় আট মণ চাউল দেখিয়া, স্বয়ং রুদ্ধ তোরণ দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষে অনবরত ভারতের যে লোক ক্ষয় হইতেছে, সে ক্ষয়ের কথা ভাবিলেও শরীরের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। কিছুদিন হইল, একজন পৃথিবীভ্রমণকারী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে নানা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার পরে এই পঞ্চাশ বৎসরে শুদ্ধ দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তিন কোটী ভারতবাসীর অকাল মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য উপায়েও সপ্রমাণ হইয়াছে, গত একশত বৎসরে দুর্ভিক্ষে ভারতের প্রায় তিন কোটী ষাটলক্ষেরও অধিক লোক মৃতু মুখে পতিত হইয়াছে। গত মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে এক মান্দ্রাজ প্রদেশেই অর্দ্ধ কোটীর অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে!

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের—অর্থাৎ ১১৭৬ সালের—মন্বন্তরে বঙ্গ উৎসন্ন গিয়াছিল! তখন একদিকে মুসলমান নবাবের পুরাতন আধিপত্য বিলুপ্ত, অন্যদিকে ইংরেজের নূতন আধিপত্যও গুপ্ত। কাজেই তখন সেই সুনীতি ও সুশাসনের অভাবের দিনে, দুর্ভিক্ষের সমুচিত প্রতিকার হইতে পারে নাই। কিন্তু তখনও বঙ্গের শস্য রপ্তানি যদি রহিত না হইত, তাহা হইলে দেশ সত্য সত্যই একেবারে জনশূন্য হইত। ইংরেজকর্ত্তারা যদি দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই অন্নরক্ষায় মন দিতে পারিতেন, যদি সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের অন্নও পশ্চিম বঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আনিতে পারিতেন, তাহা হইলে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সেরূপ প্রলয় ব্যাপার ঘটাইতে পারিত না। কেন যে পারিত না, তাহা ত পরে বঙ্গের ইংরেজ কর্ত্তারই দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজ লিখিত ইতিহাসে দেখিতেছি, বঙ্গের যেখানে যখনই অন্নকষ্টের সূচনা হইত, কর্ত্তারা সেইস্থলেই শস্য রপ্তানি রহিত করিয়া দিতেন। অতএব অন্নরক্ষা পূর্ব্বে চলিত, এখন চলে না।

একে আমরা দরিদ্র, তাহার উপর আমাদিগের শাসনব্যয় অত্যধিক, কাজেই সময়ে সময়ে আমাদিগের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। প্রচুর শস্য হয়, তাই এক প্রকারে বাঁচিয়া আছি, তাহা না হইলে গৃহে গৃহে নিত্যই হাহাকার শুনিতে হইত। ভারতের প্রজা বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষের দায়ে ঠেকিতেছে, ইহা কি শাসন প্রণালীর শ্লাঘার কথা? ট্যাক্স বসাইবার সময়ে যে প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাই ব্যয়ের সময়ে তাহার উল্লেখ দেখিনা। দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য ভাণ্ডার হইল, দুর্ভিক্ষের সময়ে ভাণ্ডারের টাকা আগেই উড়িয়া গেল, এ সকল শাসন

প্রণালীর চিরস্থায়ী কলঙ্ক। ঘর থাকিতে বাবুই ভিজিবে, শস্য সুলভ থাকিলেও ভারতে দুর্ভিক্ষ আসিবে, লোকে অন্নাভাবে মরিবে!

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে সাতবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। পরবর্ত্তী পঁচিশ বৎসরে ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে ন্যূনকল্পে ১৯ বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কালে-ভদ্রে দুর্ভিক্ষ হইত, কিন্তু দুর্ভিক্ষই এখন ভারতের অনেক প্রদেশের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুরাকালে গ্রীক বীর সেকেন্দার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অনুচরবর্গ ভারতবর্ষের অবস্থা দর্শনে এই দেশকে ধনধান্যে সৌভাগ্যশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গ্রীক পরিব্রাজক মেগেস্থিনিসও ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্যোন্নতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠান দিগ্বিজয়ীরাও ভারতবর্ষের ধনরত্নের বর্ণনা শুনিয়াই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভাস্কো-ডি-গামা প্রভৃতি পাশ্চাত্য নাবিকগণও ভারতের শিল্প সম্পদের কথা শুনিয়া ভারত-আবিষ্কারে প্রাণান্ত পণ করিয়াছিলেন। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ ভারতের ঐশ্বর্য্য কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভারতবর্ষকে ভূস্বর্গ বলিয়া মনে করিতেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ তখন ভূ-স্বর্গই ছিল। আর এখন ভারতবর্ষের যেরূপ দুরবস্থা ভারতে দিন দিন মৃত্যুর প্রভাব যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, তাহাতে দেখা যায় ভারতবাসীর জন্ম সংখ্যার অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে প্রতি বৎসরই কোন নির্দ্দিষ্ট হারে ভারতের লোক সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে কোন এক সময়ে ভারত বক্ষকে যে জনশূন্য করিবে না, এরূপ বলা যায় না। ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে সেই সময়ে হয়ত পৃথিবীর অন্য প্রদেশের লোক আসিয়া ভারতে বাস করিবে। কিন্তু তখন ভারতে বর্ত্তমান ভারতবাসীদের আর অস্তিত্বই থাকিবে না। একদিন ফরাসী পণ্ডিত মেল্‌থাস্ পাশ্চাত্য জগতের লোক বৃদ্ধির হার দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই হারে জনবৃদ্ধি হইলে কিছুদিন পরে ধরাবক্ষে লোকের সঙ্কুলান হইবে না।" আর আজ আমরা বলিতেছি, "এই হারে লোকক্ষয় হইলে কালে ভারতে আর ভারতবাসীর অস্তিত্ব থাকিবে না।"

শ্রীসুখরঞ্জন সেন গুপ্ত।

দিবস।

হে দিবা, জন্মিলে যবে, বিধাতার বরে,
সদ্যোজাত শিশু তোমা সহস্র সোহাগে,
বরষি আশীষ দিব্য দীপ্ত ঊষারাগে
দেখিলা বিমুগ্ধা সৃষ্টি ধরণীর কোরে!
বহিল প্রভাত-বায়ু সুগন্ধ-প্রচুর,
উচ্চারিল শত পাখী আনন্দের বাণী,
মুঞ্জরে পুলক-শ্যাম সৈকত-বনানী
হাসিল গগন হাসি অমল-মধুর!
ক্রমে যবে ছোটে তীব্র জীবনের ধারা
বাড়িল চঞ্চল মত্ত আকাঙ্ক্ষা অশেষ,
কত ভাঙি,' কত গড়ি, করি কাজ শেষ
ঘুমালে মরণ-তীরে; তখন যাহারা
তুলেছিল জন্মলগ্নে আনন্দ-উচ্ছ্বাস
মিশাইল, ধীরে-ধীরে, বিষাদ নিশ্বাস!

রাজ্যের কথা।

নরেন্দ্র গোস্বামী।—গত ৩১শে অগষ্ট প্রাতঃকালে, আলিপুর জেলে, বোমা প্রস্তুত অপরাধে অভিযুক্ত দুইজন আসামী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত রাজপক্ষীয় সাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ বিষম জ্বর হইতে সবে মাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, আর কানাইলাল তখনও ১০৪ ডিগ্রি জ্বরে শয্যাশায়ী। সেই রুগ্ন দুর্ব্বল দুই ব্যক্তি অসুর পরাক্রমে ইংরাজ প্রহরীদিগের চেষ্টা বিফল করিয়া গোস্বামীর কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে। এই ঘটনা উপন্যাস হইতেও অধিকতর রহস্যময়। ইংরাজের জেল—যেখানে বিনা অনুমতিতে একটী মক্ষিকারও প্রবেশ নিষেধ, সেখানে প্রহরীদিগের সতর্ক দৃষ্টি লঙ্ঘন করিয়া দুইটি পিস্তল যে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল—ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইংলিশম্যান, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্র সকল ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া এই কার্য্যকে পশুসম জঘন্য, কাপুরুষোচিত প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু পাওনিয়ার পত্রিকা এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে আমরা সত্যই আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়াছি। পাওনিয়ার যাহা বলিয়াছেন—তাহার সার মর্ম্ম এই—"নরেন্দ্র আত্মরক্ষার্থে তাহার সমস্ত সহচরদিগের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেশনে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে পাছে সে আরো অধিক ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়, সেই জন্যই তৎপূর্ব্বে তাহারা উহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিল। এস্থলে একের নিপাতে বহুলোকের উদ্ধার-সাধন। উহারা সহচরদিগের মঙ্গলার্থেই নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিয়া অকুতোভয়ে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। যদিও ইহা হত্যা, কিন্তু কখনই হীন, কাপুরুষোচিত কার্য্য নহে, আত্মত্যাগের গৌরবালোকে ইহা সমুজ্জ্বল।" পাওনিয়ারের এই মন্তব্যে ইংলিশম্যান, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি সংবাদপত্রগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলিশম্যান বলেন,—এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পাওনিয়ারের ক্ষণিক মতিভ্রম হইয়াছিল। ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন—এরূপ কথা দেশীয় কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে, নূতন আইন অনুসারে উহা সম্ভবতঃ দণ্ডপ্রাপ্ত হইত। ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে ইংরাজ ও বাঙ্গালী কোন বিষয়ে একইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে, একজনের কিছুই হয় না, অন্যের দ্বীপান্তর হইতে পারে! আর ইহা ইংরাজ মনে মনে বেশই বোঝেন! অমৃতবাজার পত্রিকা ইহাকেই 'মাকড় ধোকড়' নীতি কহেন।

নরেন্দ্র তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু এ সংসার বড় কঠোর স্থান। তাহার কর্ম্মফলে আজ তাহার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রদিগের কষ্টের শেষ নাই। ইঁহাদিগের জন্য আমরা আন্তরিক সন্তপ্ত।

আলিপুর সেসন কোর্টে কানাইলাল দোষ স্বীকার করিয়াছে। তাহার ফাঁশির হুকুম হইল। সত্যেন্দ্র দোষ স্বীকার করে নাই—এবং জুরিদিগের মধ্যেও মতভেদ হওয়াতে বিচারক সত্যেন্দ্রকে হাইকোর্টে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বারীন্দ্রের বিচার।—বারীন্দ্রকুমার এবং অপর ত্রিশজন আসামী আলিপুর সেশনে সোপর্দ্দ হইয়াছে। এই বোমাবিভ্রাটের অপরাধ ব্যতীত, মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের সহায়ক বলিয়া বারীন্দ্রকে আর একটি অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে জন্ম বলিয়া নিজে সঙ্গীবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে হাইকোর্টের বিচার গ্রহণেও ইনি অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। বারীন্দ্র-প্রমুখ দলের এই মত, "ভারতবাসী বলিয়া যাহাতে আমার অধিকার তাহাই আমার প্রাপ্য। কেবল দৈববশতঃ ইংলণ্ডে জন্ম বলিয়া তাহার দোহাই দিয়া বিদেশী বিচার স্বপ্রাপ্য রূপে গ্রহণ করা হীন কাজ, তাহাতে নিজেকে ভারতবর্ষীয় বলিয়াই অস্বীকার করা হয়।" আত্মরক্ষার জন্যও বারীন্দ্র তাঁহার দেশভক্তি ও মতবিশ্বাস জলাঞ্জলি দিলেন না। ইহাতে তাঁহার কতদূর নিঃস্বার্থ মহত্ব প্রকাশিত হইতেছে। হায়! এইরূপ দেশভক্ত বীর কিনা ভ্রান্ত ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দেশের মঙ্গল উদ্দেশ্যে দেশের অমঙ্গলই সাধিত করিলেন! বিধাতা যে হতভাগ্য ভারতের প্রতি বিমুখ—ইহা হইতে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরে অশান্তি।—মেদিনীপুরে পুলিশের অসংযম দিন দিন অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাকে তাহাকে বিনা সন্তোষজনক কারণে কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুলিস বন্দী করিতেছে। এমন কি, কতক লোককে মাসাধিক কাল কারারুদ্ধ রাখিয়াও তাহাদিগের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রমাণ দেখাইতে না পারায়, তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের বাক্য বাইবেল তুল্য জ্ঞানে কার্য্য করিতেছেন। নাড়াজোলের রাজা পর্য্যন্ত এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত। সংবাদপত্রে প্রচার, জেলের কর্ত্তৃপক্ষ রাজার ব্যারিষ্টারকে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেন নাই, তাঁহার গৃহ হইতে খাদ্যাদি পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে পৌঁছে না। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কি অপরাধে যে, রাজা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করা হইয়াছে তাহা এখনো অপ্রকাশিত। তবে গুজব এইরূপ যে, উহারা মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রমুখ সমগ্র ইয়োরোপীয়দিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইহাত উন্মাদের প্রলাপবচন বলিয়া মনে হয়। সন্তোষ দাস ও সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহাদের দোষ-স্বীকারোক্তিতে নাকি এইরূপ বলিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারাই আবার বলিতেছে যে পুলিশের প্রলোভনে ও পীড়নে বাধ্য হইয়া তাহারা এইরূপ মিথ্যা বলিয়াছিল। কিন্তু নাড়াজোলের রাজপক্ষ এই উক্তির নকল চাহিয়া পর্য্যন্ত পান নাই। আবার শুনা যাইতেছে—গোষ্ঠবিহারী নামক একজন রাজসাক্ষীরূপে দাঁড়াইতেছে। যাহা হউক পুলিশের অত্যাচারে মেদিনীপুর জর্জ্জরিত।

মিষ্টার দত্তের পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর।—মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান মিঃ কে, বি, দত্ত মেদিনীপুরের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ছোটলাটকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। মিঃ দত্ত বলেন,—"মেদিনীপুরের জনসাধারণের অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। যদিও পুলীশের কোন অনুসন্ধানে বাধা দেওয়া আমাদের ইচ্ছা নহে; তথাপি ইহাও বিশেষরূপে অবগত হইয়া আমরা গভর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি যে, যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতার প্রমাণ প্রয়োগ করা হইতেছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহারা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ। আমরা এ সম্বন্ধে মিঃ ব্রাডলী বার্টকে জানাইয়াছিলাম। আমরা ছোটলাটের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি কৃপা করিয়া এ বিষয়ের তদন্তের ভার, প্রাদেশিক কমিশনার কিম্বা, মিঃ ব্রাডলী বার্ট, অথবা মিঃ ডুবালের উপর অর্পণ করুন। আমরা ইহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে মেদিনীপুর রাজভক্তিহীন নহে। তবে দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে।" ইহার উত্তরে ছোটলাটের চীফ সেক্রেটারি মিঃ ডিউক বলিয়াছেন,—

"যে যদিও আপনি পুলীশের অনুসন্ধান কর্ম্মে ব্যাঘাত করিতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি আপনার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে গেলেই ফলে অনুসন্ধান কার্য্যটা বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ পুলিশ তদারকের ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে গেলেই পুলিশ তদারক স্থগিত রাখিতে হইবে। এ স্থলে পুলিশ অনুসন্ধানের কার্য্য কিরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহার তদন্ত করিবার আদেশ প্রদান করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব। আমরা পুলীশ কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছি যে খুব সতর্কতার সহিত যেন তদারক করা হয়, এই সম্বন্ধে সাবধানতার অভাব দেখিলেই শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু কোন কারণেই তাহাদের অনুসন্ধান কার্য্য কাহারও বিশেষ তত্ত্বাবধারণের অধীনে রাখিতে পারি না। দেশে শান্তিস্থাপন এবং অপরাধের অনুসন্ধান ও তাহার নিবারণ করাই গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য। আমি ইহাও বলি যে, যদি আপনি স্পষ্ট করিয়া লেখেন যে কাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ প্রয়োগ হইতেছে, এবং সে কিরূপ প্রমাণ, ও তাহা কাহারা করিতেছে, তাহা জানিলে প্রতিকার সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে, বিবেচনা করিতে পারি। আপনি এবং আপনার বন্ধুরা কোন রূপ সম্বাদ পুলিশকে প্রদান করিয়া অনায়াসে তাহাদের সাহায্য করিতে পারেন। এবং ইহাও আপনার ন্যায় রাজভক্তের নিকট অধিক কিছু নহে।"

এই পত্রের উত্তরে, মিঃ দত্ত দ্বিতীয় দলের আসামীরা পুলীসের অত্যাচারে, প্রলোভনে, ভয় প্রদর্শনে কিরূপ ভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছে; এবং এই সকল কাহিনী প্রকাশ করিয়া তাহারা যে এজেহার দিয়াছে, সেই

সমস্তের যথাযথ বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন "যে এই সব গুরুতর বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া আমি আপনাদিগকেই বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি, যে, এই সব বিষয় প্রকাশ হওয়াতে পুলীশ কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের উপর সন্দেহ হয় কি না? দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব এবং অস্বাচ্ছন্দ্য আমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা রাজভক্ত বলিয়া খ্যাত তাঁহারা যে রাজদ্রোহী বলিয়া, অথবা সন্দেহের কারণ হইবেন, তাহা দেখিয়া কখনই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা যায় না। আমি ইহাও বলি যে উক্ত এজেহারে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে কাহারা উক্ত ব্যাপারে জড়িত, এবং কাহারা নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণকে জড়িত করিবার জন্য মিথ্যা প্রমাণ প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছে। মিঃ দত্ত এই স্থানে কতকগুলি ভদ্রলোকের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইঁহারাই তাঁহাকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলেন "আমি প্রাদেশিক কমিশনারকে বিশেষ ভাবে বলিয়াছি যে, এই সকল ষড়যন্ত্র খুব কঠিন রূপে নিষ্পেষিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মেদিনীপুরের সমস্ত ভদ্র সম্প্রদায় যে ইয়ুরোপীয়দিগের হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে ইহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। কিম্বা অনুসন্ধানে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাই নাই।" এই পত্রের কোন উত্তর আজও পর্য্যন্ত আসে নাই। কিন্তু চুঁচুড়া হইতে যে সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ মেদিনীপুরে আমদানী হইয়াছিল তাহাদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে।

পুলীস কীর্ত্তি। এদেশের পুলিস এদেশেরই লোক। অথচ তাহারা কিরূপ নির্দ্দয় ভাবে স্বদেশীদিগকে নিপীড়িত করিতেছে তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। খুলনার একটী ৭ বৎসরের বালকের বিরুদ্ধে পুলীশ অস্ত্র আইন ঘটিত একটী মোকদ্দমা করিয়াছিল। বালক নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর বাড়ীতে একখানি ভাঙ্গা তরোয়াল পাইয়া তাহা রাখিয়া দেয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় এই মোকদ্দমায় বালককে মুক্তি দিয়াছেন।

একজন লোকের পিতা রাজদ্বারে অভিযুক্ত পুত্রকে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত অবস্থায় গৃহে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া পুলিস তাহাকে নিগৃহীত করিয়া আদালতে হাজির করে। কিন্তু এস্থলেও বিচারপতি মহাশয় পিতাকে অপরাধী মনে না করিয়া মুক্তি দিয়াছেন। এইরূপ দুএকটি ঘটনা নহে, ক্রমাগত আমরা পুলিসের এইরূপ নিষ্ঠুর 'ক্ষমতা-প্রকাশের কথা শুনিতে পাইতেছি। ক্ষমতা প্রকাশের একটি মোহ আছে স্বীকার করি, কিন্তু শাস্তির ভয় থাকিলে এইরূপ মোহ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ দানবোচিত কার্য্য তাহারা ক্রমাগত করে কেন? আসল কথা এইরূপেই তাহারা গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইবে বলিয়া আশা করে। সুতরাং এরূপ স্থলে তাহাদিগকে গোপনে ডাকিয়া সাবধান হইতে বলাই যথেষ্ট নহে—প্রকাশ্যভাবে পুলিশের মূঢ়তার সংশোধন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি বলিয়া দেন যে এই পাশবনীতি, তাঁহাদের অনুমোদিত নহে তবেই তাহাদের বিকারগ্রস্ত প্রকৃতির সংশোধন হইতে পারে। এবং লোকের গভর্ণমেণ্টের ন্যায়পরতার প্রতি বিশ্বাস জন্মে ও রাজভক্তি বর্দ্ধিত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা। সেদিন কাকিনাড়া বোমা ব্যাপারে পুলীশ ভট্টপল্লীর নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অন্যায় সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়া সমস্ত বঙ্গবাসীর মনে যে অত্যাচার, অবিচার-ব্যথা জাগ্রত করিয়াছে সেই ক্ষতবেদনা প্রশমনের চেষ্টা করা দূরে থাক, গভর্ণমেণ্ট তাহাতে আরও লবণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল গোস্বামী মহোদয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে যে পুলীশ অকারণে নিগ্রহ করিয়াছে তাহার কারণ কি? এবং কি কথায় ও কাহার সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে মিঃ ষ্ট্রীটফিল্ড উত্তর দিয়াছেন যে "সম্ভ্রান্ত অনেক ব্যক্তিকেই এ অপরাধে জড়িত দেখা যাইতেছে তবে কেবল মাত্র "সম্ভ্রান্ত" এই অছিলায় কেহ কখনই সন্দেহের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন না। সংকল্প সিদ্ধ করিতে হইলে সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করা উচিত, সুতরাং এরূপ স্থলে দু'একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তির কিছু কষ্ট ভোগ হইতে পারে কিন্তু তাহা নিবারণের কোন উপায় নাই। ইহাদিগকে কি কারণে কাহার কথায় কয়েদ করা হইয়াছিল তাহা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতে বাধ্য নহেন।' এইরূপ উত্তর নিতান্ত অসঙ্গত। সম্ভ্রান্ত লোক হইলেই যে সে দোষী হইবে না

এরূপ কথা কেহই বলে নাই। কিন্তু কোন রকম সংবাদ পাইলেই বিনা অনুসন্ধানে এবং কোনরূপ প্রমাণ পাইবার পূর্ব্বে যে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত নয় শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় তাহাই মাত্র বলিয়াছেন। যে যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে সেইরূপ বিশেষ প্রমাণ না পাইলে তাহাকে কারারুদ্ধ করা উচিত নয়। আর তাহার পর যখন দেখা যায় যে সন্দেহ-ভুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষ তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই তখন সংবাদদাতারই শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ শাস্তি না হইলে এরূপ মিথ্যা অপবাদের সীমা থাকে না—আর তাহাই হইতেছে। আমরা বলি অন্তত পক্ষে তাহাদিগের এই অকারণ লাঞ্ছনার জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ক্ষতি পূরণ হওয়া উচিত। সুইডেন, নরওয়ে দেশে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কেহ অকারণে গ্রেপ্তার হইলে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে এই অত্যাচারের দিনে বৃথা সন্দেহে অভিযুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইলে গভর্ণমেণ্টের অন্তত পক্ষে সেইরূপ করা উচিত।

বৃথা সন্দেহে গ্রেপ্তার হইবার পর পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন তাঁহার টোলের জন্য যে ৫০ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেন তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মমর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু অন্যপক্ষে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকাগুলি প্রজা সাধারণেরই টাকা, উক্ত ৫০ টাকা রাজকোষে জমা থাকা অপেক্ষা তাঁহার টোলের জন্য ব্যয় হইলে উহার সদ্গতি হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাশীর রাজ ভক্তি প্রদর্শিনী সভা। আজকাল চারিদিকে রাজভক্তি প্রদর্শনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি যেখানে সেখানে সভাসমিতি করিয়া এরূপ রাজভক্তি প্রকাশের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে? নহিলে কি যথার্থ রাজভক্তদিগকেও কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করিবেন? আমাদের ত মনে হয়—এইরূপ বাড়াবাড়িতেই বরঞ্চ গভর্ণমেণ্ট মনে করিতে পারে "You protest too much my son". যাহা হউক এই দুর্দ্দিনে কাহারো ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবার অবসর নাই, এ সময়ে তৃণ গাছটীকেও আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ অবলম্বনের ইচ্ছা স্বাভাবিক। সেইজন্য যদি সভা করিয়া রাজভক্তি দেখাইতেই হয় তবে কাশীর মহারাজার পদানুসরণ করা কর্ত্তব্য।—গত ২রা সেপ্টেম্বরে কাশীর মহারাজার নেতৃত্বে যে রাজ ভক্তি প্রদর্শনী সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে একদিকে আইনভঙ্গকারীদিগের কার্য্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছে, অন্যদিকে যে সকল ইংরাজি এবং দেশীয় পত্র পরস্পরের মধ্যে জাতীয় বিদ্বেষ ভাব জাগ্রত করিতেছেন তাহাদিগকেও নিন্দা করা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের দেশবাসীদিগকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা উচিত ইহাও বলা হইয়াছে।

উদার-হৃদয় হিগেনবটম্। কুষ্টিয়ার গুলি মারার মামলার অভিযুক্ত আসামীগণ যে মুক্তিলাভ করিয়াছে ইহাতে সকলেই আনন্দিত। এই ঘটনার পাদ্রি হিগেনবটম্ যেরূপ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন আসামীগণ এরূপ কার্য্য করে নাই। পাদ্রি হিগেনবটমের এই মহত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম যাজকেরই অনুরূপ,—কিন্তু আজকালকার এই জাতিগত বিদ্বেষের দিনে তাঁহার স্বতঃ উৎসারিত, এই ন্যায়াচরণও অসাধারণ করুণা-রূপে দেখা দিয়াছে। ধর্ম্ম-শিক্ষা-দান পাদ্রিগণের উদ্দেশ্য হইলেও, ইহাঁরা যথার্থই বাঙ্গালীকে ভাল বাসেন। এই সকল উদার হৃদয় পাদ্রিগণের নিকট বাঙ্গলাদেশ যে কত উপকৃত তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া উঠে।

ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় এই মামলা নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত করিয়া সাধারণের নিকট যশস্বী হইয়াছেন।

রাজধর্ম্ম।—ডেভিড নামক এক ব্যক্তি একজন পাথাটানা কুলীকে পদাঘাত করে। তাহার ফলে কুলীর মৃত্যু ঘটে। দিল্লির ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিডের একমাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট সে বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া লাহোর চিফ্ কোর্টে ঐ মোকর্দ্দমার পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করিয়াছেন। দুর্ব্বলের রক্ষাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম। পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবিকই আদর্শ-স্থানীয়।

ইংরাজ ও বাঙ্গালী।—সম্প্রতি "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামক একখানি ইংরাজি-সংবাদ পত্রে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর প্রভেদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন যে স্বাধীনতা ব্রিটনবাসীর জীবনের সার ভাগ। স্বাধীনতায় তাহার জন্ম; এবং প্রত্যেক দিন বায়ুর ন্যায় সে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। স্বাধীনতা বর্জ্জিত হইলে তাহার জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ভাঙিয়া যাইবে। এমন কি স্বাধীনতা বিহনে ভগ্নপ্রাণে তাহার মৃত্যু হইবে। এই সম্বন্ধে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে ঘোরতর প্রভেদ বিদ্যমান। বাঙ্গালী বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল বহন করিতেছে এবং এখানকার শাসন প্রণালী কেবল যে ব্রিটন হইতে প্রভেদ এমন নয়—সম্পূর্ণ ভিন্ননীতি ভুক্ত। এরূপ স্থলে একজন ব্রিটনবাসীর স্বাধীনতার দাবী অস্বীকার করা যায় না বলিয়া, বাঙ্গালীর স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। বাঙ্গালীকে তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা সম্ভোগের জন্য কিছুমাত্র সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে এই মাত্র। কিন্তু যে অধিকার বহু শতাব্দীর অধীনতা-বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ভোগের জন্য কিম্বা তাহা প্রদানের জন্যও কোন সন্তোষজনক কারণ দেখি না।

ইংলণ্ডের একজন কবি বলিয়াছেন যে, কোন কৃতদাসও ইংলণ্ডের মাটীতে পদার্পণ করিলে তাহার পদশৃঙ্খল আপনা হইতেই খসিয়া যায়। এদেশে আসিয়া ইংরাজদিগের স্বাভাবিক সেই বিশ্বজনীন স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাবও কিরূপ কলুষিত হইয়া পড়ে, এই উক্তিই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ!

তিলক প্রসঙ্গ।—বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে তিলক মহোদয়ের জন্য আবেদন করিবার মানসে শ্রীযুক্ত খাপার্দ্দে বিলাত গমন করিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্ট, তিলককে বিলাতে আপীল করিতে অনুমতি দিলেন না। পঞ্জাবের সেই সর্ব্বজনপ্রিয় সর্দ্দার অজিতসিংহ তাঁহার গুরু মহামতি তিলকের স্মরণার্থ বারাণসী ধামে অথবা হরিদ্বারে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। আশ্রমের নাম তিলকাশ্রম হইবে। অজিতের গুরুভক্তি প্রশংসনীয়। তিলকের নির্ব্বাসন দণ্ডের পর সর্দ্দার সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তিলকাশ্রমে শিক্ষার্থীদিগকে দেশভক্তি, রাজনীতি, বাগ্মিতা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সর্দ্দারের জয় কামনা করি।

ইংলণ্ডে ভারতকাহিনীর নিবেদন।—সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "আমি সমগ্র পৃথিবীকে জানাইতে চাই যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহার লক্ষ্য এবং সাধনার ক্ষেত্র বহু-বিস্তৃত। এই ভাব সমগ্র জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে এবং ইহা কঠোর শাসনে কখনই নিষ্পেষিত হইবার নহে। তাহাতে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এরূপ স্থলে তাঁহারা কোন পথ অবলম্বন করিবেন? অশান্তি বিপ্লবের আহ্বান করিবেন কিম্বা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন? অবশ্য ইহাও আমি জানি যে তাঁহারা আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু তা বলিয়া আমরা কেন সত্য, সমাজ এবং আমাদের বংশধরগণের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব না? আমি ইংরাজ জনসাধারণ এবং ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞ মনীষীগণের নিকট বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিব। আমরা তাঁহাদের দয়ার ভিখারী নহি। কিম্বা কোনরূপ সুবিচারের প্রার্থী নহি। কেবল তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।"

পঞ্জাব হইতে লালা হরকিষণ লাল, লালা লাজপত রায়, এবং পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ও উক্ত উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। দত্ত চৌধুরী মহাশয় যাইবার পূর্ব্বে বোম্বে সহরে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে তিনি সম্রাট সমীপে ভারতের দুঃখ-কাহিনী নিবেদন করিবেন। কিন্তু আজ কাল ত আর সেদিন নাই যে রাজারা স্বকর্ণে প্রজার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া তাহার প্রতিকার, ব্যতিকার ব্যবস্থা করিবেন। আজকাল সমস্ত কার্য্য বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা সাধিত হয়। আমাদের বোধ হয় চৌধুরী মহাশয় বৃটিস পার্লামেণ্টকেই সম্রাটরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইলেই সাধারণের মঙ্গল।

সুব্রহ্মণ্য আয়ারের মুক্তি। মান্দ্রাজের। সুব্রহ্মণ্য আয়ার ভারতবর্ষের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি। কংগ্রেসের সহিত ইনি বিশিষ্টরূপে জড়িত। এমন কি এক সময়ে ইঁহাকে কন্‌গ্রেসের সভাপতির পদে বরণ করিবারও প্রস্তাব হইয়াছিল। এই সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় অকস্মাৎ তাঁহার স্বদেশমিত্র পত্রে রাজদ্রোহ প্রচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। ইনি বৃদ্ধ এবং বিষম ব্যাধিগ্রস্ত। ইহা সত্ত্বেও হাইকোর্ট তাহাকে জামিনে মুক্তি দেন নাই।

আয়ার মহোদয় বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রচার করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিলনা। তিনি ইহার পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য কখনই করেন নাই বা ভবিষ্যতে কখনও করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করিবার মানসে তিনি উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তুত আছেন। কোনরূপ জাতিগত বিদ্বেষ তিনি কখনও কোন প্রবন্ধে বা বক্তৃতার প্রচার করেন নাই।

এই স্বীকারোক্তি করাতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা রক্ষার দায়িত্বে ২৫০০ টাকার হিসাবে দুইটি জামিন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

স্বদেশী-ব্রতোৎসব। ৭ই আগষ্ট তারিখের কথা স্মরণ করিলে স্মৃতিপটে অতীতের অনেক কাহিনী জাগিয়া উঠে। ১৯০৫ সালের সেই প্রথম অধিবেশনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ—তারপর হইতে কত অত্যাচার কত উৎপীড়ন কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া এই প্রতিজ্ঞা আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে! শুধু কলিকাতায় নহে, সেদিন বঙ্গের সর্ব্বত্রই এই উৎসব হইয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ যাহাকে এত আদরে গ্রহণ ও সম্মানে ভূষিত করিয়াছে তাহা যে অমর অক্ষয় ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এদিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের কল বন্ধ হওয়াতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জীবিকার কোন সংস্থান করিতে না পারিয়া খুব হাঙ্গামা করিয়াছে। পুলিশ আনাইয়া তবে তাহাদিগকে শান্ত করিতে হয়। অবশ্য আমাদের বিলাতি বর্জ্জনই ইহার একমাত্র কারণ নহে, তবে কতকটা কারণ তাহার সন্দেহ নাই।

সরলা দেবীর বক্তৃতা। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের স্ত্রী সমাজের অধিবেশনে আর্য্যসমাজ হলে শ্রীমতী সরলা দেবী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুইশত হিন্দু মহিলা ও তিনজন পার্শীমহিলা তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন "যে তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দি ভিন্ন অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন—এবং তাহাও তাঁহার মাতৃভাষা নহে। তাঁহার মতে, বোম্বাই প্রকৃত পক্ষে একটি সুন্দর নগর এবং সকল প্রকার কর্ম্মের উপযুক্ত স্থান। এবং বোম্বাইয়ের মহিলারা উত্তর ভারতের নারী-সমাজ হইতে অধিকতর উন্নত। কারণ তথায় পর্দ্দাবিহীন নারী একটিও প্রায় দেখা যায় না—কিন্তু এখানে পথে ঘাটে মহিলার মেলা। সর্ব্বত্রই রমণীরা পুষ্পমাল্যে দেশনায়কগণকে সম্বর্দ্ধনা করেন, কিন্তু এখানকার মহিলারা মুক্তামাল্যে দাদাভাই নরোজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক বালিকাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেকে যে লীলাবতী অথবা গার্গী হইবে এমন কোন কথা নাই; আজ কাল বিবাহের সময় বরকন্যার জন্মপত্রিকা দেখা অপেক্ষা তাহাদের শিক্ষাসম্বন্ধে দৃষ্টিপাত করা অধিকতর প্রয়োজন। ভারতের নারী মাত্রেই পতিপরায়ণা। শিক্ষা পাইলে তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দান করিতে পারেন। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নেতারা স্থির জানিবেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরা একযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে না পারিবেন ততদিন পর্য্যন্ত সাফল্যের কোন আশা নাই। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকমাত্রেই দেবী এবং সেই দেবীত্বের বিকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি একটি কবি-বচন উদ্ধৃত করেন।

তব ধর্ম্ম সেবা আর সুপ্তের রক্ষণ,
তব ধর্ম্ম অভিশপ্তে শান্তি বরিষণ;
তব ধর্ম্ম লাঞ্ছিতেরে স্নেহ সুধাদান;
তব ধর্ম্ম দেখাইবে কোথা ভগবান।

বর্ষায় সূর্য্যাস্ত।—মিঃ হ্যাভেল ভারতবর্ষের চিত্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যগণের কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা আমরা গতমাসের ভারতীতে বলিয়াছি। সম্প্রতি সিমলা পাহাড়ের চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার অঙ্কিত 'বর্ষায় সূর্য্যাস্ত' চিত্রে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশের নহে, সমগ্র ভারতের ইঁহারা মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

দুর্গাচরণ সান্যালের জন্য আবেদন।—কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহোদয়ের জন্য ছোট লাটের নিকট আবেদন করিতেছেন; আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয়ের প্রতি যে কতদূর অবিচার করা হইয়াছে ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা আশা করি ছোট লাট বাহাদুর দুর্গাচরণের প্রতি সুবিচার করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

চয়ন।

'মডার্ণ রিভিউ পত্র'। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার উক্ত পত্রে মোগল সম্রাটগণের প্রাত্যহিক জীবনী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

দিল্লি আগ্রার সেই হর্ম্ম্যরাজি—সেই স্বপ্নালোকে উদ্ভাসিত মোগল রাজপ্রাসাদ দেখিবার নিমিত্ত সুদূরের অদূরের বহু যাত্রী প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। তাহার সৌন্দর্য্য তাহার মাধুর্য্য দেখিয়া কত কবি, কত চিত্রকর, কত পরিব্রাজক, কত সঙ্গীতে, কত চিত্রে, কত ভাষায় যে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সাধারণ ভ্রমণকারীর চক্ষে এ সকল প্রস্তর স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি কি একবারও ভাবেন যে এই সকল নীরব প্রাণহীন প্রস্তর স্তূপে—কত বিচিত্র বিলাসের ভোগ রেখা—কত অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি চিহ্ন—কত জীবনের সঙ্গীত—কত মরণের বিরাট স্তব্ধতা—জড়িত হইয়া আছে! আজও অনেক পাশ্চাত্যবাসী মনে করেন, প্রাচ্য নরপতিরা হৃদয়হীন, মিথ্যা অহঙ্কারে পূর্ণ, এবং চাটুকারে পরিবেষ্টিত! তাহারা সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে নারীগণের সহিত আমোদে রত! এবং সাধারণতঃ ইংরাজি উপন্যাস সমূহে মণি-খচিত পাগড়ী, কুঞ্চিতশ্মশ্রুগুম্ফ, রক্তবর্ণ চক্ষু, কটিদেশে ক্ষুদ্র অস্ত্র বাঁধা, রাজা বা সুলতান চিত্রই আমাদের নয়ন গোচর হয়। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই এই কথার অসত্যতা সপ্রমাণ হইবে। আকবর হইতে আরঙ্গজীব পর্য্যন্ত চারিজন সম্রাট অখণ্ড প্রতাপে দেড়শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে রাজত্ব সম্প্রসারিত পূর্ণতম শান্তি, এবং সকল রূপ উন্নতির স্রোত প্রবাহিত ছিল। এই সকল কার্য্য কি কখন অমনোযোগে সাধিত হইতে পারে? পারসিক ঐতিহাসিকেরা সম্রাটগণের দৈনিক কর্ম্মের তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সম্রাট সাজাহান তাঁহার সাধের আগ্রার প্রাসাদে কি ভাবে দিন যাপন করিতেন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

দৈনিক কর্ম্মের তালিকা।

সকালে।	বিকালে।
৪ ঘটিকায় শয্যাত্যাগ—নমাজ—পুস্তক পাঠ।	৪ সাধারণকে দর্শন—বৈকালিক নমাজ।
৬—৪৪ মিঃ, হস্তিযুদ্ধ,—সৈন্যক্রীড়া সাধারণকে দর্শন!	৬—৩০ দেওয়ানীখাসে সান্ধ্য অধিবেশন।
৭—৪০ দেওয়ানী আম (প্রকাশ্য দরবার)	৮ সাবুরুজে গুপ্ত মন্ত্রণা।
৯—৪০ দেওয়ানী খাস (গোপন দরবার)	৮—৩০ অন্তঃপুরে নৃত্য গীত।
১১—৩০ সাবুরুজে গুপ্ত পরামর্শ।	১০—পুস্তক পাঠ শ্রবণ।
১২ অন্তঃপুরে বিশ্রাম,আহার,অনাথা নারীগণকে ভিক্ষাদান,	১১—৩০ হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত—নিদ্রা!

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি কোরানের শ্লোক সকল আবৃত্তি করিতেন, পরে প্রজাগণকে একটি গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়া দর্শন দিতেন। সেই গবাক্ষের নাম "ঝরকা-ই-দর্শন"। প্রজারা—নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট আসিতে পারিত। সেই গবাক্ষ হইতে একটী সূত্র নিম্নে ফেলা থাকিত। কাহারও কোন আবেদন তাহাতে বাঁধিয়া দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্রাট সমীপে উপনীত হইত। আকবর এই প্রথার প্রবর্ত্তক। তারপরে সম্রাট দরবারে বসিয়া নিয়োগ, নির্ব্বাচন, রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। দেওয়ানীখাসে সম্রাট নিজহস্তে গোপনীয় পত্র সমূহ লিখিতেন। ঐ সকল পত্র মোহরাঙ্কিত করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রেরিত হইত। কারণ সাম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল সম্রাটের শীল রক্ষা করিতেন। সাবুরুজে যে সকল অতি গোপনীয় কার্য্য হইত তাহা রাজকুমারেরা ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীগণ ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারিত না। অন্তঃপুরে সম্রাট ধন বিতরণ করিতেন। ভিখারী, দরিদ্রবিধবা, সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের বিধবা ও বালিকাদিগকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়া তাহাদের দৈন্য মোচন করিতেন। বৈকালে সভায় উৎকৃষ্ট গায়কের গান শ্রবণ করিতেন। রাত্রে অন্তঃপুরে নর্ত্তকীদের নৃত্য গীত হইয়া গেলে পুস্তক পাঠ শ্রবণ করিতেন। তৈমুরের জীবনী, এবং বাবরের আত্মজীবনী তাঁহার প্রিয়পাঠ ছিল। শুক্রবার নমাজের দিন বলিয়া কোন কার্য্য হইতনা। বুধবার দিন সম্রাট "দেওয়ানি খাসে" বসিয়া বিচার করিতেন। সেদিন কেবল বাদী প্রতিবাদী ও তাহাদের উকীলেরা ভিন্ন অন্য কেহ তথায় যাইতে পারিত না। সাম্রাজ্যের বহুদূর হইতে অনেকে—নালিস করিতে আসিত। এবং সম্রাট তত্রস্থ শাসন কর্ত্তাদের তাহাদের কথা লিখিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে সম্রাটেরা দিন যাপন করিতেন। কখন কখন সম্রাট মহা সমারোহে রাজ্য পরিদর্শনে যাইতেন। মোগল সাম্রাজ্য কেবল পুষ্পশয্যা ছিলনা তাহার মধ্যে কঠোর দায়ীত্বও ছিল। লণ্ডন নগরস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে একখানি পারস্য ভাষায় লিখিত প্রাচীন হস্তলিপি আছে। তাহাতে সম্রাট সাজাহানের কর্ম্মের বিবরণ, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিত আছে।

"ফুল্লমনে প্রজাবৃন্দ করে বিচরণ, তব রাজ্যে অত্যাচার নিদ্রায় মগন
তুমি যে তুলিয়া নে'ছ তাহাদের ভার; সতত জাগ্রত হেরি নয়ন তোমার।

নিঃসন্দেহ ইহা যোগ্য জনের প্রতি যোগ্য কবিতা! কিন্তু হায় এখন আর সে দিন নাই! রাজা প্রজার সেইরূপ নিবিড় সহানুভূতি এখনকার দিনে দুর্লভ!

"লা রিভিউ পত্র।" মিঃ আলেক্‌জেণ্ডার উলার সম্প্রতি উক্ত পত্রে "ইংলণ্ড ভারত রক্ষার্থে সক্ষম কিনা" এই প্রশ্নে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন "যে বর্ত্তমান অশান্তি প্রাচীন মোগল সাম্রাজ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বঙ্গদেশ হইতে বিলাতি পণ্য বিদূরিত, এবং হিন্দুরা তাহাদের পাশ্চাত্য প্রভুদের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের আশায় রুসিয়ার বিপ্লবকারীগণের মত বোমার সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে? ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কয়েক সহস্র সিবিল এবং মিলিটারী কর্ম্মচারী তাহাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মে, তাহাদিগের জাতিগত, ধর্ম্মগত, সামাজিক, এবং নৈতিক নীতিতে অধীনস্থ পঁচিশ কোটী জনসঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র ক্ষমতা প্রয়োগে তাহাদিগকে শাসন করিতে চাহিত, কিন্তু তাহাদিগের সেই ক্ষমতা সার্ব্বজনিক বিদ্রোহের দিনে যে কতদূর ফলপ্রসূ তাহা একবারও চিন্তা করে নাই। লেখক বলেন যে ইংরাজেরা আজও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আমলের ন্যায় ভারতবর্ষকে সর্ব্ব বিষয়ে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এবং ইংরাজেরা আজও যে ভারত সাম্রাজ্য স্বকরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন—ইহাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চায্য! 'বহুদিন হইতে ইংরাজদের ধারণা ছিল যে কোন প্রবল বৈদেশিক আক্রমণ ভিন্ন তাহাদিগের ভারত হারাইবার অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে এখন দেখা যাইতেছে যে, আতঙ্ক বিদূরিত হইলেও ভারতের আভ্যন্তরিক বিপ্লবেই—ইংরাজকে ভারত হারাইতে হইবে। লেখকের মতে ভারত রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে শান্ত করিতেই হইবে। এবং নিশ্চয়ই এমন সময় আসিবে যখন অধীনস্থ জাতির সর্ব্ব প্রকার অধিকারে মনঃ সংযোগ করা ভিন্ন ভারত রক্ষার অন্য কোন উপায় রহিবেনা।—

কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ পত্র। মিঃ ক্যানন হেন্‌রী ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নবভাব দর্শনে উন্মত্তপ্রায় ইংরাজ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া একটি সৎপরামর্শ দান করিয়াছেন।

"বর্ত্তমান ইংলণ্ডকে তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ক্ষমতার সহিত বোঝাপড়া করিতে হইতেছে। এবং উক্ত ক্ষমতা তাহারই অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইংলণ্ড তাহার প্রজাবৃন্দের মানসিক বৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছে এবং এখন তাহারা সেই নবীন ক্ষমতা পরিচালনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং সুবিধা অন্বেষণ করিতেছে দেখিয়া বিস্ময়মগ্ন! তাহাদিগকে সকল কার্য্যের উপযোগী বুদ্ধি এবং শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু এখন তদনুরূপ কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিলে চলিবে কেন? তাহাদিগের অতীত গৌরবের কাহিনী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং কি প্রকার আন্দোলনের পর ইংলণ্ড তাহার সম্মান গৌরব লাভ করিয়াছে তাহাও তাহারা বেশ বুঝিয়াছে; এবং সেই সঙ্গে নবীন আশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের অনুগ্রহেই ভারতে সর্ব্বপ্রকার উচ্চ আশা জাগিয়াছে। এই-রূপে ইংলণ্ডের করুণায় ভারতবর্ষের জাতীয়ভাব আগ্নেয় গিরির তুল্য ক্ষমতাশালী, এবং আবেগপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য রাজ্য পাশ্চাত্য না হইলেও তাহাদের নিজস্ব ভাবনকল ইউরোপেরই আদর্শের তুল্য উচ্চ এবং মহৎ। এবং তাহাদের নিজেদের শিক্ষা, কর্ম্মক্ষেত্র, এবং নিজেদের স্বাধীনতা বোধ আছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এবং শিক্ষাকে স্বাধীনতার দিকে অধিকতর অগ্রসর করিয়াছেন। ইংরাজেরাই ভারতবর্ষে স্বাধীনতার মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেরই কৃপায় ভারতবর্ষ দেশহিতৈষিতা এবং জাতীয়তা শিক্ষা পাইয়াছে। এখন কেন তবে তাহারা অভিযোগ করিতেছেন যে, 'আমরা ভারতে শান্তি স্থাপন করিয়াছি—ভারতবর্ষে পথ ঘাট রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়াছি, তথাপি এই ভিক্ষুকেরা কি চায়?' আমি বলি যাহা তোমরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ তাহারা এখন তাহাই চায়, তাহারা সেই ইংরাজের সহিত সমাধিকার চায়। যদ্যপি তাহারা শ্বেতকায় হইত তাহা হইলে কখনই তাহাদের অস্থিরতা দর্শনে ইংলণ্ড চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু জাপানের উন্নতি দর্শনে তাহারা বুঝিয়াছে যে চেষ্টা করিলে তাহারাও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। অতএব এখন হইতে ভারতের প্রতি আমাদিগকে অন্যরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদিগের চিরস্থায়ী অধিকারের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিকর না হইয়া তাহাদের জাতীয়তা বিকাশ পায় তাহার উপায় করিতেই হইবে।

ভারতে নূতন ভাবের জন্ম। ডাক্তার আনন্দকুমার স্বামী গত আগষ্টমাসের হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রে ভারতের নবীনভাবকে একটি জীবনীশক্তিসম্পন্ন পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন "কতজন ভারতবাসী এখন উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা কয়েক লক্ষ কাপড়ের গাঁট বম্বে কিম্বা লাঙ্কাশায়ারে প্রস্তুত হইয়াছে পাঁচশত বৎসর পরে সমগ্র মনুষ্য জাতির নিকট তাহার কোন মূল্য থাকিবে না কিন্তু ভারতবর্ষীয় মহান আদর্শ এবং সভ্যতার উন্নতি অধোগতির উপরই মনুষ্য সমাজের লাভ লোকসান নির্ভর করিবে। লেখকের মতে ভারতীয় ভাবের সহিত ভারতীয় জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত। দেশীকাপড়ে প্রস্তুত "লেটেষ্ট লণ্ডন ফ্যাসনের হ্যাট" মাথায় দেওয়া অপেক্ষা বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত দেশীয় পাগড়ি পরিধান করা ভারতীয় ভাবের পক্ষে বিশেষঅনুকূল! কারণ মনের ভাব অর্থ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। এবং বর্ত্তমান ভারতে জাতীয় ভাব সংগঠিত করাই ভারতের সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য! লেখক মনে করেন, জাতীয় আদর্শের প্রতি ভক্তিই প্রকৃত রাজভক্তি। ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষীয়েরই নিজস্ব, প্রত্যেক ভারতবাসীর এই বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ নহে যে আমরাই ভারতকে কর-কবলিত করিব—ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক জাতি সমগ্র মানবজাতির উন্নতিসাধন মঞ্চে আপনাপন কার্য্য অভিনয় করিবেন। যে জাতির তাহার নিজস্ব চরিত্র, ভাব ও আদর্শ সম্যক স্ফূর্ত্তির স্বাধীনতা নই—সে জাতি সমগ্র মানবজাতির উন্নতিতে কিছুই দান করিতে পারে না; কিন্তু প্রত্যেক জাতির নিকট হইতেই সমগ্র মানবজাতি ইহা প্রত্যাশা করে। ভারতের জাতীয়ত্বের পথে যে যথেষ্ট বিঘ্ন আছে ইহা সত্য। আশ্চর্য্য এই যে অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বর্ত্তমানে ভারতে একটি জাতি সংগঠিত, হওয়া ঠিক নহে, আজও অনেক ইংরাজ ইহা ভাবিয়া

থাকেন। কিন্তু আমাদের জাতীয়তার আদর্শ কেবলি কতকগুলি অধিকার লাভ নয়, ইহা সাধারণের আত্মশক্তির উদ্বোধন মাত্র। দুঃখের বিষয় প্রাচীন সৌহার্দ্দ্যের গ্রন্থিতে আমাদের জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর না হইয়া উক্ত ভাব দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবাসী জানে যে তাহাদের চরিত্রের প্রধান বৃত্তিগুলি আজও সুপ্ত! কিন্তু তাহার জাগরণে ফল যে কিরূপ হইবে তাহা আজও অবিদিত। ইহা লাভের জন্যই ভারতের বর্ত্তমান চাঞ্চল্য এবং সকল প্রকার বিপদকে তাহারা বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত।

ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক একতা জাতীয়তার প্রধান উপাদান। সমগ্র ভারত ভৌগোলিক হিসাবে একদেশ তাহার কোন ভুল নাই। এবং সমগ্র ভারতের সামাজিক বন্ধনও একাঙ্গীভূত! অশোক, বিক্রমাদিত্য আকবর ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এবং মহাভারত সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেও ইহা উপলব্ধি হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা, উন্নতি, ধর্ম্ম সমস্তই সমগ্র ভারতবাসীকে এক উদ্দেশ্যে একত্রিত করিবার জন্য গঠিত। ভারতীয় তীর্থ, নদী, কাব্য সকলই সর্ব্ব প্রকারে মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষা দিতেছে। ভারতবাসীর পুণ্য ভূমি "প্যালেষ্টাইনের" ন্যায় দূরে নহে—তাহা স্বয়ং ভারত! ভারতের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেকটির সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। কাহাকেও ত্যাগ করিবার নহে এবং ত্যাগ করিয়া কেহ স্বাধীন ভাবে জীবিত থাকিতে পারেন না। মুসলমানেরাও ভারতের সহিত একত্র জড়িত। হিন্দু উন্নতির সহিত মুসলমান উন্নতি একসূত্রে গ্রথিত। এবং অন্য কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া আমরা হিন্দু মুসলমান পরস্পরে একত্রে মিলিত হইয়া আত্মশক্তিকে জাগ্রত করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

সমালোচনা।

'ঠাকু'মার ঝুলি বা বাঙ্গালার রূপকথা।' শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত। মূল্য এক টাকা। দক্ষিণা বাবু 'ভারতী'র পাঠক পাঠিকার নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, বাঙ্গালীর শৈশবের বিচিত্র স্বপ্ন-কাহিনীগুলি সযত্নে উদ্ধার করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গালায় এখনো যে শিশু সাহিত্যের অভাব আছে, সে বিষয়ে কেহই বোধ হয়, দ্বিরুক্তি করিবেন না। দক্ষিণা বাবু এই রূপকথাগুলি সঙ্কলন করিয়া, শিশু সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এ দূরূহ উদ্যমে তিনি যে কিরূপ সফলকাম হইয়াছেন, তাহা অতি অল্পকালমধ্যে, তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় জানা যায়! রূপকথায় প্রাচীন সরলতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এরূপ গ্রন্থ সঙ্কলন, তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তাহাপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব তাঁহার বিষয়োচিত চিত্রাঙ্কনে! গ্রন্থের চিত্রগুলি দক্ষিণা বাবু স্বয়ং নিপুণতা সহকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। পরিশেষে রবীন্দ্র বাবুর সহিত আমরাও বলি, 'এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু শয়ন রাজ্যে পুনর্ব্বার দিদিমারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন্।'

মা বা আহুতি। (জাতীয় গীতিকাব্য) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। দক্ষিণা বাবু কেবলমাত্র বঙ্গজননীর অতীত গৌরবের ভস্মকণাগুলি সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। মাতৃ-যজ্ঞের আহুতি রচনা করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন! গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের একটী ক্ষুদ্র বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার 'মা বা আহুতি'—এই নামকরণে 'বা' শব্দটি কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? রূপকথা 'বা' ঠাকুমার ঝুলি শিষ্ট প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু মা 'বা' আহুতি কখনো একার্থ-বাচক হইতে পারে না। 'দুর্গা বা বলিদান'—এরূপ প্রয়োগ হাস্যকর! হয় 'মার আহুতি' অথবা কেবল 'মা' বা শুধু 'আহুতি' বেশ সুন্দর নাম হইতে পারিত। সে যাহা হউক, আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহার তরুণ কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি। কবিতাগুলি, স্থলবিশেষে

অস্পষ্টতার ছায়ায় আবৃত হইলেও ওজস্বিনী। যে খানেই পাঠ করিয়াছি সেখানেই তাহা বোধ করিয়াছি; কবিতা গুলির মধ্য হইতে, যেন একটা তীব্র জ্বালাময়ী আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! সে উচ্ছ্বাস অকৃত্রিম ভক্তির স্নিগ্ধতায় আপ্লুত হইয়া পাঠকের হৃদয় সহজেই স্পর্শ করিয়া যায়!

কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী বিরচিত। মূল্য একটাকা মাত্র। গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গ সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বেই আপনার গৌরবস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'হাসি ও অশ্রু' ও 'অশোকা' বঙ্গ সাহিত্যে যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি, তাঁহার রচিত কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি মাত্র! তন্মধ্যে একটী ঠিক 'ক্ষুদ্র' নয়, নাতিদীর্ঘ উপন্যাস বলিলেও চলে!

লেখিকার রচনায় একটী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলাম,—প্রারম্ভে কোনরূপ আড়ম্বর নাই, কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যায় আখ্যায়িকা ততই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক হইতে থাকে। এবং উপসংহারে লেখিকা একেবারে পাঠকের হৃদয় অধিকার করিয়া লন। প্রেম কাহিনীর অবতারণায় লেখিকা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও, করুণ রসে তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দু একটী গল্প পড়িয়া আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। আশা করি অচিরে আমরা তাঁহার বৃহত্তর উপন্যাস পাঠ করিতে সুযোগ পাইব।

বঙ্গীয় কবি! (অম্বষ্ঠ খণ্ড) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত প্রণীত। মুল্য ২৸৹ টাকা। এই গ্রন্থে বাঙ্লার বৈদ্য কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী—জীবনী নয়,—পরিচয় সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ সঙ্কলনে যেরূপ বিপুল পরিশ্রম, অসামান্য অধ্যবসায় ও একান্ত নিষ্ঠার প্রয়োজন, সাধারণে প্রায় তাহা উপলব্ধি করেন না। কালীপ্রসন্ন বাবু যেরূপ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক বাঙালীর ধন্যবাদের পাত্র। এরূপ সাহিত্য-ঐতিহাসিক গ্রন্থে বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির একটী সংক্ষিপ্ত-সুন্দর ইতিহাস দিয়া গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে, এরূপ গ্রন্থ একেবারে ত্রুটি বিবর্জ্জিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না; তথাপি আমরা জাতীয় অভ্যুদয়ের দিনে ইহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি। ত্রুটি এই যে, ছন্দ রচয়িতা পর্য্যন্ত কবির গৌরব স্থান অধিকার করিয়াছে। এ কথা সত্য যে, আমাদের যাহা আছে, তাহা গৌরবের সামগ্রী, কিন্তু তাই বলিয়া সামান্যকে বড় করিয়া দেখিলে কোন লাভ নাই। দ্বিতীয়তঃ; গ্রন্থকার এই গ্রন্থ সঙ্কলনে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন আমরা আদৌ তাহার পক্ষপাতী নহি। 'বিপ্রখণ্ড' অম্বষ্ঠখণ্ড, কায়স্থখণ্ড—এরূপ পর্য্যায় নির্ণয়ে কোন ইষ্ট লাভ নাই; ধারাবাহিক কালের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া, ঐতিহাসিকের প্রশস্ত ও সুগম পথ অবলম্বন তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। এবং পরে অম্বষ্ঠ কবিগণের একটী সূচীপত্র সন্নিবিষ্ট করিলেই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধি হইতে পারিত। এইরূপ ত্রুটি সত্বেও, গ্রন্থের মূল্য বা উপকারিতা আমরা খর্ব্ব করিতেছি না। তাঁহার এই গ্রন্থের জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা ত্রিপুরারাজবংশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মাতৃভাষার প্রতি, তাঁহাদের রাজোচিত অকৃত্রিম অনুরাগ চির-প্রসিদ্ধ। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যয়-ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ (ব্যঙ্গনাট্য)। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ প্রণীত। মূল্য ।৹ আট আনা। এই দৃশ্যকাব্যখানি সম্প্রতি ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। সৌরীন্দ্র বাবু অতি তরুণ বয়সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু গ্রন্থকার-রূপে তাঁহার "এই প্রথম সসঙ্কোচ প্রবেশ।

প্রহসন হিসাবে গ্রন্থখানি ভালই হইয়াছে। ইহাতে হাসিবার অঙ্গ আছে, কিন্তু অশ্লীলতা নাই। কেবল ইহার সুরটী আমাদের ভাল লাগে নাই। বইখানি পড়িলে সাধারণের মনে হইতে পারে ইহা উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিদ্রূপাত্মক। যদিও বইখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় লেখক প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহেন। আসলে তিনি অল্প এবং বিকৃত শিক্ষাকেই নিন্দা করিয়াছেন। গ্রন্থের নায়িকা, লাবণ্য বেশ সুশিক্ষিতা মহিলা; কিন্তু তিনি কলেজে পড়েন নাই, গৃহেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ইঁহার শিক্ষা প্রেম ও কর্ম্মকে আশ্রয় লাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। আর উহার দ্বিতীয় নায়িকা কিছুদিন কলেজে পড়িয়া

একেবারে অদ্ভুত জীব বনিয়াছেন। আমাদের দেশে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার সবেমাত্র আরম্ভের দিনে এরূপ ভাবেও এ সম্বন্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা ঠিক নহে। লোকে লেখকের উদ্দেশ্য তলাইয়া না বুঝিয়া, ফলে ইহা উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিদ্রূপাত্মক বলিয়াই মনে করিবে। প্রকৃত পক্ষে ইহার অভিনয়ে এই ভাবই লোকের মর্ম্মে মর্ম্মে বসিয়া যায়। আশা করি, গ্রন্থকার এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাকে নির্দ্দোষ করিয়া তুলিবেন। তাঁহার লেখনী হইতে আমরা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ প্রত্যাশা করি না।

এই দোষ টুকু ছাড়া এ গ্রন্থখানি অন্য সকল বিষয়ে প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে নাটকীয় প্রতিভা যথেষ্ট আছে। হাস্যকৌতুকও অপর্য্যাপ্ত। যাঁহারা হাসিতে চাহেন তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখুন। গ্রন্থকার ফরাসী নাট্যকার মোলেয়ার হইতে গ্রন্থের ভাবকঙ্কাল গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট নৈপুণ্য সহকারে তাহাকে মৌলিকভাবে গড়িয়া তুলিয়া সুসজ্জিত করিয়াছেন।

সারথি, প্রথম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ। ‘নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ’ কথাটা একেবারে ভুলিয়া কটমট ভাষায় আত্মস্তরিতা প্রকাশ করিয়া ‘সারথি’ বাহির হইয়াছেন! প্রথম সংখ্যায় ‘সারথি’ বলিয়াছেন—“যে ধ্বজা ধুলায় লুটাইয়াছে, যে চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, যে আসন শূন্য, যে ধনুক ভগ্ন, যে প্রাণ শক্তিহীন, যে দেশ লুণ্ঠিত, যে চক্র বিচ্যুত সেই সকল কুড়াইয়া, যে পথ আজ যুগযুগান্তের জঞ্জালে আচ্ছন্ন সেই পথ সম্যক মুক্ত করিয়া তাহারই উপর দিয়া রথ চালাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি! এ সকল কথা ‘অমৃত বালভাষিতং’ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সংযম ও বিনয় সাধনার প্রথম সোপান, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। ‘বর’ কবিতার ভাব নিতান্ত অস্পষ্ট। ‘স্বদেশীর’ হুজুকে চালানো যাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে তাহার সুদৃঢ় স্থান হইবে না। আজকালের কবি ও লেখকগণ লেখনী ধারণ করিয়া সংযমকে একেবারে দেশছাড়া করিয়া বসেন কেন, তাহা বুঝিতে পারি না; সাহিত্যের গ্লানি ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল! ‘জাতীয় জীবন’ প্রবন্ধটি সারথির একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে লেখক চিন্তা ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নির্জ্জীব ‘দ্বন্দ্ব’ কবিত্ব কলা ও শেষ কথায় তূনীর পূর্ণ। ‘কশা’র অর্থ সমালোচনা, নবীন সহযোগী কশা গ্রহণে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন। এতটা অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা লইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে নাই। তরুণবয়স্ক উদ্যমী সাহিত্যসেবিগণ এই অহঙ্কারেই অধঃপাতে না যান তাই এত কথা বলিলাম নচেৎ বাস্তবিক এত আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল না।

জগজ্জ্যোতিঃ। আষাঢ় ও শ্রাবণ। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বৌদ্ধগ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ ‘জগজ্জ্যোতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি প্রবন্ধনির্ব্বাচনে সম্পাদক মহাশয় সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি হারাইবেন না।

সাহিত্যসংহিতা। শ্রাবণ ১৩১৫। প্রথমেই শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘ভামিনী’ গল্প অর্থাৎ Henry Wood এর East Lynne নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের সপিণ্ডকরণ নাটিকাতে অক্ষম লেখকের ধৃষ্টতা পদেপদে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। ‘ব্রহ্মবিদ্যার কথা’ সাধারণের প্রণিধাণের বাহিরে। ‘আলিবর্দ্দি’ প্রবন্ধ সুলিখিত জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ। লেখকের ভাষাটি বেশ সরল অনাড়ম্বর এবং উপভোগ্য! ‘কপাল’ কবিতা মন্দ নহে। ‘ধর্ম্ম মঙ্গল’ প্রকাশিত হইতেছে—স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার লেখক। এমন কিছু বিশেষত্ব নাই। সাহিত্যসংহিতায় সুলিখিত প্রবন্ধের একান্ত অভাব, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। ‘সাহিত্য সভা’ এদিকে দৃষ্টি দিবেন না কি?

---

* উল্লিখিত মাসিক পত্রিকা গুলি আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাং সং

কলিকাতা—২৫ নং রায়বাগানষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

মাতা-শত্রু।

১

রামসদয় বাবু টেলিগ্রামটা পড়িয়াই চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দুই হাত ঝাড়িয়া কহিলেন, “দূর হোক্ গে ছাই, আমার আর ডেপুটি-গিরিতে কাজ নাই, আমি রিজাইন্ দিব!”—বলিয়া তাঁর স্ত্রীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার গর্ভমন্থরা স্ত্রী তখন ক্লান্তদেহে বিছানায় শুইয়া ছিল। স্বামীর হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি হল?”

রামসদয় কহিলেন, “মঞ্জুর হল না—আমাকে পশু দুপুর বেলাতেই আবার যেতে হবে। তোমার অবস্থার কথা জানিয়েছিলেম তবু হুজুরদের দয়া হল না। ঠিক করেছি এ চাকৃরিতে জবাব দিয়ে দেশে যে দু-দশ বিঘে জমি আছে তাই চাষ করে খাব।”

শশি বলিল, “তা তো ঠিক কথা। দু-জনের হলে চাকৃরি কর বা না কর দু মুঠো ভাত যে করে হক্ জুটতো কিন্তু”—শশিমুখীকে আর বেশি বলিতে হইল না। আসন্ন ভবিষ্যতের প্রয়োজন স্মরণ করিয়া চাকৃরি-কাঙাল বাঙালীর মাথায় পুনরায় সুবুদ্ধি আসিতে বিলম্ব হইল না। রাগ দমন করিয়া ডেপুটি বাবু কাছারিতে কাজে চলিয়া গেলেন।

কাছারি হইতে তিনি ফিরিয়া আসিতেই শশিমুখী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি গো কি স্থির করলে?

রামসদয়—“তাইত, তুমিই একটা পরামর্শ দাও না কি করি। তোমাকে রেখে যাই বা কি করে, নিয়ে যেতেও যে ডাক্তার বারণ করে। রেলের রাস্তাটিও তো বড় কম নয়। সেখানে কাউকে চিনি নে। এখানে তবু চেনা পরিচিত অনেকে আছে; আর আমিও হাঁসপাতালের দাইকে বলে যাব তোমাকে রোজ দেখে যাবে, দরকার হয় তো এসে থাকৃবে। তারপর মথুর কাকা ৭।৮ দিনের মধ্যে এসে পড়বেন। এই কটা দিন ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি।”

শশি—“তার চেয়ে এক কাজ কর। নয়নদিদিকে আস্তে লেখ। তারা তো এই কাছেই থাকে?”

রামসদয়—“ঠিক বলেছ! তুমি নইলে কি আর কেউ বুদ্ধি দিতে পারে? আমি ভেবে সারা হচ্ছি কাকে তোমার কাছে রেখে যাই! ভাগ্যিস্ বল্লে, তোমার নয়নদিদির কথা আমার মনেই ছিল না।”

নয়নতারার স্বামী হরিপদ গাঙ্গুলি দারভাঙ্গায় রেলওয়ে আপিসে কাজ করে। তাদের অবস্থা বড় ভাল নয়। মাসিক দশ টাকা বেতনে সংসার খরচ চলে না। তার উপর সম্প্রতি নয়নতারার একটি সন্তান হইয়াছে।

রামসদয় বাবু তার-যোগে পথ খরচ পাঠাইয়া তাঁর স্ত্রীর অবস্থা জানাইয়া নয়নতারাকে আসিতে লিখিলেন। যদিও শশিমুখী নয়নের দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী তবু তাহার উপস্থিত অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া এবং ধনী

আত্মীয়কে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবার প্রত্যাশায় রামসদয়ের এ অনুরোধ রক্ষা করিতে নয়ন কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। টেলিগ্রাফ পাইয়াই নয়নতারা মজঃফরপুর অভিমুখে রওনা হইল।

যে ট্রেণে নয়ন আসিল সেই ট্রেণেই রামসদয়কে যাইতে হইবে। বাড়ীতে স্ত্রীকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়া তাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া তিনি ষ্টেশনে গেলেন।

দেখেন দ্বারভাঙ্গার গাড়ী আসিয়া গিয়াছে; নয়ন গাড়ী হইতে নামিল—তাহার আপাদ-মস্তক শালে আবৃত, কোলের শিশুটিও ঢাকা পড়িয়াছে। রামসদয় নয়নকে দেখিয়াই বলিলেন, "এই যে নয়নদিদি এসেছ! আমাকেও এখনি যেতে হবে। তোমাদের দুজনকে এ রকম ভাবে অভিভাবকহীন করে রেখে যেতে আমার ভারি ভাবনা হচ্ছে। যা হোক! কিছুদিনের মধ্যেই মথুর খুড়ো এসে পড়বেন। এই কটা দিন এক রকম করে কেটে যাবে।" এই বলিয়া চাপ্‌রাসীকে ডাকিয়া নয়নকে একটা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বাসায় লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়া ট্রেণে উঠিয়া পড়িলেন।

২

পরদিনই শশিমুখীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, কিন্তু সুপ্রসব হইল না। ছেলে জন্মিবার পর প্রসূতির প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। নয়নতারা যথাসাধ্য রোগিণীর শুশ্রূষা করিল কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল; প্রসবের পরদিন রাত্রেই শশিমুখী বুঝিল যে তার বাঁচিবার আশা নাই তখন নয়নকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, খোকাকে আমার কাছে সরিয়ে দাও না ভাই।"

নয়ন খোকাকে শশির কাছে আনিতেই তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া শশি কহিল, "দিদি, আমি তো ভাই চল্লেম। খোকা রইল। তোমাকে দিয়ে গেলেম। আমার কাছে শপথ কর যেমন তোমার ছেলেটিকে দেখ সেই রকম আমারটিকে দেখ্‌বে।"

নয়ন বলিল, "সে কি কথা, বোন্! তোর ছেলেও যেমন, আমার ছেলেও তেমনি! আর তুই বাঁচবি নে সেই বা কেমন কথা ভাই! তবে যদি একান্তই ভগবান্ আমাদের এমন সর্ব্বনাশ করেন তাহলে তোর ছেলে কোনদিন জানতেই পারবে না যে তার মা নেই!"

রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই সব শেষ হইল। শশিমুখী নয়নতারার হাতে ছেলেটি দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল।

নয়নতারা পূর্ব্বেই রামসদয়কে পীড়ার সংবাদ তারযোগে জানাইয়াছিল, সেই টেলিগ্রামের ৫।৬ ঘণ্টা পরেই মৃত্যুর খবর লইয়া দ্বিতীয় টেলিগ্রাম রামসদয়ের নিকট পৌঁছিল।

নয়নতারা ছেলে দুটিকে লইয়া বসিয়া আছে। মিট্‌মিট্ করিয়া ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এমন সময় শশিমুখীর পরিচিত মেয়ের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। নয়ন শশিমুখীর ছেলেটিকে দুধ দিতেছিল আর তার নিজের ছেলে বিছানায় শুইয়া ছিল।

সকলকে বসিতে বলিয়া নয়ন প্রদীপে আরেকটা সলিতা দিয়া তেজ বাড়াইয়া দিল।

বিনোদ বাবুর স্ত্রী বসিয়াই বলিলেন, "ওমা এই বুঝি দিদির খোকা! আহা! কি কপাল ওর, মা যে কি জিনিষ এই বয়স থেকে

টেরও পেলে না। তা বেশ ছেলে হয়েছে বোন্ বেঁচে থাক্।"

নয়নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আরেক জন বলিলেন, "দেখেছ মাসিমা! মুখখানিও মার মতন ঢলঢলে হয়েছে। আহা! এমন বিপদ হয়ে গেল তা আমাদের কি একটা খবরও দিতে নেই। বাঁচাতে পারতুম না বটে তবুও তো একটু দেখতে শুনতে পারতেম। শশিপিসি আমাকে এত ভাল বাসতেন কিন্তু শেষ সময়টা দেখতে পেলেম না।"

অধিকাংশ স্ত্রীবন্ধুরা ডেপুটি বাবু এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এই ছেলের এত সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে নয়ন স্তম্ভিত হইয়া গেল!

প্রথমটা সে প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ মুখের কথা মুখেই বাধিয়া গেল। কোন্ ছেলেটি তার, আর কোন্‌টি শশির সে ভ্রম আর ভাঙিয়া দেওয়া হইল না। পাড়ার লোকে বুঝিয়া গেল নয়নের ঐ কৃশকায় দুর্ব্বল চেহারার ছেলেটিই শশির,—এবং সদ্যোজন্মের অপেক্ষা অনেক বড় দেখিতে ঐ হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটিই নয়নতারার।

সকলে চলিয়া গেল, নয়নতারা অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল—এ ভুলটা নাই ভাঙিলাম। শশিকে কথা দিয়াছিলাম যে, তোমার ছেলে জানিতে পারিবে না যে তাহার মা নাই—সেই কথাটাই না হয় রক্ষা করিব।

ডেপুটির ধনে নিজের ছেলেকে লালিত করিবার পক্ষে স্বয়ং ধর্ম্ম যখন সহায় হইলেন তখন আর কি কথা আছে! আহা! মা-হারা ছেলের মা পাওয়াই বা কি কম ভাগ্য!

৩

স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রামসদয় বহু কষ্টে উপরিওয়ালার নিকট হইতে দিন দশেকের ছুটি লইয়া আসিলেন। শশিমুখী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। পত্নীর মৃত্যুতে রামসদয়ের মন ভাঙিয়া গিয়াছে। আনমনে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া শয়ন গৃহের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি নয়নতারা চোখে দু এক ফোঁটা জল আনিয়া কহিল, "বোনাই বাবু! ঘরে এসো, খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম কর। যা হবার হয়ে গেল ভেবে আর কি করবে বল, হাজার কর যে গেল সে তো আর ফিরবে না।"

নয়নকে দেখিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া রামসদয় স্নানাহার সারিয়া সাবেক ইজিচেয়ার খানিতে বসিলেন। চাকর তামাক দিয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে ধূম পান করিতেছেন এমন সময় খোকাকে কোলে লইয়া নয়নতারা কহিল—"কেমন সোনার চাঁদ ছেলে দেখ! একটু যা কাহিল কিন্তু দেখ মুখ চোখ ঠিক তোমার ছাঁচে ঢালা।"

বলিয়া নিজের শিশুটিকে রামসদয়ের কোলে দিতে গেল। ছেলেই মার মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া রামসদয়ের মন সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হইল না।

ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্। তুমি ধর, আমি শেষে ফেলে দেব।"

অচেনা কোলে ছেলেও কাঁদিতে ছিল।

"ওমা! কেমন ছেলে! মাসি ছাড়া আর কারো কোল পছন্দ হয় না বুঝি!" বলিয়া নয়নতারা খোকাকে নিজের কোলে

তুলিয়া লইল এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভগ্নিপতির সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

নয়ন—"তুমি এসেছ এখন তোমার ছেলেটিকে তোমার কোলে দিয়ে আমি আমার ঘরকন্না সাম্‌লাতে চল্লেম। ক'দিন এসেছি সেখানে যে কি হচ্ছে তার ঠিক নেই।"

রামসদয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—

"না না সেটি হচ্ছে না। আমি ঐ এক ফোঁটা ছেলেকে নিয়ে মানুষ কর্‌ব কি করে! আমাকে কখন কোথায় যেতে হয় তার ঠিকানা নেই। হরিপদকে আমি এখানেই কাজ জুটিয়ে দেব—এ ছেলে মানুষ কর্‌বার ভার তোমাকেই নিতে হবে।"

নয়নতারা যেন বিষম মুস্কিলেই পড়িল এম্‌নিতর ভঙ্গী করিল। সে কি হয়, লোকেই বা কি বল্‌বে; পরের ছেলে মানুষ করা তো সোজা কথা নয়, হাজার কর না কেন সুখ্যাৎ হবে না—ইত্যাদি অনেক কথা বলিল। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় রামসদয়ের একান্ত অনুরোধে যেন অগত্যাই মস্ত একটা দায় স্কন্ধে গ্রহণ করিল এবং এত বড় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নয়নতারার প্রতি রামসদয়ের কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না।

৪

সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, যে ছেলেটি নয়ন লালন করিতেছে তার প্রতি নয়নের যেরূপ স্নেহ, যত্ন, এমন কেহ কখন দেখে নাই। নিজের ছেলে আছে কি না আছে নয়নের তাতে খেয়ালও নাই।

রামসদয় মনে করিতেন আমার মাতৃহীন ছেলেটির উপরে তার মাসীর কি যত্ন! মা নেই কি না তাই পাছে খোকার কোন বিষয় কষ্ট হয় সর্ব্বদাই সেইদিকে দৃষ্টি।

নয়নতারা যেটিকে নিজের ছেলে বলিয়া চালাইয়াছে সেই মোটা মোটা; সুন্দর ছেলেটিকে রামসদয়ের ভারি ভাল লাগিত। বাহিরে গেলেই প্রায় ছুটি ছেলের জন্যই ভাল খেলনা ও কাপড় প্রভৃতি লইয়া আসিতেন। নয়নের ছেলেকে দিলেই নয়ন, যেন কত সঙ্কোচ বোধ করিতেছে এইভাবে বলিত, "বোনাই বাবু! কেন আমার ছেলেকে এখন থেকে মাটি কর্‌ছ! ও গরীবের ছেলে গরীবিয়ানা চালে মানুষ হওয়া ওর পক্ষে ভাল। নইলে শেষে যে মোটা ভাত কাপড় ওর রুচ্‌বে না।"

কথাগুলা সঙ্গত বটে কিন্তু মার মুখ হইতে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না। রামসদয় মনে করিতেন যে নয়নতারার আত্মসম্মানের জ্ঞান এত বেশি যে নিজের ছেলের জন্য তাঁহার নিকট হইতে কোনোপ্রকার দান সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। ইহাতে মনে মনে তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইত ও ছেলেটিকে যাহা দিতেন তাহা নয়নতারাকে যথাসম্ভব লুকাইয়াই দিতেন।

এই রকমে ডেপুটী পুত্র যতীন ও নয়নের ছেলে উপেন পরস্পরের স্থান অধিকার করিয়া বড় হইতে লাগিল।

প্রত্যহ বাড়ীতে মাষ্টার আসিয়া দুইজনকে পড়াইয়া যায়। যতীনের বয়স অল্প বটে তবু সে বুঝিয়াছিল যে সে গরীবের ছেলে এবং পৃথিবীতে সে কাহারো কাছ হইতে প্রশ্রয় পাইবে না। পড়াশুনায় সে প্রাণপণ যত্ন করিত তবু ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু

তাহাকে দৃক্‌পাত করিতেন না—আর উপেনকে দেখিলেই তাঁহার স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সুখের মধ্যে এই, বাড়ীর মাষ্টারটি যতীনের বুদ্ধি ও মনোযোগ দেখিয়া তাহাকেই বেশি ভাল বাসিতেন।

উপেনকে লইয়া কিন্তু মাষ্টারের প্রাণান্ত হইত। এই আদুরে ছেলেটাকে পিটাইয়া সিধা করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার হাত নিস্‌পিস্ করিত কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলেন যে ইহাকে হাতে মারিতে গেলে নিজেকেই ভাতে মারিতে হইবে, তাই অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া চলিতেন। একদিন কুক্ষণে আত্মবিস্মৃত হইয়া চপেটাঘাত প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সেদিন অন্তঃপুরের দিক্ হইতে যে ঝড় আসিল তাহার স্মৃতি মাষ্টার মহাশয়কে ভবিষ্যৎ অসতর্কতা হইতে দীর্ঘকাল রক্ষা করিয়াছিল।

এ ছেলেকে শিক্ষাদানের বৃথা চেষ্টা করিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ইস্কুলে যখন উপেনের ক্লাসে উঠিবার ব্যাঘাত হইল তখন উপেনের মাসি ইস্কুলের সেক্রেটারি বাবুর স্ত্রীর বাড়ীতে স্বয়ং চড়াও হইয়া এমন সকল শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছিল যে হেড্‌মাষ্টার উপেনকে শুধু যে ক্লাসে উঠাইয়া দিলেন তাহা নহে তাহাকে প্রাইজ্ দিতেও কৃপণতা করিলেন না।

এ অবস্থায় উপেনের বিদ্যা যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপই হইল। যতীনকে দিনরাত্রি বই লইয়া থাকিতে দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহার দয়া হইত সে যতীনকেও বিনা চেষ্টায় ক্লাসে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাস দিত—"দীন যথা রাজেন্দ্রসঙ্গমে";—কিন্তু যতীন রাজেন্দ্রসঙ্গমটাকে যথাসাধ্য পরিহার করিল বলিয়াই সহপাঠীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া উঠিল।

৫

যতীন কোনমতেই একদিনের জন্যও মায়ের আদর পাইল না বটে, কিন্তু মা সরস্বতী তাহাকে দয়া করিলেন—সে কেবলি পাস করিয়া জলপানি পাইতে লাগিল।

নয়নতারা রামসদয়কে বলিত যতীনকে কতকগুলা লেখাপড়া শিখাইয়া কেন সময় নষ্ট করিতেছ—কোথাও কেরাণীগিরিতে লাগাইয়া দাও, দুদশ টাকা রোজগার করিতে শিখুক্। আর কতদিন কেবল বসিয়া বসিয়া তোমার অন্নধ্বংস করিবে?

রামসদয় সে কথায় কান দিলেন না।

তখন নয়নতারা যতীনকে ডাকিয়া কহিল—"তোমার ঢের পড়া হয়েছে—পরের টাকা উড়িয়ে বছর বছর পাস্ করতে তোমার লজ্জা করে না? ডেপুটি বাবু ভাল মানুষ বলে কিছু বলেন না—আর কেউ হলে কোন্ কালে যে ঘাড়ে হাত দিয়ে বের করে দিত।"

মার মুখে এইরূপ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া যতীন রামসদয়কে গিয়া কহিল—"মেসোমশায়, আমি তো স্কলার্সিপ্ পাচ্ছি তাই নিয়ে আমি কলকাতায় গিয়ে পড়্‌ব।"

রামসদয় কহিলেন—"কেন বাবা, এখানে তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?"

যতীন কহিল—"অসুবিধা নয়—কলকাতায় পড়া ভাল হবে।"

যতীন কলকাতায় মেসে থাকিয়া কাহারও কাছ হইতে এক পয়সা না লইয়া বহুকষ্টে

ক্রমে ক্রমে বি, এ, দিয়া অবশেষে আইন পরীক্ষায় পাস্ হইল।

উপেন বিদ্যা ও যশঃসৌরভে যতীনের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না বটে কিন্তু মাসিমার সাহায্যে কুন্তলীন ও দেলখোসের সৌরভে পাড়া আকুল করিয়া তুলিল।

এই সৌরভ অনেকদিন স্থায়ী হইতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ ওলাউঠা রোগে তাঁহার কর্ম্মস্থানে রামসদয়ের মৃত্যু হইল।

৬

নয়ন—"বাবা উপেন! এখন উপায় কি হবে? যা তোর বাপ্ রেখে দিয়েছিলেন সব তো কোন্ দিক্ দিয়ে খরচ করে ফেল্লি চোখেও দেখতে পেলেম না।

উপেন—"হবে আর কি! যেমন করে এ ক'দিন চল্ল' সেই রকম করে চল্‌বে।"

নয়ন—"তাও যে চলে না, ধার দিতে কেউ চায় না।"

উপেন—"তবে চল, একবার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি গে।"

তখন যতীন দ্বারভাঙ্গায় ওকালতি করিয়া প্রত্যহই নাম এবং টাকা করিতেছিল।

যতীন উপেনকে ছোট ভাইটির মতন ভালবাসিত। উপেনের দেনাপত্র শুধিয়া দিয়া নয়নতারা ও উপেনকে আপনার কাছেই রাখিল।

দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া যতীনের ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ দেখিয়া নয়ন ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইতেছিল। ছেলে বদল করিয়া তো কিছু লাভ হইল না কেবল ছেলে তাকে মা বলিয়া জানিল না।

উপেন সমস্তদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়; তার মত নিষ্কর্ম্মা অনেকগুলি সঙ্গী জুটিয়াছিল। ইহাতে উপেনের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া যতীন একদিন উপেনকে কাছে ডাকিল, কহিল, "উপেন! তোমার জন্যে একটা চাকুরি ঠিক করে রেখেছি; তুমি একটা কাজকর্ম্ম করলে তাতে তোমার সময় কেটে যাবে আর মনও ভাল থাক্‌বে।"

কথাটা উপেনের ভাল লাগিল না। নয়নতারার কাছে শিখিয়াছিল যে যতীনের উপর তার অনেক দাবী আছে। কাজেই সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "দাদা, বোঝা নামাতে চাও বুঝি?"

শুনিয়া যতীন মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া কহিল, "তবে থাক্। মাপ কর উপেন—কাজের কথা আর কোনোদিন মুখে আন্‌ব না।"

৭

এদিকে স্ত্রীর সঙ্গে হরিপদর বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। সে বেচারা যতীনের জন্য একটি বেশ মনের মত সম্বন্ধ জোটাইয়াছে। গবর্মেণ্ট প্লীডার কার্ত্তিক বাবুর একমাত্র কন্যা সরোজিনী। বাপের টাকা যথেষ্ট—তিনি ভাল কুল চান। হরিপদ বড় কুলীন তাহার ছেলে যতীনের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহের প্রস্তাবে কার্ত্তিক বাবু একেবারে লাফাইয়া উঠিয়াছেন। সকল বিষয়েই এমন রত্ন কি আজকালকার দিনে পাওয়া যায়!

এই শুভসংবাদে নয়নতারার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। কহিল, "কি বল্লে! যার বাপের খেয়ে পরে সাত গুষ্ঠি মানুষ হলে, আজ তার বাপ্ নেই বলে কেউ বাছার পানে একবার তাকালেও না! ও হচ্চে না। তুমি এই মেয়ের সঙ্গে উপেনের বিয়ে দাও তা নইলে আমি গলায় দড়ি দেব।"

হরিপদ শুভসমাচার দিতে আসিয়া স্ত্রীর অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কোনমতে সরিয়া পড়িল।

নয়নতারা পণ করিল—এ বিয়ে ভাঙিতেই হইবে। যতীনকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ যতীন, যাদের খেয়ে প'রে মানুষ হলে, যার দৌলতে আজ তোমার কোন অভাব নেই তার প্রতি কি শেষ নেমকহারামী করতে হবে? ধর্ম্ম কি তাহলে সইবে? উপেনকে ফাঁকি দিয়ে তুমি বড় মানুষের ঘরে বিয়ে করবে? সে হবে না; তুমি তাদের বলগে এ বিয়েতে তোমার মত নেই।"

যতীন বলিল, "মা, আমি ত বিয়ে করতে চাই নি, বাবা সব কথাবার্ত্তা স্থির করে ফেলেছেন; তুমি বাবাকে বল।" এই বলিয়া যতীন কাছারি গেল।

তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া নয়নতারা উপেনের কাছে গেল।

"উপেন! শোন্ তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। তোর দাদার বিয়ে শুনেছিস্ তো। আমি যে করে পারি সেই মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেওয়াব।"

উপেন—"সে কি কথা মাসিমা! ওদের ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে, কুল শীল দেখে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে; আর দাদার মতন পাত্র ছেড়ে আমার মত লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরের হাতে কে মেয়ে দেবে?"

নয়ন—"কুলের কথা কি বল্‌চিস্? ওর আবার কুল কোথায়? তোর কুল নিয়েই ত ওর কুলের গুমর! সে কথা আমি যদি আজ ফাঁস করে দিই তাহলে দেখি মেয়ে বিয়ে দেবার জন্যে কে ওঁর পায়ে ধরে সাধ্‌তে আসে!"

উপেন—"মাসিমা, কি তুমি পাগলের মত বকচ! আমাদের আবার কুল কোথায়—সে কুল উনিই বা নেবেন কি করে?"

নয়ন—"ওরে বোকা ছেলে, কুল তোরই। তখন কি জানতেম ধন মান সব চুলোয় যাবে শেষকালে কুলের এত মূল্য হবে! তা হলে কি নিজের পেটের ছেলের সঙ্গে মরতে পরের ছেলে বদল করতে যাই।"

উপেন বিছানা ছাড়িয়া লাফ্ দিয়া উঠিয়া কহিল—"মাসিমা!"—

নয়নতারা। "মাসিমা কিসের! মা বল্! নিজের ছেলের মুখে মা শব্দ শুনলেমনা আমি এম্‌নি অভাগী! যে জন্যে এত করলেম তার কিছুই হল না! আর কেন আমি আঁতুড়ে ছেলে বদল করেছি এ কথা আজ আমি সবাইকে জানিয়ে দেব। দুটো পাস করে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। ঐ যতে আবার কুলের গরব করে! দর্পহারী মধুসূদন আছেন—ওর অহঙ্কার চূর্ণ করব, ওর কুলের মুখে চুণকালি পড়বে তবে না আমার নাম নয়নতারা!

উপেন গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "চুপ্ কর—আর একটা কথা যদি কও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

মধ্যাহ্নে আহারের সময় উপেনকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। উপেনের পক্ষে এরূপ ঘটনা নূতন নহে। সে কোন্ দলে মিলিয়া কোথায় কখন্ কাটায় তাহার ঠিকানা নাই।

সন্ধ্যার সময় যতীন উপেনের নিকট হইতে একটা টেলিগ্রাম পাইল—"আমি রেঙ্গুনে যাত্রা করিলাম—আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়ো—ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন্।"

শ্রীমতী মাধুরীলতা দেবী।

ভগ্ন বীণা।

আমার এ উপেক্ষিতা ভগ্ন বীণা খানি
কে জানে যে কতকাল কোথা ছিল পড়ে';
সুপ্ত ছিল কত গান কিছু নাহি জানি।
অস্পষ্ট স্বপন প্রায় মনে নাহি পড়ে
শৈশব কাহিনী; ক্ষুদ্র বীণা মৃদুস্বরে
বাজিত কি বাজিত না তাহাও জানিনা।
শুধু এই মনে পড়ে একদা কৈশোরে
করুণ সুরেতে টেনে বেঁধেছিনু বীণা,
টানে তার গেল ছিঁড়ে; তদবধি ছিল
পড়ে এক পাশে,—ছিন্ন ভিন্ন তন্ত্রীগুলি।
সহসা মধুর সুরে আবার বাঁধিল
কি জানি কাহার রাঙ্গা কোমল অঙ্গুলি;—
উঠিল মধুর সুর চিত্ত মুগ্ধ ক'রে,
কি নব বাসনা জেগে উঠিল অন্তরে।

লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণের জাপান-চিত্র।

(ফেলিসিয়াঁ শালের ফরাসী হইতে)

১

একজন বুদ্ধিমান ও উদার-চিত্ত ব্যক্তি সম্প্রতি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে, প্রাচ্য-খণ্ডের যুক্তিযুক্ত সুস্পষ্ট তত্ত্বসমূহ ও পাশ্চাত্যখণ্ডের অস্পষ্ট ভাবের কথাগুলি, এই উভয়ের সমন্বয় সাধনে সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন; ইঁহার নাম—Lafcadio Hearn। তাঁহার আতিথেয় হৃদয়-কুটীরে, উচ্চতর য়ুরোপীয় সভ্যতা ও উচ্চতর জাপানী সভ্যতার মিলন ঘটিয়াছিল; উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়া, সভ্যতার একটা পূর্ণ আদর্শ গঠিত হইয়াছিল। কি "শ্বেত", কি "পীত"—সকল সভ্যতার মধ্যে যাঁহারা সৌভ্রাত্র্য ও সহযোগিতা স্থাপনের কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা এই মৃত্যুতে যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছেন।

ইঁহার অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী; "বসুধৈব কুটুম্বকং" -এই কথা ইহাতেই সার্থক হইয়াছে। আইনীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত লিউকেডিয়া দ্বীপে, ২৭ জুন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা আইরিশ, ও ইঁহার মাতা গ্রীক্‌। ইনি সুশিক্ষিত; য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে—বিশেষতঃ ফ্রান্সে ইনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্সে গিয়া ফরাসী ভাষা খুব ভাল-করিয়া শিখিয়াছিলেন। ইনি নিউ-ইয়র্কে, নব-অর্লেয়াঁ, ও অ্যান্টিই প্রদেশে বহুকাল বাস করেন। অবশেষে জাপানে উপনীত হয়েন, এবং জাপানী-জীবনের মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, ঐখানেই চিরজীবন বাস করিবেন বলিয়া স্থির করেন। প্রথমে তিনি ইজুমো-প্রদেশে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও মাৎসুরের শিক্ষক-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে—তাহার পর, টোকিয়ো-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি একজন জাপানী রমণীকে বিবাহ করেন; এবং ইংরেজ-জাতিত্ব বিসর্জনপূর্ব্বক, কোইজুমি-য়াকুমো এই নাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে বৈধরূপে জাপানী জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই অবধি, তাঁহার চিঠিপত্রের নিম্নদেশে তাঁহার গ্রীক্‌-আয়ার্ল্যাণ্ডীয়

নাম ল্যাটিন্ অক্ষরে, ও তাঁহার জাপানী নাম চীনীয় অক্ষরে লিখিতেন। তাঁহার এই যুগল নাম, তাঁহার যুগল ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণ, য়ুরোপ ও আমেরিকায় য়ুরোপীয়দিগের নিকট প্রাচ্য সভ্যতার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যুক্ত-রাজ্য ও ইংলণ্ডে, ঈষৎ-মার্কিণ-ধরণের ইংরাজি ভাষায়, তিনি জাপান-সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পর-পর প্রকাশ করেন। এই সকল উৎকৃষ্ট চিত্তরঞ্জক গ্রন্থে, তিনি জাপানী জীবনের সকল দিক্‌ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির নাম;—"Glimpses on unfamiliar Japan" (অপরিচিত জাপানের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি); "Out of the East" (প্রাচ্যদেশ হইতে); কোকোরো (হৃদয়); Gleamings in Budha fields (বৌদ্ধক্ষেত্রে শস্যসংগ্রহ), এই প্রত্যেক গ্রন্থে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ আছে;—দৈনিক বিবরণের টুক্‌রা-টাক্‌রা, ভ্রমণসম্বন্ধে মন্তব্যলিপি, সংবাদ, চলিত গল্প, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ, দার্শনিক আলোচনা; আভ্যন্তরিক সমুদ্রে ভ্রমণ,—তাহারই পাশাপাশি, জাপানী রমণীদের বেশবিন্যাসের বর্ণনা; "গ্রীষ্ম-দিনের স্বপ্ন" নামক কতকগুলি ছোট ছোট গল্প—তাহার পাশাপাশি, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খণ্ডের সেই চিরকেলে পুরাতন রমণী"; পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে বৌদ্ধবিশ্বাসের দার্শনিক বিশ্লেষণ;—তাহার পাশাপাশি, কোন একটা আখ্যায়িকা, যাহাতে একজন পুরোহিত কিংবা একজন নর্ত্তকীর জীবন বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ।

তাঁহার অন্যান্য পরবর্ত্তী গ্রন্থে, লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণ জাপান-সম্বন্ধে বিবিধ দার্শনিক ও শব্দতাত্ত্বিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন; Japan, an attempt at interpretation (জাপান ও জাপানের একটা ব্যাখ্যার চেষ্টা);—ইহা একটি উচ্চদরের গ্রন্থ; এই গ্রন্থে তিনি জাপানের পুরাতন ধর্ম্ম, চিন্তা, ভাব, ও প্রথাদির দ্বারা, জাপানের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জীবনের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত বৎসর, একটা, নিষ্ঠুর ঘটনা, হার্ণের জীবনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। কিছুকাল হইতে অস্পষ্টভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে কি-একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহার ফলে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মহইতে অবসর দিল; অধ্যাপকের আসন তাঁহাকে ছাড়িতে হইল। তিনি বলেন, জেস্যুইট্ ও মেথডিষ্ট মিসানারিরা তাঁহার বিরুদ্ধে একজোট হইয়া, চক্রান্ত করিয়া তাঁহার এই অনিষ্ট সাধন করে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে যে একটি সুন্দর পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই মর্ম্মান্তিক কথাটি ছিল;—"জাপানি ধর্ম্মকে ভাল বলায় এখন আমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে।" পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, এক্ষণে এই মনোবেদনা তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না।...য়োকোহামা হইতে Times পত্রে যে একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহা হইতেই জানা গেল, লাফ্‌কেডিয়ো হার্ণ ৫৪ বৎসর বয়সে, ১৯০৪, ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিয়ো নগরে হৃদ্‌-রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথমে, জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের

বর্ণনা। লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণ, জাপানী দৃশ্যের সৌন্দর্য্যকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, ক্ষণস্থায়িত্বই এই সৌন্দর্য্যের আংশিক উপাদান। রং, আভা ও পদার্থসমূহের প্রতিবিম্ব ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং লঘু কুয়াসার সঞ্চরণে, রেখাসমূহের সামঞ্জস্য অবিরত রূপান্তরিত হইতেছে। যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যে, বিষাদ-ময় ক্ষণিকতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়, জাপানীরা সেই সকল দৃশ্যই বেশী ভালবাসে। যথা,—শরৎকালে Maple বৃক্ষের লাল পাতার বাহার; শীতকালে, বরফের ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য্য; সর্ব্বাপেক্ষা বসন্তকালে, পীচ্‌ ও চেরি-ফুলের উজ্জ্বল শোভা।

লাফ্‌কাডিয়ো-হার্ণ বলেন :—"আমার উদ্যানে, চেরি-গাছে যে গোলাপী রঙ্গের ফুল ফুটিয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়; ফুলগুলা সাদা ও লাল্‌চে। বসন্তকালে অস্তমান সূর্য্যের দ্বারা ঈষৎরঞ্জিত, মেষ-রোমের মত সাদা, অসংলগ্ন খণ্ড খণ্ড সাদা বরফ, আকাশ হইতে যেন পতিত হইয়া বৃক্ষশাখায় ঝুলিতেছে। এই তুলনাটি অতিরঞ্জিত নহে; কিংবা নূতনও নহে; ইহা একটা পুরাতন জাপানী বর্ণনা। জাপানের চেরি গাছের ফুল ফোটা যে না দেখিয়াছে, সে এই মধুর রমণীয় দৃশ্য কখন কল্পনা করিতে পারিবে না। সবুজপাতা মোটেই নাই। পাতা দেরিতে বাহির হয়। কেবলই ফুল; প্রত্যেক শাখা, প্রত্যেক উপ-শাখা যেন একপ্রকার সুকুমার কুয়াসায় আচ্ছন্ন; সমস্ত গাছের তলদেশে, যতদূর দৃষ্টি যায়, ফুলের পাপড়ী ঝরিয়া পড়িয়াছে—মনে হয় যেন একটা গোলাপী-বরফের স্তরে মাটি ঢাকিয়া গিয়াছে।"

জাপান-দেশটা আগ্নেয়-গিরি-সঙ্কুল হওয়ায়, অবিরত ঈষৎ-রূপান্তরিত হইতেছে। কিয়ৎ বৎসরের মধ্যেই,—পর্ব্বতের উচ্চতায়, ভূমির সমতায়, নদীর গতিতে, উপকূলের গঠনে একটু একটু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এইরূপে স্বয়ং প্রকৃতি-দেবীই, জাপানীদের সমক্ষে, "জগৎ নশ্বর" এই বৌদ্ধ মতবাদটির সত্যতা প্রদর্শন করেন; "কালকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আছে, সমস্তই বিনাশ পাইবে;—অরণ্য পর্ব্বতও বিনাশ পাইবে, চন্দ্র সূর্য্যও বিনাশ পাইবে..."

হার্ণ বলেন, জাপানীদের ভৌতিক জীবনও এই অনিত্যতা-লক্ষণাক্রান্ত। এক পুরুষের মধ্যেই, কোন নগরের বাহ্য আকার একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। যেখানে মৃত ব্যক্তিরা চিরবিশ্রাম লাভ করে, সেই সমাধিস্থান ও পুরাতন মন্দিরের অধিষ্ঠানভূমি ছাড়া, পৃথিবীর আর কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী, কাগজের বাড়ী অল্পদিনের মধ্যেই নির্ম্মিত হয়; এই সকল বাড়ী বেশীদিন টেকে না। সমস্ত আবশ্যক জিনিসের মধ্যেও এই অনিত্যতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়: দেয়ালের কাগজ, প্রতিবৎসর দুইবার করিয়া বদ্‌লানো হয়, প্রতি শরৎকালে, ঘরের মাদুর বদ্‌লানো হয়; পরিচ্ছদ ধৌত করিবার সময়, উহার সেলাই সকল খুলিয়া ফেলা হয়; খড়ের খড়ম্‌গুলা এত শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায়, যে ভ্রমণ-পথের প্রতি আড্ডায়, নূতন খড়ম কিনিতে হয়; জাপানীরা যে কাঠি দিয়া আহার করে, সেই কাঠি প্রত্যেক ভোজনেই উহারা বদলাইয়া ফেলে।

বৌদ্ধধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, জাপানীরা

এই অনিত্যতাতে বেশ্ সন্তুষ্ট; তাহাদের বিশ্বাস—অনন্ত জীবনপথে, ইহজীবন একটা ক্ষণিক বিশ্রামের স্থানমাত্র। সাধাসিধা চাল-চলনের দরুণ তাহারা যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করে, সেই স্বাধীনতার মর্য্যাদা তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। জাপানীর জীবন-প্রবাহ যেরূপ তরল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না; কর্ম্মের চেষ্টায়, সখের ভ্রমণে, তীর্থ যাত্রার জন্য; উহারা যেরূপ সহজে ঠাঁই-ছাড়া হইতে পারে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

জাপানী-জীবনের এই সরলতাই, উহাদের শ্রেষ্ঠতার ধ্রুব পত্তনভূমি। ইহা নিশ্চিত যে, য়ুরোপীয়দের ন্যায়, প্রাচ্যলোকের হাতের কাজ কিংবা মস্তিষ্কের কাজ ততটা ফলপ্রসূ নহে; কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, একজন য়ুরোপীয় অপেক্ষা কুড়ি জন প্রাচ্যজাতীয় লোক অধিক উৎপাদন করে; তাই, জীবন ধারণের জন্য,—ভাল করিয়া জীবন' ধারণের জন্য, একজন য়ুরোপীয় একলা যে ব্যয় করে, কুড়ি জন প্রাচ্যজাতীয় লোক একত্র মিলিয়া তাহার অধিক ব্যয় করে না। লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণ বলেন, যে সকল জাতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, হয় ত স্বয়ং প্রকৃতিই তাহাদের পরিপোষণের জন্য তাহাদিগকে বেশী ব্যয় করিতে দেন না। প্রাচ্য লোকেরা আমাদের অপেক্ষা সংযত, আমাদের অপেক্ষা ধৈর্য্যশালী, আমাদের অপেক্ষা বহুপ্রসূ,—সম্ভবত উহারাই জীবন-সংগ্রামে আমাদিগকে স্থানচ্যুত করিবে। আমাদের আরব্ধ সভ্যতার প্রচারকার্য্য আমাদের পরে উহারাই চালাইবে; আমাদের উৎকৃষ্ট শিল্পসকল উহারাই বজায় রাখিবে, উহারাই আমাদের বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার স্মৃতি রক্ষা করিবে। আমরা যেমন পুরাকালের বিলুপ্ত বিরাট-কায় জন্তুদিগের জন্য পরিতাপ করি না, ঐ সকল বিজ্ঞানাদির জন্যও আমরা আর পরিতাপ করিব না...

আর যাহাই হউক, জাপানী জীবনের সরলতায় যে একটা অনুপম কলা-সৌন্দর্য্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হার্ণ বলেন, দারিদ্র্য সৌন্দর্য্য-বোধকে ফুটাইয়া তোলে,—এই যে একটি আশ্চর্য্য তথ্য—এই তথ্যটি জাপানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। নগ্ন কাম্‌রায় কোন আস্‌বাব না থাকায়, জাপানীরা প্রায়ই তাহাতে শিল্পসামগ্রী রাখিয়া দেয়। সুসঙ্গত সুন্দর ভূষণে বিভূষিত কোন জাপানী কক্ষে বাস করিয়া যে কি আনন্দ হয়, তাহা হার্ণ উৎসাহের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। "Out of the East" (প্রাচ্যদেশ হইতে বহির্গত) এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায়, তিনি একটা পান্থশালার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"পান্থশালাটি যেন একটি স্বর্গলোক; পরিচারিকারা যেন স্বর্গের দেবী। কোন এক 'অবারিত বন্দর-নগরে' 'আধুনিক-ধরণের সমস্ত আরামের-সামগ্রী-সমন্বিত' একটা হোটেলে গিয়া ইতিপূর্ব্বে উঠিয়াছিলাম—সেই হোটেল ছাড়িয়া এইমাত্র এইখানে আসিয়াছি। আর একবার এই প্রশান্ত জাপানী কাম্‌রায় আসিয়া আমার কতই আনন্দ হইল! এখানে শীতল ও নরম মাদুরের উপর বসিয়া আছি, মধুরকণ্ঠ নবযুবতীরা খাদ্য পরিবেশন করি-তেছে, চারিপাশে সুন্দর শিল্পসামগ্রী! ঊন-বিংশ শতাব্দির সমস্ত উদ্বেগ হইতে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে মুক্তিলাভ করিলাম! প্রাত-

রাশের সময়, উহারা আমাকে কতকগুলি বাঁশের কঞ্চি, কতকগুলি পদ্মের গেঁড়ো ও একটি সুন্দর হাত-পাখা দিল। এই হাত-পাখার নক্‌সায়, একটা প্রকাণ্ড সাদা ঢেউ তটের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং উপরে, কতকগুলি সাগর-বিহঙ্গ উল্লাস-ভরে নীল আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। এই নক্‌সার অনুধ্যানে যে সুখ, তাহাতে ভ্রমণের পরিশ্রম সার্থক হয়। আলোকের জ্বলন্ত মহিমা, বজ্রের গতি, সমুদ্র-বায়ুর জয়োল্লাস—এই সমস্ত নক্‌সার মধ্যে একত্র সম্মিলিত। আমি উহা যখন দেখিলাম, তখন মনে হইল আমি একবার প্রাণ খুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠি।

"বারাণ্ডার (Cedar) 'সিডার' পিল্‌পার ফাঁকের মধ্য দিয়া, দেখিতে পাইতেছিলাম—ধূসর-বর্ণ সুন্দর নগরটি উপকূলের গঠন অনুসরণ করিয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে, হল্‌দে রঙ্গের অলস চৈনিক পোত-সকল নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে—দুই ধারে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হরিৎ শৈল, তাহার মাঝে উপসাগরের মুখ—পর-প্রারে, দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত গ্রীষ্মকালের জ্বালাময়ী মহিমা। দিগন্তদেশে, পুরাতন স্মৃতির ন্যায় অস্পষ্ট, পর্ব্বতের রেখা-চিত্র। একান্তে,—ধূসর আকাশ, কতকগুলি চৈনিক পোত, কতকগুলি শৈল,—সমস্তই নীলবর্ণ।

"এমন সময়ে ঘণ্টিকার মধুর ধ্বনির ন্যায় একটি কণ্ঠস্বর সহসা আমার কানে বাজিল,—কতকগুলি শিষ্টতার বাণী আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া-দিল। ঐ পান্থশালার কর্ত্রী, ধন্যবাদচ্ছলে, আমাকে "চায়ের উপহার" প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে মাথা নোয়াইলাম। গৃহকর্ত্রী অতীব তরুণবয়স্কাও প্রিয়দর্শন কিংবা প্রিয়দর্শন অপেক্ষাও কিছু বেশী; 'কুনিসাদা'-র, স্ত্রী-প্রজাপতিদিগের সহিত তাঁহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। পরক্ষণেই মৃত্যুর কথা মনে আসিল : কেননা, কখন-কখন সৌন্দর্য্য চিত্ত-মাঝে বিষাদের পূর্ব্বাভাস আনিয়া দেয়..."

জাপানীদের ভৌতিক জীবন অপেক্ষা, উহাদের নৈতিক জীবনের বর্ণনা করিতে হার্ণ বেশী ভালবাসেন। হৃৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল উৎকৃষ্ট দার্শনিক আলোচনা আছে, তাহার মধ্যে একটি আলোচনার নাম—"জাপানীর হাসি-মুখ"। যে সকল জাপানী য়ুরোপীয় প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে নাই, তাহারা যেমন চিরহাস্যময় এমন আর কেহ নহে। অন্যের নিকট, বিশেষত আত্মীয় স্বজনের নিকট সৌম্যভাব, প্রসন্নভাব প্রদর্শন করা জাপানীরা একটা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে : অন্যের মনে সুখের ভাব উদ্রেক করিবার ইহাই কি প্রকৃষ্ট উপায় নহে? অন্যের নিকট রোষ কিংবা দুঃখ প্রকাশ করা অধিকাংশ স্থলে নিরর্থক এবং সকল সময়েই অবিনয়ের কাজ। কোন জাপানী যুবককে ভর্ৎসনা করিলে কিংবা দণ্ডিত করিলে—যদি তাহা অন্যায্য না হয়—তবে সে হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করে : সে তাহার দোষ স্বীকার করে, ও তজ্জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি কোন জাপানী কোন কষ্টজনক সংবাদ কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে হাসিমুখে তাহা প্রকাশ করে। সংবাদের বিষয়টা যে পরিমাণে গুরু গম্ভীর হয়, হাসিও সেই পরিমাণে অধিকতর পরিস্ফুট আকার ধারণ করে। ঘটনাটি যদি অতীব ভীষণ হয়;

যেমন মনে কর—কোন প্রিয়জনের মৃত্যু, তখন মুখের স্মিতহাসিটি—মধুর ও দ্রুত হাস্যে রূপান্তরিত হইতেও পারে। কামাকুরার বুদ্ধ-মূর্ত্তির স্মিতহাস্যের ন্যায়, জাপানীর স্মিতহাস্যে সেই আনন্দের ভাব প্রকাশ পায় যাহা আত্ম-সংযম ও আমিত্ব-লোপ হইতে প্রসূত। এই রমণীয় ও বীরত্বব্যঞ্জক শিষ্টাচার,—জাপানের একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য। হার্ণ বলেন, অন্যত্র যেরূপ কোন ব্যক্তি-বিশেষের মধুর হাসি স্মরণ করিয়া তাহার অভাবে কষ্টবোধ হয়, সেইরূপ কোন জাপানী নগর কিংবা জাপানী গ্রাম হইতে বাহির হইলে, একটা সমগ্র জাতির হাসিমুখ স্মরণ করিয়া তাহার অভাবে কষ্টবোধ হয়।

"সুখী-জীবনের গূঢ়রহস্য জাপানীরা যেমন সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কার করিয়াছে, সেরূপ আর কোন সভ্য জাতি পারে নাই; যাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সুখের উপরেই আমাদের নিজের সুখ নির্ভর করে—সুতরাং আমাদের হৃদয়ের নিঃস্বার্থপরতা ও ধৈর্য্যের উপর আমাদের জীবনের সুখ নির্ভর করে—এই কথাটি আর কোন জাতি, জাপানীদের ন্যায় ভাল করিয়া বুঝে নাই।"

হার্ণ স্বীকার করেন,—এই সস্মিত সৌম্য-তার মধ্যে, একটা অসাধারণ বীর্য্য, একটা অসাধারণ সাহস, ইজ্জৎ-সম্বন্ধে একটা তীব্র বোধশীলতা, প্রচ্ছন্ন আছে; কখন কখন, এইরূপ স্মিতমুখের আবরণে, বৈরনির্য্যাতন চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতায় পর্য্যবসিত হয়। হার্ণ, জাপানীদের এই চরিত্রকে জাপানীদের একটি কৌতুকজনক শিল্পসামগ্রীর সহিত নিপুণভাবে তুলনা করিয়াছেন। সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একটা বাক্‌সোর ভিতরে, দামী রেশমের একটা ছোটো থলে;—এই থলের মধ্যে আরও ছোট আর একটি অন্য জাতীয় রেশমের থলে; ইহার ভিতরে আবার আর একটি থলে—এইরূপ পরপর। একটার পর একটা—এইরূপ সাতটা থোলে খুলিবার পর, শেষ থলের মধ্যে, আদিম ও স্থূলধরণের শুধু একটা পুরাতন চীনে' মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। সেইরূপ, শিষ্টতা, সৌকুমার্য্য, ধৈর্য্য নিঃস্বার্থ-পরতা প্রভৃতি কতকগুলি বহিরাবরণের দ্বারা জাপানী চরিত্র সমাচ্ছাদিত; কিন্তু এই সকল রমণীয় অবগুণ্ঠনের অভ্যন্তরে, একটু কাদামাটি আছে—মালাইজাতিসুলভ ভীষণ ভীতিজনক সৌম্যশান্তভাব ও মোগোল জাতিসুলভ জ্বলন্ত হৃদয়ের আবেগ—এই উভয়েরই সমাবেশ দেখা যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অরণ্য-স্বর্গ।

(ওমারখৈয়াম হইতে অনুবাদিত)

হেথা এই বৃক্ষতলে শুধু যদি আসে
একখণ্ড রুটি আর এক পাত্র সুরা
তার সাথে থাকে কাব্য—আর মোর পাশে
তুমি থাক, গাও গান মাতায়ে অরণ্য,
সে অরণ্য স্বর্গভূমি!—কোথা স্বর্গ অন্য?

শ্রীমণিমাল গঙ্গোপাধ্যায়।

কাব্যে বর্ষাচিত্র।

(২)

ভারতের বর্ষা শুধু মানবের উপভোগ্য নহে। মানব এবং মানবেতর প্রাণী ও অপ্রাণী-রাজ্য অদ্বৈতভাবে সমানধর্ম্মীর ন্যায় ইহার আনন্দ উপলব্ধি করে।

একবার চক্ষু ফিরাইয়া ইউরোপ ভূমি দেখি। ইউরোপীয় কবিতে এ সকল ভাব থাকিতেই পারে না। ইংলণ্ডের কাব্যরাজ্যে ত বর্ষাকালের স্থান অতি নগণ্য, সেখানকার শীতপ্রধান দেশের সারাবর্ষব্যাপী দুর্দ্দিনে বর্ষার তেমন ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য নাই—যতটা আছে ততটা দেখিবার জন্য শীতের চোটে অগ্নিকুণ্ড ছাড়িয়া কোন কবিকে বাহির হইতে শোনা যায় নাই।

ইংরাজ-কবি শেলির সমগ্র কাব্যগ্রন্থে ঋতু সম্বন্ধে দুই তিনটিমাত্র কবিতা আছে;—অথচ ইংরাজ কবিসমাজে শেলিরই একটু ভারতীয় ভাব ছিল অর্থাৎ স্থূল বস্তু-জগৎ হইতে দৃষ্টিসংহরণ করিয়া উহাকে প্রাণসত্ত্বায় পরিণত করিবার একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ভারতে এই গুণগত দিক্‌টা দেখা কবিদের সহজধর্ম্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, গজেন্দ্রগমন হইতে কল্পনামূলে মৃদুমন্দ গমনটুকু ছাঁকিয়া লইয়া সুবৃহৎ হস্তীটাকে অদৃশ্য করা ইউরোপীয় কবির পক্ষে সম্ভব নহে।

শেলির উপরি উক্ত কবিতাগুলি অকিঞ্চিৎ-কর—অবশ্য বর্ষাসৌন্দর্য্যের গুরুত্ব হিসাবে। এই কবিতাগুলিও ইতালীতে রচিত হইয়াছিল। Pisa এবং Leghoraএর আকাশ-তলে, 'The Cloud' 'Summer and Winter' এবং 'Autumn—a dirge' এই কবিতাগুলি রচিত হয়। Autumnএর চিত্রে বর্ষার কিছু আভাষ আছে :—

The chill rain is falling, the nipped
worm is crawling
The rivers are swelling, the thunder
is knelling
The blithe swallows are flown
and the lizards each gone
To his dwelling.'

'Summer and Winter' কবিতাটিতে বর্ষার কিছু নাই। কবিতাটি অন্য হিসাবে সুন্দর হইলেও বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

The cloud কবিতাটি মেঘের আত্মোক্তি। কবিতাটি অতি মধুর, এবং শেলির স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এক জায়গায় আছে :—

I sift the snow on the mountains below
And their great pines groan aghast
And all the night 'tis my pillow white
While I sleep in the arm's of the Blast
Sublime on the towers of my skiey bowers
Lightning my pilot sits
In a cavern under is fettered the Thunder
It struggles howls and sits.

এই চিত্রে বৈচিত্র্য আছে, প্রাচুর্য্য আছে কবিদৃষ্টির অবিনশ্বর রেখাপাত আছে কিন্তু ভারতের বিপুল উদার গাম্ভীর্য্য, গৌরব ও মন্ত্র নাই।

Ode to the West Wind কবিতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—বর্ষাচিত্রের উল্লেখযোগ্য কোন কথা তাহাতে নাই।

সৌন্দর্য্য-নেশায় আত্মহারা কিট্‌স্‌এর কাব্যগ্রন্থের সহিত যাহাদের একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে তাহারা জানেন, অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধান দেশের বর্ষা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সৌভাগ্য কিট্‌সের হয় নাই। ইংরাজ-সাহিত্যে যে কবি অপূর্ব্ব অনন্যলভ্য স্থান লাভ করিয়াছে তাহার কাব্যে এই অভাব ভারতীয় সৌন্দর্য্যপিপাসুর চিত্তে আঘাত করে সন্দেহ নাই। অবশ্য Endymion, Lamia এবং Otho the gerat প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে দু' একটা ক্ষুদ্র বর্ষা-চিত্র উপমাস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমস্ত কবির কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি হইলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার স্থান নাই—এইজন্য ইংলণ্ডের আর দু' একটি প্রধান কবির কাব্য উল্লেখ করিব।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অশীতিবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়া কবিতাগুচ্ছের যে অভিধান রচনা করিয়াছেন তাহাতে বৃষ্টিপাত এবং উহার আনুষঙ্গিক আড়ম্বরের কোন চিত্র না পাইবার কারণ নাই; কিন্তু এই বর্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জীবনের কোন বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে মনে হয় না। এই বর্ষা-চিত্র তাঁহার জীবনতটে তেমন বিশেষভাবে আঘাত করে নাই—গবাক্ষজালের প্রান্তস্থিত তন্তুজালের ন্যায় স্থানবিশেষমাত্র অধিকার করিয়া আছে। বিস্ময়ের বিষয় তাঁহার "মেঘের প্রতি' শীর্ষক কবিতাতেও মেঘের বিশেষ কোন বর্ষামূর্ত্তি সৌন্দর্য্য নাই।

ঋতু সম্প্রদায় সম্বন্ধে দস্তরমত সাজসজ্জা করিয়া কাব্য লিখিতে বসিয়া Thompson মহাশয়ও এ বিষয়ে আমাদের তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন নাই। বালকের ন্যায় Thompson সাবানের জলে, পাইপের ভিতর দিয়া 'সারা মধ্যাহ্ন ফুৎকার দিয়া যে বুদ্বুদ্ অট্টালিকা আমাদের আনন্দ সঞ্চারের জন্য রচনা করিয়াছেন তাহার বর্ণ বৈচিত্র সূক্ষ্মগঠন এবং লঘু সৃষ্টি রচনায় আমাদের তৃপ্তি হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু যাহা এই কাব্যে সহজেই আশা করা যাইতে পারে তাহার দৈন্য এবং অভাব দেখিয়া চক্ষু ফিরাইতে হয়।

নবাব-কবি টেনিসনের বহুযত্নে লালিত পালিত চারাগাছগুলি ও কখনও মুক্তবর্ষার আনন্দ স্পর্শ অনুভব করে নাই। তাহা শুধু সেই হট্-হাউসের ষ্টীমের মদিরা রসে পুষ্ট হইয়াছে। ডেইজিকুল, বা হনিসাকল্, ম্যারিগোল্‌ড বা কাউশ্লিপ ফুলের তোড়া সাজাইয়া ড্রইংরুম-রূপী বিচিত্র কারখানার শোভাবৃদ্ধির জন্য আরণ্য বায়ু বা মেঘচ্যুত সলিলকণার প্রয়োজন হয় না। আরণ্য ব্যাপার, প্রকৃতির বিরাট বিপ্লব টেনিসন কতটা ভাল বাসিতেন জানি না তবে উহা হইতে অনেক সময় দূরে থাকাই নিরাপদ মনে করিয়াছেন। এবং Royal Botanic Garden কিম্বা যাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে পাঁচ সাতটি মানবের প্রয়োজন এমন সৌখিন ফুল তাঁহার বেশ লাগিত। এ জন্য নিরস্ত পাদপ ইংলণ্ড ভূমিতে এরণ্ডরূপী যে তথাকথিত একমাত্র বৃহৎ ওক্‌বৃক্ষ আছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে

অগ্রসর হইয়া উহার স্বাভাবিক আরণ্য নিবাস হইতে টানিয়া Abbey walls এর সমীপে আনিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে ঐ ওক্-বৃক্ষের শাখায় অনেক ওলিভিয়া Olivia অনেক ওয়াণ্টার, Walter, অনেক পাদ্রী এমন কি ব্লাক হ্যামীকে পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। এই একমাত্র বৃক্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্লান্তি জন্মে। যাহা হউক টেনিসন্ ইহাতেই তৃপ্ত ছিলেন। Voyage of Macldune নামক কবিতায় নীরবদ্বীপ, চীৎকারদ্বীপ, পুষ্পদ্বীপ, ফলদ্বীপ, প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের কোথায়ও বর্ষার কল্লোল শোনা যায় না। In Memoriumএর এক জায়গা মনে হইতেছে—

Sweet *after showers* ambrosial air
That rollest from the gorgeous gloom.

সলিলকণাবাহী বৃষ্টি স্নাত হাওয়া বুঝি টেনিসনের ভাল লাগিত না।

এইখানেই ইংলণ্ডের বর্ষা-কবি-চিত্র-আলোচনা শেষ করিতে পারি; কিন্তু সুদূর শৈল-খচিত কেলেডোনিয়ার একটি মধুর স্নিগ্ধ আহ্বানের জন্য তাহা সম্ভব হইতেছে না। গ্রেট ব্রিটেনের শীতবর্ষার বিশেষত্ব এই আরণ্য কবির হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে,—তাহাতে প্রাচ্য কবির ডমরুধ্বনি নাই কিন্তু শীতার্ত্ত আইভিলতা বেষ্টিত স্কচ হার্পের গুঞ্জন-ধ্বনির মাদকতা অপূর্ব্ব আলাপে ঘনাইয়া আসে। এই কবি রবার্ট বার্ণস্।

শীতপ্রধান দেশের বৃষ্টিপাত একটি দুর্ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় এবং প্রায় সকলেই এই শীতবর্ষার মালিন্য চিত্র অঙ্কনের সহায়তার জন্য জগতের যাবতীয় শোক দুঃখ সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু বার্ণস্ এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি উপলব্ধ নিরানন্দ হইতে অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন—ইহার অমলিন সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়পটে ধরা পড়িয়াছে। জগতে সৌন্দর্য্য শুধু দুঃখ দিতে পারে না উহা চিরকাল আনন্দ স্রোত বহাইয়া দেয়। winter শীর্ষক কবিতায় আছে—

The sweeping blast, the sky overeast
The joyless winter day,
Let others fear, *to me more dear*
Than all the pride of way !

তারপর :—

The tempest howl, *it soothes* my soul
My griefs it seems to join

বার্ণস্ তাঁহার Common Place Bookএ লিখিয়াছেন :—

There is something even in the—
"Mighty tempest and the hoary waste
Abrupt and deep stretched over the
buried earth."—

Which raises the mind to serious sublimity favorable to everythlng great and noble. There is scarcely any object which gives me more—I do not know if I should call it pleasure—but something which exalts me—something which enraptures me than :to walk in the sheltered side of a wood or high plantation in a cloudy winter-day and hear the stormy wind howling among the trees and rolling over the plain.

কার্লাইল, বার্ণসের Winter Night শীর্ষক কবিতাটির স্থল বিশেষ খুব প্রশংসা করিয়াছেন ইহাতেও মেঘ বৃষ্টি ঝড় প্রভৃতির চিত্র আছে।

ইংরাজ কবিদের নিকট বিদায় লইবার সময় ম্যাথু আর্ণল্ডের Rugby Chapelএর ঝটিকা-চিত্র আমার মন্দ লাগে নাই একথাটি বলিতে হইতেছে—কিন্তু তাহাও সামান্য ব্যাপার মাত্র।

ফরাসী সাহিত্যের চিত্রও এবিষয়ে দূরগামী নহে। ভিক্টর হিউগোর Les Quatree Vents De L'espirit নামক কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত মেঘ ও পক্ষীর উদ্দেশে লিখিত কবিতা-দ্বয়ে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশেষ আশাজনক নহে।

এখানে বলা প্রয়োজন, ইউরোপ কিংবা আমেরিকার সাহিত্যে কি নাই তাহা দেখান আমার ততটা উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য আমাদের কি আছে তাহা লক্ষ্য করা মাত্র। কাজেই ফরাসী কবি Gantier বা Musset কিংবা আমেরিকার নব্যযুগের কবি Lowell বা Pal অথবা Bryant কিংবা Whiteman সম্বন্ধে আলোচনা করার স্থান ইহা নহে। বর্ষা-চিত্রে বিশ্বসাহিত্যে তাহাদের স্থান বিশেষ উচ্চ নহে। এজন্য এমার্সনের Snow Storm নামক কবিতাটি এক হিসাবে সুন্দর হইলেও আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

এই বর্ষাচিত্রে বাঙ্গলা সাহিত্যের আসন দেখিয়া আমরা সম্ভ্রমে ও গৌরবে আত্মহারা হই। বাঙ্গলার কবি জয়দেব, গীতগোবিন্দরূপী অপূর্ব্ব বসন্ত-বাঁশরীর আওয়াজ রচনার পূর্ব্বে বর্ষার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই একটি শ্লোক শৃঙ্গার রস পূর্ণ মঙ্গলগীতি রচনা পথে বিচিত্র অভিসার বলিয়া ভ্রম হয়। বসন্তের সম্ভোগ-বর্ণনাতেও কবি বর্ষাকে একেবারে অবহেলা করেন নাই।

বাঙ্গলাসাহিত্যের এই গৌরবসম্ভায় ভারতচন্দ্রের বর্ষাবর্ণনার কৌতুকমিশ্র ব্যাপারে পাওয়া যায় না বলিলে আমাদের বিশেষ কোন হানি হয় না :—

ভুবনে করিল তূর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ
বিরহিনী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভসা।
বিদ্যুতের চক্‌মকি ডাহুকের মক্‌মকি
ইত্যাদি।

কিংবা ঈশ্বরগুপ্তের "বর্ষার অভিষেক" বা "বর্ষাকালে মানবের অবস্থা" প্রভৃতিকে বিশেষ প্রশংসা না করিলেও চলে :—

রান্নাঘরে কান্নাকাটি, ভিজে কাঠ ভিজে মাটি
কোনমতে নাহি জ্বলে চুলো
নাকে চোখে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছে করে,
চূলো শুদ্ধ চোলে যায় চূলো !

কারণ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ এ ক্ষেত্রে যাহা দান করিয়াছেন তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধনরত্ন আমাদের থাকিলেও কেবল ইহাদের লইয়া আমরা জগতের সাহিত্য দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারি। এই বর্ষাচিত্রে কোন শ্রেষ্ঠতম হৃদয় হইতে অনেক মহার্হ কার্য্য পাইলেও মাঝে মাঝে বৈষ্ণব কবিদের সারঙ্গ ঝঙ্কারের মায়াজালে আত্মহারা হইতে হয়।

বৈষ্ণব কবিরাজ্যে—অবশ্য সংস্কৃতেও—বর্ষাঋতু, আকাঙ্ক্ষা, আশা, বিরহ, অভিসার প্রভৃতিকে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয়। অতৃপ্ত পিপাসা জাগিয়া উঠে এবং উহার চরিতার্থতার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনটা মেঘের মতই ছুটিয়া বেড়ায় এবং উহার ঘনকৃষ্ণ বক্ষে সুখময় নানা বেদনা-স্মৃতি বহন করিয়া চলে। কিন্তু ইহা শুধু আয়োজনের কালমাত্র নহে—বসন্তের উচ্ছৃঙ্খল তৃপ্তি

বর্ষায় সম্ভব না হইলেও ইহার মাঝে প্রথম হৃদয় বন্ধনের শ্রেষ্ঠতম সুখসম্ভোগও রহিয়াছে।

বিদ্যাপতির "শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে" তৃষ্ণার্ত্ত রাধা কানুর রূপবর্ণনায় বলিতেছেন :—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সম্বেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে॥

ভারতে নবমেঘোদয়ে সমগ্র প্রাণীরাজ্যে যে চাঞ্চল্য এবং আবেগ জাগিয়া উঠে তাহা যেন কৃষ্ণানুরাগিণীর ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে— এ যেন জীবজগৎ ঘনকৃষ্ণ মেঘ-পুঞ্জ দেখিয়া বলিতেছে :—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ!

বিদ্যাপতি যেন সহজ কল্পনার তীক্ষ্ণ শক্তিতে রাধার আকাঙ্ক্ষা এবং অতৃপ্তি চিত্রণকালে অতৃপ্তি এবং আকাঙ্ক্ষার সহিত উপমেয় এক মাত্র পদার্থ অর্থাৎ বর্ষার ঝামর ঝামর মেঘপুঞ্জ এবং সৌদামিনীকে কৃষ্ণরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। জগতে সমানধর্ম্মী সহজেই জড়িত হইয়া পড়ে। অশ্রুপাতকেও কবি বর্ণনা করিতেছেন :—

শাঙন ঘনসম চারু দুনয়ান
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ।

তারপর বিরহ বর্ণনায় বর্ষার চিত্র আসিয়া পড়িয়াছে—এ চিত্র বড়ই মর্ম্মঘাতী। বৈষ্ণব কবিদের সহজেই হৃদয় আর্দ্র করিবার এবং চিত্তের কোমল দিক্‌কে আহত করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে :—

হাম ধনী ভাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নহি সঙ্গ
বরিষা পরবেশ পিয়া সো দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ।

এই ক্রন্দন-বিলাপে বড় আকর্ষণ রহিয়াছে— ছন্দ এবং ভাষার লালিত্যের ভিতর দিয়া আপনাআপনি একটি স্বপ্নমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে।

অতি স্বল্পকথায় বিদ্যাপতি বর্ষা-চিত্র আঁকিয়াছেন।

সজনি! আজ শমন দিন হোয়!
নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর।
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর
মিলব পঁহু গুণবন্ত।

ভাদ্রের বর্ষার যে বিরহ দুঃখ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাপতির অমৃত লেখনী হইতে আরও একটু বর্ষা-কথা পাই :—

সখি হামারি দুখের নাহি তর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরী পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

কাব্যে বর্ষাচিত্র আলোচনে আর একটিমাত্র বৈষ্ণব কবির চিত্র অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করিব। গোবিন্দদাসের বর্ণনাক্ষমতা বিস্ময়-জনক। কৃষ্ণকে সাধারণতঃ নব জলধরের সহিত উপমা দেওয়া হয়। গোবিন্দদাস কৃষ্ণকে কখনও

সজলজলদতনু ঘন রসময় জনু
রূপে জিতল কতকোটি কুসুম-ধনু॥

কখনও—

চাঁচর চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
গুঞ্জা মঞ্জুলমাল।
পরিমল মিলিত ভ্রমরীকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল।
মনমথ মথন ভাঙযুগভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল।

ইত্যাদি নানাভাবে বর্ণনা করিয়াও যেন তৃপ্ত হন নাই। যাহা হউক এই প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন নাই। গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে বর্ষার কয়েকটি চিত্র উদ্ধৃত করিয়া গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ।
অন্তরে উরল শ্যামর ইন্দু
উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু॥
অবজনি সকলি করহ বিচার
শুভক্ষণে শুভ ভেল পহিল অভিসার॥

অভিসারের বর্ণনাও আছে :—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট,
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল
বারি কি বারই নীল নিচোল।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার,
হরি রহ মানস সুরধনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত।
দশদিশ দামিনী দহই বিথার
হেরইতে উচকই লোচন তার।

ইত্যাদি। আবার :—

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ
কত শত কোটি শবদ জীউ কাঁপ।
তহিঁ দিঠি জারত বিজুরীক জ্বালা
ইথে জানি ছোড়বি মন্দির বালা।
ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি।

গোবিন্দদাসের দ্বাদশ মাস বর্ণনায় আষাঢ় ও শ্রাবণের এই বিবরণ আছে :—

মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাঁতি
নীরদ মুরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি
শাঙন সঘন গগনে ঘন গরজন
উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী
জীবন কণ্ঠহি লোল।

নব্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে রবীন্দ্রবাবুর বর্ষা শত কল্লোলে মনোরম ভাবে নিনাদিত। দুএকটি কবিতা তুলিয়া তাহার শোভা বুঝান যায় না। সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বিএ, বি এল।

বিলাতী রমণী।

(তৃতীয়)

দুইটি প্রবন্ধে আমি "বিলাতী রমণী" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কতক লিখিয়াছি। আরও গুটিকতক কথা সেই সম্বন্ধে বলিবার আছে বলিয়া এই তৃতীয় প্রবন্ধটি লিখিতেছি। এখানে মেমদের দেখিয়া বিলাতী রমণীদের সম্বন্ধে সবাকারই ভুল ধারণা আছে। তাহাদের সহিত দূরে দূরে দেখা হয় ও প্রায়ই কোনও রূপ মিশিবার ও কথা কহিবার অবসর হয় না। সুসজ্জিত অবস্থায় স্থান বিশেষে মাত্র দেখিয়া মনে হয় তাহারা বড়ই বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ও অলস। কিন্তু তাঁহাদের নিজের দেশে সাধারণ লোককে দেখিলে—সে ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ সহজেই বুঝান যায়। নিজের স্থান ছাড়িয়া আসিলে মানুষ ঠিক তেমনটি আর থাকে না। নূতন স্থান ও অবস্থার গুণে শরীর মনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সকলেরই পক্ষে এরূপ পরিবর্ত্তন অল্পবিস্তর হইতেই হইবে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা। বিভিন্ন দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন গাছপালা জন্মায়—সেইরূপ লোকেরও দেহ ও প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইংরাজরা অর্থ উপায় করিতে আসেন ও অনেক অর্থ উপায়ও করেন ও অনেক বিষয়ে খরচও এ সব দেশে কতক কম, সেই কারণে বিলাস ও আলস্য সহজেই আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া প্রধান কথা, স্থানের আব্ হাওয়া। গরম দেশে মানুষের শরীর মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই অনেক শতাব্দী থাকিয়া আমাদের জাতিগত এই দোষ দাঁড়াইয়াছে ও তাঁহাদেরও অনেক দিন থাকিলে কতকটা এইরূপই হয়।

কিন্তু বিলাতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে দুর্ম্মূল্য, ও শীতের দেশে—মানুষকে অহরহ পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। শীতপ্রধান দেশে বসিয়া থাকা ক্ষতিকর ও কষ্টকর—তাতে রক্তস্রোত কমিয়া যায়। তাছাড়া সে দেশে তাদের নিজের খাবার নিজের দেশে উৎপন্ন হয় না বলিয়া—বাহির হইতে লইয়া যাইতে হয়। যা কিছু উৎপন্ন দ্রব্য সেস্থানেই জন্মায় তা অনেক কষ্টে। তাই সেখানে সবাই পরিশ্রমী ও অনেক বেশী বুদ্ধিজীবী ও তৎপর। যাহারা উপযুক্ত নয় এমন লোক সে দেশে বাঁচিতে পারে না ক্রমেই ধ্বংস হইয়া যায়। তাই সে দেশে এত বলবান বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী লোকেরই বসতি হইয়াছে। আমাদের এ গরম ও উর্ব্বরা দেশে দুর্ব্বলেরাও কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তাই আমাদের দেশে এতগুলা অপগণ্ডের বাহুল্য।

শীতপ্রধান দেশ সচরাচর অধিকতর স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সকল রোগের মূল। তার কারণ আর কিছুই নয়—রোগের কীটাণুগুলি গরম দেশেই বেশী বাড়ে ও ভীষণ হয়। শীতে তাহাদের জড়তা আসে। তাই আমাদের দেশে এত ম্যালেরিয়া কলেরা, প্লেগ ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব। তাহাদের দেশে সে সব তত বেশী নাই। তা ছাড়া

সে দেশে দেশের স্বাস্থ্যের দিকেও রাজ-সরকারের কত দৃষ্টি, আহার্য্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব কত বেশী। আর সকল লোকেই সুশিক্ষা পায়। এই সকল নানা কারণে সে দেশের সকল লোকেরই শরীর মন আমাদের দেশ হইতে অনেক সুস্থ ও সবল। এক শীতের অসুবিধা হইতে দেশের এত মঙ্গল ঘটিয়াছে। আর এদেশে অনবরত মেলেরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া, লোকগুলি এত দুর্ব্বল কাতর ও দীনহীন।

দেহের স্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতা আপনিই স্ফূর্ত্তি পায়। ব্রিটেনের আবার এই একটি বিশেষত্ব। অতি আদি অবস্থা হইতে প্রজাসত্বর জন্য লোকেরা রাজার সহিত অহরহ বিবাদ করিয়াছে। তারই ফলে "ম্যাগ্‌নাচার্টা" "Magna Charta" তারই ফলে "Habeas Corpus Act" "হেবিয়াস্ কর্পাস্ একট্" তারই ফলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র। আর তার নিকটবর্ত্তী স্থান জার্ম্মাণী দেখ। সেখানে তাদের অতটা সহজ-সিদ্ধ স্বাধীনতাপ্রিয় ভাব নাই। লোকেরা প্রজাসত্ব লইয়া এতদিন অত কলহ করে নাই। আমাদের দেশের পূর্ব্বেকার অবস্থার মত রাজার হাতে সমস্ত সঁপিয়া দিয়া—তাহারা আপনারা জ্ঞানচর্চ্চা করিত। সেই কারণেই আমাদের দেশের সহিত "জার্ম্মণ দর্শনের" এতটা মিল। বিশেষ চিন্তারাজ্যে সে ঐক্য এতটা ঘনিষ্ঠ যে আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদের ও অন্যান্য মতের সঙ্গে সেখানকার দার্শনিকের অনেক মত হুবহু মিলে।

এত স্বাধীনতাপ্রিয়ভাব ব্রিটনের বিশেষত্ব কিন্তু তবুও তাহাদের দেশে রমণীজাতির সত্ব আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক কম। পার্লামেণ্টে তাঁহাদের ভোট নাই। আর আইন-ব্যবসায় ও অন্যান্য বিষয়েও তাঁহাদের অধিকার নাই। তা ছাড়া এমন অনেক উচ্চ বিদ্যালয় আছে যে স্থানে মেয়েদের ভর্ত্তি করা হয় না। ভর্ত্তিকরার প্রস্তাবে তুমুল আপত্তি হইয়াছিল। সেইরূপ ভোট দিবার কথাতেও কতপ্রকার আপত্তি। ভোট সত্ব পাইবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে সচেষ্ট এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই Suffragists "সাফ্রেজিষ্ট" নামে আখ্যাত। লণ্ডনে আমি তাঁহাদের অনেককে দেখিয়াছি।

তাঁহারা ভোট প্রভৃতি ব্যাপারে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর। দেহ মন প্রাণ সঁপিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী। সকল প্রকাশ্য স্থলেই তাঁহাদের এক একটি দল আছে। "বালথান" একজিবিসনে তাঁদের একটি প্রধান আড্ডা আছে। অনেক লোক সেই স্থান দেখিতে গিয়া তাঁহাদের খাতে চাঁদা দেন। তাঁহারাও সেই স্থানে দুই বিষয়ে নানারূপ কাগজ ও পেমফ্লেট্ আদি বিতরণ করেন। তাহাতে ওজস্বিনী ভাষায় রমণীজাতির অধিকার সম্বন্ধে দৃঢ় যুক্তি দেখাইয়া অনেক সুন্দর কথা লিখা আছে। তাঁহাদের অনেক গভীর বক্তৃতা করিতেও শুনিয়াছি। তেমন সতেজ ও যুক্তিপূর্ণ কথা সচরাচর শুনা যায় না। "পজেটিভিষ্ট্ সোসাইটিতে" যে দিন ভারবর্ষের গোলমাল সম্বন্ধে কথা হয়—সে দিন তাঁহারা অনেকে ভারতবর্ষের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। বড় বড় লোকের বক্তৃতাও তাঁহাদের সামান্য ভাষায় সে সব কথার কাছে

লাগে নাই। সবল লোকের মুখ হইতে তাদের অন্তরের কথাগুলিতে যেমন অন্তরে বিদ্যুৎ বহিয়া যায়—এ সব সেইরূপ কথা—একটি মানুষও সেখানে তেমন ভাবে বলিতে পারেন নাই।

সবাই যে এইরূপ রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া লাগিয়া থাকেন তাহা নহে। কেহ কেহ বা দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বড়ই মনোযোগী, তাঁহারা নানারূপ কার্য্যদ্বারা দেশের লোকের স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। লোকদের এই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া ও কোনও অস্বাস্থ্যকর স্থানের কথা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ দেওয়া ইত্যাদি কাজ তাঁহাদের বেতনহীন নিস্বার্থ কাজ। তাতে দেশের যে কত হিত হইতেছে তা বলা যায় না। শত মুদ্রা খরচ করিয়াও বেতনভোগী দাসদের দিয়া সে কাজ হয় না। দুই দিন যখন, মহাত্মা পরলোকগত দেশহিতৈষী মিষ্টার উমেশচন্দ্র বনার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়া ছিলাম তখন এক দিন ক্রইডনের এক ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে এইরূপ একটি রমণীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। বৎসরে কোথায় কত শিশুর জন্ম ও মৃত্যু হয় এই বিষয়েই তাঁহার অনুশীলন। এই বিষয়ে কত সংবাদই যে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন তা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

আবার এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা ছেলেদের শিক্ষা বিষয়েই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সকল সভ্য জগতে আজ কাল শিশুর আদর বাড়িয়াছে। তাঁহারা এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে শিশুদের সুশিক্ষাতেই দেশের উন্নতি, এই জন্য সে কার্য্যে অনেক লোক ব্রতী; সে সমিতিগুলির নাম—Child Study Society অর্থাৎ শিশু জীবনের শরীর মনের সম্বন্ধে জ্ঞান চর্চ্চার জন্য এই সমিতি। সেই অনুসারে তাদের শিক্ষা দিলে, শিক্ষার ভাল ফল হয়। এ সমিতির উৎপত্তি, সকল নূতন কর্ম্মের উৎপত্তি যে স্থানে হইয়া থাকে সেই স্থান—অর্থাৎ আমেরিকাতেই "চিকাগো একজিবিসনে" হইয়াছিল। এখন সে স্থান হইতে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে উহা প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের এদেশে যে স্থানে বালগোপালের পূজা হয় সেখানে ছেলেদের কি অযত্ন। তেমনি এত দেবীমূর্ত্তি উপাসনা করিয়াও স্ত্রীজাতির প্রতিও নির্দ্দয় ব্যবহার। জন্ম হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত যন্ত্রণা দেওয়ার অবধি নাই। সকল বিষয়েই কত সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে। কলিকাতা সহরে যত শিশু জন্মায় তার তিনটির মধ্যে একটী শিশু মারা যায়। আর শিশুকালে অতি হীন অবস্থা ও অযত্নে রাখিয়া ও অনবরত শাসিত ও তাড়িত হইয়া, আমাদের দেশের লোকগুলি ক্রমে ক্রমে কিরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, শরীরে স্বাস্থ্য নাই, দেহে বল নাই, মনে সাহস নাই—যেন জীবনমৃত অবস্থায় দিন কাটায়।

এই যে সকল রমণীর কথা বলিলাম তাঁহারা অনেকেই চিরকুমারী। জীবনের সকল উত্তম সকল ভালবাসা ঐরূপ এক মহাব্রতে উৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদের দেশের বিধবাদেরও অজানিতভাবে এইরূপ পরোপকার ব্রত করিতে অহরহ দেখা যায়—কিন্তু নিত্য দেখি বলিয়া সে কথা মনে লাগে না। তাঁহারা পরের জন্যই জীবন কাটাইয়া থাকেন।

আমাদের বাড়ীতে ও আশে-পাশে কত লোকেই যে এমন ব্রতে নিযুক্ত দেখেছি তা আর বলিবার কথা নয়। তাঁহারা প্রাণপণে পরের জন্য খাটিয়া থাকেন। তাঁহাদের যদি কেহ যত্নে রাখে ও উপযুক্ত প্রণালী শিখাইয়া দেয় সংসারে আরও কতই না জানি শান্তি ও উন্নতি সংঘটিত হইতে পারে।

এ দিকে যেমন কতকগুলি দেবীমূর্ত্তির ছবি দেখা গেল আবার অপর দিকে সম্পূর্ণ আর এক অবস্থা দেখা যায়। বিলাতের যে সব স্থানে কলকারখানা আছে সেই সকল স্থানে অনেক মেয়েরা কলে কাজ করে ও বেশ ভাল বেতন পায়। কিন্তু সে খাটুনী এমন কষ্টকর ও দীর্ঘকালব্যাপী যে তাহাতে তাহাদের সংসার ধর্ম্ম দেখা কিছুই চলে না। তাহাদের অনেকেই বিবাহিত। স্বামী স্ত্রী উভয়েই কাজ করে। বয়ন প্রভৃতি অনেক কাজই স্ত্রীলোকে পুরুষের অপেক্ষা ভাল করিতে পারে সেই কারণে ওদের বেতনও অনেক বেশী। এক একটি স্ত্রীলোক এই কাজে সপ্তাহে ৩০ সিলিং উপায় করে। এক একটি পুরুষ ১৮ শিলিং মাত্র। সে সকল স্থানে স্ত্রীই অর্থ উপায় করিয়া সংসার চালায় বলিলেও চলে। তাতে ছেলেপুলে গুলির যে কি কষ্ট তা বর্ণনারও অতীত। সকাল ছটার সময়ে কলে হাজির হইতে হয় ও রাত্রি ৬টার সময় ছুটি হয়। তাই ত্যরা অতি প্রত্যুষে ছেলেগুলিকে কোলে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া এক একটি আড্ডায় ছেলেগুলিকে জমা রাখে। সেখানে প্রতিছেলের জন্য তিনপেনী করিয়া দিতে হয়। তাতে ছেলেদের বড়ই অযত্ন ও কষ্ট হয়। আমি এডিনবারাতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি অতি প্রত্যুষে এক রমণী তার ছোট ছেলেকে কম্বলে জড়াইয়া কোলে লইয়া ফ্যাক্টরীতে কাজে যাইবে বলিয়া সেই আড্ডায় তাকে জমা রাখিতে যাইতেছে। ছেলেটির চোখে তখন বড়ই ঘুম—ও সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদচে, এরূপে ছেলেদের স্বাস্থ্যের যে কি ক্ষতি হয় তা সহজেই বুঝা যায়। স্কটলণ্ডে Ricket নামক শিশু-রোগ সচরাচর যত হয় এমন আর কোনও দেশে দেখা যায় না। সে রোগে শিশু অনাহারে, ও অসুস্থতায় বাড়িতে পারে না। তার হাড়গুলি নরম বাঁকা ও দেহ রক্তহীন ও চর্ম্মসার হইয়া থাকে। Edinburgh Castle হইতে যে পথটি Holyrood Palaceএর দিকে গিয়াছে সেই রাস্তাটির নাম High Street,—এই রাস্তাটিতে খৃষ্টানধর্ম্ম-সংস্কারক "নক্স"এর গীর্জ্জা আছে। সে রাস্তায় এইরূপ শ্রেণীর অনেক লোকের বাস। সেই রাস্তা দিয়া চলিলেই দেখা যায় কত—বিকল অঙ্গ নির্জ্জীব হাত পা বাঁকা ছোট ছেলে রাস্তায় বেড়াইতেছে, অথচ সে জলবায়ু এত ভাল এত স্বাস্থ্যকর যে তার মধ্যে অনেকেই আবার পরে সুস্থ সবল হইয়া উঠে। কিন্তু সে বাল্যজীবনের অবহেলার ফল একেবারে কখনও যায় না।

অন্য সকল বিষয়ে এত চেষ্টা এত উত্তম সত্ত্বেও এ বিষয়ে ইংরাজ জাতির এমন গাফ্‌লতি কেন তার উত্তরে আমি কেবল এই বুঝিয়াছি যে তাহাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সকল অপকর্ম্মই সংঘটিত হইতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যাদিতে সে জাতির এমন ভয়ানক টান।

এইবার আমি যাঁহাদের জানি ও যাঁহাদের সঙ্গে কতক কতক নিজেই মিশিয়াছি তাঁহাদের কাহারও কাহারও কথা বলি। বিলাতে যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সমিতি আছে সে সমিতিও একদল রমণীর দ্বারাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত। বিলাতে যাইয়া অসহায় অবস্থায় ভারতবাসীদের অজানা দেশে যে কি দুরবস্থা হয় তাই দেখিয়া মিস ম্যানিং ওই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য সেখানকার সকল ভারতবাসীকে একত্র করা ও তাহাদের সৎপরামর্শ দিয়া সাহায্য করা। তাছাড়াও তাঁহার আর এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজ ও ভারতবাসী যাহারা একই রাজার অধীনে বাস করে তাহাদের ভিতর সদ্ভাব স্থাপন করা। অনেক আংগ্লোইণ্ডিয়ানও এই সমিতির সভ্য ও সেখানকার অনেক বড় লোকও এই সকল সমিতির সভ্য, তাঁহারা মাঝে মাঝে ভারতবাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। এ সমিতিটি যে কতই সৎকর্ম্ম করিতেছে তার ইয়ত্তা নাই। ইঁহারাই সব একত্র হইয়া বিভিন্ন স্থান দর্শন করিতে যাইবার ব্যবস্থা করেন, সে দিন যে কি আনন্দে কাটে তা বলা যায় না। এখন সেই বরেণ্যা মিস্ ম্যানীংএর পরলোকগমনের পর হইতে মিস্ বেক্ এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যাওয়ার কিছু দিন পরেই তাঁর সন্ধান পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করি। সন্ধ্যার সময় পথ খুঁজিয়া তাঁর বাড়ী পৌঁছাই;—সে সহরের এক নির্জ্জন প্রান্তে। পল্লিগ্রামের মত যেন কতক সে স্থানের ভাব আছে। ছোট বাড়িটির পিছনের খানিকটা টেনিস খেলিবার জন্য স্থান। বাকি ফুলগাছময় নির্জ্জন বাগান। সেই স্থানে বসিয়া নিকটবর্ত্তী গীর্জ্জার পাশে যত গাছের ডালে পাখীর গান শুনিতে শুনিতে আমার যে সে দিনে মনে এক মধুর ভাব আসিয়াছিল এ জনমে তাহা ভুলিব না। সেই বাগানেরই এক প্রান্তে কতকগুলি "মিসিলটো" "হোলি" ও আরও কত Ever Green বা চির সবুজ্ গাছ আছে। শীতকালে সকল স্থান বরফে আবৃত হইলেও এই গাছের পাতা ঝরে না। তারই কাণ্ড হইতে এক ঝোপের ভিতর থাকিয়া একটি ঘুঘু মধুর স্বরে মর্ম্মবেদনার গান গাচ্ছিল। সেস্থানে আমি অবসর পাইলেই যাইতাম—তিনিও আমার জন্য অনেক বড় লোককে চিঠি দিয়াছিলেন। যে কেহ বিলাত যাবেন যেন তাঁর সহিত দেখা না করিয়া ফিরেন না। নিম্নে তাঁর ঠিকানা দিতেছি—

Miss Beck
233, Stokes Newington
London.

ধীর বিজ্ঞ জ্ঞানী সকল লোকই প্রায় লণ্ডনের বাহিরে থাকিতে ভালবাসেন। হ্যামষ্টেড্ প্রভৃতি সেই সব স্থানে তাঁহাদের অবসরের সময় সাক্ষাৎ করিলে কি সুন্দর পবিত্র দৃশ্য দেখা যায়। "Plain living and High thinking" যাকে বলে সেই দৃশ্য সেখানে আছে। তাঁহারা সেই সব নির্জ্জন স্থান ভালবাসেন। তাই আমারও সে সকল জায়গায় গেলে আর আসিতে ইচ্ছা হতো না। তাঁহাদের বাড়ির সকল অভ্যাগতকেই তাঁহারা কি মধুর ভাবে অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহাদের কথার এমন সরলতা ও মাধুর্য্য যে একবারও

মনে হবে না পরের বাড়ীতে আছি। "ফষ্টার মরলী" একজন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক—তিনি হেম্পষ্টেডের এক প্রান্তে একটি নির্জ্জন স্থানে থাকেন। নিজে ও স্ত্রী ও একটি আট বৎসরের ছেলে। সেই একটিমাত্র ছেলে—তার আগেও হয় নাই পরেও হয় নাই। তাঁর স্ত্রীর এই ঝোঁক যে ছেলে মেয়েদের যেন ইস্কুলে আজ কাল সব একত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর এই সকল স্থান যেন শান্তিময় স্বর্গের দৃশ্যের মত।

তখন সবাই সব দিনের কাজকর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে একত্র হইয়া আগুন পোহাইতেছেন। উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ইজীচেয়ার বা আরামকেদারা পাতা—মাঝে গৃহের কর্ত্তা ও গৃহিণী পাশাপাশি বসিয়া মধুর আলাপ করিতেছেন। গৃহিণীর মুখে মিষ্ট কথা ও হাতদুটীও তখন কিছু বুনা বা সেলাই করা কার্য্যে রত। ছেলে মেয়েগুলি পাশে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। একটি যুবতী বালিকা হয়ত—একটি গান করিলেন "The Star of Bethlem।" একটি ছোট ছেলে—একটি ক্ষুদ্র কবিতা "দুষ্টপুসী" অর্থাৎ Wicked Cat সুন্দর সরলভাবে আবৃত্তি করিল। পরচর্চ্চা ও পর গ্লানির সেস্থানে নাম গন্ধও নাই। অভ্যাগত লোকের সেস্থানে অবস্থাও জাতিনির্ব্বিশেষে বড়ই সুন্দর। আমাদের ঘরের বন্দিনীরা আমাদের সংসর্গের দূরে দূরে থাকিয়া দিনরাতই আমাদের জন্য কাজ করেন। এরূপ নিশ্চিন্তভাবে একত্রে বসিয়া আলাপ করা এদেশে বড়ই বিরল।

বিলাতের মত স্বাধীন সভ্যদেশে রাজা রাণী ও রাজপরিবারের ঘরের কথা সাধারণ লোকের মুখে সচরাচরই শুনা যায়। তাঁহাদের প্রতি কার্য্যকলাপ খবরের কাগজের এক স্তম্ভে প্রকাশিত হয়, Fashionable Societyতে সে সব কথা কহিতে প্রায়ই শুনা যায়। যখনই ব্যবসাবাণিজ্য টাকাকড়ির বা ধর্ম্মের কথা কিছু থাকে না, তখনই এই সকল কথা প্রায়ই উঠে। আজ কাল ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী দেশের লোকের বড়ই প্রিয়। শুধু সে দেশের কেন সমস্ত ইউরোপ জুড়িয়া তাঁহাদের সুনাম। এটি হবার একটি প্রধান কারণ, বর্ত্তমান রাজার ভিন্ন ভিন্ন দেশ বেড়ানর প্রবৃত্তি ও সকলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন। এমন কি ফরাশীদেশ ইংলণ্ডের চিরশত্রু, কিন্তু এখন দুটি রাজ্যে হরিহর আত্মা। এই সব কারণে বর্ত্তমান রাজার নাম হইয়াছে "Edward the Peace Maker" অর্থাৎ সন্ধি ও শান্তি স্থাপক রাজা এডওয়ার্ড। রাণী এলেকজান্দ্রারও তেমনি সুনাম।

পরলোকগতা পুণ্যশ্লোকা রাণী ভিক্টোরিয়া —"Victoria the Good" অর্থাৎ প্রজারা যাঁর "সদ্গুণের আধার" বলিয়া নাম দিয়াছেন—সেই ব্রটিশ লক্ষ্মীর নাম তাঁহার নিজের দেশে তত ছিল না। সকলে বলে তিনি বড় বিদেশ ভক্ত ছিলেন। ইংরাজ জাতীর চক্ষুশূল জার্ম্মান জামাইদের দিকে তাঁর বড়ই টান ছিল। ফরাসী দেশের নির্ব্বাসিতা রাণী Princess Eugeneকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রায়ই স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্লণ্ডে বেল্মোর্য়াল্ প্রভৃতি ক্যাসেলে সময় কাটাইতেন। ইংলণ্ডেই থাকিয়া ইংলণ্ডেরই লোকের সহিত তত মিশিতেন না। ভারতবর্ষের দিকেও তাঁহার

বড়ই টান ছিল। একটি ভারতীয় তাঁহার হিন্দুস্থানী ভাষার শিক্ষক, একটি ভারতবর্ষীয় বাউরচী রান্নাকরার পাচক, অনেকগুলি শীখ ও রাজপুত বডিগার্ড তাঁর সঙ্গে অহরহ থাকিত। ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের পর সাম্রাজ্ঞী হইয়া যখন Proclamationএ এই কথা ঘোষণা করেন তখন যে কয়টি সুন্দর উদার কথা ব্যবহৃত হয়—সে কথা কয়টি রাণীর নিজেরই রচিত।

—And henceforth our subjects of whatever cast or creed—shall be equally entitled in the Empire.

অর্থাৎ ভারতের রাণী হইবার দিনে প্রচার করিয়াছিলেন যে আজ হইতে আমাদের সকল প্রজাই—তার জাতি ও ধর্ম্ম যাহাই হোক না—এই রাজ্যে সমান সত্ত্বে অধিকারী হইবে।

বিলাতে অবস্থিতি কালে বিলাতী রমণী সম্বন্ধে এই কয়টি কথা আমার মনে আসাতে তাই এই তিনটি প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার স্থির বিশ্বাস, সে দেশের এত ক্ষমতা এত উন্নতি—তাঁহাদের দ্বারাই অলক্ষিতভাবে সংঘটিত হইয়াছে। সকল দেশেই এইরূপ হয়। ইহা সমাজের কেন—সমস্ত জীবজগতের অকাট্য নিয়ম। ইহা জীব-বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞান মনো-বিজ্ঞানের কথা। আমরা জাতীয় জীবনের এই অংশটুকু বড়ই অবহেলা করিয়াছি। আমাদের এতদুর অধঃপতনের এইটিই শ্রেষ্ঠতম কারণ। আর যে সকল কারণও বা আছে তাহা সহজেই কাটাইতে পারা যাইত—যদি এই বিষয়ে আমরা এতদিন ধরিয়া এমন দারুণ অন্ধ ও অত্যাচারী না হইতাম। যে দিন সে দিকে চোখ ফুটিবে, সেই শুভ দিন আসিবে, সেই দিন আমাদের ভাগ্যচক্র আবার উর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে। তা ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের উদ্ধার সম্ভবপর নহে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

প্রার্থনা।

যেন আজি প্রাণ মোর মেঘ খণ্ডপ্রায়,
সুদূরে তোমারি পানে উড়ে যেতে চায়।
মেঘেতে পড়েছে ওই সোনার কিরণ,
পেয়ে আলো ঝলকিছে মেঘেরা কেমন।
তেমনি এ প্রাণে মোর জ্যোতির আধার,
ঢাল ও বিশ্বাস আলো তুমি অনিবার,
সাধ মনে কুসুমের সুরভির মত,
করিব বন্দনা দেব তোমা অবিরত।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মোর দয়াময় হরি
জাগিবে তোমার শত করুণা লহরী।
অতি ক্ষুদ্র তবু প্রাণে জাগে কত আশা,
কখন না তৃপ্ত হয় অতৃপ্ত পিপাসা।
তোমারে পাইতে সাধ পাইব কি করে,
কি করে রাখিব বাঁধি বিশ্বাসের ভরে,
শয়নে স্বপনে কিম্বা থাকি জাগরণে,
সর্ব্ব কাজে সর্ব্বভাবে তুমি রবে মনে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পূর্ব্ববঙ্গে নিরাকালী ব্রত।

"নিরাকালী"নাম্নী কোন দেবীর উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না, সাধারণতঃ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কালিকাদেবীর পূজা করাই প্রচলিত পদ্ধতি, কিন্তু এই ব্রত বিনা মূর্ত্তিতেই করা হইয়া থাকে, সুতরাং সম্ভবতঃ "নিরাকারা-কালী" হইতে "নিরাকালী" নাম হইয়া থাকিবে।

পাড়াগাঁয়ের প্রাচীনাদের মধ্যে "নিরাকালী" দেবীর প্রতাপ অক্ষুন্ন থাকিলেও নব্যারা আজকাল তাঁহাকে বড় একটা আমল দখল দেন না, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বর্ষীয়সীগণ ইঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবী, এবং পুরুষগণও ইঁহাকে বিলক্ষণ সম্মান করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর, ঢাকা, এবং বাখরগঞ্জের প্রায় প্রত্যেক মেয়ে মহলেই এই ব্রতের খুব প্রচলন ছিল। আজকালও যে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। এই ব্রতের উপকরণ সামান্য এবং অর্থব্যয় একপ্রকার নাই বলিলেও হয়, এইজন্য দীন-দরিদ্রের জীর্ণ কুটীর হইতে ধনীর অট্টালিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইহার খুব প্রচলন।

ব্রতের যৎসামান্য উপকরণ প্রস্তুত করিয়া যে কথা বা কাহিনী বলা হয়, তাহাতে জানা যায় দেবীর ক্ষমতা অতুলনীয়, রাজাকে ভিখারী এবং ভিখারীকে রাজা করিতে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও লাগে নাই, কিন্তু সাধারণতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্যই "নিরাকালী" দেবীকে মানস করা হইয়া থাকে। যেমন বংশীর মা তাহার প্রবাসী ছেলের চিঠি পায় না দেবীকে ২০৷২৫টী পান, ৫৷৬টী সুপারি, একটি তামাকের পাতা মানস করিল, শোনা গেল, ডাক হরকরা ছেলের চিঠি নিয়ে হাজির!

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ব্রতের সময়। ব্রতস্থানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, তবে ছোট ছোট ছেলের যাইতে কোন আপত্তি নাই, পাড়ার নিমন্ত্রিত মেয়েরাই এই ব্রত সম্পন্ন করেন। তবে পুরুষদের মধ্যে যাঁহার আস্ত পান খাইতে আপত্তি নাই তাঁহার ব্রতান্তে প্রসাদ পাইতে বাধা হয় না।

যাঁহার ঘরে ব্রত হইবে তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাড়ার মেয়েদের জানাইয়া আসেন। ঠিক সন্ধ্যা হইলে গৃহখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ব্রতস্থানে একখানা পিড়ী এবং তাহারই পাশে একটী চুমকি ঘটির গায়ে তৈলের সহিত সিন্দুর গুলিয়া একটী পুত্তলিকা আঁকা হয়। এবং ঐ পুত্তলিকা প্রথমে বড় একটী সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া আরম্ভ করিতে হয়, তারপর ঐ ফোঁটা অর্থাৎ মস্তকের সহিত একটী সরল রেখাকে শরীর করিয়া দুই দিকে উপর এবং নীচুভাবে দুইটী দুইটী চারিটী সমকোন অঙ্কিত করিয়া হাত পা তৈয়ার করিতে হয়, পরে চুমকীটি জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর আমের ছোট এক একটী পল্লব বসাইয়া দেওয়া হয়, ইহাই হইল মঙ্গল ঘট। এই মঙ্গল ঘটের সম্মুখেই কলার পাতে দেবীর খাদ্য। অর্থাৎ এক বিড়া (গোছা) পান, ৫৷৫টী সুপারি, একটু খয়ের ও একটী তামাকের পাতা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া হয়, ব্রত সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বে তাহা কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তারপর পূর্ণাব-

গুণ্ঠনবতী, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, বা বিনাবগুণ্ঠনা মহিলাগণ দ্বারা গৃহ পূর্ণ হইলে ব্রত আরম্ভ হয়। ব্রতের প্রারম্ভে একটী প্রবীনা মহিলা নিম্নলিখিত রূপ একটী কাহিনী বলিতে আরম্ভ করেন ঃ—

এক যে ছিলেন রাজা, তার ধন দৌলত অগাধ ছিল, কিন্তু একটী কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তান ছিল না পুত্রমুখ দেখিতে পান নাই, এই যা দুঃখ, আর কোন অভাব নাই। এই ভাবে কিছুদিন যায় হঠাৎ একদিন এক পাল রাক্ষস এসে রাজ্যশুদ্ধ সবাইকে খেয়ে ফেল্লে, কি জানি কি ভেবে রাজকন্যাকে খেলেনা। বুড়া রাক্ষসীটা রাজকন্যাকে অতি যত্নে লালন পালন করতে লাগলো, কিন্তু রাজকন্যা রাক্ষসের হাতে পড়ার চেয়ে জলে ডুবে মরা ভাল ভেবে জলে ডুবে মরতে গেলেন। কিন্তু “নিরাকালী” দেবী তাহাকে দিয়া আপনার মহিমা বিস্তার করে পৃথিবীতে এক নূতন পূজা প্রচলিত করবেন কিনা তাই তার মরণ হল না। সাত দিন সাত রাত্তির রাজকন্যা জলের মধ্যে থাকার পর-একটা দৈববাণী শুন্‌তে পেলেন। “নিরাকালী”নাম্নী এক প্রত্যক্ষ দেবীর আদেশ; এক বিড়া পান, ৫টী সুপারি একটু খয়ের ও ১ পাতা তামাক দিয়া তার পূজা করতে পারলে তার সকল কষ্ট দূর হবে। রাজকন্যা তাই শুনে জল থেকে বেরিয়ে, এই সমস্ত জিনিস কোথা পাবেন তাই ভাবতে ভাবতে বনে বেড়াতে লাগলেন। ধনঞ্জয় নামে এক রাজা ঐ বনে মৃগয়া করতে এসে কন্যাকে দেখতে পেয়ে; পাল্কিবেয়ারা দিয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। তখন রাণী রাজাকে “নিরাকালী” দেবীর কথা বল্লেন এবং দৈববাণী অনুসারে যথারীতি দেবীর পূজা করতে লাগলেন। প্রতি মাসেই ব্রত করেন, দৈবাৎ কি মতিচ্ছন্ন হল, একদিন ব্রত করতে ভুলে গেলেন, “নিরাকালী” দেবীর ইহাতে খুব রাগ হলো, তিনি রাজার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়ে দিলেন। রাজা পাশা খেলায় সমস্ত হারিয়ে একমাত্র গাড়ু সঙ্গে করে রাণী ও বড় ছেলেটিকে নিয়ে বনে চলে গেলেন। রাণী তখন গর্ভবতী ছিলেন, জঙ্গলে তাহার প্রসব বেদনা হলো, এবং একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। জল না হলে চলেনা বনে জল কোথা পাবেন রাজা অগত্যা দুটী শিশু পুত্র সহ রাণীকে রেখে গাড়ুটী নিয়ে জল আন্‌তে গেলেন। দৈবাৎ ঐ দেশের রাজা কোন পুত্র সন্তান না রেখে পরলোক গমন করেছিলেন। রাজহস্তী রাজতক্তে বসাবার জন্য কপালে রাজটীকাওয়ালা মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় ধনঞ্জয় রাজাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁহাকে পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেল রাজাও সব কথা ভুলে গেলেন।

এদিকে রাণী ভেবে অস্থির। ছোট ছেলেটীকে বড়টীর কাছে রেখে অগত্যা তিনিই জল আনতে চল্লেন। ঘাটে গিয়ে দেখেন ঘাট জুড়ে এক সওদাগরের প্রকাণ্ড নৌকা রয়েছে, জলটুকু তোলবার জায়গা নাই। নৌকাখানা ঘাটে ঠেকে রয়েছে, “লাখে লাখে” লোকে নৌকা টানছে তবু নৌকা নড়ে না। রাণী মাল্লাদের বললেন “ওগো তোমরা নৌকাখানা একটু সরাও আমি একটু জল নেবো”। মাল্লারা এই কথা শুনে হেসেই খুন। তাহারা বল্লে কত “লাখে লাখে” লোকে টান্‌ছে তবুও নৌকা নড়ছে না, আর তোমার কথাতেই নড়্‌বে না কি? রাণী উত্তর দিলেন “বোধ হয় আমি

নৌকা নামাতে পারি”। এই কথা বলে নিরাকালীর নাম স্মরণ করে যেমনি নৌকাতে হাত দিয়েছেন অমনি নৌকা ‘যোজনের পথ’ সরে গেল। সওদাগর তা দেখ্‌তে পেয়ে, রাণীকে যোড়করে নৌকাতে তুলে নিলে। ওদিকে বড় ছেলেটী ছোট ভাইটীকে কোলে নিয়ে মা, মা, বলে কাঁদছে। “নিরাকালী” দেবী সদয় হয়ে এক গোয়ালার গাভীর কানে কানে বলে দিলেন “বনে যে দুটো ছেলে দেখতে পাবে, তাদিগকে দুধ খাওয়াবে। গাভীও জঙ্গলে যেয়ে রোজ রোজ দুধ খাওয়াতে লাগ্‌লি।

কিছুদিন যায় গোয়ালা দেখলে গাভীর দুধ হয় না, তবে কি কেউ দুধ চুরি করে? দেখতে হবে; এইরূপ ভেবে একদিন গাভীর পেছনে পেছনে যেতে যেতে এক বনের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌লে, গাভীটী পরমসুন্দর দুটী ছেলেকে দুধ দিচ্ছে। গোয়ালার ছেলে পিলে ছিল না, সে ছেলে দুটীকে নিয়ে গোয়ালিনীর কোলে দিয়ে বল্লে “এতদিনে ভগবান আমাদের ছেলে জুটিয়ে দিয়েছেন”, “তুমি গর্ভের ভান কর, ১০মাস পরে ছোট ছেলেটীকেই আমাদের ছেলে বলে দেখাবে।

গয়লানী তাই কর্‌লে। দশমাস দশ দিন পর ছোট ছেলেটীকে সূতিকা ঘর থেকে দুবার করে দেখিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলে যে তারই দুটী যমজ ছেলে হয়েছে। এই ভাবে কিছুদিন যায়, ছেলে দুটী ক্রমে বড় হল, গোয়ালা তাদের পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি দিয়ে পাঠশালায় পাঠালে। রাজার ছেলে কিনা তারা শিগ্‌গির শিগ্‌গির পাঁচ কলমে মুহুরী হয়ে উঠ্‌ল। এবং রাজ সরকারে ঘাটমাঝির কাজ নিলে। রোজ কত নৌকো আসে কত নৌকা যায় তার খোঁজ রাখ্‌তে হবে, মাশুল আদায় কর্‌তে হবে, এই হলো তাদের কাজ। ভাই দুইটী নদীর তীরে ঘর বেঁধে বাস কর্‌তে লাগলো। নিরাকালীদেবীর মহিমা কে বল্‌তে পারে, একদিন সেই যে সদাগরের নৌকা ওদের মাকে নিয়ে গেছলো, সেখানা এই ঘাটে এলো। রাত্তির কাল আর কোথা যাবে, ঘাটেই নৌকা লাগিয়ে রইল, পরদিন মাশুল টাশুল হিসাব করে দিয়ে চলে যাবে। এদিকে ছোট ছেলেটী দাদাকে রূপকথা বলবার জন্য পেড়াপিড়ী কর্‌তে লাগলো। বড় ভাই জানলে তারা গোয়ালার ছেলে নয়। সে বল্লে’ ভাই আমাদের নিজেদের কথাই তো এক রূপকথার মত।’ এবং ছোট ভাইকে প্রকৃত মা, বাপের কথা খুলে বল্লে। ওদিকে নৌকাতে রাণী তাই শুনে ওদের কাছে এসে বল্লেন “আমিই তোদের সেই অভাগিনী মা”। ব’লে তারেদই কোলে করে কাঁদতে লাগলেন। ছেলেরা মাকে নিয়ে রাজার কাছে চলে গেল, এবং তাঁকে সব কথা বল্লে। নিরাকালীদেবীর বরে রাজারও সব কথা মনে হল, তিনি রাণীকে তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন।

গয়লানী খবর পেয়ে দৌড়ে এলো, এবং ছেলেদের বল্লে” তোরা আমার ছেলে ন’স, একি কথা বল্‌ছিস্?” হাজার হলেও গয়লানী; তাদের বাঁচিয়েচে, তাই এক রকম মা তো বটে। রাজা বল্লেন, “আচ্ছা পরীক্ষা করা হ’ক, তোমরা দুজনে নদীর দুই পারে দাঁড়িয়ে থাক যার স্তন থেকে দুধ ছেলের মুখে যাবে, বুঝবো তারই ছেলে।” রাণী ও গয়লানী তাই কল্লেন।

কিন্তু গয়লানীর স্তন থেকে এক ফোঁটাও দুধ বেরুল না। আর রাণীর স্তন থেকে "ছত্তিশ-নালে" দুধ ছেলেদের মুখে পড়্‌ল। গয়লানীকে রাজা টাকাকড়ি দিয়ে খুসী করে বিদায় করে দিলেন। এবং ছেলেদের কোলে করে চুমো খেতে লাগলেন। নিরাকালীদেবীর কোপে এই রকল বিভ্রাট ঘটেছে বলে রাণী সওয়া মণ সোণা দিয়ে পূজার স্থান বাঁধিয়ে দিলেন, এবং নিয়ম মত মাসে মাসে পূজা করে সুখে ঘর সংসার কর্‌তে লাগলেন।

কাহিনী ও কথা শেষ হইলেই সমাগতা মেয়েরা মিলিয়া একবার হুলুধ্বনি করিয়া দেবীকে প্রণাম করেন। প্রণাম করিবার সময় বর্ষীয়সী-গণ প্রকাশ্যে এবং নব্যারা মনে মনে দেবীর নিকট আপন আপন প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। এবং প্রার্থনা পূর্ণ হইলে তাঁহারাও ঐরূপ পূজা দিবেন, দেবীকে এরূপ ভরসায় দেওয়া হয়।

সেকালের ব্রত ও পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবদেবীগণ মর্ত্ত্যলোকে তাঁহাদের পূজা প্রচলনের জন্য না করিতেন এমন কাজই নাই; পূজার একটু ত্রুটি হইলেও আর রক্ষা ছিল না, পূজকের সর্ব্বনাশ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। কিন্তু ছুটো খোসামুদে কথা এবং কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিলেই আবার জল হইয়া যাইতেন, অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা তো যাকে তাকেই দিয়া দিতেন। দুঃখের বিষয় এই এখন আর সেকাল নাই, দু একটা পানের পাতা দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই পাওয়া যায় না। এবং এই সকল ব্রত-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কুলবধূদের পরস্পর মিলনের মনোহর দৃশ্যও এখন বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া।

ঐতিহাসিক বীর-গাথা।

(খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে মেসিডোনিয়ার অধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডার (সেকেন্দর) পারস্য জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৎকালে পঞ্জাব প্রদেশ কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ঐ সকল রাজ্যের স্বাধীন অধিপতিগণ পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ঝিলমের (বিতস্তার) উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেও হিন্দুরাজগণ তাঁহার গতিরোধ করিতে সম্মিলিত হইলেন না, অবশেষে পুরু নামক একজন মহা পরাক্রমশালী হিন্দু নরপতি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অগ্রসর হয়েন। এই ঘটনার ফলাফলই বক্ষ্যমান গাথার বর্ণনীয় বিষয়।)

১

ভা'য়ের শোণিত করিবারে পান
আছিল নিরত ভায়ের কৃপাণ
হায়রে যবে,
বিদেশী-রাজের সমর-বিষাণ—
বাজিয়া উঠিল তখনি মহান্
ভৈরব-রবে।

২

কোথায় একতা, কোথায় সাহস,
কোথা তেজোময় জীবন সরস
রোধিতে গতি—
দলি' ভারতের হৃদি-শতদল
যায় বীর-দাপে অরাতির দল
পুলকে অতি।

৩

গেলরে স্বদেশ, গেল স্বাধীনতা,
অরি-পদভরে জননী পীড়িতা,
ঝরে রে আঁখি—
নিজের শকতি বিনাশিয়ে নিজে,
গেছে এতকাল মোহ-ঘোরে কি যে
কালিমা মাখি'।

৪

এমন সময় ঝিলমের তীরে
উড়িল পতাকা প্রভাত-সমীরে
গরব ভরে,
মহারাজ পুরু সেনাদল লয়ে
দাঁড়ালেন আসি' দৃঢ় নির্ভয়ে
আহব তরে।

৫

—"দেশ-জননীর কে রাখিবি মান,
কে দিবিরে আয় আপনার প্রাণ
হৃদয় চিরে"—
গাইলেন কবি—"লয়ে ফুল-মালা
আছে দাঁড়াইয়ে কত সুর-বালা
বরিতে বীরে।"

৬

ছুটিল তড়িৎ শিরায় শিরায়,
সমর-বাদ্য বেজে উঠে হায়,
গভীর স্বরে—
নাচে গজ-বাজি, নাচে বীর প্রাণ,
নাচে ভীম শেল, নাচেরে কৃপাণ,—
বীরের করে।

৭

বাঁধিল সমর, নাহি কারো হেলা,
জীবনে মরণে মধু হোলী-খেলা
আকুল সুখে—
ঝিলমের নীর গেলরে রাঙিয়া,
উঠে সিংহনাদ থাকিয়া থাকিয়া
উর্দ্ধ মুখে!

৮

ধাইলেন পুরু, ধান সেকন্দর,
সমানে সমানে রণ ভয়ঙ্কর
বিরাম-হারা;—
কভু জিতে হিন্দু, কভু জিতে গ্রীক,
উভয়ে কৌশলী, উভয়ে নির্ভীক
ক্ষিপ্ত পারা।

৯

মান দিয়ে প্রাণ নিয়ে পলাইতে
শিখেনিত তারা কেহ অবনীতে—
বারেক ভুলে;—
শুধু চাই জয়, শুধু চাই জয়,
নহে সে জীবন, জীবন(ই)ত নয়,
মিশুক্ ধুলে।

১০

উঠে কোলাহল এমন সময়,
পুরু নৃমণির নন্দন দ্বয়
সমুখ-রণে
বীর-রমণীয়-শয়নে মহান্,
করেছেন হায়, আপনারে দান
হরষ মনে!

১১

শুনিলা নৃপতি মেতে উঠে বুক—
কহেন গরজি'—"এর মত সুখ
আছে কি ভবে—
স্বদেশ রাখিতে দেয় যারা প্রাণ—
মরিলেও তারা অমর সমান—
আয়রে সবে,—

১২

আবার—আবার—ভীষণ—ভীষণ
জীবনে মরণে বাঁধিল রে রণ
কে জিতে হারে—
শোভে পূজা-সাজে রাজার শরীর,
বহে অসি-কাটা তপত রুধির
হাজার-ধারে!

১৩

কোথায় বিরাম—কোথা অবসাদ—
গরজে নৃমণি অশনি নিনাদ
যেন রে লভে—
রাজে কত বল ছুটি বীর-করে
সভয়ে বিস্ময়ে পুলক ভরে—
নিরখে সবে!

১৪

ছুটে অসি মুখে অনলের কণা,
শলভ সমান দহে গ্রীক সেনা
সকল পলে,—
বুঝিবা শমন ধরি রাজ বেশ
আইলা অরাতি করিবারে শেষ
অবনী তলে!

১৫

মুগ্ধ সেকেন্দর বীর চূড়ামণি,
কন সেনাদলে ডাকিয়া তখনি—
"শুন হে সবে
আমি চাই ওই রাজ কেশরীরে
বাঁধা সুবিমল সোণার নিগড়ে
জীবিত ভবে!"

১৬

কে বুঝিবে হায় বিধি বিধাতার
পূরিল সে সাধ বিদেশী রাজার
দিবস শেষে—
পড়িলেন ধরা পুরু নরবর
হয়ে পরাজিত,—অজেয় অন্তর
এ মর দেশে।

১৭

থেমে গেল রণ 'জয়' 'জয়' রবে
ফিরে গ্রীক-চমূ একে একে সবে
শিবির মুখে,
হরিষে-বিষাদ—হত বহুতর—
আহত কত যে স্বজন নিকর
বিলাপে দুখে।

১৮

রাজ-পটাবাসে বিনাশি' আঁধার
জ্বলে দীপমালা হাজার হাজার
তারার মত—
বসি হেমাসনে বীর—নররায়
বিহিত আদেশ দানেন সবায়
না জানি কত!

১৯

এমন সময় পুরু রাজে লয়ে
আইলা সেনানী হরষ-হৃদয়ে
সভার মাঝে—
গ্রীক নরপতি আপনি উঠিয়া
নিলেন যতন আদর করিয়া
সে বীর রাজে!

২৪

খুলিয়া নিমেষে হাতের বাঁধন
কন পুরুরায়ে বিদেশী রাজন
"কেমনে কব
কত যে মুগ্ধ, কত যে গো প্রীত,
হয়েছি নেহারি ধারণা অতীত
শূরতা তব!

২১

"কিন্তু মহারাজ, তুমি ত জানিতে
অজেয় আমার বাহিনী মহীতে
নিয়তি বলে,
তবু সারাদিন করি ভীম রণ
কেন বিনাশিলে বীর অগণন
কিসের ছলে?"

২২

কন পুরুরাজ ধীর দৃঢ় স্বরে—
"কি ফল নৃপতি, বৃথা জাঁক করে,
জান ত তুমি,
প্রকৃত তনয় নীরবে কখন
না পারে রহিতে পীড়িতা যখন
জনম-ভূমি!

২৩

"নিয়তির খেলা জয় পরাজয়—
পরিণামে তার কে জানে কি হয়,
কেমনে তবে
ভয় ভাবনায় বিষাদে ডুবিয়া—
দূরে সবে একা রহিব মরিয়া
বিপুল ভবে?

২৪

"স্বদেশ রাখিতে শত পরাজয়,
জান না কি তুমি পরাজয় (ই) নয়,—
উহার মাঝে
রাজে যে শকতি, রাজে যে সাধনা,
হয়ত একদা দিবে তা চেতনা
সকল কাজে!"

২৫

শুনি এ উত্তর গ্রীক-নরপতি
মনে মনে হয়ে পুলকিত অতি
কহেন ফিরে—
"মোর পাশে তুমি কিবা প্রতি-আশা
কর এবে রায়, কহ ঠিক ভাষা
ভাবিয়া ধীরে!

২৬

কহিলা নৃপতি চাহিয়া বীরেশ,
পড়িল না আঁখি, গেল না নিমেষ
কাটিয়া বৃথা—
"রাজার নিকটে রাজা যাহা পারে—
সঙ্কোচহীন আশা করিবারে—
চাহি যে তা!"

২৭

"তাই হোক্ তবে"—কন গ্রীক রায়—
"তোমারি রাজ্য ফিরায়ে তোমায়—
দিলাম আমি—
তারি সনে লও কিছু উপহার—
মেনেছে যে দেশ ভারতে তোমার—
আমারে স্বামী।"

২৮

এত কহি রাজা পুরু নৃপবরে—
দিলা আলিঙ্গন গাঢ় প্রেমভরে—
হৃদয়ে চাপি'—
"প্রকৃত যে জয়ী হলে এইবার"
কন পুরুরাজ মুছি আঁখি ধার—
আবেগে কাঁপি'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কি ও কেন?

মাতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মদটা কি আর সে দ্রব্যটা তার পছন্দই বা হয় কেন? তবে মাতাল বেচারাকে বিষম গোলে ফেলা হয়। ভারতশিল্পের কি ও কেন লইয়া আমাকেও দু একবার এরূপ গোলে পড়িতে হইয়াছে। একবার আমার কোন বন্ধু তাঁর মাসিক পত্রিকায় ভারতশিল্পটা কি পাঠক-দিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমায় গোটা-কয়েক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে বলেন; বলা বাহুল্য, বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আর একবার আমাদের এক দেশীয় নরপতি আমাকে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, আমি দেশী ধরণে ছবি লিখি কেন? সেবারে কিন্তু আমি "ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং" এই কবিবাক্য স্মরণ করিয়া মৌন ছিলাম। উক্ত দুই কারণে বন্ধুবর এবং নরবর দুইজনের নিকটেই যে আমি অপরাধী হইয়াছি, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও, যে একটা

১৩

কোথায় বিরাম—কোথা অবসাদ—
গরজে নৃমণি অশনি নিনাদ
যেন রে লভে—
রাজে কত বল দুটি বীর-করে
সভয়ে বিস্ময়ে পুলক ভরে—
নিরখে সবে!

১৪

ছুটে অসি মুখে অনলের কণা,
শলভ সমান দহে গ্রীক সেনা
সকল পলে,—
বুঝিবা শমন ধরি রাজ বেশ
আইলা অরাতি করিবারে শেষ
অবনী তলে!

১৫

মুগ্ধ সেকেন্দর বীর চূড়ামণি,
কন সেনাদলে ডাকিয়া তখনি—
"শুন হে সবে
আমি চাই ওই রাজ কেশরীরে
বাঁধা সুবিমল সোণার নিগড়ে
জীবিত ভবে!"

১৬

কে বুঝিবে হায় বিধি বিধাতার
পুরিল সে সাধ বিদেশী রাজার
দিবস শেষে—
পড়িলেন ধরা পুরু নরবর
হয়ে পরাজিত,—অজেয় অন্তর
এ মর দেশে।

১৭

থেমে গেল রণ 'জয়' 'জয়' রবে
ফিরে গ্রীক-চমূ একে একে সবে
শিবির মুখে,
হরিষে-বিষাদ—হত বহুতর—
আহত কত যে স্বজন নিকর
বিলাপে দুখে।

১৮

রাজ-পটাবাসে বিনাশি' আঁধার
জ্বলে দীপমালা হাজার হাজার
তারার মত—
বসি হেমাসনে বীর—নররায়
বিহিত আদেশ দানেন সবায়
না জানি কত!

১৯

এমন সময় পুরু রাজে লয়ে
আইলা সেনানী হরষ-হৃদয়ে
সভার মাঝে—
গ্রীক নরপতি আপনি উঠিয়া
নিলেন যতন আদর করিয়া
সে বীর রাজে!

২৪

খুলিয়া নিমেষে হাতের বাঁধন
কন পুরুরায়ে বিদেশী রাজন
"কেমনে কব
কত যে মুগ্ধ, কত যে গো প্রীত,
হয়েছি নেহারি ধারণা অতীত
শূরতা তব!

২১

"কিন্তু মহারাজ, তুমি ত জানিতে
অজেয় আমার বাহিনী মহীতে
নিয়তি বলে,
তবু সারাদিন করি ভীম রণ
কেন বিনাশিলে বীর অগণন
কিসের ছলে?"

২২

কন পুরুরাজ ধীর দৃঢ় স্বরে—
"কি ফল নৃপতি, বৃথা জাঁক করে,
জান ত তুমি,
প্রকৃত তনয় নীরবে কখন
না পারে রহিতে পীড়িতা যখন
জনম-ভূমি!

২৩

"নিয়তির খেলা জয় পরাজয়—
পরিণামে তার কে জানে কি হয়,
কেমনে তবে
ভয় ভাবনায় বিষাদে ডুবিয়া—
দূরে সবে একা রহিব মরিয়া
বিপুল ভবে?

২৪

"স্বদেশ রাখিতে শত পরাজয়,
জান না কি তুমি পরাজয় (ই) নয়,—
উহার মাঝে
রাজে যে শকতি, রাজে যে সাধনা,
হয়ত একদা দিবে তা চেতনা
সকল কাজে!"

২৫

শুনি এ উত্তর গ্রীক-নরপতি
মনে মনে হয়ে পুলকিত অতি
কহেন ফিরে—
"মোর পাশে তুমি কিবা প্রতি-আশা
কর এবে রায়, কহ ঠিক ভাষা
ভাবিয়া ধীরে!

২৬

কহিলা নৃপতি চাহিয়া বীরেশ,
পড়িল না আঁখি, গেল না নিমেষ
কাটিয়া বৃথা—
"রাজার নিকটে রাজা যাহা পারে—
সঙ্কোচহীন আশা করিবারে—
চাহি যে তা!"

২৭

"তাই হোক্ তবে"—কন গ্রীক রায়—
"তোমারি রাজ্য ফিরায়ে তোমায়—
দিলাম আমি—
তারি সনে লও কিছু উপহার—
মেনেছে যে দেশ ভারতে তোমার—
আমারে স্বামী।"

২৮

এত কহি রাজা পুরু নৃপবরে—
দিলা আলিঙ্গন গাঢ় প্রেমভরে—
হৃদয়ে চাপি'—
"প্রকৃত যে জয়ী হলে এইবার"
কন পুরুরাজ মুছি আঁখি ধার—
আবেগে কাঁপি'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কি ও কেন?

মাতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মদটা কি আর সে দ্রব্যটা তার পছন্দই বা হয় কেন? তবে মাতাল বেচারাকে বিষম গোলে ফেলা হয়। ভারতশিল্পের কি ও কেন লইয়া আমাকেও দু একবার এরূপ গোলে পড়িতে হইয়াছে। একবার আমার কোন বন্ধু তাঁর মাসিক পত্রিকায় ভারতশিল্পটা কি পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমায় গোটা-কয়েক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে বলেন; বলা বাহুল্য, বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আর একবার আমাদের এক দেশীয় নরপতি আমাকে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, আমি দেশী ধরণে ছবি লিখি কেন? সেবারে কিন্তু আমি "ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং" এই কবিবাক্য স্মরণ করিয়া মৌন ছিলাম। উক্ত দুই কারণে বন্ধুবর এবং নরবর দুইজনের নিকটেই যে আমি অপরাধী হইয়াছি, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও, যে একটা

কিছু করা উচিত ছিল, একথা সকলেই বলিবে। শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অথচ চট্ করিয়া ভারতশিল্পটা কি বুঝাইয়া দিতে একেবারে অপারগ;—দেশীয় ধরণে ছবি লিখিতেছি অথচ কেন এরূপটা করি জিজ্ঞাসা করিলে জবাব নাই, ইহার অর্থ কি? অর্থ কি একেবারেই নাই? বন্ধুর নিকটে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও রাজআজ্ঞা লঙ্ঘন এ দুটা গুরুপাপ ঘাড়ে লইবার যে কোন গুরুতর কারণ নাই তাহা কেমন করিয়া জানিলে? কারণটা যদি শুনিতে চাহ তবে বলিতে রাজি আছি, কিন্তু মনে রাখিও এজন্য যদি আমার বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে অথবা রাজ উপদ্রব সহিতে হয় তবে সেজন্য তোমরা দায়ী।

আসল কথাটা এই, বন্ধু যখন প্রশ্ন করেন ভারতশিল্পটা কি, তখন তার জবাব হচ্ছে, তুমি না ভারতবাসী, ভারতসন্তান, তোমাকে লিখিয়া বুঝাইতে বল কিনা ভারতশিল্পটা কি? এ প্রশ্নটা যদি কোন সাহেবে করিত তবে তাহাকে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া, যুক্তির পর যুক্তি দেখাইয়া, প্রমাণের পর প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া বুঝানর দরকার ছিল, যে ভারতশিল্পটা অশ্বডিম্বের মত একটা ভুয়ো জিনিষ নয়,—সেটা নিতান্ত ভারতবর্ষেরই,—যেমন তাদের দেশের শিল্প নিতান্ত তাদেরই। গুরুর আসনে বসিয়া সাহেবের চোখে কলমের ডগায় জ্ঞানাঞ্জন বুলাইয়া দিতে আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু তুমি নিজে ভারতবাসী হইয়া যদি আমার কাছে সে অঞ্জন চাহিতে এস, তবে আমি এই সন্দেহ করি যে, হয় আমার বুদ্ধির দৌড়টা পরীক্ষা করিবার তোমার কুমৎলব আছে নয়তো তুমি চক্ষের মস্তকটি একেবারে খাইয়া বসিয়াছ;—নির্ব্বাণ দীপে তৈল দানের ন্যায় তোমার চোখে অঞ্জন দিয়া কোন্ ফল! সেকালের প্রসিদ্ধ বাবু জয়চাঁদ পাল চৌধুরীর নাম শুনিয়াছ। শেষ দশায় তিনি আমাদের বাড়িতে সদাসর্ব্বদাই আসা-যাওয়া করিতেন, আমার পিতামহের সঙ্গে তাঁর বড়ই সখ্যতা ছিল। এক সময়ে জয়চাঁদ বাবুর জমিদারী হইতে এক কলসী পদ্মমধু আসিয়াছিল। জয়চাঁদবাবু মধুর কলসটি লইয়া আমাদের বাড়িতে উপস্থিত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আমাদের বাড়ির ডাক্তার ডিঃ গুপ্তও সেখানে হাজির; পদ্মের মধু চক্ষু রোগের মহৌষধ, সহজে দুর্লভ, সেই পদার্থ এক কলসি হাজির! ডাক্তারবাবু এক ভাঁড় মধুর জন্য দরখাস্ত পেশ করিলেন। জয়চাঁদবাবু বলিয়া উঠিলেন "বটে? আমার এত কষ্টের মধুটুকু রাজ্যের কাণার চোখে দিয়া নষ্ট করিবে? সে হইবে না, এ মধুর রসগোল্লা পাকাইয়া খাওয়াই ভাল।" জয়চাঁদবাবুর কথাও যা কাযেও তা। তৎক্ষণাৎ সেই অমূল্য মধুর অপূর্ব্ব রসগোল্লা প্রস্তুত হইয়া বাড়ির ছেলে পিলে এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরণ হইয়া গেল। আমিও তাই বলি হে বন্ধুবর, আমার ঘটে যেটুকু আছে সেটুকু আমি কাণার চোখ ফোটান কাযে লাগাইতে রাজি নই, সেটুক্ দিয়া আমি রসগোল্লা পাকাইয়া তোমাদের দিতে চাই, এখন বুঝিলে কি? রসগোল্লাটা কি পদার্থ নিজে চাখিয়া বুঝিতে হয়, তেমনি ভারতশিল্পটা কি যদি জানিতে চাহ, তবে এই লও একখানা দেশী ছবি একটা পাথরের মূর্ত্তি, একখান কাশ্মিরী শাল বেনারসী সাড়ি; ওই তোমার সম্মুখে একটা মন্দির, ওই একটা মস্জীদ, একটা পুরাতন রাজবাড়ি; এই কতকগুলা ছেলেদের খেলেনা, গৃহস্থলির তৈজস, বাবুগিরির আসবাব; আরও তোমার সম্মুখে বিস্তৃত আকাশ, কানন, নদ নদী, পাহাড়, পর্ব্বত শোভিত ভারতভূমি; পার্শ্বে তোমার কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, পুরাণ, বেদ বেদান্ত আর ভারতের লক্ষ কোটী নরনারী, ইহাদের দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, পড়িয়া অর্থাৎ কিনা রসগোল্লাটার মতন চাখিয়া নিজেই বোঝ ভারতশিল্পটা কি। আমাকে বৃথা জ্বালাতন করিও না। ইহাতে যদি মন না ওঠে তবে আমাদের কেমিক্যাল-একজ্যামিনার সাহেবের কাছে যাও, সে লোকটা জন্মে রসগোল্লা চাখে নাই অথচ তোমায় বেশ বুঝাইয়া দিবে, রসগোল্লাটা কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি। আমি বেশ বুঝিতেছি, তুমি ভাবিলে আমি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মটা তোমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া সরিয়া পড়িলাম এবং ইহার পরে সাহেবদের কাশ্বেই ভারতশিল্পটার রাসায়নিক ব্যাখ্যা শুনিতে চলিবে; কেননা তোমার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি নিজেই কাণা; অতএব কাণা তোমাকে পথ দেখাইতে সাহস পাইতেছি না; এইরূপই যদি হয় তবে ভাই তোমায় সাবধান করিতেছি যে, পরের মুখে ঝালই হোক বা মিষ্টিই হোক খাইতে চলিও না; নিজে চাখ, নিজে বোঝ। আমিও তোমার মত একদিন ইউরোপ হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি বই কিনিয়া ভারতশিল্পটা কি বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, তোমারও যদি সেই মৎলব থাকে তবে অনুরোধ করি পয়সাগুলার অপব্যয় করিও না; আমার লাইব্রেরিটা তোমায় ধার দিতে রাজি আছি পড়িয়া লইও। আর চাও আমিই তোমায় বলিয়া দিতে পারি ইউরোপিয়ান গুরু তোমায় ভারতশিল্পের কত রকম ব্যাখ্যা দিবে। মনে রাখিও সেখানেও তুমি এক মত এক বাখ্যা পাইবে না। নানা মুনির নানা মতের ফেরে, এখানেও যেমন সেখানেও, তোমায় পড়িতে হইবে; তাহার মধ্যে দুইটা দলের কবলে না পড় সেজন্য তোমায় কিঞ্চিৎ সাবধান করিতেছি। প্রথম দলটা গোঁড়ার দল। রস্কিন প্রমুখ বড় বড় পণ্ডিত ও ইউরোপের পনেরো আনা লোক এই দলে। ইহাদের মতে গ্রীক আর্টই আর্ট, ক্রশ্চান আর্টও তথৈব; আর এই যে দেখ ভারত ইজিপ্ত, পারস্য, আরব এ সকলই বর্ব্বর ও অপকৃষ্ট শিল্প। এই দলের মহারথীগণ গ্রীক শিল্পের মাধুর্য্য, তুলনা দিয়া দেখাইবার সময় বর্ব্বর শিল্পের আদর্শ নিজের দেশে খুঁজিয়া পান না, খুঁজিতে আসেন আমাদের দেশে। ইহাদের কাছে আমাদের দেবমূর্ত্তি সকল রাক্ষস মূর্ত্তি, মন্দিরগুলো ভূষণ-ভার-গ্রস্ত বর্ব্বরতার স্তূপমাত্র। ভারতশিল্প সম্বন্ধে ইহাদের কাছে বড় একটা কিছু আশা করিও না; তবে গ্রীক শিল্প ও ক্রশ্চান শিল্প সম্বন্ধে এই দলের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে উপদেশ লইতে পার।

দ্বিতীয় দলটা প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ববিদের দল,—ইহারা তোমাকে ভারতশিল্পের প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বটা যতক্ষণ বুঝাইবে, বেশ বুঝাইবে; কিন্তু ভারতশিল্পের রসটুকু ব্যাখ্যা করিবার সাধ্য ইহাদের নাই উপরন্তু ইহারাও প্রথম দলের ন্যায় গ্রীক্ ভক্ত, ও তোমাকে প্রাণপণে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে ভারতশিল্পের যা

কিছু সুন্দর সেটা গ্রীকদিগেরই দান কেন না গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার মাস কতকের জন্য আর তাঁর অনুচরেরা বছর, কতকের জন্য পাঞ্জাব অঞ্চলে বাসা বাঁধিয়া ছিলেন। এই গ্রীকতত্ত্বটা প্রত্ন ও পুরাতত্ত্বের সঙ্গে এমন জট পাকাইয়া ইহারা তোমার সম্মুখে ধরিবে যে, সে জট খোলে কার সাধ্য! —নাগপাশের মত তোমায় কাবু করিয়া ফেলিবে।

এ ছাড়া আর একটা দল,—দল বলা যায় না, কেন না, এ দলের লোক দু চারি জনের বেশি ইউরোপে দেখিতে পাই না, সে লোক-গুলি বাস্তবিক আমাদের শিল্পটাকে প্রাণ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। এ দলের কারো হাতে যদি তুমি পড় তবে দেখিবে সে তোমার আমার মত, রসগোল্লা কি, নিজে চাখিয়া বুঝিতে বলিবে। এবং এ কথাও বলিবে যে তুমি ভারতবাসী, তুমি চেষ্টা করিয়া পরখ করিলে তাহা হইতে যে রস পাইবে ও দ্রব্যটাকে যেমন করিয়া বুঝিবে, আমি বিদেশী কখনই তেমনটা পারিব না। "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" ও "কষ্ট নহিলে কেষ্ট মিলে না" এই দুটিমাত্র উপদেশ দিয়া সে লোক তোমায় ছাড়িয়া দিবে। জিজ্ঞাসা করি, তখন কি বন্ধু বুঝিবে, ঠেকিয়া শেখা ছাড়া এক্ষেত্রে তোমার উপায় নাই? কংশ জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়া উদ্ধার হইয়া গেল,—কৃষ্ণ-দায়ে ঠেকিয়াছিল বলিয়া। তেমনি আমিও বন্ধু, তোমাদের শিল্প-দায়ে ঠেকিয়াছ দেখিতে চাই,—তবেই আমাদের কলালক্ষ্মী বিশ্বরূপিণী হইয়া তোমাদের দেখা দিবেন। হরিনাম ছাড়া যেমন 'কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' আমি বলি তেমনি "কলায়াং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" ঠেকিয়া শেখা ছাড়া।

এখানে আমাদের রাজন্ কি বলেন শোনা যাক্। বলিয়া রাখি, এ রাজাটি আমাদের সে কালের রাজাদের মত নয়, ইনি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের ছাঁচে ঢালা কাটা-ছাঁটা ফিট্‌ফাট্ রাজা। ইনি আতর গোলাপ গায়ে মাখেন না, ইঁহার জন্য প্যারিস হইতে "রিগোর" এসেন্স চালান আসে। মণিমাণিক্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদে বাস করিলে ইঁহার "হেলথ্" খারাপ হয় অতএব ইনি ইউরোপ হইতে মিস্ত্রি আনাইয়া ফ্রেঞ্চ ধরণে সাটু বনাইয়া সেটাকে কট্‌গ্লাস মণ্ডিত করিয়া তাহাতে সুস্থ শরীরে বাস করেন এবং তীর্থযাত্রার বদলে বছরে একবার বিলাতে সফর করেন সমহিষী।

এই রাজ্যাভিষিক্ত ভারতবাসী অপূর্ব্ব জীবগুলি যখন আমায় জিজ্ঞাসা করেন—ফ্রেঞ্চ ধরণ, ইতালী ধরণ, ইংলিস জর্ম্মাণ রাসিয়ান এত ধরণ থাকিতে তুমি দেশী ধরণে ছবি লেখ কেন? তখন আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—রাজন্! আমি যে দেশী ধরণে ছবি লিখি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়, না মহারাজ যে আতর গোলাপ ছাড়িয়া বিলাতি এসেন্স, রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া ফ্রেঞ্চ 'সাটু' ও কাশীধাম ছাড়িয়া বার্ম্মিংহামে মজিয়াছেন সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়? ভুলটা কে করিতেছে?

কাছিম একবার আকাশমার্গে উড়িতে চাহিয়াছিল; এবং রাজন্, জাহাজ ভাড়া করিয়া আমরা যেমন বিলাতে যাই, তেমনি কাছিম বেচারা অনেক কষ্টে একটা ঈগল পক্ষী ভাড়া

করিয়া ও তাহার স্কন্ধে ভর দিয়া আকাশ-মুখে চম্পট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। জাহাজ যেমন আমাদের ঠিক ২১ দিনে বিলাত পৌছিয়া দেয়, পক্ষিবাহনও কাছিম ভায়াকে ঠিক নিয়মিত সময়ে বন্দরে পৌঁছিয়া দিয়াছিল। কাছিম বন্দর হইতে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল বটে,—কিন্তু কাছিমত্ব সাফ্ হারাইয়া! অতএব হে মহারাজ, বলুন্ দেখি, এই যে আমি যেখানকার সেখানে থাকিয়া সুখে মরিতে চাহিতেছি ইহাতে আপনার ক্ষোভের কারণটা কি থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণের ছেলেকে হোটেলে খাইতে দেখিতেছ তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে না, আর দেবমন্দিরে প্রসাদ কুড়াইতেছি ইহাতেই অমনি প্রশ্ন তুলিলে! আমি কেন এরূপটা করিতেছি জানিতে চাহিতেছ? সে অনেক দুঃখের কথা। ভাবমরীচিকা ধরিবার আশায় তোমার ও ফ্রেঞ্চ, ইতালী আরও কত কি, পথে ছুটিয়াছি; এককালে কাছিমের মত জাহাজ ভাড়া করিবারও মৎলব আঁটিয়াছি, কোন ফল পাই নাই। এখন দেখিতেছি, এই পথে গেলে সে মায়াবিনী যদি ধরা দেয়!

মহারাজ! দেখিতেছি আমার কার্য্য কলাপ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তোমার মনে আমার মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিতেছে এবং এই পাগলের পাল্লা হইতে সরিয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতেছ; তা হইবে না মহারাজ, আমাকে ক্ষেপাইয়াছ তখন আর একটা শ্লোক না শুনাইয়া ছাড়িতেছি না।

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মবিগুণ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

মহারাজ, একবার একটা ফ্রেঞ্চম্যান—ফ্রেঞ্চ ম্যানের নাম শুনিয়া মহারাজের যে হাসি ধরে না—একবার একটা ফ্রেঞ্চ কাউণ্ট-কি কি-একটা আমার এই লক্ষ্মীর ঘরের আল্‌পনা-গুলা দেখিতে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি ফ্রান্সে যাইতে ইচ্ছা রাখি কি না—আমি বলিলাম, ফ্রান্সে যাইয়া কি লাভ? বাঙ্গালীর ছেলে অথচ ফ্রান্সে যাইতে নারাজ। কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে লোকটার কিছুক্ষণ গেল; কিন্তু যখন আমার কথার প্রকৃত অর্থ টা বুঝিতে পারিল তখন সে আমার চারিদিকে নাচিয়া কুঁদিয়া আমার সঙ্গে হস্ত-কম্পন করিয়া এমন একটা বিপরীত কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, আমার ভয় হইল, বুঝিবা ধরিয়া আমার মুখচুম্বন করে! কিন্তু লোকটা ছিল ভবঘুরে, আমি তার নামটা টুকিয়া লইতে ভুলিয়া গেলাম, নচেৎ মহারাজকে তাহার ঠিক ঠিকানা দিতে পারিতাম;—কাযেই লোকটা যাইবার সময় আধ আধ ভাষায় যে শ্লোকটা আওড়াইয়া গিয়াছিল তাহাই উপহার দিতেছি—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ।"

মহারাজ, বুঝিলেন কি সকলে যখন জাত হারাইয়া ন্যেড়া বনিয়া বাহির হইয়াছে তখন কেন আমি এই ভাঙ্গা মন্দিরটায় ধন্না দিয়া পড়িয়া পড়িয়া লক্ষীর মন্দিরে আল্‌পনা টানিতেছি? সবাই যদি সরিয়া পড়ি তবে কলা দেবীর পূজা হয় কেমন করিয়া, আর যদি কোন অতিথি এ মন্দিরে আসে তবে তার সৎকারইবা করে কে?

রাজন্, মনে মনে হাসিতেছ? ভাবিতেছ যে, কোথা হইতে একটা ছেলে খেলার পুতুলকে ঠাকুর বলিয়া খাড়া করিয়া স্বপ্নে সাম্রাজ্য

লাভের স্থায় নিজেকে একটা মোহান্ত গোছের কিছু মনে করিতেছি। আমি যেটাকে কলা-লক্ষ্মী বলিয়া পূজা দিতেছি সেটা আসলে দেবী মূর্ত্তিই নয়, শিল্প-হাটে সেটা একটা কালীঘাটের পুতুল কিম্বা পট গোছের কিছু। ভূমধ্য সাগরের তীরে তীরে গ্রীস রোম ইটালী প্রভৃতি শিল্পের সপ্তলোকবাসী তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কোন এককে না পাকড়াইয়া এই খেলার পুতুলটাকে ভোগ লাগাইতেছি কেন, ইহাতেই মহারাজ আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এবং ইহাতেই মহারাজ আঁচিয়াছেন যে আমার মোহান্তগিরির কুমৎলব আছে। বলি মহারাজ! আপনি এটা কি বুঝিতেছেন না যে, আমি যে কলাদেবীর পুজায় লাগিয়াছি তাঁর যদি কোন দেবোত্তর সম্পত্তি থাকিত তবে মোহান্তগিরির লোভটা সামলাইতে না পারিবারই কথা। যে সময়ে দেশের রাজা মহারাজার উপরে কলালক্ষ্মী বরাতি চিঠি দিবার ক্ষমতা রাখিতেন, সে সময়ে মোহান্ত-গিরির কথাটা মনে উদয় হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু মহারাজ আপনারা কলালক্ষ্মীর খাতক হইয়াও যখন গণেশ উল্টাইয়া বসিয়া আছেন, তখন এ মোহান্তগিরিতে কেন লোভ হইবে? ভয় নাই মহারাজ, খাতক বলিয়া আমি আপনাকে আদালতে হাজির করিতে চাহিতেছি না, কিন্তু মহারাজ, আমি যে মোহান্ত হইতে চাই এ কথাও আপনি কখন মুখে আনিবেন না; কোন্ দিকে কে শুনিয়া ফেলিবে আর স্বরাজের মত স্বধর্ম্ম ও স্বশিল্প গোছের একটা অকাণ্ড বাধাইয়া একজন লিডার হইতে চাহিতেছি বলিয়া আমাকে লইয়া টানাটানি পড়িবে।

দেখুন মহারাজ, আপনাকে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, আপনি যে আমার দেবীটিকে পুতুল আর পটের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন এটা বড় ভাল হইতেছে না। আপনি কি জানেন না, একদিন এই দেবীর পূজা দিতে মোগল বাদশারা রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া দিয়াছিল? জানেন না কি, এই দেবীরই সিংহাসন ছিল জগৎবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন?—আর সেটা লইয়া কি কাণ্ডই না হইয়া গেছে। মহারাজ এখনো যে ভারতবর্ষে পৃথিবীর লোকে, ব্যবসাদার বল, সৌখিন ভ্রমণকারিই বল, গতিবিধি করিতেছে, সেকি তোমার ওই ফ্রেঞ্চ 'সাটু' দেখিতে, না তোমার কাট্-গ্লাসের সন্ধান করিতে?

মহারাজ, তুমি বল কিনা আমার দেবী মাটির ঢেলা পটের চিত্র! তবে মহারাজ, কার প্রসাদে ভারতবাসী এতকাল দুর্ভিক্ষের মুখ দেখে নাই; আর কাকে অপমান করিয়াই বা সেই ভারতবাসী আজ উপবাসে প্রাণ দিতেছে। এখনও বুঝিতেছ না আমি কার দ্বারে ধন্না দিতেছি, কেনই বা? মহারাজ তোমরা কার সন্ধানে পশ্চিম সাগরে পাড়ি জমাইয়াছ তাহা তোমরাই জান, কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি, মরিব তবু নড়িব না; এজন্মে না হোক পরজন্মেও দেবীর দর্শন লাভ করিব।

দেখ, এই নির্জ্জন মন্দিরে একলা বসিয়া বড় চমৎকার একটা রহস্য দেখিতে পাই—কালচক্র নিয়তই সূর্য্যটাকে পশ্চিম মুখে টানিয়া লইতেছে; পূর্ব্বদিকটা অন্ধকার করিয়া সূর্য্য যখন চলিয়া যায়, আমি ভাবি, যাঃ গেল, আর আসিবে না; কিন্তু দেখি পরদিন পুবের

সূর্য্য পূবেই হাজির হইয়া আমার দেশে স্বর্ণ-বৃষ্টি সুরু করিয়াছে। তেমনি মহারাজ যে কালচক্র আজ তোমাদের পশ্চিম দিকে লইয়া চলিল সেই আবার তোমাদের পূবে আনিয়া পৌঁছিয়া দিবে ও আমি দেখিব তোমাদের করপুট স্বর্ণ পদ্মের মত আমার এ মন্দিরে দেবীর অর্চ্চনায় লাগিয়া গেছে, আমি সেই সুপ্রভাতের আশায় রহিলাম, মহারাজ!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নান্দী।*

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্য্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন॥
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি'
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধহাস্যে সেই রসময়
নির্ম্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়॥

মিশ্র—রামকেলি

(ওগো তুমি) নব নব রূপে এস প্রাণে!
এস গন্ধে বরণে এস গানে!
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস চিত্তে সুধারস হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে!
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এসহে বিচিত্র বিধানে!
এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে,
এস সকল কর্ম্ম অবসানে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কল্পনার প্রতি।

চারিধার ঘনমেঘে ছেয়ে গেছে, আজি
একি মোহ ব্যাপিয়াছে হৃদয় আমার!
রে কুহকি', রে নিষ্ঠুরা, আজো আসিবিনা?
একিরে কৌতুক তীব্র, একি ব্যবহার!
সেই বরষার মেঘে বিদ্যুতের খেলা,
উদাস বায়ুর স্বর আজো জাগে মনে,
কত মায়া, কত প্রেমে ভুলায়ে আমারে
চলে গেছ, মুগ্ধ মোরে ফেলি কুঞ্জবনে!
তার পর কত সন্ধ্যা, বিনিদ্র রজনী
সাজায়ে বাসর-শয্যা, অয়ি অকরুণা,
কাতরে ডেকেছি তোরে; এত সাধ-আশা
এমনি দলিবি, হায়! বিফল সাধনা?
লুকায়ে থেকোনা; হৃদে কর অধিষ্ঠান,
উঠুক্ আমার কণ্ঠে সঙ্গীত মহান্!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

* বোলপুর শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব উপলক্ষে বিরচিত।

সুবেগ সিং ও সবজ সিং।

শিখকুল চূড়ামণি সুবেগ সিং পঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষেরা পুরুষানুক্রমে পঞ্জাব শাসনকর্ত্তৃগণের মন্ত্রীত্ব করিতেন। সুবেগ বাল্যকালাবধি মেধাবী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই পারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি স্বীয় প্রগাঢ় চেষ্টায় গুরুমুখী ভাষাতেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অল্প বয়সেই তিনি রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হন ও কার্য্যনিপুণতা বলে অচিরেই মন্ত্রীত্ব পদে অভিষিক্ত হন। তিনি অমায়িক প্রকৃতিক লোক ছিলেন। যে কেহ তাঁহার সহিত আলাপ করিত, সেই তাঁহার সারল্যে ও ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। যথন দুই দলে কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হইত, তথন তিনি সহজেই সেই বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় সকলেই তুষ্ট হইত।

তিনি অত্যন্ত রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। ধর্ম্মের বাহাড়ম্বর তিনি ভালবাসিতেন না। ধর্ম্মান্ধতা তাঁহার ছিল না। তিনি অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন না। তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মানুষ যে ধর্ম্মই মানুক, সেই ধর্ম্মে অচলা মতি রাখিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে মুক্তি পাইবেই। ধর্ম্মের নামে অত্যাচার তাঁহার চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার্হ ছিল। তিনি মোগল শাসনকর্ত্তৃগণকে প্রকৃত রাজধর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন অযথা অত্যাচার করিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু প্রায়ই তাঁহার সে উপদেশ বৃথা হইত, কদাচিৎই তাহা পালিত হইত।

এই সময় মোগল শাসনকর্ত্তৃগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে উচ্ছৃঙ্খলা প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীতেই সংক্রামিত হইয়া পড়ে। সেই উচ্ছৃঙ্খলা প্রভাবে বিচার প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্ধ কাজির বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইত। সে বিচারের বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রদেশাধিপতি শুনিতেন না। ফলে কাজি স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তাই আজও কাজির বিচার বলিলে লোকে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতাই বুঝিয়া থাকে।

ভাই সবজ সিংহ নামে সুবেগের এক অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র ছিলেন। এই তরুণ যুবক নানাগুণে অলঙ্কত ছিলেন। তিনি তদানীন্তন প্রথামত এক মৌলবীর নিকট পারসী ও আরবী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। সেই বয়সেই তিনি উক্ত দুই ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শীঘ্রই বিদ্যালয় ত্যাগ করিবেন, ঠিক্ হইয়াছিল। সেই বিদ্যালয়ে কতকগুলি মুসলমান যুবকও পড়িত। তাহারা সবজের শ্রেষ্ঠতায় বড়ই অপমানিত বোধ করিত। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার সহিত ধর্ম্মতর্ক আরম্ভ করিত। কিন্তু সবজ নিতান্ত ধীর ভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। প্রতিযোগী মুসলমান যুবকেরা তাঁহাকে 'কায়দায়' আনিতে পারিত না।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে আবার উভয় পক্ষে কোন কারণে তর্ক

উপস্থিত হয়। ক্রমে তর্ক বচসায় পরিণত হইল। মুসলমান যুবকেরা নানা কটূক্তি করিয়া শিখধর্ম্মের নিন্দা করিল। শিখ সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নিন্দা তাহার নিকট অসহনীয়। সবজ তাহাদের নিন্দায় বাধা দিয়া স্পষ্টোক্তিতে স্বীয় ধর্ম্ম মতের গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। এরূপ ব্যাখ্যায় মুসলমান ছাত্রেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ও মৌলবীর নিকট সবজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। মৌলবীর সমক্ষেও সবজ স্বীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে শিক্ষকের আত্মাভিমানে অত্যন্ত আঘাত পড়িল। শিক্ষক সবজকে মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দুক বলিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেন। বন্দী হইয়া সবজ বিচারার্থ বিচারালয়ে নীত হইলেন।

বিচার-প্রহসনের পর কাজি রায় দিলেন—'ভাই সবজ সিংহকে ইসলাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।' নবাবের কর্ণে এই বিচার কাহিনী উঠিল। তিনি কাজির প্রদত্ত এরূপ লঘুদণ্ডে সন্তুষ্ট না হইয়া আদেশ করিলেন—'ভাই সুবেগসিংহকেও ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। পিতাপুত্রে নবধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।' নবাব ভাবিয়াছিলেন, সুবেগ পারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি ইসলামধর্ম্মের সকল রহস্যই জ্ঞাত আছেন। এরূপ অবস্থায় রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে রাজভক্ত সুবেগ নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। পিতা মুসলমান হইলে, পুত্রকেও দীক্ষিত করা কঠিন হইবে না!

নবাব শিখকে চিনিতেন না। তাই এরূপ ভাবিয়াছিলেন। নবাবের অদ্ভুত আদেশে সুবেগ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন—"আমরা শিখ; আমরা শিখ ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি। আমাদিগকে এরূপ কাপুরুষ ভাবিও না যে, সামান্য পার্থিব সুখের জন্য অমূল্য ধর্ম্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করিব। যদি তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণান্তে অমর হওয়া কখনও সম্ভব হইত, তবে না হয় গ্রহণ করা যাইত। কিন্তু অনিত্য অসার বস্তুতে বিশ্বাস করা যায় না। এ জীবন হয় আজ, নয় কাল নষ্ট হইবে। আমরা ধর্ম্মের জন্য মরিতে ভয় পাই না। জীবন রক্ষার চেষ্টা নিতান্তই নিরর্থক। এই মুহূর্ত্ত বড়ই সুখদায়ক; কারণ, আমরাও ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত হইতেছি। তোমার আদেশ পুণ্যযুক্ত হউক; কারণ, তাহা গুরুর প্রচারিত ধর্ম্মরক্ষার জন্য এই দেহকে বলি স্বরূপ গ্রহণ করিবে। আর আমাদের এই দেহ আরও শুভদ; কারণ, তাহারা ধর্ম্মের জন্য গৃহিত হইবে। দেহের চর্ম্ম-নিষ্কাষক চক্র-যন্ত্রও পুণ্যময় হউক; কারণ, তাহা এই দেহ হইতে চর্ম্ম খুলিয়া লইবে, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, আর আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া 'অকাল' 'অকাল' শব্দ * করিতে করিতে মর লোক ত্যাগ করিব। নবাব! শিখেরা কাপুরুষত্ববর্জ্জিত। আমরা গুরুগোবিন্দসিংহের সন্তান। ভাই মণিসিংহ, ভাই তরুসিংহ প্রভৃতিকে যেরূপ ভাবে হত্যা করিয়াছ, আমাদেরও সেই ভাবে হত্যা কর। আমরা তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে প্রস্তুত হইয়াছি।"

* শিখেরা ঈশ্বরকে 'শ্রী অকাল' বা 'অকাল' বলে। অকাল শব্দের অর্থ—অনন্ত, অজ ও অমর।

মন্ত্রীর অপ্রত্যাশিত উত্তরে নবাব বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সুবেগ কোন ধর্ম্ম মতের ধার ধারেন না—তিনি এ বিষয়ে স্বাধীন প্রকৃতিক; সুতরাং ইসলামধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। তিনি এতক্ষণে বুঝিলেন, সুবেগ যতই শিক্ষিত হউন, আরবী ও পারসীতে যতই অভিজ্ঞ হউন, তিনিও একজন শিখ। সাধারণ শিখে ও তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় নবাবের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তথনই তাঁহার আদেশে "চরকারি" বা চক্রযন্ত্র আনীত হইল। তাহাতে বসাইয়া পিতাপুত্রকে পেষণ করা হইতে লাগিল। যিনি প্রশংসার সহিত সমস্ত জীবন রাজ-সেবায় কাটাইয়া বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহার রাজভক্তির অভাব সম্বন্ধে কেহ কখনও সন্দেহ করে নাই, যাঁহার কর্ম্মে সকলে তুষ্ট ছিল, সেই সর্ব্বজনপ্রিয় রাজভক্ত প্রজা, বৃদ্ধ বয়সে রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ চক্রযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া মৃত্যুদণ্ড লাভ করিলেন! আর সেই নির্দ্দোষ, সুন্দর, তেজস্বী, তরুণযুবককে অকালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাঁহার সকল উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল! কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ নহেন। ধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিতে পারিতেছেন, এ চিন্তা তাঁহাদের সকল কষ্ট দূর করিয়াছে। তাঁহারা অকাতরে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। চক্রযন্ত্র মাংস ছিন্ন করিতে লাগিল, অস্থি-ভঙ্গ করিতে লাগিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল, তবু সিংহদ্বয় কোন কাতরোক্তি করিলেন না। কেবল 'অকাল' 'অকাল' শব্দে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। চক্রযন্ত্র স্বকার্য্য-সাধনে বিরত নহে। পিতাপুত্রের পবিত্র রক্তে ভূমিতল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তবু বীরেরা, বীরের ন্যায়, সব সহ্য করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া নবাব আবার তাঁহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। পার্থিব সুখ-সম্পদের যথেষ্ট প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু তাহাতে শিখেরা মুগ্ধ হইলেন না। তাঁহারা ঘৃণার সহিত নবাবের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তখন আবার চক্রযন্ত্র চলিতে লাগিল। পিতাপুত্রে অসীম যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। এরূপ যন্ত্রণা দিয়াও নবাবের তৃপ্তি হইল না। তিনি বালককে নিম্নমুখে টাঙাইয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। তখন লৌহদণ্ড অগ্নিতে পোড়াইয়া তদ্দ্বারা বালককে আঘাত করিতে লাগিলেন। বালক আর সহ্য করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'আমায় মুক্ত কর, মুক্ত কর। আমি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।' তথনই বালককে মুক্ত করা হইল। নবাব হৃষ্ট হইয়া পিতা সুবেগকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন—"সুবেগ! তোমার পুত্র অবশেষে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছে। তুমি বৃদ্ধ হইয়াও অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। কেন তুমি অনর্থক এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ? তোমার পুত্র সবজ স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে। পার্থিব সুখ-সম্পদে সে বিভূষিত

হইবে। নবাবের অন্তঃপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রূপবতী রমণী তাহার সেবার্থ প্রদত্ত হইবে।"

নবাবের এই কথায় সুবেগের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস পড়িল। তিনি একবার পুত্রের পানে চাহিলেন। সে চাহনীতে কত তিরস্কার, কত অনুযোগের ভাব মিশ্রিত ছিল। পরে তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সবজ! এ দেহ তোমার নহে। এক দিন এ দেহ অগ্নিতে ভস্ম হইবে। সাহস, সবজ! সাহস! কষ্টে বিচলিত হইও না। বিশ্বাস রাখিও। সবই মঙ্গলময় হইবে। ধর্ম্মের জন্য সানন্দে এই দেহ ত্যাগ কর। গুরু অর্জ্জুন, গুরু তেগ বাহাদুর, গুরু গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় এই ধর্ম্মের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়াছেন—।"

পাছে বালকের মতি "বিপথগামী" হয়, এই ভয়ে নবাব তথনই সুবেগের মুখবন্ধ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পিতার সামান্য ইঙ্গিতে পুত্রের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। শিখ-সুলভ সাহসে তাঁহার হৃদয় আবার পূর্ণ হইল। বালক নবাবের সকল প্রস্তাব পদাহত করিয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আমার দেহ নষ্ট কর। দগ্ধ কর। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। ইহাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহা আমার নয়। ইহা শিখ ধর্ম্মের বলি স্বরূপ গৃহীত হউক! মুসলমান হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় জ্ঞান করি।"

এই উত্তরে নবাব উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তথনই আবার চক্রযন্ত্রে তাঁহাদের পেষণ করা হইতে লাগিল। শেষে পিতাপুত্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাদের কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সেই কারাগারে কয়েক দিন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রথমে পুত্র পরে পিতা দেহ ত্যাগ করেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজা।

হে জননি, হে বরদা, আসিলাম পুন
শারদ উৎসবে এই, আঁধার প্রভাতে
তোমার চরণে দিতে পূজা উপহার।
এ নহে কমল, শুভ্র চন্দন-চর্চ্চিত,
রূপগন্ধে পরিপূর্ণ, এই পুণ্যদিনে
পূজে নরনারী তোমা যে সুন্দর দানে।
দেখ চেয়ে, দেখ মাগো, এনেছি কি দিতে!
যাতনায় পরিশুষ্ক, ছিন্ন মহাপ্রেম
হৃদয় শোণিতে মাখা, নৈরাশ্য আহত!
সুরধুনী নীর ত্যজি, নয়নের জলে
তাহাই করিয়ে ধৌত এনেছি, জননি!
লইবে কি এ দুর্দ্দিনে এ দুঃখীর দান?
হে তারিণি, দেখ আজি কণ্ঠ রুদ্ধ মোর,
আনন্দ নির্ঝরসম তব স্তব গান
ছুটিছে না মুখে, প্রাণ, স্তব্ধ বেদনায়।
ব্যর্থ আজি জনমের সমগ্র সাধনা
ব্যর্থ আজি পরিপূর্ণ মহাপ্রেম মোর;
নীরব মনের ভাষা, মৌন আর্ত্তনাদে
দারুণ বেদনা-পূর্ণ অনল শিখায়
প্রজ্জ্বলিত জীবনের আত্মাময় মূল।
তাহাই আহুতি লয়ে এসেছি জননি
তোমার চরণ মূলে দিতে উপহার!

সহসা হৃদয়পুরে উঠিল বাজিয়া
দেবীর আশ্বাস বাণী, অপূর্ব্ব রাগিণী!
"তোমার এ পূজা, বৎস লইনু সাদরে
স্বরগের পারিজাত তুচ্ছ এরি কাছে।
স্থির হও, বাঁধ চিত্ত; হয়োনা দুর্ব্বল
উন্মত্ত সাগর সম—যে নিরাশা বেগ
গরজিয়া ভাঙে তব জীবনের বেলা
এখনি মুহূর্ত্ত মাঝে থামিবে এ খেলা—
দূরে যাবে ঝঞ্ঝা বায়ু, শুধু রেখে যাবে
তটভূমি আলো করি প্রেম সুবিমল।
উঠ বৎস, চেয়ে দেখ, অনন্ত আকাশে
ভাতিছে প্রেমের-জ্যোতি তপন কিরণে;
সমীরণ প্রাণরূপী প্রেমের হিল্লোলে
সঞ্জীবিত রাখে ধরা। তব হৃদি মাঝে
সেইরূপ প্রেম ধরে অনন্ত শকতি।
তোমার যন্ত্রণা তীব্র, তব আত্ম দান
তোমার জীবন এই, তোমার মরণ,
হবে না নিষ্ফল কিছু; তব মহাপ্রেমে
জাগিয়া উঠিবে পুন শত মহা প্রাণ;
বরেণ্য হইবে তুমি সিদ্ধ সাধনায়;
তোমা সম প্রিয় পুত্রে এই আশীর্ব্বাদ।"

শ্রীমতী কমলা দেবী।

চয়ন।

স্যাটার-ডে রিভিউ।—সিপাহি বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং এদেশবাসীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে স্যার এভিলিন উড উক্ত পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক বলেন, বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ ব্যবহার অবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

লর্ড ক্যানিং পদ গ্রহণ করিবার পনের মাস পরেই ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভারতবর্ষে আঘাত প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি অবিচলিত ধৈর্য্যে, অধ্যবসায়ে এবং মহানুভবতায় সেই বিদ্রোহ দমনে চেষ্টিত হইলেন। ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে ভারতের এবং তাবৎ সমগ্র পৃথিবীর ইংরাজ সম্প্রদায়, ইংরাজ নারী এবং শিশু হত্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই দুঃসময়ে লর্ড ক্যানিং একাকী, এই বিপ্লব যাহাতে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত না হয় তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সমগ্র জাতির মন হইতে বিদ্বেষভাব দূরীকরণে যত্নবান ছিলেন। কলিকাতার একটি সমিতি এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে তাহারা গবর্ণর জেনেরালকে চাকরী হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিলাতে আবেদন করিয়াছিল—কারণ তাহাদের মতে এতাদৃশ দুর্ঘটনা কেবল গভর্ণমেণ্টের দৌর্ব্বল্য বশতই ঘটিয়াছিল; এবং উক্ত আবেদনপত্রে তাহারা রাজদ্বেষপূর্ণ দেশীয় সংবাদপত্র দমন, কলিকাতায় ভলণ্টিয়ার রাখা, উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে সৈন্য সকল প্রেরণ করা হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিল। আবেদনকারীরা ইহা বলিয়াছিল যে, দেশীয় লোকের শত শত বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট একজন মুসলমানকে মুসলমানদের আড্ডা পাটনা সহরে ডেপুটি কমিশনার করিয়া পাঠাইয়াছেন; কিন্তু ইহা উল্লেখ করে নাই যে উক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটী কলিকাতার এক জন রাজভক্ত খ্যাতিসম্পন্ন ব্যারিষ্টার। বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় সিভিলিয়ান শাসনকর্ত্তাদের হস্তে জীবন মরণের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৭ সালে জুলাই মাসে ক্যানিং উক্ত ক্ষমতার হ্রাস করেন; এবং বিদ্রোহী সৈন্যগণকে সুবিচারের জন্য সাময়িক বিচারালয়ে অর্পণ করিতে অনুমতি দেন। এইরূপ উত্তেজনা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না—ইংলণ্ডের অনেক বক্তা এবং লেখকেরা প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যানিং পরম সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত সহ্য করিতেন। সেজন্য অনেকেই তাঁর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্বদেশী সম্বন্ধে স্যার আর্থর ললির বক্তৃতা।—[illegible]দ্র জ "ইণ্ডষ্ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্সে" স্যার আর্থর ললি স্বদেশী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন "গভর্ণমেণ্ট স্বদেশীর উন্নতির কল্পে কিছু সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত আর্থিক উন্নতি ভারতবাসীর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ভারতবর্ষ শিল্পজগতে স্থান লাভের প্রয়াসী হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের প্রধান ব্যক্তিগণকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, এবং তাহাদিগকে বৃথা জাত্যাভিমান ত্যাগপূর্ব্বক সাহস ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হইবে, কারণ কর্ম্মেই উন্নতি লাভ হয়, বক্তৃতায় কিম্বা লেখায় তাহা পাওয়া যায় না। স্বার্থত্যাগ ও আত্মদমনের ফলে একত্রে মিলিত হইতে হইবে। এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। যদিও পন্থা অতিশয় দুরূহ ও দুর্গম; কিন্তু লক্ষ অতিশয় মহৎ ও গৌরবময়।

প্রকৃত পক্ষে মুক্তির পথ ইহাই। অধীর হইবার কারণ নাই—আত্মদান করিয়া বীরপদে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। একদিন যে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই; জগতের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

জিয়া বের আত্ম-কথা।—তুরষ্কে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী ঘোষণার পর যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে, কিম্বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, জিয়া বে, তাহাদের মধ্যে অন্যতম! তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলের গুপ্ত পুলীসের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি বিলাতের সংবাদপত্র লেখকদের জিজ্ঞাসায় এইরূপ বলিয়াছেন:—

২১শে জুলাই তারিখে প্রজাতন্ত্র প্রচারিত হইল। আমি বুঝিলাম, তাসিন এবং ইজ্জৎ পাশার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কপাল ভাঙিয়াছে!—এবং আমাদের পলায়ন করিতেই হইবে। কিন্তু কাহাকেই বা বিশ্বাস করি? কাল যাহারা আমাকে ভয় করিয়াছে—আজ তাহারা আমাকে হত্যা করিতে প্রস্তুত। একজন লোককে অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া আমি তাহার বাড়ীতে লুকাইয়া রহিলাম। ২৪শে জুলাই সুলতান আমাকে একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাঠান, তাহাতে লেখা ছিল "এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইউরোপে পলাইয়া যাও।" স্মির্ণা যাত্রী একখানি জর্ম্মান জাহাজের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জাহাজে উঠিবার পথে একজন পরিচিত লোক আমাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তাহাকে সেই খানেই গুলি করিয়া আমি দ্রুতপদে জাহাজে উঠিলাম এবং নিরাপদে স্মির্ণায় উপনীত হইয়া তথা হইতে একখানি মেল ষ্টীমারে "মার্সেলশ" আসিয়া পৌছিলাম। আমি উত্তমরূপে ক্ষৌরী হইয়া আমার ফেজ "পরিত্যাগপূর্ব্বক সোলাহ্যাট মাথায় দিয়া মিঃ গ্রে নাম গ্রহণ করিলাম!"

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—আপনি কি নূতন দলের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন?

অসম্ভব! তাহারা আমাকে কখনও ক্ষমা করিবে না! আমার কর্ত্তৃত্বকালে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বংশ সমূহের ১৭০ জনব্যক্তি গুপ্তভাবে নিহত হইয়াছে।

"আপনি কি বিবেচনা করেন যে, এই নূতন প্রথা চিরস্থায়ী হইবে?"

—জন্মকাল হইতেই ইহা সাফল্য লাভ করিয়াছে।

আপনি ভবিষ্যতে কোথায় বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন?

আমি লণ্ডনে স্থায়ীরূপে বাস করিব না; আমার ইচ্ছা আছে, কানাডায় একখণ্ড ক্ষুদ্র জমিদারী কিনিয়া তথায় বাস করিব। ইংরাজ শাসনের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

আপনি কি তুর্কীর নূতন প্রথার কল্যাণ কামনা করেন?

নিশ্চয়ই! সমস্ত প্রাণ দিয়া আমি তাহার মঙ্গল কামনা করি। তবে আমার এই দুঃখ যে, যাহাদের উপর আমি অত্যাচার করিয়াছি তাহারা আমায় ক্ষমা করিবে না।

বোমা মকদ্দামার ব্যয় প্রশ্ন।—"মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রে একজন "আংলো ইণ্ডিয়ান"

সংবাদদাতা বোমা ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ব্যয় সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়াছেন। লেখক বলেন, "আজ প্রায় তিন মাস ধরিয়া বোমা ব্যাপারে লিপ্ত ত্রিশজন আসামীর বিচার ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে চলিতেছে। একজন ব্যারিষ্টার হিসাব করিয়াছেন যে, এই ঘটনায় ব্যারিষ্টারদিগের "ফি" স্বরূপ গভর্ণমেণ্টের দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। অথচ এই সামান্য ব্যাপারে কোনরূপ খরচ না করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিজের লোকের দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারিত। আমরা জানিতে ইচ্ছুক যে, গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী এডভোকেট জেনেরাল, ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল, উকীল, লিগাল রিমেমব্রান্সারদিগকে ফেলিয়া গভর্ণমেণ্ট কেন প্রত্যহ একশত পাউণ্ড ফি দিয়া একজন অন্য ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন?' এই প্রশ্ন সম্বন্ধে "বেঙ্গলী"পত্র যাহা বলিয়াছেন আমরা [redacted] কিছু বলিতে চাহি না:—"এদেশীয় গভর্ণমেণ্ট, কোনরূপ কার্য্যের জন্য প্রজার নিকট দায়ী নহেন বলিয়া সাধারণের অর্থ এরূপভাবে খরচ করা কখনই উচিত নহে। গভর্ণমেণ্টের কি নৈতিক দায়ীত্ব বোধও নাই?"

রাজ্যের কথা।

তিলক প্রসঙ্গ।—জজ ডেভার তিলকের প্রতি যে হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের আদেশ দিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের গভর্ণার বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া তাহা ক্ষমা করিয়াছেন।

তিলক পত্নীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশার্থ সম্প্রতি বোম্বাইয়ের হীরাবাগে একটি মহিলা সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচশত জন ভারতবর্ষীয় মহিলা তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে 'তিলকের প্রতি যে বিচার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা আইন সঙ্গত হইতে পারে—কিন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। বিদ্রেহিতা প্রচার নহে—দেশ-ভক্তি প্রচার করাই তিলকের উদ্দেশ্য ছিল। জজ তাঁহার এই দেশভক্তির উপর বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহা দেশভক্তি বটে, কিন্তু অতি ভক্তি! ইহা নিতান্তই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ! উপসংহারে এই বলিয়া তিনি সভা ভঙ্গ করেন যে, ফরাসী দেশে "ক্যালে" নগরের অবরোধ কালে রাজ্ঞী ফিলিপা যেরূপ নিজে অবনত হইয়া রাজার নিকট হইতে দেশের লোকের মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারাও সেইরূপ রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের কর্ম্মচারীগণের নিকট দেশভক্ত তিলককে কঠোর দণ্ড হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রার্থনা করিবেন।

যুগান্তর।—সংবাদপত্রে প্রকাশ,—জনশ্রুতি এইরূপ যে, সম্প্রতি একখণ্ড "যুগান্তরে" প্রকাশিত হইয়াছে শীঘ্রই কলিকাতায় একটি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড হইয়া সমস্ত নগরী রুধির প্লাবিত হইবে। এ বাক্যে কি কিছুমাত্র বীরত্ব আছে—না মহত্ব আছে—না ইহাতে দেশের কিছুমাত্র মঙ্গল আছে? কোন দেশের পক্ষেই এরূপ নিষ্ঠুর হত্যা বা হত্যার সংকল্প পৌরুষজনক নহে; তাহা কাপুরুষোচিত জঘন্য কার্য্য মাত্র। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহাদের মতামতের জন্য দায়ী। এতাদৃশ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও তাঁহারা যে এইরূপ নৃশংস আচরণ, গর্ব্বের বিষয়—আস্ফালনের বিষয় বলিয়া মনে করেন ইহা দেখিলে লজ্জায় ক্ষোভে যেন মরিয়া যাইতে হয়। জার্ম্মনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী প্রিন্স বুলো সম্প্রতি সংবাদ পত্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় এইরূপ বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার একটি অঙ্গ এবং ইহার ক্ষমতা অসীম; কিন্তু উক্ত ক্ষমতা যেন কোন প্রকারে পীড়ন বা মিথ্যা প্রচারে ব্যবহৃত না হয়; সম্পাদকগণের দেশানুরাগী হওয়া উচিত; কিন্তু উক্ত অনুরাগের জন্য পরবিদ্বেষী হওয়া কোনমতেই উচিত নহে!

বারীন্দ্র আস্ফালনের জন্য নহে—নিষ্ঠুরতার জন্য নহে—সত্যই দেশের মঙ্গল হইবে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে হত্যা সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও পরে বুঝিয়াছেন যে এরূপ হত্যা স্বাধীনতার পথ নহে। আলিপুরের

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তিনি এই উক্তিতে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছেন।

নির্জ্জন কারাবাস।—নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যার পর আলীপুরের বোমার বন্দী সকলকেই নির্জ্জন কারাগা[redacted] হইয়াছে। চারুচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, নির্জ্জন কারাগারে থাকিয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহাকে নাকি একখানা কাগজ পর্য্যন্তও পড়িতে দেওয়া হয় না। আধুনিক সভ্যতার দিনে এরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতা অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়। ইহাতে বিচার কার্য্যের কোনই সহায়তা হয় না—কেবল বন্দীর অনর্থক কষ্টভোগ হয়। যাহারা ফাঁসী যাইবে তাহারা ফাঁসী যাক্—যাহারা দীপান্তরের যোগ্য তাহাদিগকে দ্বীপান্তরে পাঠান হউক; কিন্তু বিচার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কয়টা দিন তাহারা বাঁচে, গারদে থাকে—সে কটা দিন অন্ততঃ যাহাতে এরূপ কষ্ট না পায় তাহা দেখা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্ষুদিরামের ফাঁসীর পূর্ব্বে তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সকল কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন—তাহাকে পুস্তকাদি পড়িতে দেওয়া হইত। শুনা যায়. তাহার অভিপ্রায় মত তাহাকে নাকি দেবতার প্রসাদও দেওয়া হইয়াছিল। এইখানেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। কিন্তু এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ এ সব প্রতিকারে বড় মনসংযোগ করিতেছেন না। এখন মনুষ্যধর্ম্মের উন্নতি সহকারে পূর্ব্বের নিষ্ঠুরতা কমিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেকার দণ্ড সকল বর্ব্বরতা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই উন্নতির যুগে এইরূপ কষ্টকর নির্জ্জন কারাদণ্ড বৃটিশরাজের কলঙ্কের কথা। স্বদেশী কি বিদেশী মনুষ্যধর্ম্মী ভারতবাসিগণ সকলে মিলিয়া আবেদন করুন—যাহাতে বিচারেরপূর্ব্বে বন্দিগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করা না হয়। ইহাই আমাদের অনুরোধ। আশা করি, আমাদের দৈনিক সহযোগিগণ এ সম্বন্ধে অধিকতর আন্দোলন করিবেন।

কানাইলাল ও তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।—কানাইলাল দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার এ, এন, দত্ত, এল, এম, এস্, 'বন্দেমাতরম্' পত্রে কানাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

কানাইয়ের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট আবেদন করাতে তাঁহারা আমাকে জেল-সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিলেন। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আমাকে যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। আমি আমার মাতার পক্ষ হইয়া গোপনে কানাইয়ের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করাতে তিনি বলিলেন যে, অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমি দেখা করাইয়া দিতে পারি না। তিনি আমাকে জেলের দরজার নিকট অপেক্ষা করিতে বলিলেন। প্রায় তিন-ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর জেল-রক্ষক আমার নাম লিখিয়া লইল এবং খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। আমার সহিত দু'জন জেলার এবং দু'জন প্রহরী ছিল। সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একধারে প্রহরীবেষ্টিত গারদ! তাহার ভীম দরজা আমাদের জন্য খোলা হইল—এবং আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম,—আমাদের দক্ষিণের প্রথম কক্ষেই কানাই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় পদচারণ করিতেছে! তাহার চসমা না থাকার দরুণ সে আমাদের চিনিতে পারে নাই—তথাপি নির্ভিক দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখিল। সে আমার সহিত বেশ হাসিয়া কথা কহিল। আমি তাহার এইরূপ আচরণে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম! তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সমস্ত কথা আমি ভুলিয়া গেলাম। সে এরূপ উৎসাহের সহিত তাহার ফাঁসীর দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিল, যেন তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সে চলিয়া যাইতেই ব্যগ্র! সে মা'কে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল, এবং বলিল, যেরূপভাবে জেলে পরীক্ষা চলিতেছে তাহাতে মা'কে এখানে আনিবার দরকার নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুমতি দিলে, সে তার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত। সে এক মুহূর্ত্তের জন্য কাতর নয়! আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও মা'র আশীর্ব্বদ জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

সমালোচনা।

শারদোৎসব (নাটিকা)।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। প্রকাশক—কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থের বাহ্য চাক্‌চিক্য ও মুদ্রণের পারিপাট্য বেশ মুগ্ধকর হইয়াছে। সবুজ কভারে রঙিন রেশমীর বাঁধুনীতে যেন উৎসবের ভাব বিকশিত হইয়াছে! গ্রন্থখানি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়। এইজন্যই নাটিকাটি স্ত্রীচরিত্র বর্জ্জিত।

'শারদোৎসব' বলিলে আমাদের মনে সেই পুরাতন—কেবল প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে চির-নূতন—বসন্তোৎসবের মনোরম চিত্র ফুটিয়া উঠে! কিন্তু শরতে ও বসন্তে কত প্রভেদ! একটিতে অতি সংযত, সাত্ত্বিক ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ, অন্যটিতে সদ্যোদ্ভিন্ন, সুকুমার যৌবনের অতৃপ্তি-উচ্ছ্বসিত বিলাস-মাধুরী! তাই শারদোৎসব বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারী ছাত্রগণের অভিনয় উপযোগী হইয়াছে।

গ্রন্থখানি একখানি স্বাধীন নাটিকা হইলেও—ইহাই যেন শারদোৎসবের অনুষ্ঠান, এইরূপ মনে হয়! কবিবর বুঝাইয়াছেন;—ক্ষুদ্র ভিতরের সহিত বৃহত্তর বাহিরের সম্বন্ধ স্থাপন করাই উৎসব। ক্ষণিক দিনের আলোতে ক্ষণিকের গান গাওয়া; নিত্যকার নিবিড় কর্ম্মস্তূপের মধ্য হইতে একটু ছুটি নিয়া, 'বিনা কাজে বাশী বাজিয়ে' একটি দিনের তরে যে আনন্দ লাভ হয়,—তাহাই উৎসব! কবি তাই আমাদের শরতের সুনীল আকাশের দূরতম প্রান্তে, কাশপুষ্পের অম্লান শুভ্রতায়, শেফালিকার জীবন-মরণ অভিনয়ে,—শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে, খণ্ডমেঘে, নদীর কুল্‌কুল্ ধ্বনিতে যে বিরাট রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া জলস্থলে ও শূন্যে মহাসমারোহে প্রকৃতির বিশাল ভবনে যে উৎসব অভিনয় করে, আমাদের তাহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন!

গান গুলিতে এমনি-একটী মধুর তন্ময়তার আবেশ মাখান'—যে তাহা রবিবাবুরই নিজস্ব!

রবীন্দ্রবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা আর কি করিব। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক কাব্যামোদী এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অমৃতের আস্বাদ পাইবেন!

নবরত্নমালা।—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১॥• টাকা। এই গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত গ্রন্থকার, 'শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাব্য, বিবিধ কবিতা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত কবি তুকারামের অভঙ্গাদি' সুললিত পদ্যে অনুদিত করিয়াছেন। ইংরাজী কাব্য নাটকাদি হইতেও রত্নাদি সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন। সুধু যে প্রত্যেক সাহিত্যসেবী ইহাতে 'কাব্যামৃত রসাস্বাদ' করিতে পারেন তাহা নহে,—প্রত্যেক নরনারী, সংস্কৃত সাহিত্যের এক একটী প্রচবন হইতে,—তাহা যথাস্থানে সংপ্রযুক্ত হইলে,—অনেক উপদেশ, অনেক সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। মেঘদূতের অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে,—রচনায় সরলতায় আর ভাবের সহজবিকাশের এমন সুন্দর অনুবাদ আর নাই। তবে মনে হয়, মেঘদূতের দুএকটী শ্লোক অনুবাদে পরিত্যক্ত হইলে, গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইত। এই গ্রন্থে তুকারামের অভঙ্গগুলি যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনি সর্ব্বসাধারণেয় উপযোগী। ভক্তিপ্রবণ বাঙালীর গৃহে গৃহে সেইগুলি প্রতিধ্বনিত হউক!

ভুতুড়ে কাণ্ড।—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।৵• আনা। (ডবল ক্রাউন ২৪পেজী,) ১৭৩ পৃষ্ঠা। ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে মণিবাবুর 'সম্মোহন বিদ্যা' শীর্ষক যে সকল কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর, অনেক অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা আমাদের নিকট পত্র লিখিতেন। তাহা হইতেই বুঝা যায়, প্রবন্ধ সাধারণে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল। বাঙলা ভাষায় এ শ্রেণীর গ্রন্থ তেমন সুপ্রতুল নহে। পুস্তকখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না—এমনি বিচিত্র রহস্যপূর্ণ। পুস্তকের সরল ও অনাড়ম্বর ভাষা সহজেই হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে!

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

অসময়ে।

১

"এস সবে হইয়াছে দেব আবির্ভাব—
অর্ঘ্যভার প্রদানের হয়েছে সময়!"
আগ্রহে কহিল যবে পুরোহিত ডাকি
কেহ না শুনিল, কেহ উত্তর না কয়।
নীরব প্রাঙ্গণ শুধু উঠিল চমকি;
বাহিরে প্রমোদ-মগ্ন যত যাত্রিদল;
সে আহ্বান প্রতিধ্বনি মিলাইল ধীরে
ক্ষণতরে সুগভীর বেদনা চঞ্চল!

২

"এস সবে হইয়াছে দেব আবির্ভাব
অর্ঘ্যপূজা প্রদানের এই অবসর;"
আবার কহিল উচ্চে পুরোহিত ডাকি,
তবু না আসিল কেহ, না কোন উত্তর!
নির্ব্বাপিত হোল দীপ স্তব্ধ দেবালয়;
দেখিল, ফিরিয়া যবে এল যাত্রিগণ
নির্জীব প্রতিমাখানি রয়েছে দাঁড়ায়ে,
পূজার সময় গেছে, নাহি শুভক্ষণ!

শ্রীলজ্জাবতী বসুকন্যা।

গুরুদক্ষিণা।

১

চণ্ডিতলা একখানি সামান্য পল্লিগ্রাম। গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিবার সৌন্দর্য্য ও সংগ্রহ তাহার কিছুই ছিল না। সেই যেমন বঙ্গদেশের ঝোপঝাপ, প্রাচীন ও নবীন ঘন সবুজ বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যে সুরকি ও ইষ্টক খসিয়া পড়া, নোনা-ধরা ছোট ছোট বাড়ী, তাহার একপাশে ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে পানা, কলমী ও কুমুদ শোভিত সবুজ বর্ণের জলযুক্ত পুষ্করিণী, সকালবিকালে সেখানে পল্লিবাসিনীদের জনতা এবং স্ব ও পরকীয় চর্চ্চা আর দ্বিপ্রহরের অনাহত শান্তি এবং অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। গ্রামে প্রবেশ করিবার মুখে ডানহাতি গোচারণের প্রশস্ত মাঠ ও দূরবিস্তৃত জলাভূমি আকাশের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ধু ধু করিতেছে। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিশ্বাস ছিল কোন রকমে সেই বৃক্ষবর্জ্জিত সুদূর জলার শেষে পৌঁছিতে পারিলেই তাহারা হাত দিয়া আকাশের শুভ্র মেঘপুঞ্জ আঁকড়িয়া ধরিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশখানাকে নোওাইয়া ফেলিয়া উচ্চ শাখার ফুলের মতন তাহা হইতে নক্ষত্রগুলা পাড়িয়া আনিতে পারিবে। তাই যখন জলার পার হইতে বলদের উপর ভার চাপাইয়া, কৃষকেরা শষ্য বেচিতে আসে, ব্যবসায়িরা মেটে পাথর চালান আনে তখন তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতে বালকদের আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যেদিন তাহাদের গোপালদাদা বা হারান কাকা ঘৃত বা আখের গুড় লইয়া জলাপারে যাত্রা করে তাহারা চারি পাশে

ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মহা কলরোলে তাহাদিগকে নক্ষত্র সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। মাঠের বটগাছতলায় নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গোচারকের গান যেমনি কেন বেসুরাই হোক না গ্রামের মধ্যে তাহার সুরটুকু বাতাসের শব্দে বেশ মধুর হইয়াই প্রবেশ করিত। রাস্তার ওপারে ধানের ক্ষেতে সোনার ফসল পাকিয়া উঠিলে কৃষক-যুবার আনন্দ কণ্ঠ উপরের আকাশে ধ্বনিত হইতে থাকিত। এবং কৃষক বালকের আনন্দ কোলাহলে, কৃষকবধূর তাবিজ ও লবঙ্গফুলের ঠুন্‌ঠুনানিতে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিত। এই ত আমাদের পল্লির ইতিহাস।

ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথিতে চণ্ডিতলায় সাতদিন ব্যাপিয়া এক সুদীর্ঘ মেলা সেই কোন অজানা কাল হইতে বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল। সে মেলায় গরু মহিষ হইতে কাঁঠাল আনারস, এবং মাটির সবেনে পুতুল ও আহ্লাদে পুতুল প্রতি বৎসরই অপর্য্যাপ্ত আসিয়া জমিত। সেই সময় নবজাগ্রত, নব হিল্লোলিত বাতাসে পাল তুলিয়া, কখন বা অবিশ্রান্ত বর্ষাধারায় পরিপূর্ণাঙ্গী নদীটির দুই তীরকে মুখরিত করিয়া নানা দেশ বিদেশ হইতে বোঝাই লইয়া ছোট বড় নানা আকারের নৌকা আসিয়া মেলার ঘাটে ভিড়িত। নিকটবর্ত্তী ও দূরস্থ সহর হইতে যাত্রার দল ও সৌখিন বাবুর দল বেহালা হারমোনিয়মের সঙ্গে টপ্পা ও মানভঞ্জনের পালা গাহিয়া নিশান ও ফুলের মালায় নৌকাকে বিচিত্র করিয়া মেলার দিকে স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিত। গ্রামে ও গ্রামপ্রান্তের সেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠখানাতে যেন একটুখানিও স্থান থাকিত না। আজও মেলায় তেমনি ধূম। বেশির ভাগ এখন কাঁচের চুড়ি কাচের পুতুল, এবং কাপড়ের ফুলে দোকানগুলা ছাইয়া ফেলিয়াছে। পিতল কাঁসার বিখ্যাত দ্রব্য ঠেলিয়া ফেলিয়া, রঙ্গিন রঙ্গিন সুবিচিত্র এনামেল ও কাঁচের বাসন মেঘফাটা পিতাভ রৌদ্রের রশ্মিপাতে অত্যন্ত লোভনীয় দেখাইতেছে। চাষাদের মেয়েরা ঝুটাঝরির পাড় বসান রঙ্গিন ফুলদেওয়া প্রভাবতী সাড়ি ও গ্ল্যাডষ্টোন চুড়ির জন্য আব্দারে,—এনামেলের বাসনে লোলুপমানা জননীকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। এবং মার্চ্চেণ্টের এজেণ্টের কাছে কৃষকস্বামী সদ্য শষ্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থলাভ করিয়াছে, কৃষকপত্নী সম্বৎসরের অন্নচিন্তা ভুলিয়া আয়নাবসান কাঞ্চণমণি চুড়ি ও কেমিকেলের দড়াহারের সহিত দুই চারিখানা কাঁচ এনামেলের বাসনে সেই অর্থ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রমকাতর ও অর্দ্ধাহার শীর্ণ স্বামীর সহিত ঘোরতর কোন্দল লাগাইয়া দিয়াছে। ছেলের দল গায়ে কাল ছিটের জামা এবং পায়ে ফুল মোজা পরিয়া মুখে সিগারেটে আগুন ধরাইয়া একখানি সিল্কের রুমাল বা একটি ইউডিকলন, বা এসেন্স্‌ অব্‌ রোজ কিনিয়া মসমস্‌ শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এবার মেলার ভারি জাঁক। গ্রামের মধ্যে রামহরি সান্ন্যাল একটুখানি প্রতিপত্তি-শালী লোক ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা পদ্মা তাঁহার সে প্রতিপত্তিটুকুতেও কিছু অংশ লইয়াছিল। তাহার মন্থরগতি, বিনম্র কথা এবং হাসি হাসি মুখখানি গ্রামের প্রাণে একটি স্নেহমাখা করুণার ঢেউ তুলিত।

গ্রামের বিজ্ঞ বিজ্ঞা হইতে ছোট ছোট সঙ্গী সঙ্গিনীরা পর্য্যন্ত এই অচঞ্চল প্রকৃতি ক্ষুদ্র মেয়েটিকে সমান চোখে দেখিত। কেবল পদ্মা তাহার অপ্রদীপ্ত সুবিশাল স্নিগ্ধ নেত্রের সুকোমল দৃষ্টিপাতেও হরীশ ঘোষের ভাগিনেয় যতীশের অদম্য হৃদয়কে নত করিতে পারিত না। গ্রামের মধ্যে হরীশ ঘোষের ভাগিনেয় যতীশের মতন আর একটি বালক জন্মিলে গ্রামখানি যে এতদিন কোন কালে রসাতলে প্রবেশ করিত সে বিষয়ে গ্রাম এবং গ্রামান্তরস্থ যাহারা কার্য্যব্যপদেশে এ গ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। অনেকেই আবার শুধু এক গ্রাম ছাড়িয়া সাতখানা গ্রামের সহিত তাহার বিক্রমের সংযোগ করিয়া বলিতেন "সাতগাঁয়েও অমন ছেলে দুটি জন্মায়নি সেই মহাভাগ্য।" এই অতুল্য ভাগিনেয়টিকে লইয়া নিরীহ প্রকৃতি হরীশ বেচারা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকালবেলা কেশবিরল মস্তকে ও অনুচ্চ উদরে তৈল সিক্ত করিয়া গামছা কাঁধে নদীর পথে বাহির হইয়া পুনঃপ্রত্যাগমন পর্য্যন্ত পথের দুই ধারে কত লোকেই যে তাঁহার কাছে নালিস রুজু করিতে আইসে তাহার সংখ্যা নাই। কেহ আসিয়া বলে, 'খুড়ামশাই তোমার ভাগ্‌নে কাল আমার ক্ষ্যাত হতে অড়র কলায়ের গাছ অর্দ্ধাঅর্দ্ধি কেটে নিয়ে গ্যাছে।' কেহ বলে 'আমার কেলে বাছুরটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেচে কোথাও খুঁজে পাচ্চি না।' কোন বালক অঙ্গের আঘাত চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া বিচার প্রার্থনা করে। কোন পল্লিবাসিনী সুশীলা ভগ্ন কলসীর প্রতিশোধে ঘোষগুষ্টির চতুর্দ্দশ পুরুষের পারলৌকিক সুব্যবস্থা প্রদান করিতে থাকেন। এইরূপে স্বল্পভাষী সহশীল মাতুল চারিদিকের আক্রমণে অস্থির হইয়া উঠিতেন। কাহাকেও বা শান্ত করিতে পারিতেন, কাহাকেও বা পারিতেন না, এক একস্থলে নিজেকেই যথেষ্ট অপমানিত হইয়া আসিতে হইত। কিন্তু এত অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহিয়াও নিজে ভাগিনেয়কে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে সাহস হইত না। তাহার কারণ যে শুধুই তাহার হস্তে নিগ্রহ ভোগের ভয় তাহা নহে, সেটাও একটা আংশিক কারণ হইলেও প্রধান কারণ, সে তাঁহার দুর্দ্দমনীয়া পত্নী ভামিনীমণির একান্ত প্রিয়পাত্র।

গলায় পড়া অনাথ ছেলেটা হরীশের প্রথম স্ত্রীর নিকট অত্যন্ত অনাবশ্যক বলিয়া ঠেকিলেও নতুন গৃহিণী ভামিনী তাঁহার প্রতি অপর্য্যাপ্তরূপে সন্তুষ্ট ছিলেন। সে দত্তদের সবচেয়ে মিষ্ট পেয়ারাগাছের আগা হইতে অর্দ্ধপক্ক পেয়ারা ও পোদ্দারদের জামগাছের সার সংগ্রহ করিয়া মাতুলানীর অঞ্চল ভরিয়া দিত। গ্রামান্তর হইতে দুর্ল্লভ কাঁচের চুড়ি, পুতুল ও পুঁথির মালা কিনিয়া আনিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত। এমন কি সন্ধ্যাবেলা যখন বৃদ্ধ হরীশ, বোসেদের চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া পিতামহের আমলের পুরাতন খেলো হুঁকায় কড়া তামাকু টানিতে টানিতে সেই আমলেরি গল্প করিতে থাকিতেন, যতীশ সেই নির্জ্জন সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ কিশোরী মাতুলানীর নিকট ছেলে মেয়ে জুটাইয়া আনিয়া তাস খেলার সাহায্য পর্য্যন্ত করিত। ভামিনী এদিকে যাহাই হোক্‌ অকৃতজ্ঞ ছিল না। সেও সেই

উপকারের প্রতিদানে হরীশের প্রহার ও গালি হইতে তাহার উপকারককে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদিন একদিন অত্যাচার অসহ্য হইলে যদি হরীশ তাহাকে কিছু বলিতেন তাহার পর তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িত। যতীশ রাগ করিয়া মামীর ঘুষ যোগাইত না। ভামিনী সে ক্ষতি বৃদ্ধ স্বামীর উপর দিয়া পুরণ করিয়া লইত। কান্নাকাটি অনাহার ও আত্মহত্যার ভয় প্রদর্শনে ব্যাকুল হইয়া হরীশ অবশেষে তাঁহার তরুণী পত্নীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গুরুতর শপথ করিয়া ফেলিতেন যে যেমনই কেন পাড়ার নিন্দুক মিথ্যাবাদীরা লাগাক না তিনি যতীশকে কখনও কিছু বলিবেন না। এইরূপে যতীশের অত্যাচার গ্রামের উপর নির্ব্বিঘ্ন হইত এবং সেজন্য ভামিনীর খেলা বা পেয়ারা ভক্ষণে বড় ব্যাঘাত ঘটিত না!

সান্যালদের মেয়ে পদ্মা সেদিন যখন স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে গামছা হাতে এলোচুলে বাড়ীর পথে যাইতেছিল তখন পথের একটা কাঁঠাল গাছের তলায় অনেকগুলি সঙ্গী লইয়া ছেলেদের সদ্দার যতীশ কচি আম গাছের মুলোৎপাটন পূর্ব্বক ভেঁপু তৈয়ারি করিতেছিল। পদ্মা কৌতূহলের সহিত সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব শিল্প কৌশল দেখিতে লাগিল। সে ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু এই আশ্চর্য্য শিল্প রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হয় নাই। যতীশ একে একে অনেকগুলা ভেঁপু তৈয়ারি করিয়া সকলকে বিতরণ করিল তারপর অবশিষ্ট দুইটার মধ্যে একটা লইয়া সজোরে তাহাতে ফুঁ দিয়া বাজাইয়া বলিল,—

"কি রে তোর একটা চাই নাকি!" পদ্মা সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া হাত বাড়াইল,—যতীশ হাত সরাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল "ইস্ অমনি দোব বই কি, আগে তুই আমায় কি দিবি তা বল?" পদ্মা অপ্রতিভ হইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল "কি দোব বলোনা?" "তোর মা খুব ভাল মিঠে আমসী করে, কুড়িখানা তাই যদি আন্‌তে পারিস্ তবে ভেঁপু পাবি। নৈলে এ ভেঁপু তৈরি করা কি না সহজ"। পদ্মার মুখ ম্লান হইয়া আসিল, ভয়ে বলিল "কুড়িখানা আম্‌সী আমি কোথা পাবো? মা তো দেবেন না, আমি পাঁচখানা এনে দোব"। যতীশের দল হাসিয়া উঠিল, যতীশ সদম্ভে কহিল "ইঃ পাঁচখানা আমসী দিয়ে ভেঁপু নেবেন। মেয়ের ভারী আহ্লাদ যে দেখতে পাই। "পদ্মা কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল, 'আমি এত কোথা পাবো?" "কেন চুরি করে আনবি"। যতীশ অনায়াসে এই পরামর্শ দিলেও ঝিন্‌মিনে প্যান্‌প্যানে মেয়েটা এই সদ্‌যুক্তি কিছুতেই গ্রহণ করিল না। এইজন্যই এই দলের সহিত তাহার মিল হইত না। অবশেষে এই পাঁচখানা আমসির উপর একখানি আমস্বত্বর কিছু অংশ স্বীকার করিয়া লুব্ধা বালিকা আনন্দের সহিত ভেঁপু লইল। কিন্তু তেমন বাজিল না দেখিয়া পদ্মা ক্ষুণ্ণ হইলে যতীশ অগ্রাহের সঙ্গে বলিল, 'কুড়িখানা 'আম্‌সি দিতিস ভেঁপুও খুব জোরে বাজ্‌তো, যেমন দান তেমনই দক্ষিণা হবে ত।'

২

আমরা যে বছরের কথা বলিতেছি সে বছর অত্যন্ত বর্ষা সত্ত্বেও চণ্ডিতলায় মেলায় বড় ধুম লাগিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চল হইতে সখের থিয়েটার ও ঢাকা হইতে যাত্রার দল আসিয়া সেই ত্রেপান্তরের মাঠে তাঁবু খাটাইয়া মহাসমারোহে অভিনয় দেখাইতেছে। গ্রামান্তরের লোকে গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। কনসার্টের বাজনায় গ্রাম্য সঙ্গীত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে গ্রামবাসীরা বিস্ময় আনন্দে চকিত

হইয়া রহিয়াছে। ছেলেমেয়েদের আনাগোনা এবং মেয়েদের উমেদারির কামাই ছিল না।

পূর্ব্বদিন বৃষ্টির জন্য অভিনয় বন্ধ ছিল। আজ রাত্রে নূতন থিয়েটারের দল ভারতমাতা অভিনয় দেখাইবে। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্ব হইতেই দর্শনার্থীরা স্থানার্থী হইয়া অভিনয় স্থলে বিপুল জনতার সৃষ্টি করিতে লাগিল। দূরগ্রাম ও সহর হইতে বড় বড় গাড়ি জুড়ি পল্লিপথ কম্পিত করিয়া অভিনয় স্থলাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। গৃহস্থবাড়ী গৃহবাসিনীরা তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে গিয়া এক কর্ম্ম সাতবারেও শেষ করিতে না পারায় রাগিয়া ছেলে পিটাইতেছেন। না হয়তো হাঁড়ি বেড়ি আছড়াইয়া ক্ষোভ মিটাইতেছেন। বধূ ও পল্লীবাসিনী যুবতীর দল বর্ষায় পরিপুর্ণ পুষ্করিণীর তীর মুখরিত করিয়া সকাল সকাল গা-ধুইতে গিয়াছে। কেহ বা তখন আয়নার সম্মুখে বসিয়া দ্রুতহস্তে আলবার্ট ফ্যাসানে চুল আঁচড়াইয়া সোনালি জরি জড়াইয়া খোঁপা বাঁধিতেছেন। গহনা বস্ত্র যাহার যাহা কিছু ছিল বাহির হইয়াছে; যাহার কিছুই ছিল না, সেও দুইগাছা কাঁচের চুড়ি ও একখানা ক্রেপের সাড়ি কিনিয়া মান বজায় রাখিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া কোন প্রধান ঠাকুরদাদা তাঁহার সুসজ্জিতা নাতিনীকে বলিতেছিলেন "ওরে বাপু তোরা থিয়েটার দেখতে যাবি না থিয়েটার করতে যাবি?"

পদ্মার মা মেয়ের লাল ফিতায় মোড়া খোঁপাটি ফিরাইয়া গামছা দিয়া গা মুছাইবার সময় হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন তাহার বামহাতের কাঁচের চুড়ি তিন গাছিই নাই। ক্রোধে বিস্ময়ে রুঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যতীশদাদা ভেঙ্গে দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে ও অস্থিদাহকারী' দস্যু ছেলের সম্বন্ধে অনেক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অবশেষে মেয়েকে বলিলেন;—

"বুড়ো মেয়ে! হাত শুধু করে দেশশুদ্ধ লোকের মাঝখানে যাবি কেমন করে? যা আট আনা দিয়ে তোর সই যেমন চুড়ি পরেছে, তেমনি রংয়ের চুড়ি পরে আয়গে।"

তখনই চুড়ি পরিতে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও মায়ের হুকুম পালনে বিলম্ব করা বিপদ জনক বলিয়া পদ্মা পয়সা লইয়া নীরবে চলিয়া গেল।

তখন রাস্তায় স্রোতের মতন লোক ছুটিয়াছে। বড় বড় গাড়ি আসিয়া মধ্যে মধ্যে কোন একটা দোকানের সম্মুখে থামিতেছে—এবং একটু পরে আবার তাহার 'সুবেশধারী আরোহীদের লইয়া থিয়েটারের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। একটা সিগারেটের গন্ধ বা এসেন্সের সুবাস সকৌতুক উচ্চ হাস্যের সহিত পথের বায়ুস্তরের মধ্যে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছিল। গাড়ির গম গম শব্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনভ্যস্ত কর্ণে বাজিতে ছিল এবং চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল।

যে দোকানে পদ্মা চুড়ি পরিতে বসিয়াছিল তাহার সম্মুখে একখানা বড় জুড়ি থামিল এবং তাহার মধ্য হইতে দুইটি বাবু নামিয়া দ্রুতপদে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিক্রেতা ও ক্রেতাকে বিস্ময়চমকিত করিয়া তুলিল। দোকানী বালিকার সুগোল হাতখানি ছাড়িয়া নির্ব্বাচিত চুড়িগাছি ভুমে রাখিয়া

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সৌজন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—

"আজ্ঞে কি চাই বাবু?" বাবুদ্বয় দোকানের দ্রব্য সামগ্রীর উপর অনুসন্ধিৎসু নেত্রপাত করিতেছিলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন, "এতগুলো দোকান দেখলাম কোথাও একটা মাত্র দেশী জিনিষ নেই। পরাণ, আমাদের এ কি অবস্থা হলো?"

সম্বোধিত বাবুটি একটু মুখ মুচকিয়া মোসাহেবী হাসি হাসিল। তাহাতে দুঃখ প্রকাশ পাইল না। দোকানী বাবুদের ভাবভক্তি ভাল বুঝিতে না পারিয়া পুর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মার হাত লইয়া চুড়ি পরাইতে বসিলে, বাবুদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। প্রথম বাবুটি তাহাকে কাছে ডাকিলেন সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি বিলিতি চুড়ি পরছো কেন?" এ প্রশ্নের অর্থ সে বুঝিল না দেখিয়া আবার বলিলেন, "কাঁচের জিনিষ বিলিতি, ও পরতে নেই, তোমার সোনার কি রূপোর চুড়ি নেই?" বালিকা কুণ্ঠিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না'। বাবু একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন "আচ্ছা, শাঁখা পরতে পার তো, পরবে?" বিস্মিতা বালিকা অপরিচিতের প্রশ্নের উত্তরে একটা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, "আচ্ছা আমি কালই ঢাকা থেকে একজন শাঁখারিকে এখানে আনিয়ে দিচ্চি, তুমি আর কক্ষণো বিলিতি চুড়ি পরবে না বলো? অমন লক্ষ্মীর মতন হাতে ও বিদেশী জিনিষ মানায় না!"

এ স্তুতিবাদের অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পদ্মা মনে মনে একটা আনন্দ অনুভব করিয়া স্বীকার করিল, সে কখনো বিলাতি চুড়ি ও পুতুল কিনিবে না।

গাড়ি চলিয়া গেলে ডানহাতের আধুলিটি আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া পদ্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। দোকানী জিজ্ঞাসা করিল "কি মা চুড়ি পরবে না?" সে ঘাড় নাড়িল "না"। দোকানী বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" বালিকা দৃঢ় স্বরে বলিল "ও বিলিতি চুড়ি"। দোকানী এবার ক্রুদ্ধভাবে বলিল "তা হোলই বা, দেশশুদ্ধ পৃথিবীশুদ্ধ সবাই তো পরছে, তোমার বেলাই বিলিতি? পরে যাও"। বালিকা একটি কথাও না বলিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ী আসিলে মা বলিলেন "কৈরে কি চুড়ি পরলি দেখি? হাত লুকিয়ে রৈলি কেন দেখা না"? জোর করিয়া কাপড়ে লুকান হাত টানিয়া বাহির করিয়া সক্রোধে বলিলেন "কই চুড়ি কি হলো?" কন্যা কথা কহিল না। মা গর্জ্জিয়া বলিলেন "আবার বুঝি সেই মুখপোড়াটা ভেঙ্গে দিয়েছে?" কাঁদো কাঁদো হইয়া কন্যা কহিল "আমি পরিনি"। "কেন?" "চুড়ি যে বিলিতি"। "বিলিতি আবার কি?" পদ্মা মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল "হ্যাঁ বিলিতি। তিনি পরতে বারণ করেছেন।" মাতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কে?" "সেই খুব বড় গাড়ি করে এসেছিলেন, বলেছেন কাল শাঁখাওয়ালা পাঠিয়ে দেবেন।" ব্যাপারটা ভাল না বুঝিতে পারিয়া মাতা নিরস্ত হইলেন, তথাপি একটু ঝঙ্কার দিতে ছাড়িলেন না. বলিলেন "থাক্ তবে সং সেজে, দিচ্চে তোমায় শাখা পাঠিয়ে।"

পরদিন এই ব্যাপার কেমন করিয়া যতীশের কানে উঠিল। সে মহাকৌতুক বোধ করিয়া চাঁদা তুলিয়া খুব ভাল একজোড়া কাঁচের চুড়ি ও একটা সিল্কের গাউনপরা মোমের পুতুল কিনিয়া লইয়া সান্যালদের বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া একেবারে খিড়কির দোরে গিয়া ডাকিল—

"পদ্মা শুনে যা।" পদ্মা তখন ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াইতে ছিল। অলঙ্ঘ্য আদেশে বাধ্য হইয়া উঠিয়া আসিল। যতীশ তাড়াতাড়ি উপহার দ্রব্যগুলা তাহার হাতে গুজিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল "তোকে দিলুম, এর বদলে কিছু দিতে হবে না, তুই নে'। বলিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পদ্মা প্রাপ্য সামগ্রীগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া সব বুঝিল। বুঝিয়া মুহূর্ত্তে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত্তের জন্য সামান্য একটা যে প্রলোভনের ভাব মনের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছিল, সেটা মুহূর্ত্তের মধ্যেই সরাইয়া ফেলিয়া রুষ্ট কণ্ঠে ডাকিল "যতীশদা" "যতীশ বেড়ার পাশে শুঁড়ি মারিয়া বসিয়াছিল, উত্তর দিল না। তখন পদ্মা সেই উপহার দ্রব্যগুলা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মানুষের জীবনে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যে, একমুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সমস্ত জীবনের গতি সেই একটি ক্ষুদ্রতর ঘটনায় এমন অদ্ভুতভাবে, এমনি সহসা সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া দাঁড়ায় যে চারিদিকের লোকে এমন কি নিজে পর্য্যন্ত স্বপ্নেও সে কথা কখনো কল্পনা করে নাই। এ পরিবর্ত্তন ঘটাইবার সাধ্য শুধু সেই মহাশক্তিময়ী মানব জীবনের অধিষ্ঠাত্রী ভিন্ন আর কাহারো নাই এবং মানবপ্রকৃতি কেবল সেই এক রহস্যময়ীর শাসনদণ্ডতলে সম্পূর্ণ পরাজিত। বালিকার সেই অপমানিত বেদনার সুগভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস সেদিন নিষ্ঠুরপ্রকৃতি যতীশের হৃদয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত করিল। বালির প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া সে অন্তরালে বসিয়া হাসিবে ভাবিয়াছিল, এখন তাহার মুক্তবেদনার ব্যাকুল ক্রন্দন তাহার বক্ষে সবেগে লাঠির বাড়ি মারিল। সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া আবার সেই বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বালিকার কাছে অপরাধীর মতন আসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—

"পদ্মা!" পদ্মা এবার যতীশের সাড়া পাইয়া শান্তচোখে সজল বিদ্যুৎদগ্নি বর্ষণ করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল "নিয়ে যাও তোমার চুড়ি, নিয়ে যাও তোমার পুতুল, শীগগির নিয়ে যাও বল্‌ছি, না হলে আমি এক্ষুণি কুচি কুচি করে ভেঙ্গে ফেলে দেব! আমি কি তোমার মতন মিথ্যাবাদী?"

সেই তীব্র তিরস্কার, সুগভীর লাঞ্ছনা সেদিন কিছুতেই যতীশকে ক্রোধে উত্তেজিত করিতে পারিল না। বরঞ্চ তাহা ডাক্তারের ল্যান্সেটের মতন তাহার হাড়ে হাড়ে কাটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মনের মধ্যে একেবারে বসিয়া গেল। লজ্জায় আপদমস্তক পূর্ণ হইয়া সে অধোমুখে বলিল—

"মাপ কর ভাই পদ্মা, আর কক্ষণো এমন কাজ করবো না, এবার আমায় মাপ কর।" পদ্মা সহসা বিস্মিত হইয়া যতীশের মুখের দিকে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, সে এমন উত্তর ও এরূপ স্বর আশাও করেন নাই। যতীশ একবার অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া ভূমি হইতে চুড়ি ও পুতুল কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। এবার বেড়া ডিঙ্গাইয়া গেল না, সদর দরজা দিয়া ভদ্রলোকের মতনই গেল। মেয়ে বাড়ী আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন "যতেটা কি নিয়ে গেলরে?" পদ্মা বলিল "চুড়ি আর পুতুল"। "এনেছিল কেন?" গম্ভীর মুখে পদ্মা বলিল "আমায় দিতে"। "তবে নিয়ে গেল যে? তুই নিলিনি বুঝি? এমন বোকা মেয়েও দেখিনি।"

পরবৎসর চণ্ডিতলার মেলায় শাখার চুড়ি ও কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, পিতল কাঁসার বাসন এবং ফরাসডাঙ্গা ও বরানগরের সাদা ও রঙ্গিন সাড়ির প্রচুর আমদানী আসিয়াছিল। কাঁচের জিনিষের আমদানী ও বিক্রয় সমান চলিলেও এ সমস্ত জিনিষও নিতান্ত অনাদৃত হয় নাই। একটু অবস্থাপন্ন ঘরে কাচের পরিবর্ত্তে মেয়েরা শাঁখাটাই পছন্দ করিতেছিল। তবে চাকচিক্য ছাড়িয়া চাষাভূষারা বড় একটা পিতল কাঁসা বা দেশী ধূতি কিনিতে রাজী ছিল না। যে কয়জোড়া মিলের ধূতি ছিল তাহা একদিনেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল কিন্তু দাম

বেশি বলিয়া মিহি ধুতি কেহ কিনিতেছিল না। অবস্থাপন্নরাও ফরাসডাঙ্গা সাড়ীর অপেক্ষা সেই দরে রঙ্গিন ফুলদার বিজলীপ্রভা সাড়িতে অধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বাজারের সবচেয়ে বড় দোকানী ভারি চটিয়া উঠিয়া সদলে মিলিয়া একজন বিলাতি বস্ত্র ক্রেতাকে ধরিয়া খুব পিটাইয়া দিয়া তাহার কাপড় ছিনাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। হাসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—

"বেটা বিলিতির লোভ ছাড়তে পারো না! আজ কাপড় পুড়িয়েছি এবার যেদিন বিলিতি জিনিষ কিন্‌বে তোমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দোব, জানোনা আমার নাম যতীশ ঘোস।"

বাস্তবিক সে বেচারী তাহা জানিত না, অর্থাৎ নাম জানিলেও সে নামের মহিমা সে জানিত না, সে নিতান্তই দূর গ্রামের লোক! সে মার খাইয়া নিকটস্থ থানায় নালিশ করিতে চলিল। যে সমস্ত দর্শকগণ দূরে দাঁড়াইয়া তাহার নিগ্রহ দেখিতেছিল তাহাদের দুএক জনকে সাক্ষী মানিতে গেলে তাহারা সভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল—

"বাপরে যতি বাবুর বিরুদ্ধে কে কথা কইবে! আর তুমিও বাপু আর বাড়াবাড়ি করোনা ভাল চাও তো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।"

সে বেচারা আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া থানায় গিয়া নিজের অঙ্গের প্রহারচিহ্ন দেখাইয়া নালিস করিল।

দারোগা সাহেব তদারক উপলক্ষে দোকানদার গণের নিকট হইতে পাদ্য অর্ঘ মায় দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রমাণ নাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরেই একখানা জুড়ি গাড়ী আসিয়া যতীশের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তাহা হইতে একজন যুবক নামিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"একি কাণ্ড করেছ?" যতীশ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "আপনি শুনেছেন? তা মন্দ কি করেছি বলুন?" যুবক বলিলেন "মন্দ নয়! বল কি যতীশ। ভারী অন্যায় কাজ করেছ। আমরা যে কাজ নিয়েছি তাতো জবরদস্তির কাজ নয়, অনুরোধে যে গলাবে, ভক্তিতে যে গলাবে সেই মাতৃভূমির সন্তানের কাজ করবে। দেশের জন্য যে হৃদয় উৎসর্গ করবে সে হৃদয় মধ্যে নিষ্ঠুরতা পাশব-বৃত্তিকে স্থান দিতে পারে না, তাকে করুণায় মমতায় দেশ গলিয়ে ফেলতে হবে। ছি ছি এমন কাজ আর করোনা। আমাদের অসীম ধৈর্য্য সহকারে অল্পে অল্পে দিনে দিনে সযত্নে সহজ পথে অন্যের হৃদয় অধিকার করে নিজের এই আরব্ধ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার পথে অগ্রসর করতে হবে। এ কাজ তো সহজ নয়। এ কাজে ভারতকে এক করতে হবে; তাহা প্রহার ও অত্যাচারের দ্বারা কখনও হবার নয়। মিষ্ট কথা সৎব্যবহার এবং অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মপথ এই তিনের সাহায্য ভিন্ন উল্টা পথে যা করতে যাবে, জেনো তাতে সফলতার পরিবর্ত্তে ব্যর্থতাকে টেনে আনবে! বুঝতে পেরেছ তোমার কাজটি ভাল হয়নি?"

যতীশ নতমস্তকে অপরাধ স্বীকার করিল। তখন তিনি বলিলেন "সে গরীব লোকটিকে কাপড়ের জন্য পাঁচ টাকা ও গাড়ি ভাড়া বলে পাঁচ টাকা দিয়েছি। দারোগা সাহেবও কিছু পেয়েছেন। কিন্তু সাবধান এবার যেন রক্ষা পেয়ে গেলে, বরাবর পাবে না। এ কথা যদি একবার সহরে পৌঁছয়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানে যায় তোমায় কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাছাড়া আমাদের স্বদেশী প্রচার সম্বন্ধে ওদের একটা অহেতুক বিদ্বেষ জন্মে থাকবে সকলেই দোষ ধরতে বসবে, কোন কাজই হবে না।"

সেদিন লজ্জিত যতীশ থিয়েটারের আমোদ পরিত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে স্বহস্তে লাঞ্ছিত ব্যক্তির সন্ধানে বাহির হইল। গ্রাম-

ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহাকে অনুসন্ধানে বাহির করিয়া যতীশ যোড়হাতে একেবারে বলিয়া উঠিল—

"ভাই মাপ করো, আমি নিতান্ত পাষণ্ড, আমার পাশব ব্যবহার এবারকার মতন ক্ষমা করো।"

লাঞ্ছিতের নাম কেবল দাস, সে ব্যক্তি এই ব্যবহারে কিছু ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল, প্রথমে ইহা সত্য কি ব্যঙ্গ তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না আবার কোন নূতন উপদ্রব আগতপ্রায় ভাবিয়া একান্ত কাতর হইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে বলিল "না ঠাকুর তুমি তো কোন দোষ করোনি, সে আমি সব ভুলে গেছি। আমরা গরীব গুরবো লোক আমাদের অতো গায় লাগে না।"

শেষের কথাটা বলিতে বেচারার মুখের ভাবটা একটু শোচনীয় হইয়া আসিল, কারণ গরীব লোকদের গায়ে না লাগিলেও এক্ষেত্রে যতীশের বজ্রমুষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে এখনও কন্‌কন করিতেছিল, এইমাত্র সে তাহার কন্যাকে চুনহলুদ গরম করিতে আদেশ দিয়াছে। যতীশ তাহার ভয়ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়া বেশিক্ষণ তাহাকে এই বিপদা-শঙ্কিত সঙ্গদান দ্বারা সন্ত্রস্ত না রাখিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, "চণ্ডিতলায়" গেলেই তুমি আমার কাছে যেও, আমাকে ভয় করবার তোমার আর কোন কারণ নেই।"

সেদিন যতীশ যখন ফিরিয়া গিয়া ঐক্যতান বাদনের শব্দে মুখরিত জনহীনা পল্লিগৃহে নিজের পুরাতন তক্তপোষের উপর জীর্ণশয্যায় দেহ ঢালিয়া দিল তখন নিজেকে যেন অপর আর এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। জীবনের সহস্র ছোট বড় হৃদয়হীনতা আজ তাহার কাছে অক্ষমণীয় অপরাধের আকার ধারণ করিয়া তাহার চিত্তকে কেবলি খোঁচা মারিতে লাগিল। নিজেকে এক বৎসরে অনেকখানি পরিবর্ত্তিত বলিয়া মনে হইবামাত্র হঠাৎ সে পরিবর্ত্তনের কারণটাও মনে পড়িয়া গেল। সেই এক দ্বিপ্রহরের মুক্ত রৌদ্রে এক রুদ্রদৃষ্টি তাহার রুদ্ধ হৃদয়দ্বারের কপাট খুলিয়া দিয়াছিল। সেদিন আজ তাহার নিকট জীবনের একটা পুণ্যাহ বলিয়া মনে হইল। তারপর আজ আবার পুণ্যকার্য্যের আবরণে গুরুতর পাপানুষ্ঠান দ্বারা হীনবুদ্ধিতে সে যখন নিজেকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিতেছিল, পরপীড়নের দ্বারা মাতৃসেবা ব্রত যখন কলঙ্ক কালিমায় রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে ছুটিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন আর এক সতেজ দৃষ্টি ও সরল উপদেশ দেবতার আশীর্ব্বাদের মতন তাহাকে পথ ও উপায় দেখাইয়া দিয়া গেল। যতীশ উঠিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিল। তাহার জীবনের মধ্যে এই দুইটি আবির্ভাবকে সে দেবতার প্রেরণা বলিয়া মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মগৌরব অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে তাহাদের শতবার প্রণাম করিয়া বলিল "তোমরাই আমাকে নবজীবন দিয়াছ, তোমরাই আমাকে মানুষ করিয়াছ দেখো সে দান আমি অপব্যয় করিব না। দেশের জন্য এজীবন উৎসর্গ করিয়াছি এবার পথও স্থির করিলাম।"

জমীদার প্রমোদকিশোরের বিবাহে ফাল্গুন মাসে চণ্ডিতলায় অত্যন্ত সমারোহ হইল। কিন্তু সে বিবাহে বাজি বাজনা ও আলোকের প্রাচুর্য্য মোটেই নাই দেখিয়া গ্রাম ও গ্রামান্তরের ভদ্রলোকেরা অবাক হইয়া গেলেও এবং আকাঙ্খিত যাত্রা থিয়েটার বা নাচ না থাকায় পল্লীবাসিনী

রূপসীরা যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকিলেও, অনাথ আতুর দীনদরিদ্র সমস্বরে কুমার প্রমোদকিশোর ও নববধূ পদ্মাবতীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিল। সাত গ্রামের হিন্দু মুসলমান প্রজা সমান যত্নে আহার বস্ত্র, এবং খাজনা রেহাই পাইয়াছিল। এবং দূরাগত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সসম্মান বিদায় পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিল—

জমিদারের নুতন কর্ম্মচারী যতীশ বোসেরই চেষ্টা ও যত্নে এই শুভকার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইল। চণ্ডিতলার বাজারে সমস্ত দোকানীরা সে দিন স্বেচ্ছায় বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ রাখিয়া বলিল "যা জিনিষ পত্র মজুদ আছে সেগুলো অবশ্য বেচে ফেলতে হবে তারপর আর আনচি নি ; কিন্তু আজ এই শুভদিনে অশুভ করবো না।"

বর তদ্গ্রামে আসিয়া বসিলে পুরবাসিনীরা রক্তাম্বরা মাল্যচন্দন চর্চ্চিতা কন্যাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া গেলে সানায়ের বাঁশি বিদায়ের সুরে যেইমাত্র তান ধরিয়াছে এমন সময়ে কার্য্যে অপরিশ্রান্ত যতীশ কোথা হইতে ভিড় সরাইয়া নবদম্পতির সম্মুখে আসিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁদের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বর একটু ব্যগ্রভাবে সরিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন, ঘোমটার মধ্যে নববধূ পদ্মা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। যতীশ সজলনেত্রে উভয়ের পানে চাহিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিল—

"প্রমোদবাবু! পদ্মা দিদি, তোমরাই আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিলে, তোমাদের সে অপরিশোধ্য ঋণ আজ আমি শোধ করলুম। অধম শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করো; যতই অধম হোক সে গুরুদক্ষিণা ভালই দিয়েছে।"

শ্রীঅনুপমা দেবী।

ঘুম।

নিতি সে আসিত কানন পথে।
একাকী বালিকা নবীনকলিকা,
মানসমোহিনী বিমল প্রাতে।
কুসুম কামিনী ডাকিত তারে।
দুলাইয়া পাতা, কহিত যে কথা;
সুরভি ঢালিত আদর ক'রে।
আঁচল ভরিয়া তুলিত ফুল।
পবন স্বননে, পুলকিত মনে,
দোলাত আদরে অলক চুল।
সহসা উঠিল করুণ বাণী।
ধাইনু ছুটিয়া হেরি চমকিয়া
লুটাইছে ভূমে কুসুম রাণী!
ঘুমায়েছে বালা বিঘোর ঘুমে।
শিয়রে ফণিনী, উজলিয়া মণি,
কমল কপোলে সঘনে চুমে!!

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণের জাপান-চিত্র।

[ফরাসী হইতে]

২

লাফকাডিয়ো হার্ণ, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া জাপানী শিল্পকলাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই বৈশ্লেষণিক আলোচনাগুলি বড়ই অদ্ভুত। পাশ্চাত্য শিল্পকলার সহিত প্রাচ্য শিল্পকলার তুলনা করিয়া, উভয়ের মধ্যে কি গভীর পার্থক্য বিদ্যমান তাহাই তিনি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাপানীদিগের অপেক্ষা য়ুরোপীয়েরা বেশী অহংনিষ্ঠ; তাই তাঁহারা জগৎকে মানুষের ভাবে ও মানুষের দৃষ্টিতে দর্শন করেন। নারী-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নারীকেই অন্বেষণ করেন; তাঁহারা সৌসাম্য ও সুষমার আদর্শের ভিতর দিয়াই সমস্ত পদার্থ দর্শন করেন; এইরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রেম-লালসার স্মৃতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ সৌন্দর্য্যবোধ একপ্রকার জগৎ-নারীময় ভাব। এইরূপ নারীভাবাপন্ন জগতের মধ্যে য়ুরোপীয়েরা কেবল—পাহাড়পর্ব্বতের তরঙ্গিত রেখা, উষার রক্তিম আভা, জলরাশির চঞ্চলতা, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ, অসীম আকাশের স্নেহ-মমতা, দিবসের সোহাগ-যত্ন—এই সকল সৌন্দর্য্যেরই মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারা বিশোধিত জাপানীরা সমস্ত খুঁটিনাটি-সমেত বিশ্বপ্রকৃতি যেমনটি তাহাই দেখেন; প্রকৃতিতে যাহা কিছু অসমান ও অসম-পরিমাণ তাহাতেই তাঁহারা বিশেষরূপে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহারা যে শুধু জীবজন্তু বৃক্ষলতাকেই ভাল বাসেন তাহা নহে,—তাঁহারা পাথরকে ভাল বাসেন, মেঘকে ভাল বাসেন। জাপানীরা তাঁহাদের অনুপম শিল্পসামগ্রীগুলিতে সৌন্দর্য্যের যেরূপ সূক্ষ্ম আভা ও তারতম্য প্রকটিত করিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে য়ুরোপীয়েরা বহুকাল হইতে চেতনাহীন।

জাপানী শিল্পকলার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইতে হইলে, হার্ণ যাহাকে বলেন,—"সাধারণ আদর্শের অধীনে বিশেষ সত্তার নিয়ম—জাতির অধীনে ব্যক্তির নিয়ম",—সেই নিয়মটি স্মরণ করা উচিত। জাপানী শিল্পী যখন কোন ফুলের, কিংবা কোন কীটের, কিংবা কোন শৈলের, কিংবা কোন সূর্য্যাস্ত-দৃশ্যের অনুকরণ করেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত খুঁটিনাটির বিরক্তিজনক হুবহু নকল করেন না; তিনি তুলিকার দুই চারি পোঁচে, মূল-আদর্শকে—জাতিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; "আকৃতির ভিতরে প্রকৃতির যে ভাবটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে" তাহাই তিনি প্রকটিত করিতে প্রয়াস পান। এইরূপে, সমষ্টির অধীনে থাকিয়া ব্যষ্টিগত খুঁটিনাটিগুলি একটি বিশেষ তাৎপর্য্য প্রকাশ করে এবং উহা প্রকৃত শিল্প কলার মর্য্যাদা লাভ করে। নক্সা-চিত্রে ও মনুষ্য-মুখের চিত্রে এই একই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। গ্রীক্ শিল্পকলার ন্যায় জাপানী শিল্পকলাও, বিষয়-সমূহের সাধারণ ভাবগুলিই প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়। এইজন্যই এইরূপ শিল্পকলা মনস্তত্ত্বের

দিক্ দিয়া আলোচিত হইতে পারে। জাপানী চিত্রকর মুখের যে ছবি আঁকেন তাহাতে কেমন একটি চমৎকার প্রশান্তভাব প্রকটিত হয়! কত শতাব্দী হইতে এই জাপানী জাতি সস্মিত সৌম্যভাবের আবরণে কিংবা দুর্লঙ্ঘ্য ধৈর্য্যের আবরণে আপনার প্রকৃত মনের ভাব ঢাকিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। "জাপানী শিল্পকলার মধ্যে যে রহস্য আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মই তাহার চাবি।"

এইরূপ, কোন জাতির মুখ-ভাবে, ও শিল্পকল্পায়, সেই জাতির সভ্যতার ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় শিল্পীরা পুরুষ-সৌন্দর্য্যে এমন একটা ভাব প্রদান করে যাহাতে প্রায়ই দারুণ নিষ্ঠুরতা ও আক্রমণ-প্রবণতা প্রকাশ পায়; এবং নারী-সৌন্দর্য্যে উহারা প্রায়ই ইন্দ্রিয়-লালসা ও উদ্দাম আবেগের ভাব প্রকটিত করিয়া থাকে। তাহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা "হিংস্র পশুর জাতি"; উহারা যুদ্ধ ও রূপলালসা লইয়াই ব্যাপৃত; "সুখ সম্ভোগের জন্য যুঝাযুঝি করাই প্রকৃত জীবন"—এই কথাটি উহাদের শিল্পকলাতেও প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। জীবনের যে সাধাসিধা আনন্দ—আত্মসংযমের দ্বারা সুসংযত জীবনের যে আদর্শ—জাপানী শিল্পীরা তাহাই প্রকটিত করিয়া থাকে।

জাপানীর ধর্ম্মজীবনের প্রতি হার্ণের জ্বলন্ত অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। শিন্তোধর্ম্মের পুরাতন প্রথা, বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চ নৈতিক-কিংবদন্তীসমূহ, এবং হরিণ-পূজার সহিত ও পূর্ব্বজন্মের বিশ্বাসের সহিত যে সকল লৌকিক কুসংস্কার বিজড়িত রহিয়াছে—এই সমস্ত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং শিন্তোধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক ও তাত্ত্বিক মতগুলি তিনি তন্নতন্ন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন, আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনতন্ত্রের সহিত ঐ দুই পুরাতন জাপানী ধর্ম্মের আশ্চর্য্য মিল আছে। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক দর্শন হইতে একটু গায়ের জোরে এই দুইটি মুখ্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন:—জগৎ এক, আমি অনেক। জড় ও জীবনের মধ্যে, উদ্ভিজ্জ-জগৎ ও জীব-জগতের মধ্যে, পশুত্ব ও মানবত্বের মধ্যে স্পষ্ট কোন ব্যবধান রেখা নাই: এইরূপে তিনি বিশ্বজগতের একত্ব প্রতিপাদন করেন। পক্ষান্তরে, মনের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাসমূহ লইয়াই আমার আমিত্ব—এই "আমি" এমন কতকগুলি মূল উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন, আধ্যত্ম-বিদ্যার সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই—অধ্যাত্মবিদ্যা, আংশিকভাবে কুলক্রমাগত-গুণসংক্রমণ নিয়মের দ্বারা উহার ব্যাখ্যা করিয়াছে: এইরূপে, সত্তা মাত্রই অনেকাত্মক। জগতের একত্ব, 'আমি'র বহুত্ব—ঐ দুই জাপানী-ধর্ম্মের মধ্যে এই উভয় তত্ত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুরাতন শিন্তোধর্ম্মের মতে, সমস্ত সত্তা সূর্য্যের সহিত অনুস্যূত; এইরূপে শিন্তোধর্ম্ম আপনার ধরণে জগতের একত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে। শিন্তোধর্ম্ম "আমি"র বহুত্বও প্রতিপাদন করে; "মৃতদিগের জগৎ, জীবিত-দিগের জগৎকে শাসন করে"—এই যে শিন্তো-ধর্ম্মের বীজমন্ত্র, ইহার মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। শিন্তোধর্ম্মের মতে, মানুষের সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত চিন্তা—"কামিস্"

অর্থাৎ প্রেতাত্মাদিগের প্রভাবে উৎপন্ন হয়। ইহা আধুনিক মতেরই যেন পূর্ব্বাভাস:—চৈতন্য মাত্রই মন-সমূহের জগৎ; "একটি ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে একটি সমস্ত জাতির জীবন সঞ্চিত রহিয়াছে; শতসহস্র বৎসরের অতীত অনুভূতিসমূহ, এমন-কি, বোধ হয় শত সহস্র মৃত গ্রহের (কে জানে?) জীবন সঞ্চিত রহিয়াছে।" আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সাধুভাব আছে তাহার জন্য আমরা সদাশয় কামিস্‌দিগের নিকট ঋণী। প্রত্যেক মাতৃ-স্নেহ,—শত সহস্র অন্তর্হিত মাতৃস্নেহের সংক্ষিপ্ত সার। নারীর যাহা কিছু মাধুর্য্য, নিঃস্বার্থ-ভাব, ভালবাসার সামর্থ্য, দিব্য মোহিনীমায়া—নারী সে সমস্ত মৃতদিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। যে বুদ্ধিবলে পুরুষ বিভিন্ন লোকচরিত্র ঘনিষ্ঠভাবে অবগত হইয়া থাকে তাহাও কামিস্‌দিগের প্রসাদাৎ। মঙ্গলের কত মূল্য, কত মর্য্যাদা, কত প্রাণপণ চেষ্টায় মঙ্গল জগতে আবির্ভূত হইয়াছে, শিন্তোধর্ম্ম তাহাই আমাদের নিকট প্রকাশ করে। আমাদের সদাশয় মৃতেরাই প্রকৃত দেবতা।—অবশ্য আমাদের মধ্যে যাহা কিছু মন্দভাব আছে তাহাও আমরা কামিস্‌দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু শিন্তোধর্ম্মা-বলম্বীদিগের বিশ্বাস, জগতে এমন কিছুই নাই যাহা পূর্ণমাত্রায় মন্দ; কি মৃত কি জীবিত—এমন কেহ নাই যে সম্পূর্ণরূপে অসৎ; দুষ্ট কামিস্‌দিগকে শান্তিসস্ত্যয়নের দ্বারা পরিতুষ্ট করা আবশ্যক। মহৎভাবগুলি অহং-এর মাটি হইতেই গজাইয়া উঠে; আমাদের স্বাভাবিক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস কর—সেই সঙ্গে আমাদের জ্ঞান ও নীতির উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিও ধ্বংস হইয়া যাইবে—সেই সকল বৃত্তি যাহা মানবজীবনকে স্নেহ মমতা ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করে। যাহাই হউক, জগতে মন্দ অপেক্ষা ভালোরই আধিক্য। সদাশয় কামিস্‌দিগের প্রভাবই চিরকাল প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং উহাদেরই প্রভাব উত্তরোত্তর আরও প্রবল হইবে।

শিন্তোধর্ম্মের নীতি খুব উচ্চদরের—এই কথা হার্ণ পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। শিন্তোধর্ম্মের মতে, মৃত্যুর পরেও মৃতেরা জীবিত থাকে—আমা-দিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করে; এই বিশ্বাস হইতে জাপানী-চিত্তে এমন একটা গভীর ভাবের বিকাশ হইয়াছে যাহা য়ুরোপে অজ্ঞাত;—সে ভাবটি অতীতের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা। এই ভাবটি জাপানীজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সমস্ত জাতির নৈতিক জীবন এইভাবে উপরঞ্জিত। পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্মানার্থেই তাঁহাদের অনুসৃত মহৎ নৈতিক আদর্শটি রক্ষা করা আবশ্যক। চরিত্রই শিন্তো-শব্দের উচ্চতম তাৎপর্য্যার্থ;—সাহস, শিষ্টতা, আত্মসম্ভ্রম, এবং সকলের উপরে রাজভক্তি। শিন্তো শব্দের অর্থ পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, পারিবারিক ভালবাসা, নারীর মাধুর্য্য, বালকের বশ্যতা। তাছাড়া, শিন্তোধর্ম্মের অর্থ দেশভক্তি; কারণ, সমস্ত জাতি একটা বৃহৎ পরিবার বলিয়া পরিগৃহীত হয়। ভৌতিক, মানসিক, নৈতিক যে কোন জ্ঞান হউক সমস্তই পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে প্রাপ্ত,—এই ধারণা হইতে জাপানীদিগের মধ্যে মনুষ্যত্বের একটা সুগভীর ভাব—মানব সম্বন্ধে একটা বিশ্বজাগতিক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জগতের এই সমস্ত জিনিসগুলার কত মূল্য

—কত যত্ন চেষ্টা করিয়া তবে উহা পাওয়া যায়, —জাপানীরা বেশ জানে বলিয়াই প্রত্যেকে আপন-আপন বাসনাকে একটা সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে, এবং ইহা হইতেই বোধ হয় জাপানী জীবনের সরলতা সমুদ্ভূত হইয়াছে। —অতীত ও বর্ত্তমান বিশ্বমানবের নিকট প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকটা ঋণী—এই জ্ঞান হইতে হৃদয়ের যে সকল ভাব উদ্দীপিত হয়, য়ুরোপে সেই সকল ভাব এখনও অতীব বিরল। কেবল অভিব্যক্তিবাদই এই সকল ভাব আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে; হৃদয়ের যে সকল আবেগ বর্ব্বর ও "পেগ্যান"-জনোচিত বলিয়া এতকাল ধিক্কৃত হইয়া আসিয়াছে, আজ উন্নত বিজ্ঞান আবার সেই সকলকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া আনিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আচার্য্য বসুর আবিষ্কার।

আমাদের দেশে এমন কম লোকই আছেন, যাহারা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম শুনেন নাই। কিন্তু আমি এমন অনেক ইংরাজী-জানা শিক্ষিত লোকও দেখিয়াছি, তাঁহারা কেবল এই মাত্র জানেন যে আচার্য্য বসু মহাশয় কি এক মহৎ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু সে অদ্ভুত তত্ত্বটি যে কি, তাহা তাঁহাদের ভাল করিয়া জানা নাই।

সে তত্ত্বটি যে কি তা মোটামুটি বুঝান অতি সহজ, কারণ আমাদের দেশের পক্ষে সেটি অজানা বিষয় নয়। তবে কিরূপে সে সত্যটি চাক্ষুষ প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহা বুঝানই একটু কঠিন। কারণ তাহা বুঝিতে হইলে পদার্থ বিদ্যা ও জীব বিদ্যার কিছু জ্ঞান চাই। যাহাতে অতি সামান্য ও অল্প আয়াসেই, সাধারণ লোকেও সে জ্ঞানটুকু লাভ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সহজ উপায়েই বসু মহাশয়ের আবিষ্কারতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

অতি অল্প কথায় এই আবিষ্কারের সার-মর্ম্মটুকু বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, যে "জীবনী" বলিয়া যে শক্তি আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীতে নির্দ্দেশ করি, সে শক্তি ধাতু প্রভৃতি অচেতন পদার্থেও কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই অল্পবিস্তর সজীব। তাহাদের ডাকিলে মানুষের মত এত স্পষ্টভাবে সাড়া না দিক—প্রকারান্তরে তাহারা সাড়া দেয়। যন্ত্র বিশেষের দ্বারা সে মিহি সাড়া স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

সে বিস্ময়কর অতি সূক্ষ্ম সাড়া মাপিবার যন্ত্রটি আচার্য্য বসুরই নিজের আবিষ্কার। স্পষ্টভাবে ও সূক্ষ্মভাবে সেই সাড়া মাপিতে পারাতেই, ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্নরূপ ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে কত নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যে কোনও বিষয়েরই হউক সূক্ষ্ম মাপকাটি আবিষ্কার হইলেই, সেই বিষয় অনুশীলনে এইরূপ সুবিধা সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। "তাপমান" ও "তড়িৎমান" যন্ত্রের

আবিষ্কারের পরই, সেই সেই বিষয় অনুশীলনে এইরূপ সুবিধা হইয়া, অল্প দিনেই কত উন্নতি হইয়াছিল।

ডাক্তার বসুর আবিষ্কারের এই একটি মাহাত্ম্য, যে সেই তত্ত্বের সাহায্যে অন্য অনেকগুলি স্থূলতর তত্ত্ব এক হইয়া গিয়াছে। সেই সূক্ষ্মতর তত্ত্বটি হইতে এই সকল স্থূলতর তত্ত্বগুলি আপনিই আসে। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব উদ্ভাবনই মানব বুদ্ধির উদ্দেশ্য, ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। আচার্য্য বসু এই বিষয়ে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। জ্ঞান জগতে যেমন "মাধ্যাকর্ষণে"র স্থান, যেমন "অভিব্যক্তিবাদের" স্থান, তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বটিও সেইরূপ পদে অভিষিক্ত হইয়া, বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় গুলিকে এক করিয়াছে। ধাতু উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই সজীব। অবস্থা বিশেষে একই মতে সাড়া দেয়। ও অবস্থা বিশেষে সকলেই মারা যায়—তখন আর তাহাদের সাড়া দিবার ক্ষমতা থাকে না। মাধ্যাকর্ষণ জড় জগতের একতা স্থাপন করিয়াছে, অভিব্যক্তিবাদ প্রাণী জগতের একতা স্থাপন করিয়াছে, আর আচার্য্য বসুর "সাড়াবাদ" জড়জগৎ ও প্রাণীজগৎকে এক করিয়াছে।

কিরূপে যে এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ হইল একথা বুঝাইতে হইলে আচার্য্য বসুর আবিষ্কৃত "সাড়া মাপিবার যন্ত্রটির কথা সবিস্তারে বুঝাইতে হয়। সেটিও অতি সামান্য যন্ত্র—বুঝিলে সব জটিল বিষয়ই সামান্য হইয়া পড়ে। অন্য দিকের চিত্রটি দেখ। "গ" এটি একটি তড়িৎমান যন্ত্র,—অতি সামান্য তড়িৎ উৎপন্ন হইলেই ইহার কাঁটা নড়িয়া সে সংবাদ জানায়। ইহার মধ্যগত চুম্বকে সংলগ্ন ছোট আরসীতে আলোক প্রতিভাত হইয়া পরদার মাপ অঙ্কনে পড়ে। ও তড়িৎ সংযোগে

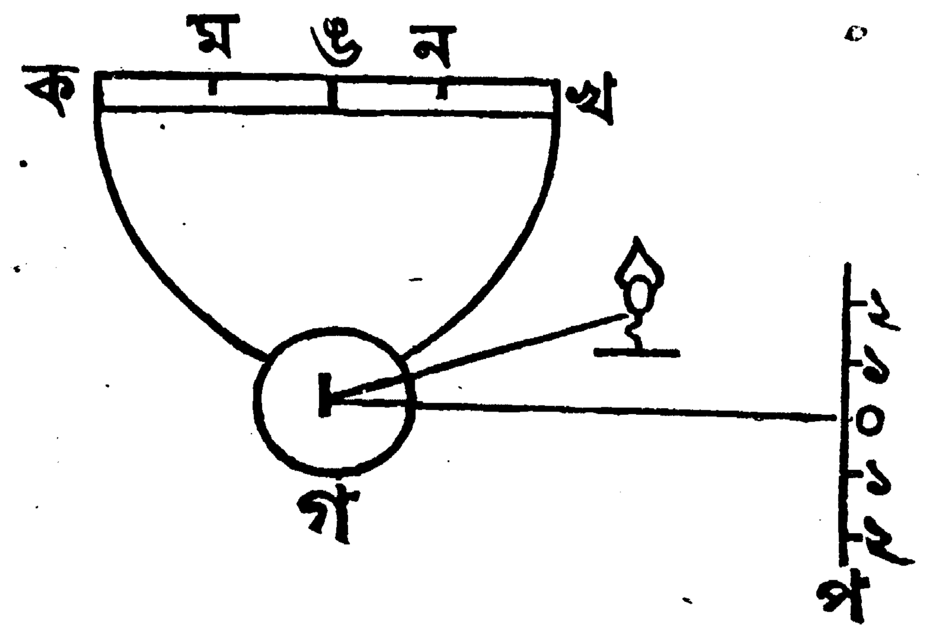

১ম চিত্র

তার শূন্য অঙ্কিত রেখা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—অন্য অঙ্কে দাঁড়াইয়া, সেই তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ ও দিক জানায়। এই অঙ্কন লিখিত পরদা খানি আরসী হইতে যতই দূরে রাখা যাইবে মাপ ততই সূক্ষ্মতর ভাবে হইবে। এবং এই পরদার স্থানে যদি পরদা না রাখিয়া, একখানি ফটোগ্রাফের কাগজ রাখা যায়, তাহা হইলে তার উপর আলোর রেখা পড়ে ও সেই সময় পরদা খানি একদিকে সরাইতে থাকিলে, তার উপর নিম্নলিখিতভাবে আলোর একটি (২য় চিত্র দেখ।) বক্র রেখা পড়ে।—এই রেখাটির বিষয় এখন একটু ভাল করিয়া দেখা যাউক।

আলোটি পূর্ব্বস্থান হইতে হটিয়া যাইবার সময় যতই বেশী দূরে যাইবে—রেখাটি ততই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে। পরে সমানভাবে খানিকক্ষণ গিয়া তড়িৎ প্রবাহ শেষ হইলে শেষে আবার ক্রমে নিজের পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যায়। অর্থাৎ একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য তড়িৎ চলিলে, আলোক রেখা ফটোগ্রাফের উপর এরূপ এক একটি বক্ররেখা অঙ্কিত

করিয়া দেয়।—তার উর্দ্ধদিকের অংশটি (২য় চিত্র দেখ।) "শূন্য"স্থান হইতে বিক্ষেপ, সমান পরদার অবস্থাটুকু সাম্য অবস্থা, ও নিম্নরেখাটি পতন বা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা।

এইটি আচার্য্য বসুর "স্যাড়া" লইবার যন্ত্র। ইহা অতি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে বলিয়া, যে সকল ক্ষীণ সাড়া অন্য কোনও রূপে ধরা যায় না, সে গুলিও ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ যন্ত্রটি অনেকটা তড়িৎমান যন্ত্রেরই মত—অর্থাৎ একটি তারের আবর্ত্তের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিলে সেই আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলে একটি স্বাধীনভাবে ঝুলান চুম্বক, নূতন আকর্ষণে নড়িয়া উঠে। তাহাতেই বিদ্যুতের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। ডাক্তার বসুর এই সাড়ামান যন্ত্রে এই ব্যবস্থাই আরও সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। যন্ত্রটি Diffrential Galvanometerএর নিয়মে গঠিত, অর্থাৎ দুইটি দিক সমান অবস্থায় রাখিলে কাঁটা নড়ে না, কিন্তু যদি একদিকে কোনওরূপ প্রভেদ থাকে অমনি চুম্বক নড়িয়া সঙ্কেতে তাহা জানায়। বেশী উত্তেজিত করিলে বেশি নড়ে, কম উত্তেজিত করিলে কম নড়ে, আর অতিশয় বেশী উত্তেজনা প্রয়োগে—হঠাৎ অতিশয় নড়িয়া উঠিয়া মরিয়া যায়—আর তারপর নড়ে না, ঠিক যেন বিষপ্রয়োগে বা বজ্রাঘাতে মনুষ্যের মৃত্যুর মত তাহার মৃত্যু হয়।

এই কথাই ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, সমগ্র যন্ত্রটি কার্য্যের সময় যে কিরূপ সাজান থাকে ও কিরূপ কার্য্য করে, তাহার চিত্র দিতেছি।

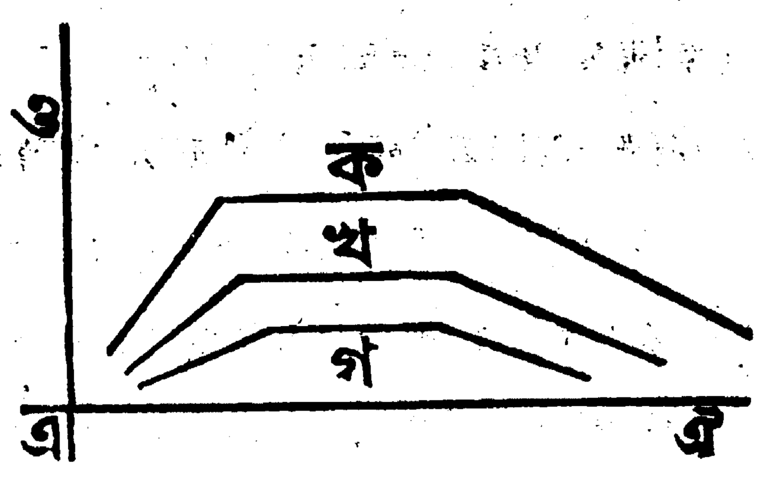

(১ম চিত্র দেখ।)

"ক খ"লোহার তার বা লতাতন্তু বা প্রাণীদেহের স্নায়ুখণ্ড। "গ" নামক তড়িৎমান যন্ত্রটির সঙ্গে, দুই ধারের তার দ্বারা সংযুক্ত হইয়া, কখ নামক দ্রব্যটি রক্ষিত। আর তার "গ"র গণ্ডির মধ্যে রক্ষিত—চুম্বকটির সহিত সংলগ্ন একটি ছোট আরসিতে প্রতিভাত হইয়া, পাশ হইতে একটি আলোক রশ্মি সামনের পরদায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় ঐ আলোক, ঐ মাপ অঙ্কিত পরদার ঠিক মধ্যস্থানে অর্থাৎ "শূন্য" অঙ্কিত স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। আর যখনই কোনও তড়িৎ চলিয়া চুম্বকটিকে নড়ায় আলোক রেখাও শূন্য হইতে নড়িয়া ১ বা ২ মাপে যায়। এই হইতে তড়িতের পরিমাণ ও দিক নির্দ্দিষ্ট হয়।

এখন দেখা যাউক এ তড়িৎ আসে কোথা হইতে। যখন কখ সহজভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, তখন কোনও "তড়িৎ নাই। কিন্তু যখন সেই কখর কোন স্থান স্পর্শ বা আঘাত করিলাম, তখনি সেই স্থান হইতে একটি তড়িৎ স্রোত সৃষ্ট হইল। এইরূপে কখর ঠিক মধ্যদেশ, "ঙ" যদি স্পর্শ করি সেই স্থান হইতে দুই ধারে স্রোত বহিয়া তাপমান যন্ত্রে দুই উল্টা দিক দিয়া তড়িৎ স্রোত প্রবেশ করে, সেই নিমিত্ত তখনও চুম্বকের

উপর কোনও ফল দেখা যায় না। কিন্তু যদি একদিক ঘেঁসিয়া "ন"কে ঐরূপে উত্তেজনা দেওয়া যায়—চুম্বকের কাঁটা তখনি সেদিকে নড়িয়া উঠে। অপর দিকে "ম"কে দিলে কাঁটা অপর দিকে নড়ে। ঠিক যেন সেই জিনিষটিকে গা ঠেলিয়া ডাকা হইল—আর সে সাড়া দিল।

সাড়া অনেক রকম—সহজ মানুষকে ডাকিলে সে কথা কহিয়া সাড়া দেয়। একজন বোবাকে ডাকিলে সে ঘাড় নাড়িয়া সাড়া দেয়। সাড়া দিলেই বুঝা যায় যে সে জীবিত আছে। একটি ক্ষীণ মুমূর্ষু রোগী কথা কহিয়া বা ঘাড় নাড়িয়া কিছুতেই সাড়া দিতে পারে না। তখন সে বাঁচিয়া আছে কিনা জানিতে হইলে তার নাড়ি পরীক্ষা করা যায়। নাড়ি পরীক্ষাও একটি সূক্ষ্মতর সাড়া। আর ডাক্তার বসুর প্রথায়—জিনিষটি তাঁহার তড়িৎমান যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকাতে চুম্বক নাড়াইয়া সাড়া দেয়—সে আরও সূক্ষ্ম সাড়া। তাতে দেখা যায় সুধু প্রাণী নয়, উদ্ভিদ নয়, এমন কি সোণা লোহারাও তেমনি সাড়া দেয়।

সুধু সাড়া দেয় না। বিভিন্ন ডাকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার সাড়া দেয়! যদি আমরা অতিশয় চীৎকার করিয়া ডাকি—তাহারাও যেন বিরক্ত হইয়া—আরও চীৎকার করিয়া সাড়া দেয়—অর্থাৎ তড়িৎমান যন্ত্রের কাঁটাটি আরও বেশী নড়ে। আবার ধীরভাবে ডাকিলে ধীরে নড়ে। প্রাণীর স্নায়ু, বা উদ্ভিদের তন্তু, বা লোহার তার যাহাই হউক, ঠিক যেন—ডাকের মত সুর বুঝিয়া সুঝিয়া মাপসই উত্তর দেয়। এমন যার ক্ষমতা সে সব জিনিষ জীবিত নয় ত কি বলিব।

আবার সুধুই যে জীবিত তা নয়। মানুষের স্বাস্থ্যের মত তাদেরও জীবনীশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। মানুষকে যেমন সুরা পান করাইলে সে উত্তেজিত হয় ও নেচে নেচে চলে, সুরা সিঞ্চনে উদ্ভিদ ও লোহার তারেরও সেইরূপ অবস্থা আসে। আবার আমাদের যেমন ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণে উত্তেজনা কমিয়া যায় ঘুম আসে, ও অলস হইয়া পড়ি—উদ্ভিদ ও লোহার তারও ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণে সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হয়। তখন তার সাড়া খুব কমিয়া যায়। আবার মানুষকেই হোক বা গাছকেই হোক বা লোহার তারকেই হোক, সেঁকো বা অন্য কোন বিষ খাওয়াইয়া বিষাক্ত কর, তারা সকলেই ঠিক একরকম ভাবে মরিয়া যাইবে। তখন আর তাহাদের ডাকিলে সাড়া পাইবে না। সুতরাং দেখা গেল মানুষের মতনই—উদ্ভিদ ও ধাতু—বিশেষ রকমে ডাকিলে, সাড়া দিতে পারে। অবস্থা বিশেষে তাদের সাড়া দিবার ক্ষমতা বাড়ে বা কমে—বা একেবারে চলিয়া গিয়া মৃত্যু আনে—যেমন মানুষ দেহে সুরাপানে বা ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইলে বা বিষ প্রদানে ঘটে।

ইহা হইতে আর একটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায় তাহা এই যে—ঔষধের কার্য্য মানুষের দেহে যেমন—উদ্ভিদ ও জড়ের দেহেও সেইরূপ। তারাও মদ্য সিঞ্চনে উত্তেজিত হয়, ক্লোরোফর্ম্মে ঘুমাইয়া পড়ে, ও বিষপ্রয়োগে মরে। আমরা যে জন্তুকে খাওয়াইয়া, তবে আমাদের ঔষধের ফলাফল ঠিক করি, সে নিষ্ঠুর জীবহত্যার কার্য্য আর না করিয়া, প্রথম প্রথম অন্ততঃ তামা লোহার উপর তার ফল পরীক্ষা চলিতে পারে। তাহাতে

শক্তাও হইবে, ও নিষ্ঠুরতা পাপও কমিবে; আচার্য্য বসুর এই একটি বড়ই সুবিধাজনক নির্দ্দেশ।

এই অসামান্য আবিষ্কারের মধ্যে কত সামান্য বিষয়েও উপকারিতা আছে! যাতে জীবে ও জড়ে কতকটা এক করিয়া দিল, সেরূপ অলৌকিক আবিষ্কারে কেনই বা এরূপ না হইবে। এই আবিষ্কারে জীববিজ্ঞান উদ্ভিদবিজ্ঞান শরীরবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকেই সংক্ষেপ করিয়াছে।

যে পুস্তকের কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলিলাম সে পুস্তকখানি তাঁহার প্রথম পুস্তক।—"Response in the Living and Non Living" অর্থাৎ জড় ও জীবের সাড়া যে ঠিক সমান তাহাই তিনি ইহাতে দেখান। তারপর তিনি আরও দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই প্রথম পুস্তকখানিই সে সব গুলির ভিত্তিস্বরূপ। দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে উদ্ভিদ ও জীবের সকল কার্য্য কলাপে, এই সকল আবিষ্কার কিরূপে প্রাযুজ্য তাই দেখাইয়াছেন। তাহাতে এই জটিল শাস্ত্র বড়ই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে কথাটি বুঝাইতে আট দশটি মতের আবির্ভাব করিতে হইত, এখন এক কথায় সে বিষয় প্রমাণ হইয়া যায়। সাতশত পাতার বইখানি একশত পাতায় লেখা চলে। এক শাস্ত্রের কথা অন্য শাস্ত্রে যথাযথ প্রযুজ্য হয়। পদার্থ, বিদ্যা উদ্ভিদ বিদ্যা, শরীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, এখন অনেকটা একই হইয়া গেছে। এই সকল শাস্ত্রের ভিত্তিতে যে কয়টি নিয়ম বিদ্যমান, তিনি সেই কয়টির আলোচনা করিয়াছেন। সকল শাস্ত্র এখন একই সূত্রে বাঁধা। বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সবই একই নিয়ম,—কেবল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশমান। এ কথাগুলি পুরাতন কথা সন্দেহ নাই—পুরাকালের ঋষিদের ও পুরাকালিক ও আধুনিক দার্শনিকদের মত। কিন্তু এমন বিশদভাবে এতদিন কেহই এ কথা বুঝাইতে ও প্রমাণ করিতে পারেন নাই। হাক্সলির এই চেষ্টা ছিল,—স্পেনসরেরও এই মত এই চেষ্টা ছিল—তাঁহাদেরই সেই মহৎ উদার মত—আচার্য্য বসু প্রত্যক্ষ ও বিশদভাবে প্রমাণ করিয়া দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

তাঁহার তৃতীয় বইখানি Electro physiology সম্বন্ধে। অর্থাৎ প্রাণীদেহে তড়িতের কিরূপ বিভিন্ন কার্য্য এই বিষয় আলোচনা। ইহা এক্ষণে কতকটা দুর্বোধ্য গ্রন্থ। এখানিতে মনোবিজ্ঞানের অনেকগুলি গূঢ়তত্ত্ব বিশদরূপে ও অতি সহজভাবে বিবৃত আছে। যথা স্মৃতি শক্তির কথা, সুখ দুঃখের কথা, সুষুপ্তি ও স্বপ্নের কথা ইত্যাদি। সকলগুলিই চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়া বুঝান।

তাহা ছাড়াও প্রকারান্তরে তিনি একটি আরও গুরুতর কথার আভাষ দিয়া গেছেন। সে কথা অতীব মহতী কথা। সুখ দুঃখে মনে শান্তভাব রাখিতে সকলেরই তাহা জানা উচিত। সে কথাটি এই পৃথিবীর যাবতীয় পরিবর্ত্তন চাকার মতঘুরে। (Unvirsal "Cycles")। কিন্তু এ বিষয়ে বিবৃত করিয়া বুঝাইবার এ প্রবন্ধে স্থান নাই।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

বর্ণ-রহস্য।

পেটকাটা ব (ৰ) এর উড়িষ্যা যাত্রা।

(১। আসামে 'ড়' নাই)

আসামে আছিল পেট-কাটা ৰ
বৰুৱা ঠাকুৰ বাৰী,
জগন্নাথ দেব দেখিতে একদা
বাসনা হইল তাৰি।

এৰিৰ চাদৰ উৰণি কৰিয়া
মুগাৰ কাপৰ পৰি,
তাৰাতাৰি কৰি হইল বাহিৰ
আসাম মুলুক ছাৰি।

এক পোট্টলীতে বাঁধিয়া লইল
দেশেৰ জিনিষ তাৰ—
লাম ডিং আৰ ডিহিং মুখেৰ
দপ সেৰ অনুস্বাৰ।

নাসিকা ৰিহাৰী বর্গেৰ বন্যায়
প্লাবিত আসাম দেশ—
পূর্ব্বদিক হতে চীনেৰ চোট্টা
পশ্চিমে লেগেছে বেশ।

পথেৰ সম্বল নিল "বোকা" চাল
ভিজায়ে খাইতে ভাত,
টকা চাৰ কুৰি লয়ে চলে পুৰী
দেখিতে জগৰনাথ।

ডিব্রুগৰে এসে চৰিল জাহাজ
যথা বহে নদৰাজ
শালতৰু যাৰ দুপাৰে দাঁৰায়ে
মাথায় পাতাৰ তাজ।

ঝগ্ ঝগ্ ঝগ্ চলিল জাহাজ
ধুম কৰি উদ্গাৰ;
সাৰি সাৰি সাৰি মাথা নাৰি নাৰি
শাল কৰে নমস্কাৰ।

সাৰা ৰাত্রিদিন, চলি চাৰি দিন
পৌছিল বঙ্গে এসে,
যথা ব্রহ্মপুত্র আৰ ভাগীৰথী
ভাই বোনে খেলে মিশে।

পবিত্র সে জলে পেট কাটা ৰ
নাইল করিতে পুণ্য,
উঠে দেখে পেট লেগে গেছে যোরা,
নাইকো কাটার চিহ্ন।

(২। পূর্ব্ব বাংলায় 'ড়' উচ্চারণে 'র')

উদর বিদারী দীঘল কাটারি
পদতলে হল শূন্য—
বাঙ্গালার জল বাঙ্গালার বায়ু
মুছিল অস্ত্রের চিহ্ন।

যথা পুরাকালে পরশু রামের
হাতের পরশু খানা,
খসিয়া পরিল লাঙ্গল-বক্ষে
কার বা না আছে জানা।

তদবধি ৰ হইলেন র
সাধু সে আসাম বাসী,
পূর্ব্ব বঙ্গের জিলায় জিলায়
বেড়াইতে অভিলাষী।

এ পারা ও পারা ঘুরে ঘুরে সারা
ঘোরায়, গারীতে, হেটে;
অতি বৃদ্ধ কেউ দেখে তারে যদি
কাটারি বসায় পেটে।

(ক্বচিৎ—'ড়')

বহু লোকে ডাকে বরুয়া ঠাকুর
কেহ বা বড়ুয়া কয়
জল খেতে তারে দেয় গুর চিরা
কেহ গুড় "গুর" নয়।

কাটায়ে ক'দিন পূর্ব্ব বাঙ্গালায়
চলিল পুরীর পথে
মনের আনন্দে গোয়ালন্দ ঘাটে
নামিল জাহাজ হতে।

বিষ্ণু ঠাকুরের পুত্রেরা যেখানে
হোটেল তীর্থ করে
পুরী যাত্রী 'র'য়ে আদর করিয়া
ডাকিয়া লইল ঘরে।

('ড়' আরম্ভ)

খেতে দিল ভাত ইলিশের ঝোল
—পদ্মার জল খালি,
অদৃষ্টের গুণে তাতেও আবার
কড় কড় করে বালি।

ভাত ঠেলে ফেলে উঠিল সে রেলে
বসেছে লোকের সারি
চাহে চারি ভিতে শোনে আচম্বিতে
গড় গড় করে গাড়ী।

ফাঁপর সে 'র' দেখিয়া শুনিয়া
হায় কি হইল গোল ;
কাণে গড় গড় দাঁতে কড় কড়
করে সে মাছের ঝোল।

এই পোড়াদহ, এই এঁড়েদহ
অই গড়ইয়ের পোল ;—
কাণে গড় গড় দাঁতে কড় কড়
করে সে মাছের ঝোল।

ঘোর অনিদ্রায় কোনরূপে রাত
কাটায়ে, বিহানে 'র'
পোঁট্‌লী পাঁট্‌লী যা' ছিল লইয়া
নাবিল শেয়াল দ।

ভাবিল বেচারী গড় গড় ছাড়ি
হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচিলাম :
হায় ! ইষ্টিশান ছাড়িয়াই দেখে
বাহিরে দাঁড়িয়ে ট্রাম।

ফের গড় গড়—একি ভয়ঙ্কর
বল কি উপায় করি—
পুরী যাওয়া আর হলোনা কপালে
পথেই পড়িয়া মরি।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না কহিয়া
উঠিয়া সে দিল দৌড়
পুলিশের গন্ধে হায়রে যেমন
ছুটিয়া পালায় চোর।

(৩। পশ্চিম বঙ্গে 'ড়' 'র' উভয় ঠিক)

ধর্ ধর্ ধর্ ছুটিল মটর
র দেছে লম্বা পাড়ি,
দেখে পাছে পাছে হায় ! লেগে আছে
তিনশো ঘোঁড়ার গাড়ী।

সে ভাবিছে হায় ! এলাম কোথায়
এটা কি মুলুক ভাই,
মাথাটা আমায় গিয়েছে বিগুড়ে
এ দেশে সোয়াস্তি নাই ?

আকুলি বিকুলি ফেলিয়ে পুঁটুলি
যা ছিল সঙ্গে তার,
ছুটি উর্দ্ধশ্বাসে হয়ে গেল র
হাবড়ার পোল পার।

কলিকাতা বাসী পেয়ে সে পুঁটুলী
তুলিয়া শুঁকিল নাকে,—
কামাখ্যা মায়ের পরম প্রসাদ
আগত আসাম থেকে !

(৪। পশ্চিমবঙ্গে অনর্থক অনুস্বার)

হায়রে দুর্দ্দশা সে প্রসাদ খাসা
নাসায় লইল বাসা !
চন্দ্রবিন্দুরূপে হসন্ত মকার
ছাইয়া ফেলিল ভাষা।

যত আম ছিল হয়ে গেল আঁব,
আখি গুলি হল আঁখি,
কাচগুলি সব হয়ে গেল কাঁচ
ফক্কিকা হলেন ফাঁকি।

তামাক ধরিল তাঁবাক চেহারা
অবাক্ দেখিয়া সবে,
হাসিকে শুনিয়া হাঁসিতে, দেশটা
ফাটিল হাসির রবে।

ফোটকের 'ফোঁড়া' পোট্‌লী 'পুঁটলী
দেখে হয় অনুমান,
নাসার উপর ডাকিয়া গিয়াছে
চন্দ্রবিন্দুর বান।

হায় সে অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া
সকলে পাইল ভয়—
বিনা যুদ্ধে রাজ্য রাণী শূর্পনখা
কখন করিল জয় ?

(৫। 'র'এর রূপান্তর আরম্ভ)

এ দিকেতে 'র' দুটী পয়সায়
কিনিল আঠার ভাজা,
আঁজলা ভরিয়া খেয়ে গঙ্গাজল
পেট্‌টা করিল তাজা।

দাঁতে কিন্তু তার আঠার ভাজার
কণিকা রয়েছে লেগে,
গোঁড়ায় গোঁড়ায় মটর কড়াই
বাজিছে অপূর্ব্ব রাগে।

কোমল সে মাড়ী হয়ে গেল কড়া
ফের করে কড় কড়,
আবার সে রেলে উঠিল ত্বরিত
ফের সেই গড় গড়।

বিষম পেটের অসুখ তাহার
পথে পথে দেখা দিল,
হাড়-গোড়-ভাঙ্গা ড,এর মতন
র এর চেহারা হ'ল।

(৬। ড—একেবারে ড়)

ক্রমে লৌহ অশ্ব দৌড়িয়া দৌড়িয়া
যেমনি পৌছিল পুড়ী,
জগড় নাথেড় পাণ্ডাড়া আসিয়া
নামাইল ধড়াধড়ি।

খাই কিড়ি কিড়ি অন্নড়বড়া
কচ্‌কড়া দিল খেতে,
হায়ড়ে তাহাড় সে ড়াবড়ঁ্য আড়
ফিড়িল না কোন মতে।

কাতড় সে 'র' যুড়ি দুই কড়
কহিল, "উড়িয়া ভাই,
একবার মোড়ে দেখাড়ে তাঁহাড়ে
আমি আড় আমি নাই।"

(৭। 'র'এর নির্ব্বাণ)

সকলে ধড়িয়া কড়াইল তাড়ে
জগড়নাথ দড়শন,
মুর্চ্ছিত হইয়া সে চড়ণে ৰ
কৈল আত্ম-বিসর্জ্জন।

শ্রীমনোমোহন সেন।

সূর্য্যকান্ত।

যাও,—দেবগৃহে যদি দেহ লভিল বিশ্রাম
হে রাজেন্দ্র ! যাও তবে সেই দিব্যধাম,
যথায় তোমার তরে শত দিব্য কর,
জ্যোতিমাখা, ব্যাকুলিত ল'য়ে লক্ষবর,
ল'য়ে শত আশীর্ব্বাদ, ল'য়ে অর্ঘ্যডালা,
ল'য়ে শ্যাম সন্ধ্যাগমে নন্দনের মালা !

তোমারে ঘিরিয়া যবে উঠিবে কল্লোল
ত্রিদিব-সাগর পারে, কোটি উত্তরোল
ব্যাকুল মরম হ'তে, তুমি কর্ম্মবীর,
কহিও তোমার বার্ত্তা আনন্দ-গম্ভীর।
——কহিও, প্রভাত হ'তে সন্ধ্যার আঁধারে
আনন্দ-উল্লাসে, কিম্বা, রুদ্ধ হাহাকারে,
কি ভাবে এ বঙ্গভূমি কাটাইল দিন
দিনে দিনে।—তুমি সাক্ষ্য দিও, হে প্রবীণ !

কাটাইও নিশাকাল ত্রিদিব বাসরে।
কি ভাবে ?—কিরণমণি ! তব প্রাণ ধরে'
পারিবে কি কাটাইতে আনন্দে যামিনী
ত্রিদিব আমোদে ঢালি' সারা প্রাণখানি,
ভুলিয়া মায়েরে ?——
——হায়—বঙ্গলক্ষ্মী মাতা
রহিবা চাহিয়া পথ ;—তুমি তাঁর পিতা,
তুমি তাঁর প্রাণানন্দ আশার নিধান,
তুমি মা'র সূর্য্যকান্ত হৃদয়-সন্তান।

কাটায়ো যামিনী ধীরে ; তারা-চক্ষু মেলি'
বিনিদ্র সে বিভাবরী ধীরে দিও ঠেলি'
আনিতে প্রভাত নব। বল এই ভবে
অসূর্য্য ধরার বুক বল কোথা কবে ?
এ তোমার অস্ত শুধু ক্ষণেক বিশ্রাম—
জেনো, নব প্রভাতের আশার আরাম।

নিশাশেষে, পরাইয়া মেঘ-আবরণ,
হে সন্তান জননীর আনন্দ পরম !—
সমস্ত শক্তির জ্যোতিঃ মর্ম্মমাঝে ভরি,'
স্বর্গমন্দাকিণী জলে পুণ্য স্নান করি,'—
স্নাত পূত সুকুমার,—ধীরে ধীরে ধীরে,—
—সমস্ত দেবতা, তব, কিরণ রুচিরে
দিবা সাজাইয়া পথ,—হৈমী রথে উঠি'
অপূর্ব্ব ছটায় তুমি উঠিবে যে ফুটি'—
তুমি মাতৃগত প্রাণ !—তুমি আসিবে আবার
ঢালি' রাঙা হাসি ; কোলে, বঙ্গলক্ষ্মী মা'র।

——আসিবে, সে একা নহে,—
জ্যোতিঃ ঝল ঝলে
উদিবে সহস্ররশ্মি বঙ্গ-উদাচলে।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত।

যিনি নিম্নলিখিত প্রবন্ধটির লেখক তিনি আর এলোকে নাই, পৃথিবীর সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশের একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মত নির্ভীক এবং স্বাধীন-চেতা পুরুষ এদেশে অতি বিরল। রাজ-পুরুষদিগের বিরাগভাজন হইয়া, কর্জ্জনের অনুরোধ অনুনয়েও অটল থাকিয়া তিনি যেরূপ দৃঢ়ভাবে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং আমৃত্যু ইহার উন্নতি সাধনে যত্নবান ছিলেন—এরূপ আদর্শ দেশানুরাগ এমন পুরুষোচিত দৃঢ়তা সচরাচর দেখা যায় না।—দেশের কার্য্যে ইনি যত দান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সবিস্তার আলোচনার স্থান নাই; প্রসঙ্গক্রমে দু-একটির উল্লেখ করিব মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ প্রকাশসত্ত্বেও ইনি ন্যাসনেল কলেজের জন্য বার্ষিক ২০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং শুনা যায় স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যে প্রতি মাসে ইনি নিয়মিত তিন শত টাকা করিয়া দান করিতেন।

তিনি যেন মূর্ত্তিমান সাহস ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে, চিন্তায়, আচারে, ব্যবহারে,এমন কি আমোদ প্রমোদেও সাহসের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বন্য পশু শিকারে তিনি এত আনন্দ-লাভ করিতেন যে তখন কোন বিপদকেই বিপদ জ্ঞান করিতেন না। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র রায় মহারাজার সাহসের প্রশংসায় বলিয়াছেন, ইংরাজ তাঁহাকে সেনানেতৃত্বে বরণ করিলে তিনি মানসিংহ বীরবল প্রভৃতির ন্যায় সুযোগ্য সেনাপতি হইতে পারিতেন। ইহা খুব সত্য কথা। তাঁহার যখন ২১ বৎসর বয়স তখন কোন সূত্রে পুলিসের সহিত বিবাদ হওয়ায়, পুলিস তাঁহাকে মুক্তাগাছা হইতে মৈমনসিং ১১ মাইল হাঁটাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে দমাইতে না পারিয়া তাঁহার সংকল্পে অর্থাৎ পুলিসের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ় করিয়া তুলে। মৈমনসিংহের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ফিলিপ তাঁহাকে নানারূপে নিগৃহীত করিয়াও জব্দ করিতে না পারিয়া অবশেষে নিজেই হার মানিতে বাধ্য হইয়াছিল।

তাঁহার স্বভাবের আর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল, বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা স্বপদোচিত ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে তিনি কিছুমাত্র লোলুপ ছিলেন না। কলিকাতা বাসকালে বাঙ্গালী পাড়ায় সার্কুলার রোডের একটি সাধারণ বাড়ীতে জাঁকজমকহীন ভাবে বাস করিতে তাঁহার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইত না। অথচ দেশের কাজে দেশের উপকারে তিনি কিরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তাঁহার দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়াই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে তাঁহার একান্ত দৃষ্টি ছিল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সুবিধার জন্য মুক্তাগাছায় দীর্ঘিকা খনন, জলকলস্থাপন রাজপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা জমীদারীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

বঙ্গদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহিতই তাঁহাকে জড়িত দেখা যায়, সমাজ সংস্কারেও তিনি সাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ স্থির হইলে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু অনেকেই ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অনেকেই তাঁহার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু নিদারুণ সমাজ-শাসনও মহারাজাকে সংকল্পচ্যুত করিতে একমাত্র পারে নাই।

বঙ্গসাহিত্যের প্রতিও ইনি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। বাঙ্গালার ইনি একজন সুপরিচিত লেখক। তাঁহার শিকার-কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীতেই প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিকার সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র বাঙ্গলা পুস্তক।

ইঁহাকে হারাইয়া বঙ্গমাতা তাঁহার একটি সেবক ও সুসন্তান হারাইয়াছেন, এবং বঙ্গবাসী তাহার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী একটি সহৃদয় ভ্রাতাকে হারাইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু অকালে বজ্রাঘাতের ন্যায় আমাদিগকে শোকাহত করিয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প দিন মাত্র আমরা পাইয়াছি। মাসাধিক পূর্ব্বে তিনি নিজে আসিয়া আমাদিগের হস্তে ইহা সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা মুদ্রিত দেখিবার জন্য সরল বালকের ন্যায় তাঁহার কত না আগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যে তাহা দেখিয়া গেলেন না ইহাতেও আমাদের পরিতাপের শেষ নাই।

এই প্রবন্ধটি তাঁহার দ্বিতীয় ভাগ শিকার কাহিনীর প্রথম প্রস্তাবমাত্র,—ভূমিকা বলিলেও হয়। কথা ছিল, শিকার অংশ ইহাতে আর খানিকটা যোগ করিয়া দিলে তখন ছাপা হইবে। হায়! তাঁহার কার্য্য অসমাপ্ত, তাঁহার বাসনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল—তিনি মানবলীলা সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা আজ শোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহার অসম্পূর্ণ শেষ লেখা প্রকাশ করিলাম। পাঠক ইহাতেও তাঁহার উচ্চ চিন্তা, সহৃদয়তা মনুষ্যত্ব অক্ষরে অক্ষরে দেখিতে পাইবেন।

সম্পাদিকা।

শিকার-কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম প্রস্তাব।

ক্যাম্প জামালপুর, ময়মনসিং।

ভুটান সীমান্তকলহে খ্যাতনামা, শিকারী মিষ্টার ডনো সাহেব যে সময়ে কমিসিয়রেটের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন তাঁহার শিকার স্পৃহা ভুটান-দুয়ার এবং জলপাইগুড়ি পাহাড়ের জঙ্গলে অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল। তিনি যে ঐ অঞ্চলে প্রচুর শিকার করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় চিত্তাকর্ষক গল্পে তৎকালিন "ইণ্ডিয়ান্ স্পোর্টিং মেগাজিনে" উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে। বাস্তবিক সে সরল প্রবন্ধগুলি বড়ই মনোরম, আনন্দপ্রদ এবং বিস্ময়জনক।

"ডনোসাহেব" ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ভুটান যুদ্ধের পর নানা দেশ, নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর সব্‌ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল খুব একটা মস্ত দক্ষ শিকারীই ছিলেন এমন নহে, "সোনার উপর মিনাও ছিলেন"। তিনি বড়ই পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইংরেজী ভাষার কথাই নাই। পারস্য ভাষায় তিনি একজন সুদক্ষ মৌলবী ছিলেন। আমি স্বয়ং তাঁহাকে স্বরচিত পারস্য ভাষার বহু কবিতা ও গজ্‌ল আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। তাঁহার আচার ব্যবহার অনেকটা প্রাচ্য ভাবাপন্ন ছিল।

আমার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডম্বল সাহেব এবং ডনোসাহেবের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ছিল। গল্পচ্ছলে একদিন ডম্বল সাহেব আমাকে বলিলেন, ডনোসাহেবের একান্ত

ইচ্ছা জামালপুর অঞ্চলে একবার আমি যাই ও তাঁহার সহিত শিকার করি। সম্প্রতি সাহেব ছয়সাতটী বড় বাঘের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার অভিমত হইলে তিনি (ডনো) আমাকে পত্র লিখিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিবেন। যদিও তৎসময়ে আমি বাঘ শিকারে ভালরূপ অভ্যস্ত নই, সতরঞ্চ গায়ে, হিংস্র জানোয়ারের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া তত্‌টা নিরাপদ মনে করিতে পারি না; তবুও সাহেবের যত্ন ও একান্ত আগ্রহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। একেই ত বাঙ্গালী জাতির বিশ্বব্যাপী অপবাদ, বাঘশিকারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই অপবাদ স্বেচ্ছায় সমর্থন কবিব ইত্যাদি চিন্তা করিয়া ডনো সাহেবের প্রস্তাবের অনুকূলেই অভিমত প্রকাশ করিলাম।

আমি যে সময়ের ঘটনা আজ লিপিবদ্ধ করিতেছি সে বহুদিনের কথা। তখনকার আচার ব্যবহার,—তখনকার লোকের চাল চলন, আর এখনকার হাব ভাব আকাশ জমীনে তফাৎ। তখন এই বঙ্গ সমাজ আপন ব্যবসায়ে আপনি স্বাধীন ছিল। পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খল তখন কেবল রাজস্ব বিভাগের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত মাত্রই ছিল। স্বাধীন চিত্তবৃত্তি, কি স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনের পথে আজকাল যেমন কণ্টকজাল বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, সে পথ তখন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও প্রসারিত ছিল। রাজপুরুষগণও তখন বেশ একটু উন্নতভাবে, উন্নতজ্ঞানে এবং সমুন্নত ধ্যানধারণায় শাসন যন্ত্র পরিচালন করিতেন। প্রজা সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। স্নেহপোষণে প্রজা সাধারণের সঙ্গে আমোদউৎসবে, আলিঙ্গনের আদান-প্রদানে প্রকৃত রাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অধিকতর সুখী হইতেন। হায়! সেদিন কি আর জীবনে ফিরিয়া পাইব? আর কি জীবনে সে সুখ-সংসর্গ মুহূর্ত্ত মাত্র ভোগ করিয়া এই পরাধীন বাঙ্গালী জন্ম সার্থক করিতে সমর্থ হইব।

তখনকার সরকারী কর্ম্মচারী—আর আজকালকার রাজপুরুষগণের মধ্যে তুলনায় চন্দ্র-তারকার বৈষম্য বিদ্যমান। তখন দেখিয়াছি ছোট বড় সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীই জমীদার, তালুকদার এবং প্রজা সাধারণের সহিত প্রতি কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন; উৎসবে, আমোদে যোগদান করিতেন, এমন কি অনেক মহাত্মা তাহাদের সাংসারিক এবং পারিবারিক কুশল এবং অকুশলের পর্য্যন্ত খোঁজখবর লইতেন। আর এখন সেই পদ-গৃধ্নু প্রভুগণ আপনা লইয়া ব্যস্ত, আপনি আপন মনে মস্ত, আপন আপন মর্য্যাদা লইয়াই শশব্যস্ত। আর অধীনের উপর সতত খড়্গহস্ত। হায়! এ বিড়ম্বনা কেন? রাজপ্রতিনিধিগণ যদি একবার স্থির মনে অতীতের প্রতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে রাজকর্ম্মচারীগণের পদমর্য্যাদা রক্ষার ভার এই দীন, দুঃখী, মূর্খ, অজ্ঞ প্রজাগণের হাতেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। মানব, কেবল মানব কেন? পশু, পক্ষী প্রভৃতিও মনের প্রীতি, স্নেহ, মমতা লইয়া সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা রক্ষায় নিবদ্ধ। যতদিন মানবসমাজে প্রীতি স্নেহের আদান-প্রদান বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন এই মহা সত্যের তিলমাত্র নড়চড় হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমার ভৃত্যটী আমার অধীন কতক্ষণ? না যতক্ষণ আমার বেতনের প্রত্যাশী, আমার অনুগ্রহের প্রত্যাশী, ফলতঃ যতক্ষণ কোন না কোন একটা দায়ে আমার কাছে আবদ্ধ ততক্ষণ। কিন্তু এই অর্থ, অনুগ্রহ এবং দান ছাড়া যে আর একটী আছে, তাহাকে সহানুভূতি কহে। ইহা ঘনিষ্টতার বিকাশ ও স্নেহ শক্তির ফল। একে যদি অন্যকে আত্মীয়তায় ও স্নেহবলে নিজ হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে অপর হৃদয়ের অবস্থা প্রতিফলিত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সহিত তাহার সমবেদনা —সহানুভূতি জন্মে। কোন ব্যক্তি দুঃখে মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে, আমি যদি তাহার সে যাতনা স্নেহ ও সহৃদয়তা বলে সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারি তাহা হইলেই সেই মুহূর্ত্তে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারেচ্ছা হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবে। সেই সহানুভূতি দ্বারা যদি কাহাকেও একবার আবদ্ধ করা যায়, সে বন্ধন জীবনে বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। মরণের পথেও তাহার সুখস্মৃতি স্বর্গীয় আলোক দেখাইয়া চিত্ত বিহ্বল করিয়া রাখে, এবং একে অন্যের স্নেহ ও প্রীতিতে কৃতার্থমন্য হইয়া থাকে।

দেশে পূর্ব্বেও রাজা ছিল। আজও রাজা আছে, ভবিষ্যতেও রাজা থাকিবে। কবি বলিয়াছেন—

"এক রাজা যাবে অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

তবে কথা এই প্রকৃত রাজা কে? যিনি প্রজারঞ্জক তিনিই আসল রাজা। রাজকীয় গুণে বিভূষিত না হইলে, তাহাকে "রাজ" শব্দ বাচ্য করিতে পারা যায় না। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে বলিয়াছেন "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"। রঞ্জ ধাতু অন্ প্রত্যয় করিয়া রাজন্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এমত স্থলে অবশ্য বলিতে হইবে; যে রাজা প্রজারঞ্জন করিতে পারে না, প্রজার অভাব, অভিযোগ বুঝিতে অক্ষম, পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে জানে না, সে রাজা ধর্ম্ম হইতে স্খলিত। রাজা আখ্যা লাভ করা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সমগ্র প্রজাকুলের ভাগ্যবিধাতা যিনি হইবেন, তিনিত নরাকারে দেবতা। মহাভারতে আছে—

যে রাজ্যে রাজায় প্রজায় সেই স্বর্গীয় ভাবের অভাব সে রাজ্যের অমঙ্গল অনিবার্য্য।

যথাসময়ে ডনো সাহেবের নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইলাম। মাঘ মাসের শেষভাগে আমাদিগকে জামালপুর শিকারে যাইতে হইবে। তদনুসারে বিশে মাঘ প্রাতে আমরা শিকারে যাত্রা করিলাম। এক খানা ফেটন গাড়ী, পাঁচটী প্রাণী তাহাতে আরোহী; যেন একখানা কাঁঠাল-বোঝাই নৌকা, গড় গড় করিয়া রাস্তা বাহিয়া চলিল। মাঘের শেষ শীত একটু একটু আছে, রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল। কুষ্টিয়া বাজার পর্য্যন্ত গাড়ীতে পঁহুছিলাম, তৎপর হস্তিআরোহণে পেয়ারপুর—উপস্থিত হইলাম। পেয়ারপুরেই আমাদের তাম্বু পড়িয়াছিল। এইখানে আমাদের মধ্যাহ্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে এক সুবিস্তৃত আম বাগানের মধ্যে তাঁবু সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। বেলা এগারটার সময় আমরা শিবিরে পঁহুছিলাম।

আকাশ নির্ম্মল, নীলাম্বর তলে কোকিল পঞ্চমে মধুর তান ছাড়িয়া মনোভবের মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া "চ'থগেল" করুণ নিনাদে বিরহবিধুর প্রাণে নিজ মর্ম্মজ্বালা প্রকাশ করিতেছিল। আম্র মুকুলে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপকুল ঝঙ্কার দিতেছিল। স্থানটি বড়ই সুন্দর, মনোরম। আমরা যথাশীঘ্র স্নানাহার সমাপন করিয়া পুনরায় হস্তিআরোহণে জামালপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। অপরাহ্ন ৫৷৷৹টা ৬ টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাদের স্কন্ধাবারে উপস্থিত হইলাম।

জামালপুরে আমার একটি বাসাবাড়ী ছিল, সেখানে আমার একজন মোক্তার স্থায়ীরূপে বাস করিতেন। বাড়ীটি আম কাঁটালের একটী বৃহৎ বাগানের মধ্যে স্থাপিত। ঐ বাগানে আমাদের তাঁবু পড়িয়াছিল। আমরা তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া হাত মুখ প্রক্ষালণান্তর পরিধেয় ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করিতেছি, তখন সংবাদ পাইলাম ডনোসাহেব আমাদের জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহ আমরা একবার তখনই তাঁহার কুঠিতে যাই। আমরা তাঁহার কুঠিতে পঁহুছিলে সাহেব অতি সমাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া, সংবাদ দিলেন যে দুইটি বড় বাঘের সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। আগামী কল্যই শিকারে যাত্রা করিতে হইবে। আমি ইহাতে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম,—আর একটি দিন অপেক্ষা করাও যেন দীর্ঘকাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

সাঞ্চীর তোরণ।

পুরাতত্ত্ববিদগণের নিকটে সাঞ্চীর বৌদ্ধ-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অতিশয় মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত। এই স্তূপরাশিতে অদ্যাপি বুদ্ধ-দেবের জীবনী সংক্রান্ত নানাবিধ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আজ আমরা তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিব।

সাঞ্চীর চারিটি সুউচ্চ তোরণ ছিল। দুইটী এখনও বর্ত্তমান আছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ তোরণ কালপ্রভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছে। জেমস ফার্গুসনের মতে Northern is the finest.* কিন্তু জেম্‌স্ বার্গেশের মতে পূর্ব্ব-তোরণই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ফার্গুসন সাহেবের কথাই ঠিক। কারণ, উত্তর তোরণটী যেমন বিশাল তেমনি শিল্প কৌশলের চরম পরাকাষ্ঠা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আয়তনেও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই তোরণটী উচ্চে ৩৫ ফিট এবং প্রস্থে ২৩ ফিট। পূর্ব্ব-তোরণের উচ্চতা-পরিমাণ ৩৩ ফিট। এই তোরণদ্বয়ের উভয়-দিকই আর্য্য-সুলভ কারুকার্য্যাদিতে পরিপূর্ণ। শিল্পী বুদ্ধের জীবনী হইতে তাঁহার অঙ্কনীয় বিষয়ের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু

* History of Indian and Eastern Architecture. By J. Fergusson. p.p. 95.

সে বৃত্তান্ত বুদ্ধের পূর্ব্বজীবনের—যখন তিনি কুমার সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত ছিলেন।

উত্তর-তোরণের ঊর্দ্ধভাগ দুইটী স্তম্ভোপরি স্থাপিত। স্তম্ভদ্বয় মূর্ত্তিবহুল খোদনচিত্রে পূর্ণ। স্তম্ভযুগলের শীর্ষভাগে প্রত্যেকটীতে সমসংখ্যক—হস্তীযূথের প্রতিমূর্ত্তি ও দুইটী নগ্না-কামিনীর মূর্ত্তি আছে। নিম্নভাগাবস্থিত স্তম্ভদ্বয়ের শীর্ষস্থানীয় হস্তীযূথ, বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট উপরার্দ্ধভাগের ভার বহন করিতেছে। উপরভাগে সুন্দরভঙ্গীবিশিষ্ট পুরুষ ও রমণীমূর্ত্তি, হস্তী এবং সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই তোরণের খোদনচিত্রকর্ম্মার দক্ষতা ও কল্পনার (Design) কারিগরী বাস্তবিক প্রশংসাযোগ্য। এবং এই তোরণটীর ভাবোদ্দীপক সৌন্দর্য্যদর্শন করিলে, দর্শকমাত্রেরই মন বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়।

সাঞ্চীর পূর্ব্বদিকস্থ নির্গমন পথের (gateway) বামপার্শ্বের স্তম্ভে যে সকল খোদন-চিত্র দেখা যায়, তাহা অতি সুন্দর ও কাব্যময়। স্তম্ভের অধোভাগে একটি চিত্র আছে। একজন শ্মশ্রুবহুল জটাধারী লোক বসিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকের উপরে কুটীরের ছায়া পড়িয়াছে। কুটীরের আচ্ছাদনী শুষ্ক পত্রদ্বারা গ্রথিত। তাঁহার সম্মুখে একটি পুষ্করিণী। তাহাতে জলচর পক্ষী এবং এবং মস্যদল ক্রীড়াপরায়ণ। জলের উপরে পদ্মপত্র শোভা পাইতেছে। একদল মহিষ ও একটী হস্তী পিপাসা নিবারণার্থ পুষ্করিণীর দিকে আসিতেছে। একজন শ্মশ্রুবহুল ভিক্ষু স্নান করিতেছেন। আর একজন ভিক্ষু একটী লোটা করিয়া জল তুলিতেছেন। সামান্য পরিধি মধ্যে এরূপ নানাবিষয় খোদনচিত্র সমাবেশ করা অল্প ক্ষমতার কাজ নহে।

আরও উচ্চে—স্তম্ভের মধ্যভাগে, একটী মন্দিরের ন্যায় ভবন দেখা যায়। সেখানে, একটী যজ্ঞ-বেদীতে হোমানল জ্বলিতেছে। আর একটি আধারের মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে। কতকগুলি যোগী সমিধ বহন করিয়া আনিতেছেন। পশ্চাৎ দৃশ্যে ফল-ভারাবনত, বানরবিরাজিত বৃক্ষরাজিতে শোভিত। ব্রাহ্মণদল মন্দিরবেষ্টন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন। পর্ণকুটীরে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের দিকে,—আর একজন ব্রাহ্মণ, মন্দিরে কি হইতেছে, তাহা বলিতে আসিতেছেন। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে একটী সর্প উপবিষ্ট রহিয়াছে। সর্পটীর আকৃতি অতি ভয়ানক। তাহার মস্তকে সাতটী প্রকাণ্ড ফণা। ছাদে কতকগুলি গবাক্ষ রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। এই দৃশ্য সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। বুদ্ধদেব ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক যখন চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতেছেন,—সেই সময়ে একদিন তিনি উরূবেলাতে গিয়া, উক্ত সর্পাধিষ্ঠিত মন্দিরে বাস করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। পর্ণকুটীরমধ্যস্থ যে ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছি, তাঁহার নাম কাশ্যপ। কাশ্যপ বুদ্ধদেবের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইহাও বলিতে ভুলিলেন না, যে ঐ মন্দিরে একটী ভীষণ অষ্টফণা সর্প আছে। বুদ্ধদেব অবলীলাক্রমে সর্পের নিকটে গিয়া, তাহাকে ধারণ করিয়া আপনার ভিক্ষাপাত্রমধ্যে স্থাপন করিলেন এবং গবাক্ষ পথ দিয়া মন্দিরস্থ অগ্নিকে বাহিরে প্রেরণ পূর্ব্বক নিরাপদে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বহির্গত

হইলেন। স্তম্ভখোদিত চিত্রে আর আর সমস্তই আছে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উপাখ্যান-বর্ণিত প্রধান ব্যক্তি—অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এই চিত্রে সন্নিবিষ্ট নাই।

বামভাগের স্তম্ভের সম্মুখে আর একটী খোদিত চিত্র আছে।

জলের ভিতরে ফলিত-ফল ছয়টী বৃক্ষ রহিয়াছে। বৃক্ষগুলি সাতিশয় অস্পষ্ট। উদ্ভিদ্বিদ্যা হইতে কোনরকম নামই তাহাদের উপরে প্রয়োগ করা যায় না। জলে কয়েকটী পাখী সাঁতার দিতেছে। কেহ জলের ভিতরে মাথা ডুবাইয়া দিয়াছে; কেহ পক্ষ প্রসারিত করিয়া, মাথাটী পিছনে হেলাইয়া রহিয়াছে। একটী পানিভেলা (pelican) পাখী মাছকে গ্রাস করিতেছে। প্রস্ফুটিত কমল সলিল-বক্ষে ভাসিতেছে। জলের ঢেউগুলি খুব উচ্চে উঠিয়াছে।

তিনটি মানুষ একখানি নৌকা বাহিয়া আসিতেছেন। দেখিলে, বোঝা যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। দুইজন শ্মশ্রুগুল্ফধারী—একজন ক্ষৌরিত, কিন্তু তাঁহার মস্তকে দীর্ঘকেশপাশ আছে। নৌকাখানির আকার পুরাতন নহে। মাদ্রাজের উপকূলে বা যেখানে সেখানে এখনও ঐরূপ ধরণের নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়।

কথিত আছে, বুদ্ধ একবার উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল নিরঞ্জন নদীর উপর দিয়া, যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় পদব্রজে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। বিস্মিত কাশ্যপ নৌকা-সাহায্যে বুদ্ধের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু এখানেও বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শিত হয় নাই।

অধোভাগে আর একটী ভিত্তি-গাঁথনীর উপরে চারিটী লোক রহিয়াছে। লোকগুলির পিছনে,—একটী গাছের সম্মুখে, একটী প্রস্তরবেদী রহিয়াছে। মূর্ত্তি চতুষ্টয়কে দেখিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানা যায়। মধ্যস্থিত ব্রাহ্মণটী ঊর্দ্ধ-করে ঊর্দ্ধপদে-ভূতলশায়ী রহিয়াছে। তাহার পদদ্বয় এখন ভাঙিয়া গিয়াছে। চারিদিকে বিচ্ছিন্ন পুষ্পদল ছড়ানো রহিয়াছে। তাহা দ্বারা শয়নের অবস্থান (position) বোঝানো হইয়াছে। অপর ব্রাহ্মণত্রয় ধ্যানস্তিমিতনেত্রে দাঁড়াইয়া। তাঁহাদের পিছনে কতকগুলি চারা গাছ খোদিত হইয়া, দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিতেছে, যে মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়া আছে,—শুইয়া নাই! ফার্গুসন বলিয়াছেন যে, "শায়িত মূর্ত্তিটীর পিছনে কতকগুলি তরঙ্গপ্রতিম রেখা (wavy-line) আছে।* কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বামদিকস্থ স্তম্ভের অভ্যন্তরভাগে আর একটী চিত্র আছে। একটী ফলভারনত পাদব-পরিবৃত অরণ্য-মধ্যে তিনজন ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। একজন অগ্ন্যুৎপাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিতেছেন। দুইটী শ্মশ্রু-গুল্ফধারী ব্রাহ্মণ বৃক্ষচ্ছেদনে নিরত। পশ্চাৎদৃশ্যে একটী গোলাকার বাড়ী খোদিত হইয়াছে। বাড়ীটির চারিদিকে রেলিং দিয়া, আরণ্যপশুর ভীতি হইতে নিরাপদীকৃত।

এই চিত্রের মুল-সম্বন্ধে একজন বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদের মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* Trees &c. Serp. Worship. by J Fergusson p. p. 141.

"When the Brahmanas tried to light a fire the wood, owing to Gautama's power, would not burn. They made their trouble known to Kasypa, who entreated Gautama to let the fire kindle. When Gautama gave his consent the wood took fire, and there was nothing to present the sacrifice." *

যে চিত্রগুলির কথা বলা গেল, সেগুলি মধ্যযুগে খোদিত।

এই চিত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে, একটী গল্পই আংশিকভাবে, বার বার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র সহায়তায় উল্লিখিত হইয়াছে।

একজন মানুষই দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। জল ও স্থল এক সমতলক্ষেত্র মধ্যেই খোদিত হইয়াছে। জল-স্থলের বিভেদ—মধ্যবর্ত্তী সমতল রেখার দ্বারা বোঝানো হইয়াছে। চিত্রবিষয়ী-ভূত মূর্ত্তি-বৃন্দ শায়িত বা দণ্ডায়মান। যেখানে শায়িত মূর্ত্তি,—সেখানে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন কুসুম-রাশি ছড়ানো আছে। অন্যান্য স্থলে চারা-গাছ দিয়া বোঝানো হইয়াছে। চিত্র-নিবিষ্ট মূর্ত্তি সমুদয়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। সকল চিত্রই বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে খোদিত হইয়াছে, অনেকগুলি বুদ্ধের জীবনী-সংক্রান্ত, কিন্তু চিত্রমধ্যে বুদ্ধদেবেরই অভাব। খৃষ্টানগণ, প্রাচীনকালে চিত্রাদিতে যেমন মৎস্য, মেষ প্রভৃতি জীববৃন্দ সন্নিবিষ্ট করিতেন, বৌদ্ধগণও তেমনি খোদনচিত্রে মৎস্য, পক্ষী, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি প্রাণীবৃন্দের সমাবেশ করিতেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

যাদু।

একদিন বসে' আছি মুক্ত গগনের কোলে,
অনন্তের কাছাকাছি—প্রেমামৃত পা'ব বলে'!
হেনকালে তুই এলি 'বাবা আমি' বলে' যেই,
দেখিনু নয়ন মেলি' যেন তুই সেথা নেই!
উঠিলে ঝাঁপায়ে বুকে 'ও বাবা আমার' বলে';
হেরি' সে স্বর্গীয় মুখে, সর্ব্ব ব্যথা, গেল চলে'!
তোরে পে'য়ে শুধু তোর মুখে রহিলাম চাহি,—
এ সংসারে যেন মোর আর কোন লক্ষ্য নাহি!
প্রীতির স্বরূপ যেন তুই ওরে প্রিয়তম,
অমৃতের বিন্দু হেন শান্ত, শুদ্ধ, অনুপম!
তুই যেন পুত্ররূপে আমার আনন্দ ওরে;
দিস্ তাই চুপে চুপে আমারে বিহ্বল করে'।
তোরে কোলে নিয়ে আজ রোমাঞ্চ হ'তেছে মোর;
ডুবি'ছে ও রূপ-মাঝ যেন বিশ্ব-চরাচর!
তোরে হেরি' আঁখি ভরে' কেন শুধু আসে জল,
কি যাদু করিলি মোরে?—বল্ বৎস, মোরে বল্!

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

---

* Buddhist Art in India by J. BurgessC,I,E. L,L,D. F,R,S,E. &c,—p.p. 66.

মাঘ মণ্ডলের ব্রতকথা।

পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সমস্ত পল্লীতে মাঘ-মাসে বালিকারা এই ব্রত করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এখন এইগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। অল্পবয়স্কা বালিকা-দিগকে প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা-ইয়া গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার এমন উৎকৃষ্ট শিক্ষা আর নাই। ছেলেবেলায় সন্ধ্যাকালে সমবয়স্কাদের সহিত মিলিত হইয়া পরদিন প্রাতে ব্রত করিবার জন্য কত যত্নের সহিত ফুলদুর্ব্বা তুলিয়া রাখিতাম, আবার অতি প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেবতাদের নিকট সরল প্রার্থনাপূর্ণ সঙ্গীত করিতে করিতে মুখ প্রক্ষালন করিতাম,—শৈশবের সেই মধুর স্মৃতি এখনও প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়। এই সঙ্গীতগুলি কাহার রচনা এবং কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে জানিনা। (কিন্তু বোধহয় বর্ণজ্ঞান-হীনা মহিলাগণ আপন হৃদয়ের সরল ভাবটুকু গ্রথিত করিয়া বঙ্গ বালিকাগণের মঙ্গল কামনায় এই সঙ্গীত গুলি রচনা করিয়াছেন।)

এই সকল ব্রতে কোন অর্থব্যয় নাই, কেবল বালিকাদের নিজের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যে সকল দ্রব্য লাভ সম্ভব, অর্থাৎ ফুলদুর্ব্বাই ব্রতের উপাদান। সুতরাং পাড়াগাঁয়ের প্রায় সকল বালিকাই এই ব্রত করিয়া থাকে, এবং মাঘ মাসের প্রভাতে তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর ক্ষুদ্র পল্লীবক্ষঃ ঝঙ্কারিত করিয়া তোলে। মাঘমাসে প্রাতঃকালে স্বভাবতঃই কুয়াসা হয়, তখন বালিকারা পুকুরের ঘাটে বসিয়া সুর করিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করে—

কুয়া(কুয়াসা) ভাঙ্গি কুয়া ভাঙ্গি এ্যাচলার আগে,
সকল কুয়া গেল বরই (কুল) গাছটির আগে,
দে দে বরই গাছটী ভরসা দে,
ছয় কুড়ী ছয়টা বরই লিখিয়া দে।

পূর্ব্ববঙ্গে ঘরের চালের নিম্নভাগকে অ্যাচলা বলে, সম্ভবতঃ অঞ্চল শব্দের অপভ্রংশ। এইখানে সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া কুয়াসা ভঙ্গ হয়। বালিকাগণ তাহারও আগে কুয়াসা ভাঙ্গিতে উঠিয়াছে এবং এই সময় কুলভরা গাছ দেখিয়া তাহাতে লুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

লিখিতে পড়িতে একটী হ'ল উনা, (কম)
কেটে কুটে ফেলা লো শিবের কানের সোনা।

বেচারা শিব কি অপরাধ করিলেন বোঝা গেলনা।

শিবের কাণের সোনা নালো নরীয়ার পিতল।
কতকাল থাকবো আমরা বর্ত্তের (ব্রতের) ভিতর!

ওঃ শিব পিতল কাণে দিয়া সোনার বাহাদুরী লইতে চাহেন!

বর্ত্তের ভিতর নানা রতন জ্বলে,
পাড়া ভরে লো জয় জোকার (জয়কার) পড়ে।
আমরা জয় দেব নালো যোকাড় (হুলুধ্বনি) দেব,
সোনা দুইটী ভাই বোন কোলে তুলে নেব।

কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর প্রতি বঙ্গ বালিকার স্বাভাবিক স্নেহ রাশি উথলিয়া উঠিল, তাই সে গাহিল—

"সোনা দুটী ভাই বোন কোলে তুলে নেব।"

তারপর চোখ্ মুখ ধোয়ার গান—

চ'খে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে?
সরুয়া মরুয়া দুটী ফুল লাগে।
ও পাড় থেকে জিজ্ঞাসে মালী,
কি কি ফুলে মুখ পাখালি?

ভাই এনে দিয়েছে সরষার ডালি
তাই দিয়ে আমরা মুখ পাখালি।
যে জল ছোঁয় নীলো কাগে (কাকে)
আর বকে,
সে জল ছুঁই আমরা দুর্ব্বার আগে।
সরস্বতী জিজ্ঞাসেন কি বর মাগে।
পাশা খেলিয়া জিনিলাম কড়ি;
তাই দিয়ে কিনিলাম কপিলেশ্বরী।

এক বারেই কপিলেশ্বরী না চাহিয়া পাশাখেলার ঝঞ্ঝাট করিয়া কপিলেশ্বরী লাভে একটু সুখ আছে তাহা পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন।

কপিলেশ্বরী গাই কিবা ঘাস খায়,
পুকুড়ের চারি পাড়ের দুর্ব্বা খায়।
দুর্ব্বা খেয়ে লো সই শুকাল দুধ,
কি দিয়ে পাল্‌বো আমরা রাইলের
ঘরের পুত।
রাইলের* ঘরের পুত নালো বেড়ার মাটি,
ব্রতীদের ভাই বোন লোহার কাঠি।

ব্রতধারিণী বালিকা এবারও বেড়ার মাটির ন্যায় নিজকে তুচ্ছ মনে করিয়া ভাই বোনকে লোহার কাঠির ন্যায় স্থায়ী করিবার কামনা করিতেছে।

এখন সূর্য্য উদিত হইতেছেন বালিকা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছে—

উঠ সূর্য্য উদয় দিয়া,
নবীন পৈতা গলায় দিয়া।
সূর্য্য ওঠে কোনখান দিয়া?
বামুন বাড়ীর কাছ দিয়া।
বামুন মেয়ে বড় সেয়ান,
পৈতা যোগায় বেয়ান বেয়ান।
পৈতার ঘোলা জল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মালিনী হাসে।
হাসিস্ না লো মালিনী তুই আমার সই,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাবো কই।
আছে আছে লো ঘাট ভুঞ্ৰিমাণী বাড়ীর কাছে,
রাত পোহালে ভুঞ্ৰিমানী-মেয়ে কোদাল
ধোয় তাতে।
কোদাল ধোয়া জল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে বামুন ঠাকরুণ খল খল হাসে।
হাসিস্ না লো বামুন মেয়ে তুই আমার সই,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাবো কই।
আছে আছে লো ঘাট মালী বাড়ীর কাছে,
রাত পোহালে মালিনী বুড়ী ফুল ধোয় তাতে।
ফুল ধোওয়া ঘোলা জল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মালীর মেয়ে খল খল হাসে!
হাসিস্ না লো মালিনী তুই আমার সই,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাবো কই।
আছে আছে লো ঘাট নাপিত বাড়ীর কাছে,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত আমরা করবো সেই ঘাটে।

মেয়ে তখন মালিনী, বামুন প্রভৃতি সকল জাতির মেয়ের সহিত সখীত্বের সুমধুর বন্ধন স্থাপন করিয়া ঘাটে জল লইয়া খেলিতে বসিল। এ সময় দুর্ব্বা দিয়া খেলিবার জাল তৈরী করিয়া নিম্নলিখিত রূপ গান করা হয়—

রাইলদের পুকুরে ফেলিলাম জাল,
তাতে উঠল না কিছু মাছ।
মামাদের পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাতে উঠল রাঘব বোয়াল।
পেয়েছি পেয়েছি মাছ নেবে কে?
আস্‌ছে ঐ বামুন মেয়ে থালুই হাতে ক'রে।
থাক্ থাক্ বামুন মেয়ে, আপনি নেব ধ'রে।

* সম্ভবতঃ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের উপাধি।

যেমন তেমন করে।
এনেছি, এনেছি মাছ কাটবে কে?
আসছে ঐ বামুন মেয়ে বঁটী হাতে করে।
থাক্, থাক্ বামুন মেয়ে, আপনি কাটব
যেমন তেমন করে।
কুটেছি, কুটেছি মাছ, ধোবে কে?
আস্‌ছে ঐ বামুন মেয়ে জলের ঘটী নিয়ে।
কুটেছি কুটেছি মাছ রাঁধবে কে?
আস্‌ছে ঐ বামুন মেয়ে কড়াই হাতে করে।

বামুনের মেয়েকে সকল রকম কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে এলেও রান্নাটা তার ঘাড়ে না চাপিয়ে দিয়ে পারা গেল না।

তারপর ভোজন শেষ, এবং ভাইদের প্রতি আশীর্ব্বাদ এবং পিতার সৌভাগ্য কামনা।

খরকা মুঠুম, কাটুম কুটুম মুঠে ধরি মাজা,
ভাইটী আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা!
দধিশ্বর, দধিশ্বর বাপ, ভাই আমার লক্ষেশ্বর;
গাইটি (*) কেটে ভাইটী পেলাম
তার শত্রু দুই নখে কেটে দিলাম।

তারপর মাটীর তৈয়ারী দুইটী পুতুলকে বিয়ে দেওয়া হয়, পুতুল দুইটীর নাম হালা।

বিবাহের গান—
হালা ধরি, মালা ধরি, তুলে ধরি ছাতি,
শিব শঙ্কর বিয়া করে গৌর পার্ব্বতী।
আন গৌরীকে ডাক দিয়া,
যুঁতি মালতীর তলা দিয়া,
যুঁতি মালতীর নাই ফুল,
গৌরীর মাথায় দীঘল চুল।
এ পাড়া ও পাড়া কিসের বাদ্য বাজে?
রাজার বেটা সদাগর বিয়া করতে সাজে।
সাজ সাজরে রাইল মাথায় মুকুট দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দর কন্যা তুলে দিব বিয়া।
সাজ সাজরে রাইল পাঁয়ে নুপুর দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দর কন্যা তুলে দিব বিয়া।

এখন ঘাট, পথ, বৃক্ষ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে:—

আমরা পূজি ঘাট,
আমাদের হবে সোনার খাট।
আমরা পূজি পথ,
আমাদের হবে সোণার রথ।
আমরা পূজি মান্দার
আমাদের বাপ ভায়ের ঘর ধানে, চাউলে
ভাণ্ডার।

তারপর গৃহে আসিয়া উঠানে পিঠালির আলেপনার কাছে বসিয়া গাহিতে হয়। সচরাচর বধূরাই আলেপনা দিয়া থাকেন। পিঠুলি দ্বারা আয়না, চিরুণী, খাট প্রভৃতি অঙ্কিত করা হয়। বলা বাহুল্য নববধূগণ এই অঙ্কন কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে বিশেষ যত্নবতী হন।

মাঘ মণ্ডল, মাঘ মণ্ডল,
সোণার কুণ্ডল, সোনার কুণ্ডল,
মাঘ মণ্ডলের কোটে ঢেলে ঘি
আমরা হব বড় মানুষের ঝি।
মাঘ মণ্ডলের কোটে ঢেলে মধু
আমরা হব বড় মানুষের পুত্রবধু।

এতক্ষণ এ প্রার্থনাটী মনে মনেই ছিল এখন আর প্রকাশ না করিলে চলিল না।

আমরা পূজি মেটে কোট,
আমাদের হবে সোণার কোট।

* এক প্রকার সুতা।

আমরা পূজি মেটে আয়না,
আমাদের হবে সোণার আয়না।
আমরা পূজি মেটে চিরুণী,
আমাদের হবে সোণার চিরুণী।
আমরা পূজি মেটে কৌটা
আমাদের হবে সোণার কৌটা।

এইরূপ প্রার্থনার পরই ব্রত ভঙ্গ হয়। সমস্ত মাঘ মাসই এই ব্রত করিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাদিগকে সকালে শয্যা ত্যাগের অভ্যাস জন্মাইবার জন্যই যে এই ব্রতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ব্রতকালে যে সঙ্গীত করা হয়, তাহা কবিত্ববিহীন হইলেও ইহার প্রতি ছত্রে পল্লীবাসিনী বালিকার যে হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া উঠে; তাহার তুলনা নাই।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস-জায়া।

জাতীয় মহাসমিতি।

গত বৎসর সুরাটে কংগ্রেসযজ্ঞ ভঙ্গের পর, প্রায় দশ মাস অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস সম্বন্ধে নানা জনরব উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন; যে এবার চরমপন্থীগণ মিলিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু মডারেট-গণ তাঁহাদিগকে বাদ দিতে চান।

আগামী ডিসেম্বর মাসেই মান্দ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশন অবশ্য এলাহাবাদে গৃহীত কন্‌ভেনসনের অনুযায়ী হইবে। চরম দল বলেন—আগামী মান্দ্রাজ-কংগ্রেস কখনো "জাতীয় মহাসমিতি" নামে অভিহিত হইতে পারে না। কারণ এক পক্ষের মিলন সভা কখনো "জাতীয়" নাম ধারণ করিতে পারে না।

এ যুক্তি নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বিলাতে যথারীতি নির্ব্বাচিত স্থিতিশীল দল শক্তিমান হইয়া ক্ষীণশক্তি লিবারেল দলকে পার্লামেণ্ট হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া দিয়া "বৃটিশ" পার্লামেণ্টের নামে কাজ চালাইতে পারে না। সুতরাং দেশে যদি চরমপন্থী ডেলিগেট নির্ব্বাচন করে তাহাদিগকেও লইতে হইবে। মতের অনৈক্যহেতু 'জাতীয়' নামধেয় কোন প্রতিনিধি-সভা হইতে দলবিশেষকে বাদ দেওয়া যায় না।

চরমপন্থীকে কংগ্রেসে লইতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে দেশের কল্যাণ সকলেরই উদ্দেশ্য সুতরাং দলাদলির প্রয়োজন কি? দলাদলি হইলে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। একই উদ্দেশ্যে মাতৃপূজার আয়োজন করা প্রয়োজন। চরম-পন্থীকে এইটুকু বুঝাইয়া দেওয়া হউক, যাহা সম্মিলিত মহাসমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, তাহা প্রত্যেক সভ্যের পালনীয়। যাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—তাঁহার স্বাধীন মতে; কিন্তু কংগ্রেসের নামে নয়। এই প্রসঙ্গে পুরাতন কথা পাড়িতে হইল। গত কলিকাতা কংগ্রেসে যখন "বয়কট" প্রস্তাবটি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল তখন তাহা সকলেই গ্রহণ করিয়াছিল,—কিন্তু যখন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাহার ব্যাখ্যা করিলেন যে "বয়কট" মানে শুধু কাপড়-চোপড় নয়—তাহার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের অবৈতনিক পদগুলিও ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে—তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া—বিপিন বাবুকে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। শেষে এমনি দাঁড়াইল যে মহাসভার শক্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা হইল; ধীর, শান্ত গোখলে মহোদয় বুঝাইয়া বলিলেন যে,—"যে যাহার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে—কিন্তু কংগ্রেস যে গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে তাহা সকলকে মানিতে হইবে। তাহার অধিক নহে। যিনি তাহার অধিক যাইতে উদ্যত—তিনি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে যাইতে পারেন।"

কথাগুলি যেমন অকাট্যযুক্তি পূর্ণ তেমনি সারগর্ভ। এখন মডারেট দলের কর্ত্তব্য এই যে চরমপন্থীগণকে বুঝাইয়া বলা উচিত যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-সমবেত মহাসমিতির উদ্দেশ্য। সকলেই এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি তাহার অধিক যাইতে উদ্যত তিনি তাহার স্বাধীন মতে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী কিন্তু কংগ্রেস সেজন্য দায়ী নহেন।

বিশেষতঃ এক্ষণে চরমপন্থীদল, একেবারে নেতাশূন্য। তিলক বন্দী, খাপর্দ্দে প্রবাসে, অরবিন্দ অভিযুক্ত ও বিপিনচন্দ্র প্রবাসী—এমন অবস্থায় যাহাতে চরমপন্থীগণকে কংগ্রেসে যোগদান করান যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা মডারেটগণেরই কর্ত্তব্য। উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। কারণ এ কথা সত্য যে, যদিও তিলকের বাহিক রূঢ়তা গত বৎসর মহা সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তথাপি, ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম বিচারে মডারেটগণের যে একেবারে দোষ ছিল না—একথা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন না।

যাহা হউক, অতীতের শোক-কথার আলোচনার এখন সময় নয়। তবে অতীতের উদাহরণ ভবিষ্যতের কর্ম্মীকে সাবধান করিয়া দেয়। যাহাতে উভয় দলের সম্মিলিত "জাতীয় মহাসমিতি আবার গর্ব্বের সহিত মাথা তুলিয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা সকল ভারতবাসীরই একান্ত কর্ত্তব্য।

কোন নিরপেক্ষ মডারেট।

সম্রাটের ঘোষণাবাণী।

সিপাহী বিদ্রোহের আতঙ্কছায়া তখনো লোকের মন হইতে একেবারে দূর হয় নাই,—সে দুর্দ্দিনের বীভৎস চিত্র দেশময় একটা নিবিড় অন্ধকার ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। তখন সেই অন্ধকারের গর্ভ হইতে, তরুণ প্রভাতরশ্মির মত ১৮৫৭ সালে, ১লা নভেম্বরে মহারাণীর ঘোষণাবাণী দেশ আনন্দআলোকে প্লাবিত করিয়াছিল! মহারাণী কম্পানীর নিকট হইতে সেই প্রথম স্বহস্তে ভারতরাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। সে আজ ৫০ বৎসরের কথা। আজ—তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের "পঞ্চাশৎ বার্ষিকী" উৎসব হইয়া গেল। এই উপলক্ষে আবার রাজবাণী বিঘোষিত হইল। কিন্তু সেদিনে ও আজিকে কি প্রভেদ! সেদিনকার সমারোহ—আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও যে গভীরভাবের বিকাশ হইয়াছিল আজ তাহা কৈ?—সেদিনকার উৎসবাড়ম্বরের কথা তৎকাল প্রচলিত সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া দুরূহ। আমরা মনস্বী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যে সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের সহিত "ঘোষণা" পত্র পাবনা জেলায় পঠিত হইয়াছিল—তাহা আমি (আজিও) গর্ব্বের সহিত স্মরণ করি। তখন তোপধ্বনি ও জন-সাধারণের কোলাহলে দিক পরিপূরিত হইয়াছিল। ইংরাজী ও বাংলাভাষায় "দীর্ঘায়ুরস্তু" "মহারাণীর জয়" শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান একবাক্যে সেই প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ, উপবীত হস্তে তাঁহাদের সদাশয়া মহারাণীর জয়োচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

সেদিন যেমন অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল—তেমনি তাহা সার্থক হইয়াছিল। সেদিন সমগ্র ভারত-প্রজা মহারাণীর নিকট হইতে যে দান ও স্বত্ব পাইয়াছিল তাহা যথার্থই গর্ব্বের সামগ্রী। আজিকার ঘোষণাপত্র নূতন কোন দানে আমাদিগকে গৌরবান্বিত করে নাই বা মহারাণীর ঘোষণাবাণীর মর্য্যাদা অক্ষত থাকিবে—এরূপ আশ্বাসেও আমাদিগকে আশ্বস্ত করে নাই। সেইজন্য ভারতবাসী মাত্রেই ক্ষুব্ধ। তথাপি আমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ নহি,—ভবিষ্যৎ রাজনৈতিকক্ষেত্রে যে আমাদের অধিকার বৃদ্ধি হইবে সম্রাটের ঘোষণা বাণীতে তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা মর্লির নূতন রাজনৈতিক নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ দেখিতে উৎসুক হইয়া আছি। দেশের উন্নতিসাধন কার্য্যে আমরা প্রকৃত ক্ষমতাধিকার প্রাপ্ত হইলে সূর্য্যকিরণে অন্ধকারের

ন্যায় আমাদের অসন্তোষ আপনা হইতে বিদূরিত হইবে।

'ঘোষণা' প্রসঙ্গে মান্দ্রাজ লাট বলিয়াছেন 'অনেক সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণে ভারতবাসী কেবল ইংরাজ শাসনের ছিদ্রান্বেষণ করে।' তাহার কারণ আর কিছু নয়,—কোনও বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহার সুফল হৃদয়ঙ্গম করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কুফলের কথাও মানবের মনে স্বতই উদিত হয়; ইহাই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। আমরা এ কথা বলিতে চাহি না যে গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবাসী কেবলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক বিষয় তাহাদের উন্নতি হইয়াছে। লর্ড মেয়োর আমল হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থদান পাইতেছে। তাহাতে অনেক মঙ্গল সাধন হইতেছে। লর্ড ডফারিনের আমলে কংগ্রেসের জন্মলাভ হইয়া ভারতবাসীর মধ্যে একতা পুষ্টি হইয়াছে। লর্ড ল্যান্সডাউনের সময়ে ব্যবস্থাপক সভার উন্নতি হইয়া ভারতবাসী অধিকতর অধিকার পাইয়াছে। তাহার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, ভারতবাসী ক্রমশই নির্ধন হইয়া পড়িতেছে, এবং পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—বর্ত্তমান দারিদ্র্য এই ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেশ ক্রমশঃ জনহীন হইয়া পড়িতেছে। এবং গত ৫ বৎসরে বিশেষতঃ লর্ড কর্জ্জনের আমলে ভারতবাসীর প্রজাস্বত্বের অধিকারেও হস্তক্ষেপ হইয়াছে—এইরূপ সাধারণ ধারণা।

বঙ্গ-বিভাগ ভিন্ন আর একটি বিষয়ে বঙ্গবাসী যথার্থ অভিযোগ করিতে পারে। সেটী তাহার রাজকীয় সামরিক বিভাগে প্রবেশে অনধিকার। যে বাঙালী, ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়াছে, তাহাকে এই অধিকারে বঞ্চিত করা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে হয়। যেন তাহার প্রতি, তাহার শক্তির প্রতি চিরন্তন অনাস্থা খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙালী ভীরু, বাঙালী নির্জ্জীব—এ যুক্তি নিতান্ত অন্তঃসারহীন। যখন, ষ্টিভেনসন সাহেব ভারত ভ্রমণ প্রসঙ্গে বাঙালীর অযথা গ্লানি প্রচার করিয়াছিল, তখন তৎকালীন বঙ্গীয় শাসনবিভাগের ওল্ডহাম সাহেব প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই বাঙালীর পূর্ব্ব-পুরুষগণই লর্ড ক্লাইবকে পলাসীর প্রান্তরে সাহায্য করিয়াছিল। বাস্তবিক বাঙালী সামরিক বিভাগে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়া নিতান্তই দুঃখিত। অন্য সকল ভারতবাসীর এই গর্ব্বের অধিকার আছে কেবলই বাঙালীর নাই! এমন কি তাহারা সখের সৈনিক রূপেও গৃহীত হয় না!

প্রজার হৃদয়, হৃদয় দিয়া জয় করিতে হয়। বিশ্বাস দ্বারা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যদি বাঙালীকে বিশ্বাস করিয়া সেনাবিভাগে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, বাঙালী কখনই সেই অধিকারের অপব্যবহার করিবে না। আমাদের এই প্রস্তাব—আজিকার বিপ্লব ও অশান্তির দিনে অনেকের নিকট হাস্যোদ্দীপক হইবে, কিন্তু ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, বাঙালী রাজকার্য্যে কখনও আপনার দায়িত্ব হইতে বিচলিত হয় নাই। বাঙালী পুলিস ও ডিটেক্‌টিভ না থাকিলে, পুলিস বিভাগের কার্য্য চলিত কি না সন্দেহ। এই অশান্তির দিনে বাঙালী পুলিশ আপনার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছে। ভবিষ্যৎ "রিফর্মে" এ বিষয়েও সম্রাটের দৃষ্টি, আকৃষ্ট হইবে, এই আশায় আমরা আশান্বিত রহিলাম।

চয়ন।

তুরস্কে স্ত্রী স্বাধীনতা।

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—"ওয়েষ্ট মিনিষ্টার পত্রে" তৎসম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

টাগেব্লাট্‌ পত্রের সংবাদদাতা লিখিতেছেন—

বৈকালে ৪ ঘটিকার সময় আমি, আমার একটি তুর্কী বন্ধু এবং একটি ইটালিয়ান সহযোগীর সহিত বস্‌ফরাসের পূর্ব্বতীরস্থ গিয়াসৃটেপ শৈলতলে সমাগত হইলাম। এই স্থানে সুহাসিনী প্রফুল্লমুখী মহিলারা তাঁহাদের বিলাস আড়ম্বরময় অন্তঃপুর কারাগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপনীত হইয়াছিলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমার মনে হইতেছিল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। কিন্তু তাহা নহে; সত্য সত্যই সে মুহূর্ত্তে সেই সব খর্ব্বকায়া মহিলারা তুরস্ক নারীসমাজের স্বাধীনতা সঙ্কল্পে তাঁহাদের সহস্র বৎসরের কুসংস্কার ও অবরোধ ভঙ্গ করিয়া তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। সেই শুভ মুহূর্ত্ত আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। সেই সভায় তিন শতের অধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রিফাট্‌ পাশার পত্নী শ্রীমতী লাবিনে হানুম সেই সভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বেশভুষা দেখিলে সহজেই অনুমতি হয় যে, মুসলামীয় পরিচ্ছদ ধীরে ধীরে ইয়ুরোপীয় পোষাকে পরিণত হইতেছে। তাঁহার মুখ অনাবৃত ছিল—এবং মস্তকে একটি সুন্দর ছোট টুপী শোভা পাইতেছিল। ধীর এবং অকম্পিত স্বরে সভাপতি বলিতে লাগিলেন;—"যে নবীন আলোকে আমাদের দেশ প্লাবিত হইয়াছে—তাহা নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমভোগ্য। আমরা তাহা হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না। কারণ স্বাধীনতার দাবী করিবার অধিকার আমাদেরও আছে। আমরা আমাদের জাতির নব জীবন লাভে সহায়তা করিব দরিদ্র এবং অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব। কিন্তু সেই সঙ্গে ইয়ুরোপীয় খৃষ্ট মহিলাদিগের ন্যায়, সমান অধিকার এবং সম্ভ্রম আমরাও ভোগ করিব। এই বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে ধর্ম্ম ও সম্মান সম্বন্ধে অধিকতর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা সমাধিকার এবং স্বাধীনতা চাই। তুরস্ক মহিলারা যেন ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পান। অন্তঃপুরের যে কঠোরতা এযাবৎ-কালই আমাদিগের নারীত্বের অবমাননা করিয়া আমাদিগকে ক্রীতদাসীর মত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অতীতে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অন্তঃপুরের নির্ম্মম অবরোধ দূর করিতে চাই; এবং আমাদের একমাত্র বাণী হইবে "অবরোধ ধ্বংস হউক। নারীর স্বাধীনতা ও সমাধিকার অমরত্ব লাভ করুক।" আমাদের সঙ্গী সেই তুর্কী যুবক বলিলেন—অদ্য-কার এই ঘটনা ইতিহাসে গৌরব স্থান লাভ করিবে। বহুশতাব্দীর দাসত্বের পর আমাদিগের নারীগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইয়ুরোপের অন্যান্য জাতির অনুকরণে শীঘ্রই আমাদের জাতি নবজীবন লাভ করিবে।

বিপিনচন্দ্র ও কটন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও স্যার হেন্‌রি কটনের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বর্ত্তমান ভারত সচীব ভারতের যে রাজনৈতিক সংস্কার করিতে মানস করিয়াছেন—তাহা কোনরূপ ফলপ্রসূ হওয়া দূরে থাক্‌—বরং তাহাতে প্রজা এবং গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বর্ত্তমানাপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় বিরাগ বৃদ্ধি হইবে। সাধারণে উক্ত দান গ্রহণ না করিয়া তাহা তাহাদের লক্ষ্যের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া গণ্য করিবে। অপর পক্ষে গভর্ণমেণ্ট (হয়ত বিলাতবাসী-গণও) তাঁহাদের মহৎ দানকে ভারতবর্ষে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং এইরূপে দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের আশা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সহিত লিপ্ত, তাহা ভিন্ন ভারতবাসী প্রত্যেকেই গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দূরে থাকিতে ব্যস্ত। এবং যাঁহারা নব ব্যবস্থায় গঠিত কাউন্সিলে অথবা বোর্ডের মেম্বর হইবেন তাঁহাদের সহিত ভারতের আধুনিক মতামতের কোন সংস্রব নাই। আপনি বেশ জানেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের চাকরীকে যথেষ্ট সম্মান করিত, এবং সামাজিক উন্নতি লাভের সোপান বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু সে দিন আর নাই! শাসক শাসিতের মধ্যে বিরাগ উপস্থিত হওয়াতে লোকে গভর্ণমেণ্টের বৈতনিক অথবা অবৈতনিক কোন পদবী আর গ্রাহ্য করে না। লর্ড মর্লি হয়ত

শাসন চক্রের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু অন্যদিকে লর্ড কর্জ্জন যেরূপ রিপননীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহার উত্তরাধিকারী যে সেরূপ করিবে না, তৎসম্বন্ধে তিনি কি আশ্বাস দিতে পারেন? সুতরাং এরূপ স্থলে ভারতবর্ষ এমন অধিকার চায় যাহা কোনকালে আর কেহ তাহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

স্যার হেন্‌রী ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন—

"ভারত গবর্ণমেণ্টকৃত কোনরূপ সংস্কার কিম্বা পরিবর্ত্তনের চিরস্থায়িত্ব সম্ভবপর নহে। আমরা জানি যে, কোনরূপ উন্নতি-সংস্কার একবার প্রচলিত করিয়া পুনরায় তাহার প্রত্যাহার সহজ নহে। কিন্তু ইহাও দেখিয়া আসিতেছি যে প্রয়োজন হইলে কোন কার্য্যই বন্ধ থাকে না। সুতরাং এরূপ স্থলে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত অসম্ভব। কিন্তু ইহা জানিয়াও যাহা এক্ষণে পাইতেছি তাহা গ্রহণ করিব না কেন? আমি চিরদিন বলিতেছি যে, বর্ত্তমান শাসননীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবলমাত্র শাসন সংস্কার করিলে অশান্তি বিদূরিত হইবে না। বর্ত্তমান রাজ্যশাসনের নীতি কেবল রাজদ্রোহ দমন, অথবা কারাদণ্ড, এবং ছাত্রদলনে অভিব্যক্ত হইতেছে। এই সকলের নিবারণ এবং রাজনৈতিক অপরাধীগণের মার্জ্জনা প্রয়োজন।

বিপিনবাবুর প্রত্যুত্তর;—

"আমি পূর্ব্ব পত্রেই বলিয়াছি যে, কোনরূপ চিরস্থায়ী অধিকার ব্যতিত ভারতের বর্ত্তমান অশান্তি কিছুতেই বিদূরিত হইবে না। আমাদের তিনটি অধিকার দান করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম অস্ত্র আইন রহিত করা, দ্বিতীয় ভারতবাসীকে "ভলণ্টিয়ার" দলভুক্ত করা এবং তৃতীয় সমগ্র ভারতে ইংলণ্ডের ন্যায় জুরী প্রথা প্রবর্ত্তন করা। এবং আমার বিশ্বাস উক্ত তিনটি অধিকার ভিন্ন আমাদের দেশবাসী অন্য কোন অধিকার গ্রহণে সম্মত হইবে না।

পণ্ডিত রামভজ্‌ দত্ত চৌধুরীর মত।

বিলাতের "ডেলি নিউজ" পত্রের সংবাদদাতা পণ্ডিত রামভজ্‌ দত্ত চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। লেখক বলেন—পণ্ডিত "হিন্দুস্থান" নামক পত্রের স্বত্বাধিকারী। পঞ্জাবের রেলওয়ে শ্রম-জীবিদিগের সমিতি গঠনের জন্য তিনি মিঃ বিচার্ড বেল, এম, পি মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। সাম্রাজ্যের একজন প্রধান বিদ্রোহীজ্ঞানে তাঁহাকে লাজপৎ রায়ের সহিত নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু উচ্চক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত বলিয়া সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পণ্ডিত বলিয়াছেন আমি বাঙ্গালার জন্য কিছু বলিব না। আমার যাহা কিছু বক্তব্য তাহা পঞ্জাবের জন্য। বর্ত্তমান অশান্তির তিনটি প্রধান কারণ আমি নির্দ্দেশ করিব। প্রথম, সাধারণের দারিদ্র্য—গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কুড়িবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে! এবং সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে যে, এই সমস্ত ঘটনা রাজার দোষেই ঘটিতেছে। অবশ্যই ইহা কুসংস্কার! কিন্তু জগতে কুসংস্কার বর্জ্জিত কে? ভদ্রশ্রেণী অপেক্ষা সাধারণের মধ্য হইতেই বিপদ আশঙ্কা অধিক! সৈন্যদল হইতেও বিপদের আশঙ্কা আছে—কারণ কৃষক ও সৈন্য এক পরিবারভুক্ত বলিয়া উভয়েই এক ফলের অধিকারী। সৈন্যেরা যে বেতন পায় এই মহার্ঘের দিনে তাহা যথেষ্ট নহে। তথাপি ইহা বলা নির্ব্বুদ্ধিতা যে সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়াছে! দ্বিতীয় কারণ,—যাহা ভদ্র সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত—তাহা ভারতবাসীর প্রতি আংলো-ইণ্ডিয়ানগণের বিদ্বেষ! কয়েক বৎসর যাবৎ "নিগার" শব্দটি প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রতি ব্যবহৃত হইতেছে। স্মরণ রাখিবেন,—পঞ্জাব সেই সম্ভ্রান্ত ও সাহসী যোদ্ধৃগণের বাসভূমি। তাহারা এযাবৎকাল সম্রাটের কার্য্যোদ্ধারকল্পে নিজেদের রক্তদান করিয়া আসিয়াছে। তৃতীয় কারণ, নিরাশ্বাস। দুইটি কমিশনের জরুরী তাগিদ সত্ত্বেও "খাল খনন" সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। রেলওয়ের জন্য সাতবার কত টাকা ব্যয়িত হইল—তথাপি যাহার উপর সমগ্র জাতির জীবন নির্ভর করিতেছে তাহার জন্য কিছুই করা হইল না। বারম্বার ব্যর্থ হইয়া সমগ্র জাতি বিরক্ত ও আশাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত চৌধুরী সর্ব্বশেষে বলিলেন যে—আমাদের অনেকের ইংলণ্ডের ন্যায়-বিচারের উপর বিশ্বাস আছে। আমার বিশ্বাস যে, ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইতে পারিলে সুফল ফলিবে।

আসামের শঙ্করদেব ও মাধবদেব।

ইঁহারাই আসাম দেশের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক।

আসামদেশ গিরিনদীনির্ঝরিণী-উপত্যকা-অধিত্যকা-অরণ্যাণী-সমাকীর্ণ প্রকৃতির লীলা-ক্ষেত্র। প্রকৃতিদেবী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সৌন্দর্য্যরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন; তাই তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, সকলেই লাবণ্যসিক্ত হইয়া মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ব্রহ্মপুত্র এই সৌন্দর্য্যবার্ত্তা কলকলনাদে বিজ্ঞাপন করিতে করিতে সাগর বন্ধুর উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে।

ঈদৃশকাব্যোন্মাদজনক রসময় প্রদেশে ১৩০৮।৯ সালে স্ববৃত্তি উপলক্ষে অবস্থানকালে তত্রত্য জনসমাজের নানাবিধ অবস্থা ও পর্য্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহারই একাংশ ইতিহাসতত্ত্বজিজ্ঞাসু বন্ধুবর্গকে উপহার দিতে উপস্থিত হইয়াছি।

আসামদেশ প্রাচীন লোহিতরাজ্য বা বর্ত্তমান সদীয়া অঞ্চল হইতে গোবালপাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এতৎ সমস্ত প্রদেশ অসভ্য বন্যবৃত্তি পরায়ণ লালুঙ্গ, মিরী, ডফলা হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতাভিমানী ব্রাহ্মণ কায়স্থ পর্য্যন্ত নানাজাতীয় ও নানাভাষী মানবের বাসস্থান। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে অধিবাসিগণের সামাজিক বিভিন্নতানুসারে তাহাদের ধর্ম্মমত, ধর্ম্মকর্ম্মেরও বিভিন্নতা থাকিবেই। আসামের সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; শুধু আর্য্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর হইতে শঙ্করদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত তত্রত্য আর্য্য-ধর্ম্মের উপদেশপরম্পরা নির্দ্দেশ করতঃ শঙ্করমাধবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন বিবৃত করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অতি প্রাচীন সময়ে এদেশে কিরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা নির্ণয় কয়া দুষ্কর। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে "আর্য্যগণের পদার্পণের পূর্ব্বে এদেশে এরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল যাহাকে জড়োপাসনা বলিলেও হানি হয় না। সেই সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মের চিহ্ন বর্ত্তমানেও অনার্য্য কাছারী, লালুঙ্গ, মিরী, ও ডফলা প্রভৃতি অসভ্যজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।" অধুনা ইহাদের মধ্যে অনেকে আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও স্বভাবসিদ্ধ হীনাচার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

কালক্রমে আর্য্যগণ এদেশে আসিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন; অনার্য্যগণ ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিল। 'পৌরাণিক ধর্ম্ম' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বৈদিক ধর্ম্ম যে আসাম অঞ্চলে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক আর্য্যগণ প্রধানতঃ পঞ্চনদ প্রদেশেই অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কখনও গঙ্গাযমুনা অতিক্রম করতঃ মগধের সীমা লঙ্ঘন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতে লাগিল। আর্য্যদিগের রাজ্য বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদি বাহ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হইতে

লাগিল। সিন্ধুবিধৌত সামগীতিমুখরিত পুণ্য-ভূমি হইতে আর্য্যগণ যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মকর্ম্ম নূতন নূতন মুর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। যতই পুর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকি ততই দেখিতে পাই—বৈদিকতা ধীরে ধীরে তান্ত্রিকতায় পরিণত হইয়াছে। আর্য্যোপনিবেশের শেষ সীমা কমিলিঙ্গ, চট্টল, কামরূপ, লোহিত প্রভৃতি স্থানে তান্ত্রিক-ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব।

যোগিনীতন্ত্রের পূর্ব্বভাগে দ্বাদশ পটলে দেখিতে পাই—

নরকাসুরনামাভূদ্বিষ্ণুবীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
পৃথিবী গর্ভ সম্ভূতো দানবানামধীশ্বরঃ॥
তস্মৈ বিষ্ণুর্দদৌ রাজ্যং কামরূপং মহাফলং।
পুনশ্চ ভগবান্ তস্মৈ নিবাসায় দদৌমুদা।
প্রাগ্জ্যোতিষ্পুরংখ্যাতং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্॥
জিত্বাভিষেচনং রাজা বিষ্ণুঃ শক্তিং দদাবপি॥
ততস্তু দর্শয়ামাস মনোভবগুহাং হরিঃ।
সুস্নাতং নরকং তত্বদ্বোধয়ামাস বৈ তদা!
যদা তে সুমুখী মাতা তদাতে সর্ব্বসম্পদঃ।
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠং স্বনিকেতনম্॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি বৃত্তান্তং শৃণু দারুণম্।
ব্রহ্মণঃ মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠোঽতীব সদযতিঃ।
তারাসারাধয়ামাস তদা নীলাচলে মুনিঃ॥
তত্র তং বারয়ামাস নরকো ব্রহ্মসম্ভবম্।
... ... মহাদেবীং শশাপ দারুণং মুনিঃ॥
ব্রহ্মবধোদ্ভবং পাপং সত্যং তেদ্যৈ ভবিষ্যতি॥

তন্ত্রের তন্তত্ব ছাড়িয়া দিয়া ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ এই দেশ হেয় করিয়া অনার্য্যশ্রেষ্ঠ নরককে শক্তির উপাসনায় দীক্ষিত করিলেন; এবং তাহাকে ৬ কামাখ্যা দেবীর অধিষ্ঠানের রক্ষক ও প্রতিপালক নিযুক্ত করিয়া—(রাজাই ধর্ম্মের রক্ষক ও প্রতিপালক)—পুনরপি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে নরক রাজক্ষমতার অপব্যবহার করাতে—অত্যাচার উৎপীড়ন দোষে দুষ্ট হওয়াতে আর্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া নরকের ভবলীলা শেষ করিলেন—নরক শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তদনন্তর নরকপুত্র ভগদত্তকে তাহার পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আর্য্যগণ "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি গ্রহণ করিতে পারেন। তাই কিরাতপতি ভগদত্তের ভগিনী রূপগুণসম্পন্না ভানুমতী আর্য্যরাজ দুর্য্যোধনের অঙ্কশায়িনী সহধর্ম্মিণী। কামরূপে আর্য্য অনার্য্যে এই প্রথম সম্বন্ধস্থাপন।

কামরূপে আর্য্যতান্ত্রিকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার পর হইতেই "মহাদেব" বা "বুড়া গোসাঁই" 'কালিকা' বা 'কালী' 'বরমাণী' বা 'ব্রহ্মাণী' প্রভৃতি দেবতার পূজাপদ্ধতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বেই যে লৌহিত্যোপকূলে আর্য্যধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (ক) বাণ ভগদত্ত প্রভৃতি অনার্য্যরাজগণ পৌরাণিক তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তাহাদিগকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ইত্যাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

প্রায় ২৫শত বৎসর পুর্ব্বে শাক্যমুনি

(ক) রামায়ণেও দেখিতে পাই—
তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং...
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥
কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্—৪২শঃ সঃ।

অবতীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই ধর্ম্ম কালক্রমে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইল। পূর্ব্বাঞ্চলের পাহাড়পর্ব্বতে আসিয়াও বৌদ্ধপ্লাবনের ঢেউ লাগিল। অনেকে তাহাতে ডুবিয়া গেল।

কোন সময়ে যে এদেশে বৌদ্ধস্রোত বহিয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনদেশীয় পর্য্যটক হুয়েন সাং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মাকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কামরূপেও পদার্পণ করিয়াছেন। (৫৬০।৬১ শক ৬৩৮। ৩৯ খ্রীঃ অঃ বিশ্বকোষ)। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারা যায় যে তখনও কামরূপবাসিগণ দেবদেবীর উপাসনা করিত; বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের আস্থা ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম যে এই আসামপ্রদেশে কখনও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, এতৎপ্রদেশে কোনও সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধপুরোহিতাশ্রম ছিল না বলিয়াই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। (খ)।

ভারতের তাৎকালিক আর্য্যনৃপতিগণ প্রায়শঃই বৌদ্ধধর্ম্মকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন না। বৌদ্ধশ্রমণগণ অনেক সময়ে রাজপূজিতও হইতেন। এমন কি ইতিহাস পাঠে আরও জানিতে পারা যায় যে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা (গ) কান্যকুব্জাধীপ শীলাদিত্যের একজন সামন্ত। তিনি শাক্তপন্থী হইয়াও শীলাদিত্যের বৌদ্ধসমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। (তখন হুয়েন সাঙ্ও কনোজে।) সে যাহাই হউক, আমার বোধহয় যখন পালবংশীয় নরপতিগণ কামরূপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তখন এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ আদৃত ও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যখনই প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া থাকুক না কেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্ম্ম আসামদেশ হইতে একরূপ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অধুনা সমগ্র আসামে চারি পাঁচ সহস্রের অধিক বৌদ্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারাও বিশিষ্ট বৌদ্ধ নহে; প্রায় সকলেই হীনজাতি ও অনার্য্য-বংশসম্ভূত। এই বৌদ্ধগণও খাস "অসমীয়া" নহে। ইহাদের প্রায় সাড়েপনের আনা ভুটিয়া, অবশিষ্টাংশ ব্রহ্মদেশীয় ও শ্যামদেশীয় লোক।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভয়ে তাঁহার শিষ্যগণের প্রতাপে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম পলায়ন করিল। বৈদান্তিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ভারতবর্ষে আর স্থান না পাইয়া বৌদ্ধেরা পার্ব্বত্য তিব্বত ও সুদূর চীন ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিল। কালক্রমে আসামদেশেও পুরাতন আর্য্যধর্ম্ম সম্পূর্ণ আধিপত্য পুনঃপ্রাপ্ত হইল। লুপ্ততীর্থসমূহের আবিষ্কার—এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড পূজাপদ্ধতির পুনঃসংস্থাপন হইল। যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থও রচিত হইল। এই তন্ত্রে কামরূপের তীর্থাদির মাহাত্ম্য

(খ) কেহ কেহ হাজোর মন্দির বৌদ্ধমঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হাজোর হয়গ্রীব মাধবকে দেখিবার জন্য বহু ভোটানাধিবাসী প্রতিবৎসর এইস্থানে আসিয়া থাকে। কাহারও মতে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের সাক্ষী জনার্দ্দনও বৌদ্ধমূর্ত্তি।

(গ) ভাস্করবর্ম্মা কুমাররাজ নামেও প্রসিদ্ধ। বিশ্বকোষ।

বিবরণ ও পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দেবেশ্বর নামে একজন শূদ্র রাজাই পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

জনসাধারণে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আচার ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অদ্যাপি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্বচিৎ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু প্রাচীন আর্য্য-ধর্ম্মের উপদেশ সুচারুরূপে প্রাপ্ত না হইয়া ব্রাহ্মণাদি সকলেই হীনাচারী হইয়া পড়িল। কলিতা প্রভৃতি কোনও কোনও শ্রেণী ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ের প্রতি আক্রমণ করিল। ব্রাহ্মণদিগের ভ্রষ্টাচারিত্বহেতু কলিতাগণ সুযোগ পাইয়া আত্মপ্রসারে প্রয়াস পাইতে লাগিল। অনেকে তাহাদের শরণ লইল, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। শক্তি ও শিবের উপাসনাই আর্য্য-পন্থীদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল। ইতর শ্রেণীর জনসাধারণে ঈদৃশ উপাসনার মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া আপনাদের মনোমত যা-ইচ্ছা-তাই পূজা করিতে লাগিল। বলিতে কি, জনসাধারণের মন হইতে ধর্ম্মভাব একপ্রকার তিরোহিত হইয়া গেল। আসাম দেশের ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাসে এই সময়কে "তামসযুগ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দেশে যখন ধর্ম্মের ঈদৃশ অধঃপতিত অবস্থা ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—তখন কোনও এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া দেশের লোকের মানসিক অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছিলেন।

ইনিই আসামের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শ্রীশঙ্করদেব।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। প্রতীচ্য ভূখণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে "নূতন পৃথিবী" আবিষ্কৃত হইল—ভাস্কোডিগামা ও কলম্বস অমর হইলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্পেন আমেরিকার রাজা হইল। তখনকার স্পেনের বাহার দেখে কে! কিন্তু হায়, "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশা ক্রমনেমিক্রমেণ।" অন্ততঃ লুথার ও জুইঙ্গলী খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অসার উপসর্গগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক সারতত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রাচ্যভূখণ্ডের প্রতি, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দিকে, চাহিলে দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-দেব আবির্ভূত। তাঁহার প্রেমের বন্যার "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়"। যদিও সেই প্রেমপ্রবাহের তীব্রবেগ অধুনা মন্দীভূত হইয়াছে,—পবিত্রতা অনেকাংশে আবিলতায় পরিণত হইয়াছে, তথাপি এখনও যে দুই একটি হরিদাস না ডোবে, দুই চারিটি জগাই মাধাই না ভাসে এরূপ নহে।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বরদলৈ তাঁহার "মনোমতীর" "আরম্ভন" বা ভূমিকায় লিখি-য়াছেন,—"যেনেকৈ শ্রীকৃষ্ণর মোহন মুরলির ধ্বনিত বৃন্দাবনবাসী গোপিনীসকল ঢলি ঢলি পড়িছিল সেই দরে এই মহাপুরুষ সকলর মধুর মনোমোহা ধর্ম্মআলাপত অসমীয়া মানুহ মোহ গৈছিল; আরু হেজার হেজার অসমীয়া মানুহে তেঁওবিলাকর কাম ক্রোধ লোভ মোহ দলিয়াই পেলাই এই মহাপুরুষ সকলর ওচরলৈ আহি পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মক আশ্রয় লই তেঁও বিলাকর ইহ জনম সার্থক করিছিল।" এই মহাপুরুষগণই আমাদের শঙ্করদেব ও মাধবদেব ও তাঁহাদের অনুচর পারিষদবর্গ। শঙ্করদেবই প্রবর্ত্তক ও অগ্রণী, মাধব তাহার প্রিয়তম প্রধান শিষ্য ও সহায়। গোপালদেব ও অপরাপর সকলে ইহাঁদেরই উপদেশ পাইয়া ধর্ম্মরাজ্যে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এবং দামোদর ও হরিদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে শঙ্কর মাধবের সহায়তা করিয়া অসমদেশে ধর্ম্মোন্নতির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

কোনও মহাপুরুষকে বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ কিঞ্চিৎ জানিয়া রাখিতে হয়, নতুবা অনেক সময়ে ভুল ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা। শ্রীমচ্ছঙ্করদেবের ও মাধবদেবের ধারাবাহিক জীবনী লেখন আমার উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ আসামদেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও সমাজ সংস্কারক মহাত্মার জীবনের 'খুঁটিনাটি' সমস্ত পর্য্যালোচনা করা মাদৃশ ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" শঙ্করদেবের ও মাধবদেবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কমতাপুরে দুর্লভনারায়ণ নামে (ঘ) এক রাজা ছিলেন। কোনও কারণে তাহার প্রধান মন্ত্রী হেমচন্দ্রের সহিত তাহার মনো-মালিন্য ঘটে। (ঙ)। হেমচন্দ্র প্রতিশোধ লইবার মানসে তীর্থযাত্রার ছল করিয়া ভাটীর দেশে আসিয়া ধর্ম্মেশ্বর নামক গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হেমচন্দ্রের প্রার্থনানুসারে দুর্লভনারায়ণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মেশ্বর পূর্ব্বাভিমুখে অভিযান করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক যুদ্ধাভিনয় হইয়াছিল কিনা তাহার ঐতিহাসিক সত্য কিংবদন্তীরাশির মধ্য হইতে বাহির করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহাই হউক, উভয়তঃ সন্ধি হইল। গৌড়েশ্বর তাঁহার রাজমিত্রের দেশে আপনার ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থ (একুনে চৌদ্দজন) পাঠাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ৭ জন কৃষ্ণপণ্ডিত, মথুরা, রঘুপতি, রামবর, লোহারাম, ধর্ম্ম-নারায়ণ ও বয়ন। কায়স্থ ৭ জন—চণ্ডীবর, শ্রীহরি, শ্রীধর, হরি, শ্রীপতি, সদানন্দ ও চিদানন্দ। দুর্লভনারায়ণ ইহাদের প্রত্যেককে ভূসম্পত্তি দিয়া নিজদেশে স্থাপন করিলেন। এই চৌদ্দজনের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডীবর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হইয়াছিল। এবং ইহাদের মধ্যে বারজন সমধিক প্রতাপশালী হইয়া 'অসমে' "বার ভূঞা" নামে কালক্রমে পরিচিত হইল। এই চণ্ডীবরের বৃদ্ধ প্রপৌত্রই আমাদের শ্রীমচ্ছঙ্করদেব। ক্রমশঃ।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

(ঘ) এই দুর্লভনারায়ণ কে তাহা এখন পর্য্যন্ত সুনির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন ইনি জিতারিবংশীয়; কাহারও মতে ইনি পালবংশীয়; ইহাঁর রাজত্ব কালও এযাবৎ সুনির্দিষ্ট হয় নাই।

(ঙ) কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন যে হেমচন্দ্রের পুত্রের সহিত রাজকন্যার (কাহারও মতে রাজ্ঞীর) গুপ্তপ্রণয় ছিল। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে হত্যা করাইলেন হেমচন্দ্র ইহা জানিতে পারিল। হেমচন্দ্রের শত্রুতাচরণের ইহাই নাকি কারণ। (Mr. M. N. Ghosh's "Religious Beliefs of the Assamese people." দ্রষ্টব্য।)

রাজ্যের কথা।

ভীষণ সংকল্প।—গত ২২শে কার্ত্তিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রকাশ্য সভায় আবার একজন দুর্ব্বৃদ্ধি যুবক বঙ্গেশ্বর ফ্রেজরের জীবন হননে উদ্যত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এবারও তিনি এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। তাঁহার প্রতি ইহা দৈবানুগ্রহ সন্দেহ নাই। এইরূপ অন্যায় নীচপন্থাবলম্বীগণ দেশের কল্পিত মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, ক্রমাগত রাজার মনে সন্দেহ অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে,—কত নির্দ্দোষব্যক্তিকে পর্য্যন্ত এজন্য নিগৃহীত করিতেছে তাহা বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত যে তাহাদের নাই ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি আছে! এই ঘটনায় আমরা যারপর নাই সন্তপ্ত ও নৈরাশ্যাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এই শঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় একপ্রাণে ভগবানকে স্মরণ করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন;—তাঁহার কৃপায় প্রকৃত নেতার অভ্যুদয়ে এই বিপদগামী যুবকদিগের উৎসাহ ও মতি-গতি সুপথে নীত হইয়া তাহাদের দেশানুরাগ তাহাদের উদ্যম উৎসাহ সফল সার্থক হউক। এই বিপদের দিনে ভ্রাতা ভগিনী সকলে মিলিয়া এস তাঁহাকেই আহ্বান করি—তিনি রাজা-প্রজা উভয়কেই সুবুদ্ধি সম্প্রীতি এবং দেশে সুনেতা প্রেরণ করুন। * * *

আবার ইন্‌স্পেক্‌টর নন্দলালকে কে খুন করিয়াছে। নন্দলাল প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়াছিল। দেশে এ কিরূপ কাণ্ড হইতে চলিল!!!

মেদিনীপুর সংবাদ।—নব বৎসরের আরম্ভ হইতে আমরা বিস্ময়ের গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরিতেছি। বোমা, ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া, নরেন্দ্র গোস্বামী, জেলহত্যা, মেদিনীপুর সংবাদ, ডাকাতি প্রভৃতি প্রতি-দিনই নব নব এক একটা বিস্ময়াবহ ঘূর্ণীপথের মধ্যে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার যেন উপায় দেখিতেছি না। মেদিনীপুরের বিস্ময় ক্রমশ 'তর' হইতে 'তম' মার্গে উত্থিত হইয়াছে। সেখানকার বোমা ব্যাপারের প্রধান সাক্ষী রাখালচন্দ্র লাহা এতদিন পরে প্রকাশ্য আদালতে বলিয়াছে যে, মে মাস হইতে আমি মৌলবী সাহেবের গুপ্তচরের কার্য্য করি, এজন্য আমি ৫০ টাকা বেতন পাই; অথচ আমি এই ব্যাপারের কিছুই জানি না। পুলিষ আমাকে যাহা বলিতে বলিয়াছে আমি তাহাই বলিয়াছি, যে সকল কাগজ সই করিতে বলিয়াছে তাহাই সই করিয়াছি, আর তাহাদের কোন কথায় অসম্মত হইলেই তাহারা আমাকে বিশেষরূপ আত্মীয়তা সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিতে, এবং ফাঁসি কাঠে ঝুলাইবার আশ্বাস প্রদান করিতেও ত্রুটি করে নাই।

কেবল ইহাই নহে, বোমা সম্বন্ধে সাক্ষী দিলে স্বয়ং ওয়েষ্টন সাহেব তাহাকে যেরূপ অনুগ্রহ দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া সে প্রকাশ করিয়াছে—তাহাতে কেবল রাজকন্যাটি ছাড়া—অর্দ্ধেক রাজত্বই তাহার প্রাপ্য দাঁড়ায়। তিনি নাকি তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহা পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে স্বীকৃত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা রাখাল দাসের বোধগম্য হয় নাই মৌলবী সাহেবই তাহাকে সে সব বুঝাইয়া দিয়াছিল। লোকটা অশিক্ষিত হইলেও তাহার বেশ একটু কৌতুকজ্ঞান আছে। তাহার এজেহার পড়িলে না হাসিয়া থাকা যায় না। পুলিশের এত কড়াক্কড় পাহারার মধ্যেও সে এক সময় তাহাদের চোখের সামনেই চুপে চাপে তাহার সই করা কাগজের এককোণে লিখিয়া রাখিয়াছিল "সমস্ত ভুল"। রাজকাউন্সিলের যেরূপ নিরপেক্ষভাবে কাজ করা উচিত বর্ত্তমান এডভোকেট জেনেরল তাহাই করিতেছেন। সেই জন্যই ইহার পর, সন্তোষ সুরেন্দ্র ও জগজীবন ছাড়া মেদিনীপুরের অন্যান্য অভিযুক্তগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই সম্বাদে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

শিক্ষিত দলের দস্যুতা।—আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে যখন নরেন্দ্র গোস্বামী বলিয়াছিল—যে আমরা ডাকাতি করিতে রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলাম—তখন সে কথা এতই অদ্ভুত এতই অবিশ্বাস্য মনে হইয়াছিল যে, সকলে

তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাবচন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা স্বপ্নেরও অগোচর, কল্পনায় যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেও লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যাইতে হয়, সেই অচিন্ত্য মর্ম্মদাহকর ঘটনা আজকাল প্রতিদিনই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বিঘাটি বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত দস্যুতা হইয়াছে তাহাতে সংলিপ্ত বলিয়া যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা প্রদীপ শিক্ষিত যুবক বৃন্দ। এমন কি সম্প্রতি পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী পর্য্যন্ত দস্যু বলিয়া বন্দী। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে নির্দ্দোষ সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এবং আশা করি—প্রকৃত দেশানুরাগী ব্যক্তি একজনও ইহার মধ্যে নাই। হীন প্রকৃতির লোকই তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থের অবসর বুঝিয়া মহৎ উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করিতে বসিয়াছে।

তবে যদি সত্যই এমন হয় স্বরাজপ্রার্থী এক দলই অর্থবল সংগ্রহাভিপ্রায়ে এইরূপ লুটপাট ডাকাতি তাহাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত একটি উদ্দেশ্য গড়িয়া থাকে, তাহা হইলে স্বরাজের আশা ভরসা বহুদিনের জন্য বিলুপ্ত। আমাদের স্বরাজলাভের প্রথম ও প্রধান উপায় কি? দেশের লোকের মনে ইহার স্পৃহা জাগ্রত এবং বদ্ধমূল করা। কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইবে? যাঁহারা এই মতের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা এই কার্য্যের নেতা তাঁহাদের পরিপূর্ণ দেশানুরাগে, সংযমপূর্ণ অধ্যবসায়ে ও বৈধচেষ্টা দ্বারা দেশী বিদেশী রাজাপ্রজা সকলকেই ইহা বুঝাইতে হইবে—যে আমরা স্বরাজলাভের যোগ্য। আমরা পরাধীন জাতি কেন? নিজের দেশের লোকের উপর আমরা কখনও বিশ্বাস শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি নাই বলিয়া। নিজের লোকের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াই আমরা পরকে সিংহাসনে বসাইয়াছি। যুদ্ধ করিয়া আমাদিগের রাজ্য কেহ অপহরণ করে নাই, অন্তর্ব্বিবাদই আমাদের পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। স্বাধীনতার ইচ্ছা সকলের মনেই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তাহা লাভের প্রয়াসী হইলে তৎপূর্ব্বে আমাদের যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। এরূপভাবে দেশানুরাগ দেখাইতে হইবে, এরূপভাবে আত্মদান করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত দেশের লোকেরই—দেশীবিদেশী সকল লোকেরই মনে তাহার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ হয়। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে স্বরাজপ্রার্থী শিক্ষিত কোন দল যদি দেশের লোকের প্রতিও অত্যাচার উৎপীড়ন করেন তবে তাঁহারাই কি স্বরাজের পদে কুঠারাঘাত করিতেছেন না? হায়। তাঁহারাই কি বুঝাইয়া দিতেছেন না—স্বরাজ প্রাপ্তির আশা কামনা আমাদের আকাশকুসুমমাত্র! আশা করি এই অপবাদ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা সপ্রমাণ হইবে।

ভারতবর্ষে প্লীহার প্রভাব। যখন তখন দেশের গরীবলোকের প্লীহা ফাটে আর মৃত্যু হয়। কিন্তু দোষ কাহার? প্লীহার—না আঘাতের? একদল বলেন, প্লীহার—একদল বলেন—আঘাতের। সমস্যার কথা বটে। মীমাংসা করা বড়ই কঠিন! একই উচ্চৈঃশ্রবায় বিনতা কদ্রু দুইরূপ দেখিয়াছিলেন,—জগতে আখসারই এইরূপ ঘটিতেছে। এ অবস্থায় দিল্লির পাখাকুলীর পদাঘাতকারী সাহেবের সৎসামান্য শাস্তি হইয়াছে বলিয়া আমরা অসন্তুষ্ট কেন? আমি ত বলি ইহাতে বিচারকের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি নাসিকে যে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহাতে আঘাতকারী বেকসুর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আহত শকটবাহক যদিও তাহার মৃত্যুকালীন উক্তিতে স্পষ্টই বলিয়াছে যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পদাঘাতই তাহার মৃত্যুর কারণ এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকেই যদিও এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তথাপি বিচারকের যুক্তি এই—গাড়োয়ানের নিজের গরুর লাথিতেই তাহার প্লীহা ফাটিয়াছে; তবে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই, মনে করিয়াছে সাহেবের। কারণ সে বৃদ্ধ একচক্ষু অন্ধ, তাহার উপর অন্ধকার রাত্রি—(যদিও ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গাড়ীতে আলো ছিল,)—এইজন্য গরুর পদাঘাতকেই মানুষের পদাঘাত বলিয়া সে ভ্রম করিয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্রে যে সকল ন্যায় যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে এরূপ যুক্তি নাই! এই নব যুক্তি ন্যায়-বিভাগের কোন অংশ পরিপুষ্ট করিবে—তাহা ন্যায়বাদী বিচার করুন। কিন্তু আমাদের

মনে হয় একচক্ষু অন্ধ হইলে মানুষের ও পশুর পদাঘাত-পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা যে লোপ পাইয়া যায় ইহা সম্ভবতঃ শারীরিক বিজ্ঞানতত্ত্বেরই একটি নুতন আবিষ্কার স্বরূপ দাঁড়াইতে পারে।

দুর্গাচরণ। মিশ হুপারকে একজন মুসলমান ভৃত্য বধ করার পর গোরা অ্যালেন, নেটিভ হত্যার এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—যে নিরপরাধ একজন শকট বাহককে গুলি করিয়া তবে তাহার প্রতিশোধ স্পৃহা নিবৃত্তি হইল। এ বধ অস্বীকার করিবার উপায় আদৌ নাই; অতএব অ্যালেন উন্মত্ত-অবস্থায় হত্যা করিয়াছে এই সিদ্ধান্তে বিচারক তাহাকে মুক্তি দিলেন। যাহারা হত্যা করে—তাহারই ত ক্ষণিক জ্ঞানশূন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহা হইলে কোন হত্যাকারীই দণ্ডনীয় হইতে পারে না। আর এই বিচার দেশকাল পাত্র নির্ব্বিভেদে প্রযুজ্য হইলে আমাদেরও বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যে যুক্তিতে ইংরাজ মুক্তিলাভ করে সেই যুক্তিতেই দেশীয় লোক গারদে পচে, বা ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলে।

উন্মত্ত হইয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া অ্যালেন অব্যাহতি পাইল আর বৃদ্ধ দুর্গাচরণের ইংরাজ মারিবার কোন গূঢ় অভিপ্রায় ধরিতে না পারিয়া বিচারক ইঙ্গিত করিলেন, সম্ভবতঃ তাহার মস্তিষ্কদোষ ঘটিয়াছে। তাঁহার সপরিশ্রম চারি বৎসর মেয়াদ হইল। এখন এক লাটের নিকট হইতে অন্য লাটের নিকট তাঁহার মুক্তির আবেদন চলিয়াছে। প্রথমে বঙ্গের লাট বলেন,—'পূর্ব্ববঙ্গের লাটকে জানাও, উহাকে মুক্তি দিতে আমার এক্তিয়ার নাই।' পূর্ব্ববঙ্গের লাট বলিয়াছেন "দারজিলিং রেলপথে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে হস্তক্ষেপে আমার অধিকার নাই, সেখানকার কর্ত্তা যিনি তাঁহাকে জানাও।" দেখা যাক্ এবার বঙ্গাধীপ কি করেন? রাজশক্তির এরূপ অপব্যবহারে ভারতবর্ষের হৃদয় ভেদ করিয়া অনবরত যে দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে,—তাহা যে রাজার হৃদয় স্পর্শ করে না,—অসন্তোষের মূল কোথায় ইহা যে কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন না, ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে। সিডিশন অপরাধে যে সকল সম্পাদক বন্দী হইয়াছিলেন,—তাহার মধ্যে জুবিলি উপলক্ষ্যে কেহ কেহ মুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। দুর্গাচরণকে ক্ষমা করিবারও এই উত্তম অবসর. আশা করি গভর্ণমেণ্ট এ সুযোগ ত্যাগ করিয়া বাঙালীকে নিরাশ করিবেন না।

নিবেদন।—দেশের বিদ্রোহীদল অত্যন্ত গর্হিত আচরণ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দোষীকে শাস্তি বিধান করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন। কিন্তু উদোর দোষে বুধোর শাস্তি যাহাতে না হয়, এসময় অন্যায় অবিচার পক্ষপাতিত্ব যাহাতে আদৌ না ঘটে—তাহার দিকেও কর্ত্তৃপক্ষগণের অধিকতর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অযথা গুরুতর শাস্তির প্রয়োগে বা কড়াকড় আইন জারি দ্বারা —যেমন অকারণে যাহার তাহার বাড়ী তল্লাস, পিউনিটিভ পুলিস, সামান্য কথায় সিডিশন চার্জ্জ প্রভৃতি উপায়ে দেশে কল্যাণ শান্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বরঞ্চ ইহাতে অশান্তির ভাব ঔদ্ধত্যের ভাব উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আকস্মিক এই অশান্তির মূল কোথায়, ধীরচিত্তে তাহা আবিষ্কার করিয়া সময়োপযোগী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া এই অসন্তোষের মূল উৎপাটন করিতে চেষ্টা করাই এখন রাজকর্ত্তব্য। এই বিদ্রোহিতা অশান্তি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যেরূপ ক্ষতিজনক দেশের পক্ষে তাহা হইতে অধিকতর ক্ষতিজনক। বস্তুত যুদ্ধ বাধিয়াছে এখন কাহাদের মধ্যে? আসলে দেশের লোকের মধ্যে। সহ্য করিতেছে এইরূপে কে? গভর্ণমেণ্ট না দেশের লোক? দেশের লোক।!!

আর একটি কথা।—বার বার রাজ্যেশ্বরের জীবনের উপর যেরূপ আক্রমণ দেখা যাইতেছে—তাহা একটি বিশেষ চিন্তার কারণ। ইহার আমূল প্রতিকারের উপায় কি? ইংলিসম্যান প্রমুখদল যেরূপ মারকাট বন্দবস্তে ইহার প্রতিকার করিতে বলে তাহা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতার কথা, কেন না দেশশুদ্ধ লোককে তাহা হইলে ফাঁসি না দিলে চলে না। আর তাহাতেও দেশ রক্ষা হইবে না। যাহারা বাঙ্গালী জাতিকে কিছুমাত্র জানেন—তাঁহারাই একবাক্যে বলিবেন যে, করুণ নীতিই তাহাদিগকে বশ করিবার অকাট্য উপায়। বেলি সাহেব করুণনীতিতে পূর্ব্ববঙ্গে কিরূপ শান্তি স্থাপিত করিয়াছেন? এমন কি বিদ্রোহীতার অভিযুক্ত আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট মহা করুণ নীতির অবলম্বন করেন—আমাদের বিশ্বাস তাহাতেও যথার্থ সুফল হইবে। কিন্তু নিষ্ঠুর-নীতিতে কোন ফল হইবে না।

প্রেসের মুখ বন্ধন দ্বারা বাস্তবিক সুফল আশা করা যায় না। মনের অসন্তোষ কথায় প্রকাশিত হইলে তাহার বেগ বরঞ্চ এই উপায়ে অনেকটা প্রশমিত হইয়া পড়ে, কিন্তু বাক্য বন্ধ হইলে কার্য্যতঃ তাহা অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিবে—ইহা একটি সহজ সত্য। কেবল গভর্ণমেণ্টই যথাসময়ে সাবধান হইতে পারিবেন না। অতএব যথাসংযত ভাবে সদুপায় অবলম্বনে গভর্ণমেণ্ট এই অসন্তোষের মূল উৎপাটন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কানাইলাল।—কানাইলালের ফাঁসির দিন প্রত্যূষে চারিদিকে শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল—এবং ফাঁসির পরে মহাসমারোহে কালিঘাটে তাহার সৎকার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সহস্র সহস্র যুবকবৃন্দ কানাইলালের ভ্রাতার সহিত মিলিয়া ফুলশোভিত মৃতদেহ চন্দন চিতায় তুলিয়া ঘৃতাহুতিদানে দাহ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশসঙ্গীতে ও বন্দেমাতরং ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল পুরুষ নহে, তাহাকে দেখিবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত রমণী শ্মশানে সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহারা অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহার মুখে চরণামৃত দিয়াছেন। ফুলবিক্রেতাগণ বিনা মূল্যে কানাইয়ের দেহ ফুলসজ্জিত করিয়াছে। কালী মন্দিরের নিকট দিয়া লইয়া যাইবার সময় মন্দিরের একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার কণ্ঠে ফুলমাল্য প্রদান করেন,—এবং মন্দিরে দেবীর নিকট তাহার সদ্গতি প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাকে। কানাইলাল আমৃত্যু তাহার অবিচলিত সাহস দেখাইয়া গিয়াছেন। ফাঁসিরজ্জু কণ্ঠলগ্ন করিবার সময় তাঁহার মুখে যে সুগম্ভীর হাস্যের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল—দেহ ভস্ম হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে হাসি তাঁহার মুখে শোভিত ছিল।

শবদাহের পর দগ্ধাস্থিখণ্ড ও চিতাভস্ম গ্রহণের জন্য দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। একজন ধনী স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহা লইয়া গিয়াছেন।

ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে? এরূপ দণ্ড দৃষ্টান্তে ভীত হওয়া দূরে থাক;—যুবকবৃন্দ এই মৃত্যু পুণ্যময় সৌভাগ্যময় আদর্শ মৃত্যু বলিয়া মনে করিতেছে। ইহা দেখিয়া কোন কোন ইংরাজ সংবাদ পত্র এরূপ স্থলে হিন্দুর সৎকারক্রিয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে বলেন! চমৎকার কথা! এইরূপ উপদেশই যে বিদ্রোহিতা সৃজন করে এ জ্ঞানটুকুও কি তাঁহাদের নাই।

কানাইলাল সম্বন্ধে আর একটি গুজব এই, মৃত্যু দণ্ড অপেক্ষা দ্বীপান্তর দণ্ড হইলে ভাল হইত কোন বন্ধু এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায়, কানাইলাল নাকি বলিয়াছিলেন —"না মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়, যত শীঘ্র মরিব তত শীঘ্র পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া পুনরায় স্বদেশের কার্য্য করিতে পারিব—দ্বীপান্তরে আমার কয়েক বৎসর বৃথা নষ্ট হইবে।"

পার্লামেণ্টে ভারত প্রসঙ্গ।—পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলেই সেখানে হাস্যরস-সিন্ধু উথলিয়া উঠে। ভারত-সুহৃৎ স্যার হেনরী কটন ভারতের কথা লইয়া আলোচনা করেন—কিন্তু ফল একেবারে নিষ্ফল! ক্ষুদ্র অপরাধে গুরুতর দণ্ড,—অনর্থক মাননীয় ব্যক্তিগণের লাঞ্ছনা প্রভৃতি বিষয়ের অনেক প্রশ্ন হইয়াছিল—কিন্তু কর্ত্তারা কিছুতেই মনঃসংযোগ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'একটি বলিতেছি। স্যার হেনরী কটন প্রশ্ন করেন যে, মধ্যপ্রদেশের শিউরাজ সিংহ নামক এক ব্যক্তি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যে তাহার পেন্‌শন বন্ধ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত করা হইবে কি? ইহার উত্তরে মিঃ বুকানন্‌ বলেন—যে শিউরাজ সিংহ ইচ্ছা করিলে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারেন। কটন সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করেন,—আমি জানিতে ইচ্ছুক যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা অপরাধে "পেন্‌শন" হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন কি না? এই প্রশ্নে সকলে মহোল্লাসে হাস্য করিলেন। মিঃ লপ্‌টন প্রশ্ন করিলেন, ভারতে এখনও বাক্যের

ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষিত হইতেছে কি ? মিঃ বুকানন্ ইহার উত্তর দেন—"হাঁ।" তাহাতেও হাস্য-ধ্বনি উত্থিত হইল। এই সব দেখিয়া ঈষপের গল্পের ভেকেরা লোষ্ট্র নিক্ষেপকারী বালকদিগকে যাহা বলিয়াছিল আমাদের তাহাই মনে হয়—তোমাদের যাহাতে কৌতুক—তাহা আমাদের প্রাণঘাতী।

সমালোচনা।

চীন ভ্রমণ। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল্ রচিত মূল্য ১॥• টাকা। বঙ্গভাষায় ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ বিরল বলিলে বোধহয়, অত্যুক্তি হয় না। যাহা বা আছে, তাহা প্রায়ই—হয় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায়, না হয় দার্শনিক গবেষণায় সুখাপাঠ্য হইতে অবকাশ পায় নাই। সম্প্রতি অক্লান্তশ্রমী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যমে কয়েকখানি বিদেশী পর্য্যটকের ভ্রমণ কাহিনী অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা হইতেই জানা যায়,—বিচক্ষণ বৈদেশিক পর্য্যটকের দর্শনশক্তি কদূতর মার্জ্জিত ও উন্নত। তাঁহারা লেখেন,—হৃদয়ের সহিত, চিন্তার সহিত ভূত ও বর্ত্তমানকে সমন্বয় করিয়া, কল্পনা ও ইতিহাসের পুঞ্জীভূত গভীর সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য্যের নিগূঢ়, সূক্ষ্ম সম্বন্ধটী মনোজ্ঞ করিয়া! তাঁহারা জড়প্রকৃতিকে আপনার হৃদয়ের বিচিত্র বেদনাস্পন্দনে পাঠকের চিত্তে সজীব করিয়া তুলেন; তাই তাঁহাদের ভ্রমণ কাহিনী এত চিত্তাকর্ষক! ফরাসী লেখক মোঁপাসাঁ—একবার ভূমধ্যসাগরে নৌকাযাত্রা করিয়াছিলেন। বিশাল সমুদ্রবক্ষে, দেখিবার এমন কিছু ছিল না যে তাহা লইয়া একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করা যায়, অথচ তিনি তাহার উপর এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহা সহজে হৃদয়স্পর্শ করিয়া যায়! আমরা বর্ত্তমান লেখকের রচনায় সেইরূপভাবে মুগ্ধ হইয়াছি! মল্লিক মহাশয়ের রচনার প্রধান গুণ তাঁহার সম্পূর্ণ সহৃদয়তা, আর অসঙ্কোচ মুক্তপ্রাণতা। তিনি যে দেশ দেখিয়াছেন, যে অধিবাসিগণের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন. তাঁহারই সহিত আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। যাহার যেটুকু গুণ তিনি তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি পাঠককে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চালিত করিয়া লইয়া যাইতে চান। তিনি যাহা দেখিয়াছেন—যাহা ভাবিয়াছেন তাহা অতি সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন কিছু গোপন করেন নাই। সাগরবক্ষে জনৈকা চীনারমণীর সৌন্দর্য্যে তিনি এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে তাঁহার অপ্রসন্ন-দৃষ্টির নির্ব্বাক তিরস্কারে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়াছিল! কিন্তু হায়, তিনি চাহিয়াছেন শুধু সৌন্দর্য্যের প্রতি নয়; তিনি চাহিয়াছিলেন তাহার লোকান্তরিত চির বাঞ্ছিতার সাদৃশ্যের প্রতি। ঘৃণা হইতে তিনি কেমন সুকৌশলে পাঠকের সহানুভূতি আদায় করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে, গ্রন্থকার আত্মনিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার ভাগ দিয়া পাঠককে যেন আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলেন! গ্রন্থকার শুধু যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন তাহা নহে—তিনি দেখিয়াছেন কবির চক্ষে—কবির হৃদয় লইয়া! বাস্তব বস্তু লইয়া ব্যস্ত ডাক্তারের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে! তাই বিদেশী নরনারীর বিচিত্র আচার ব্যবহারে যাহা ভাল, তাহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় নারী জাতির প্রতি গ্রন্থকারের সম্মান অসীম।

গ্রন্থখানি অতি সুন্দর সহজ ভাষায় লিখিত—অথচ যেখানে যেরূপ ভাব ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন তাহা সহজেই ফুটিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে ইহার সমাদর আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

মাতৃ-মঙ্গল।

ফেন মুকুতাজাল চরণে ঝলমল,
নীলাচল মেখল, হিমাদ্রি হর্ম্ম্য
মরকত মুকুট, দীপ্ত "নেপালভুট" ;
সুন্দর করপুট, "গুর্জ্জর-ব্রহ্ম !"
আচ্ছাদন নদীনদ, স্বচ্ছ তড়াগ হ্রদ ;
স্নিগ্ধনবঘন কোমলকান্ত।
সুমধুর বরষা, বসন্ত সরসা,
ভক্তজন-ভরসা—সতত-শান্ত !
গোচারণ শষ্পিত অরণ্য পুষ্পিত ;
চারণ-লাঞ্ছন—অযুত-ভৃঙ্গ !
দীপ্তদিবাকর, তপ্ত নিরঝর,
দৃপ্ত মহীধর—কাঞ্চন শৃঙ্গ !

অশথ বটতরু, চন্দন কালাগুরু,
মণ্ডন দেবদারু, উর্ব্বর বঙ্গ !
তিমির নাশকর-অমিয় শশিকর
সমীর সশীকর শ্যামল অঙ্গ !
ফুল ফলপুঞ্জিত শুকশিখীশিঞ্জিত
রবিশশিরঞ্জিত-আশ্রমরম্য,
সুরভিত মলয়, কুবলয় আলয়,
বেলাম্বুবলয়—সাগর সৌম্য !
গোদাবরী-গোমতী যমুনা-সরস্বতী—
জাহ্নবী-দয়াবতী ! রজত-তরঙ্গে !
নাশ মা অমারাতি ভারতে দেহভাতি,
ভগবতি-ভারতি !—ভাগীরথি—গঙ্গে !

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

পরিত্যক্ত বা পরিত্যক্তা ?

১

"মণিদা'—তুমি নাকি বিলেত যাবে ? সাহেব ডাক্তার হবে ?"

অস্ত যাইবার পূর্ব্বে সূর্য্য তাঁহার সবটুকু কিরণ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন,। দারুণ গ্রীষ্মে একবারে হাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়া একটা ভয়ানক গুমটের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। মণীন্দ্র তাঁহার ছোট ঘরটির জানালা খুলিয়া দিয়া একবার বাহিরের সেই রৌদ্র ঝলসিত গাছ পালার দিকে চাহিয়া, মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নকারিণী বালিকা ছাত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সত্যি—মিনু, আমি বিলেত যাব,—এই বৃহস্পতিবারেই যাব।" "বৃহস্পতিবারে ? কেন তুমি বিলেত যাবে মণিদা ? হারু-কাকা ব'লছিল বিলেত গেলে জাত যায়, সাহেব হয় ; আর—আর"—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই বালিকা মুখ ফিরাইয়া শিক্ষকের বিশৃঙ্খল পুস্তকাদি যথা স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিতে মনোনিবেশ করিল। মৃণ্ময়ীর স্বরের আর্দ্রতায় মণীন্দ্র বুঝিয়াছিল—সে কেবল অশ্রু সম্বরণের জন্যই মুখ ফিরাইয়াছে। তাঁহার চিত্তও ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনিও এতক্ষণ ইহাই ভাবিতেছিলেন—বিলাত গিয়া

কি হইবে? মণীন্দ্র কতদিন নির্জ্জনে ভগবানের নিকট এইদিনের জন্যই প্রার্থনা করিয়াছে, অবশেষে আপনার নিঃস্ব জীবনের উপর শত শত ধিক্কার দিয়া ভাবিয়াছে তাহার মত দরিদ্রের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। আজ যখন অপ্রত্যাশিতরূপে জীবনের সেই একান্ত প্রার্থনীয় দুর্ল্লভ বস্তু সুলভ হইয়া উপস্থিত হইল, তখন মণীন্দ্রের মনে হইল বুঝি এটা না ঘটিলেই ভাল হইত। কি আবশ্যক ছিল? না, না—আবশ্যক আছে বৈকি! কয়টা বৎসর বইতো নয়, দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। তা'রপর সে যখন কৃতকার্য্য হইয়া দেশে ফিরিবে সে দিন! কল্পনায় ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে দেখিতে মণীন্দ্র আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। কল্পনারাজ্য হইতে বাস্তবে ফিরিয়া দেখিল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, এবং ছাত্রী মৃণ্ময়ী তাহার অসমাপ্ত উত্তরের আশা না রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছে।

দেশের জমিদার বিপিনচন্দ্র বসু মণীন্দ্রকে পুত্র তুল্য স্নেহ করিতেন। তাঁহারই অনুগ্রহে সে আজ ডাক্তারি পাস করিয়া এম, বি, উপাধি ধারণ করিয়া লোকের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিপিন বাবু দেশে, মশা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ছোট বড় অনেকগুলি উপদ্রব থাকায় সপরিবারে তাঁহার কলিকাতার বৌবাজারের বাসায় বাস করিতেন। মণীন্দ্র তাঁহার নিকট থাকিয়া পটলডাঙ্গা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িত।

নিজের পড়াশুনা ছাড়া মণীন্দ্রের আর একটি কাজ ছিল—প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বিপিন বাবুর একমাত্র কন্যা মৃণ্ময়ীর শিক্ষকতা করিত। সমস্ত দিনের মধ্যে সেই সময়টাই মণীন্দ্রের পক্ষে একান্ত আনন্দের ছিল। আবাল্য একত্র পালিত হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

মণীন্দ্রের এক দূর সম্পর্কীয় ধনী জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনে কখনও ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশ লয়েন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত সকলে শুনিল যে সেই অপুত্রক জ্যেষ্ঠতাত উইল করিয়া তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করিয়া গিয়াছেন। উইলের আর একটি সর্ত্ত ছিল, মণীন্দ্রকে বিলাত গিয়া ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে হইবে।

সাধুচরিত্র মণীন্দ্রের এই আকস্মিক অবস্থা পরিবর্ত্তনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বিপিন বাবু মণীন্দ্রের বিলাত গমনে আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

এই ব্যাপারে সব চেয়ে গোলে পড়িয়াছিল মৃণ্ময়ী। সে দেখে তাহার মণিদা' আজকাল সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, কার্য্যে ব্যস্ত। সে আর ইচ্ছামত যখন তখন তাঁহার দখল পায় না। গ্রীষ্মের রাত্রে আহারাদির পর দক্ষিণ দিকের খোলা বারাণ্ডায় মাতা অন্নপূর্ণার নিকট শয়ন করিয়া ইংরাজী বাঙ্গালা নানা পুস্তকের গল্প শোনা একরকম উঠিয়াই গিয়াছে। লেখাপড়ায় মৃণ্ময়ীর কোন দিনই অনুরাগ ছিল ছিল না, আজকাল নাকি অন্য সময় মণীন্দ্রের দেখা পাওয়া যায় না তাই সে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত পড়িতে বসে, কিন্তু মণীন্দ্রের

এতই কাজ যে সে ছাত্রীর এই আকস্মিক পাঠানুরাগ অনুভব করিতেও পারে না। সংক্ষেপে পড়া বুঝাইয়া দিয়া সে কার্য্যে নিযুক্ত হয়। অভিমানে বালিকার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কাল আর কখনই সে পড়িতে আসিবে না। পরদিন দেখা যায় যথাসময়ের পূর্ব্বে, মণীন্দ্রের ডাকিবার অপেক্ষামাত্র না রাখিয়াই নির্ল্লজ্জা বালিকা পিঠে বিনুনী ঝুলাইয়া শ্লেট বই সম্মুখে রাখিয়া পাঠ মুখস্ত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

২

বিদায়ের পূর্ব্বে মণীন্দ্র মৃণ্ময়ীর অন্বেষণে গিয়া দেখিল সে তখন পড়িবার ঘরে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। "মিনু, আমার যাবার সময় হ'য়ে এলো, তোমায় দেখ্‌তে না পেয়ে খুঁজতে এলাম, এখানে একলা কি করছ?" মৃণ্ময়ী উত্তর দিল না, বাহিরে চাহিয়া রহিল। "মিনু আশা করি আমি চলে গেলেও তুমি পড়াশুনা ছেড়ে দেবে না। আমার বড় সাধ ছিল তোমায় খুব লেখাপড়া শেখাব"। মৃণ্ময়ী ফিরিয়া চাহিল, প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না। মণীন্দ্র দেখিলেন অজস্র অশ্রুপাতে তাহার চক্ষু স্ফীত রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, তখনও মুক্তা বিন্দুর মত অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। ব্যথিত মণীন্দ্র বালিকার হাত ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন "কেঁদনা মিনু এ ক'টা বৎসর দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। আমি পৌঁছেই তোমায় চিঠি দোব, তুমি লিখবে তো?" মৃণ্ময়ী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "লিখিবে"। "পড়াশুনা ছেড়ে দিও না—আসি মিনু"।—হাত ছাড়িয়া দিয়া মণীন্দ্র বাহিরে গেলে মৃণ্ময়ী মাটিতে লুটাইয়া উচ্ছসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া মণীন্দ্রও বার বার চক্ষু মুছিয়াছিল।

বিলাতে পৌঁছিয়া মণীন্দ্র বিপিন বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহার সহিত মৃণ্ময়ীকেও একখানি পত্র দিয়াছিল। চিঠিতে বিলাতের বর্ণনাই বেশী, মৃণ্ময়ীকে লেখাপড়া করিবার উপদেশ আর শেষভাগে লিখিয়াছিল, সে যখন দেশে ফিরিবে মিনু তখন তাহার মণিদাদাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালীই দেখিতে পাইবে"।

যথাকালে বিপিন বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। প্রত্যাশিত নেত্রে মণীন্দ্র একখানি চিরপরিচিত আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরের পত্র খুঁজিতেছিল; ইপ্সিত বস্তু না না পাইয়া ক্ষুণ্ণ-মনে বিপিন বাবুর পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। খানিকটা পড়িয়াই মণীন্দ্রের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল; আনন্দ কণ্টকিত মণীন্দ্র দেখিল, চিঠিতে বিপিন বাবু তাঁহার সফলতার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, আর মণীন্দ্রকে জামাতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অনুমতি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। মণীন্দ্রের সম্মতি বুঝিলে তিনি লোক নিন্দা উপেক্ষা করিয়াও কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে প্রস্তুত আছেন। তবে কথাটা রীতিমত পাকাপাকি হইয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পত্রোত্তরে মণীন্দ্র তাঁহার পিতৃতুল্য স্নেহময় আশ্রয়দাতার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার অসীম অনুগ্রহপূর্ণ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

৩

একমাস দুইমাস করিয়া মণীন্দ্রের বিলাত যাইবার পর অতি দীর্ঘ দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে নিয়মিত প্রতিমেলে বিপিন বাবুর নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে ও লিখিয়াছে। মিনুকে দুএকবার পত্র লিখিয়া উত্তর না পাওয়াতে আর সে তাহাকে পত্র লিখে না। আসিবার দিনে সন্ধ্যায় মৃদু আলোকে অসম্বদ্ধ কেশরাশিমণ্ডিতা মৃণ্ময়ীর সেই একান্ত কাতরতা ও ক্রন্দন মনে করিয়া মণীন্দ্র কতদিন নির্জ্জনে চক্ষু মুছিয়াছে। মৃণ্ময়ীর হয়ত এতদিনে মণীন্দ্রের অদর্শন দুঃখ সহিয়া গিয়াছে। বিপিন বাবু লিখিয়াছেন মিনুর আজকাল পড়া শুনায় ভারি উৎসাহ, সে জেদ করিয়া একজন শিক্ষয়িত্রী রাখাইয়াছে। আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া মণীন্দ্র ভাবিল "মিনু এখনও আমায় ভুলিয়া যায় নাই, আমার আগ্রহ অনুরোধ রাখিবার জন্যই তাহার এ পরিশ্রম।" বিপিন বাবুর প্রত্যেক চিঠিতে মিনুর কথা কিছু না কিছু থাকিতই, মণীন্দ্র সেই অংশগুলি পিপাসিতের মত বার বার করিয়া পড়িয়া দেখিত।

এই সময় একটা মেলে বিপিন বাবুর নিকট হইতে মণীন্দ্র কতকগুলি জিনিষ পাইল। সেই সঙ্গে তাঁহার নূতন তোলান একখানি পারিবারিক ফ'টো ছিল। তাঁহাদের বাগানের ধারে ঝিলের নিকট একটা পাথর বাঁধান বেদির কাছে চেয়ারে বসিয়া বিপিন বাবু,—কন্যা ও স্ত্রী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। মণীন্দ্র দেখিল দুইবৎসরে মৃণ্ময়ীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই পরিপুষ্টদেহা বালিকা এখন তন্বঙ্গী যুবতী। তাহার সদা সহাস্য চক্ষু ও প্রসন্ন মুখ ঈষৎ লজ্জাকুণ্ঠিত, সুগোল, সুগঠিত হস্তে কয়েক গাছি চুড়ি, ব্রোচনিবদ্ধ পার্শি সাড়ী,—ক্ষিতা বসান পাড়টি, ঘাড়ের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়াছে,—নির্ম্মল রেখাহীন ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুল সযত্নে বিন্যস্ত। মণীন্দ্র মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল "এই মিনু তাহার বাল্যসঙ্গিনী, শিক্ষা জীবনের ছাত্রী, আর ভবিষ্যৎ পত্নী মৃণ্ময়ী—এত সুন্দর!"

মণীন্দ্র মৃণ্ময়ীর একখানি ক্ষুদ্র ফ'টো তুলাইয়া আপনার লকেটে রাখিয়া দিয়া বড় ছবিখানা বাঁধাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিল।

৪

দেখিতে দেখিতে দুইবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন মণীন্দ্রের অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছে। দত্ত পরিবারের সহিত তাহার আত্মীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিপিন বাবুর পত্র সে নিয়মিত পাইয়া থাকে,—কিন্তু সেজন্য সে আগেকার মত উদগ্রীব হইয়া থাকে না। সম্প্রতি বিপিন বাবুর পত্রে সে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পাইল। অন্নপূর্ণা মৃত্যুর সময় ভাবী জামাতা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে চঞ্চল হইয়া উঠিল। দত্তপরিবারের সান্ত্বনায় সে দুঃখ ভুলিতে চেষ্টা করিল।

আজকাল তাহার সন্ধ্যাটা প্রায়ই মিঃ দত্তের গৃহেই অতিবাহিত হইত। অৰ্দ্ধেক দিন মিঃ দত্তের সাগ্রহ অনুরোধে রাত্রে সেখানে আহারও করিতে হয়। আর মিশ দত্তের সঙ্গীতে মণীন্দ্র আত্মহারা হইয়া সমস্ত দুঃখজ্বালা ভুলিয়া যায়।

মধ্যে অমিয়ার কয়দিন সামান্য জ্বর হওয়ায় তাহার ভ্রাতা নির্ম্মলের অনুরোধে তাঁহাকেই চিকিৎসার ভার লইতে হইয়াছিল। জ্বর যদিও ৯৯এর অধিক উঠিত না কিন্তু "সাবধানের বিনাশ নাই" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়াই বোধ হয় ডাক্তার সাহেব তাঁহার রোগিণীকে নিয়মিত দুই বেলা দেখিতে আসিতেন।

এই সময়ে দত্তপরিবারে আর একজনের খুব খাতির যত্ন চলিতেছিল। তিনি একজন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র, নাম সতীশচন্দ্র বসু। মণীন্দ্রের প্রথম দর্শন হইতেই লোকটার উপর কেমন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রকাশ্য কারণ সে কিছু আবিষ্কার করিতে পারিল না। মণীন্দ্র দেখিল মিষ্টার দত্ত সতীশচন্দ্রের উপর অত্যন্ত অনুকূল, সতীশচন্দ্র দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ, আর সবচেয়ে বিড়ম্বনা মিস্ দত্তের প্রতি তাঁহার কোমল স্নেহপূর্ণ অযাচিত অনুগ্রহ। কয়দিনের রোষ দমন করিয়া মণীন্দ্র একদিন নির্ম্মলের কাছে অভিযোগ করিল "সতীশ লোকটা কিরকমের বল দেখি? আমার তো মোটেই ওকে ভাল ব'লে বোধ হয় না। লেডিদের সামনে দাঁড়াবার একবারে অনুপযুক্ত।" নির্ম্মল তাহার নীল চসমার ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার মণীন্দ্রকে দেখিয়া লইল।

"কেন? মিষ্টার বসু কথা বার্ত্তায় বেশ অমায়িক তো? আর স্বভাবটাও বেশ ভাল, বাবা ওঁকে খুব পছন্দ ক'রেছেন। অমিয়ার সঙ্গে বোধ হয় শীঘ্রই ওঁর বিবাহের এনগেজমেণ্ট হবে। অমিয়ার নাকি তেমন মত নাই তাই আপত্তি।" নির্ম্মল আর একবার চশমার ভিতর দিয়া বন্ধুর মুখ দেখিয়া লইল। স্তম্ভিত হইয়া মণীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। অমিয়ার ভাবী স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কি আছে? কিন্তু মণীন্দ্র তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। অমিয়া কখনই মিষ্টার বসুর হইবেন না। প্রায় এক সপ্তাহের পর মণীন্দ্র একদিন মিস্ দত্তের নিকট হইতে সৌগন্ধযুক্ত সুন্দর কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত একখানি আগ্রহপূর্ণ পত্র পাইল। মুখের উপর হইতে অসজ্জিত চুলগুলা সরাইয়া ললাটের ঘাম মুছিয়া টেবিলের উপর হইতে মণীন্দ্র বহুবার পঠিত পত্রখানা তুলিয়া লইল। অমিয়া লিখিয়াছে "আপনি কয়দিন কেন আসেন নি, আপনি না আসায় আমরা সকলেই দুঃখিত, মা বলিলেন আজ রাত্রে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া আহার করিবেন"।

আপনার স্নেহের অমিয়া।

চিঠিখানা বুকের পকেটে রাখিয়া দিয়া দৃঢ়সংকল্প মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। সপ্তাহব্যাপী হৃদয়-যুদ্ধে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছিল।

৫

সংসারে আমরা সহজ সিদ্ধান্তে যাহা একেবারেই অসম্ভব মনে করি অনেক সময় দেখা যায় তাহাই সবচেয়ে সম্ভব। বিপিন দেখিলেন মণীন্দ্র আর চিঠিপত্র লেখে না, যদি বা লেখে তাহাও অতি সংক্ষেপ। পূর্ব্বের সেই সঙ্কোচহীন সরল আত্মীয়তা যেন সুধু ভদ্রতার গণ্ডির ভিতর আশ্রয় লইয়াছে।

স্নেহময় পিতা কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

যথাসময়ে মণীন্দ্রের পাশের খপর বাহির হইল, বিপিন বাবুও সংবাদপত্রে সে খপর পাইলেন, মণীন্দ্র কিন্তু তাঁহাকে নিজে কিছু লেখে নাই। খুব ধুমধাম করিয়া কালিঘাটে পূজা দেওয়া হইল। আনন্দে, উৎকণ্ঠায় মৃণ্ময়ীর দিনগুলা কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বিপিন বাবুর চিন্তারেখাভুত ললাটে ক্রমেই অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় তিন মাসের পর বহু চিঠির উত্তরে বিপিন বাবু মণীন্দ্রের একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলেন। "মণীন্দ্র কর্ম্ম পাইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছে। বিপিন বাবুকে বলিবার কথা অনেক আছে, সে একটু সুবিধা পাইলেই তাঁহার সহিত দেখা করিবে। চিঠিখানা ডেস্কের তলদেশে গোপন করিয়া বিপিন বাবু মুঙ্গের যাত্রার আয়োজন করিতে দেওয়ানজীকে আদেশ প্রদান করিলেন।

৬

মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া বিপিন বাবু ডাক বাঙ্গালায় উঠাই স্থির করিলেন, কারণ এখানে তাঁহার পরিচিত আত্মীয় কেহই ছিল না। একবারেই মণীন্দ্রের বাসায় উঠিতে কোন মতেই সাহস হইল না। মৃণ্ময়ী বিলম্বে মনে মনে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেও প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে পারিল না।

পরদিন সকালে চা পানের পর বিপিন বাবু ভ্রমণের বেশে বাহির হইয়া গেলে মৃণ্ময়ী তাঁহার ট্রঙ্কের ভিতর হইতে অতি যত্নে রক্ষিত রৌপ্যফ্রেমমণ্ডিত মণীন্দ্রের ফ'টো খানা বাহির করিয়া দেখিতে বসিল। এখানি মণীন্দ্র বিলাত হইতে তাহাকে উপহার পাঠাইয়াছিল। স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধ চক্ষে চাহিয়া ছবি যেন উপহাস করিয়া বলিতেছিল "ছি! মিনু তুমিও আমায় সন্দেহ কর"। মৃণ্ময়ী অঞ্চলে মুখ লুকাইল।

চৌদিকে উদ্যানবেষ্টিত ছোট খাট বাংলা খানি গৃহস্বামীর সুরুচির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। বাগান হইতে বাংলায় যাইবার দুইধারে দুইটি লাল সুরকি দেওয়া সরু রাস্তা সর্প গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

বাংলার নিকট আসিয়া বিপিনচন্দ্রের উৎসাহ সহসা অবসাদে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল। কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার গতিশক্তি নিশ্চল হইয়া পড়িল। সহসা "তফাৎ যাও তফাৎ যাও" শব্দে সচকিত হইয়া পার্শ্বে হটিলেন। ঠিক পশ্চাতেই হাত দুই তিন দূরে একখান ফিটন গাড়ী, কোচম্যান রাশ টানিয়া প্রাণপণে ঘোড়াকে সংযত রাখিয়াছে। চিন্তাতুর বিপিনচন্দ্র গাড়ীর শব্দ শুনিতে পান নাই। গাড়ী বাগানের রাস্তা দিয়া গাড়ীবারাণ্ডায় দাঁড়াইলে অতি মাত্র বিস্ময়ে বিপিনচন্দ্র দেখিলেন সাহেববেশী মণীন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া পার্শ্বোপবিষ্টা সঙ্গিনীকে হস্ত প্রসারণে নামিবার সাহায্য করিয়া স্নেহপূর্ণ মধুস্বরে বলিতেছেন "ডারলিং তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন? কিন্তু লোকটা কি ষ্টুপিডের মত দাঁড়িয়েছিল, মানুষ এতদুর অন্যমনস্ক হতে পারে।"

"ভারি অন্যায়, বাড়ীর মধ্যে যে সে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেই বা পায় কেন? আমার যে রকম আতঙ্ক হ'য়েছিল। হয় ত

ফেণ্ট হ'য়ে যেতে পার্ত্তুম, জানতো আমার শরীরের অবস্থা।"

মণীন্দ্র আতঙ্ককারীকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইয়া আসিয়া সহসা সর্পদষ্টের মত নিশ্চল স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন—অনেক দিনের পর অপ্রত্যাশিত মিলনেও পরস্পরকে চিনিতে কোন ক্লেশ হইল না। কিন্তু শীঘ্রই মণীন্দ্র আপনাকে যথাসাধ্য প্রকৃতস্থ করিয়া লইল। অমিয়া তখনও দুরে দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল। "আপনি! কৈ আপনার তো আসিবার কোন কথা ছিল না?"

অবস্থা বুঝিতে বিপিনচন্দ্রের আর বাকি ছিল না। অত্যধিক বিশ্বাসের উপর অত্যন্ত আঘাত লাগায় সহজেই তাঁহাকে বিস্মিত ভাব হইতে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল। "হাঁ আমি তোমার আশ্চর্য্য ব্যবহারের অর্থ বুঝতে না পেরে সহজেই এখানে আস্তে বাধ্য হয়েছি।" মণীন্দ্র অতি কষ্টে ক্ষীণস্বরে বলিল, "চলুন ভিতরে যাই, আমার বল্‌বার কথা অনেক আছে, আপনার কষ্ট করে আসবার দরকার ছিল না, আগামী সপ্তাহে নিশ্চয় আমি দেখা কর্ত্তে যেতাম।" "থাক থাক! ওসব শিষ্টাচার শোন্‌বার আমার সময় কম। মণীন্দ্র, আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই মাত্র যে মহিলার সহিত তুমি এক গাড়ীতে এলে, তিনি তোমার কিরূপ আত্মীয়? তুমি জান এ প্রশ্ন করিবার আমার সঙ্গত অধিকার আছে।" আরক্ত মুখ নত করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম মণীন্দ্র উত্তর দিল "আমার স্ত্রী।" "আর আমার কোন জিজ্ঞাস্য নাই।" এই বলিয়া কোনদিকে না চাহিয়া দৃঢ় পদে বিপিনচন্দ্র চলিয়া গেলে স্তম্ভিত বিষণ্ণ ভাবে মণীন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া বিপিন চন্দ্রের পদতলে পতিত হইয়া বলে "আমায় ক্ষমা করুন, না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা করুন, পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" না মণীন্দ্রের ক্ষমা প্রার্থনার আর অধিকার নাই। মৃণ্ময়ীর যে ছবি মণীন্দ্রের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল আজ অসময়ে তাহার উজ্জ্বলতায় মণীন্দ্রের বাষ্পজড়িত চক্ষু ঝলসিত হইয়া উঠিল।

*   *   *   *

ক্রমে মৃণ্ময়ী সবই শুনিল। সবই বুঝিল।

৭

সময় মানুষের সুখ দুঃখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলে না। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বিপিনবাবুর স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত বুকে একটা বেদনা মধ্যে মধ্যে বড়ই যন্ত্রণা দিত। কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবনায় তাঁহাকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক—কিন্তু মৃণ্ময়ী তাহাতে অসম্মত। মৃণ্ময়ী পিতার বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে লইয়া বাঁকিপুরে মাতুল উকিল রামচরণ দত্তের নিকট গমন করিল। মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া মাতুল বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! মিনুটা এত বড় হ'য়ে উঠেছে, রেখেছ কি করে? বিয়ে দেবে না নাকি?' অপ্রস্তুত বিপিনচন্দ্র মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন "তাই ত এইবার যা হয় কর্ত্তে হবে"। মৃণ্ময়ী এই কথার আরম্ভেই মুখ ফিরাইয়া লিচু গাছের

পত্র গণনায় মনোনিবেশ করিল। গোলমালে মণীন্দ্রের ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল।

কাছারি হইতে ফিরিয়া রামবাবু সহসা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন 'হাঁ হে মিঃ সেনকে মনে আছে কি? সিভিল সার্জ্জন?' মৃণ্ময়ী বঁটিতে আম ছাড়াইতেছিল, তাহার কম্পিত হস্তে আঘাত লাগিয়া শোণিতপাত হইতেছিল, সে অঞ্চলে হাত ঢাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপিনবাবুকে নিরুত্তর দেখিয়া রামবাবু আরম্ভ করিলেন "হাঁ সে সব কথাও কিছু কিছু শুনেছি। শেষকালটায় মণি নাকি তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিল, তা' সে জন্য সে এখন যথার্থই অনুতপ্ত, সে আজ বিকালেই এখানে আস্‌তে চায়, আমি ব'লে দিয়েছি, তোমাদের তাতে সম্পূর্ণ মত আছে।"

সহসা উত্তেজিত ভাবে বিপিনবাবু বলিয়া উঠিলেন "মত আছে! কি সর্ব্বনাশ, সে অকৃতজ্ঞের মুখ দর্শনে——"; "আহা—ব্যস্ত হও কেন? সব কথা শোন আগে। যদিও সে কোন রকমে তোমার অপ্রিয় হ'য়ে থাকে, তাই ব'লে তার এই শোকের সময় তার পুরান বন্ধুদের কি উচিত নয় তাকে সান্ত্বনা দেওয়া?" উত্তেজনায় বিপিনবাবু আরাম চৌয়ার হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, শ্যালকের কথায় স্থির ভাবে শয়ন করিলেন। "শোকের সময়!"—"হাঁ, স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যুতে বেচারা দুটি ছোট ছোট ছেলে নিয়ে বড়ই বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছে"। শেষের কথা কয়টি বলিবার সময় সূক্ষ্মদর্শী আইনজীবি একবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভাগিনেয়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু সে মুখে সুগভীর বিষণ্ণতা ছাড়া আর কোন ভাবই দেখা গেল না।

সন্ধ্যার সময় পিতা ও মাতুলের অনুপস্থিতিতে অগত্যা মিঃ সেনের অভ্যর্থনার ভার মৃণ্ময়ীকেই লইতে হইয়াছিল। ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা সে দিন সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মৃণ্ময়ী জানালায় বসিয়া মাতুলের জন্য এক খানা শিল্কের রুমালে ফুল তুলিতেছিল। মণীন্দ্র অদূরে টেবিলের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিল। সে দিন মণীন্দ্র রামবাবুর মুখে শুনিয়াছে, মৃণ্ময়ীর নাকি বিবাহে আদৌ মত নাই। এখন মণীন্দ্র যদি নিজের চেষ্টায় মৃণ্ময়ীর মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে। মণীন্দ্র ভাবিল এটা অভিমান, মৃণ্ময়ী যদি সত্য সত্যই তাঁহাকে ভাল না বাসিত তাহা হইলে সে এতদিন নিশ্চয়ই বিবাহ করিত।

সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় বেহারা ঘরে আলো দিয়া গেল। মৃণ্ময়ী সেলাইটা ভাঁজ করিয়া রাখিতে রাখিতে বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা কই এখনও ত ফিরিলেন না"।

"মিস্ বসু, আপনারা নাকি কাল কাশী চলে যাচ্ছেন?"

"হাঁ, কাল মেলেই কাশী যাওয়া হবে।"

"এত শীঘ্র চলে যাচ্চেন?"

তাহার উত্তর না দিয়া মৃণ্ময়ী বলিল "কৈ আপনার ছেলেদের তো আনলেন না?" "তারা এখন এখানে নেই, ক'ল্‌কাতায় পিসিমার কাছে রেখে এসেছি, আপনি যদি তাদের দেখতে চান সে তো তাদের সৌভাগ্য।"

মৃণ্ময়ী নত মুখে সেলাইয়ের সুতাটা

মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিল "তাইত তা হলে তাদের সঙ্গে আর দেখা হোল না, কালকেই তো আমরা কাশী যাচ্ছি, আর খুব সম্ভব সেখান থেকে এখন আর ফেরা হবে না"।

"মিস্ বসু, আমি বেশী কথায় ভূমিকা কত্তে চাই না, সে মনের অবস্থাও আমার নেই—আপনার মামার মুখে শুনলেম্ আপনি চিরকুমারী থাক্‌তে ইচ্ছুক, কথাটা কি সত্য?" মৃণ্ময়ীর কালো চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "কিন্তু এ সব প্রশ্ন আপনার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নয় কি?" মিঃ সেন হাসিবার চেষ্টা করিলেন; "কিন্তু আমি যদি অধিকারের আশা রেখে থাকি"? বলিতে বলিতে তিনি উৎসুক নয়নে মৃণ্ময়ীর মুখের প্রতি চাহিলেন। তাহার অবিচলিত মুখে কোন ভাবই দেখা গেল না। "যে অধিকার, যে আশা, আমি উন্মত্তের মত নিজের দোষেই হারিয়ে ছিলেম, আজ যদি নত জানু হ'য়ে ভিক্ষুকের মত তাহা প্রার্থনা করি তবুও সে আশা কি আমার পক্ষে দুরাশাই থাকবে?" মুহূর্ত্তের জন্য মৃণ্ময়ীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আপনার অসীম আত্মসংযমক্ষমতায় শীঘ্রই সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিল "অসম্ভব—অসম্ভব! যে দিন গিয়াছে সে দিন আর ফিরিবে না। আমার হৃদয় আর তোমার নাই।"

মণীন্দ্র দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধভাবে টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কম্পিত বক্ষের স্পন্দন স্তব্ধ গৃহে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটা উঠাইয়া বলিল "তাই হোক্ মিনু তোমার দত্ত দণ্ড যতই কঠোর হোক্ তাহাই আমার শিরোধার্য্য, ইহজগতে হয় তো এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, কিন্তু পরজগতে যদি ভুলের মার্জ্জনা থাকে, তাহ'লে সেখানে আবার আমাদের দেখা হবে"। মৃণ্ময়ীর মুখের প্রতি না চাহিয়াই মিঃ সেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মৃণ্ময়ীর ইচ্ছা হইল একবার ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, একবার বলে যে "সেও বড় অভাগিনী"—কিন্তু সে উঠিল না! বাহিরে জুতার শব্দ মিলাইয়া গেলে, সে উঠিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিল তারপর সহসা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বালিকার মত কাঁদিয়া উঠিল। আজ দশ বৎসর পরে শেষ বিদায়ের দিনে মণীন্দ্রের মুখে সে তাহার পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে তেমনি করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিয়াছে। এই আলোকহীন অন্ধকার কক্ষের অপেক্ষাও অধিক অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে সে মণীন্দ্রের যে উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল মিঃ সেনের অবজ্ঞাত পরিত্যক্ত চিত্রের সহিত তাহা মিশিয়া গিয়া সমস্ত গোলমাল হইয়া গিয়াছে—সে ছবি খুঁজিতে গেলে মিঃ সেনের মুখ জাগিয়া উঠে। আজ আর তাহাব নিজের বলিতে কিছুই নাই। মণীন্দ্র বলিয়া গিয়াছে "পরলোকে আবার তাহাদের সাক্ষাৎ হবে"। কে জানে সেখানকার বিচারে কে জয়ী হয়! মৃণ্ময়ী আপনার হৃদয়ের ভিতর খুঁজিয়া দেখিতে চাহিল, কিন্তু কই সে তো মণীন্দ্রের জন্য কোন কামনা রাখে না। ইহলোকে ত নয়ই, পরলোকেও না। তবে চোখের জল বাঁধ মানে না কেন? শুধু কি সমবেদনা? কে জানে!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

TORN PAGES

নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা।

বঙ্গমহিলাদের মধ্যে প্রচলিত ব্রতগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবী ভগবতীই বিভিন্নরূপে কুলমহিলাদের নিকট হইতে ব্রত গ্রহণ করেন এবং অতি সামান্য উপকরণেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্রতকারিণী উক্ত সামান্য উপকরণও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন্ না, তখন দেবী কেবল ভক্তি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হন। কোন কোন ব্রতের খাদ্যোপকরণ ব্রতকারিণীর নিজের ভক্ষণ করিতে হয়, আবার কোন কোন ব্রতের মিষ্টান্ন প্রভৃতি কেবল বালকবালিকাদেরই প্রাপ্য। প্রায় সমস্ত ব্রতেই দেবীর অসাধারণ শক্তিপ্রকাশক একটি উপাখ্যান শোনা ব্রতের প্রধান অঙ্গ। যদিও এই সকল উপাখ্যান প্রাচীন মহিলাবৃন্দের কেবল কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রধান করে, তথাপি যে ইহার কোন মূল্য নাই এরূপ নহে। উহা দ্বারা তৎকালীন সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ীর ব্যবহার, পিতৃমাতৃভক্তি সম্বন্ধে প্রচুর উদাহরণ আমরা উহা হইতে প্রাপ্ত হই। আবার দেখিতে পাওয়া যায় রাজা বাণিজ্য প্রভৃতি করেন, এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও বর্ত্তমান কালের মধ্যবিৎ গৃহস্থ অপেক্ষা উন্নত নহে, অথচ তিনি আবার গর্দ্দান নিতে পারেন। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় সামান্য ভূম্যধিকরীদিগকেই তখন রাজা বলা হইত এবং আপন ক্ষুদ্র রাজ্যে তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ইঁহাদের উপরে সম্ভবতঃ অধিকতর ক্ষমতাবান্ এবং বৃহত্তর প্রদেশের রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগের মন্ত্রী কোটাল প্রভৃতি কর্ম্মচারী থাকিত। কিন্তু রাজামাত্রেই প্রজাবৎসল। প্রজার হিতার্থে পুকুর কাটিয়া তাহাতে নিজ পুত্র পৌত্রের রক্তদানেও তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্ত। "সোনার খাটে শোওয়া এবং রূপার খাটে পা রাখা"র উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর তৎকালে কিরূপ মূল্য ছিল, ইহা তাহারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

যাহা হউক এই সকল ব্রতপ্রতিষ্ঠা দিন দিন লোপ পাইতেছে, নব্যাদিগকে আর ব্রত করিতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রাচীনাদের সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বোধ হয়, এই সকল ব্রত পার্ব্বণের কথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। কারণ এখনই আমাদিগকে শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি হইতে এবং প্রাচীনাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রত কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিতে হইতেছে। এ সময়ে 'ভারতী' সম্পাদিকা মহাশয়া এইগুলিকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের একটি হিতসাধন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল কাহিনীর আদর না হইলেও ভাবী বংশীয়েরা যে ইহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বুধবার 'নাটাই চণ্ডীর' ব্রত আরম্ভ করিয়া উক্ত মাসের প্রত্যেক বুধবারই ব্রত করিতে হয়। চারি

বৎসর পরে ব্রত উদযাপিত হইয়া থাকে। ব্রত শেষের বৎসর খুব ঘটা হয়, অবস্থানুসারে সকলেই এই সময় ভোজনাদি করাইয়া থাকেন। ব্রতের উপাদান ২১ গাছি দুর্ব্বা, ২১টী ধান, এবং চারখানা আলুণা ও তিনখানা লুণা পিটে। ২১টি ধানের মধ্যে ১০টী কাল এবং ১১টী সাদা হওয়া চাই এই সকল দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখিত নিয়মে সাজাইয়া নিম্নলিখিত কাহিনী শুনিতে হয়, এবং তৎপরে ব্রতকারিণীকে পিটেগুলি ভক্ষণ করিতে হয়।

রাজা যাবেন বাণিজ্যে, দেশ শুদ্ধ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, সাত ডিঙ্গা সাজান হইয়াছে, লোক লস্করের কলরব, মাঝি মাল্লাদের আনা গোনার শব্দে রাজপুরী টলমল। কিন্তু যেতেও রাজার মন চায় না; তাঁর মনে সুখ নাই। বড় রাণী এক ছেলে এক মেয়ে রেখে মারা গিয়াছেন, ছোট রাণী দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে ঘরকন্না কচ্ছেন। রাজা দেশে থাকবেন না, বিমাতা সাপিনী বাঘিনী কখন কি বিভ্রাট ঘটিয়ে বসেন তার ঠিকানা নেই। হয়ত বড় ছেলে মেয়ে দুটীকে না খেতে দিয়েই মেরে ফেলবে। মাঝিরা বল্লে "মহারাজ! তার জন্য ভাবনা কি? তেলী বাড়ীতে কড়ি দিয়ে যান, তারা তেল যোগাবে; মোদক বাড়ীতে কড়ি দিয়ে যান, তারা মুড়ী মুড়কী যোগাবে। তাঁতী কাপড় যোগাবে। তাহলে আর রাজপুত্র রাজকন্যার অভাব কিসের?" রাজা তাই করলেন, তেলীকে বল্লেন তেল যোগাতে, আর মোদককে মুড়ী মুড়কী যোগাতে বলে দিয়ে বাণিজ্যে গেলেন, ছোট রাণীকে কিছুই বল্লেন না।

রাজাও গেলেন ছোট রাণীও সতীনের ছেলে মেয়ে দুটীকে পেয়ে বস্লেন। সারাদিন তাদের দিয়ে বনে জঙ্গলে ছাগল চরাতেন, আর দিনের শেষে পোড়া ভাত পোড়া ব্যঞ্জন খেতে দিতেন। কিন্তু তেলী বাড়ীর কাছ দিয়ে যাবার সময়, তেলীরা তেল মাখিয়ে দিত, ক্ষুধা পেলে মোদকেরা মুড়ী মুড়কী দিত, কাজেই বিমাতার অত্যাচারেও তারা কাহিল হল না। ছোট রাণী ভাবলেন, ওদের পোড়া ভাত পোড়া ব্যঞ্জন খেতে দিই, তবু ওরা মোটা হয় কেমন করে? আর আমার বাছারা ঘি, দুধ খেয়েও দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। নিজের ছেলে মেয়েদের বলে দিলেন, "ওরা কি খায় কি করে তা লুকিয়ে দেখে এস।" তারা সে সব দেখে এসে মাকে খবর দিলে। ছোট রাণী তা শুনে রেগে তেলী বাড়ী গিয়ে তেলের হাঁড়ী ভেঙ্গে দিলেন; মোদকের মুড়ী মুড়কী ফেলে দিয়ে তাদের নানা রকম গালাগালি দিয়ে এলেন। তারপর থেকে তারা কেউ বড় রাণীর ছেলে মেয়েকে কিছু দেয় না। কাজেই তারা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যেতে লাগলো। নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণের মনে কি আছে কে জানে! একদিন তারা বনের ভিতর ছাগল হারিয়ে কোথাও খুঁজে পায় না, বিমাতার ভয়ে মুখ খানা শুকিয়ে এত টুকু হ'য়ে গেল, সন্ধ্যাবেলা ভয়ে ভয়ে বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। ছাগল হারিয়েছে শুনেই তো ছোট রাণী তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন, এবং মেরে ধরে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এমন সময় এক গেরস্তের বাড়ীতে জোকার (হুলুধ্বনি) শুনতে পেয়ে, সেখানে জিজ্ঞাসা করে

TORN PAGES

জান্‌তে পার্‌লে তারা নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণের ব্রত কর্‌ছে? এ ব্রত কর্‌লে কি হয়? "অব্বিয়াতোর" (অবিবাহিতের) বিয়ে হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, হারান ধন ফিরে আসে, ছোট ঘর বড় হয়, নির্ধনের ধন হয়, বড় ঘর ছোট বর (অল্পবয়স্ক বর) পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সর্ব্বত্র জয় হয়, দূরের বন্ধু উড়ে আসে, নাটাইচণ্ডীর বরে সকল ঘর ভরে।"

ব্রতে কি কি লাগে? অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বুধবার ব্রত আরম্ভ কর্‌তে হয়, প্রথম বুধবার তিন খানা কলার মাইজ (মধ্যস্থিত নবোদ্গত কলাপাতার অগ্রভাগ) সাজিয়ে দুদিকের দুখানির এক খানিতে তিন খানা লুণা পিঠে, আর একখানিতে চার খানা আলুণি পিঠে এবং মাঝের পাতা খানিতে ২১ গাছি দুর্ব্বা ও ২১টী ধান এবং মঙ্গল ঘট রেখে নাটাই চণ্ডী ঠাকরুণের কথা শুনতে হয়। ওরা তাই শুনে ভাবলে নাটাইচণ্ডীর ব্রত কর্‌লে "দূরের বান্ধব উড়ে আসে", তবে আমরাও ব্রত করব। নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণের বরে যেন বাবা ঘরে আসেন। সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বুধবার ছিল তাই তারা সেই দিনই ব্রত করবে, স্থির করলে, না হ'লে আবার বসে থাক্‌তে হয়। কিন্তু ওরা বার দুয়ারে মেগে যেচে খায়, পিঠে করবে, তার চাল পাবে কোথা? তাই নদীর কিনারায় গিয়ে বালির পিঠে করলে, একুশ গাছি দুর্ব্বা তুলে আনলে, এবং ক্ষেত থেকে ২১টী ধান কুড়িয়ে নিয়ে এল, কলার পাতে মঙ্গলঘট রাখ্‌লে, তারপর গেরস্থ বাড়ীতে যে কথা শুনে ছিল, দিদি তাই বল্লে ছোট ভাই দুর্ব্বা হাতে করে শুনলে। কথা শেষ হলে বোন জো'কার দিলে। ব্রত শেষে বর্ত্তীর (ব্রতকারিণীর) পিটে খেতে হয়, বালির পিঠে কি করে খাবে? শুঁকে ফেলে দিলে। "দূরের বন্ধু উড়ে আসে" তবে তো বাবা কাল আসবেন। "রাত পোহা" "রাত পোহা"। রাত পোহালে, ভোর বেলা সত্যি সত্যি তারা দেখ্‌তে পেলে রাজার সাত ডিঙ্গা পাল খাটিয়ে আস্‌ছে, রাজা ছাদের উপর বসে আছেন, হঠাৎ ছেলে মেয়ের উপর তাঁর নজর পড়ল। তিনি মাঝিদের ডেকে বল্লেন "তোরা দ্যাখ তো ও দুটী কার মেয়ে ছেলে? মাঝিরা রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে নৌকাতে তো নিয়ে এল। ছোট রাণী তাদের প্রতি যেরূপ ব্যাভার করেছেন, তা শুনে রাজা খুব রেগে গেলেন এবং তাদের নৌকার ভিতরে লুকিয়ে রেখে ঘাটে গিয়ে টিকারা দিলেন এবং ছোট রাণীকে তাঁর নিজের ও বড় রাণীর ছেলে মেয়েকে সঙ্গে করে নৌকোর জিনিষ বরণ করে তুলে নিয়ে যেতে বল্লেন। এদিকে ছোট রাণী তাঁর নাটাইয়ের সুতো এলো মেলো করে ফেলে দিয়ে, মিছি মিছি মায়া কান্না কেঁদে বল্লেন "বড় রাণীর ছেলে মেয়ে দুটো যে দুষ্টু, বাপরে আমার নাটাইয়ের সুতো ছিঁড়ে ফেলেছে, তারপর দুই ভাই বোনে মিলে আমাকে মেরে ধরে কোথা চলে গিয়েছে। রাজা বল্লেন, তবে থাক্ আর বরণ করে কাজ নেই, জিনিষ পত্তোর অমনি ঘরে তুলে নেব এখন। তারপর রাজা একটা পুকুর কাটিয়ে তেল সিন্দুর মাথায় দিয়ে রাণীকে পুকুরটা সাত পাক ঘুরে আস্‌তে বল্লেন। রাণী ছয় পাক ঘুরে যেমন সাত পাক ঘুরবেন, অমনি রাজা তাঁকে পুকুরে ঠেলে ফেলে দিয়ে হেঁটে কাঁটা পিঠে কাঁটা

দিয়ে পুতে রাখ্‌লেন। তার পরের বছর আবার অগ্রহায়ণ মাস এল, বুধবার এল, রাজকন্যা ২১ গাছ দুর্ব্বা আনলেন, কলার মাইজ কাটলেন, ৩ খানা লুণো পিঠে আর চার খানা আলুণা পিঠে তৈরী করে ব্রত করলেন। নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণের বরে আর এক দেশের এক রাজপুত্র সেই দেশে বাণিজ্য কর্‌তে এলেন, রাজা তাঁর সঙ্গে বড় রাণীর কন্যার বিয়ে দিলেন। এক বছর সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে রাজপুত্র শ্বশুরকে বল্লেন মহারাজ! আমি দেশে যাব। রাজা বল্লেন, "বেশত"। তিনি ধন দৌলত দিয়ে জামাইয়ের ডিঙ্গা পূর্ণ করে দিয়ে, মেয়েকে শ্বশুরের ঘর কর্‌তে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা নৌকাতে যাচ্ছেন দৈবাৎ সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বুধবার ছিল, কাজেই রাজকন্যা নৌকাতেই ব্রত কর্‌তে লাগলেন, বাড়ী থেকে দুর্ব্বো ও পিঠে তৈরী করে নিয়ে এসেছিলেন। নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণের কথা শোনবার লোক নাই, নিজে বলে নিজেই শুনতে লাগলেন। রাজা দেখ্‌লেন রাণী বিড় বিড়, করে আপন মনে কি বক্‌ছেন, পাগল নাকি? জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "ওকি করছ?" "নাটাইচণ্ডীর ব্রত করছি?" "এ ব্রত কর্‌লে কি হয়?" "অবিয়াতোর বিয়ে হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, হারান ধন ফিরে আসে, ছোট ঘর বড় হয়, নির্ধনের ধন হয়, বড় ঘরে ছোট বর পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সর্ব্বত্র জয় হয়, দূরের বন্ধু উড়ে আসে, নাটাই চণ্ডীর বরে সকল ঘর ভরে। এই ব্রত করে আমি বিদেশের বাপ দেশে পেয়েছি, এই ব্রত করেই তোমাকে পেয়েছি।" কুবুদ্ধি রাজার সকল কথা প্রত্যয় হলনা; তিনি রাজকন্যার অলঙ্কারের ঝাঁপিটী নদীর ভিতর ঝুপ করে ফেলে দিলেন, আর বল্লেন "যদি ঘরে বসে এই ঝাঁপি ফিরে পাই, তবেই বুঝব নাটাইচণ্ডী প্রত্যক্ষ দেবী।" এইরূপে তাঁর গা খালি করে, রাজা তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। ছেলে বিয়ে করে এসেছে শুনে তাঁর মা বরণডালা সাজিয়ে বৌ ঘরে তুলে নিতে এলেন, কিন্তু বৌ দেখেই তো তাঁর চক্ষু স্থির, ও মা! এই নাকি বৌয়ের শ্রী! বাপের বাড়ী থেকে ইচার আংটী * গাছটীও দেয় নি! পাড়া পড়শীরা আই, ছি, কর্‌তে লাগলো। বুড়ো রাণী মুখখানি হাঁড়ী পানা করে বৌকে ঘরে তুলে নিলেন, কিন্তু বৌ তাঁর দু চোখের বিষ হল। নানা রকমে তাকে জ্বালা যন্তন্না দিতে লাগলেন। কিছুদিন পরে রাজকন্যার একটী ছেলে হল। বুড়ো রাজার ইচ্ছে হল একটা দীঘি কাটালেন। হাজার হাজার মাটী কাটা লোক লাগিয়ে দিলেন, জল আর ওঠে না, মজুরেরা একে একে বিদায় হয়ে চলে গেল, বল্লে "মহারাজ! আমাদের দিয়ে আর হবেনা"। রাজা ইহা অলক্ষুণে কাণ্ড মনে করে ভেবে অস্থির হলেন। রাত্তিরে স্বপ্ন দেখ্‌লেন যে তাঁর নাতিকে কেটে রক্ত দিলে দীঘিতে জল উঠবে নৈলে উঠবে না। দীঘিতে জল না ওঠলেও চলে না, নাতিকেই বা কি করে কাটেন? তিনি দুঃখিত হয়ে পরদিন আর শোবার ঘরের দরজা খোলেন না। ছেলে এসে ডাকা ডাকি করাতে খুলে দিলেন। ছেলে বাপের মুখখানা ভারী দেখে জিজ্ঞেস কল্লে "বাবা কি হয়েছে?" রাজা এই নির্ঘাত

* চিংড়ি মাছের গোঁপের নির্ম্মিত আংটি। পূর্ব্ববঙ্গে চিংড়িকে ইচা বলে।

স্বপ্নের কথা কোন মুখে বল্‌বেন, তাই চুপ করে রইলেন। শেষে ছেলে অনেক পেড়াপিড়ী করাতে স্বপ্নের কথা খুলে বল্লেন। রাজপুত্র বল্লেন "বাবা! তার জন্ত কি, আপনি সাধ করে দীঘি কাটিয়েছেন রাজ্যের লোক তার জল খেয়ে বাঁচবে, ছেলের মায়া ক'রে আমি তার ব্যাঘাত কিছুতেই হ'তে দেব না"। বুড়ো রাজাও শেষেও সম্মত হ'লেন, এবং ছেলের ভাত এবং পুকুর উৎসর্গ করার দিন পাঁজি দেখে ঠিক কর্‌লেন। সেদিন ভারী ঘটা কত বামুন পণ্ডিত কত হাজার হাজার লোকের নেমন্তন্ন হয়েছে, কিন্তু জেলেরা জাল ফেলে একটা পুঁটি মাছও পেলেনা। এখন তো জাত যায়, উপায়! এদিকে নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণ বুড়ীর রূপ ধরে, পাকা চুলে সিন্দুর, চওড়া কস্তা পেড়ে শাড়ী ও শাঁখা পরে, আর এক গাল পান চিবুতে চিবুতে রাজকন্যাকে এসে বল্লেন "বউ তুই বলনা যে আমি বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় যে গাঙ্গ দিয়ে এসেছি সেই গাঙ্গে একবার জাল ফেল"। বউ সে কথা শাশুড়ীকে জানালেন, তিনি তো প্রথমে সে কথা গ্রাহ্যই কর্‌লেন না, অবশেষে বুড়ো রাজা শুনে ভাব্‌লেন, একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তেই বা বাধা কি? জেলেদের পাঠিয়ে দিলেন, ও মা! জাল আর টেনে তোলা যায় না অনেক টানা হেঁচড়া করে তুলে দেখতে পেলে, প্রকাণ্ড একটা রাঘব বোয়াল উঠেছে? এত বড় মাছ কাটবে কে? আর সকলে পরাভব মানলে। নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণ আবার এসে রাজকন্যাকে বল্লেন "বউ তুই কাটগে না"। তিনি কাটতে গেলেন, পেট কেটে দেখেন তার মধ্যে তাঁর হারান অলঙ্কারের ঝাঁপিটী রয়েছে। ছেলের ভাত হল, এখন পুকুর উৎসর্গ হবে, রাজপুত্র ছেলে কেটে রক্ত দেবার জন্ত তাকে কোলে করে নিয়ে গেলেন, কেটে যাই রক্ত দিলেন অমনি দীঘি জলে ভরে থই থই কর্‌তে লাগলো। নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণ আবার রাজকন্যাকে এসে বল্লেন, "বউ তোর যে সর্ব্বনাশ হল তা তুই জানিস্ নি, তোর ছেলেকে যে ওরা কেটে নতুন পুকুরে রক্ত দিয়েছে। রাজকন্যা তো তাই শুনে 'হায় কি হল' বলে কাঁদতে লাগলেন, নাটাইচণ্ডী বল্লেন, "তা বউ আর কেঁদে কি হবে, শিগ্‌গির করে নতুন পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আয়" রাজ-কন্যা কাঁদতে কাঁদতে পুকুরে ডুব দিতে গেলেন। তখন নাটাইচণ্ডীর মহিমা দেখে সকলেই অবাক হ'য়ে গেল, দেখলে রাজকন্যা তাঁর ছেলেটীকে কোলে করে উঠ্‌লেন! সকলে অবাক্ হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লে, কি করে এরূপ হল। রাজকন্যা নাটাইচণ্ডীর কথা বল্লেন, রাজ্যশুদ্ধ এই খবর রাষ্ট্র হল, সকল মেয়েরা ব্রত আরম্ভ করলে, নাটাইচণ্ডীর ব্রত সে রাজ্যে প্রচারিত হল। শাশুড়ী এখন আর বউকে অনাদর করেন না, শেষে বুড়ো রাজা, বুড়ো রাণী স্বর্গে গেলেন, রাজপুত্র রাজা হ'য়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে রাজত্ব কর্‌তে লাগলেন।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া।

মানসীর প্রতি।

অন্তর আজি তিমির মগ্ন,
টুটিয়া গিয়াছে ভরসা।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ মরমের কোলে,
পড়িছে অলস উচ্ছ্বাসে ঢলে,
ঘন ঘনতম বরষা।
তপনের ছায়া হ'য়ে গেছে ম্লান,
নিবে গেছে হাসি থেমে গেছে গান,
জীবনের আশা ভাষা ম্রিয়মান
বিষাদ্‌বেদন পরশা।
অন্তর আজি তিমির মগ্ন,
টুটিয়া গিয়াছে ভরসা।

মলিন জীর্ণ দীর্ণ হৃদয়
কাঁপিছে প্রলয় পবনে।
কম্পিত করি জীবনের বেলা,
দীপ্ত মরণ করিতেছে খেলা,
মন মর্ম্মর ভবনে।
বিদ্যুত মালা ঝলকে ঝলকে,
কুটিল কঠোর বক্র আলোকে,
কৌতুক রেখা পলকে পলকে
ফুটায়ে তুলিছে গগনে।
মলিন জীর্ণ দীর্ণ হৃদয়
কাঁপিছে প্রলয় পবনে।

হে মোর তৃষিতা, চির ঈপ্সিতা,
কত দূরে আজ তুমি গো?
পলে পলে পলে নিবিড় আঁধার,
ছড়ায়ে দিতেছে ঘন কেশ ভার,
ঢাকিয়া জীবন ভূমিগো।
গর্জ্জন করি কাঁদে মেঘ দল,
ভীমা প্রকৃতি হাসে খল খল,
ছল ছল ছল ভরে' উঠে জল
মরণের কোল চুমিগো।
হে মোর তৃষিতা, চির ঈপ্সিতা,
কত দূরে আজ তুমিগো?

এস তুমি এস বাঞ্ছিতা মোর;
ডাকিছে প্রকৃতি নগ্না।
তোমার আমার শুভ পরিণয়,
কবে দিবে তারে চির মধুময়,
সরস হরষ মগ্না।
হুলুধ্বনি গাবে বজ্রের বাণী,
বিদ্যুৎ জ্বালিবে আলোমালাখানি,
ঝঞ্ঝা আনিবে উল্লাসে টানি'
প্রীতি মাধুরী লগ্না।
এস তুমি এস বাঞ্ছিতা মোর;
ডাকিছে প্রকৃতি নগ্না।

জীবনে তোমারে পারিনি ধরিতে
চরণের তলে লুটিয়া।
আজিকে আমার মরণ ভবনে,
অনাহুত ভাবে আকুল পবনে
এসগো আপনি ছুটিয়া।
এস তুমি এস হে মোর প্রেয়সি,
হে মোর মানসি, হে মোর প্রেয়সি,
চির প্রভাময়ী অতুলা রূপসি,
হৃদয়েতে উঠ ফুটিয়া।
জীবনে যে তোমা পারিনি ধরিতে
চরণের তলে লুটিয়া।

মিটাও গো মোর মরণ শয়নে
চির জীবনের সাধটী।

আমার মলিন করের উপরে,
রাখ সযতনে, স্নিগ্ধ আদরে,
তোমার নলিন হাতটী।
সার্থক হোক্ মোর ভালবাসা,
পূর্ণ হউক হৃদয়ের আশা,
খুলে দাও তুমি মর্ম্মের ভাষা
বুকের কঠোর বাঁধটী;
মিটাও গো আজি মরণ-শয়নে
চির জীবনের সাধটী!

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

আসামের শঙ্করদেব ও মাধবদেব।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, যখন গুরু নানকের উপদেশে শিখ সম্প্রদায় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইতে লাগিল, তখন শঙ্করপ্রমুখ মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া অসমদেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া দিলেন। বঙ্গের গৌরনিতাই অকাতরে বুকের রক্ত ঢালিয়া পাপীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন; অসমের শঙ্কর মাধবও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া মানবকে "নামকীর্ত্তন" শিক্ষা দিয়াছেন।

অধিকাংশ বৈষ্ণবর্গণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করেন। শঙ্করদেবও এই অসমদেশে "মহাপুরুষিয়া"-গণ-কর্ত্তৃক অবতার বলিয়া পূজিত। হরিদেবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে—

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ প্রোক্তঃ কৃষ্ণো দামোদরস্তথা।
হরিদেবো হরিশ্চৈব চৈতন্যঃ পূর্ণব্রহ্ম চ॥"

প্রথমে কুসুমগিরি পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া নানা দেবদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, পরে শম্ভুর বরে পুত্র লাভ করিলেন। কুসুমের বংশ উজ্জ্বল হইল—অসমদেশ ধন্য হইল। মহেশের বরে পুত্র লাভ করিয়া কুসুমগিরি পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"শঙ্করর বরত পুত্রক নভিলন্ত।
এতেকে শঙ্করর নামক থৈলন্ত॥
গুপ্তনাম তাহার থৈলন্ত গঙ্গাধর।"

শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ৩৬ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যায় বঙ্গদেশ যখন টলমল, তখনও শঙ্করের "পাষণ্ডমর্দ্দন" আরম্ভ হয় নাই। কেহ কেহ একথাও বলিয়া থাকেন যে শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষিত। ইহা কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন তখন শঙ্করের বয়স ষষ্ঠিবৎসর হইবে। শঙ্করের প্রচার তখনও নিয়মিত রূপে আরম্ভ হয় নাই। মাধব রামদাস প্রভৃতি অনেকেই ইতিপূর্ব্বে শঙ্করের শরণাগত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, এবং তাহারা যে নাম কীর্ত্তনও না করিতেন এরূপ নহে। কিন্তু শঙ্কর তখনও প্রচারককার্য্যে ব্রতী হ'ন নাই। তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই শঙ্কর লোকশিক্ষায় আত্মসমর্পণ করেন।

শঙ্কর তীর্থদর্শন উদ্দেশ্যে গৃহহইতে বহির্গত

হইলেন; সঙ্গে দামোদর, হরিদেব, মাধব ও অন্যান্য সহচর-অনুচর-বৃন্দ। তীর্থদর্শন ছল-মাত্র; প্রধান উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্যদর্শন্। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন—

পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক।
ন করিবা কেহ নমস্কার চৈতন্যক। ৫৭১।
চিত্তো জনে নমস্কার করে চৈতন্যক।
উলটিয়া তেহোঁ প্রণামন্ত সিজনক॥
মনে মনে নমস্কার করিবা এতেকে।
এহি বুলি শিখাইলন্ত লোক সমস্তকে॥ ৫৭২।
জীবনচরিত্র।

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাহার কীদৃশ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। অতঃপর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র আছন্ত যথাত
ভৈলন্ত শঙ্করসূর্য্য প্রবেশ তথাত॥ ৫৭৩।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও—

দুয়ার মুখত রহি আছিলন্ত চাই।
দুয়ো নয়নর নীর ধারে বহিয়াই॥ ৫৭৪।
শঙ্করো নয়নর নীর বহে ধারে।
পথহন্তে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে॥ ৫৭৫।

শঙ্করদেবের যে শ্রীচৈতন্য "দরশনে ভেল অনুরাগ" তাহাত এই ঘটনাতেই স্পষ্টীকৃত; সুতরাং "তব রহই না পারই চলল দরশন লাগি"—ইহাও দেখিলাম। "দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল" তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু "দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি" কিনা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তি যে শঙ্করের হৃদয়-পটে চিরাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার অণুমাত্র কারণ নাই। "দুঁহুঁ দোহাঁ দরশন পাওল"। উভয়ই প্রেমে বিভোর—আত্মহারা;—কাহারও মনোভাব প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। কাজেই—অনেকক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল। পরে—

"কৃষ্ণচরিত্রত মন মজিছে একান্ত।
কৃষ্ণচরিত্র কহিবাক লাগিলন্ত॥" ৫৭৮।

শঙ্কর এইরূপে কিছুদিন শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রেমভক্তিরসে ডুবিয়া রহিলেন; পরে সহচরগণ সমভিব্যারে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্যের নিকট শঙ্করের দীক্ষা-গ্রহণ সত্য কি না ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু চৈতন্যপ্রেম যে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদর্শনের পরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়াই জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিতে তৎপর হ'ন; ইহাতেই বোধহয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য না হইলেও তাঁহার নিকট যে প্রেম ভক্তি শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শঙ্করদেব শিশুকালেই মাতৃহীন। একে বড় ঘরের ছেলে, তাহাতে আবার "বুঢ়ী আই" (পিতামহী) বৃদ্ধা খেরাস্থতির আদরে লালিত পালিত। এমত অবস্থায় একটু দুর্দ্দান্ত হওয়া বিচিত্র নহে। শ্রীচৈতন্যদেবও বাল্যকালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সমুদায়ও দুর্দ্দমনীয় ঐশী শক্তির পরিচয় দিতেছে।

পাঠে মনোনিবেশ করিয়া শঙ্করদেব অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় দিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর বলিয়াছেন—

পরম যতনে গুরুগৃহত পঢ়ন্ত। ৫১।
বারেকাদ দেখাই দিলে এতেকে পারন্ত।
অতি অনায়াসে গুরু তাহাঙ্ক পঢ়ান্ত॥
পঢ়িলন্ত নিরন্তরে শাস্ত্র সমস্তয়।

অপ্রমাদী পণ্ডিত ভৈলন্ত মহাশয় ॥ ৫২।
অবিরত সমস্তে শাস্ত্রকে বিচারন্ত।
শাস্ত্রালাপ বিনে আন কর্ম্ম নাচরন্ত ॥ ৫৩।

শঙ্কর শাস্ত্রচিন্তায় তদ্‌গত হইলেন। যোগও কিছু কিছু অভ্যাস করিলেন।

শাস্ত্রর তত্ত্বক জানি মনত হরিষে।
পরলোক হিত মাত্র চিন্তা অহর্নিশে ॥ ৫৩।
এহিমতে শাস্ত্র বিচারি পাছত, যোগশাস্ত্র পাইলা যাই।
পরলোকহিত সাধিবাক চিত, সাধিলা যোগ উপায় ॥৫৫।
প্রাণ অপান সমান উদান
আদি করি বায়ু চয়।
বশ্য করিলন্ত চলাইবে পারন্ত
চি বায়ু চৈত লাগয় ॥
শরীরর ছয় চক্রক চিন্তন্ত
মনক করি নিয়ম। ৫৯।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের শারীরিক ও মানসিক তেজঃ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। যে যুবক বিশাল ব্রহ্মপুত্র বক্ষে সাঁতার কাটিয়া দুই তিনবার 'এপার ওপার' হইতে পারে, যে যুবক মল্লযুদ্ধে ভীষণকায় পার্ব্বত্যবৃষভ পরাজিত করিতে পারে—"ডেকা-গিরি আসে শুনিলেই যাহার ভয়ে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যবৃষভ পলায়নপর হয়, সেই যুবক যে অমিততেজঃসম্পন্ন নয় কে বলিবে? যে যুবক—

"ধ্যান ধারণা সমাধি আসন প্রাণায়াম আদি যত।
* * * * আচরা মাত্র সতত ॥ ৫৯।

তাহার যদি মানসিক স্ফূর্ত্তি না হইবে, তবে আর কাহার হইবে!

যথাসময়ে শঙ্কর দারপরিগ্রহ করিলেন। কিছুকাল পরে "আলিকান্ত আই" একটী কন্যাসন্তান রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিল। শঙ্কর পুনরপি "কালিন্দীনাম্নী" এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শঙ্করদেব বুদ্ধ অথবা শ্রীচৈতন্যের ন্যায় স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই পরন্তু—

"গৃহাশ্রমে থাকি ধর্ম্ম আচরন্ত শাস্ত্রর যেন বিহিত।"৬১।

দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে শঙ্করদেব একবার পুরুষোত্তম ধামে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি কোনও তত্ত্বজ্ঞ বিপ্রের উপদেশে বেদান্তে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিলেন। চিন্তাশীল শঙ্কর যৌবনেই বেদান্তপাঠে তাহার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতার প্রতি বহু পূর্ব্বেই তাঁহার ঘোর বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন—

"ই দেশত পূর্ব্বকালে নাছিল ভকতি।
* * * * *
নানাদেব পূজায় করয়ে বলিদান।
হাঁস ছাগ পায় কাটে অসংখ্য প্রমাণ ॥" ৯।

তদনন্তর পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগত কোনও বিপ্রের মুখে ভগবত পাঠ শুনিয়া—

"বিচার করিয়া পাছে ভাগবত গ্রন্থ।
করিলন্ত শঙ্করে প্রকাশ ভক্তিপন্থ ॥" ৯।

এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে এই ব্রাহ্মণ ৺জগন্নাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তম হইতে কামরূপে আসিয়া শঙ্কর-দেবকে শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনাইতে শুনাইতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর শঙ্করদেব বাছিয়া বাছিয়া বিষ্ণু-পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে অনেক অংশ পদ্যে অনুবাদ করিয়া "কীর্ত্তন ঘোষা" নাম দিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন।

এমন সময়ে মাধবদেব আসিয়া শঙ্করের শরণাগত হইলেন—মণিকাঞ্চন যোগ হইল।

মাধবদেবের পূর্ব্বপুরুষগণও বঙ্গদেশ হইতে সমাগত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দুর্লভনারায়ণ যে ৭জন কায়স্থ বঙ্গদেশ হইতে

আনাইয়া নিজদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন মাধবের পূর্ব্বপুরুষ তাহাদেরই একজন। কিন্তু তিনি পরে অসম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (ড)। সে যাহাই হউক, মাধবের পিতা গোবিন্দগিরি পত্নীর মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বাণ্ডুকা ছাড়িয়া "টেম্বুয়ানীবন্ধে" আসিয়া পুনরপি গৃহস্থ হইয়া—দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। (ঢ) গোবিন্দ অসমে আসিয়া "দীঘলপুরিয়াগিরি" নামে পরিচিত হয়েন। গোবিন্দ "কাণলমা" বা "লামকাণা" নামেও অভিহিত। দৈত্যারি লিখিয়াছেন—

"কাণলম্বা দেখি আসামে দিলেক তান্ কানলমা নাম।" ১১০।

এবং আমার বোধ হয় গোবিন্দ আলম্বান গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনেকে "লামকাণা" বলিয়া সম্বোধন করিত। (ণ)।

এই সময়ে আসামে কাছারী মানের উপদ্রব আরম্ভ হইল। গোবিন্দগিরি সপরিবারে "যঃ পলায়তে স জীবতি" নীতির অনুসরণ করিলেন।

পরে 'হরশিঙ্গা বড়া,' নামক জনৈক জমিদারের আশ্রয় পাইয়া পুখুরীপার গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। হরশিঙ্গা বড়া যদিও অসমরাজের নিতান্ত অনুগত তথাপি গোবিন্দের সৌভাগ্যহেতুই তাঁহাকে আপন অধিকারের 'হাকিম' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই হরশিঙ্গা বড়ার আশ্রয়ে বসতিকালেই তৎপত্নী "সত্যদী আই" একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই পুত্রই শঙ্করপন্থীদিগের "মহাপুরুষ" মাধবদেব।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ"। গোবিন্দ আবার দুঃখ দারিদ্র্যে পতিত। অবশেষে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া মাধবের সহিত পুনরায় স্বস্থানে বাণ্ডুকায় প্রস্থান করেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দের জীবলীলা সাঙ্গ হইল। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পরে মাধব আপন মাতৃসমীপে আসামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গোবিন্দের বঙ্গীয়া পত্নীর সন্তান বঙ্গে রহিলেন, অসমীয়া পত্নীর সন্তান অসমদেশ উজ্জ্বল করিলেন।

গোবিন্দ স্বদেশে যাইবার সময়ে ভার্য্যাকে জামাতা রামদাসের আলয়ে রাখিয়া যান। মাধবও আসামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

(ড) "Madhab's ancestor was one of the seven Kayasthas who were given as hostages by Dharmeswar to the Assam King. Brahmagiri,—for this was the name of Madhab's ancestor,—after he ran away from the territory of the Assam Prince, settled at a place called Banduka in Bengal."—M. N. Ghosh's "Brief Sketch" p.14. কিন্তু সেই সাতজনের মধ্যে ব্রহ্মগিরি নামধেয় কেহ ছিলেন বলিয়া আমি কোনও প্রমাণ পাই নাই। ঘোষ মহাশয় অনেক স্থলে ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারিত করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

(ঢ) মাধবের ভাগিনেয় রামচরণের বংশধর বামুনার বর্ত্তমান-অধিকারি-বংশীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি যে এই বাণ্ডুকা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রাম। সম্প্রতি কীর্ত্তিনাশা পদ্মা ইহাকে গ্রাস করিয়াছে। বন্ধুবর উপেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় কায়স্থবংশসম্ভূত বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

(ণ) এই "লামকাণা আতা" হইতেই ঘোষ মহাশয় তাহার নাম 'রামকান্ত আতা' স্থির করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ কখনও রামকান্ত নামে অভিহিত হইতেন না।

ভগিনীপতি রামদাসের গৃহেই বসতি করিতে লাগিলেন। তান্ত্রিক মতাবলম্বী পিতার নিকট শিক্ষিত নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মাধব শক্তি-উপাসনায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

এদিকে শঙ্করদেব অল্পে অল্পে আপন মত প্রচার করিতে লাগিলেন—

"হরির কীর্ত্তনে মহাপাতকক
যিমতে করে নির্বাণ।
আন প্রায়শ্চিত্ত পবিত্র করিবে
নোবারে তার সমান॥"

গয়াপাণি ওরফে রামদাস ইতিপূর্ব্বেই শঙ্করের শরণাগত হইয়াছিল। রামদাস স্বীয় শ্যালক মাধবকে শঙ্কর সমীপে লইয়া গেল। শঙ্কর-মাধবের মধ্যে ঘোর তর্ক উপস্থিত। শাস্ত্রালাপে মাধব পরাজিত হইয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন;—দুইটী পার্ব্বতীয় নদ সম্মিলিত হইল, আসামদেশ তাহাদের প্রবাহে প্লাবিত হইয়া গেল। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"দুয়োজন এক থান ভৈল যি দিনত।
সেহি ধরি দুইরো মহা আনন্দ মনত॥ ২৮৫।
গগনমণ্ডল ছোবে কীর্ত্তনর ধ্বনি।
আনন্দসাগরে লোকে মজে তাক শুনি॥ ২৮৬।
আনন্দর সীমা নাই প্রেম উপজিল।
কীর্ত্তনসুখত মন সবারো মজিল॥ ২৯৫।

প্রচার আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনের বেগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। মহাপুরুষ গাইলেন—

"হরিমাত্র সত্য চৈতন্য ঈশ্বর
পরম তত্ত্ব নির্ণয়।"—নামঘোষা ২০৫।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অসমদেশ এই সময়ে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল শৈব ও শাক্ত ব্রাহ্মণগণ দেখিতে পাইলেন যে তাহাদের প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে; বিশেষতঃ শঙ্কর মাধব কায়স্থ সন্তান বলিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষবহ্নি সহস্রশিখায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মহাপুরুষদিগের পাষণ্ডমর্দ্দন আরম্ভ হইল। তাঁহারা উপদেশ দিতে লাগিলেন—

কলির ধর্ম্ম হরিনাম জান।
পাপীর নিন্দাত নিদিবা কাণ॥ কীর্ত্তনঘোষা ৭।
স্ত্রীমদ্যমাংস সেবার কথা।
কৈ মরে করে জন্ম বৃথা॥
নুবুজে বেদ অভিপ্রায় গূঢ়।
কর্মক করিবে না জানে মূঢ়॥ কীর্ত্তনঘোষা ৯৪।
তীর্থবুলি করে জলত শুদ্ধি।
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি॥
বৈষ্ণবত নাই ইসব মতি।
গরুতো অধম কৃষ্ণ বদতি॥ কীর্ত্তনঘোষা ১৩৩।

কলিত হরির কীর্ত্তন বিনাই
আরর নাহিক দুজো॥ নামঘোষা ৩৯৯।
চৈতন্য কৃষ্ণক এড়ি জড়ক ভজিয়া মরে
কিনো লোক অধম মুগুধ॥ নামঘোষা ৪৭।
সকলনিগমলতা তার অবিনাশি ফল
কৃষ্ণ নাম চৈতন্য স্বরূপ।
সুমধুর সুমঙ্গল শ্রদ্ধায়ে হেলায়ে লৈ
নর মাত্র তরে ভবকূপ॥ নামঘোষা ৮।

এইরূপে লোকশিক্ষা আরম্ভ হইল। কিন্তু হায়! "এই যে সংসারধাম নহে নিরাপদ স্থান।" যখনই যে মহাত্মা লোকশিক্ষার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনই তাহাকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। সক্রেটিশকে হেমলক রস পান করিয়া মরিতে হইয়াছিল। মহম্মদ প্রাণের ভয়ে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষ্ঠুরতার অবতার হেরড বেথেলহামের সমস্ত শিশু হত্যা করিল; অবশেষে

পাইলেটের বিচারে যিশুর প্রাণদণ্ড—ভীষণ পাশব অত্যাচারে তাঁহার ভবলীলা অবসান হইল। ষোড়শ শতাব্দীর Huguenotদিগের হত্যাব্যাপার মনে হইলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। Latimer ও Ridleyকে জীবন্ত দগ্ধীভূত করা হইল। গৌর নিতাই রূপসনাতনের জ্বালাযন্ত্রণার ইতিহাস বোধহয় কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। এইরূপে আমাদের শঙ্করমাধবকেও অনেক অত্যচার সহ্য করিতে হইয়াছে।

রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইল।—

অহোম রজাত লাগাইলেক বিপ্রলোক!
শূদ্র একগোটা নাম শঙ্কর আছয়।
শ্রাদ্ধবিধি (ত) করিবাক লোকক না দেয়।
পাষণ্ড আচারে দেশ নষ্ট করিলেক।
নিরন্তরে লোকে ধর্ম কর্ম এড়িলেন।
হেন শুনি রাজা শঙ্করক আনাইলেক।"
দৈত্যারি ৪২৯

বিচার হইল। বিচারে শঙ্কর নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন। শঙ্কর রক্ষা পাইলেন। ব্রাহ্মণগণ "লাজ হয়া সমস্তে গৃহলাগি গৈল।" দৈত্যারি—৪৩৬।

অহোমের দৌরাত্ম্য পুনরায় আরম্ভ হইল। প্রধানতঃ ভূঞাদিগের উপরেই রাজার কোপদৃষ্টি। শিষ্যগণসহ শঙ্কর পলায়ন করিলেন। বরদোরা ছাড়িয়া ধুঞাহাটায় আসিয়াও শঙ্কর নিরুপদ্রবে থাকিতে পারিলেন না। "এদিন রজাই গরবান্ধি হাতি ধরিবলৈ দিয়াত শঙ্করর লগর ভকত সকলকো হাতি বেরিবলৈ দিলে। হাতি ভকতর ফালেই পলাল। সেই জগরতে ভকতবিলাকক ধরিবলৈ কলে।" (আসাম-বুরঞ্জী ১১২ পৃঃ)। মাধব ও শঙ্করের জামাতা হরি ধৃত হইলেন। অহোম মাধবকে প্রাণে ছাড়িয়া দিল। শঙ্করের জামাতা অহোমের খড়্গে ছিন্নশীর্ষ। প্রবাদ আছে যে তাহার "কাটামুড়ে তিনবার রাম বুলিলেক।" (ইত্যারি—৪২৫)।

অতঃপর শঙ্কর ধুঞাহাটা ছাড়িয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে বড়পেটায় উপস্থিত। মাধব কর্ত্তৃক বড়পেটায় "সত্র" বা ভজনালয় স্থাপিত হইল। কালক্রমে বড়পেটা মহাপুরুষীয়াদের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল।

শঙ্করমাধব যখন বড়পেটায় (থ) আসিলেন তখন রাজবংশী দ্বিতীয় রাজা বিশ্বসিংহাত্মজ (দ) নরনারায়ণ কোচবিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ়। নরনারায়ণ বড় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। অহোম রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করেন। নরনারায়ণ বড় বিদ্যোৎসাহী ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ; অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ কামরূপী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া যথার্থ বিদ্যোৎসাহিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারই সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ১৪৯০ শকে (খ্রীঃ অঃ ১৫৬৮)

(ত) মহাপুরুষীয়াদের মধ্যে শ্রাদ্ধবিধি নাই। আচার ব্যবহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে ইহারা নব্য যুগের ব্রাহ্মদিগের সহিত তুলিত হইতে পারে। উভয়েই সংস্কারপন্থী।

(থ) বড়পেটা কামরূপান্তর্গত—কোচরাজ নরনারায়ণের রাজ্যভুক্ত ছিল।

(দ) পণ্ডিত রাম সরস্বতী বলেন, নরনারায়ণ বিশ্বসিংহের দৌহিত্র। তিনি আরও বলেন বিশ্বসিংহ হীরার গর্ভে হরিদাস নামক জনৈক লোকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। রামসরস্বতী নরনারায়ণের সভা পণ্ডিত ছিলেন।
—বিশ্বকোষ—কামরূপ—৫২৪ পৃঃ।

“প্রয়োগরত্নমালা” নামক ব্যাকরণ রচনা করেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্রগুলি ভাঙ্গিয়া সরল ও সুবোধ্যছন্দে গ্রথিত করিয়া বিদ্যাবাগীশ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ৺কামাখ্যা মা’র বর্ত্তমান মন্দির রাজা নরনারায়ণই নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহাঁর ও তদীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজ ওরফে চিলাবায়ের প্রতিমূর্ত্তি ৺মা’র মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে।

আর একটী কথা এস্থানে বলিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই নরনারায়ণ রাজার আমলেই কালাপাহাড় বা “রাজু” এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। ত্যক্তপিতৃধর্ম্ম তেজোদৃপ্ত রাজু কামাখ্যা ও হাজোর মন্দির নষ্ট করিল; পরে নরনারায়ণের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিল। শক ১৪৭৫—১৫৫৩ খ্রীঃ অঃ,। কিন্তু বিশ্বকোষ মতে ১৫৬৪ বা ১৫৬৬ খ্রীঃ অঃ। রাজুর প্রতিগমনের পরেই নরনারায়ণ ৺মা’র মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। দেখা যাইতেছে যে শঙ্করদেবের সমকালেই এই রাজুর আক্রমণ। (ধ)।

রাজা নরনারায়ণ ঘোর শাক্ত ছিলেন। সুবিধা বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণ পুনরায় রাজবংশি-বংশাবতংসের নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

“রাজার আগত খল দিলে বিপ্রলোক॥
সমস্তে রাজ্যক নষ্ট করিল শঙ্কর।
শূদ্র হুবা নমস্কার লবে ব্রাহ্মণর॥
কৈবর্ত্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত।
একলগে খায় দুধ চিড়া ফল যত॥ দৈত্যারি ৭৫১।

রাজার ভয়ঙ্কর ক্রোধ হইল। তিনি আপন-রাজ্য নিঃশঙ্কর করিতে সংকল্প করিলেন। সশিষ্য শঙ্কর ধৃত হইয়া রাজসভায় আনীত হইলেন। বিচার হইল, শাস্ত্রালাপ হইল। ব্রাহ্মণগণ বিচারে শঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। শঙ্কর বলিলেন, “ব্রাহ্মণক হিংসা করে কোন নো পামরে?” ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা শঙ্করের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শঙ্কর তাহাতে নারাজ। শঙ্কর কখনও নৃপনারী-ব্রাহ্মণের গুরু হ’ন নাই।

ইহার অল্পদিন পরেই ১৪৯০ শকে ১২০ বৎসর বয়সে কোচবিহারান্তর্গত ‘কাকতকাটায়’ শঙ্করদেব ভবলীলা শেষ করিয়া স্বাধিষ্ঠানে চলিয়াগেলেন। (ন)

মৃত্যুর সময়ে শঙ্কর পুত্র রামানন্দকে বলিয়া গেলেন—

আরো এক বাত কহওঁ তোমাত
মোর গুণগণ যত।
বল পরাক্রম শক্তি ভক্তি পন্থ
সবে আছে মাধবত।

(ধ) কালাপাহাড় কামরূপে “পোড়াকুঠার” “পোড়াসুঠার” “কালাসুঠান” বা “কালযবন” নামেও পরিচিত।

(ন) “Sankar Deva is said to have been born in 1449 (Sak 1371), and to have died in 1569 (Sak 1491). There is evidence that he lived in the reign of Narnarayan (Koch King) 1528-1584, and of the Ahom King Chuhamung *alias* Swarganarayan, 1497-1539; but the exact dates of his birth and death cannot be verified”=E. A. Gait. —Sensus Report of Assam, 1891, Vol, I. p. 80, footnote.

Gait সাহেব জানেন না, কিন্তু শঙ্করের মৃত্যুর সনের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মাধবের লগে পীরিতি করিবা
করিয়া অতি আহ্লাদ।
যুগুতি বচন পুছিবাহা তান্ত
ন করিবা তাঙ্ক বাদ॥
তান মোর কিছু নাহি কৈ অন্তর
জানিবা নিশ্চয় করি।
মাধব আমার পরম বান্ধব
মোর প্রাণে এড়ে সরি॥
তান্ত হতে জীব বিস্তর তরিব
ভক্তির হইব আচার্য্য।
মই চলি যাওঁ তাহান্তে লাগিল
ইঠাবর যত কার্য্য॥ ইত্যাদি ৯৩০-৯৩২।

রামানন্দ কখনও পিতার এই উপদেশের অন্যথাচরণ করেন নাই। শঙ্করের পরে মাধবই—“ভক্তির আচার্য্য” হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীতারাপ্রসন্ন রায়।

উদারনীতি ও রক্ষণশীলতা।

উদারনীতি ও রক্ষণশীলতা—বলিলেই আমরা উভয়কে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া মনেকরি;—যেন একটির সহিত অন্যটির কিছুতেই সামঞ্জস্য হইতে পারে না। দুইটিতে সাধারণতঃ আমাদের মনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের দুইটি চিত্র অঙ্কিত হইয়া উঠে। একটিতে, তরুণ যুবকের আশারঞ্জিত, প্রসন্ন- তেজস্বিতাপূর্ণ মুখশ্রী; অন্যটিতে, পলিতকেশ, কুঞ্চিতভ্রূ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখচ্ছবি সহজেই আমাদের হৃদয় অধিকার করে। একজন, স্বাবলম্বনের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসে, বিঘ্নবিপত্তি পদদলিত করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে, নবীন যোদ্ধার ন্যায় অগ্রসর হইতেছে; অন্যজন বিচক্ষণ, সাবধান ও কূটবুদ্ধি সেনাপতি; যেন চতুর্দ্দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় সন্তর্পণে, পদবিক্ষেপ করিতেছে। একজন মনুষ্য চরিত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানবের শৃঙ্খল ও বন্ধন মোচন করিয়া দিতেছে, অন্যজন মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতাগুলি পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়া তাহার বন্ধন গুলিকে কবচ বোধে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় রক্ষা করিতেছে।

ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু পণ্ডিতগণ উহাদের মধ্যে এতদূর পার্থক্য স্বীকার করেন না। আধুনিক ইউরোপীয় রাজনৈতিকগণ রক্ষণশীল হইলেই যে তাঁহাকে প্রত্যেক প্রস্তাবিত সংস্কারের প্রতি খড়্গহস্ত হইতে হইবে, অথবা উদারনৈতিক হইলেই যে তাঁহাকে প্রচলিত রীতিনীতির আমূল উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইতে হইবে,—এরূপ মনে করেন না। সমাজের রক্ষা ও উন্নতি উভয়েরই উদ্দেশ্য। সুতরাং ধীর ভবে বিবেচনা না করিয়া কোন দলই নূতন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন না।

কোন্‌টি শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, কোনটির দ্বারা এপর্য্যন্ত জগতের অধিক কল্যাণ সাধন হইয়াছে,—তাহাই স্থির করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট মতভেদের সম্ভাবনা। উদার-নৈতিকেরা যে সকল সংস্কারগুলিকে তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া ঘোষণা করেন, রক্ষণশীলগণ তাহার অধিকাংশগুলিই অসতর্কতা ও অদূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমেরিকায় উদরনৈতিক বল প্রবল; তথায় স্ত্রীলোকে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করেন পৃথিবীর আর কোনও জাতি ততদূর স্বাধীনতা স্ত্রীলোকদের অধিকার অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না। অধুনা বিলাতে স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে; স্ত্রীলোকগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিবার

প্রস্তাবও হইতেছে। আন্দোলনকারীগণ তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিতেছেন, যে স্ত্রী স্বাধীনতাই আমেরিকার শ্রীবৃদ্ধির কারণ। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের নেতাগণ অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতাই আমেরিকার পারিবারিক জীবনে অশান্তি প্রভৃত নানা অমঙ্গলোৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস—যে, সমাজ অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্যদিয়া আপনার অস্তিত্ব লইয়া দাঁড়াইয়াছে—শতশত বৎসরের বিদ্রোহ বিপ্লব অতিক্রম করিয়া আপনার স্বাধীন পথে সে চলিয়া আসিয়াছে—সহসা সংস্কারের আঘাত তাহাকে বিকলাঙ্গ করিতে পারে। সেইজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার করিবার পূর্ব্বেও তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে গভীর চিন্তার প্রয়োজন। আপাততঃ দৃষ্টে যাহা আশুপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে পরিণামে তাহা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইতে পারে ইহাই রক্ষণশীলের প্রধান যুক্তি। বস্তুতঃই সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বড়ই জটিল এবং মনুষ্যের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলেও, ভ্রমশূন্য নয়। উদারনৈতিকেরা হয়ত উচ্চ আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যতঃ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সেই জন্য, অনেক সময়ে, দেখাযায় যে সংস্কারকেরা যে মহৎ উদ্দেশ্যে উন্নত ও মঙ্গলকর বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কালক্রমে, অযথা অপব্যবহারে, সেগুলি নিতান্ত পঙ্গু হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে এখনও সম্মিলিত পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে। মনে করুন এই প্রথার দুএকটি অপব্যবহার লক্ষ্যকরিয়া যৌথ সমাজ ভঙ্গ করা হইল। যাঁহারা সামাজিক শাসনে বা লোকনিন্দার ভয়ে অক্ষম ভ্রাতা ও আশ্রিত স্বজনকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন, তাঁহারা তথাকথিত স্বাবলম্বননীতির ছদ্মবেশে অসমর্থ ভ্রাতাদিগকে পৃথক্ করিয়া তাঁহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া সমাজের মঙ্গল দূরে থাক,—অশান্তির সৃষ্টি করিয়া ফেলিবেন। স্বাবলম্বন অপেক্ষা মনুষ্যের আর কিছুই শ্লাঘ্য বস্তু নাই সত্য, কিন্তু দেখা যায় যে একমাত্র স্বাবলম্বনে সকল লোক স্বস্ব অভাব সম্পূর্ণরূপে মোচন করিতে পারেন না। সংস্কারকেরা যে মহৎ উদ্দেশ্য বশতঃ যৌথ সমাজের উচ্ছেদ করিলেন, সেই সংস্কার অভীষ্টপ্রসূ হইল না। হয়ত যৌথ সমাজের সামান্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইহার দোষগুলি বহুল পরিমাণে সংশোধিত করা যাইতে পারিত। এস্থলে বলিয়া রাখি যে যৌথপ্রথার দোষগুলি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতেছি না—প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিলাম মাত্র।

রক্ষণশীলতার অপব্যবহার হইলেই উদারনীতি রাজ্য মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। এবং মানব স্বভাবতঃ রক্ষণশীল বলিয়া, সে যতদূর সম্ভব তাহার পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অভিলাষ করে। বস্তুতঃ সমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোকেই পরিবর্ত্তন প্রিয়। সমাজে নূতন সংস্কার অকস্মাৎ প্রবেশ করাইতে কেহই ইচ্ছুক নয়। তবে, যখন রক্ষণশীলতা জাতীয় উন্নতির সহায়তা না করিয়া তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; যখন রক্ষণশীলতা রক্ষণে অসমর্থ,—তখনই দেশে উদারনীতির প্রভাব বিস্তার হয়। ইতিহাস এই সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের দুইটি প্রধান শাখা—ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ সম্প্রদায়কে স্থূলভাবে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, যে প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ মত প্রচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ক্যাথলিক সমাজের নেতাগণ কিরূপ নীতিহীন ও ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্যাথলিক্ জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগুরু পোপগণ তখন ঘোরতর বিলাসে ও বিষয়ভোগে মগ্ন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের সহিত বাহ্যিক সম্পর্ক ভিন্ন হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল না। ক্যাথলিক যাজকসম্প্রদায় স্বেচ্ছাচার বিক্রয় করিয়া মহাপাপীকেও পাপ হইতে অব্যাহতি দিতে ছিলেন! এই সময়ে, ইউরোপের সর্ব্বত্র ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের উপর স্বতঃই অশ্রদ্ধা অভক্তি আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রচলিত সমাজে বা ধর্ম্মে লোকের আস্থা শিথিল হইয়া আসিলেই, তাহারা প্রায় পরিবর্ত্তন সাদরে গ্রহণ করে, সেইজন্য মার্টিন লুথরের প্রবর্ত্তিত

ধর্ম্ম অতি অল্পকাল মধ্যে অধিকাংশ নরনারীর হৃদয় জয় করিয়াছিল। রোমে যখন প্রথম খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন রোমের দেবতাগণ পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিভরে পূজিত হইতেন না। রোমে তখন বিলাসের পঙ্কিল স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছিল।

ভারতবর্ষে মহাত্মা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে শিশুনিক্ষেপ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি নানা সঙ্কীর্ণতার বিষময় পরিণামে পবিত্র হিন্দুসমাজ যে অধঃপতনের গভীরতম কূপে পতিত হইয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়ে রক্ষণশীলভাব এতদূর প্রবল যে অধিকাংশ সংস্কারকেরা তাঁহাদের অভিনব ভাবকে রক্ষণানুকূল বলিয়াই পরিচিত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন, এবং মার্টিন লুথারও প্রটেষ্ট্যাণ্টবাদকেওএই রক্ষণশীল শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হন।

এইভাবে দেখা যাইতেছে যে সমাজে অধিকাংশ লোকেই রক্ষণশীল বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষ করেন,—কেন না রক্ষণশীলতা উদারনীতির বিরোধী নয়। সমাজকে উন্নত করিতে হইলে সাধারণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে হইবে। সমাজের নেতা জনসাধারণের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইবেন। জনসাধারণের সহানুভূতি ভিন্ন কোন সংস্কারই চিরস্থায়ী হয় না। যে সংস্কার রক্ষণশীল ভাবের যত অনুকূল প্রমাণ করিতে পারা যাইবে, ততদূর পরিমাণে তাহার সিদ্ধির সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক সংস্কারে এই বাক্যের সত্যতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করি।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যখন দেশের রক্ষণশীলতার কালোপযোগী গ্রহণশীল শক্তি হ্রাস হইতে হইতে একেবারে লোপ পাইয়া যায়,; এবং তাহা পুরুষানুক্রমিক প্রচলিত চলচ্ছক্তিবিহীন রীতিনীতির সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন উপেক্ষা করে, তখন উদারনীতি জনসাধারণ সমক্ষে সমাজের দুরবস্থা প্রকটিত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। রক্ষণশীলেরা ভাবেন, যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যদি প্রাচীনকালে কোন নিয়মানুসারে নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আধুনিক কালেও সেই নিয়ম কার্য্যকরী হইবেনা কেন? তাঁহারা স্মরণ রাখেন না যে পৃথিবীতে খুব অল্প নিয়মই সকল সময়ে, সকল সমাজের লোকের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে। কালভেদে সমাজের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়। বৈদিককালে জাতিভেদ প্রথায় ভারতের যেরূপ উপকার হইয়াছিল, অধুনা সেরূপ হইতেছে না। রক্ষণশীলগণ এই নিয়ম অবগত হইলেও কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপ্লবের সহায়ে সুব্যবস্থা লইতে পশ্চাৎপদ হন। কিন্তু উদারনীতি রক্ষণশীলতা অপেক্ষা অধিক সাহসী; ইহার যুক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস সুতরাং নানা কুসংস্কারের মূলে উদারনীতি নির্ভীকভাবে কুঠারাঘাত করিয়াছে;—উদারনীতিদ্বারা দাসত্বপ্রথা দূরীভূত হইয়াছে;—উদারনীতিদ্বারা, বিপরীত মতবিন্যাসের প্রতি জগতে শ্রদ্ধার (toleration) সৃষ্টি হইয়াছে; বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা ও অত্যাচার উদারনীতি প্রশমিত করিয়াছে, উদারনীতিদ্বারা বিজ্ঞানের এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছে। গ্যালিলিও যখন পৃথিবী গতিশীল এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তখন তিনি বাইবেলের মতবিরুদ্ধ সত্য প্রচারের জন্য যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত হইয়াছিলেন। অদূরদর্শী রক্ষণশীলেরা মধ্যে মধ্যে সত্যের অপলাপ করিয়া লোকের নিকট ঘৃণিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সত্যের সঙ্গোপনে সমাজের কল্যাণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

উদারনীতি শিক্ষার ফল। দুঃখের বিষয় কল্পনার উপর ইহার যতদূর প্রভাব কার্য্যতঃ ইহার প্রয়োগ ততদূর দেখাযায় না। আজ ইয়োরোপ ও আমেরিকা তূর্য্যনিনাদে যে উদারনীতির জয় ঘোষণা করিতেছে বাস্তবিক কি সেই উদারনীতির অনুশাসনগুলি ছত্রে ছত্রে সেখানে প্রতিপালিত? ইউরোপ যদি উদারনীতি অবলম্বন করিয়া থাকে তবে কৃষ্ণকায়ের প্রতি এত ঘৃণা কেন? তবে রুশিয়া অন্যায়পূর্ব্বক চীনসাম্রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করে কেন?

ইউরোপ আফ্রিকার প্রতি অনেক দিন কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন, এখনো আসিয়ার দুএকটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতি তাহারা লোলুপ দৃষ্টি কেন? সে যাহাই হউক, উদারনীতি না থাকিলে রক্ষণশীল হওয়া যায় না এবং রক্ষণশীল না হইলে উদারনৈতিক হওয়া যায় না। এই দুইটির ন্যূনতা ও আধিক্যের হেতু নামের পরিবর্ত্তন হয়। যেমন কোন জড়পদার্থে দুটি তড়িতের মধ্যে একটির প্রাধান্য থাকিলে, পদার্থ টি সেই প্রধান তড়িত অনুযায়ী নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ সমাজেও রক্ষণশীলতা ও উদারনীতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে মানব রক্ষণশীল বা উদারনৈতিক পদবাচ্য হন।

স্থূলভাবে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। উভয়েরই যথেষ্ট উপকারিতা আছে, উভয়েরই সমাজের কল্যাণসাধন মুখ্য ব্রত। সুন্দরভাবে চালিত হইলে উভয়ের দ্বারাই দেশের প্রভুত হিতসাধন হয়। এবং অসতর্কতা ও বুদ্ধিহীনতায় উভয়ে তুল্যরূপে দেশের অনিষ্ট করে।

ইতিহাসে প্রায় দেখা যায় যে উদারনীতি উদীয়মান জাতি দ্বারা গৃহীত হইলে এবং রক্ষণনীতি, সমৃদ্ধিশালী জাতির দ্বারা গৃহীত হইলেই রাজ্যের মঙ্গল হয়। উদাহরণ স্থলে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জাপানের কথা বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের ক্ষমতা ব্লেনহিমের যুদ্ধের পর হইতে বর্দ্ধিত হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধের কিছু পর হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত উদরনৈতিকদের প্রতাপ অক্ষুন্ন ছিল। গ্রীকজাতি উদারনীতি বশতঃ উন্নতি লাভ করিয়াছিল কিন্তু সমৃদ্ধিশালী হইয়াও রক্ষণশীল হইতে না শিখায় গ্রীক-সাম্রাজ্য শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া গেল। জগতের ইতিহাসের দিকে চাহিলে দেখিতে পাই যে দুইটিশক্তি সমাজ গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে এবং আবশ্যক মত পরস্পর সাহায্য করিয়া সমাজকে মঙ্গলের পথে চালিত করিয়া আসিতেছে। যখন রক্ষণনীতির গ্লানি" হইয়াছে তখনই ভগবান বুদ্ধের ন্যায় উদরনৈতিকের আবির্ভাব হইয়াছিল আবার যখন উদারনীতির হানিকর আতিশয্য ঘটিয়াছে তখন শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষ তুলাদণ্ড সমান রাখিবার জন্য উদয় হইয়াছেন। আশা করি বর্ত্তমানসময়ে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীর সহযোগে আমাদের জাতীয় জীবনও পুষ্টিলাভ করিবে।

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কল্পনা।

কল্পনা দাঁড়াও আসি' সম্মুখে আমার
ত্রিভুবন আলো করি',—জুড়াক জীবন
হেরি' তব নগ্ন মধুরিমা। চাহিনা তোমার
হেরিতে কটাক্ষে পূর্ণ চপল নয়ন,—
দেখি সুধু ও আঁখির প্রশান্ত, সুস্থির,
স্নেহপূর্ণ কোমল চাহনি। ও তোমার
লালসা মাখান ওষ্ঠে, চঞ্চল হাসির
লুকাচুরি খেলায়ো না; স্নিগ্ধ স্নেহধার
ঢালিয়া দেখাও তব প্রফুল্ল অধরে,—
মুছে ফেল কপোলের চুম্বনের রেখা।
খদ্যোতের হার পরি' কুন্তলের 'পরে
কানন বালিকা বেশে দিয়ে যাও দেখা।
ফেলে দাও অলঙ্কার,—ফেল পেশোয়াজ;—
পরে এস নীলাম্বর, কুসুমের সাজ।

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন।

লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণের জাপান-চিত্র।

(ফরাসী হইতে)

৩

এইবার বৌদ্ধধর্ম্মের কথা বলি। আধুনিক বিজ্ঞান ও হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রত্যক্ষবাদের ন্যায়, বৌদ্ধধর্ম্মও এই কথা বলে যে, নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল, দৃশ্যমান ব্যাপারসমূহের সমষ্টিই এই জগৎ। পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ, সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ, শুধু আমাদের চৈতন্যের অবস্থা বিশেষের মধ্যে অবস্থিত; এই সমস্ত পদার্থ কতকগুলা ক্ষণস্থায়ী প্রতীতি মাত্র; জন্মমরণের রহস্যময় সমুদ্রের উপর, সাগর তরঙ্গের ন্যায়, কতকগুলি প্রতীতির পশ্চাতে আর কতকগুলি প্রতীতি নিয়ত চলিয়াছে।—যে সকল শব্দের দ্বারা দার্শনিক Huxley, ক্রমোৎপত্তিবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল শব্দের দ্বারাই বৌদ্ধদর্শনগত মুল-ভাবের বেশ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই জগতে কতকগুলা ক্ষণস্থায়ী আকার ভিন্ন আর কিছুই নাই; জাগতিক পদার্থের খণ্ডাংশ সকল, ক্রমাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া ক্রমাগত চলিয়াছে; শক্তি হইতে ক্রিয়ার আকারে আসিয়া, উহারা সমস্ত বৈচিত্র্য—জড়ের বৈচিত্র্য, জীবনের বৈচিত্র্য, চিন্তার বৈচিত্র্য,—নিয়ত প্রকাশ করে; তাহার পর, আবার সেই অনির্দ্দেশ্য শক্তির মধ্যে গিয়া পড়ে—যেখান হইতে সমস্তই নিঃসৃত হয়; হক্স্‌লি বলেন;—"জগতের যে লক্ষণটি খুব স্পষ্টরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ পায়, তাহা ঠিক্ বৌদ্ধধর্ম্মের বীজসূত্রটির অনুযায়ী—অর্থাৎ জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব"।—বাহ্য জগৎ শুধু একটা চলন্ত মেঘ, একটা মরীচিকা, উপছায়া-সঙ্কুল একটা স্বপ্নমাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন একদিকে জগতের একত্ব ও অস্থায়িত্ব প্রতিপাদন করে, তেমনি আবার অন্যদিকে অহং-এর বহুত্ব ও অস্থায়িত্ব ঘোষণা করিয়া থাকে। যেমন বহু কোষাণুর দ্বারা শরীর—সেইরূপ বহু মনের দ্বারা মন গঠিত হয়; আত্মচৈতন্যের অবস্থা-সমূহের সমষ্টিই—'আমি';—উহা দৈহিক-চেষ্টার উপর নির্ভর করে। যে পরমাণুসঙ্ঘের সমষ্টিকে বহির্জগৎ বলে সে যেমন অস্থায়ী ও অবাস্তব, এই আমিরূপ সমষ্টিটিও সেইরূপ অস্থায়ী ও অবাস্তব। 'আমি'—কর্ম্মসৃষ্ট, অথবা কর্ম্মই 'আমি': উহা মায়া হইতে অথবা মায়াতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন; এই আত্মা অনাত্মারই ন্যায় মায়াময়; এবং আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে যে প্রভেদ—তাহাও মায়াময়।

স্পেন্সারের এই মূলসূত্রগুলির দ্বারা, বৌদ্ধধর্ম্মের মতটি বিষদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে:—"সমস্ত ভাব, সমস্ত চিন্তাই ক্ষণস্থায়ী; এইরূপ ভাব ও চিন্তাসমূহে যে জীবন সংগঠিত সেই জীবনও ক্ষণস্থায়ী; যে সকল পদার্থের মধ্যে এই জীবন অতিবাহিত হয়, সেই সকল পদার্থ ততটা ক্ষণস্থায়ী না হইলেও, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিনষ্ট হয়: এইরূপে আমরা অবগত হই, এই

সকল পরিবর্ত্তনশীল আকারের পশ্চাতে যে অজ্ঞেয় বাস্তবতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই একমাত্র নিত্য বস্তু।"

বংশপরম্পরাক্রমে মানসিক গুণসমূহ সংক্রামিত হয়,—এই যে আধুনিক তত্ত্ব, ইহারই অনুরূপ প্রাচীন তত্ত্ব—বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বজন্মবাদ। জাপানী জাতির সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত ভাবের মধ্যে এই বিশ্বাসটি অনুপ্রবিষ্ট; তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, তাহাদের সমস্ত কার্য্য, এই বিশ্বাসের দ্বারা উপরঞ্জিত। সকলের মুখেই 'ইঙ্গুয়া'—এই কথাটি প্রায়ই শোনা যায়—অর্থাৎ বর্ত্তমান জীবনের উপরে পূর্ব্বজন্মের প্রভাব—এক কথায় 'কর্ম্মফল'। ইহা পিথ্যাগোরাসের যোনিভ্রমণ নহে; বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করিলেও, প্রত্যেক আত্মার চিরস্থায়ী ব্যক্তিত্বও স্বীকার করে না, ব্যক্তিগত যোনিভ্রমণও স্বীকার করে না। অতীতের প্রভাবে আত্মা উৎপন্ন হয় না, পরন্তু আত্মা যে সকল ব্যাপার লইয়া গঠিত, সেই সকল ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া থাকে; পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কর্ম্ম ও চিন্তাসকল হইতে উহারা সমুদ্ভুত হয়,—নিগূঢ় আকর্ষণ-সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া উহারা পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। আমাদের পূর্ব্বে অসংখ্য মৃতব্যক্তির যে সকল ইন্দ্রিয়বোধ ছিল, যে সকল ধারণা ছিল, যে সকল বাসনা ছিল, তাহাদেরই পুনর্ব্বার যোগাযোগ হইয়া ও সেই সকল ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া, আমাদের চিন্তা, আমাদের কামনা সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। "অসংখ্য পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের উৎপাদনী চিন্তার কেন্দ্রীভূত সমষ্টিই আত্মা।" বর্ত্তমানের উপরে অতীতের এই প্রভাব—যাহা পাশ্চাত্য দর্শনসমূহ বহুকাল স্বীকার করে নাই—একণে আধুনিক বিজ্ঞান তাহা আবিষ্কার করিয়াছে। Spencer "বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায়, অতীতের আত্মতত্ত্ব-ঘটিত অভিজ্ঞতার দ্বারা, বর্ত্তমানের আত্মতত্ত্বঘটিত সমস্ত প্রহেলিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" আমাদের জ্ঞানের উপর, ভাবের উপর, কামনার উপর, সংস্কারের উপর, কৌলিকতার (Heredity) কিরূপ প্রভাব তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। আত্মা ব্যক্তিগতভাবে এক ও অভিন্ন এই যে প্রাচীন সিদ্ধান্ত—ইহার দ্বারা আত্মতত্ত্বঘটিত অনেক ব্যাপারই আমাদের বোধগম্য হয় না, সেই সকল ব্যাপার শুধু কৌলিক-গুণসংক্রমণ-নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সেই সকল ব্যাপার যথাঃ—শিশুরা কোন কোন মুখ দেখিয়া কাঁদিয়া ওঠে, কোন কোন মুখ দেখিয়া হাসে;—শিশুর এই প্রকার মনের আবেগ; অপরিচিত লোককে দেখিয়া প্রথমেই আমাদের মনে যে ভাব হয় যেমন—অহেতুক অনুরাগ ও অহেতুক বিদ্বেষ; কোন কোন রং-এর দর্শনে এবং কোন কোন গন্ধের আঘ্রাণে আমাদের যে সুখ হয়; কোন কোন কণ্ঠস্বরের মোহিনীশক্তি; সহানুভূতি, বিষাদ, অনুকম্পা এই সমস্ত ভাবের যতপ্রকার সূক্ষ্মভেদ আছে তাহা আমরা স্বতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি; যে স্থান বাস্তবিক কখন দেখি নাই, সেই স্থান যেন দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়; কোন কোন ভূদৃশ্য আমাদের মনে যে দুরপনেয় বিষাদের উদ্রেক করে, ইত্যাদি… আমাদের হৃদয়ের যে সকল ভাব খুব গভীর, খুব জলন্ত, খুব মহান্—সে সমস্ত ভাব অতীব

ব্যক্তিগত। তাহার দৃষ্টান্ত, প্রথম-অনুরাগ;—কাহাকে দেখিবামাত্র যুবজনের মনে যে ভালবাসার সঞ্চার হয়। তাহার সহিত কোন পরিচয় নাই, অথচ মনে হইতেছে তাহাকে না পাইলে সে কখনই সুখী হইতে পারিবে না; মনে হয়; এইরূপ ভালবাসা স্বত-উৎপন্ন ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ; যাহাদের এইরূপ হঠাৎ ভালবাসা হয়, তাহারা যেন কোন গূঢ় রহস্যময় স্মৃতির দুর্জ্ঞেয় প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ভালবাসে; ইহার জন্য মৃতেরাই দায়ী, জীবিতেরা দায়ী নহে; যে রমণীকে আমি এখন ভালবাসি—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল রমণীকে পূর্ব্বে ভালবাসিয়াছিলেন তাহাদেরই সমস্ত সৌন্দর্য্য ঐ রমণীতে বর্ত্তাইয়াছে। অতএব, আধুনিক আত্মতত্ত্ববিদ্যা যেরূপে প্রেমের ব্যাখ্যা করে, তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যার কতকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মবলে,—পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেম, আবার দেহের মধ্যে বদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করে। অবশ্য, এভোলিউসনবাদের সহিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অনেক গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ আছে; বৌদ্ধদিগের মতে, বর্ত্তমানের উপর অতীতের প্রভাব,—দৈহিক উত্তরাধিকারের দিক্ দিয়া প্রকটিত হয় না;—কর্ম্ম শুধু পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হয় না। ঐ দুই সিদ্ধান্তের উপর, ঊর্দ্ধ হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বেশ বলা যাইতে পারে যে, আত্মতত্ত্বঘটিত কৌলিক গুণসংক্রমণ-নিয়মের উপরেই বৌদ্ধ মতটি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। কি বৌদ্ধ, কি ইভোলিউসানবাদী—উভয়ের মতেই, মৃতেরা কখন মরে না: উহারা মানবহৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে নিদ্রিত থাকে মাত্র।

অতএব দুই প্রধান বিষয়ে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের মিল দেখা যায়:—জগতের একত্ব, আত্মার বহুত্ব। তাছাড়া,—"আত্মা বহু—এই সুস্পষ্ট বিশ্বাসের রাস্তা দিয়াই আর একটা বৃহত্তর বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায়;—সে বিশ্বাসটি এই:—ব্যক্তিগত বহু আত্মা আসলে এক; সমস্ত জীবন—একটি মাত্র; আসলে সসীমের অস্তিত্ব নাই, কেবল অসীমেরই অস্তিত্ব আছে। যে কল্পনা করে 'আমি আছি'—সেই অন্ধ অহঙ্কার যতক্ষণ না চূর্ণ হইয়া যাইবে, যতক্ষণ না আত্মার ধারণা ও অহঙ্কারের ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হইবে, ততক্ষণ অনন্তরূপ,—প্রকৃত জগৎরূপ গভীর আত্মজ্ঞানে কখনই উপনীত হইতে পারিবে না।"

বৌদ্ধধর্ম্ম যে স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সহিত প্রত্যক্ষবাদের বেশ মিল আছে; বৌদ্ধধর্ম্ম বিজ্ঞানের বিরোধী নহে;—তবে কিনা, উহা বিজ্ঞানকেও অতিক্রম করে; এবং অতিক্রম করিবার উহার অধিকার আছে। সমস্তকে জড়ে পরিণত করিবার চেষ্টায় সুসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞান জড়ের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। এইখানে তত্ত্ববিদ্যা আসিয়া বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করে। বোধ হয়, তত্ত্ববিদ্যাই নিত্যকালের জিনিস, অন্তত উহা আমাদের পক্ষে আবশ্যক। ধর্ম্মের সমস্ত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা যে-ধর্ম্মভাব অনন্তগুণে গভীর, তত্ত্ববিদ্যা সেই ধর্ম্মভাবের সহিত বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমন্বয় করিবার চেষ্টা করে। সিদ্ধান্তরূপে ধর্ম্ম তিরোহিত হইলেও (যাহা খুব সম্ভব) ভাবরূপে ধর্ম্ম টিকিয়া থাকিবে। "জাগতিক রহস্যকে আরও

বাড়াইয়া" বিজ্ঞানই ধর্ম্মভাবের খোরাক যোগাইবে।—যাহাই হউক একথা স্বীকার করিতে হইবে, ইভোলিউসানের দর্শন নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। উৎপত্তির পর লয়; বিকাশের পর বিনাশ; বিকাশের চরম ধাপে উঠিলেই ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়।

যতই আমরা ভালোর জন্য চেষ্টা করি না কেন, কিছুই রক্ষা পায় না; ভাবীকালকে আরও ভাল করিয়া তুলিবার জন্য যতই কষ্ট স্বীকার করিনা কেন—তাহাতেও কোন সান্ত্বনা নাই। সংযোগ বিয়োগের ক্রিয়া নিত্যকাল চলিয়াছে: দুঃখের অসীম চক্র হইতে পলাইবার কোন উপায় নাই।—বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিকাশবাদের হিসাবে, জীবনের কোন অর্থ নাই; বিশ্ববিকাশের কোন নৈতিক মূল্য নাই।—পক্ষান্তরে, আধুনিক বিজ্ঞান, যে সকল তত্ত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, সেই সকল তত্ত্বকে বৌদ্ধধর্ম্ম এমন একটি উচ্চ নীতিবাদে উপনীত করিয়াছে, যে নীতিবাদের প্রতিবাদ করিতে বিজ্ঞান কদাপি সমর্থ হয় না।

বৌদ্ধধর্ম্ম বলেন,—অহং-জ্ঞান যাহা মায়া বই আর কিছুই নহে—সেই অহংজ্ঞানের পরপারে একটি গভীর বাস্তব সত্তা বিদ্যমান; "প্রত্যেক ভূতের মধ্যেই দিব্যসত্তা," মুগা—নো—তৈগা," "অহংত্বহীন বৃহৎ অহং"। প্রত্যেক ভূতের মধ্যে, এই গভীরতর অহং সেই বিশ্বাত্মা, সেই সকল সত্ত্বার অনাদি মূল কারণ,—সেই কর্ম্মজালে আচ্ছন্ন বুদ্ধ যিনি পরে জন্মগ্রহণ করিবেন। আমরা সকলেই "মহা-অসীমরূপ প্রজাপতির পূর্ব্বাবস্থার কোষস্থ কীট"। অহংএর সম্পূর্ণ বিলোপ হইলে তবেই আমাদের অন্তরে দেবত্বের আবির্ভাব হইবে।—কর্ম্মের অবস্থায়, আমাদের ভাব, আমাদের প্রেম, আমাদের দ্বেষ, আমাদের আশা, আমাদের ভয়—এসমস্ত অহং-এরই মায়া—পূর্ব্ববর্ত্তী অসংখ্য জীবনের পরিণাম। কিন্তু আমাদের অন্তরে এরূপ শাশ্বত দিব্য ভাবসমূহ থাকিতে পারে, যাহার সহিত আমাদের মিথ্যা অহং-এর কোন সম্বন্ধ নাই যাহা অসীমের নিজস্ব জিনিস:—তাহা নিঃস্বার্থ ভাব; "বংশ, সূর্য্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইলেও, উচ্চনীতির ভাবসমূহ টিকিয়া থাকে"। স্বচ্ছপাত্রের মধ্যদিয়া যেমন আলোক—সেইরূপ আত্ম-অবভাসের মধ্যদিয়া, নিঃস্বার্থপরতা, অনুকম্পা, বিশুদ্ধ হিতৈষণা দীপ্তি পায়:—এই সকল ভাব মানুষের নহে, পরন্তু মনুষ্যরূপী বুদ্ধের।—এই অবভাসিক আত্মা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে গমন করে এবং ক্রমশঃ বিশোধিত হয়; অসীমের ভাব আসিয়া ব্যক্তিত্বের স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া দেয়, মানুষের অন্তরে ব্রহ্মকে জাগাইয়া দেয়!

কিন্তু এক জন্মেই এইরূপ উন্নতি লাভ করা যায় না, অনেক জন্মের পর—এমন কি, অসংখ্য জন্মের পর এইরূপ উন্নতি লাভ করা যায়। মিথ্যা 'আমি'টি ধ্বংস হইয়া গেলেও, মনের প্রবৃত্তিগুলি থাকিয়া যায় এবং তাহারা আবার একত্র সম্মিলিত হয়: স্থূলপ্রবৃত্তিগুলি চলিয়া গিয়া তাহার স্থানে কতকগুলি সূক্ষ্মতর প্রবৃত্তি আবির্ভূত হয়, কিন্তু সে প্রবৃত্তিগুলিও অহংনিষ্ঠ: এইরূপে মায়ার শ্মশানক্ষেত্র হইতে নবনব মায়াবিভ্রম অবিরত নিঃসৃত হয়। অহংপরতার প্রবণতাকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে এতটা উদ্যম ও প্রযত্ন আবশ্যক হয় যে সে উদ্যম ও প্রযত্ন, শত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু যতই মহত্ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিবে, ততই মোক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবে।—অংহপরতার উর্দ্ধে আপনাকে যতই উত্তোলন করিতে পারিবে ততই কামনাসমূহের হ্রাস হইবে। আত্মবিলোপ সাধন করিতে হইলে, আত্মবিলোপের কামনাকেও বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পাপীমাত্রই আবার ব্যক্তিভাবে জন্মগ্রহণ করে; একমাত্র পাপ-বিরহিত ব্যক্তিই পুনর্ব্বার দেহ পরিগ্রহ করে না। ব্যক্তিত্বের শেষ ছায়াটুকু পর্য্যন্ত যখন অন্তর্হিত হয়, তখনই মনুষ্য নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। "নির্ব্বাণ—নাস্তিত্ব নহে, নির্ব্বাণ—মোক্ষ।" সসীম জীবন হইতে,—অনন্তগুণে মুক্ত ও আনন্দজনক সেই অসীম জীবনে উপনীত হইবার ইহাই একমাত্র পথ। গ্রীষ্মের দিনে শুভ্র জলদরাজি যেমন আকাশের নীলিমায় মিলাইয়া যায়, সেইরূপ অহংপরতা শূন্যে বিলীন হইয়া যায়; তখন যাঁহার আত্মা অসীম সত্তায় পূর্ণ হয়, তিনি অসীম দৃষ্টি, অসীম স্মৃতি, অসীম আধ্যাত্মিক শান্তি প্রাপ্ত হন। পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া বুদ্ধমাত্রই পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন।

কিন্তু এই সমস্ত বুদ্ধ—একই বুদ্ধ। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের একটি গূঢ় রহস্য; একত্বের মধ্যে অনির্দ্দেশ্য বহুত্ব; প্রত্যেক মহাভূত, অন্যান্য প্রত্যেক মহাভূতের সমান; আবার সমস্ত বিশ্বের সমান। বিশ্বমানব শুধু নহে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও—এই ভাবী বুদ্ধ। প্রাচীন বচনে আছে—"তৃণ, নক্ষত্র, পৃথিবী সমস্তই বুদ্ধ হইবে। এমন একটি ধূলিকণাও নাই যাহা পরে বুদ্ধ হইবে না।" এইপ্রকার ধর্ম্মমতের মধ্যে,—কুসংস্কার, বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা, পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতার স্থান নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ ভাব, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু এই পৃথিবীর ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অসংখ্য শতাব্দিব্যাপী কোটি কোটি লোকের উপযোগী ধর্ম্ম...ইহা হইতেই বিশ্বোৎপত্তির অপরিসীম নৈতিক মূল্য; ইহা হইতেই জীবনের একটা অর্থ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে, বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে যেরূপ গভীর ধারণা, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিও তদনুরূপ।

যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের নিকট অঙ্গীকার করে, তাহাতে বিজ্ঞানেরও কতকটা সম্মতি আছে। মানবজ্ঞানের মান-দণ্ড অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মকে বিচার করিলে দেখা যায়, আর সমস্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বচিন্তার সহিত এই ধর্ম্মের অনেকটা মিল আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অনেকগুলি প্রাচীন সিদ্ধান্তের মধ্যে, আধুনিক আবিষ্কার সমূহের আশ্চর্য্যজনক পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের ধারণা এবং আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস—এই যে পাশ্চাত্য ধর্ম্মের ভিত্তি, এই ভিত্তিকে বিজ্ঞান যেমন অগ্রাহ্য করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মও অস্বীকার করিয়াছে। এইরূপ ধারণা ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে, বৌদ্ধধর্ম্ম উহা অপেক্ষা আশাপূর্ণ মহত্তর দার্শনিক বিশ্বাস আমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছে। "আমাদের এই জ্ঞানোন্নতির যুগে, সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস তিরোহিত হইতেছে, এবং ব্যক্তিগত আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া

পড়িয়াছে; যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলি সেই ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরাও সরিয়া দাঁড়াইতেছেন, বিশ্বজনীন সংশয় আসিয়া নৈতিক স্পৃহা সমূহের উপর পাষাণ ভারের মত চাপিয়া রহিয়াছে—ঠিক্ এই যুগে প্রাচ্যদেশ হইতে আলোক আসিয়াছে।”

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহের সহিতবৌদ্ধধর্ম্মের মিল থাকায়, এবং বৌদ্ধনীতির শ্রেষ্ঠতা কার্য্যে প্রকটিত হওয়ায়, বৌদ্ধধর্ম্ম শিন্তোধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া, জাপানীর ধর্ম্মবুদ্ধিকে যে চিরকাল তৃপ্ত করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কালসহকারে এই ধর্ম্ম যদি আরও উন্নতিলাভ করে সে পরধর্ম্মের সংসর্গে নহে পরন্তু শুধু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরই প্রভাবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে, জাপানীদের ধর্ম্মমত আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে, আরও স্পষ্টতর হইবে। হয়ত এমন এক সময় আসিবে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পাশ্চাত্যখণ্ডেও প্রসারিত হইবে। এখনই য়ুরোপে, প্রাচ্য তত্ত্বচিন্তাসমূহ সযত্নে আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় ইভোলিউশান সিদ্ধান্তের ন্যায়, প্রাচ্যদর্শনও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের ধারণা সমূহকে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত করিবে।

য়ুরোপে, আমরা—কৃত্রিম সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত ধর্ম্মমতগুলির বিশ্বাসে ক্লান্তি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। একজন ত্রাণকর্ত্তা আসিবেন বলিয়া আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি। হয়-ত এমন এক দিন আসিবে যখন আমরা কপটতা ও স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন করিয়া, আমাদের যাদুঘরে যে সকল মূর্ত্তি রাশীকৃত রহিয়াছে সেই সকল বুদ্ধমূর্ত্তির চরণে পূজাঞ্জলী অর্পণ করিব। সেই দিব্য মুখের মধুর প্রশান্তি, অবিচল স্নেহমমতা আমাদের আত্মাকে শান্তি দান করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছাত্রের নিদ্রাসম্ভাষণ।

(স্থান—বিদ্যামন্দির)

এ কি রঙ্গময়ি! ছাড়, ছাড় মোরে,
লোকে কি কহিবে হা রে বালিকা চপলা?
কমল আসনা দেবী বাণী—পদযুগ
সেবিতে চলেছি আমি,—একি তোর খেলা?
দিবি না করিতে পূজা? ও মৃণাল ভুজে
বাঁধিয়া কৌতুকে মোরে রে কৌতুকময়ি,
রাখিবি, দিবি না যেতে? অলসনয়নে
পদ্মকর বুলাইয়ে দেখাইবি অয়ি,
সোণার স্বপন্ রাজ্যে সৌন্দর্য্যের মেলা,
কত রঙ্গে করে খেলা যূথি সেফালিকা?
অদূরেতে বাপীতটে কদমের তলে
বিরহিনী গাঁথিতেছে বকুল-মালিকা?
সর্ বালা, এ'ত নহে যোগ্য অবসর!
লোকে কি বলিবে?—এ যে বেলা দ্বিপ্রহর!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আচার্য্য বসুর আবিষ্কার।

২য় প্রবন্ধ।

গতবারের প্রবন্ধে আচার্য্য বসুর প্রথম পুস্তক খানির সম্বন্ধেই অনেক কথা বলিয়াছি। তাহার মোটামুটি সারাংশ এই যে, সূক্ষ্ম সাড়া মাপিবার যন্ত্র সংযোগে স্পষ্ট দেখান যায় যে—ধাতু, এবং উদ্ভিদও মানুষেরই মত ডাকে সাড়া দিতে পারে। বিভিন্ন ডাকে যে বিভিন্ন রকম সাড়া দেওয়া, তাও সকলকার পক্ষেই সমান দেখা যায়। অধিক ডাকে উচ্চরবে সাড়া দেওয়া—অল্প ডাকে অল্পভাবে সাড়া দেওয়া—ও বিষপ্রয়োগে মরিয়া গিয়া সাড়া দিতে অক্ষম হওয়া, এইরূপ সকল বিষয় হইতেই মনে হয় যে তাহারাও এক হিসাবে সজীব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকখানির কথা বলিব। প্রথম পুস্তকখানি আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, দ্বিতীয় পুস্তকখানি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সমস্ত বৃত্তান্ত অল্প কথায় প্রথম পুস্তকে বলিয়া, দ্বিতীয় পুস্তকে তাহা উদ্ভিদের সম্বন্ধে সবিস্তারে প্রযুজ্য হইয়াছে।

এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে গাছের কি কি কাজ আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি তাহাই দেখা যাউক। বীজ হইতে গাছ জন্মায় ও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া পাতা ফুল ও ফল প্রসব করে। অন্ধকার ঘরে গাছ পুঁতিলে তার ডালপালাগুলি আলোর দিকেই বাড়িয়া যাইতেছে দেখা যায়। অন্ধকারের দিকে বাড়ে না তার কারণ গাছের জীবন-ধারণের জন্য আলোর আবশ্যক। পরে ফুল হইতে ফল হয় ও ফলের ভিতর বীজ হয়। এই বীজ হইতেই পরে আবার গাছ জন্মায়। আর দেখা যায় গাছের গুড়িতে চোপ দিলে তাহা হইতে রস নির্গত হয়। অবশ্য এই রস মাটি হইতে শিকড় দিয়া শোষিয়া লওয়া হইয়াছে। আমরা যেমন জলপান করি, গাছও মাটি হইতে জল টানিয়া শিকড় দিয়া জল পান করে। সেই রস গুঁড়ির মধ্য দিয়া পাতায় উঠিয়া—গাছের খাদ্য যোগায়। “অঙ্গার” নামক হাওয়া হইতে পাতার সাহায্যে গৃহীত পদার্থের সহিত মিলিয়া—এই রসই শ্বেতসার, চিনি ও অন্যান্য অনেক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। শিকড় দিয়া গাছ মাটি হইতে জলপান করে, আর পাতা দিয়া হাওয়া হইতে অঙ্গার খায় ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে। ঠিক আমাদের জীবন ধারণের আবশ্যকীয় সব কার্য্যের মতই তাহাদেরও এই কার্য্যগুলি।

কিন্তু গাছ কিরূপে এইরূপ নানা প্রকার কার্য্য করিতে সক্ষম হয়—এই বিস্ময়কর ব্যাপারই আচার্য্য বসু সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আগে এই সম্বন্ধে যে সকল ধারণা ছিল তিনি দেখাইয়াছেন যে তার মধ্যে অনেকগুলি ধারণাই ভ্রান্তিমূলক। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বিস্তর বাক্যব্যয় করিয়া যে তত্ত্বগুলি বুঝাইয়াছেন আচার্য্য বসু অনেক সংক্ষেপে সেই কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাই তাঁহার আবিষ্কারের এত সুবিধা ও এত সুনাম।

পূর্ব্বে ধারণা ছিল যেমন ছোট ছিদ্র দিয়া আপনিই জল নলের উপরে উঠে—(Capillary attraction) তেমনি শিকড় দিয়াও গাছের উপর জল চড়ে। আর অনবরত গাছের

পাতা হইতে জল শুখানতে, শিকড়ের জল তাহার স্থান অধিকার জন্য গাছের গুঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া—পাতায় যায়। সমস্ত গাছে রসসঞ্চালনের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ ছিল। আচার্য্য বসু এখন এইসব কার্য্যগুলি আরও অনেক সহজভাবে বুঝাইয়াছেন। তাতে সুধু এই ব্যাপারটি নয়, গাছের আরও কত কার্য্য একত্রে বুঝা যায়। এত বড় বইথানি নিম্নোক্ত—এই একটি নিয়মে বিশিষ্টরূপে প্রাঞ্জল হইয়া পড়িয়াছে।

"একটি জীবন্ত কোষকে বাহির হইতে উত্তেজিত করিলে সেটী সঙ্কুচিত হয়। আর ভিতর হইতে উত্তেজিত করিলে বিস্ফারিত হয়।"

গাছের ছবি লিখিয়া উদাহরণ দিয়া এই নিয়মটির অর্থ বুঝাই।

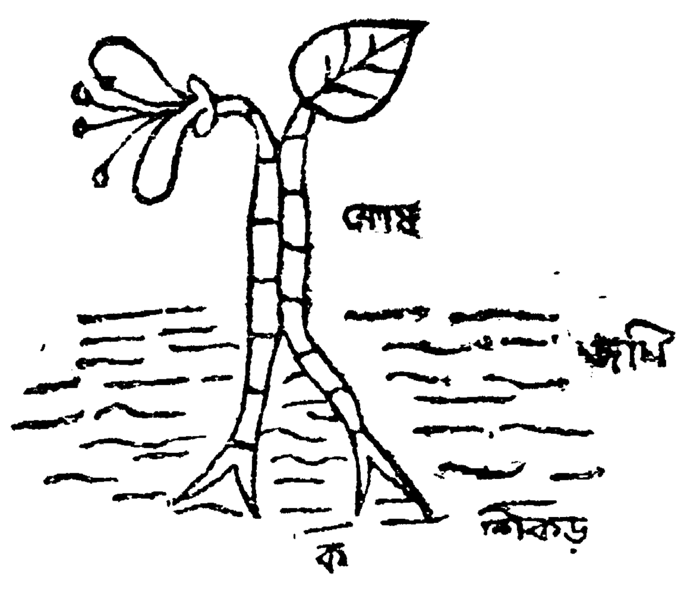

সকল সজীব পদার্থেরই দেহ অনেকগুলি কোষ দিয়া গঠিত। যেমন ইট সাজাইয়া বাড়ী হয় তেমনি কোষ সমুহ দ্বারা প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ গঠিত হয়। ছবিতে দেখুন। এক একটি ভাগ এক একটি কোষ। উহার ভিতর একটু আটা আটা পদার্থ আছে তাকে "প্রোটোপ্ল্যাজম্" বলে। সেটি কতকটা তরল।

সকলের নিম্নদেশে অর্থাৎ ক চিহ্নিত স্থানের কোষটি, মাটির ভিতর হইতে জল আকর্ষণ করিয়া কেন লয়, তাহার কারণ এই—মাটি সেই কোষটিকে সংঘর্ষে উত্তেজিত করে;—তাই সেই কোষের মধ্যস্থিত তরল পদার্থ সে স্থান হইতে সঙ্কুচিত অবস্থায় বিতাড়িত হইয়া তার ঠিক উপরকার কোষে প্রবিষ্ট হয়। মাটির সংস্পর্শ যেমন প্রথম কোষটিকে উত্তেজিত করিয়া সঙ্কুচিত করিল—কিন্তু ২য়টির উত্তেজনা আর বাহির হইতে না আসিয়া অন্য কোষটির ভিতর দিয়াই আসিল বলিয়া, এটি প্রথমে আরও আয়তনে ফুলিয়া উঠে। তারপর আবার সেও যখন কুঞ্চিত হয়, তখন তার উপরকার দিকের কোষটিতে তরল পদার্থ সেইরূপেই প্রেরিত হইয়া, তাহাকে প্রথমে স্ফীত তারপর আবার সঙ্কুচিত করে। এইরূপে উপরে উপরে সাজান প্রতিকোষটি একে একে স্ফীত ও সঙ্কুচিত হইয়া—উপরদিকে পাতা পর্য্যন্ত একটি তরল পদার্থের ঢেউ পাঠায়; তাহাতেই গাছে রস চড়ে। মানুষের যেমন এক স্থানেই হৃদয় থাকিয়া সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইয়া নলযোগে চারিদিকে রক্ত নীত হয়—সেইরূপই এখানেও হইয়াছে। কেবল একটি না হইয়া উপর উপর অনেকগুলি কোষ সাজান, সেইগুলিই পরে পরে সঙ্কুচিত হইয়া উপর দিকে স্রোত পাঠায়।

কোষ সঙ্কোচ ও বিস্ফারণের দরুণ রস উঠার কথা যদি বুঝা গিয়া থাকে তো' অপর সকল বিষয়ও অতি সহজেই বুঝা যাইবে। গাছ বাড়ে কেন তার উত্তর এই যে, গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া স্রোতটি যে উপরের দিকে চলে, সেই স্রোতের প্রতিঘাতেই আগার নূতন নরম কোষটি স্ফীত হইয়া পড়ে, ও সেই অবকাশে তার গায়ে গায়ে আরও সার নিক্ষিপ্ত হয়

বলিয়া—একবার ফুলিয়া উঠিয়া সেটি আর পূর্ব্বাবস্থায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে পারে না। স্রোতের ধাক্কা খাইয়া যেটুকু আগায় বাড়িয়াছিল সেটুকু রহিয়া যায়—তাতেই গাছ বাড়ে।

এইরূপে গাছের বাড় মাপিবার আচার্য্য বসু একটি অতি সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে গাছের গোড়ায় গরম জল দিলে শিকড়গুলি আরও জোরে জোরে কোঁচকায় বলিয়া স্রোতের জোরও বেশী হয়—ও সেই কারণে গাছটিও শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। আচার্য্য বসুর এই তত্ত্ব লইয়াই আমেরিকায় এখন গাছ বাড়াইবার এই উপায়—শস্য ক্ষেত্রে পরীক্ষা হইতেছে। তবে তাহাতে গরম জল না দিয়া জমীর মধ্য দিয়া তড়িৎ চালান হয়—তাহা আরো সহজ ও তাহাতে একই ফল।

তারপর গাছেরও এক হিসাবে চলৎশক্তি আছে। অর্থাৎ গাছের শিকড়গুলি আপনা আপনি যেদিকে জল আছে বা ভিজা মাটী সেই দিকে যায়। আর আলোর দিকে যাইতেই ডালগুলির সর্ব্বদা চেষ্টা। একটি অন্ধকার ঘরে একদিকে একটি জানালা খুলিয়া একটি গাছ রাখিলে গাছটি সেইধারে বাঁকিয়া পড়িবে—লতানে গাছ হইলে সেই দিকেই লতাইয়া যাইবে। আলো ও জল পাইবার জন্য এত চেষ্টা তার কারণ গাছের জীবন ধারণ পক্ষে এই দুইটি বড়ই আবশ্যকীয়। কিন্তু তাহারা যে, ঠিক যেন বুঝিয়া সুঝিয়াই উক্তরূপে আলোর দিকে ফিরে তাহার কারণ কি? তারও কারণ পূর্ব্বোক্ত সেই নিয়মটি—অর্থাৎ যেদিকে উত্তেজনা পায় সেই দিক কোঁচকায়। গাছের জানালার দিকের অংশে আলো পড়ে বলিয়া সেই দিকের কোষগুলি সঙ্কুচিত হয়—তাই গাছটি, সেই দিকেই ঝুঁকে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফুল ফুটে—সাদা ফুল রাত্রে ফুটে তার কারণ সেই রংটিই রাত্রে ভাল দেখা যায়। রাত্রিতে ও মেঘবৃষ্টির অন্ধকারের দিনে, আবার অনেক প্রকার ফুল ও পাতাগুলি আপনিই মুদিয়া যায়, সেও সেই কারণে। আবার লজ্জাবতী লতা ছুঁইলে পাতা মুদিয়া ডাল গুটাইয়া লজ্জাশীলতা প্রকাশ করে, তাহারও কারণ ঐ। অর্থাৎ সেই সেই পাশের কোষগুলি বেশী কোঁচকায়—তাই গাছ বা পাতা বা ফুলের দল সেই দিকে ফিরে বা মুদিয়া যায়। এমন কি Dionea নামক পাতাভোজী গাছেও মাছি বসিলে ফুলটি আপনা আপনি মুদিত হয় তাহাও এই কারণে। অর্থাৎ যে দিকে মাছি বসে সেই দিক কোঁচকায় বলিয়াই ফুলটি আপনা আপনি মুদিত হইয়া পড়ে।

গাছের পাতাগুলির সজ্জাপ্রণালী দেখিলে অবাক হইতে হয়। ভাল করিয়া দেখিলেই দেখা যায়,—যে সেগুলি বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন ব্যবস্থামত সাজান। কোন গাছে একস্থান হইতে অনেক পাতা বাহির হয়, আবার কোনও গাছের পাতা সব পৃথক্ পৃথক্ স্থানে। এ সব ব্যবস্থার মুলে,—হাওয়া ও আলো পাইবার প্রয়াস আছে।—আর সে উদ্দেশ্য সাধন হয় পূর্ব্বোক্ত একই নিয়মে।—স্থান বিশেষের কোষগুলি আলোক বা অন্য কোনও উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া ওইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন ঘটায়। লতা গাছ বা লতাতন্তুর আশ্রয়বৃক্ষ জড়াইয়া ধরারও এই কারণ। এইরূপে এক কোষের সঙ্কোচন লইয়াই উদ্ভিদ জীবনের কত ঘটনা বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে।

কিন্তু এই সঙ্কোচন কি অনুমানের কথা বা

যথার্থ ঘটনা—এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্যই তিনি "কুঞ্চনগ্রাফ্" নামক এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সে বিস্ময়কর যন্ত্রযোগে কোন ছোট জিনিষ অতি সামান্য মাত্রও সঙ্কুচিত হইলেই তাহা দেখা যায়। অতি সামান্য পরিবর্ত্তনও এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। সে যন্ত্রটি না দেখিলে শুধু বর্ণনায় বুঝা সহজ নহে—তবুও আমি ছবির সাহায্যে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

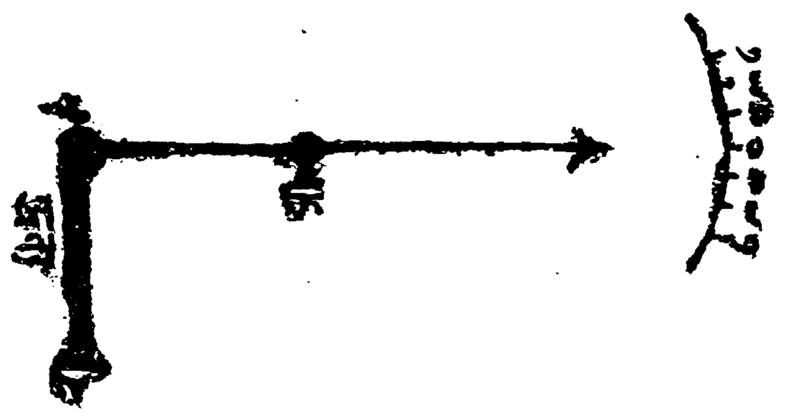

একটি তীরের গোড়ার দিকে একটি সরু আশ্রয়ের উপর তীরটি স্বাধীনভাবে ন্যস্ত আছে। "ক"র উপর অবস্থিতি কালে সেটি এদিকে ওদিকে ঘুরিতে পারে। খগ একটি লতাতন্তু তীরটির পিছন দিকে বাঁধা। যদি কোনও রূপে এই লতাতন্তুটিকে উত্তেজিত করা যায়—তখনি অঙ্ক নির্দ্দেশে দেখা যাইবে যে তীরের আগাটি পূর্ণ মাত্রায় না থাকিয়া আরও উপরের দিকে উঠিয়া কতটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। তাপ বা তড়িৎ দিয়া এই লতাতন্তুটিকে উত্তেজিত করিলে বাস্তবিকই এই ঘটনা দেখা যায়—তীরটির আগা নড়িয়া গিয়া লতার সঙ্কোচ নির্দ্দেশ করে। এই গেল সহজ ভাবে মোটামুটি "কুঞ্চনগ্রাফের" বর্ণনা।

পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বুঝা গেল যে কোনও জীবন্ত জিনিষকে যে কোনও রূপেই হউক উত্তেজিত করিলে সেটি সঙ্কুচিত হয়। সকল কোষের এই সহজ ধর্ম্ম—এমন কি অল্প বিস্তর এইটি তার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। যখন এরূপ উত্তেজনায় দেখা যায় যে সে সঙ্কুচিত হয় না বা সাড়া দেয় না তখনই বুঝিতে হইবে— সেটির জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে। গাছটি শুকাইয়া গেলে তার এইরূপ অবস্থা হয়। সেটি তখন আর তার স্বভাব ধর্ম্ম অনুসারে কুঁচকাইয়া সাড়া দেয় না।

এখন একটি কোষ যদি সঙ্কুচিত হয় তো তার তরল পদার্থও সেই সঙ্কুচিত স্থানে স্থান না পাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে, বা নিকটবর্ত্তী অন্য একটি কোষে প্রেরিত বা শোষিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে গাছে রস উঠার কথা বুঝাইতেই দেখিয়াছি যে বাস্তবিকই তাহা হয়। একটি কোষ সঙ্কুচিত হইলে তাহার তরল পদার্থ—কতক উপরের কোষটিতে যায়, ও সেটিও প্রথমে স্ফীত হইয়া পুরে আবার সঙ্কুচিত হইলে তখন আবার আরো উপরে উঠে—এইরূপেই গাছে রস চড়ে।

সঙ্কুচনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ তরল পদার্থের সঞ্চালন—দেখাইবার জন্য আর একটি যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেটির নাম "শোষণ-গ্রাফ্"। অতি সামান্য হইলেও অতি সূক্ষ্ম ভাবে সে যন্ত্রটি—এইরূপে তরল পদার্থের সঞ্চালন দেখায়।

ইহা ছাড়াও, আর একটি অতি বিস্ময়কর যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেটির নাম "মোরোগ্রাফ্" অর্থাৎ মৃত্যুনির্দ্দেশক যন্ত্র। কখন কোন জীবন্ত জিনিষটি মরিয়া গেল এ যন্ত্রটি তাহা দেখায়। কোষটি বা লতাতন্তুটি এতক্ষণ ডাকে বেশ সাড়া দিতেছিল। এখন

হয়ত সে বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোনও কারণে মারা গেল বলিয়া,তারপর আর সাড়া দেয় না। এ যন্ত্রে পর্য্যায়ক্রমে এ অবস্থার সকল পরিবর্ত্তন গুলিই দেখা যায়। এমন কি প্রাণবায়ু বাহির হইবার সময়—মানুষেরও যেরূপ—খাবি খাওয়া আছে বা খেঁচুনী হয়—গাছের মৃত্যু কালেও সে লক্ষণ সূচিত হয়। আমি মোটামুটি সে চিত্রেরও একটু আভাস দিতেছি।

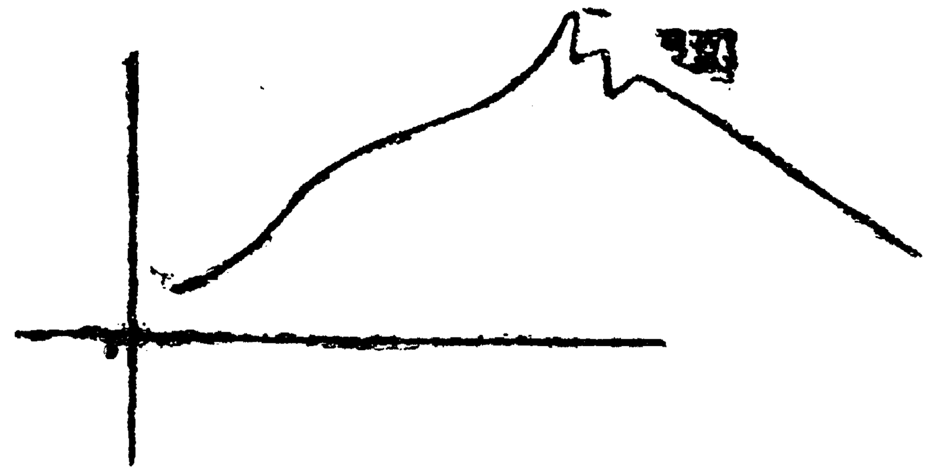

এই চিত্রে রেখাটি উঠিয়া এতক্ষণ জানাইতেছিল যে দ্রব্যটি জীবিত আছে। পরে যখন মৃত্যু আসিল, রেখাটির এলোমেলো ভাবে বুঝা যাইতেছে যে ঐটিই অন্তিম কালের শ্বাস ও অস্থিরতা। তারপর আর রেখাটি উঠে না অর্থাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এইখানে আচার্য্য বসু—ডাক্তারী কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। জীবনমরণের কথা, স্বাস্থ্য ও সুখসম্পদের কথা। সে তত্ত্বগুলি বড়ই শিখিবার বিষয়, ও অনেকক্ষণ ধরিয়া বলিলে তবে শেষ হইবে। সেই কারণে বারান্তরে তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এক্ষণে কেবল এই বলিয়া শেষ করি—যে, যে চারিটি যন্ত্রের কথা বলিলাম—তাহারা এই—

১। সাড়ামান যন্ত্র।—মানুষের ন্যায় উদ্ভিদ ও ধাতুরও যে সাড়া দিবার ক্ষমতা আছে ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সকল সজীব পদার্থেরই অতি সূক্ষ্ম সাড়া পর্য্যন্ত ইহা বিজ্ঞাপিত করে।

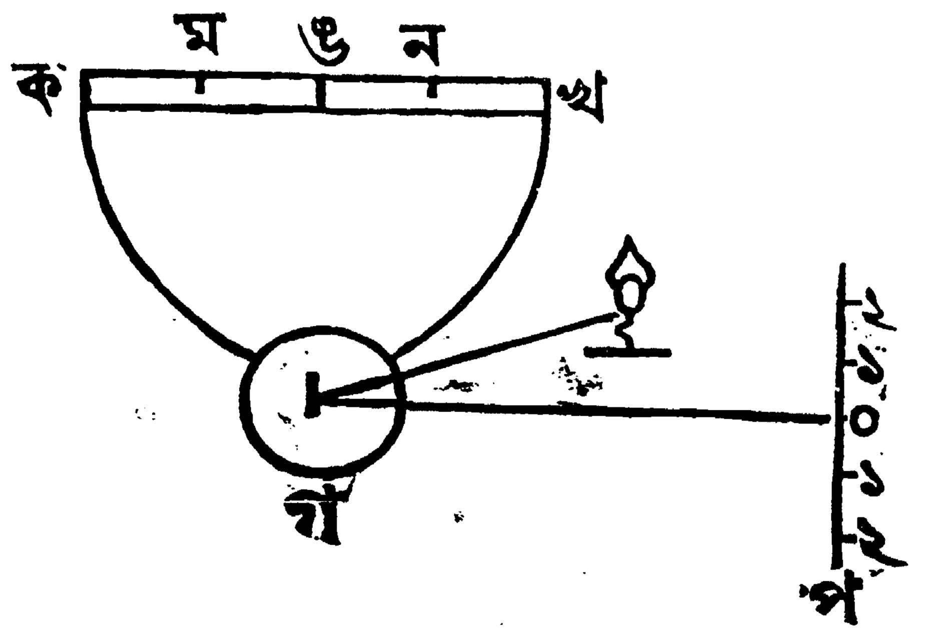

২। "কুঞ্চনগ্রাফ্"। জীবন্ত কোষ উত্তেজিত করিলেই যে সেটি সঙ্কুচিত হয়—তা ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হয়।

৩। "শোষণগ্রাফ্"। সঙ্কোচ অবস্থায় যে, কোষের মধ্যস্থিত তরল পদার্থ একটি কোষ হইতে অন্য কোষে সঞ্চালিত হয়, এই যন্ত্রে তাহাই দেখায়।

৪। "মোরোগ্রাফ্—অর্থাৎ মৃত্যুনির্দ্দেশক যন্ত্র বা অন্তিমকালের অবস্থা পরিবর্ত্তনের চিত্র। ইহাতে ধাতু উদ্ভিদেও ঠিক মানুষের মত মৃত্যুকালের অসংযত শ্বাস প্রশ্বাস বা খাবি খাওয়া ও খেঁচুনী আর মৃত্যুর পর স্থিরভাব পর্য্যন্ত দেখা যায়।

পদে পদে যদি এমন সব সূক্ষ্ম বিষয়েও ধাতু উদ্ভিদ ও মনুষ্য দেহে এমন সৌসাদৃশ্য থাকে—তাহা হইলে উহাদিগকেও প্রাণী নামে অভিহিত করিতে কি বাধা হইতে পারে?

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কর্ত্তব্য কোন পথে ?

সংবাদ পত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি বর্দ্ধমানে তিনটি বালক ধৃত হইয়াছে। বঙ্গেশ্বর ট্রেনে সেই পথ দিয়া যাইবেন শুনিয়া তাহারা নাকি তাঁহার হত্যা সঙ্কল্পে ঘুরিতেছিল। আগড়পাড়া ট্রেনেও আবার বোমানিক্ষেপের কথা শুনা যাইতেছে। এখনো যে বালকদিগের দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইতেছে না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এইরূপ আয়াজকতা সংসাধনে শক্তিক্ষয় করিলে প্রকৃত মঙ্গল কার্য্যে শক্তি আসিবে কোথা হইতে ?

ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে কয় জন? এই লক্ষ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ ভক্তসংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। আর তাঁহারাই কি না ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের আত্মদান, পুণ্যশক্তি অন্যায় প্রয়োগে নিষ্ফল ব্যর্থ করিতে বসিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, দেশের কল্যাণ কল্পনায় দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে সকল স্বদেশসেবকগণ অরাজকতার পক্ষপাতী, অনুরাগে জ্ঞানশূন্য না হইয়া এ সম্বন্ধে ধীরচিত্তে একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ইতিহাস কি বলে? বিদেশীয় দৃষ্টান্তেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? স্বাধীন রাজ্যের মধ্যেও রাজনিধনকামীদলকে সিদ্ধকাম হইতে দেখা যায় নাই। আর আমরা হৃতশক্তি, নিতান্ত অক্ষম দুর্ব্বল অধীন জাতি; দু একটা ইংরাজহত্যা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এরূপ মনে করা কি নিতান্তই মূঢ়তা নহে? কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের আগে যদিবা বুদ্ধির ভুল জন্মিয়া থাকে অভিজ্ঞতায় অন্ততঃ এখন ত সচেতন হওয়া উচিত। এই অরাজকতার ফলে সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের অত্যাচার, শত নির্দ্দোষব্যক্তির শাস্তি, সংবাদপত্র দমন, কঠোরতর বিচারপদ্ধতির প্রবর্ত্তন প্রস্তাব প্রভৃতি দলননীতিতে ভারতবাসী দিন দিন নিপীড়িত, পেষিত হইয়া উঠিতেছে। এই পেষণ স্থায়ী হইলে কিছুদিনে যে আমরা একেবারেই নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িবনা এমন কে বলিতে পারে? অন্ততঃ ইহা সুস্পষ্ট যে উক্তরূপ মারকাট সঙ্কল্পে রাজপক্ষের ক্ষতি অপেক্ষা প্রজাপক্ষের ক্ষতি শত সহস্রগুণে অধিক। ইংরাজ যদি আজ প্রজাদমন অভিপ্রায়ে তোপের মুখে সমস্ত ভারতবাসীকে উড়াইয়া দিতে চায়—আমাদের এমন সাধ্য নাই যে আমরা তাহার প্রতিরোধ করি। বোম্বাই সহরের প্রজাবিদ্রোহে কি ঘটিল? বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর, ন্যায় বিচারের উপরই আমাদের একান্ত ভরসা। এ সত্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিলে চলিবে না। দেশের জন্য মৃত্যু পুণ্য কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মৃত্যুতে যদি সিদ্ধির পরিবর্ত্তে অসিদ্ধি, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল আনয়ন করে—তাহাহইলে? যাঁহাদের বাচাইবার জন্য তুমি মৃত্যুবরণে উদ্যত তোমার কার্য্য যদি তাঁহাদেরই জীবন বলির কারণ হয়, তাহা হইলে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

ঝড়ের মুখে নৌকা চালাইয়া নৌকা ডুবান কোন নাবিকেরই কর্ত্তব্য নহে, শত্রুর অপরিমিত শক্তির মধ্যে মুষ্টিমেয় সৈন্য সঞ্চালনে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। স্বদেশসেবকগণ এরূপ অসম অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যুর সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। যেরূপ জীবনদানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়—যাহাতে মাতৃভূমির যথার্থ সেবা হয়—এখন সেই কার্য্যেই জীবনপাত করিতে হইবে; অন্য কথায়,—এখন তাঁহাদের মরিবার সময় নাই, বাঁচিয়া কাজ করিতে হইবে।—সম্মুখে স্তূপাকৃতি কাজ পড়িয়া আছে; তাহা দিয়া সযত্নে স্বরাজের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে;—সে জন্য বিস্তর পরিশ্রম বিস্তর আয়োজনের প্রয়োজন, এক পুরুষের আজীবন ব্যাপী উদ্যমেও তাহা সম্পন্ন হইবে কি না সন্দেহ! উত্তেজনার মূহূর্ত্তে প্রাণ দান অপেক্ষাকৃত সহজ বীরত্ব; কিন্তু আমৃত্যু কষ্টকর অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগই অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক। ভারত বাসীর পক্ষে এই ব্রতই প্রশস্ত ব্রত। রাজাপ্রজার বিবাদে মারকাট অত্যাচারে সবলপক্ষেরই যখন জয় লাভের আশা নাই তখন দুর্ব্বল পক্ষের কোন কথা। ধীর সহিষ্ণুতায় অত্যাচার সহ্য করিয়া, সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আত্ম সঙ্কল্পে অটল থাকিতে হইবে! গৃহবিবাদই আমাদের সকল অনর্থের মূল,—সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক। অধিক কি কথা; এহেন জাতীয় মহাসমিতি, যাহার প্রভাবে আমাদের জাতীয় মহাদেহে গৌরবময় নবজীবন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাই আজি মতপার্থক্যজনিত অন্তর্ব্বিবাদে পুনর্বিচ্ছিন্ন, বলহীন,—মুমুর্ষুবৎ।—অতএব মাতৃভূমির পূজায় যতদিন আমরা সকলে অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোকে বিবাদ বিসম্বাদ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে না শিখি ততদিন কেবল মুষ্টিমেয় লোকের অবৈধ চেষ্টায় স্বরাজপ্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা—বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন নীতির প্রচার, স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দেশভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষা বিস্তার, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে অর্থবল সংগ্রহ, সর্ব্বোপরি একতার মহাবল সঞ্চয়ই আমাদের সফলতা লাভের মূল মন্ত্র। বলা বাহুল্য, অন্নপানের ন্যায় নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চার স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহবলের উৎকর্ষ সাধন ও বিদ্যাচর্চ্চায় মানসিক বলের উৎকর্ষ সাধন সমস্ত সাধনার মূলে বর্ত্তমান। অতএব স্বদেশী হুজুকে বালকগণ যদি তাহাদের লেখাপড়া ও শরীর পালন ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে পরবংশে দেশের কাজ করিবার অল্প লোকই থাকিবে। বালকগণের নহে—সুশিক্ষিত যুবকগণেরই প্রতি গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বৈধউপায়ে ভিন্ন ভিন্ন দল সংগঠনে ভিন্ন ভিন্ন উন্নতিজনক ব্রতগ্রহণ করিতে হইবে। অধিকন্তু যাহাতে গভর্ণমেণ্ট সন্দেহ না করেন—রাজপক্ষকেও আপনাদিগের সহায় গ্রহণে চেষ্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইংরাজ বাঙ্গালীর বন্ধুত্বের মধ্যদিয়া কোন কাজ সাধিত হইতে পারিলে তাহার আর বিনাশ নাই। কেহ কেহ বলেন আমাদের নিজের কোন কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলে আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মানের হানি হয়। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি। প্রথমতঃ অবিমিশ্র

আত্মনির্ভরতা সংসারে নাই, কোন না কোনরূপে একের সাহায্য অন্যকে গ্রহণ করিতে হয়ই ;—রাজপক্ষ প্রজাপক্ষ উভয়ে মিলিয়া দেশ, আমরা যতই প্রতিজ্ঞা করিনা কেন ; রাজপক্ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরহীন হইতে পারিই না। সুতরাং উক্তরূপ কথার কোনই মূল্য নাই।—দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি আরাম শয্যায় শয়ন করিয়া আমাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ডাকি—তাহাই প্রকৃত নির্ভরতা। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে কার্য্য সুসিদ্ধির জন্য রাজপক্ষের সহায়তা গ্রহণে আত্মনির্ভরতা বা আত্মসম্মানের ত্রুটি হইতে পারে না। কেননা উদ্যোগী প্রজাপক্ষের রাজপক্ষের সহায়তা ন্যায্যপ্রাপ্য—অনুগ্রহ ভিক্ষা নহে। বস্তুতঃ আমাদের স্বজাতির মধ্যে সদ্ভাব যেমন আবশ্যক, রাজাপ্রজার মধ্যেও বন্ধুত্বস্থাপন তদপেক্ষা কম আবশ্যক নহে। এ সম্বন্ধে স্যর অ্যানড্রু তাঁহার বিদায়-কালের বক্তৃতাতে যেরূপ উপদেশ দান করিয়াছেন তাহা কার্য্যতঃ কতদূর সফল হইবে জানি না ; তবে কর্ত্তৃপক্ষ ইহা যে বুঝিতেছেন তাহাও আশাজনক। সত্যই গভর্ণমেণ্ট আমাদের অমঙ্গলপ্রার্থী নহেন ; প্রজাপক্ষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাও তাঁহাদের নীতির অন্তর্গত নহে। রাজায় প্রজায় মিলন নাই বলিয়া, পরস্পরকে আমরা জানিনা চিনিনা বলিয়াই পরস্পরের বিরোধের এত কারণ ঘটে। কিন্তু সেলামবাজি পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বস্থাপনের উপায় নহে। "সেলামবাজি" কথাটা যে এস্থলে চলিত অর্থেই ব্যবহৃত তাহার বোধ করি টীকার আবশ্যক নাই।—স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে দাসভাবে যেরূপ সম্মান দেখান হয়—তাহাই উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে অনুগ্রহলাভ হইতে পারে, সমভাব সৌহার্দ্দ্য লাভ হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্যই এই,—যাঁহারা রাজপক্ষের সহিত মেলামেশা করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই হয়ত বা কোন ফাঁকা উপাধির প্রত্যাশায়, নয়ত বা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে সতেজে সমকক্ষভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। এবং সেলামবাজিকেই হীন স্বার্থসাধনের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র বিবেচনা করেন। সুতরাং রাজপক্ষও ইহাতে এমন অভ্যস্ত যে—ইহার ত্রুটি দেখিলেই তাঁহারা অসম্মান মনে করেন, এবং উভয়ত সমকক্ষ মিলন যে সম্ভবপর ইহাও তাঁহাদের মনের ত্রিসীমাতে প্রবেশ করে না। অনেক সময় তোষামোদ-কারীগণ দেশের সত্য মনোভাব (sentement) প্রকৃত ইচ্ছা সংগোপন করিয়া স্পষ্ট বিপরীত বলিয়া রাজপক্ষের মন রক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। স্বরাজ বিরুদ্ধে কাশীর রাজার উক্তিই ইহার একটি দৃষ্টান্ত। দোষ রাজপক্ষের নহে ; দোষ আমাদেরই ; ইহা বুঝিয়া আত্মসংশোধন করিতে হইবে। মহতের বন্ধুত্ব মহত্ব দ্বারাই অর্জ্জন করিতে হয়। তাঁহারা যদি দেখেন, তাঁহারাও যেমন মানুষ আমরাও তেম্‌নি মানুষ ; তাঁহারা যদি দেখেন অনুগ্রহলাভের জন্য নহে, দেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যেই আমরা তাঁহাদের বন্ধুতা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যদি বোঝেন, সেলামবাজি না করিয়া আমরা তাঁহাদের অসম্মান করিতেছি না, আমরা মনুষ্যোচিত ভদ্রতা বিনয় রক্ষা

করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি নির্ভয়ে তাহাই প্রকাশ করিতেছি মাত্র,—তাহা হইলে ক্রমশ পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বস্থাপন হইবেই হইবে।

রামমোহন বিদ্যাসাগর তাঁহাদের হৃদয়মাধুর্য্যে ও চরিত্রবলে লাটমহালাটদিগের যেরূপ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু ছিলেন,—কোন রাজা মহারাজা অপর্য্যাপ্ত তৈলমর্দ্দনেও রাজপক্ষের সেরূপ সম্মানীয় বন্ধু? বর্ত্তমান অ্যাডভোকেট জেনেরল তাঁহার নির্ভীক ন্যায়কর্ত্তব্যপরায়ণতায় দেশের হিতসাধন করিয়া রাজপক্ষের শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু হায়! যাঁহাদের স্বার্থসাধনের গূঢ় অভিসন্ধি হৃদয়ে জাগ্রত, তাঁহাদের এ সাহস কোথা হইতে আসিবে? এমন লোকও আছেন, যাঁহারা রাজপক্ষের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য দেশের সর্ব্বনাশেও অকুণ্ঠিতচিত্ত! গভর্ণমেণ্ট দেশের শত্রু নহেন, আমরাই আমাদের নিজের শত্রু। বর্ত্তমান যুবকগণ যাঁহারা দেশের আশাভরসা, যাহারা নিঃস্বার্থতা মূর্ত্তিমান, গভর্ণমেণ্টকে উপেক্ষা না করিয়া, তাহার শত্রুতাচরণ না করিয়া—যাহাতে নিজের চরিত্রবলে তাহাদের সৌহার্দ্দ্য জয় করিতে পারা যায় সেই দিকেই লক্ষ্যদান করুন। যদি আমরা কখনও এই মিলনযুদ্ধে জয়ী হই, একদিকে স্বদেশীর মধ্যে একতা স্থাপন, অন্য দিকে বিদেশীর নিকট হইতে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মানপূর্ণ সৌহার্দ্দ্য আকর্ষণ করিতে পারি তখনি বিনা রক্তপাতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। এখন একজন কটন, একজন ওয়েদারবর্ণ আমাদের উন্নতি কামনায় নিজ জাতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছেন,—আমাদের চরিত্রবল দেখিলে তখন শত কটন শত ওয়েদারবর্ণ অভ্যুদিত হইয়া আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকারদানে আপনাদিগকেই সম্মানিত জ্ঞান করিবেন।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—কে জানিত বঙ্গবালকগণ এত পাহারার মধ্যেও বোমার কারখানা সৃজন করিতে পারে। কিন্তু এরূপ কার্য্য আমাদের উন্নতিরই প্রতিকূল ইহা বুঝিয়া যে পথ আমাদের স্বরাজের প্রকৃত পথ তাহা নির্ম্মাণেই নববংশের বল নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চয়ন।

ভারতে অশান্তি ও তাহার প্রতিকার।—লাহোরের খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রামভজ দত্ত চৌধুরী মহাশয় কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে গিয়াছেন। ভারতের যথার্থ অবস্থা বৃটিশ জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করাই তাঁহার এই প্রবাস গমনের প্রধান উদ্দেশ্য। গত ২৪শে অক্টোবর চৌধুরী মহাশয় লণ্ডনের হাইড্ পার্কে এক বিরাট সভার সম্মুখে "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিয়াছেন—

"যে দেশে ভূমি উর্ব্বরা এবং দেশবাসী পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয় ও মিতব্যয়ী, সে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ যদি দেশব্যাপী ও নিত্যসঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তথাকার শাসন পদ্ধতির ব্যর্থতা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। গত পঞ্চাশ বৎসরের শাসনফলে দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হওয়া দূরে যাউক, বরং দিন দিন

বৃদ্ধিই পাইতেছে। প্রথম পঁচিশ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী দুর্ভিক্ষে মরিয়াছিল, কিন্তু শেষ পঁচিশ বৎসরে দুইকোটি ষাট লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। তাহার উপর আবার গবর্মেণ্ট সেই অন্নহীন প্রজাগণের স্কন্ধে দিন দিন ভুমিকর বাড়াইয়া তাহাদিগকে অধিকতর ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় যে, দেশীয় সৈনিকগণ পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! নিজেরা সামান্য বেতনে জীবন ধারণ করিয়া যখন তাহারা তাহাদিগের বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী পুত্রকে এই দুঃসহ করভারে পীড়িত হইতে দেখে তখন তাহাদিগের আন্তরিক সন্তোষ আমরা কি প্রকারে আশা করিতে পারি? দারিদ্র্যই অসন্তোষের মূল। কিন্তু ভারতে অশান্তির তাহা অপেক্ষাও আর এক ভয়ঙ্কর কারণ উপস্থিত রহিয়াছে,—তাহা রাজপক্ষের ধনী দরিদ্র ও শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিচারে ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা ও যথেচ্ছ ব্যবহার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, "যে পাঞ্জাবী বহু যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার জন্য রক্তদান করিয়া তাহাদের বীরত্ব ও প্রভু ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগেরই দেশের মধ্যে সর্ জন লরেন্সের প্রস্তরমূর্ত্তির এক হস্তে তরবারী ও অন্য হস্তে লেখনী দিয়া নিম্নে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত করা হইয়াছে,—"তোমরা এই উভয়ের মধ্যে কোনটির দ্বারা শাসিত হইতে ইচ্ছা কর?" পাঞ্জাবী ইহাকে জাতীয় অপমান বলিয়া গ্রহণ করেন। পঞ্জাবের সিংহকে অনাহারে অপমানে বিড়ালে পরিণত না করিয়া, যদি সন্তোষ ও সুখে সিংহরূপে রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের জর্ম্মণি বা রুশিয়া, কাবুল বা জাপান বা সকলে একত্রিত হইলেও কোন উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ নাই।"

লর্ড মর্লির নূতন সংস্কার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"মর্লির বিপন্ন অবস্থা আমরা বুঝি। তিনি যে ভারতের লক্ষ লক্ষ অন্নহীন অসহায় ও পীড়িত প্রজার প্রতিনিধিগণের কণ্ঠ লৌহকঠিন হস্তে রুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি। তাঁহার উপর এখনও আমাদিগের শ্রদ্ধা রহিয়াছে। কিন্তু তিনি যে অভিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীগণেরই সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার নবসংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়াছেন, ইহাতে আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া আছি।"

ভারতে শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়াছেন;—

(১) ভারতবাসীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার দূর করিয়া তাহাদিগের সুখ দুঃখ, মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি রাখা;—

(২) দেশবাসীকে সমস্ত বিশ্বস্ত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রবেশাধিকার দান করা;

(৩) দেশীয় সৈন্যগণের বেতন বৃদ্ধি করা এবং তাহাদিগের যোগ্যতা প্রমাণিত হইলে সৈনিক-বিভাগে সর্ব্বোচ্চ পদলাভে অধিকার প্রদান করা;

(৪) অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জন্য আর করবৃদ্ধি স্থগিত করা এবং সীমান্তে রেলের ও সৈনিকবিভাগের অপেক্ষা পূর্ত্তকার্য্যে নিম্নপ্রাথমিক এবং শিল্পশিক্ষা ও শিল্পোন্নতির জন্য অধিক অর্থব্যয় করা,—কারণ প্রজার হৃদয় ভাঙ্গিয়া কেবল দুর্গ গড়িলে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত করা সম্ভব নহে;

(৫) যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভে আমরা নিতান্তই অনুপযুক্ত বিবেচিত হই, তাহা হইলে রাজার মনোনীত কতকগুলি বিশ্বাসী রাজকর্ম্মচারীর মধ্য হইতে ভারতবাসীকে তাহাদিগের রাজপ্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা মন্ত্রণাসভার সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার দান করা;

(৬) গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত ভারতবাসী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং গবর্মেণ্টপক্ষের সদস্যগণ সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট বা রাজ-প্রতিনিধি অথবা উভয়েরই দ্বারা মনোনীত হইবার পর ভারতবাসীর দ্বারা যথাবিহিতরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক।

ভারতের রাজপ্রতিনিধির পদে লজপত রায়।

বিলাতের রিভিউ অফ্ রিভিউস্ পত্রের সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন—

"আমি লজপত রায়কে এক আশ্চর্য্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিব বলিয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। লর্ড মর্লি লজপত রায়কে ছয় মাসের জন্য মান্দালে নগরে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি লজপত রায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যদি আপনি ভারতে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইতেন, আর আমি সেক্রেটরি অফ্ ষ্টেট পদে নিযুক্ত থাকিতাম, তাহা হইলে আপনি ভারতে সুশাসনের জন্য আমাকে কি পরামর্শ দিতেন?"

লজপত রায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"আমার মত স্বদেশসেবকের পক্ষে কল্পনাতেও এরূপ স্থান অধিকার করা কষ্টকর।"

আমি বলিলাম—"তথাপি চেষ্টা করুন না; অবশ্য আপনাকে এ পদে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, অন্য অনেক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু আজ যদি আপনি রাজপ্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে আপনি কি করিতেন?"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর লজপত রায় বলিলেন—"আমার মনে হয় আমি সর্ব্বপ্রথমেই ভারতবাসীর সহিত এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতাম, যাহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাগণের দ্বারা আমার ভ্রান্তি সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ সতর্কিত না হইয়া, আমার পক্ষে কোন ভ্রান্ত বিধান করাই সম্ভব হইত না। যদি জিনের দরুণ ঘোড়ার কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সে পা ছুড়িলে বুদ্ধিমান অশ্বচালক আনন্দবোধ করে, কারণ তাহা দ্বারা অশ্বের ঘায়ের প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।"

"কিন্তু আপনি তাহাকে কি প্রকারে পরিচালিত করিবেন?"

"অতি সহজে। আমি সর্ব্বপ্রথমেই ভারতবাসী-গণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সমিতিতে ও সমগ্র ভারতের ব্যবস্থাপক সমিতিতে তাহাদিগের নিজ নিজ প্রদেশের ও সমগ্র ভারতের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও কর্তৃপক্ষের উপর শাসনের ক্ষমতা দান করিব। রাজকর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকার আমি নিজের হাতে রাখিতে পারি, কিন্তু প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণ তাহাদিগকে শাসন বা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

"সামরিক বিভাগেও কি ঐ একই নিয়ম প্রচলিত করিবেন?"

"না, তাহা যে করিতেই হইবে এমন নহে। ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি হইয়া আমি অবশ্য সামরিক বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্বভার নিজহস্তেই রাখিব, যতদিন না ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট উপনিবেশসমূহের ন্যায় ভারতবর্ষকেও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করেন। কিন্তু আমি নির্ব্বাচন বা পরীক্ষা বিধি প্রচলিত করিয়া ভারতবাসীকে সামরিক বিভাগের উচ্চপদে প্রবেশাধিকার দান করিব।"

"কলিকাতাতে সমগ্র ভারতের জন্য কিরূপ সমিতি আপনি গঠন করিবেন?"

"জেলা সমিতির সভ্যগণ হইতে নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া আমি এই সমিতির সৃষ্টি করিব। ইহা দ্বারা প্রজাসাধারণের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিগণ এই সমিতির সভ্য হইতে সমর্থ হইবেন। ভারতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা চতুর্গুণ অধিক, সুতরাং এই সমিতির এক চতুর্থ অংশ সভ্য মুসলমানগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবে।"

"আপনার এই সমিতিকে আপনি কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করিবেন?"

"প্রথমেই আমি আমার সমিতিকে পার্লামেণ্টের সকল অধিকার দান না করিলেও, তাহাই আমার লক্ষ্য স্বরূপ করিব। কেবলমাত্র পরামর্শদানে-অধিকারী সমিতির সৃষ্টি করা নিষ্প্রয়োজন। সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইলে লোকের এরূপ সমিতির কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ নষ্ট হয়।"

"কিন্তু তাহারা কি কোনও ভ্রান্ত বিধান করিবে না?"

"অবশ্য, তাহা করিবে। বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারেও আপনাদের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ অনেক ভ্রান্ত বিধান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের সে সকল ভ্রান্তি ও ত্রুটি চাপা দিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যে সকল ভুল ও ত্রুটি করিবেন, সেগুলি দেশময় রাষ্ট্র করা হইবে। এইরূপ অভিজ্ঞতার দ্বারাই মনুষ্য জাতি স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা করে।"

"আপনি স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা কিরূপে দান করিবেন?"

"আমি লর্ড রিপনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিব। স্থানীয় সমিতি সকলকে তাহাদের আপন আপন সভাসমিতি মনোনীত করিবার অধিকার দান করিব এবং তাহারা সকলেই সমিতির কর্ম্ম স্বাধীনভাবে পরিচালিত করিবে। বর্ত্তমান বিধানে ডেপুটি কমিসনারই এই সকল সমিতির সভাপতি, এবং কার্য্যতঃ তাঁহার ইচ্ছাই আইন স্বরূপ। আমি তাঁহাকে এ উচ্চপদ, হইতে বঞ্চিত করিব। অধিকন্তু তাহাদের রাজস্ব ব্যয় করা সম্বন্ধে স্থানীয় সমিতি সকলের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিব।" "তার পর?"

"শাসন ও অন্যান্য বিভাগে আমি ব্রিটিশ জাতির একাধিপত্য নষ্ট করিব, এবং সকল বিভাগেই ভারতবাসীকে সহজ প্রবেশাধিকার দান করিব। যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনের জন্য আমি ইংলণ্ডে ও ভারতে একই পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিব।"

"কিন্তু তাহা হইলে আপনাকে কি ভারতের শাসনভার বাঙ্গালিবাবুর হাতে অর্পণ করিতে হইবে না?"

"আমি তাহা মনে করি না। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে বাঙ্গালীই দেশের সমস্ত বুদ্ধি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আমার বোধ হয় যে ব্রিটিশ জাতির সহিত ভারতবাসীকে যদি পরীক্ষা দানে সমান সুবিধা দান করা হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী রাজ্যের অর্দ্ধেক উচ্চপদ লাভ করিতে পারিত। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত গবর্মেণ্টের সকল বিভাগেই কেবল যে ইংরাজগণেরই সহজ প্রবেশাধিকার আছে, তাহা নহে, ঔপনিবেশিকগণকেও সমান অধিকার দান করা হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে আমি ইহাও বলিয়া রাখি যে যদি আমি ভারতে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত থাকিতাম, তাহা হইলে উপনিবেশের ব্যবহারে আন্তরিক ভীত হইতাম সন্দেহ নাই। কতকগুলি উপনিবেশ ভারতের ব্রিটিশ প্রজাকে মানবের সহজ অধিকার দানে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবাসীরাই নেটাল উপনিবেশের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছে এবং এখনও ট্রান্সভালে তাহারা অনেক উপকার সাধন করিতেছে; কিন্তু উপনিবেশ মাত্রেই আমাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে; এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বাস করিবারও অনুমতি দান করা হইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের ও বিপদের কারণ।"

"কি উপায়ে আপনি ইহার প্রতিবিধান করিবেন?"

"এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যদি ভারতবাসীকে ট্রান্সভ্যাল পথের পার্শ্ব দিয়া চলিতে দেওয়া না হয় বা অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডায় স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিতে বা বাস করিতে দেওয়া না হয়, তবে আমি এই সকল উপনিবেশবাসীকেও ভারতসাম্রাজ্যের উচ্চপদে প্রবেশাধিকার দিব না এবং আমি তাহাদিগকে ভারতে বাণিজ্য বা বাস করিতে দিব না। আমি সমব্যবহারের পক্ষপাতী, ন্যায্য ব্যবহার মানবসমাজে অতি মূল্যবান বস্তু। উপনিবেশবাসীরা আমাদিগকে যে সকল ক্ষমতা দান করিয়াছেন, আমরাও তাঁহাদিগকে সেই সকল ক্ষমতা দান করিব। কিন্তু আমরা উপনিবেশ হইতে তাড়িত হইব, আর উপনিবেশবাসীরা ভারতে যথেচ্ছবাস ও অর্থোপার্জ্জন করিবেন, ইহা অতি ভয়ানক কথা।"

"আপনি আর কি করিবেন?"

লজপত রায় বলিলেন—"হাঁ, ভারতের সকল স্থানেই বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাইবার যে আইনবিরুদ্ধ প্রথা প্রচলিত আছে, আমি তাহা বন্ধ করিব। আমি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণকে এরূপ বেতন দিব যে তাহাদের জীবনধারণের জন্য প্রতিবেশীগণের অর্থে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক হইবে না, এবং যখন ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের আপন আপন এলাকার মধ্যে ভ্রমণ করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে শ্রমজীবিগণের ন্যায্য পারিশ্রমিক দানে বাধ্য করিব।

লর্ড কর্জ্জনের নীতির সংস্কার না করাই বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের মহা ভুল হইয়াছে। জাতীয় বিরোধ জাগ্রত করিবার জন্যই বঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছিল। আমি সমগ্র ভারতবাসীকে এক বৃহৎ মহাজাতিতে পরিণত করা এবং তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনে পারদর্শী করাই আমার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করিব।"

আমি বলিলাম—"অর্থাৎ আপনি রাজপ্রতিনিধির পদে বসিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।"

"আমি উহা সর্ব্বনাশ বলিয়া মনে করি না। আমি যে আদর্শ আমার সম্মুখে রাখিব,—অর্থাৎ ভারতবাসীকে এরূপ শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া তুলিব, যাহাতে তাহারা তাহাদের স্বদেশ শাসনের সমস্ত ভার ও দায়িত্ব বহন করিতে সমর্থ হয় এবং ইহারই ফলাফল অনুসারে ভবিষ্যৎ ইতিহাস ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সার্থকতার বিচার করিবে।"

ভারত-সমস্যা।—মিষ্টার এস্, কে, র‍্যাট্‌ক্লিফ বহুদিন এখানে ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার উদারতা ও ভারতবাসীর প্রতি সহৃদয়তাগুণে সকল শিক্ষিত লোকেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি বিলাতের 'সোসিয়লজিকেল রিভিউ' নামক পত্রিকায় ভারতের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাহ্যিক অশান্তির প্রতি মনোযোগ দেওয়া পুলিষের কর্ত্তব্য, কিন্তু অশান্তির অন্তর্নিহিত সত্যের ও শক্তির প্রতি মনোযোগ দেওয়াই রাজনীতিজ্ঞের যথার্থ কর্ম্ম। ভারতের বর্ত্তমান অশান্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন—"আমরা একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের পরিপাকের বিরুদ্ধে একটা প্রতিঘাত-ক্রিয়া দেখিতেছি, অপর দিকে জাতীয় চেতনার একটা জাগরণ দেখিতে পাইতেছি। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যথাসম্ভব ইংরাজের অনুকরণ করিতে পারাই ভারতবাসীর আদর্শ ছিল। যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহারই নিকট তাঁহাদের অন্তর স্বতঃই নত হইয়া পড়িত। যে দানের অপেক্ষা কঠিনতর দান নাই, পাশ্চাত্য যাহা কিছু দেখিলেই ভারতবাসী সেই মহামূল্য বস্তু দানে তাহা লাভ করিত বা লাভের চেষ্টা করিত। যে বহু শতাব্দীর ইতিহাস, শিক্ষা ও ধর্ম্মে তাহার দেহমন গঠিত, পাশ্চাত্য যাহা কিছু দেখিলেই তাহার পদতলে ভারতবাসী তাহার স্বদেশের সেই সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ধন সমর্পণ করিত; এবং ভারতবাসী ইংরাজমাত্রেই যে আন্তরিক মঙ্গল কামনায় প্রণোদিত হইয়াই, তাহাদিগকে এই আত্মত্যাগে লুব্ধ ও উত্তেজিত করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ প্রবৃত্তির একটা প্রতিক্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য জাতির ইতিহাসের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার ভাবটি কত স্বাভাবিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহুদিদিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উনবিংশতি শতাব্দীর ঐ যুগে তাহারাও নতশিরে ঐরূপ আত্মলোপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহাদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব আসিয়া দেখা দিল এবং জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই উভয় জাতির জাগরণের ইতিহাসের মধ্যে সাদৃশ্যের ঘনিষ্ঠতা আরও স্পষ্ট প্রমাণ করা যায়। উভয় জাতির মধ্যেই যে প্রতিক্রিয়ার ভাবটি অন্তর্নিহিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং পাশ্চাত্য ভাব পরিপাক ও অনুকরণের চেষ্টা কল্যাণকর হইলেও অধ্যাত্মজগতে আনন্দের স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উভয় জাতির মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। যাহা হউক, কার্য্যতঃ উভয়জাতিকে অনুকৃত জাতি অনুকরণ কর্ম্মে বিরত করিতে চেষ্টা করিবা মাত্র, তাহাদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিল। ইহুদিদিগের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাদর যেরূপ তাহাদের মধ্যে জাতীয়তায় সৃষ্টি করিয়াছিল, লর্ড কর্জ্জনের অনুদার নীতিও ভারতে সেইরূপ জাতীয় জীবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতে শান্তি রক্ষা।—মিস্ বেল ইংলণ্ডের একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর কন্যা, তিনি প্রাচ্যদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। সেদিন ইয়র্ক রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে তিনি 'পেশোয়ারের অভিজ্ঞতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে ভারতের শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র গল্পটি বলেন।

মিস্ বেল যখন পেশোয়ারে উপস্থিত হন, সেই সময়ে লর্ড কর্জ্জন সেই স্থান পরিদর্শন করিতে যান। পরিদর্শন কার্য্য শেষ করিয়া নগরত্যাগ কালে তিনি তথাকার চিফ্ কমিশনর সার হ্যারল্ড ডিন্ সাহেবকে

নগরের প্রশান্ত অবস্থার জন্য ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বোধ হয় আপনার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করিবার আবশ্যক হয় নাই?" ডিন্ সাহেব উত্তর করিলেন—"না, তাহা হয় নাই। তবে তিন হাজার লোককে আমি জেলে পুরিয়া রাখিয়াছি কারণ আপনি এখানে যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ কোনও দুর্দ্দান্ত লোক বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।" লর্ড কর্জ্জনের মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু কাজটা কি আইন সঙ্গত হইয়াছে?" ডিন্ সাহেব উত্তর করিলেন" হয়ত তাহা হয় নাই, কিন্তু আপনি নগর ত্যাগ করিলেই আমি তাহাদের সকলকেই মুক্তিদান করিব।"

রাজ্যের কথা ও মন্তব্য।

বিদায় ও অভ্যর্থনা।—পুরাতন বর্ষকে দুঃখ-পূর্ণ হৃদয়ে বিদায় দিয়াও নূতন বর্ষের আগমনে আমরা যেমন নব আশা নব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠি সেইরূপ আশা আনন্দে হৃদয়পূর্ণ করিয়া নব বঙ্গেশ্বরকে আজ আমরা সাদর অভ্যর্থনায় বরণ করিয়া লইলাম। এ আনন্দের মধ্যেও আমরা পুরাতনকে অভিবাদন করিতে ভুলিব না। স্যর অ্যান্ড্রু তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের যতটুক কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন এবং বিদায়কালে প্রজার প্রতি যে অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; অধিকন্তু তাঁহার শাসনে যে সকল ত্রুটি হইয়া গিয়াছে, তাহার সংশোধন ভার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার উপর স্থাপন করিয়া নূতন আশার জাগরণে পুরাতন দুঃখ কষ্টকেও আমরা মন হইতে মুছিয়া ফেলিলাম। ভগবান করুন এ আশা এ আনন্দ ম্লান হইবার কারণ যেন না ঘটে। সহানুভূতিপূর্ণ করুণনীতিতে রাজকর্ত্তব্য এবং প্রজামঙ্গল একই সঙ্গে সুসাধিত করিয়া বঙ্গেশ্বর যেন বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন। রাজ্যভার হস্তে গ্রহণ করিয়াই ৩০শে নবেম্বর সেণ্ট অ্যানড্রুর ডিনার অধিবেশনে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। তিনি যে বিজ্ঞ বিচক্ষণ দূরদর্শী এবং তাঁহার যে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ আছে উক্ত বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশই তাহার পরিচায়ক।

"বোধ হয় অনেকেই আশা করিতেছেন যে আজ আমি সন্ধ্যায় আমার রাজনৈতিক মতামত কিছু জানাইব, কিন্তু তাঁহাদের আমি নিরাশ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ আমার বিশ্বাস যে সবে কয় ঘণ্টামাত্র শাসনভার গ্রহণ করিয়া নূতন শাসনকর্ত্তার পক্ষে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করা বা সে সম্বন্ধে অপরিপক্ক মতামত প্রকাশ করা কেবল যে গর্হিত কর্ম্ম তাহা নহে, পরন্তু তাহা ধৃষ্টতা মাত্র।" "বঙ্গদেশ যে আমার প্রথম অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা সত্য। অন্য প্রদেশে কর্ম্ম করিবার প্রবল প্রলোভন সত্ত্বেও আমি স্বেচ্ছায় আমার জীবনের যে ত্রিশ বৎসর বঙ্গদেশে অতিবাহিত করিয়াছি তাহার জন্য আমি অনুতপ্ত নহি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক্ষণে কোন মতামত প্রকাশ না করাই যুক্তিযুক্ত।"

বেকর সাহেব যখন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি কিরূপ সহৃদয় ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন, তাহার এইরূপ একটি গল্প আছে। তিনি কোন গ্রামের থানা তদারকে গমনকালে পথে একজন বৃদ্ধা দরিদ্রা রমণীকে কাঁদিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া শুনিলেন, সরকারী লোকে বলপূর্ব্বক তাহার ক্ষেত্র মন্থন করিয়া ইক্ষু উৎপাটন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার গৃহে কিছুদিন আর কপর্দ্দকও আসিবে না। তিনি দরিদ্রাকে তাঁহার তাম্বুর নিকটে যাইতে বলিলেন এবং অনুসন্ধানে জানিলেন তাঁহার অশ্বের খাদ্যের জন্যই থানার জমাদার এই কার্য্য করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে দ্বিগুণ অর্থদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন, এবং জমাদারকে পরে কার্য্যচ্যুত করিলেন।

আশা করি এইরূপ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে বঙ্গেশ্বর চিরস্মরণীয় হইবেন।

সার অ্যাণ্ড্রুর বিদায়কালীন বক্তৃতার কিয়দংশ।—যদি আমরা আমাদের মধ্যে পার্থক্য-কেই বৃহৎ করিয়া তুলি, যদি আমরা সেইগুলিকে এরূপভাবে অন্তরে পোষণ করি, যাহাতে তাহারাই সর্ব্বপ্রধান হইয়া এদেশে বিভিন্ন জাতির মিলনের পক্ষে বাস্তব বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমরা যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহানুভূতি সঞ্চারে বাধা প্রদানে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

টাউন্‌সেণ্ড সাহেব তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে প্রকৃত মিলন অসম্ভব। বোধ হয় তিনি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েই মানব। বিভিন্ন শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে বর্ত্তমান পার্থক্য বৃহৎ করিয়া তুলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু ভারতে আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত নীতি অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। পরস্পরের মধ্যে যাবতীয় বিভিন্নতাকে হ্রাস করিয়া আনিয়া, সুবৃহৎ সমতাগুলিকে যথাযোগ্য প্রাধান্য দিয়া সকলে একতাসূত্রে গ্রথিত হইবার চেষ্টা করাই আমাদের সকলেরই লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।" * * *

" * * * আমাদিগের এবং প্রাচ্যগণের মধ্যে বিভিন্নতাকেই যদি আমরা বৃহৎ করিয়া তুলি, যদি আমরা একথা বিস্মৃত হই যে তাহারাও আমাদিগের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাদিগের অন্তরেও আমাদিগের ন্যায় ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও কৃতজ্ঞতা ঘৃণা ও প্রতিহিংসা বিরাজ করিতেছে, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের নিকট পরিচিত হওয়া অসম্ভব। অপরন্তু তাহারাও আমাদিগেরই ন্যায় মানুষ এই কথা স্মরণ রাখিলে, তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা কোনমতেই কঠিন নহে। * * *

সার এনণ্ড্রু বিদায় গ্রহণকালে এইরূপ উদার সহৃদয়তা প্রকাশদ্বারা আমাদের শ্রদ্ধানুরাগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশ সফল হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রজার শান্তি সন্তোষের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী হইবে সন্দেহ নাই।

ফ্রেজরের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন।—এই অভিপ্রায়ে দেশের লোক যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ ২৫ হাজার টাকা চাঁদা ওঠে এবং পরে আরও উঠিবে সন্দেহ নাই। এই অর্থে চাঁদার একটি মুর্ত্তি সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, গভর্ণমেণ্ট ত সদা সর্ব্বদাই মূর্ত্তি স্থাপনে লাট মহালাটদিগকে সম্মানিত করিতেছেন। দেশের লোক স্বতন্ত্র অর্থ তুলিয়া যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন তাহাতেও গভর্মেণ্টের পদানুসরণ কেন? মূর্ত্তি স্থাপন এবং অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখা প্রায় একই কথা। আমাদের দেশের কত মঙ্গলকাজ অর্থাভাবে সুসাধিত হয় না। এই অর্থ সেইরূপ কোন কার্য্যে ব্যয় হইলে ইহার যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে এবং স্যর অ্যান্ড্রুকেও অধিকতর সম্মান দেখান হইবে।

স্যর ফ্রেজর এবং লেডি ফ্রেজর উভয়েই মহিলা শিল্প সমিতি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বিধবাশ্রমের সাতিশয় কল্যাণপ্রার্থী ছিলেন; অর্থাভাবে ইহার নিজস্ব একটি বাটী নির্ম্মিত হইতেছে না, আমাদের প্রস্তাব এই বাটীনির্ম্মাণের আনুকুল্যেই উক্ত অর্থ প্রদত্ত হউক। ইহাতে তাঁহাদের মনের মত কাজই করা হইবে। বিধবাশ্রমের নাম হউক ফ্রেজর বিধবাশ্রম। বেথুন সাহেবের ন্যায় ফ্রেজরের নাম সহযোগে এই আশ্রমই তাঁহার চিরস্মৃতি বহন করিবে। অন্তত স্যর অ্যানৃড কে এই প্রস্তাবটি জানাইয়া এ সমন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হউক ইহাই আমাদের অনুরোধ। আশা করি সহকারীগণ তাঁহাদের সংবাদ পত্রে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন।

নূতন অপরাধ আইন। Crime's Act. সম্প্রতি গত ১১ই ডিসেম্বর বড় লাটের সভায় দুঘণ্টার মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডের নজীরে উক্ত আইন পাশ হইয়া গেল! আমাদের পক্ষে ইহা নূতন আইন। আয়ারল্যাণ্ডে যে সময় এই আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এদেশের বর্ত্তমান

অবস্থার সহিত তাহার কোনই সৌসাদৃশ্য নাই, ইহা ডেলিনিউস্ পত্র অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

সার হার্ভি অ্যাডামসন—তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে এই একটি কথা বলিয়াছেন, যে, "সম্প্রতি সংবাদপত্র আইন পাশ হইবার পর হত্যার উত্তেজনা আর সংবাদপত্রে দেখা যায় না।"—কিন্তু আমাদের দেশীয় কোন সংবাদপত্রে, দু একখানা নিতান্ত নগণ্য কাগজে ছাড়া—হত্যার উত্তেজনা কখনো থাকিত বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু ইহা জানি, উক্ত আইন পাশ হইবার পরেও ইংরাজ পরিচালিত কোন কোন সংবাদপত্র এইরূপ উপদেশ পর্য্যন্ত দিয়াছেন যে,—"দেশীয় লোক দেখিলেই গুলি করিবে।" সেই সময়ে অনেক কাগজে এই বিষয়ে আন্দোলন চলিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সার হার্ভি একথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন!!! নব আইনের প্রধান উদ্দেশ্য অরাজকতাদমন। উক্ত আইনের স্থূল মর্ম্ম এই—

প্রথমতঃ; বিচারাধীন অপরাধীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একতরফা বিচার হইবে।—জামিনে তাহাকে মুক্তি দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাধীন,—তিনি যতদিন ইচ্ছা তাহাকে হাজতে রাখিতে পারেন;—তাহার উপর আর আপিল নাই।

দ্বিতীয়তঃ; শেষ বিচার হাইকোর্টে তিনজন জজের কাছে, এখানেও জুরি নাই।

তৃতীয়তঃ; কোন সাক্ষীর যদি সাক্ষ্যপ্রদানের পর মৃত্যু হয়, আর আসামীর পক্ষ হইতে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে আদালত এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে।

চতুর্থতঃ; যে জনতা বা সমিতি খুন মারপিটে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে তাহাই 'বে-আইনী' নাম ভুক্ত। আর গভর্ণমেণ্ট যে সমিতিকে বে-আইনী বিবেচনা করিবেন—তাহাও উক্ত নাম ভুক্ত।

তিন বৎসর বে-আইনী সমিতির যিনি পরিচালক তাঁহার মেয়াদ তিন বৎসর আর ইহার মেম্বর হইলে বা ইহাতে দান করিলে তাহার মেয়াদ ছয় মাস।

শ্রীযুক্ত দাদা ভাই বলেন,—ইহা পাশ হউক, কিন্তু ইহা যেন দেশের স্থায়ী আইন না হয়, বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে এ আইনও যেন বন্ধ হইয়া যায়।

একমাত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ দুএকটি বিষয়ে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—আয়ারল্যাণ্ডের সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা হইতে পারে না—আর গবর্ণমেণ্ট বলিলেই যে অমনি—যে কোন সমিতি অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে ইহাও ন্যায়সঙ্গত নহে।

বলা বাহুল্য তাঁহার অরণ্যে রোদন হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, এইরূপ আইনে দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে? কিন্তু আমাদের আশঙ্কা ইহা নির্দ্দোষ ব্যক্তির অযথা উৎপীড়নের কারণস্বরূপ হইয়া দেশে অশান্তি অত্যাচার বর্দ্ধিত করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবেচনা যে কত ভুল হইতে পারে—মেদিনীপুরের বিচার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট কত সম্ভ্রান্ত—সুশিক্ষিত, ধনী ব্যক্তিকে কেবল পুলিসের গোয়েন্দার কথায় বিশ্বাস করিয়া অযথারূপে হাজতে দিয়াছিলেন। অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল সিংহ মহোদয় তাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইতে অসম্মত না হইলে—উঁহাদিগের অবস্থা যে কি হইত তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আমরা বেকার সাহেবের সহানুভূতি ও দিব্যদর্শনের প্রতি যে আশাস্থাপন করিয়াছিলাম, তাঁহার শাসনারম্ভেই তাহাতে হতাশ হইতে হইল; দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়!!!

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সিকিম ভ্রমণ।

ভূমিকা।

সিকিম অতি মনোরম দেশ। ইহার উত্তর সীমা তিব্বত, পশ্চিম সীমা নেপাল, পূর্ব্ব সীমা ভূটান ও দক্ষিণ সীমা ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ। এই দেশ নানাবিধ বৃক্ষলতাদ্বারা পরিশোভিত। এখানে যেরূপ সরল ও উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও নাই। এখানে বিভিন্ন ঋতুতে নানাবিধ স্বভাবজাত লতা ও কুসুম বিকাশ লাভ করিয়া দর্শকবৃন্দের নয়ন পরিতৃপ্ত করে। ষড়্ ঋতু পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করিয়া একত্র অবস্থান করে। এই দেশ পর্ব্বতবহুল। নগাধিরাজ হিমালয় স্বকীয় হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক এই দেশকে রক্ষা করিতেছেন। এখানে অসংখ্য নির্ঝর ও নদনদী বিদ্যমান আছে। তিস্তা ও রঙ্গীত এই দুইটি এখানকার প্রধান নদী। ইহারা সমস্ত সিকিমকে বিধৌত করিয়া উত্তর বঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। এই দেশে প্রতি তিন চার মাইলের ব্যবধানে ঋতুর পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। পর্ব্বত সমূহের উচ্চতা অনুসারে শীত গ্রীষ্মের তারতম্য হইয়া থাকে। পর্ব্বতগহ্বরে ও নদীর পার্শ্বে যেরূপ ঘোর গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, পর্ব্বতশৃঙ্গে আবার তদনুরূপ ঘোর শীত অনুভূত হইয়া থাকে। সিকিমে বহু সমভূমি আছে। এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ১৫৫০০ ফুট। শীতল ও উষ্ণ উভয় প্রকার প্রদেশের কীট পতঙ্গ ও পক্ষী সিকিমে বাস করে। এখানে বহু তাম্রখনি আছে। লৌহ, চুণ ও অভ্র অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়।

সিকিমের প্রাচীন ইতিহাস ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। প্রাচীন গ্রন্থে এই দেশের কোনও বিশেষ উল্লেখ নাই। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় যে হিমবৎপ্রদেশের বর্ণনা আছে সিকিম বোধ হয় উহারই অন্তর্গত। সিকিমের অধিবাসী—লেপ্‌চাজাতি। লেপ্‌চাগণের সাধারণ বৃত্তি পশুপালন। ইহারা অতিশয় কোমল স্বভাব ও দেখিতে সুশ্রী। ইহারা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কিন্তু পুরাকালে ইহারা কোনও রাজার অধীন ছিল না। ১৬৪১ খৃঃ অব্দে তিব্বত দেশ হইতে হ্লা-চুন্-ছেম্—পো ও অপর দুইজন লামা সিকিমে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়া বলেন যে, তিব্বত দেশে এক দৈববাণী প্রচারিত হইয়াছে। তদনুসারে তিব্বতের অন্তর্গত খাম প্রদেশের ফুন্—ছোগ্—নাম্—গ্যাল্ নামক কোনও ব্যক্তি সিকিমের রাজা হইবে। লেপ্‌চাগণ লামাদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া ফুন্ ছোগ্-নাম-গ্যাল্‌কে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। এই সময় হইতে সিকিমের রাজতন্ত্র প্রণালীর প্রতিষ্ঠা হয়। সিকিমের সর্ব্বপ্রথম রাজা তিব্বত দেশ হইকে সমাগত। তিনি একটি লেপ্‌চা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। উহাঁদের সন্তান তেন্-স্রুঙ্-নাম্-গ্যাল্ ১৬৭০ খৃঃ অব্দে

সিকিমের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তদনন্তর তাঁহার সাতজন বংশধর যথাক্রমে সিকিম শাসন করিয়া আসিতেছেন। সিকিমের বর্ত্তমান রাজার নাম থু-তোব্-নাম্-গ্যাল্। ইঁহার বয়ক্রম এখন ৪৮ বৎসর। ইঁহার পুত্র সিদ্-ক্যোঙ্-টুল্-কু বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। ইনিই সিকিম রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

যে সময়ে সিকিমে রাজতন্ত্রপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা হয় ঠিক সেই সময়েই ঐদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত লামা হ্লা-চুন্-ছেম্-পো সিকিমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচারক। তিনি রাজা ফুন্-ছোগ্-নাম্-গ্যালের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে লেপ্চাগণকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সিকিমের রাষ্ট্রধর্ম্ম হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ অনের বিহার মন্দির ও স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে সিকিমে ৩৫টি বিহার বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বিহারে কতিপয় লামা বা ধর্ম্মযাজক অবস্থান করে। বিহারসমূহের নাম, যথা;—

বিহারের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা
সাঙ্-ঙা-চি-লিঙ্	খৃঃ ১৬৯৭	২৫ জন
দ্যুব্-দি	১৭০১	৩০
পে-মি-য়াং-চি	১৭০৫	১০৮
গ্যাণ্টক	৭১১৬	৩
টা-সি-দিঙ্	১৭১৬	২০
সিলোন্	১৭১৬	৮
রিন্-চিং-পোঙ্	১৭৩০	৮
রা-লোঙ্	১৭৩০	৮০
মেলি	১৭৪০	১৫
রাম-টেক্	১৭৪০	৮০
কো-ভাঙ্	১৭৪০	১০০
চুন্-থাঙ্	খৃঃ ১৭৮৮	৮ জন
খা-চো-পাল্-রি	১৭৮৮	১১
লা-চুঙ্	১৭৮৮	৫
তা-লুঙ্	১৭৮৯	৯০
এন্-চি	১৮৪০	১৫
ফেন্-সুঙ্	১৮৪০	১০০
কার্ত্তোক্	১৮৪০	২০
দো-লিঙ্	১৮৪০	৮
য়ঙ-গঙ্	১৮২১	১০
লা-ব্রাঙ	১৮৪৪	৩০
হ্লা-চুঙ্	১৮৫০	৮
লিঞ্চে	১৮৫০	১৫
সি-নিক্	১৮৫০	৩০
রি-ঙ্গিম্	১৮৫২	৩০
লিঙ্-থাম্	১৮৫৫	২০
চাঙ্ঘে	১৮৫৫	২০
লা-ছেন্	১৮৫৮	৮
গিয়া-তোঙ্	১৮৬০	৮
লিঙ্-কোই	১৮৬০	২০
ফা-দি	১৮৬২	৮
নোব্লিঙ্	১৮৭৫	৫
নাম্-চি	১৮৩৬	৬
পা-বিয়া	১৮৭৫	২০
সিঙ্-তাম্	১৮৮৪	৬

সিকিমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর অবধি তিব্বতের সহ উহার ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ ঘটে। ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলেই উহার মীমাংসার জন্য তিব্বতের দালাই লামার নিকট আবেদন করা হয়। তাঁহার নিষ্পত্তিতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়। ধর্ম্ম বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়েও সিকিমের সহিত তিব্বতের দৃঢ় সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। উর্ণা, পশম, চা প্রভৃতি দ্রব্য তিব্বত হইতে সিকিমে আমদানি হইতে থাকে।

তিব্বতীয় ভাষা সিকিমের রাজদরবারে প্রবেশ লাভ করে। লেপচাগণ ক্রমে ক্রমে স্বীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া তিব্বতীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া আপনাদিগকে শ্লাঘ্য মনে করে। তিব্বতীয় পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি সিকিমে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয়। সিকিমের শেষ তিন রাজা তিব্বতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তিব্বতীয় রমণীগণ গ্রীষ্মকালে সিকিমে বাস করিতে ভাল বাসেন না এই হেতু সিকিমের রাজা তিব্বত ও সিকিমের প্রান্তবর্ত্তী চুম্বি নামক স্থানে স্বীয় গ্রীষ্মাবাসের ব্যবস্থা করেন। রাজা অধিকাংশ সময়ই চুম্বিতে অবস্থান করেন ইহাতে রাজ্যে অনেক বিশৃঙ্খলতা ঘটে। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে নেপাল সিকিম আক্রমণ পূর্ব্বক উহার তরাই প্রদেশ অধিকার করে। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের মধ্যস্থতায় নেপাল সিকিমকে তরাই প্রদেশ প্রত্যর্পণ করে। এই সময় হইতে সিকিমে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আবেদন অনুসারে সিকিম রাজ্য স্বীয় রাষ্ট্রের কিয়দংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করেন। উহাই বর্ত্তমান ব্রিটিশ অধিকৃত দার্জ্জিলিং জেলা। তদনন্তর ১৮৫০ খৃঃ অব্দে সিকিমের মোরাঙ্ প্রদেশ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দার্জ্জিলিং জেলার মূল্য স্বরূপে সিকিমরাজ প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার হাজার টাকা কর প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সিকিমরাজের সন্ধি হয়। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে চীনের সহিত ইংরেজগণের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তিব্বতের নানা স্থানে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ১৬৪১ খৃঃ অব্দে তিব্বতের সহ সিকিমের সংস্রব ঘটে। তদবধি তিব্বত দেশ হইতে বহু ধর্ম্মযাজক ও গৃহস্থ আসিয়া সিকিমে উপনিবেশ স্থাপন করে। শনৈঃ শনৈঃ চীন, মঙ্গোলিয়া, ভুটান প্রভৃতি দেশ হইতেও বহুলোক সিকিমে আগমন করে। ইহাদের সহিত লেপ্চা জাতির সংমিশ্রণে এক নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে। উহারা সাধারণতঃ ভুটিয়া নামে প্রসিদ্ধ। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে নেপাল হইতে বহুলোক আসিয়া সিকিমে বসতি করিয়াছে। ভুটিয়াগণ প্রায় পর্ব্বতশৃঙ্গে শীতপ্রধান স্থানে বাস করে। কিন্তু নেপালিগণ পর্ব্বতশৃঙ্গ, উপত্যকা, অধিত্যকা, সানুদেশ ও নদীতীর এবং নির্ঝর পার্শ্ব সর্ব্বত্রই অবস্থান করিয়া থাকে। অধুনা সিকিম রাজ্যে নেপালির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অনুমান হয় আর অর্দ্ধশতাব্দীকাল মধ্যে সমস্ত সিকিম নেপালির দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। বৌদ্ধ বিহার মন্দির স্তূপ ও ধ্বজা ক্রমে বিলুপ্ত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

[পাঠক দেখিবেন নিম্নলিখিত গল্পটি এবং পূজার স্বপ্ন শীর্ষক কবিতাটি দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা। অথচ একটির আখ্যান ভাগের সহিত অন্যটির কিরূপ আশ্চর্য্য মিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা দুটিকে পাশাপাশি প্রকাশ করিলাম। ভা—স]

শেফালিকা।

এই শিশিরাচ্ছন্ন ফুল গুলি দেখিলেই বহুদিনের একটি করুণ স্মৃতি মনে পড়ে। আজ প্রৌঢ় হইতে চলিলাম তবু এই স্নিগ্ধ-গন্ধ নাসাপথে প্রবেশ করিলেই বাল্যকালের সামান্য একটি কাহিনী, হেমন্তের দুটি প্রত্যূষকে মানস পটে তেমনি অশ্রুকুয়াসাচ্ছন্ন রূপে ফুটাইয়া তুলে।

পিতামাতা বড় আশা করিয়া শিশুকালে আমার নাম রাখিয়াছিলেন সুশীলকুমার। কিন্তু এই সাধের নামে বিপরীত অর্থ প্রতিপন্ন করায় অগত্যা তাঁহারা সুশীল বাদ দিয়া শুধু কুমার বা 'কুমো' নামেই আমায় প্রচার করিলেন। গুরুমহাশয় "বিদ্যার্ণবধান'' তর্জ্জন গর্জ্জন প্রহার বন্ধন প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও আমার নিকটে তাঁহাকে পরাজয় মানিতে হইয়াছিল। বালক বালিকা সমাজে আমি একেশ্বর সম্রাট ছিলাম।—শুধু শাসনে নয়, পালনের গুণেও বটে। আমার অনুগ্রহে দুর্লভ বস্তুও সহজ প্রাপ্য ছিল। দত্তদের বাগানের উৎকৃষ্ট আম্র লিচু পেয়ারা দাড়িম্বে—গ্রামের বিগ্রহ গোবিন্দদেবের ভোগের পূর্ব্বেই তাহাদের অরুচি ধরিয়া যাইত। শীতকালে খেজুর রসের বদলে পাশী কলসী পোরা জল পাইত,—আর সেই রস পানে আমার প্রজাগণ তৃপ্তিলাভ করিতেন। বর্ষাকালে বন্যার জলে সাঁতার দিয়া গ্রামের লোকের বিলের মৎস্য লুণ্ঠন করিয়া ভক্তবৃন্দে বিতরণ করিতাম। আমার গুণ অবর্ণনীয় ছিল। তবে সেটা পাড়াগ্রাম, সহরের লঙ্কা চুরির মোকর্দ্দমার কথা সেখানের অধিবাসীরা কখনো শোনে নাই, তাই 'ভান পিটে' আমি বিনাজেলে সাবালক হইয়াছি।

কার্ত্তিক মাস!—তখনো ফর্ষা হয় নাই। বাঁশ ঝাড় হইতে 'ফিঙে' দুই বার ডাকিয়া উঠিল শুনিয়া "কোঠার'' গায়ের ফোকর হইতে দোয়েল একবার শিষ দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমার শয্যাত্যাগের ইহাই মাহেন্দ্র ক্ষণ! উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইলাম,—কেননা 'লোকু' পাশী খেজুর গাছ কামাইয়া ভাঁড় পাতিয়াছে। ষষ্ঠীতলা, 'মুকুয্যের বেড়' ছাড়াইয়া লোকুর ভুঁয়ে গিয়া দেখি ষড়যন্ত্রকারীরা তখনো কেহ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা না আসিলে রসের রস গ্রহণই হইবে না; অগত্যা আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনো অস্ত যায় নাই,—পৃথিবী হাসিতেছে। দুরে খালের জলের আর্শিতে চেপ্টা চাঁদ মুখ দেখিতেছে, পূর্ব্বাকাশে শুকতারা ঝক্ ঝক্ করিতেছে! বুড়ো শিউলিগাছেরও বিশ্রাম নাই অনবরত ফুল গন্ধ ছড়াইয়া ভোরের হাওয়াটাকে সুগন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে। দেখি শিউলি তলায় দোলাই গায়ে গুটি সুটি হইয়া কে ফুল কুড়াইতেছে! "কেরে?" ভীত বালিকাকণ্ঠে উত্তর হইল "কুমোদাদা—

আমি"! "ঊষা! এতরাতে ফুল কুড়ুতে এসেছিস্,—ভয় নেই?"—"রাত কোথা,—এ ত' ভোর"! "এখনো ফর্ষা হয়নি, এ চাঁদের আলো;—বাড়ী যা"! অনুগ্রহ প্রার্থনার চক্ষে চাহিয়া ঊষা বলিল "তাহলে যে ফুলগুলি সবাই কুড়িয়ে নেবে"! "এত ফুল নিয়ে কি করবি"? "শিউলির বুঁটি দিয়ে কাপড় ছোপাব! এই দ্যাখ'না কেমন সুন্দর রং হয়।" বলিয়া বালিকা একবার নিজ বস্ত্রের প্রতি চাহিল, তারপরে আমার দিকে চাহিয়া আমার প্রসন্ন ভাবে সাহস পাইয়া বলিল, "গাছটা ঝাড়া দিয়ে দাওনা কুমোদা, মেলা ফুটে রয়েছে"। আমি বলিলাম "তা দিচ্চি—ঊষা—খেজুর রস খাবি? ঊষা গম্ভীর মুখে বলিল "এত ভোরে, ছিঃ! এখনো আমার পুকুর পূজো হয়নি, এখনি খাব কি?" "যাঃ তবে খাস্নি!" আমি গাছে উঠিয়া ডাল নাড়া দিতে লাগিলাম। ঝর্ঝর্ করিয়া পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে নীহারের বড় বড় ফোঁটা! ঊষা ত্রস্ত হইয়া উঠিল তবু ফুলের লোভ ত্যাগ করা যায় না। গন্ধে বায়ু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

পিঙ্গলা ঊষা আকাশের গায়ে দেখা দিলেন। চাঁদের আলো ম্লান হইয়া আসিল। বালিকারা দলে দলে আসিয়া জুটিল—তাহাদের নেত্রী আমার ভগিনী প্রভা আমায় দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহে ফুল কুড়াইতে লাগিল। আমি বলিলাম "হ্যাঁরে তোদের পুকুর পূজোর মন্তর কি"? চারিদিকে চাহিয়া ঊষা বলিল "কাকে শুন্লে পচে যায়;—মোন্তর জান না? হেলেঞ্চা কল্মী—লক্লক্ করে—রাজার ব্যাটা পক্ষী মারে"—"থাম্ থাম্"।—হাসিতে হাসিতে আমার পেটে খিল ধরিল। ঊষা অপ্রতিভ হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "তবে কি?" প্রভা দার্শনিক ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওকি মন্তর? অনুস্বর না থাক্লে কি মন্তর হয়!" আমার ভগিনীটি বালিকা সমাজে দ্বিতীয় চার্ব্বাক! 'পুণ্যি পুকুর' 'যম পুকুর' 'দশ পুতুল' প্রভৃতি বালিকা সুলভ ব্রতে কেহ তাহাকে ব্রতী করিতে পারে নাই। মন্ত্র শুনিলেই সে চটিয়া যায়। বলে মাসিমার মত অনুস্বর দেওয়া মন্ত্র বলত ব্রত কর্ব।"

তখন চারিদিকে কাক কোকিল দোয়েলে চেঁচামেচি বাধাইয়াছে। চেপ্টা চাঁদ পৃথিবীর আড়ালে গিয়াছেন। অদূরে আমার পারিষদদিগকে দেখিয়া আমি শিউলি গাছ হইতে নামিয়া খর্জ্জুর বৃক্ষাভিমুখে চলিলাম। * *

বৎসর না যাইতেই আমি নির্ব্বাসিত হইলাম। কলিকাতার বহুজন ও যানাকীর্ণ পথ আমার চক্ষে দ্বিতীয় হেলেনা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমার অভিভাবক ও গার্ডরূপী খুল্লতাত মহাশয়কে স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় সার হাডসন লো বলা যাইতে পারিত। উন্মুক্ত প্রকৃতির অশান্ত বালক আমি তাঁর শাসনে সত্যই যেন কারাগারে পড়িলাম। অতি কষ্টে গার্ড মহাশয়ের চক্ষুর অন্তরালে একখানি বই এবং একটি বিড়াল শাবক লইয়া নাড়ানাড়ির অভিনয় সর্ব্বদা করিতে হইত! বই খানি রবিবাবুর "বধূ" নামক কবিতার জন্যই আমার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আমিও সেই বালিকার মত বলিতে চাহিতাম "হায়রে রাজধানী পাষাণ কারা। * * ইটের পর ইট মাঝে মানুষ কীট, নাহিক ভালবাসা নাহিক খেলা!" তাহারি মত কাঁদিয়া বলিতাম

"কোথায় মাগো! * * উদিলে নবশশী ছাদের পরে বসি আর কি রূপকথা বলিবি না গো!"

গ্রীষ্মাবকাশ আসিল,—বাড়ী গেলাম,—কয়দিনের জন্য সেই পূর্ব্ব জীবন পাইলাম,—নীলু নেপ্‌লা হ'রেদের লইয়া গ্রাম মাথায় করিয়া তুলিলাম। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরে যে আকাঙ্খা গঠিত হইয়াছে—গোণা দিনে কি তার বুভুক্ষা নিবৃত্তি হয়! ছুটি ফুরাইল,—আবার সেণ্ট হেলেনায়!

শিক্ষা চলিতে লাগিল। চারিদিকের অবস্থায় আমি য়ুনিভারসিটির একটি পড়া পাখী হইলেও ভিতরে সেই গ্রাম্য বালক ছিলাম। তাই অন্তরের মধ্যে সেই পল্লী জীবনের সুখস্বপ্ন স্মৃতির মতই রহিয়া গেল।

সেবারে শারদা পার্ব্বণে বাড়ী যাইতেছিলাম। ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ী করিয়া আমাদের গ্রামে যাইতে হয়। আমি ছইয়ের মধ্যে শয়ন করিয়া শরতের আবাহনময় বায়ু উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছি! গাড়োয়ান নারিকেলের ছোবড়ায় আগুণ ধরাইয়া কলিকায় তামাকু খাইতে খাইতে মধ্যে মধ্যে "বাঁ-বাঁ ডাঁয়ে-ডাঁয়ে" বলিয়া বলদের লেজ মলিতে মলিতে মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে। দুই পার্শ্বে সারি সারি বড় বড় গাছ,—সম্মুখে সুন্দর "সড়ক" বরাবর সোজা চলিয়াছে। ষষ্ঠীর চাঁদ সন্ধ্যার আকাশে হাসিতেছে। সহসা পার্শ্বস্থ কুটীর হইতে একটা কৃষক গাহিয়া উঠিল "শরৎশশী দরশনে নন্দিনী পড়িল মনে; যাও গিরি ত্বরা করি আন গিয়ে উমাধনে।"—বড় ভাল লাগিল। এ শরৎ শশী দেখিয়া মায়েদের প্রাণ আজ দূরস্থ সন্তানের জন্য কত না ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে! মনে পড়িল উষার মার কথা! তিনি দূর সম্পর্কে আমাদের মাসিমাতা হইতেন। সেই দরিদ্রা অথচ আত্মনির্ভরশীলা স্নেহময়ী বিধবাকে সকলেই ভক্তি করিত, ভাল বাসিত। একবৎসর হইল উষার বিবাহ হইয়াছে,—তাহার রূপে বিখ্যাত ধনী গৃহের শোভা সে বর্দ্ধন করিয়াছে। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত সে শ্বশুরালয়ে। প্রভা লিখিয়াছে "আমাদের মাসিমা গরীব, তারা বড়লোক তাই বুঝি পাঠালে তাদের সম্মান হানি হবে।" মনে হইল এ শরৎশশী দেখিয়াও মাসিমার একমাত্র ধনকে গৃহে আনিবার ক্ষমতা নাই! তাঁর মুখ মনে পড়িয়া বড় কষ্ট হইল।

রাত্রেই বাড়ী পৌঁছিলাম,—কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই প্রভাতে সপ্তমী পূজা! প্রভা জাগ্রত হইয়া আমায় লইয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। তখনি সব কথা বলা চাই; "দাদা আজ উষা এসেছে"। "এসেছে? তারা পাঠিয়েছে?" "কি জানি কি মনে হয়েছে—পাঠিয়েছে—সঙ্গে ৪।৫ টা লোক, একাদশীর দিনই যাবে।"

প্রভাতে আগমনীর বাজনা বাজিয়া উঠিল—"গা তোল গা তোল বাঁধমা কুন্তল, ওই এল পাষাণী তোর ঈষাণী!" আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে লোকে লোকারণ্য! আমি ভোরে উঠিয়াই গ্রাম প্রদক্ষিণে গিয়াছিলাম, বেলা হইলে সদলে বাটী আসিয়া প্রতিমা দর্শনে গেলাম! থামের গায়ে ঠেস্ দিয়া এ কে! সর্ব্বাঙ্গে রত্নভূষণ, মহার্ঘ্য বস্ত্র পরিহিতা, মস্তকে শরৎ-প্রতিমার মতই উজ্জ্বল মুকুট, তার নীচে শুষ্ক স্থলপদ্মের মত মুখখানি!

সেই শরতের শেফালি ফুলটির মত উষাই কি এই ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী? উষা নতমুখী! গহনার ভারে বিশেষতঃ সকলের যুগপৎ দৃষ্টিতে একেবারে যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণে বৈষ্ণবেরা তখন গান ধরিয়াছে—

কৈ সে গিরি কই সে আমার
প্রাণের উমা নন্দিনী!—
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এল রণরঙ্গিনী!—
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী!
মা বলে ডাকে মুখে আধ আধ বাণী!

দেখি এককোণে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনাবৃত সজল চক্ষে মাসিমা এক একবার কন্যার দিকে চাহিতেছেন ও পূজার কি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার বেদনা যেন গিরিরাণীর উক্তিতে প্রকাশ হইতেছে। তাঁহার সে বালিকা উষার পরিবর্ত্তে এ মহিমাময়ী মূর্ত্তি যেন তিনিও সহ্য করিতে পারিতেছেন না! ইহাকে আর তিনি যেন 'আমার' বলিতে পারেন না। গোণাদিনের বেশী হৃদয়ের ধনকে রাখিবারও সাধ্য নাই! আমিও উষা বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না।

পূজার চারিদিন পরে উষা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। ক্রমে আমারও ছুটি ফুরাইতে চলিল। কিন্তু প্রভার ফোঁটা না লইয়া যাইবার উপায় নাই! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন স্নানান্তে এলোচুলে গীঁট বাঁধিয়া সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া গুপ্তপ্রেস পাঁজীর অনুকরণে বসিয়া যখন সে হাসি হাসি মুখে বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীদ্বারা আমাকে চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিল—তখন উষাকে মনে পড়িল। সেও অন্যবার ছোপানো কাপড়খানি পরিয়া পিঠে চুল ফেলিয়া হস্তে চন্দন দধি ঘৃত মধু ও দুর্ব্বা ধান্যের পাত্র লইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইত,—আমিই তার ভ্রাতৃস্থানীয় ছিলাম। প্রভা চঞ্চলা বাক্‌পটু,—সে শান্ত লজ্জাশীলা অথচ সরলা—তাই প্রভা অপেক্ষাও তাহাকে বেশী ভালবাসিতাম। প্রভা শত আব্দার লইয়া মন্ত্র না বলিয়া (কেন না তার মতে ও মন্ত্র নয়!) ফোঁটা দিত, কেবল দুগ্ধ দ্বারা আচমন দিবার সময় পাঁজীর মন্ত্রটি আবৃত্তি করিয়াই তাহার তৃপ্তি হইত! তাহার ফোঁটা দেওয়া হইলে উষা সম্মুখে বসিয়া স্নিগ্ধ সরল চক্ষে চাহিয়া সলজ্জ মৃদু স্বরে যখন মন্ত্র পড়িয়া ফোঁটা দিত "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়োরে পড়ল কাঁটা, যম যেমন চিরজীবি, আমার ভাই তেমনি চিরজীবি"—তখনি যেন আমার ফোঁটা নেওয়া সম্পন্ন হইত। এবার সে কোথায়! "পর গৃহে পর হ'য়ে আছে!"

পর বৎসর পূজার সময় বাড়ী যাই নাই—কেন না সম্মুখে একজামিন। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় যাইতে হইল। প্রভা শ্বশুর বাড়ী হইতে ফোঁটা দিতেই আসিয়াছে, অগত্যা দু চার দিনের জন্যও আমাকে যাইতে হইল।

বাড়ী পৌঁছিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। মার সঙ্গে দু একটা কথামাত্র কহিয়া শুইয়া পড়িলাম। এক ঘুমেই রাত্রিটুকু শেষ!

দোয়েল সেই ফাটলের মধ্য হইতে শিষ দিয়া ওঠায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মনে পড়িল প্রকৃতির এই সেই জাগরণ সঙ্কেত! একবার সেই দিনের মতন মুক্ত বাতাসে ঘাসের উপর তেমনি করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হইল। উঠিলাম। অনেক দুর বেড়াইয়া আসিলাম। ঐ বাম পার্শ্বে গাছ পালায় ঢাকা মাসিমার ক্ষুদ্র গৃহখানি!—অদূরে সেই খাল,—দক্ষিণে রায়েদের সেই বুড়ো শিউলি গাছ! এখন কি

আর আগেকার মত বালিকার দল ফুল কুড়ায় না? আমার মত কেহ ডাল নাড়া দিয়া দেয় না! কৌতূহলে নিকটে গিয়া দেখিলাম কে একজন ফুল কুড়াইতেছে বটে! শ্বেতবস্ত্রে আবৃতা, হস্তে একটি তাম্রপাত্র,—রুক্ষ কেশগুলা মুখের উপর আসিয়া নড়িতেছে,—এ কে? এমন নিদারুণ শ্বেতবস্ত্র কোন্ বালিকার?—একি উষা? সেই রাজৈশ্বর্য্যময়ীই কি এই?

অবশ বজ্রাহত ভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম বলিতে পারি না! "কুমোদাদা কবে এলে!—ভাল আছ?" এই প্রশ্নে সচকিত হইয়া চাহিলাম! সেই আগমনীর সানাইয়ের পরিবর্ত্তে তখন যেন বিসর্জ্জনের বাজনা চারি দিক হইতে কানে আসিতেছিল।

আমার উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই দেখিয়া উষা ম্লান করুণ হাস্যে বলিল, "বাড়ী চল, কুমোদাদা আজ যে ভাইদ্বিতীয়া!"

আমি নত নেত্রে সেই পূতঃ তাম্র পাত্রস্থিত দেবপূজার জন্য আহরিত শেফালিগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

পূজার স্বপ্ন।

বেল তরুতলে কখন ষষ্ঠী
পেরিয়ে গেছে,
সপ্তমী প্রভাত জাগেনি, তখনো
রাত্রি আছে।
গোখুরের ধ্বনি তখনো ফুটেনি
গ্রামের পথে,
উস্‌খুস্‌রব আসিছে পাখীর
কুলায় হ'তে।
হিমভিজা বায় রহিয়া রহিয়া
পুষ্প-সৌরভ আনিছে বহিয়া
নীহার বিন্দু পড়িছে ঝরিয়া
মাটির পরে;
তখনো আঁধার গাঁথা আছে বনে,
পল্লীবধূগণ লগ্ন শয়নে,
থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিছে স্বপনে
অলীক ডরে;
জাগিয়া তখন শুদ্ধ শান্ত মনে
সাজিটি হাতে,
পুষ্প চয়নে বাহিরি' পড়িনু
বিজন পথে।

রায়দের বাড়ী কুড়াতে ফুল
আসিনু যবে,
অরুণ তখন পূরবে কিরণ
ঢালিছে সবে।
তরুণ একটি বালিকাও সেথা
চয়নে রত,
প্রভাত আলোক চুমে তার মুখ
ফুলের মত;
হিমকণাগুলি হাসিয়া অলকে,
কভু ঝরে' পড়ে ঝলকে ঝলকে,
কচি হাত দিয়ে নীচু শাখে শাখে
তুলিছে ফুল;
সাঙ্গ করি' বালা পুষ্প চয়ন
দেখে সাজি তুলি' হয়নি পূরণ,
চায় মোর পানে তুলিয়া নয়ন
দ্বিধা-ব্যাকুল।
ঢালি' দিতে গেনু সব ফুল মোর
উজাড়ি' ডালা,
মুখখানি তুলি "থাক্" বলি' গেল
চলিয়া বালা।

ঘরে ঘরে হর্ষে হইছে তখন
সপ্তমী পূজা,
নদী তীরে তীরে লুটায় সমীরে
কাশের ধ্বজা।
মেঘে মেঘে মিলি' সুনীল আকাশে
করিছে খেলা,
ললিত কাকলী করিয়া ছুটিছে
বিহগ-মেলা।
ফুটে গীত রব পবন আকুলি',
বাঁধ ভাঙ্গি ছুটে নদনদী গুলি,
উর্ম্মি লইয়া করিতেছে কেলি
অরুণ-কণা;
সোহাগে চুমিয়া শরত কিরণ
যারে তারে হেসে করিছে হিরণ,
হৃদয় লইয়া খেলিছে পবন
চঞ্চল-মনা।
আসি ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিনু
তখন পুরে,
হৃদয়ে তখন বাজিছে রাগিণী
আকুল সুরে।

সপ্তমীর দিন স্বপ্ন-ছায়ায়
কখন গেল,
সুপ্তি-রজনী চিত্তে আমার
আঁধারি' এল।
অষ্টমী প্রভাতে চমকি' জাগিয়া
শয়ন হ'তে,
তেমনি চলিনু ধীরে রায়দের
বাগান পথে।
দেখিনু বালায় তুলিতেছে ফুল,
পথ পানে কভু চাহিছে আকুল,
রক্তরাগে রাঙা হয়েছে দুকুল
কাঁটার ঘা'য়ে;
ওড়না আমার ভিজাইয়া জলে
বাঁধি দিনু তার কোমল আঙ্গুলে,
নীরবে চাহিয়া গেল ধীরে চলে'
সাজিটি ল'য়ে;

বহুদূর গিয়া চাহিল ফিরিয়া
মুখটি তুলি',
আঁখি পাতা লাজে নত করি' গেল
ত্বরিত চলি'।

নবমীর প্রাতে সাজি নিয়ে হাতে
আসিল বালা,
নিজ হাতে তুলি' ফুলে দিনু তার
পূরিয়া ডালা।
ফুলদলে আর প্রসাদে বাদ্যে
হইল পূজা,
দশমীর দিনে ডুবিল সলিলে
এ দশভুজা।
হ'ল পূজা সারা এবারের মত,
চয়নের দিন হ'য়ে গেল গত,
বাঁশী বেজে' বেজে' ক'দিন সতত
থামিয়া গেল।
প্রবাসেতে গেনু নিজ গ্রাম ছাড়ি',
ছায়াসম স্মৃতি চলে অনুসরি',
আঁখিপাতা জলে কার কথা স্মরি'
ভরিয়া এল।
ফুটাইয়া ফুল শরৎ আবার
আসিবে কবে,
আঁখি পাতে কার সলাজ দৃষ্টি
ফুটিয়া রবে।

ফুটাইয়া ফুল শরৎ আবার
আসিল ফিরি,
অকারণে মেঘ আকাশের পটে
খেলিছে ধীরি।
প্রথম দু'দিন ফুলগাছ তলে
চয়ন বেলা;
নীরব সরমে সয়নে নয়নে
হইল খেলা।
নবমীর প্রাতে দেখি' গিয়ে বালা
বসিয়া বসিয়া গাঁথিয়াছে মালা,
লাজ-ম্রিয়মান পরাণ উতলা
কাহারে দিতে?

নীরবে পাশেতে দাঁড়ানু তাহার,
সহসা খসিল ভূমে ফুল-হার,
নয়ন পেলব নত হ'ল তার
লাজে চকিতে ;
নিজ হাতে তুলি' খসে'-পড়া মালা
পরিলাম গলে স্বহাতে তুলে ;
বালিকার কণ্ঠে দিনু পরাইয়ে
আবার খুলে'।

দেখিতে দেখিতে বর্ষ ঘুরিয়া
আসিল যেই,
মনে পড়ে গেল কত সাধ ভরা
চয়ন সেই।
গত বরষের মালিকা পরশ
তখনো জাগে,
লাজে নত মুখ তখনো ভাসিছে
নয়ন আগে ;
অরুণ তেমনি ঢালিছে কিরণ,
মেঘোপরি মেঘ হাসিছে হিরণ,
ফুলবন লুটি' বহিছে পবন
রেণুতে মাখা।
আসে নাই বালা এবার চয়নে,
বসে নাই কেহ চকিত নয়নে,
আড়ালেতে কেহ ঢাকে না বয়ানে
সরম-আঁকা ;
অনিল তখন অমনি থামিল
বহে না আর,
গগনে তপন নিবিল সহসা
বিশ্ব আঁধার।

বাকি দুই দিন তেমনি ফিরিনু
নিরাশ চিতে,
আসে নাই বালা, হাঁসেনি তপন
গগণ ভিতে।
একটি বরষ রাখিনু পরাণ
উন্মুখ করি',
চেনা পথে পুন চলিনু তা' পরে
সাজিটী ধরি' ;
গোঁসাই হাটেরে রাখিয়া ডাহিনে,
নমশূদ্র পাড়া ফেলি' বাম পানে
রায় বাগানের আসিনু সামনে
কম্পিত হৃদে ;
ক্ষণকাল ভয়ে মেলেনি নয়ান,
পাছে দেখি পুনঃ শূন্য বাগান,
ক্ষীণ আশা যদি হয় অবসান
ভাঙিয়া নিদে!
একি একি হায়! নিঠুর বিধাতা
দেখিনু আজ,
বরষ না যেতে শুভ্র বাসে তার
বিধবা সাজ!

তার পর কত দিবস কাটিল
কেমন করে',
জানিনা ঘুমা'য়ে অথবা জাগিয়ে
আছিনু ঘরে!
শুধু মনে হয় তিমির নিশীথে
শ্মশান-ঘাটে,
মৃত দেহ মোর আবরি' বসনে
রাখিল খাটে ;
আবরণ-ঘেরা অন্য দেহ কার
শুয়াইয়া দিল পাশেতে আমার,
উড়াল বাতাসে বহিয়া তাহার
মুখের বাসে,
চিনিনু তখনি সে করুণ মুখে,
তখনো সে মালা গাঁথা আছে বুকে,
পূরিল অনিল মিলনের সুখে
গন্ধোচ্ছ্বাসে ;
মৃত্যু-তীরে বসি' চাহিনু দুজনে
দুজনা পানে,
ও পারে তখন সানাই বাজিছে
বিজয়া গানে।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

মণিসিংহ।

শিখবীর ভাই মণিসিংহ আবাল্য গুরুভক্ত। তিনি ভক্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চবর্ষ, সেই সময় একবার তাঁহার পিতা গুরুদর্শনে গমন করেন। মণির বয়স অতি অল্প হইলেও তিনি গুরু দর্শনের অভিলাষী হওয়ায় ভক্ত পিতা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। গুরুর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বালকের প্রাণে বিমল প্রেমের বীজ উপ্ত হয়। গুরুর "কড়াহ্ প্রসাদ" পাইয়া মণি আর গৃহে ফিরিলেন না। পিতাকে বলিলেন—"গুরুর প্রসাদ আমার ভাল লাগিয়াছে। আমি আর গৃহে ফিরিব না।" পিতা কত বুঝাইলেন ; কিন্তু পুত্র কিছুতেই বুঝিলেন না। তখন অগত্যা পিতা পুত্রকে গুরুপদে উপহার দিয়া গৃহে ফিরিলেন। সেই অবধি মণি গুরুর দাস হইলেন।

গুরু গোবিন্দসিংহ বালক মণির বিদ্যা-শিক্ষার যথাবৎ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অল্প বয়সেই মণি যথেষ্ট বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন। গুরুর সহবাসে থাকিয়া তাঁহার হৃদয় উদার ও পর-দুঃখ-কাতর হইয়া উঠিল। গুরুর প্রসাদে মণি আধ্যাত্মিক জগতে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিলেন।

গুরু মণিকে জ্যেষ্ঠ পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। মণিও প্রতিকার্য্যে গুরুর সহায়তা করিতেন। তিনি গুরুর প্রধান মুন্সী ছিলেন। গুরু বলিয়া যাইতেন, আর মণি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ সাহেব তাঁহা দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। তিনি গুরুকে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। গুরুও বেশ আগ্রহের সহিত শিষ্যের পাঠ শুনিতেন। মণি অনেকগুলি গ্রন্থ অনুবাদিত করেন, এবং কয়েকখানি পুস্তকের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন। অনেক বিষয়ে তিনি গুরুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন।

আনন্দপুর পতনের পর গুরু কতিপয় অনুচরসহ চমকৌড় দুর্গে প্রস্থান করেন। এই সময় তিনি তাঁহার দুই সহধর্ম্মিণীকে অন্যত্র প্রেরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। পুত্র-মণির হস্তে দুই পত্নীর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। মণি গুরুর আজ্ঞামত মাতৃগণকে দিল্লী লইয়া যান। তথায় তাঁহারা সংগোপনে বাস করিতে থাকেন।

গোবিন্দের এই দুই পত্নীর নাম—মাই সুন্দরণ এবং মাই সাহেব দিবান। মাতৃগণ গুরুগতপ্রাণা ছিলেন কিন্তু স্বামীর আদেশ অবশ্য পালনীয়। তজ্জন্য তাঁহারা হৃদয়াবেগ দমন করিয়া এত দূরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই গুরুর সংবাদ পাইতেন। গুরুর প্রতি তখন বিজয়শ্রী বিমুখ হইয়াছিলেন। গুরু তখন প্রতিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে "জঙ্গল দেশে" পলায়ন করিতে বাধ্য হন। গুরুর উপর্য্যুপরি বিপদকাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃদয় শোকাবেগে উদ্বেগ হইয়া উঠিত। তার পর যখন ফতেসিংহ ও জোরবার সিংহের বীভৎস হত্যাকাহিনী * তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল, তখন তাঁহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া

* গত শ্রাবণ মাসের ঐতিহাসিক চিত্রে সিংহশিশু প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উঠিলেন। কিন্তু মণিসিংহের একান্ত চেষ্টায় ও শুশ্রূষায় তাঁহারা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। মণি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌পটুতার সহিত গুরুগণের আত্মত্যাগ কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন।

কয়েক বর্ষ পরে গোবিন্দের জয়শ্রী ফিরিল। তাঁহার অধ্যবসায় ও মাহাত্ম্য গুণে আবার তাঁহার ছত্রতলে দ্বাদশ সহস্র সৈনিক একত্রিত হইল। গোবিন্দ তাহাদের সাহায্যে মুক্তসরে সিরহিন্দের নবাবকে পরাজিত করিয়া লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন। রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে তিনি কিছুকাল মালব প্রদেশান্তর্গত দমদমাতে অবস্থান করেন।

এই শুভ সংবাদ শ্রুত হইয়া ভাই মণি গুরু-পত্নীদের লইয়া দমদমাতে উপস্থিত হন। গুরু মণির ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। কতকাল পরে আবার গুরু-শিষ্যের মিলন হইল।

এই দমদমা অবস্থান কালে গুরু পুনরায় সমগ্র গ্রন্থ আবৃত্তি করেন ও ভাই মণি তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থে নবমগুরু তেগ বাহাদুরের স্তোত্রগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়। গ্রন্থ সাহেবের এই সংস্করণ 'দমদমা সংস্করণ নামে খ্যাত। বহুকাল এই গ্রন্থখানি দমদমার গুরু মঠে রক্ষিত ছিল। তার পর তাহা হারাইয়া যায়। কোন মতে নাদির শাহ ভারতাক্রমণ কালে ইহা লুণ্ঠন করিয়া কাবুলে লইয়া যান, কোন মতে ইহা এখনও পাটনার গুরুমঠে বিরাজ করিতেছে।

রাজ্যোদ্ধারের কিছুকাল পরে গুরুর সহিত তদানীন্তন নূতন সম্রাট বাহাদুর সাহের সম্প্রীতি ঘটে। তাহার ফলে গুরু সম্রাটের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বের মনসবদার হইয়া দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। যাত্রাকালে গুরু ভাই মণির সহিত মাতা সুন্দরণকে দিল্লী প্রেরণ করেন; কিন্তু মাতা সাহেব দিবান কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা গুরু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই দক্ষিণাপথে গমন করেন। তথায় অল্পকাল অবস্থানের পর গুরুর শেষকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে। গুরু তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিয়া মাতা দিবানকে দিল্লী পাঠাইয়া দেন। মাতা কোন মতেই গুরুর সঙ্গ ত্যাগে সম্মত হন নাই। এত দূরে যাইয়া মাতা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? তিনি যে গুরুপদ বিনা অন্য কিছুই জানেন না। এই এতকাল পরে তিনি একবার সে পদ পূজা করিতে পাইয়াছেন। আবার এত শীঘ্র তাহা কিরূপে ত্যাগ করিবেন! মাতার কাতর ভাব দেখিয়া গুরু তাঁহাকে স্বীয় অস্ত্রাদি * প্রদান করিলেন। মাতাকে বুঝাইলেন, বৃথা কাতর হইয়া কোন লাভ নাই; ভক্তির সহিত ভগবদ্প্রেমে আপ্লুত হইয়া মাতা যেন জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দেন; আরও বলিলেন—"এই অস্ত্র দেখিলেই তুমি আমার দেখা পাইবে।" মাতা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া অচিরে দিল্লী গমন করিলেন। তথায় মাতা সর্ব্বদা স্বামী ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। অধিক দিন তাঁহাকে স্বামীর

* এই অস্ত্রগুলি গুরু উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছিলেন। এগুলি ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দ তেগ বাহাদুরকে দান করেন। তেগ আবার গোবিন্দকে প্রদান করেন।

সহিত লৌকিক বিরহ সহ্য করিতে হয় নাই। শীঘ্রই তিনি দেহত্যাগ করিয়া গুরুর আত্মার সহিত মিশিয়া যান।

গুরু মৃত্যুকালে বান্দাকে শিখদিগের নেতৃ পদে বরণ করিয়া যান। বান্দাকে তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেন শিখদিগের ধর্ম্মমতে হস্তক্ষেপ না করেন; বান্দা শিখদিগের রাজা মাত্র হইলেন; ধর্ম্ম সংস্কারের ভার খালসার উপর প্রদত্ত হইল। বান্দাও মুমূর্ষু গুরুর নিকট কেবল রাজপদে মাত্র সন্তুষ্ট থাকিবেন বলিয়াই প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অতঃপর বান্দা উত্তর ভারতে আসিয়া শিখশক্তি বর্দ্ধনে মনঃ সংযোগ করেন। তাঁহার প্রতাপে দেশের মুসলমানবর্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। বাহাদুর সাহ তৎপর না হইলে তিনি সমগ্র ভারতে শিখরাজত্ব বিস্তার করিতে পারিতেন। বান্দা রাজগর্ব্বে মুগ্ধ হইয়া শেষে গুরুর নিকট স্বীয় প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হন ও শিখদিগের ধর্ম্মনেতৃত্ব পাইবার জন্য প্রয়াস পান। ফলে শিখ সমাজে দুইটি দল সংঘটিত হয়। এক দল বান্দার পক্ষে, অন্য দল তাঁহার এরূপ অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধবাদী হইলেন। মাতা সুন্দরণ পত্র দিয়া বান্দাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হইল না। তখন মাতা শিখ সমাজে ঘোষণা করিলেন যে, সকলে যেন বান্দার পক্ষ পরিত্যাগ করেন। এ ঘোষণায় যথেষ্ট ফল দর্শিয়াছিল। তথাপি বান্দার কতিপয় অনুচর নিতান্ত মূর্খের ন্যায় শিখদিগের সহিত বৃথা কলহ করিয়া দুই দলে বিদ্বেষ ভাব উপ্ত করিয়াছিল।

ভাই মণির অমায়িক ও নিঃস্বার্থ আচরণে দিল্লীস্থ শিখেরা তাঁহাকে খালসা পক্ষ সমর্থনের জন্য এক পত্রসহ অমৃতসরে প্রেরণ করিলেন। সে পত্রে মাতা মণির যথেষ্ট গুণ বর্ণনা করিয়া শেষে বলেন, মণি তাঁহার পুত্র স্বরূপ ও গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রকৃত শিষ্য। ভাই মণি সেই পত্র লইয়া অমৃতসরে গমন করিলে তথাকার শিখেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল ও তাঁহাকে তথাকার হরমন্দিরের প্রধান পৌরহিত্যে বরণ করিল। ভাই মণিসিংহ শিখ সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইলেন।

এই গুরুপদ পাইয়াই ভাই মণি সকল বিবাদ মিটাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইলেন। তিনি খালসাপন্থী ও বান্দাপান্থীর শিখদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন—"অমৃত সরের এই দীর্ঘিকাতে গুরু গোবিন্দ সিংহের ও বান্দার নাম লিখিয়া দুইখণ্ড কাগজ ফেলিয়া দেওয়া হইবে। যে কাগজ ভাসিয়া উঠিবে, তল্লিখিত ব্যক্তিই আমাদের গুরু বলিয়া স্বীকৃত হইবেন। আর যদি কোন খানিই না ভাসিয়ে উঠে, তবে আমাদের যাবতীয় পূজোপহার তুর্ক (মোগল) রাজন্যদিগকে প্রদত্ত হইবে।"

প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। তখন সহরস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে মধ্যস্থ মানা হইল। মধ্যস্থের সমক্ষে দুইখণ্ড কাগজ দীর্ঘিকায় নিক্ষেপ করা হইল। নিক্ষেপ মাত্র দুইখানিই জলমগ্ন হইল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে খালসা-পন্থীদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ নামের কাগজ খানি ভাসিয়া উঠিল।—ভক্তের প্রবল বিশ্বাস জয়যুক্ত হইল। তখন প্রকৃত পক্ষে

বান্দার দল পরাজিত হইল। কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়াও দাবী ত্যাগ করিল না। কাজেই উভয় পক্ষের বিবাদ ক্রমশ যুদ্ধে পরিণত হইল। হরমন্দরের সীমানার মধ্যেই উভয় দল অসি ও বন্দুক লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইল। তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর বান্দার দল প্রতিহত হইল। তাহারা তৎপরে আর কখনও ধর্ম্ম জগতে নেতৃত্ব লাভের প্রয়াস পায় নাই।

ভাই মণিসিংহ একান্ত চেষ্টা করিয়াও বিবাদ বন্ধ করিতে পারেন নাই। বান্দার দলের অন্যায় বাড়াবাড়িতে উক্তরূপ আত্মদ্রোহ সংঘটিত হইয়া সমগ্র শিখসমাজের লজ্জার কারণ ঘটিয়াছে। শিখ হস্তে শিখের রক্তপাতে পবিত্র দেবমন্দির রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল!

মণিসিং পৌরহিত্যে বরিত হইয়া বহুকাল শিখ-সেবা করেন। তাঁহার সারল্য, অমায়িকতা, নিঃস্বার্থপরতা ও পরহিতৈষণায়—শিখ-সমাজের সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। শিখসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রিয় কার্য্য হইয়াছিল। সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি আপনার আত্মীয় স্বজনকে ভুলিয়া ছিলেন, পার্থিক সুখসম্পদের মোহ তুচ্ছ করিয়াছিলেন। শিখের জন্য তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত ঋষিকল্প ছিলেন।

অমৃতসরে অবস্থান কালে তাঁহাকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। সে সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া অবসর সময়ে তিনি শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেব আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেন। তিনি শ্রী গ্রন্থ সাহেবের একটি নূতন সংস্করণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে গুরুগণের স্তোত্রগুলি এক নূতন স্বাধীন প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। তাঁহার সে বিভাগ দৃষ্টে গুরুগণের বিভিন্ন ভাব সহজেই জানিতে পারা যাইত। এরূপ একটি অভিনব সংস্করণের ইচ্ছা তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে ছিল। কিন্তু এতকাল তাহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। এখন হর-মন্দরে অবস্থান কালে সেই পুণ্য ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

সংস্করণ লিপিবদ্ধ হইলে ভাই মণি একটি প্রকাশ্য দরবার করিলেন। তাহাতে সমগ্র শিখ একত্রিত হইল। তিনি তাহাদিগের নিকট ঐরূপ সংস্করণের আবশ্যক প্রতিপন্ন করিয়া আপনার সংস্করণটি প্রদান করিলেন। ইহাতে শিখেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা জানিত, শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব শ্রীগুরু-গণের দেহস্বরূপ। তাহা যেরূপ আছে, সেইরূপ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তদ্বিপরীত কোন কার্য্য করিলে গুরুগণের অবমাননা হয় ও গ্রন্থ সাহেবের স্তোত্রগুলির বিভাগে গুরুদেহ খণ্ড খণ্ড করা হয়। আর দশম গুরুও মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন যে, গ্রন্থ সাহেবকে গুরুর ন্যায় মান্য করিবে। তাই তাহারা সকলে এক মত হইয়া মণির প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিল যে, তিনি গুরু দেহ যেরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহও সেইরূপ খণ্ড খণ্ড করা হউক।

ভক্তির আতিশয্যে শিখেরা গুরুবাক্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাহারা বুঝে নাই যে, গ্রন্থসাহেব গুরু নহেন, কিন্তু গুরুর ন্যায় মাননীয়। গ্রন্থ সাহেব-বিশ্লেষণে গুরুদেহ ক্ষতবিক্ষত করা হয় না, বরং গুরুকে

পূর্ণভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা হয়। গুরুই স্বয়ং একদা বলিয়াছিলেন, গ্রন্থ সাহেবের ব্যাখ্যা কর্ত্তা নিশ্চয়ই মুক্তি পাইবেন।*

ভাই মণি ধীরভাবে শিখদিগের দণ্ডাজ্ঞা শুনিলেন। তিনি জানিতেন, তিনি কোন অন্যায় করেন নাই। গুরুর সাহায্যে গুরুর মতামত সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও হয় নাই। তথাপি তিনি নত মস্তকে দণ্ডাজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু নানা কারণে সে দণ্ডাজ্ঞা শেষে রহিত করা হয়।

এই নব সংস্করণ প্রণয়ন ব্যতিরেকে তিনি আর একটি মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন। এজন্য শিখ-সমাজ কেন সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি অনেক চেষ্টায় গুরু-গোবিন্দ সিংহের বিক্ষিপ্ত স্তোত্র ও কবিতা-বলী একত্রিত করেন। তাহাই আজ "দশবাঁ পাদ্‌শাহ কা গ্রন্থ" নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে গোবিন্দের কতিপয় ভক্তের কবিতাও গৃহীত হইয়াছে। ভাই মণি যদি এই সঙ্কলন কার্য্য না সমাধা করিতেন, তবে আজ গুরু-গোবিন্দের একটি প্রধান কীর্ত্তি একেবারে লোপ পাইত।

মণি সিংহের জীবনের শেষ কালে এক মহান্ অনর্থ ঘটিল। পঞ্জাবের তদানীন্তন নবাব কোন কারণে শিখদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন ও শিখ হত্যার জন্য উত্তেজিত হন। তিনি রাজ্যময় ঘোষণা করেন, যে কেহ শিখ-হত্যা করিতে পারিবে, সেই রাজ-পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে শিখদিগের নিগ্রহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। কাজেই তাহারা নগর গ্রাম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। কারণ, সহরে বা গ্রামে আসিলেই ধৃত হইবার সম্ভাবনা, আর একবার ধৃত হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

রাজ-অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সকল শিখই পলাইল; কিন্তু ভাই মণিসিংহ পলাইলেন না। তাঁহার হস্তে হরমন্দরের রক্ষা ভার ন্যস্ত। কোন্ লজ্জায় তিনি প্রাণের ভয়ে কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবেন? তিনি হরমন্দরে থাকিয়াই দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। দেব-সেবায় যে অর্থ সংগৃহীত হইত, তাহার কতকাংশ মাতা সুন্দরণের জন্য অবশিষ্ট অতিথি সেবায় নিঃশেষিত হইত।

শিখদিগের আত্মগোপনে হরমন্দরের অর্থ-কৃচ্ছতা উপস্থিত হইল। অতিথি সেবায় বাধা পড়িবার সম্ভাবনা হইল। তখন ভাই মণি-সিংহ সহরস্থ সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র মুসলমান সর্দ্দার-দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি উৎসব করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ভাই মণি-সিংহ শিখ হইলেও সহরস্থ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার পরার্থপরতায় ও বাক্‌পটুতায় সকলেই মুগ্ধ ছিল। তাই এতকাল তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই। কিন্তু রাজ অত্যাচারের মধ্যে উৎসব করা সহজ কথা নহে। রাজ-অত্যাচারে শিখদিগের সমস্ত উৎসবই প্রকাশ্য ভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মণি ভাবিলেন, কোনরূপে একটি উৎসব করিতে পারিলেই হরমন্দিরের অর্থ কৃচ্ছতা ঘুচিবে, আবার দেব-সেবা কার্য্য যথাবৎ চলিতে পারিবে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া ভাই মণি নবাবের

* প্রহ্লাদ রায়ের "রীতনামা"।

নিকট এক আবেদন পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে আগামী দেওয়ালিতে হরমন্দরে উৎসব করিতে দেওয়া হয়—এজন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইল। নবাব অনেক বিবেচনার পর আবেদন মঞ্জুর করিলেন; কিন্তু আদেশ করিলেন, উৎসব উপলক্ষে রাজসরকারে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দান করিতে হইবে। মণিসিংহ তাহাতেই সম্মত হইলেন।

উৎসবের কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হইল। ক্রমে দেওয়ালি উপস্থিত হইল। রাজসৈন্যগণ ছদ্মবেশে অমৃতসর ঘিরিয়া ফেলিল। উদ্দেশ্য, শিখদিগকে এক স্থানে পাইলে নির্ব্বিচারে হত্যা করিবার সুবিধা হইবে। এ সুবিধা ত্যাগ করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া নবাব এরূপ কৌশল খেলিয়া ছিলেন। কিন্তু নবাবের শত চেষ্টাতেও তাঁহার সংকল্প গোপন রহিল না। শিখেরা সাবধান হইল। তাহারা উৎসবে যোগদান করিল না।

উৎসব না হওয়ায় হরমন্দরের অর্থসাচ্ছল্য ঘটিতে পাইল না। কিন্তু রাজসরকার সে কথা শুনিবেন কেন? প্রতিশ্রুত পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আদায়ের জন্য অচিরেই নবাবভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাই মণি অর্থ প্রদান করিতে পারিলেন না। ফলে তিনি বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করা হয়, তথাপি তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থাপিত করা হইল। কাজি তাঁহাকে অর্থ-দানের অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বীর মণি, ধীর ও গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—"যখন নবাবেরই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে উৎসব হইল না, তখন আমার নিকট অর্থ প্রার্থনা করা নিতান্তই অন্যায়। শিখদিগকে হত্যা করিবার জন্য তিনি গুপ্তভাবে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিয়া কোন শিখই উৎসবে যোগ দেয় নাই। কাজেই হরমন্দরে অর্থ নাই। সুতরাং আমি অর্থদানে অক্ষম।" তিনি আরও বলিলেন যে, নবাব যদি আগামী বৈশাখী উৎসব করিবার অনুমতি দেন ও যাত্রীদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা হইবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তিনি সেই সময় অর্থ দিতে স্বীকৃত আছেন; অন্যথা তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা সরকারের নিতান্তই অন্যায় আচরণ।

বিচারান্তে কাজি নবাবকে জানাইলেন—ভাই মণি সিংহ বিদ্রোহী শিখদিগের ধর্ম্মগুরু ও নেতা। তিনি প্রত্যহ রাজদ্রোহ প্রচার করেন। তিনি অর্থ দানে অক্ষম; এজন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে বিষম যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে হত্যা করাই বিধি সঙ্গত। এই দণ্ড ব্যতীত আর কোন দণ্ড তাঁহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে যদি তিনি ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাহা হইলেই মুক্তি পাইতে পারেন। নতুবা তাঁহাকে ক্ষমা করা কোন মতে রাজনীতিসঙ্গত নহে। তিনি ইস্লাম ধর্ম্মের ও রাজসরকারের প্রধান শত্রু।

মণির মুক্তি-প্রার্থী হইয়া তাঁহার কতিপয় বন্ধু চাঁদা করিয়া পঞ্চ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করেন ও তাহা রাজসরকারে জমা দিতে চেষ্টা করেন। এ কথা জানিতে পারিয়া ভাই মণি তাঁহাদিগকে সেরূপ কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"না আমার মুক্তির

জন্য কিছুই দান করিও না। যে দণ্ড প্রদত্ত হইবে, তাহাই বিধি নির্দ্দিষ্ট দণ্ড বলিয়া আমি আলিঙ্গন করিব। কাজির দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে আমি ভগবানের ইচ্ছার আভাস পাইয়াছি। যদি এই দেহের বিনিময়ে শিখসমাজের কোন মঙ্গল ঘটে, যদি এই দেহত্যাগ ভগবানের কোন গূঢ় শুভ ইচ্ছা সাধনের সহায় হয়, তবে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ রক্ষার জন্য চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নয়। ভাই সব! তোমরা কিছুই ভাবিও না। আমার মৃত্যুতে শিখ-সমাজের কোন ক্ষতিই হইবে না, প্রত্যুত শিখধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে।" তাঁহার অনুরোধে বন্ধুগণ নিবৃত্ত হইলেন। রাজসরকারে অর্থ প্রদত্ত হইল না। ভাই মণি সিংহ অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মোগলেরা যত অত্যাচার করিবে, দেশবাসীর দেশ হিতৈষণা ও ধর্ম্ম পিপাসা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া ভাই মণি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন—"আমি প্রস্তুত হইয়াছি। আপনার আদেশ প্রতিপালিত হউক। আপনার ঘাতকদের আহ্বান করুন। তাহাদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন আমার শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি ছেদন করিতে করিতে আমায় হত্যা করে।"

মণির সাহসিকতায় নবাব মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা পাইলেন। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানা প্রলোভন দেখাইলেন। বিপুল ধন, উচ্চ রাজপদ, সুন্দরী ও মনোরমা স্ত্রী—সকল প্রলোভনই বৃথা হইল। মণি ঘৃণার সহিত নবাবের সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বারম্বার প্রতিহত হইয়া নবাবের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। নবাব তখনই জল্লাদের হস্তে মণিসিংহকে সমর্পণ করিলেন। জল্লাদ তাঁহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া গেল। যাইবার সময়ে মণি নবাবকে বলিলেন—"নির্দ্দোষের উপর নির্য্যাতন যতই বৃদ্ধি পাইবে, তোমাদিগের রাজ্যের পতন ততই অদূরবর্ত্তী হইবে।"

বধ্য-ভূমি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সাধু ভক্ত পরার্থপর বীরের শেষ দশা দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে জন-সংঘ তথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই বিষণ্ণ। সেই জনসমুদ্র ভেদ করিয়া বীর মণি অম্লানবদনে ঘাতকের সহিত বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

লাহোর সহরের মুক্তিদ্বারের বহির্ভাগে বধ্যস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইলে ঘাতকেরা তাঁহার সেই জড় দেহের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া সে দেহ শতধা বিভক্ত করিল। প্রথমে একটু একটু করিয়া হস্তচ্ছেদ করা হইল তার পর আবার একটু একটু করিয়া সমস্ত শরীর খণ্ড খণ্ড করা হইল। দেব সমাধিমগ্ন হইয়াই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরের প্রতি যে এত অত্যাচার চলিল, তাহা তিনি বুঝি জানিতেও পারিলেন না। সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সেই বিশাল নয়ন তেজোদীপ্ত, প্রশান্ত আস্য হাস্যময় রহিল। ক্ষণেকের তরেও কাতর চিহ্ন তাঁহার বদনে প্রকটিত হয় নাই।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসামের শঙ্করদেব ও মাধবদেব।

শঙ্করের তিরোধানের পরে মাধব দেব গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া বড়পেটার নিকটে সুন্দরীদিয়াতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

মাধবদেব চিরকুমার ছিলেন। এমন কি গুরু শঙ্করও তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। তদুত্তরে মাধব বলে—

"আক নু বুলিবা বাপ ধরোঁ চরণক।
বিবাহ করিবে নু বুলিবন্ত আমাক।
ন করিবোঁ এহিমান মাত্র তবহু বাক্।

মাধব গুরুর কেবল এই আদেশটি পালন করেন নাই। শঙ্কর ইহাতে বলিয়াছিলেন।

"অভুক্ত বৈরাগ্য তুমি করিলা মনত।
এতেকে পেহ্লাইবা বাদ ভক্তির পথত॥" (প)

বিবাহ করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি আপন ভাগিনেয় রামচরণকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। মাধব রামচরণকে শিক্ষা দিয়া সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। সুন্দরীদিয়া ও বামুনার বর্ত্তমান 'মহাপুরুষিয়া' অধিকারিগণ এই রামচরণেরই বংশধর।

শঙ্করের ন্যায় মাধবের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণগণ রঘুদেব (ফ) রাজার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মাধব "অনাচার করি নষ্ট করিল জগৎ" শুনিতে পাইয়া রঘুদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। মাধবকে হস্তপদে বন্ধন করিয়া রাজসমীপে হাজির করা হইল। মাধব বিচারে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু স্থির করিলেন—

"ব্রাহ্মণ সকলে ছিদ্রে চাবৈ বারম্বার
ইদেশত জানা আমি না থাকাওঁ আর॥"

সুতরাং "ভকতক দ্বেষ বোপা করে যি দেশত" সেই দেশ মাধব পরিত্যাগ করিলেন। রামচরণকে বড়পেটায় রাখিয়া তিনি কোচ-বিহারে গমন করিলেন এবং তথায় তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ রাজার আশ্রয় পাইলেন। রঘুদেবের রাজ্য ছাড়িয়া তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া ১৫১৮ শকে মানবলীলাসম্বরণ করিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে মাধব "ভেলাদৈ"তে দেহত্যাগ করেন। দৈত্যারি ঠাকুর বলেন—

"চৌধশ নবৈ শকত নিশ্চয়
শঙ্কর বৈকুণ্ঠ গৈলা।
তার পাছে আর আঠাইশ বছর
মাধব দেব আছিলা॥
পঞ্চদশ শত আঠার শকত
বৈকুণ্ঠ গৈলা মাধব।
শক গণিলাত জানিবা সংখ্যাত
নির্ণয় সবে বৈষ্ণব॥" ১৭১৬

শঙ্করের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির পর তাঁহার আদেশানুসারেই মাধব গুরুর আসন গ্রহণ করেন। একবৎসর অতীত হইল—শঙ্করের মৃত্যুতিথি উপস্থিত। নিমন্ত্রিত হইয়াও দামোদর ঠাকুর—উপস্থিত হইলেন না। শঙ্করের জীবিতকালে দামোদর ঠাকুর তাঁহার সহিত অনেক সময়ে মিলিয়া মিশিয়া লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিভাব বা শত্রুতা ছিল না। বরং একে অপরকে বন্ধু মনে করিতেন। কিন্তু শঙ্করের সাম্বৎসরিক তিথিতে তিনি উপস্থিত হইলেন না। কারণ কি? অন্য কারণ যাহাই হউক আমার বোধহয় মাধবের প্রতি অসন্তুষ্টি ই ইহার প্রধান কারণ। মাধব শঙ্করের ন্যায় দ্বিজভক্তিসম্পন্ন ছিলেন না; এবং নানা কারণে ব্রাহ্মণের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং গুরুর জীবিতাবস্থায় মাধবের সহিত দামোদর ঠাকুরের বিশেষ অসদ্ভাব না থাকিলেও, শঙ্করের "তিথি"তে তাঁহার অনুপস্থিতিহেতু মাধব ও তাঁহার অনুচরবর্গ বড়ই রুষ্ট হইলেন। মাধব স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "আর আন বেলা পুনু ন মাতিবা তাঙ্ক।" মহাপুরুষিয়াদের সহিত দামোদরের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। অদ্যাপি মহাপুরুষিয়া ও দামোদরিয়াদের মধ্যে বড় সদ্ভাব নাই। ইহাদের একে অপরের নিকট স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমত প্রকাশ করে না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে হরিদেব ঠাকুরও শঙ্কর-দেবের এক প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি শঙ্করের সহিত শ্রীচৈতন্যদর্শনে গিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর-দেবের জীবিতকালে হরিদেব স্বতন্ত্র সত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। হরিদেব শঙ্করদেবের সহচর হইলেও মহাপুরুষিয়াদের সহিত হরিদেব-সম্প্রদায়ের বিশেষ মিলমিশ নাই। সম্প্রতি 'বহুরীর সত্র'ই কামরূপে হরিদেব সম্প্রদায়ের প্রদান সত্র। বহুরীর বর্ত্তমান অধিকারী হরিদেব-জামাতা জগন্নাথের বংশধর।

মাধব নানাস্থানে সত্র স্থাপন করিয়া তাহার অধিকারী স্বরূপে প্রিয়শিষ্য ও ধর্ম্মবন্ধুগণকে "আতা" নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'গোপাল আতা' পৌত্তলিকতার অছিলায় গুরুকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দলভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। এবং ভবানীপুরে স্বতন্ত্র সত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং তাহার অধিকারী হইলেন।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে অসম-দেশে বৈষ্ণবগণ চারিভাগে বিভক্ত,—১মহাপুরুষিয়া, ২ দামোদরিয়া, ৩ হরিদেবিয়া ও ৪ গোপালদেবিয়া সম্প্রদায়। ইহারা একই বৈষ্ণবপন্থী হইলেও শিক্ষা ও শিক্ষকভেদে বিভিন্ন। এবং ইহাদের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

শঙ্করদেব মহাপুরুষিয়াদের আদিগুরু ও প্রবর্ত্তক হইলেও, শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে "মহাপুরুষিয়া" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। শঙ্করদেব অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মাধব তদপেক্ষা চতুর ও বুদ্ধিমান। তিনি দেশকাল অবস্থা পাত্র বুঝিয়া বিধিব্যবস্থা করিতেন। মাধব এই সকল গুণে শিষ্যদের সমধিক প্রিয় হইয়া "মহাপুরুষ" হইলেন;—শঙ্করপন্থিগণ আপনাদিগকে মহা-"পুরুষিয়া" আখ্যা দিয়া ধন্য হইল।

শঙ্করমাধবের ধর্ম্মমত বিশ্বাস ও লোকশিক্ষা সম্বন্ধে অধিক বাক্যবিস্তার না করিয়া—

প) শঙ্কর ঠিকই বলিয়াছিলেন। মাধব সরল ভক্ত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। গুরুর তিরোধানের পরে মাধবের কিছু কিছু আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ফ) এই রঘুদেব নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ ওরফে চিলারায়ের পুত্র। নরনারায়ণ প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পরে বৃদ্ধ বয়সে নরনারায়ণের অপত্য জন্মিল। রঘুদেব বিদ্রোহী হইল। নরনারায়ণ আত্মজ লক্ষ্মীনারায়ণ ও রঘুদেবকে রাজ্য সমান দুইভাগ করিয়া দিলেন। স্বর্ণকোষ বা সোনকোষ নদী উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিল। রঘুদেব পূর্ব্বাংশ ও লক্ষ্মীনারায়ণ পশ্চিমাংশ প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনা ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খ্রীঃ অঃ) সংঘটিত হয়।

শঙ্করকৃত "কীর্ত্তনঘোষা" ও মাধবকৃত "নামঘোষা" হইতে দুই চারিটি "নাম" উদ্ধৃত করিয়াই—উপসংহার করিব।

মাধব গাহিলেন যে 'নামে মূর্খজ্ঞানী আচণ্ডালীর সমান অধিকার'—

"যিহেতু কৃষ্ণর কীর্ত্তন ধর্ম্মতঃ
নাহিক পাত্র নিয়ম।
কেবল কৃষ্ণর কীর্ত্তন করয়
সমস্তকে নরোত্তম ॥" নামঘোষা ৩৪৯।

"বিষয় সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়র সুখ
সমস্ত যোনিতে পাই।
পরম দুর্লভ হরির ভকতি
মনুষ্যত পরে নাই ॥ নামঘোষা ২৬৯

"হরিমাত্র সত্য চৈতন্য ঈশ্বর
পরম তত্ত্ব নির্ণয় ॥" নামঘোষা ২০৫

খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বীগণ বলিয়া থাকেন যে Heathens দিগের মুক্তি নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"পূর্ণ নুহি যত যজ্ঞর অঙ্গ।
হরিনামে করে সবে সুসাঙ্গ ॥"
কীর্ত্তনঘোষা ১২৪

"মহাপুরুষিয়াদের" সকলই "নাম," ধর্ম্ম, অন্য শিক্ষা দীক্ষা নাই—

"হরিক সন্তোষ করাইবার হেতু
নাম বিনে নাহি আর। কীর্ত্তন—২০৪

শঙ্কর জাতিধর্ম্ম উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না—

"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যত যার যেন বিহি আছে
তারে সে কেবল অধিকার।" কীর্ত্তনঘোষা।

কিন্তু মহাপুরুষ মাধবদের জাতিভেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া অনেক সময় মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। শঙ্করপন্থী "কেবলিয়া (ব) ভকতেরাও জাতিভেদ স্বীকার করে না।

"হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই হরিনাম কীর্ত্তন করা যাইতে পারে—

"হরিনাম কীর্ত্তনর নাহিকে নিয়ম একো
এতেকে সে ধর্ম্মমধ্যে সার।" কীর্ত্তন ১১৯

কেবল "নাম" কীর্ত্তন করিলে হইবে না; ভিতর বাহির উভয় পরিষ্কার থাকা চাই—

"সাধুসঙ্গ অনুসরা শ্রবণ কীর্ত্তন করা
পরিহরা পাষণ্ড আচার।" কীর্ত্তন ৩৪

হরিনাম—

"কর্ণপথে ভকতর হিয়াত প্রবেশ করি
দুর্ব্বাসনা হরে সমস্তয়,
জলের যতেক মল যে হেন শরৎকালে
স্বভাবত নির্ম্মল করয় ॥" কীর্ত্তন—২৫

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ

"যেহেতু চৈতন্যপূর্ণ, পরমাত্মারূপে হরি
হৃদয়ত আছন্ত প্রকাশি।

(ব) প্রায় সকল সত্রেই "কেবলিয়া"দের আশ্রম আছে। ইহাদের প্রধান কর্ম্মই শাস্ত্রালোচনা নাম-কীর্ত্তন গান ও শ্রবণ। ইহাদিগকে কুমারব্রত অবলম্বন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়সংযমনের নিমিত্তই ইহারা "কেব্‌লিয়া" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। "কেব্‌লিয়া=অকলশরীয়া অর্থাৎ বিয়া ন করা; সংসারর সুখলৈ বিমুখ"—হেমকোষ। কিন্তু বঙ্গে দেখিতে পাই বৈরাগীদিগের সেবাদাসী না হইলে চলে না; খ্রীষ্টরাজ্যে দেখিতে পাই—রোমান্ ক্যাথলিক পুরোহিতদিগের চরিত্র নির্ম্মল নহে, আর এই "কেবলিয়া" ভকতদিগের মধ্যেও প্রায় পৌণে ষোল আনা যে ভণ্ড তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও শয্যার পারিপাট্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি দুইজন "কেবলিয়া ভকতের" ঘরে রমণী-পরিধেয় মেখলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।

তাতেসে ইন্দ্রিয়গণ মৃতপ্রাণ বুদ্ধিমন
প্রবর্ত্তে যতেক জড়রাশি ॥ ১১
অব্যক্ত ঈশ্বর হরি কি মতে পূজিব তঙ্ক
ব্যাপকত কিবা বিসর্জ্জন।
এতাবন্ত মূর্ত্তিশূন্য (ভ) কেন মতে চিন্তি বাহা
রামবুলি শুদ্ধ করা মন ॥ ৫

উপসংহারে—

শঙ্করায় নমস্তভ্যং মাধবেন সমন্বিতাম্
ভক্তশনপি তথা বন্দে মাধবাৎ শীলশিক্ষিতান্ ॥

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণের জাপান-চিত্র।

(ফরাসী হইতে)

৪

লাফকাডিয়ো হার্ণ, তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে, বিবিধ সাধারণ বিষয়ের আলোচনার মধ্যে, একএকটি গল্পের 'ফোড়ন্' দিয়া থাকেন; তাহাতে বর্ত্তমান ও ঐতিহাসিক জাপানী স্ত্রীপুরুষের আদর্শ-চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। গল্পের পাত্রগণ এরূপ বীর-প্রকৃতি, এরূপ চিত্তহারী, এরূপ প্রাণস্পর্শী, যে, একবার সাক্ষাৎ হইলে, আর তাহাদিগকে ভুলিতে পারা যায় না। তাহারা আমাদের চিন্তাকে সজীব করিয়া তুলে, পুরাতন প্রিয় সুহৃদের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকে। ঐরূপ দুই একটি চিত্রের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

কসুগা-আসাকিচি, লাফকাডিয়ো হার্ণের একজন ছাত্র। ধনী জোৎদারের পুত্র কসুগা, অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পিতামাতাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত, নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করিল। এক বৎসর পরে, সে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ক্রমে সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হইল। যখন চীনের সহিত যুদ্ধ বাধে তখন সে কোরিয়াতে প্রেরিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিল,—কেন না, সেই খানেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। যে নগরে লাফকাডিয়ো হার্ণ বাস করিতেন সেই নগর দিয়া যাত্রা করিবার সময়,—যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্ব দিনে,—কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে, তাহার পুরাতন শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিল। হার্ণ তাহাকে 'মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। তরুণ

(ভ) শঙ্কর মাধবের মতে কোন দেবতার বিগ্রহ বা মুর্ত্তি পূজা করিবার বিধান নাই বটে, তথাপি "কলিবা" বা "কইয়া" ঠাকুর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন। মহাপুরুষিয়াদের প্রধান সত্র বড়পেটার "কীর্ত্তনঘরে" বাসুদেব-বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের ধাতুময়ী মুর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। তথায় মহাপুরুষিয়াদের অধিষ্ঠাতৃদেব "কালিবা ঠাকুরের" দক্ষিণ পার্শ্বে একটী "বন্তি" বা বর্ত্তিকা অহর্নিশি জ্বলিতেছে। প্রবোধন পূজা ও আরতির সময়ে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর ধ্বনিত হয়। কলিবাঠাকুর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

সেনানায়ক সুরাপান করিতে অস্বীকৃত হইল, কেন না, সুরাপান করিবে না বলিয়া তাহার মাতার নিকট সে অঙ্গীকার করিয়াছে। দেশ-সেবার কাজে সে নির্ব্বাচিত হইয়াছে বলিয়া তাহার যে আনন্দ হইয়াছে তাহা, লাজ-রক্তিম-কপোল একজন বালিকার ন্যায়, সে তাহার অধ্যাপকের নিকট সলজ্জভাবে স্বীকার করিল।

"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার মনে আছে কি, যখন তুমি ইস্কুলে পড়িতে, মহামহিম সম্রাটের জন্য প্রাণ দেওয়া—তোমার একটি সাধের বাসনা ছিল?"

—একটু হাসিয়া সে উত্তর করিল; "হাঁ, এইবার আমি একটা অবসর পাইয়াছি।"

কসুগা আসাকিচি মরণকে ভয় করে না; সে ভাবে, প্রিয়জনের সহিত নিত্য বিচ্ছেদ কখনও হয় না; মৃতেরা জীবিতদের মধ্যেই বাস করে;—তাহারা আমাদিগকে দর্শন করে, আমাদের কথা শ্রবণ করে; এবং জীবিতেরাও মৃতদের কথা চিন্তা করে, মৃতদের সহিত কথা কহে, মৃতদিগকে ভাল বাসে। কসুগা আসাকিচির বিশ্বাস,—সে মরিলে, শুধু যে তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে ভালবাসিবে তাহা নহে, তাহার দেশের লোকেরাও তাহাকে ভাল বাসিবে। স্বয়ং সম্রাট, তাহাকে সম্মান করিবেন।

তাহার পল্টনে ফিরিয়া যাইবার সময় হইল; তরুণ সেনানায়ক, তাহার শিক্ষককে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিয়া তাহার একখানি ফোটো তাঁহাকে দিল, এবং সম্ভব হইলে,—প্রথম জয়লাভের পরেই তাঁহাকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। তাহার পরে, সৈনিকের ধরণে নমস্কার করিয়া, নৈশ অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

কিয়ৎ সপ্তাহ পরে, কসুগার নাম মৃত-তালিকার মধ্যে প্রকাশিত হইল। তখন লাফ-কাডিয়ো হার্ণের পুরাতন ভৃত্য মান্‌ইয়েমন্, অতিথি-কাম্‌রার গুপ্তকক্ষ দীপালোকিত করিল, ফুল দিয়া পুষ্পঘটগুলি পূর্ণ করিল, ধূপকাঠি জালাইয়া দিল।

"সমস্ত প্রস্তুত হইলে পর, মান্‌ইয়েমন্ আমাকে ডাকিয়া আনিল। নিকটে আসিয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপর, সেই যুবকের ফোটো খাড়া রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে,—চাউল, ফল, পিষ্টক, আহারের সমস্ত আয়োজনই স্বল্পপরিমাণে রহিয়াছে; উহাই বৃদ্ধের উপহার।

"মান্‌ইয়েমন্ আমাকে বলিল—প্রভু, যদি আপনি উহার সহিত বাক্যালাপ করেন তাহা হইলে বোধ হয় উহার প্রেতাত্মা বড়ই আনন্দিত হইবে। প্রভুর ইংরাজিও বেশ বুঝিতে পারিবে..."

"আমি কথা কহিলাম; মনে হইল, ধূপ-বাষ্পের মধ্য দিয়া ছবিটির মুখে যেন একটু স্মিতহাস্য প্রকাশ পাইতেছে। আমি যে কথাগুলি তখন বলিলাম—সে কেবল তাহার উদ্দেশে ও দেবতাদের উদ্দেশে।"

আর একটি নর্ত্তকীর ইতিহাস বলি। সামুরাই-দুহিতা কিমিকো উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ তাহার মাতা ও ছোট বোন্‌টির ভরণপোষণের নিমিত্ত সে গেইশা-রূপে (নর্ত্তকী) আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। গেইশাদিগের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা কলাবতী। যাহা বাস্তব জীবনে

সচরাচর দেখা যায় না—সে প্রাচীন জাপানের নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শস্থল! দীর্ঘমুখ, খুব সরু ছোট-ছোট চোখ। সে সুন্দর ফুলের তোড়া তৈয়ারী করিতে পারে, চা দিবার অনুষ্ঠান নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, জরির কাজ করিতে পারে, ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে পারে। শীঘ্রই তাহার খুব পসার হইল; কিয়োটোর অভিজাতবর্গ তাহার খুব পক্ষপাতী হইল। সে সকলেরই নিকট হইতে প্রীতি-উপহার ও পূজাঞ্জলী গ্রহণ করিত, কিন্তু বিশেষরূপে কাহারও প্রতি আসক্তি দেখাইত না।

একদিন, একটা জনরব হইল, কিমিকো তাহার কোন প্রণয়ীর সহিত পলায়ন করিয়াছে;—যে প্রণয়ী "তাহার জন্য দশবার মরিতে প্রস্তুত এবং এখনই তাহার প্রেমে অর্দ্ধমৃত হইয়া আছে।" ঐ গেইশার জন্য যুবক আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল; এই প্রেমের পরিচয় পাইয়া গেইশার হৃদয় বিগলিত হয়। তাহাদের প্রেমরত্ন লুকাইয়া রাখিবার জন্য একটি পরী-প্রাসাদে তাহারা গমন করিল; প্রাসাদের চারি ধারে একটি অতি রমণীয় ও নিস্তব্ধ উদ্যান। তাহারা দুজনে একত্র থাকিয়া, জীবনের সমস্ত অপ্রিয় ঘটনা বিস্মৃত হইল। অনেক চেষ্টার পর, যুবক স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট হইতে গেইশাকে বিবাহ করিবার অনুমতি পাইল। কিন্তু কিমিকো, কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া, তিন-তিনবার তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইল।

বসন্ত চলিয়া গেল—তার পর গ্রীষ্মও চলিয়া গেল। এইবার কিমিকো, তাহার বিবাহার্থী প্রণয়ীকে বিবাহ না করিবার কারণ বলিবে বলিয়া স্থির করিল। দৃঢ়স্বরে ও হাসিমুখে তাহাকে বলিলঃ—"আমি তোমার পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিবার যোগ্য নই। আমি তোমার গৃহস্থাশ্রম প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত পাত্র নাই। আমি তোমার একদিনের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করি, এক ঘণ্টার অতিথি হইতে ইচ্ছা করি; ততটাও নহে; একটি মায়াবিভ্রমের মত, একটি উন্মাদের স্বপ্নের মত, একটি ছায়ার মত তোমার জীবনের উপর দিয়া আমি চলিয়া যাইতে চাহি..." তাহার পর, কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াই, কিমিকো তাহার সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত অলঙ্কার তাহার প্রণয়ীর নিকট রাখিয়া অন্তর্হিত হইল। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; তাহার কথা কেহই বলিতে পারিল না।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, পরিশেষে কিমিকোর প্রণয়ী একটি মধুর-দর্শন বালিকাকে বিবাহ করিল, এবং তাহার গর্ভে একটি পুত্র জন্মিল। যুবক সুখী হইল। এক দিন, একটি দরিদ্রা ব্রহ্মচারিণী ভিক্ষার জন্য তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। যুবকের শিশু-পুত্রটি কিঞ্চিৎ চাউল আনিয়া তাহাকে ভিক্ষা দিল। অপরিচিতা ভিক্ষুণী তাহাকে কোলে লইয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর তাহার কাণে কাণে একটি কথা বলিল এবং সেই কথাটি তাহার পিতাকে বলিতে বলিল; তাহার পর, ভিক্ষুণী হাসিমুখে চলিয়া গেল। শিশুটি ঐ কথাটি বলিবার জন্য পিতার নিকট দৌড়িয়া গেল। —"দেখ বাবা,

একজন লোক, যার সঙ্গে এই পৃথিবীতে তোমার কখনই আর দেখা হবে না, তোমাকে এই কথা, আমাকে বল্‌তে বল্‌লে যে, তোমার ছেলেকে দেখে তার খুব আনন্দ হল।” পিতা, ভিক্ষুণীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন; এবং নীরবে অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

এই সকল গল্পের মধ্যে, লাফকাডিয়ো হার্ণ “সংরক্ষক” নামে যে গল্পটি লিখিয়াছেন বোধ হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আভাস-ইঙ্গিত-ময় (suggestive) ও ঠিক্ জাপানী ধরণের। যে রাষ্ট্রবিপ্লব জাপানীকে আধুনিক ভাবাপন্ন করিয়াছে সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়কার একজন ‘সামুরাই’-পুত্রের ইতিহাস এই গল্পে বর্ণিত হইয়াছে।

সে সময়ে, যোদ্ধৃগণের পুত্রদিগকে যেরূপ শিক্ষাই দেওয়া হইত, শৈশবাবধি উহাকে সেই-রূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করিতে তাহাকে অভ্যাস করান হইয়াছে। সকল অবস্থাতেই আত্মদমন করিতে, দুঃখ কষ্ট ও মৃতুকে অবজ্ঞা করিতে, এবং কোনপ্রকার ভয়ের বশবর্ত্তী না হইতে উহাকে শেখান হইয়াছে। কি অপূর্ব্ব শিক্ষা-পদ্ধতি! একদিন, প্রাণদণ্ড দেখিবার জন্য তাহাকে বধ্যভূমিতে পাঠান হইল, এবং তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, কোন প্রকার ভয়ের চিহ্ন যেন তাহার মুখে প্রকাশ না পায়; গৃহে ফিরিয়া আসিলে, রক্তের রং-এ রঞ্জিত ভাতের একটা পিণ্ড পাকাইয়া তাহাকে খাওয়ান হইল; এবং দ্বিপ্রহর রাত্রে, দণ্ডিত ব্যক্তির ছিন্নমস্তক আনিবার জন্য তাহাকে বধ্যভূমিতে পাঠান হইল। শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চায়, চীন-ভাষার অক্ষর পরিচয়ে, চৈনিক ধর্ম্মনীতি ও বৌদ্ধ দর্শনের স্থূলতত্ত্বসমূহের অনুশীলনে সে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিল। সে সাহসী হইল, শিষ্টাচারী হইল, নিঃস্বার্থপর হইল, প্রেমের উদ্দেশে, আত্মমর্য্যাদার উদ্দেশে, অথবা রাজার উদ্দেশে, সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল।

ঠিক্ এই সময়ে, বৈদেশিকদিগের কতক-গুলা ‘কালো জাহাজ’ জাপান-সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই শত্রু-জাহাজগুলাকে দূরীভূত কিংবা ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ঐ সামুরাই যুবক দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিল; কিন্তু দেবতারা এই সমগ্র জাতির প্রার্থনার প্রতি বধির হইলেন। শীঘ্রই জাপানী রাজ-সরকার স্বীকার করিলেন যে, পাশ্চাত্যদিগের শক্তি-পরাক্রমকে প্রতিরোধ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; বিদেশীভাষা ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানাদি শিখিবার জন্য জাপান-রাজ তাঁহার ভক্তপ্রজা-গণকে আদেশ করিলেন।

যুবক, জাপানীজাতির উদ্ধারার্থ বদ্ধপরিকর হইল; এবং ভাবিল প্রভূতরূপে রূপান্তরিত না হইলে জাপানীজাতি কখনই স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। সামুরাই-যুবক ইংরাজি শিখিল; কোন ‘অবারিত বন্দরে’ গিয়া, বৈদেশিকদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালী কৌতূহলের সহিত (অনুরাগের সহিত নহে) অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেখানে একজন বৃদ্ধ খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রচাকের সহিত তাহার পরিচয় হইল; ধর্ম্মপ্রচারক তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, তাহাকে বাইবেল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যুরোপীয়দের উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মনীতি উহাদের প্রভূত পরাক্রমের কারণ কি না—জাপানীযুবক তাহাই মনে মনে আলোচনা

করিয়া অবশেষে খৃষ্টান হইল। তাহার দেশ-প্রীতিই তাহাকে খৃষ্টান করিল।

সে এখন, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানসমূহের অনু-শীলনে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমশ সে জানিতে পারিল, প্রাচীন জাপানী ধর্ম্মগুলি অপেক্ষা, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানই খৃষ্টধর্ম্মের বেশী বিরোধী। সে ভাবিল,—জগৎ হইতে পৃথক্ একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং ব্যক্তিগত আত্মার অমরত্বে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে? লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণ একস্থানে বলিয়াছেন, “মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ছাড়া অন্য কোন দিব্য প্রেম নাই।” তখন সামুরাই-যুবক প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। য়ুরোপকে ঠিক্ বিচার করিয়া দেখিবার নিমিত্ত সে য়ুরোপে যাইবার সঙ্কল্প করিল।

য়ুরোপে সে অনেকদিন অতিবাহিত করিল। স্বহস্তে কাজ করিয়া ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া সে বিবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল। ভ্রমণাদি করিয়া পরিশেষে সে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইল? তাহার মতে,—য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে চমৎকার জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহার নৈতিক মূল্য তেমন কিছুই নাই। প্রাচ্যখণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, জঘন্য প্রতিযোগিতার প্রণালী অনুসরণ করিয়া, উহাদের ভৌতিক শক্তিপরাক্রম প্রভূত বিস্তার লাভ করিয়াছে। য়ুরোপ ও আমে-রিকায়, লোকদিগের মধ্যে ক্ষুধিত নেকড়ে-বাঘের যুঝাযুঝি অবিরাম চলিয়াছে। বলবান ও নিপুণ ব্যক্তিরা, পৃথিবীকে দুর্ব্বলের নরক করিয়া তুলিয়াছে। কতকগুলি ব্যক্তির অপরিসীম বিলাসবিভব,—অধিকাংশ লোককে নির্দ্দয় দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে। একদিকে, বহুসংখ্যক ব্যক্তি জীবনের নিতান্ত-আবশ্যক অভাব সকল পূর্ণ করিতে পারিতেছে না; পক্ষান্তরে এক ঘণ্টার সুখের জন্য ধনীদের আত্মম্ভরিতা,—শ্রমীদিগের বহু বর্ষের শ্রমলব্ধ ফল গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; “সভ্যতার রাক্ষসেরা, বন্যাবস্থার রাক্ষসদিগের অপেক্ষা অজ্ঞাতসারে অধিকতর নিষ্ঠুর; অধিকতর মাংস-লোলুপ।” জনসমাজ যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, উচ্চ নীচ শ্রেণীর মধ্যে দুঃখ কষ্টের রসাতল ততই গভীর হইয়া উঠে। সামুরাইরা বলে, য়ুরোপীয়েরা শক্তিরই গৌরব করে, শক্তিকেই পূজা করে। অডিন্ ও থর্ নামে পুরাকালে, যে দুই প্রচণ্ড নৃশংস পাশব-শক্তির দেবতা ছিল, তাহাদিগকেই উহারা ভিন্ন নামে উপাসনা করে। উহাদের খৃষ্টধর্ম্ম, সাংসারিক জীবনের লৌকিক বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। “এ পৃথিবীতে ভক্তি আর নাই।”

তখন সেই জাপানীযুবক এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিল!—আবার সে দেশে ফিরিয়া যাইবে, সেখানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচারক ও জন-নায়ক হইবে। তাহার কার্য্যপ্রণালী খুব সাদাসিধা; স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য সেই সকল ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান য়ুরোপের নিকট হইতে ধার করিতে হইবে, কিন্তু দেশের যাহা প্রাণ—দেশের যেটি অন্তরঙ্গ জিনিস—সেই প্রাচীন জাপানের সভ্যতাকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণ বলেন, জাপান যদি

রাষ্ট্রবিপ্লবকারী হইয়া থাকে,—সে রক্ষণশীলতার দ্বারাই হইয়াছে। "জাপান সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ প্রাচ্যভাবাপন্ন ছিল, এখনও তাহাই আছে।" হার্ণ ইহাই দেখাইতে চাহেন যে,—জাপানীরা একেবারে য়ুরোপীয় হইয়া যাইবে, এরূপ ইচ্ছা তাহাদের মোটেই নাই। যতদূর সম্ভব উহারা, স্বকীয় পুরাতন সভ্যতা, পুরাকালীন জাপানীদিগের ভৌতিক জীবন, নৈতিক জীবন, শিল্প-জীবন, ধর্ম্ম-জীবন বজায় রাখিয়াছে। তথাপি, কতকগুলি য়ুরোপীয় অনুষ্ঠানের অনুকরণ, উহাদের জীবনকে অল্পে অল্পে রূপান্তরিত করিতেছে। হার্ণ প্রশ্ন করিয়াছেন, বিংশতি শতাব্দিতে উহাদের উন্নতি না জানি কি ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। আপনিই উত্তর করিতেছেন;—উহাদের শরীর আরও বলিষ্ঠ হইবে; বিদ্যালয়ের ব্যায়ামচর্চ্চায় ও রাষ্ট্রের সৈনিক কর্ম্মে, উহাদের দৈহিক বল আরও বৃদ্ধি হইবে; য়ুরোপীয় রন্ধনের কতকগুলি খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিলে, উহাদের দেহ আরও পুষ্টিলাভ করিবে; যেরূপ বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার হইতেছে তাহাতে জ্ঞানের পথেও উহারা খুব অগ্রসর হইবে; বিদেশী ভাষা-শিক্ষায়, বিশেষত ইংরাজি ভাষা-শিক্ষায়, উহাদের শব্দকোষ সমৃদ্ধ হইবে, উহাদের বাক্যরচনা সহজ হইয়া আসিবে; বোধ হয় উহাদের মধ্যে নবতর আভিজাত্যের—জ্ঞানমূলক আভিজাত্যের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু একটা বিষয়ে আশঙ্কা আছে—হয়ত নৈতিক বিষয়ে অবনতি হইবে; জীবন-সংগ্রাম ক্রমশ নিষ্ঠুরতার সীমায় উপনীত হইবে; মহাপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে; জাপানী-জীবনে তেমন আর সরলতা থাকিবে না, নিঃস্বার্থপরতা থাকিবে না, মাধুর্য্য থাকিবে না।

প্রাচীন জাপানের ছাপা-ছবিতে ছায়া যে মোটেই দেখা যায় না,—জাপানী-চিত্রের আলোচনায় হার্ণ তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আলোক, কোন একটা ভূদৃশ্যের শুধু একটা দিক্ উদ্‌ভাসিত না করিয়া, সমস্ত দিক্ই একসঙ্গে উদ্‌ভাসিত করে। তিনি বলেন, "প্রাচীন জাপানী চিত্রকরেরা ছায়া ভাল বাসে না,—কারণ সূর্য্যালোকে বিশ্বের যে শোভা হয়, ছায়া তাহা কমাইয়া দেয়।" বাহ্য-জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগতও তাহাদের নিকট জ্যোতির্ম্ময়; তাহারা জীবনকে ছায়াহীনভাবে দেখিত। কিন্তু য়ুরোপ আসিয়া জাপানকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, ছায়ান্ধকার রচনা করাই সূর্য্যদেবের প্রধান কাজ।

"তখন জাপান, যন্ত্রাদির ছায়াকে, ধূম-নলের ছায়াকে, টেলিগ্র্যাফের খুঁটিকে বিস্ময়-মিশ্র অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল;—খনির ছায়ান্ধকার, কলকারখানার ছায়ান্ধকার, এবং যাহারা সেখানে কাজ করে তাহাদের হৃদয়ের ছায়ান্ধকার; ২০ তলাবিশিষ্ট অট্টালিকার ছায়ান্ধকার; সেই সব অট্টালিকার তলদেশে যে সকল ক্ষুধিত ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় তাহাদের ছায়ান্ধকার; যাহাতে-করিয়া দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হয়,—সেই প্রভূত ভিক্ষা-দানের ছায়ান্ধকার; যাহাতে করিয়া পাপের বৃদ্ধি হয়—সমাজসংস্কারের ছায়ান্ধকার; মিথ্যা কথার ছায়ান্ধকার, কপটতা ও নৈশ ব্যসনের ছায়ান্ধকার; সেই বিদেশী দেবতার ছায়ান্ধকার—যে দেবতা মানুষকে ভস্মীভূত করিবার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন—

জাপান এই সকল ছায়ান্ধকারের পক্ষপাতী হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, জাপান আবার তাহাদের অতুলনীয় প্রাচীন শিল্প ও ধর্ম্মবিশ্বাসে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ঐ সকল ছায়ান্ধকারের মধ্যে কতকগুলি এখনও উহাদের জীবনের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে; উহারা এখনও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে উহারা জগৎকে যেরূপ সুন্দর দেখিত, আর কখন সেরূপভাবে দেখিতে পারিবে না।

অবশ্য, কেহ কেহ হার্ণকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে পারে যে, তিনি য়ুরোপের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন এবং প্রাচ্যখণ্ডের প্রতি একটু বেশী পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন। সে যাহাই হউক, প্রাচ্য সভ্যতার উচ্চ জ্ঞান নীতি ও শিল্প সম্বন্ধে য়ুরোপের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। বহু শতাব্দি ধরিয়া, আমাদের য়ুরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা, নিরবচ্ছিন্ন গ্রীক্ ল্যাটিন ও খৃষ্টীয় আদর্শে সম্পন্ন হইয়াছে; ভারত, চীন জাপান এখনও যথোচিতরূপে আমাদের মনকে অধিকার করিতে পারে নাই। হার্ণ বলেন, "আমরা এতদিন অর্দ্ধ-ভূমণ্ডলে ছিলাম-বলিয়া আমরা আধা-আধিভাবে চিন্তা করিয়া থাকি।" য়ুরোপের সীমান্তদেশ পর্য্যন্তই সভ্যতার সীমা—এই যে মতটি ইহা হেয় জাতীয় গর্ব্ব হইতে উৎপন্ন; হার্ণ এই হাস্যজনক অসঙ্গত মতটিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তিনি চাহেন যে আমাদের শিক্ষার পরিধি আরও বর্দ্ধিত হয়—সমুদ্র ও আকাশ অতিক্রম করিয়া উহার সীমা দূরদিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; তিনি চাহেন, সমস্ত জাতির আবিষ্কৃত সমস্ত সত্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য আমাদের মনে সঞ্চিত হয় এবং বিশ্বমানবের সমস্ত জ্ঞান আমাদের অন্তরে স্থান পায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধ্রুবতারা।

শ্রান্তিহীন নিদ্রাহীন ব্যাকুল নয়নে—
চিরদিন আছ তুমি চেয়ে কার পানে?
বল ওগো ধ্রুবতারা সুন্দরী ললনে?
বিভোর হৃদয়ে তুমি মগ্ন কার ধ্যানে!

পেয়েছ কি তুমি সেই অমূল্য রতন?
তাই কি গো চেয়ে আছ হয়ে আত্মহারা?
পূর্ণ জ্যোতিঃ বিকশিত সে মূর্ত্তি মোহন—
দেখে যদি থাক বল ওগো ধ্রুবতারা!

আকুল পরাণ মোর সদা যাঁরে চায়,—
বল কি করিলে পাব তাঁর দরশন?
কেমনে মিশাতে পারি সে অনন্ত কায়—
অণু হতে অণু মোর এক্ষুদ্র জীবন।

এক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁর বিরাট মূরতি,
ধরি ধরি করি আমি ধরিতে না পারি।
স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতির্ম্ময় প্রেমপূর্ণ অতি,
ধরিবারে ধায় মন সে রূপ তাঁহারি।

বিশ্বন্তর সে মূরতি যাইলে ধরিতে,
আমারে ধাঁধায় ফেলি অনন্তে মিশায়।
কেমনে পাইব তাঁরে পার কি বলিতে?
অশান্ত হৃদয় সদা ধরিবারে চায়।

তাঁহারে ভজিতে ওগো শিখাও আমারে,
যে ভজনে তাঁরে তুমি পেয়ে দিশেহারা।
সেই ভাবে ভজি আমি অন্তর মাঝারে,
দেখি তাঁরে পাই কিনা ওগো ধ্রুবতারা!

শ্রীসুশীলা সুন্দরী মিত্র-জায়া।

ভারতের ভুতপূর্ব্ব কয়েকজন লাট।

লর্ডক্যানিং। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। বিদ্রোহী সিপাহীগণ উত্তর ভারতে ইংরাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও যথেচ্ছ হত্যা করিয়া দেশময় অশান্তি ও অরাজকতা ব্যাপ্ত করিয়া তুলিবার পর যে সময় দেশবাসীর সাহায্যে বহুলোক ও বহু অর্থক্ষয় করিয়া ইংরাজ বিদ্রোহীদলকে ছত্রভঙ্গ ও হৃতশক্তি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে লর্ডক্যানিং ভারতে রাজপ্রতিনিধির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতবাসী ইংরাজগণ বিদ্রোহী-দিগকে ও তাহাদিগের সহায়তাকারিগণকে সুশাসিত করিবার জন্য ক্যানিংকে কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন যে ইংরাজের শক্তির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ৪০ কি ৫০ হাজার ভারতবাসীকে বিনা বিচারে ফাঁসীকাষ্ঠে বা বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা কর্ত্তব্য। প্রশান্ত হৃদয় ও সূক্ষ্মদর্শী ক্যানিং—তাঁহাদিগের এই প্রতিহিংসা-প্রণোদিত কুপরামর্শ অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়া, ন্যায় ধর্ম্মের পথ অনুসরণ করিয়া দেশময় শান্তি ও সন্তোষ শক্তি ও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ-দাতাগণ তাঁহার এই উদার নীতি অবলম্বনে ক্ষুব্ধ হইয়া বিলাতে তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভি-যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এমন কি তাঁহারা ক্যানিংকে পদচ্যুত করিবার জন্য মহারাণীর নিকট আবেদন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এই সকল নিন্দাবাদ ও অভিযোগের প্রতি দৃকপাত না করিয়া, লর্ড ক্যানিং অবিচলিত হৃদয়ে আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিলাতের লর্ড গ্র্যান্‌ভিলকে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কঠোর শাসন অবলম্বন করিবেন না। তাঁহার শাসন কালে ভারত গবর্মেণ্টকে তিনি ক্রোধ বা প্রতিহিংসার বশে একটি কথা বলিতে বা কার্য্য করিতে দিতেও প্রস্তুত নহেন—কারণ এ কথা বা কর্ম্মের জন্য তিনিই দায়ী। এই সময়ে মহারাণীকে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—যে "বাহিরে তাঁহার বিরুদ্ধে বহু নিন্দা প্রচারিত হইতেছে। উত্তেজনার বশে ভারতবাসী ইংরাজগণ এখন তাঁহাদের কর্ত্ত্যপথ বিস্মৃত হইয়াছেন।"

লর্ড ক্যানিং তাঁহার এই মহত্ত্বের দ্বারাই দেশের লোকের নিকট হইতে দয়ালু (clemency) ক্যানিং এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা কি গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত তারানক্ষত্র উপাধি হইতেও সম্মানজনক এবং সুবর্ণপ্রতিমূর্ত্তি হইতেও কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাকর নহে?

লর্ড নর্থব্রুক্—তাঁহার শাসনকালে ভারতে ইন্‌কম্ ট্যাক্স (আয় কর) উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের সম্মতি ছিল না, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধেই লর্ড নর্থব্রুক্ এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাঁহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "আপনি জানেন যে আমার মতে আমাদের গত কয়বৎসরের কর্ম্মের ফলে প্রজাগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ন্যায়সঙ্গত হউক আর অন্যায় হউক, এরূপ অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে ইন্‌কম্ ট্যাক্স উঠাইয়া দিলে প্রজাগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইবে।" লর্ড নর্থব্রুক্ বিজ্ঞ ও উদারহৃদয় রাজ-নৈতিক ছিলেন, সেই জন্য তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে প্রজার সন্তোষ লাভই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। এবং অন্যায় স্বীকার করিলে রাজার সম্মানের বা মাহাত্ম্যের লাঘব হয় না, বরং তাহাতেই রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়।

লর্ড-ডফ্‌রিণ।—লর্ড ডফ্‌রিনের শাসনকালের একটি ঘটনা দ্বারা আমরা তাঁহার উদারতা ও দূরদৃষ্টির বিশেষ প্রমাণ পাই। তাঁহার সময়ে সার লেপেল গ্রিফিন মধ্যভারতে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। সার্‌গ্রিফিনের নানারূপ অভিযোগের ফলে ভূপালের নবাব রাজ্যচ্যুত হন। সংবাদপত্র সকল একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকা সার লেপেল গ্রিফিনের প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রতিদিনই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন অমৃতবাজারের এই আক্রমণ গ্রিফিন সাহেবের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি উক্ত সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য ভারত গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু লর্ড ডফরিন তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, কোন কর্ম্মচারী বিশেষের সম্মান রক্ষার অপেক্ষা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা রক্ষাই অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। যদি কোন সংবাদপত্র কোন কোন রাজকর্ম্মচারী বিশেষের মানহানি করিয়া থাকেন এমন হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলেই বিচারালয়ে তাহার প্রতিবিধান প্রার্থী হইতে পারেন। সার লেপেল গ্রিফিন ডফরিনের এই মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করেন। কিন্তু ইহাতেও ডফ্‌রিণ কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই।

লর্ড রিপণ।—বিলাতের 'রিভিউ-অফ্-রিভিউস্' নামক সংবাদ পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড্-সাহেব ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড-রিপণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইলবার্ট বিল উপলক্ষে ভারতবাসী ইংরাজগণ যে তুমুল আন্দোলন করেন সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লর্ড-রিপণ বলিয়াছেন—"ইলবার্ট বিলে এমন কিছুই ছিল না, যাহা দ্বারা ভারতবাসী ইংরাজগণ যথার্থ ক্ষতি-গ্রস্ত হওয়া সম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে, তাহারা আমার ভারতবাসীর প্রতি উদার নীতি-অবলম্বন সমর্থন করিতেন না। আমি ভারতে যে স্বায়ত্বশাসন প্রথা প্রচলিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহারই জন্য আমি তাঁহাদের আন্তরিক বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা ইলবার্ট-বিলের উপলক্ষ লইয়া আমার শাসন নীতির বিরুদ্ধে দেশময় এক অভুতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।"

লর্ড মর্লি—ভারতবাসীকে সম্প্রতি স্বায়ত্ব শাসনে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন..."লর্ড-মর্লি আজ ভারতবাসীকে যে ক্ষমতা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেই তাহাদিগকে এই সকল অধিকার দানের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমার মতে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন লাভে অনুপযুক্ত বলিয়া তাহাদিগের স্বদেশের শাসনকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আমার মতে অসহ্য বা অসম্ভব না হইলে বিদেশীর শাসন অপেক্ষা স্বদেশী শাসন সহস্রগুণ বাঞ্ছনীয়। ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশশাসনে উপযুক্ত করিয়া তুলাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। উপনিবেশ সমূহের ন্যায় স্বাধীনতা ভারতবাসীকে বর্ত্তমান সময়ে প্রদান করা অসম্ভব হইলেও, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে উপনিবেশ বাসীর ন্যায় স্বায়ত্তশাসনে উপযুক্ত করিয়া তুলাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। আমার মতে সৈনিক ও বৈদেশিক বিভাগে ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমাদের আর মুহূর্ত্ত মাত্র কৃপণতা করা কর্ত্তব্য নহে।" বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া মহামতি রিপণ বলিয়াছেন—"বঙ্গদেশকে এভাবে বিভক্ত করা যে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে যাঁহারা চিরদিন ভারত-গবর্মেণ্টের নিতান্ত অনুরক্ত ও ভক্ত ছিলেন এবং যাঁহাদের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন দিনই কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের এই কর্ম্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশ একজন শাসনকর্ত্তার পক্ষে অত্যন্ত বৃহৎ সন্দেহ নাই। শাসনের সৌকর্য্যার্থে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন স্বীকার করি কিন্তু লর্ড কর্জ্জন যে ভাবে বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়াছেন আমি কোন মতেই তাহার অনুমোদন করিতে পারিনা।

আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে—দেশবাসী যেরূপ বিভাগে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইতেন, সেই রূপেই একার্য্য সম্পন্ন করিতাম।" ধন্য রিপণ! বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা-গণ যদি লর্ড ক্যানিং লর্ড রিপনের ন্যায় উদারনীতি অবলম্বনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে দেশে এত অসন্তোষ ও অরাজকতা ব্যাপ্ত হইতে পারিত না।

সমালোচনা।

ঠাকুরদাদার ঝুলি বা বাঙ্গালার গীতকথা। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ প্রকাশিত। মূল্য ১॥০। গ্রন্থসঙ্কলনে, দক্ষিণাবাবু যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চির ঋণী। বাঙ্‌লায় গীতকথায় যে অপূর্ব্ব "রোমান্স" কবিত্ব ও কল্পনাকুশলতা আছে তাহা বাস্তবিকই গৌরবের সামগ্রী, এবং যদিও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে তাহা কোনকালে প্রকাশিত হইবে কিনা সন্দেহ, তথাপি ইহাতে বাঙ্গলাসাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিবে! গ্রন্থখানির বাহ্য পারিপাট্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বালক বালিকাগণ নিশ্চয়ই 'ঝুলি' লইয়া কলহের অবতারণা করিবে! দক্ষিণাবাবু ইতিপূর্ব্বে 'ঠাকুরমার' যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, শেষে ঠাকুরদাদাকে লইয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙালীর ঠাকুরদাদা চিরকালই একটু রসের পক্ষপাতী। এই গ্রন্থে রাজকন্যা রাজপুত্রের বিবাহ, প্রণয়কাহিনী নাতি নাত্‌নীগুলির চিত্তে উজ্জ্বল কল্পনা ফুটাইয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, হয়ত তাহারা অচিরেই বুঝিতে পারিবে,—"বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়, ছিন্ন তুষারের ন্যায়।" এবং "পড়ে থাকে দূরগত, জীর্ণ অভিলাষ যত, ছিন্ন পতাকার মত, ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে।" দক্ষিণাবাবু এই গ্রন্থের চিত্রগুলিও বেশ কৃতিত্বের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন! কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য, তিনি চিত্রকল্পনার আবেগে একটি স্থলে, রাজকন্যা বাসর রাতে রাজপুত্রের পেলব বাহুউপাধানে, আপনার কেশ-সুন্দর মাথাটী রাখিয়া না জানি কি স্বপ্নেই বিভোর—এইরূপ একখানি চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন।—শিশুসাহিত্য পুস্তকে এ বিষয়ে তিনি এতটা লিবারল্ না হইয়া, কন্সারভেটিভ হইলেই যেন ভাল হইত।

আর একটি কথা;—এরূপ গ্রন্থে প্রাদেশিকতা একেবারে বর্জ্জন করা অসম্ভব হইলেও, ইহাতে যত অল্প প্রাদেশিকতা থাকে তাহাই বাঞ্ছনীয়। এবং সেই সঙ্গে প্রাদেশিক শব্দগুলির অর্থ বা উৎপত্তি টীকাকারে বা পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইলে, গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ইহার অনেকগুলি শব্দ লইয়া কলিকাতার বালকগণ বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিবে, বোধ হয়।

পরিশেষে আমরা দক্ষিণা বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার উদ্যম অসীম হউক, তাঁহার লেখনী অক্লান্ত হউক। তাঁহার জীবন দীর্ঘ হউক!

ভারতচিত্র গ্রন্থাবলী, সংখ্যা ১; আর্য্যনারী। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ, ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ প্রকাশিত। মূল্য একটাকা। গ্রন্থকারদ্বয়, আজিকার জাতীয় অভ্যুদয়ের দিনে, জাতীয় অমূল্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া জাতীয় উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। যখন জর্ম্মাণীতে জাতীয় অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয় তখন জাতীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাহার যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল। আমাদের গ্রন্থকারদ্বয়ের কার্য্যও সেইরূপ, বলা যাইতে পারে। ইহাতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আর্য্যনারীর চরিত্র সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবং যাহাতে জাতীয় চরিত্র সেই মহচ্চরিত্রের উদাহরণে গঠিত হইয়া উঠে, সেই বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয় বিশদভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চরিত্রের মহৎ অংশগুলি হৃদয়গ্রাহীভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! গ্রন্থশেষে "লীলাবতীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই প্রচলিত প্রবাদ। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক মনস্বী লোক লীলাবতী ভাস্করের কন্যা নয়, ইহাই

প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয়ের উক্তির প্রমাণ কি তাহা উদ্ধৃত হইলে ভাল হইত।

The Seva-Sadan Training Institute including Free Medical Ward and Dispensary for women and children। উক্ত সেবা-সদনের একখানি অনুষ্ঠান-পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা বিধবা ও বালকগণের জন্য বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত।—বিধবাগণ যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে উক্ত সদনে বিধবাগণকে শিক্ষাদান করা হয়। বোম্বাই সহরে এই একটি বিধবাশ্রম নহে আরো একটি বিধবাশ্রম আছে—তাহার নাম শারদাসদন,—পণ্ডিতা রমাবাই তাহার প্রতিষ্ঠাত্রী। দানশীল ব্যক্তিগণের অর্থ সাহায্যে এই দুইটিই স্থায়ীভাবে সুচালিত হইতেছে। কথা অপেক্ষা কাজের মূল্য কাহারও অবিদিত নাই। বোম্বাই সহরের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সম্প্রতি বঙ্গমহিলাগণ যে একটি বিধবাশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন—বিগত কার্ত্তিক সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত তাহার বিবরণী পাঠে জানা যায়—অর্থাভাবে তাহার নিজস্ব একটি বাটী পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইতেছে না। ইহা বঙ্গদেশের কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই। আশাকরি বোম্বাইএর অনুকরণে বঙ্গের ধনী সমাজ এই আশ্রমের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া ইহার কল্যাণসাধন করিবেন।

হস্তলিপি-লিখন-প্রণালী—শ্রীশিবরতন মিত্র প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট! কলিকাতা কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। শিশুগণকে সহজ উপায়ে অক্ষর রচনা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "এই পুস্তক-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে শিক্ষক মহাশয়গণ শিশুদিগকে অক্ষর লিখিতে শিখাইলে অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহারা সমগ্র বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।" কিন্তু মানুষের সকল সময়ে সকল আশা সফলহয় না, ইহা সংসারের নিয়ম; সুতরাং এক্ষেত্রে যদি যদি গ্রন্থকারের আশা সফল না হয়, তাহা হইলে সে দোষ গ্রন্থকারের নহে! লেখকের প্রণালীটি শিশু ও তাহার শিক্ষকের নিকট বেশ জটিল হইয়া উঠিয়াছে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।—লেখকের মতে নিম্নলিখিত উপায়ে 'ং' লিখিতে হইবে।—"শিক্ষক একটি শূন্য লিখ। উহার বামপাশের উপর হইতে 'ই'র মাথার বাঁকা রেখার মত নীচের দিক্ দিয়া ডানধারে একটি হেলান কষি টান। কি অক্ষর হইল?" 'ভ' লিখিতে হইলে,..."একটি বক্ররেখা টান। 'ত' লিখিবার মত রেখার উপরের মুখে শূন্য দিয়া একটু নীচে বামদিকে দাও, শূন্যের নীচের দিক হইতে বাঁকা রেখার কষি টানিয়া বক্ররেখার উপরের মুখে জুড়িয়া দাও, নীচের মুখটা 'ভ'-এর মত একটু বাড়াইয়া দাও," গলদ্‌ঘর্ম্ম ব্যাপার! রীতিমত 'ড্রয়িং' (অঙ্কণ-বিদ্যা) শিখিয়া তবে শিশুকে অক্ষর রচনা করিতে হইবে দেখিতেছি। গ্রন্থকার মাথা ঘামাইয়া এত কাণ্ড না করিয়া যদি '৩১' ও '৫০' পৃষ্ঠার মত ইংরাজী কপিবুকের অনুরূপ সুবৃহৎ অক্ষরে 'আদর্শ-লিপি' দ্বারা পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠপূর্ণ করিতেন তাহা হইলে গ্রন্থখানি অনেক উপকারে লাগিত এবং এখনকার মত শিশু ও শিক্ষক উভয়ের প্রাণে বিভীষিকার সঞ্চার করিত না। তাহার উপর এক বিষম ত্রুটি, বানান ভুল। শিশুদিগের জন্য যাঁহারা গ্রন্থ লিখিবেন তাঁহারা অগ্রে বানান গুলির উপর একটু দৃষ্টি রাখিবেন; এ দোষ শিশুপাঠ্য গ্রন্থে কিছুতেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। "শুধাংশুশেখর" "ভ্রুকুটী" প্রভৃতি উদ্ভট বানান শিখাইবার দাবী কাহারো নাই, এ কথা গ্রন্থকারগণ যেন বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখেন। "ঝোঁপ" বলিয়া কোন কথা নাই—"ঝোপ"। গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে কোন সাহিত্যকারকে দেখাইয়া লইলে এ সকল ভ্রমগুলি ঘটিত না! আর এ ভুলগুলি মুদ্রাকরের স্কন্ধে চাপাইবারও উপায় নাই। পরিশেষে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, গ্রন্থের ছাপা ও বহিরবয়ব সুন্দর হইয়াছে—তিন চারি বর্ণের

কালিতে ছাপা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ লোভনীয়, কিন্তু আমাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইতেছে, "All that glitters, is not gold."

তীর্থসলিল—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। তীর্থ-সলিল "জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানাদেশের বিভিন্ন যুগের বিচিত্র কবিতার পদ্যানুবাদ; ক্ষেত্র বিশেষে অনুবাদের অনুবাদ।" ভাষা সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল না হইলেও অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শেলির অনুবাদ গুলিতে লেখকের চেষ্টা তেমন সফল হয় নাই। ছন্দের উপর লেখকের বেশ দখল জন্মিয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীর গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য। বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সঙ্গীত-গুলির অনুবাদ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। আমরা স্থানভাবে 'ভারতীয়' পাঠকবর্গকে অনুবাদের নমুনা দেখাইতে পারিলাম না; মূল গ্রন্থেই তাঁহারা সে পরিচয় লউন। 'তীর্থসলিলের জন্য একটি মুদ্রা ব্যয় করিলে তাহা জলে যাইবে না, এ কথা অসঙ্কোচে আমরা বলিতে পারি।

আম-পারা—শ্রীকিরণগোপাল সিংহ প্রণীত মূল্য আট আনা মাত্র। এ গ্রন্থখানি 'কোরাণ শরীফের শেষখণ্ডের' পদ্যানুবাদ। লেখক 'ভূমিকা'তে লিখিয়াছেন, কোরাণের অনুবাদ বঙ্গভাষায় গদ্যতে হওয়াই এক দুরূহ ব্যাপার সুতরাং আমি পদ্যে অনুবাদ করিয়া দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছি সন্দেহ নাই। লেখকের উদ্যমের আমরা প্রশংসা করি কিন্তু তাঁহার উদ্যম যে পথে পরিচালিত হইয়াছে তাহার সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। প্রাদেশিকতা পরিত্যাগ করিয়া আবশ্যক স্থলে টীকাটিপ্পনী সংযুক্ত করিয়া তিনি যদি সরলগদ্যে এই ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে যথার্থই বঙ্গসাহিত্যের উপকার হইত। লেখকের ছন্দানুবাদ কষ্টকল্পনা ও জটিলতার ভারে যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

অবসর। শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। নগেন্দ্র ষ্টীম প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ।• চারি আনা। গ্রন্থখানি ৭৬ পৃষ্ঠায় দশটি কবিতায় সম্পূর্ণ। কবিতাগুলিতে ভাব ও ছন্দ উভয়েরি অভাব। 'ভূমিকায়' 'শ্রীপাঁচকড়ি দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়' অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া ও আরো আটখণ্ডে'র আশা না দিয়া যদি লেখিকার সমগ্র রচনাবলী হইতে পাঠযোগ্য কবিতাগুলি মাত্র প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে প্রকৃতই তিনি লেখিকার শুভার্থীর কার্য্য করিতেন; নচেৎ ভূমিকার উপসংহারে 'কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেও আমরা তাঁহার শুভার্থিতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না।

Certain Unpublished Drawings of Antiquities in Orissa and Northern Circars. By Monmohan Chakravarti, M.A., B.L., M.R.A.S.—গ্রন্থকার এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে কতকগুলি প্রাচীন চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সেগুলি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাচীন মন্দিরাদির ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য বিষয়ক চিত্র। প্রায় শত বৎসরের পুরাতন হইলেও সেগুলি সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার সেগুলি বিশেষ উদ্যমের সহিত শ্রেণিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সেগুলি হইতে অনেক লুপ্ত ইতিহাসের কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

প্রোফেসার বোসের অপূর্ব্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত।—অর্থাৎ গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ বসু মহাশয়ের নানা প্রদেশ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং নানাবিধ বিচিত্র ঘটনাবলীসম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা মাত্র। বাঙ্গালী সার্কাস কোম্পানি আপনাদিগের ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল-প্রদর্শনে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে কিরূপ সমাদর ও সম্মান লাভ করিয়াছে তাহা পাঠ করিলে যথার্থই আনন্দ হয়। তবে অনেক স্থলেই তিনি অসার ও ক্ষুদ্র কথার আলোচনায় আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। মাছধরা ও খাওয়া-দাওয়ার এত সবিস্তার সংবাদ লইবার জন্য পাঠকের কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। আর একটি বিষম ত্রুটি, গ্রন্থখানিতে শীলতা ও সুরুচির অভাবও বহুস্থানে লক্ষিত হইল। লেখকের বর্ণনাভঙ্গীটি বেশ সরল ও অনাড়ম্বর। চর্চ্চা রাখিলে তাঁহার লেখনী বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে এই জন্যই আমরা বিশদ ভাবে ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিলাম। গ্রন্থখানির বিশেষ গুণ, আগাগোড়া বেশ কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। দুই এক স্থলে তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি চিত্রবিশেষকে নিখুঁত করিয়া তুলিয়াছে, যেমন রাজপুতানার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সার্কাসের তাম্বুর বাহিরে সার্কাস ওয়ালার জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হয়, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার যেটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহা পাঠে সাধারণ পাঠকের প্রীতিরুদ্রেক হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

স্বদেশী সার্কাশ।

আমরা সম্প্রতি বসু মহাশয়ের সার্কাশ দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া যে আনন্দলাভ করিলাম তাহা ক্রীড়া কৌতুক দর্শনের সাধারণ আনন্দ হইতে অনেক অধিক। দেখিলাম ভৌতিক ক্রিয়া সাধনে, দুঃসাধ্য ব্যায়ামপারদর্শীতায়, অস্ত্রচালনা কৌশলে, এমন কি হিংস্র পশুদমনেও বাঙ্গালী ইয়োরপের নিকট এক তিল ন্যূন নহে। একটি ক্ষুদ্র বালিকা নির্ভয়ে বাঘের মুখ চুম্বন করিতে লাগিল—বাঘটি যেন তাহার একটি পোষা কুকুর। আর ভোজবাজি প্রদর্শনের সময় শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্ত্তী শতদৃঢ়বন্ধনে পেটিকাবদ্ধ হইয়াও বিস্ময়স্তম্ভিত দর্শক মণ্ডলীর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিলেন, আবার প্রায় তৎক্ষণাৎ যখন পেটিকা উন্মুক্ত হইল তখন তাঁহাকে তন্মধ্যে রজ্জুবদ্ধ অবস্থাতেই দেখা গেল। অস্ত্রচালনা এবং ব্যায়াম ক্রিয়াগুলিও এত চমৎকার এমন কঠিন যে দেখিতে দেখিতে স্নায়ুমণ্ডলী বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই সার্কাশ স্বদেশ-গৌরব সন্দেহ নাই। ইহার অভিনায়কগণ সকলেই বাঙ্গালী। সার্কাশের নেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন। বাঙ্গালীর মধ্যে যে একটি সহস্রমুখী প্রতিভা আছে—সামান্য অবসর পাইলেই যে তাহা উল্লিখিত গণপতি চক্রবর্ত্তীর ন্যায় শতবাধা অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশে সক্ষম, এই সার্কাশে আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলকেই আমরা এই সার্কাশ দর্শনে অনুরোধ করি। ইহাতে প্রীতিলাভ এবং উৎসাহ প্রদান—উভয় কার্য্যই একসঙ্গে সাধিত হইবে। আমরা ত মনে করি এদেশের লোকের এরূপ কার্য্যে রাজপক্ষেরও উৎসাহ প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল দেশেই রাজাগণ প্রজার সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, তাহাদের কীর্ত্তিজনক কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। আমরাই কেবল সে সুখ হইতে বঞ্চিত। এইরূপ উপায়ে কত সহজে যে তাঁহারা আমাদের সহিত এক হইতে পারেন দুঃখের বিষয় তাহা তাঁহারা একেবারেই দেখিতে পান না। আর তাঁহাদের এইরূপ সহানুভূতির অভাব বশতই আমাদের রাজা যে বিদেশী ইহা আমরা ভুলিতে পারি না; তাঁহারা চিরদিনই আমাদের পর থাকিয়া যান।

খুঁটিব্রত বা ইতুর কথা।

[সম্ভবত ইতুশব্দ ঋতু শব্দেরই অপভ্রংশ। অগ্রহায়ণ মাস পুর্ব্বে ঋতু অগ্রণী বলিয়া গণ্য হইত। এই মাসেই ইতুপূজা আরম্ভ হয়। ভা—স]

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, দেবী ভগবতীই নানা রূপে বঙ্গরমণীর নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু স্বয়ং নারায়ণও অনেক সময় কুলমহিলা এবং বালিকাদের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া নারায়ণ ধৈর্য্য এবং সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, কিন্তু ব্রত পার্ব্বণের কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার ক্রোধও কোপনস্বভাবা দেবীদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। ব্রতকারিণী বিন্দুমাত্র তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলে তাঁহার ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হন, আবার তাঁহাকে তেমনই সহজে সন্তুষ্ট করা যায়, মুনি ঋষিরা সহস্র বৎসর আরাধনা করিয়াও তাঁহার দর্শন পান নাই, কিন্তু একটি বালিকা কয়েকটী ধান্য এবং দূর্ব্বা উপহার দিয়া তাঁহাকে কেনা গোলাম করিয়া ফেলিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। নারায়ণের উদ্দেশে যে সকল ব্রত করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে 'খুঁটিব্রত'ই সমধিক প্রসিদ্ধ,—ইহাকেই পশ্চিমবঙ্গে ইতুপূজা বলে।*

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবারে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া উক্ত মাসের প্রতি রবিবারেই ব্রত করার নিয়ম। ব্রতারম্ভের দিন প্রাতে গৃহে আলিপনা দিয়া একটী নূতন খুঁটী অর্থাৎ নূতন ঘটে কয়েকগাছি নূতন আমন ধানের শীষ রাখিয়া আলিপনার উপর বসান হয়। এবং উহার সম্মুখে শালগ্রাম শিলা স্থাপনপূর্ব্বক অঞ্জলী (পুষ্পোপহার) দিয়া নিম্নোক্ত কাহিনী বলা হয়। দুইটী রমণী উপবাসী থাকিয়া একত্রে এই ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের সময় উভয়ের চুলে এবং অঞ্চলে পরস্পর গেরো দিয়া ব্রত করিবার নিয়ম। কাহিনী বা কথা বলিবার পূর্ব্বে ব্রতধারিণী দ্বয়কে নিম্নলিখিত ছড়াটী আবৃত্তি করিতে হয়।

এলো ফুল কুড়াইতে গেলাম, বেল ফুল কুড়াতে গেলাম, তিনটী কথা শুনে এলাম। এ কথা শুনলে কি হয়? নির্ধনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু দান হয়, অন্তিমে স্বর্গবাস হয়।

এক ছিলেন বৃদ্ধ বামুন, তাঁর দুটী মেয়ে— নাম উমনো এবং ঝুমনো। মা শিশুকালে মারা গেছেন, বুড়ো বামুন কোন রকমে মেয়ে দুটীকে মানুষ করেছে। কিন্তু কি জানি কেন বামুন আর তার মেয়ে দুটির উপর নারায়ণের ভারী কোপ। তারা পুকুরে গেলে জল শুকিয়ে যায়, বনে গেলে বন পুড়ে যায়, এই রকম কাণ্ড। মেয়ে দুটী যেখানে যায় সেই খানেই অমঙ্গল নিয়ে যায় বলে পাড়াপরসী কেউ দেখ্‌তে পারে না। একদিন হয়েছে কি, তারা শাক তুলতে ক্ষেতে গিয়েছে, ও মা যাই শাকের ক্ষেতে পা দিয়েছে অমনি ক্ষেতের শাক পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন আর যারা শাক তুলছিল তারা তাদের মেরে ধরে

* পূর্ব্ববঙ্গে ঘটকে খুঁটি বলে।

তাড়িয়ে দিলে। উমনো, ঝুমনো মনের দুঃখে বনে বসে কাঁদতে লাগলো। বনের কাছেই একটা নদীতে অপ্সরাগণ জলকেলি করছিল, তারা তাদের দেখে বল্লে, "দেবতা হও তো স্বর্গে যাও, ভূত হওতো দূর হও। মানুষ হও তো কাছে এস।" উমনো ঝুমনো বল্লে "আমরা দেবতাও নই, ভূতও নই, মানুষ।" অপ্সরারা বল্লে "তবে কাছে এস"। তারা কাছে গেল, কিন্তু অলক্ষণে মেয়ে কিনা, যাই কাছে গিয়েছে, অমনি সেই নদীর জল শুকিয়ে গেল। তা দেখে অপ্সরারা বল্লে "ওঃ বুঝেছি, তোমাদের উপর নারায়ণের কোপ হ'য়েছে; আচ্ছা আমাদের গাঁড়ুর জল দিয়ে তোমাদের স্নান করিয়ে দি, তার পর খুঁটিব্রত করলেই নারায়ণ প্রসন্ন হবেন"। তারা স্নান করে খুঁটিব্রত করবার জন্য অঞ্জলী দিলে, কিন্তু নারায়ণ আর তাদের অঞ্জলী নেননা। তারা অঞ্জলীতে ফুল দিয়ে নারায়ণকে দেয়, আবার সে ফুল তাদের কাছেই ফিরে আসে। এখন উপায়? অপ্সরারা তখন মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বল্লে" ঠাকুর! এদের পূজো নিতেই হবে"। ঠাকুর কি করেন—ভক্তের কথা তো আর) ঠেলতে পারেন না, পূজো নিলেন, তুষ্ট হলেন, এবং উমনো ঝুমনোকে বর দিয়ে চলে গেলেন। তখন থেকে তাদের অলক্ষুণে নাম দূর হল, তারা যে দিকে যায় সেই দিকেই সুপ্রতুল। ক্রমে বুড়ো বামুনের রুজি রোজগার হল, দুঃসময় গিয়ে সুসময় ফিরে এল। তখন মেয়েরা একদিন বাপকে বল্‌লে "বাবা বিয়ে কর"। বুড়ো বামুন বল্লে "না তাও কি হয়, আমার তিন কাল গেছে এককাল আছে, এমন বয়সে বিয়ে—ছি!" কিন্তু মেয়েরা শুনলে না, তারা তলে তলে মেয়ের যোগাড় দেখ্‌তে লাগলো।

সেই দেশের যে রাজা তাঁর মেয়ে বড় হ'য়েছে বিয়ে হয় না, রাণী জেদ করেন রাজা সে কথা উড়িয়ে দেন। একদিন রাণী চালাকী করে মেয়েকে দিয়ে তাঁর ভাত পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাজা রাণীকে জিজ্ঞেস কল্লেন "এ কে?" রাণী বল্লেন "চখের মাথা খেয়েছ, নিজের মেয়েকে চিন্তে পারনা?" রাজা অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, "কি! আমার মেয়ে এত বড় হয়েছে? আচ্ছা কাল আমি প্রাতে উঠে প্রথমে যার মুখ দেখবো তার সঙ্গেই আমার মেয়ের বে দেবো।" রাণী বল্লেন "ওমা সেকি, প্রাতে উঠেই যার মুখ দেখ্‌বে তারসঙ্গেই মেয়ের বে দেবে একি কথা!" রাজা বল্লেন "আমার কথার আর নড়চড় হ'তে পারেনা যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন দেবোই দেবো।" রাণী তখন "গোপনে" ঢোল পিঠিয়ে দিলেন—রাজ্যের কোন লোক কাল প্রাতে রাজবাড়ীর ত্রিসীমায় এলেও তার গর্দ্দান যাবে। উমনো ঝুমনো তা শুনে সব বুঝতে পারলে—তারা বাপকে চুপে চুপে বলে দিলে "বাবা, তুমি আজ শেষ রাত্তিরে রাজবাড়ীর সদর দরজার পাশে চুপ করে বসে থেকো। তা হলেই রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।" বুড়ো তো কিছুতেই স্বীকার হয় না, শেষে মেয়েদের পেড়াপিড়ীতে স্বীকার হল, এবং তাদের কথা মত, রাজ বাড়ীর সদর দরজার পাশে বসে রইল। বুড়ো মানুষের স্বভাবতঃই একটু কাশী হয়, ভোর হয় হয় এমন সময় তার কাশী শুনে রাজা বিরক্ত হয়ে যাই ঘর থেকে বেরিয়েছেন, অমনি প্রতিজ্ঞার

কথা স্মরণ করে বল্লেন আহা! কার মুখ দেখ্‌লুম! কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছেন উপায় নেই, বুড়ো বামুনের সঙ্গেই মেয়ের বে দিলেন; বুড়োও রাজকন্যা পেয়ে নিজের মেয়েদের কথা ভুলে গেল। প্রায় এক বছর কেটে যায় একদিন বুড়ো নদীতে স্নান কর্‌তে গিয়েছে, এমন সময়ে দেখ্‌তে পেলে একটা গাভী তার বাছুরের জন্য ব্যস্ত হয়ে দৌড়োচ্ছে। তাই দেখে তার নিজের মেয়ে দুটির কথাও মনে হল, সে সেই দিনই রাজাকে গিয়ে বল্লে "মহারাজ! আমি দেশে যাবো।" রাজা বল্‌লেন তার আর ভাবনা কি দেশে যাবে, বেশ যাও"। রাজা ধন দৌলোৎ, দাস দাসী এবং হাতী ঘোড়া দিয়ে মেয়েকে শ্বশুর ঘর কর্‌তে পাঠিয়ে দিলেন।

উমনো ঝুমনো প্রাণপণে বিমাতার সেবা শুশ্রূষা কর্‌তে লাগলো, কিন্তু রাজকন্যার আর কিছুতেই মন ওঠে না। তিনি মেয়ে দুটীকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারেন না। নানান্ ছুতো নাতা করে তাদের মারেন, ধরেন বকেন, আর একখানা কথা দশ খানা করে বামুনের কাণে লাগান। ক্রমে রাজকন্যার এক ছেলে হল, উমনো ঝুমনোর আহ্লাদ ধরে না, তারা দিন রাত তাকে কোলে কাঁখে করে মানুষ কর্‌তে লাগল, বিমাতার গায়ে আঙুলের আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগতে দেয় না, তারাই সংসারের কাজকর্ম্ম করে, রাজকন্যা পায়ের উপর পা রেখে কেবল খান। এত করেও তারা বিমাতার মন পায় না। এ দিকে ছেলে যতই বড় হতে লাগলো, ততই তাদের উৎপাতে উমনো ঝুমনোর ট্যাঁকা ভার হ'য়ে উঠল, সে দিদিদের মেরে ধরে চুলছিঁড়ে একাকার করতে লাগলো, তারা তবু কিছু বলে না। একদিন ছেলে বায়না ধরে বস্‌লো যে দিদিদের ব্রতের খুঁটি নিয়ে খেলা কর্‌বে। উমনো ঝুমনো বল্‌লে "লক্ষ্মী ভাইটী ও দিয়ে খেল' না, তোমাকে আরো সুন্দর সুন্দর খুঁটি দেবো এখন"। ছেলে কি আর তা শোনে? সে ঐ খুঁটি দিয়েই খেলবে। মা গোলমাল শুনে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "ব্যাপার কি?" উমনো ঝুমনো বল্‌লে "কিছু হয় নি মা, খোকা আমাদের ব্রতের খুটি দিয়ে খেলা কর্‌তে চায়, আমরা বলেছি ও নিয়ো না, এর চেয়েও আমরা ভাল খুঁটি দেবো তাই দিয়ে খেলা কর্‌বে। তাই কাঁদছে।" মা তো তাই শুনে না খেয়ে না দেয়ে রেগে পাড়া পরসির দোরে গিয়ে বসে রইলেন। এদিকে বামুন এসে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোদের মা কোথায়! তারা আর কি বলবে, বল্‌লে, "মা শুধোশুধি আমাদের উপর রাগ করে, পাড়া পরসির বাড়ীতে গিয়ে বসে রয়েছেন, আমরা কত ডাকলুম এলেন না। তখন ব্রাহ্মণ নিজেই স্ত্রীকে আন্‌তে গেলেন, রাজকন্যা কিছুতেই আসবেন না, শেষে বল্‌লেন যদি ওদের বনবাস দিতে পার তবেই ঘরে যাবো নইলে যাবো না। বামুন বল্‌লেন "আচ্ছা তাই দেবো তুমি ঘরে এসো"। তার পর বাড়ী গিয়ে বামুন মেয়েদের বল্‌লে "তোরা তোদের মাসীর বাড়ী বেড়াতে যাবি চল"। উমনো ঝুমনো মনে ভাবলে, আপন মায়ের কালে ছিল না মাসী পিসী, এখন হল মাসী পিসী, বুঝেছি এ আমাদের বনবাস দেবার ফিকির"।

কিন্তু বাপের ইচ্ছায় বাধা দেবার সাধ্য নাই,

তারা বাপের সঙ্গে চললো। যেতে যেতে পথ আর ফুরোয় না, মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, "বাবা আর কত দূর"? ব্রাহ্মণ বলেন, "ঐ যে কালো গ্রাম খানি দেখ্‌তে পাওয়া যায় ঐ খানেই তোদের মাসীর বাড়ী।" তারপর তারা এক নিবিড় বনে গিয়ে উপস্থিত হল। উমনো ঝুমনো ক্লান্ত হ'য়ে বল্লে "বাবা একটু ঘুমাবো"। তখন তারা বামুনের হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমলো; খানিক পরে বামুন বনে আলতা ছিটিয়ে সেখান থেকে চলে গেল, যেন মেয়েরা উঠে বুঝতে পারে বাপকে বাঘে খেয়েছে। উমনো ঝুমনোর ঘুম ভাঙ্গতেই তারা দেখে বাপ নেই। উমনো সাদা সিধে রকমের মেয়ে ছিল সে কেঁদে বল্লে, হায়! আমাদের বাবাকে বাঘে খেয়েছে, ঝুমনো বল্লে "দূর বোকা, বাঘে খাবে কেন? বাবা আমাদের বনে দিয়ে চলে গেছেন।" তারা আর কি করে? লতা পাতা দিয়ে ঘর বেঁধে বনেই বাস কর্‌তে লাগলো। তার পর অগ্রহায়ণ মাস এলো, তারা ক্ষেত থেকে ধানের শীষ কুড়িয়ে এনে খুঁটি ব্রত কর্‌লে। নারায়ণ আর কত কাল ভক্তের কষ্ট দেখ্‌বেন, তিনি বামুনের বেশ ধরে ওদের কাছে এসে রইলেন। উম্‌নো ঝুমনো তাঁকে "বাবা" বলে ডাকৃতো এবং পূজো আর্চ্চার যোগাড় করে দিত। নারায়ণের বরে তাদের আর কিছুরই অভাব নেই।

একদিন সেই দেশের রাজপুত্র আর কোটালের পুত্র সেই বনে মৃগয়া কর্‌তে এসেছেন, ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে কোথাও জল পান না, বামুনরূপী নারায়ণকে দেখে তাঁরা বল্লেন "ঠাকুর! আমাদের একটু জল দিন"। নারায়ণ ছোট চুমকীতে করে তাঁদের একটু জল দিলেন। প্রথমে রাজপুত্র চটে বল্লেন, "এইটুকু জলে কি হবে"? নারায়ণ বল্লেন, খেয়েই দেখনা, দরকার হয় ত আরও দেবো। কিন্তু রাজপুত্র কোটালের পুত্র যত জল খান চুমকীর জল আর ফুরোয় না। তখন তাঁরা নারায়ণের পায়ে পড়ে বল্লেন "ঠাকুর আপনি কে?" "আগে তোমরা আমার মেয়েদুটীকে বে কর, তারপর আমার পরিচয় দেবো।" রাজপুত্র কোটালের পুত্র তাতেই সম্মত হলেন, বনেই গন্ধর্ব্ব মতে বে হল, নারায়ণ আপন পরিচয় দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

রাজপুত্র কোটাল পুত্র তখন লোক লস্কর, পাল্কী বেয়ারা ডেকে উম্‌নো ঝুমনোকে দেশে নিয়ে যাবার উদ্যোগ কর্‌লেন। ঝুমনো ব্রতের খুঁটিটী যত্ন ক'রে সঙ্গে নিলে, উমনো "ভাবলে আমি রাজরাণী হ'য়েছি,—আমার আবার এ সব নিয়ে কি হবে।" এই বলে লাথি মেরে খুঁটিটাকে ভেঙ্গে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজপুরীতে চল্ল'। তখন থেকেই রাণীর ঘাড়ে অলক্ষ্মী এসে চাপল, যে পথ দিয়ে রাজপুত্র যান সেই পথেই দেখ্‌তে পান কোন জঙ্গলে আগুন লেগেছে, কাউকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্চে। আর যেদিক দিয়ে ঝুমনো অর্থাৎ কোঠাল পুত্রের স্ত্রী যান, সে পথে কেবলই আনন্দ, কারো ছেলে হচ্ছে, কাহারও ছেলের ভাত হচ্ছে, কোথাও বা বিয়ের বাজনা বাজ্‌ছে ইত্যাদি। রাজপুত্র রাণীকে নিয়ে রাজপুরীতে যেতে না যেতেই বুড়ো রাজরাণী মারা গেলেন, দেশে অরাজক কাণ্ড হয়ে উঠ্‌ল, রাজপুত্র রাজত্ব হারিয়ে জল্লাদকে রাণী ও তাঁর কোলে যে একটি শিশু ছেলে ছিল

তাকে কাট্‌তে হুকুম দিয়ে বিরাগী হ'য়ে বনবাসে চলে গেলেন। জল্লাদ কোটালের সঙ্গে পরামর্শ করে রাণী ও তার ছেলেকে লুকিয়ে রেখে কুকুর কেটে রক্ত দেখালে। রাণী ও তার ছেলের কষ্টের আর সীমা রইল না। এদিকে ঝুমনো যে ঘরে গিয়েছে অর্থাৎ কোটালপুত্রের ঘরে সুখ, ঐশ্বর্য্য উথ্‌লে উঠ্‌তে লাগলো। হাতী ঘোড়া ও দাস দাসীতে তাদের পুরী টলমল কর্‌তে লাগল। আর তার দিদি তো দুসন্ধ্যা খেতেই পায়না। কিছুদিন পরে তিনি তার ছেলেকে বল্লেন", তোর মাসীর নাকি "অপার" ঐশ্বর্য্য হ'য়েছে, দিনরাত সেখানে ভাল খেয়ে পড়ে আসগে যা।

সে তাই শুনে তার মাসী ঝুমনোর বাড়ীতে গেল। ঝুমনো তাকে বেশ যত্ন করে খাওয়াতে পরাতে লাগলো; কিন্তু রোজই ভোর বেলা উঠে দেখতো কে যেন তার ভাল কাপড় চোপড় কেড়ে নিয়ে তাকে ন্যাকড়া পড়িয়ে ছাইএর ভিতর মুখ গুঁজে রেখেছে। ঝুমনো তাই দেখে ভাবলে "একথা শুনে দিদি কি মনে করবেন"! তারপর সে তাকে খুব টাকা কড়ি ও লোক জন সঙ্গে দিয়ে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিলে। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়েছে এমন সময় সে ভাবলে "আমার মা খুব দুঃখী কাঙ্গালের মত আছেন, মাসীমার লোকজন তাঁকে দেখে কি ভাববে।" এই মনে করে সে সঙ্গের লোকজনকে বিদায় দিয়ে একাই যেতে লাগলো; পথে একদল ডাকাত এসে তার টাকা কড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে যে ন্যাকড়া সেই ন্যাকড়া পরিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তখন সে আর কি করে? কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে গেল। মা দেখে ভাবলে তার বোনই বুঝি ছেলেকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু যখন ছেলে বল্লে—মা! মিছিমিছি কেন মাসীমার দোষ দিচ্ছ, তিনি ত আমাকে সবই দিয়েছিলেন, আমার কপালে নেই তাঁর দোষ কি? মা সব কথা শুনে মনে কর্‌লেন মায়ে পোয়ে কিছুদিন বোনের বাড়ীতে থাক্‌বেন। তারপর দুজনে গিয়ে কোটাল পুত্রের বাড়ীর পুকুরের কিনারায় বসে রইলেন। কোটালের বাড়ী থেকে দাসীরা জল নিয়ে যাচ্ছে, রাণী একটা জলের কলসীতে হাতের সোণার আংটী যেটি তাঁকে অলক্ষ্মীতে পেয়েছিল বলে পিতল হয়ে গিয়েছিল—তাই ফেলে দিলেন। কোটাল-পুত্রের স্ত্রী সেই জল দিয়ে স্নান করছেন, তার উপর লক্ষ্মী "অধিষ্ঠান" আছেন কিনা তাঁর গায়ে পিতলের আংটীটি লেগে সোণা হ'য়ে গেল। কোটালের স্ত্রী তাই দেখে দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কার সোণার আংটী চুরী করে এনেছিস?" দাসী বল্লে "ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব"? তিনি বল্লেন "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।" দাসী তখন পুকুর পাড়ের কাঙ্গালিনীর কথা বল্লে। তিনি আংটী হাতে নিয়ে দেখেন তাঁর দিদির হাতের আংটী, তার পর খুব যত্ন করে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন। নারায়ণের কোপে এসব হয়েছে ভেবে দিদিকে খুঁটিব্রত করাবেন ভাবলেন। যখন অগ্রহায়ণ মাস এল, রবিবার এল, দিদিকে বল্লেন "খুঁটিব্রত করবে, উপবাস করে থেকো" পরদিন ব্রতের যোগাড় করে দিদিকে ব্রত করতে ডাক্‌লেন, তিনি বল্লেন, "আহা আমি একটা সন্দেশ খেয়ে ফেলেছি।" ঝুমনো ভাবলে দিদিকে অলক্ষ্মীতে

পেয়েছে তাই এমন কর্‌ছেন। তার পরের রবিবারে সকাল সকাল ব্রতের যোগাড় কর্‌বেন ঠিক করে দিদিকে আবার উপোস করে থাক্‌তে বলে দিলেন। পরদিন ব্রত করবার জন্য যেমন দিদিকে ডেকেছেন, তিনি বলেন, "ওমা! আমি একটা পান খেয়ে ফেলেছি।" তার পরের রবিবারও এইরূপ ক'রে কেটে গেল; ঝুমনো দেখলে মুস্কিল। শেষ রাত্তিরে তাকে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দরজা বন্ধ করে রাখ্‌লেন। রাণীর ঘাড়ে অলক্ষ্মী চেপেছে কিনা, তিনি খুব চেঁচামেচি কর্‌তে লাগলেন। পরদিন ব্রত আরম্ভ হল, নারায়ণ আর রাণীর অঞ্জলী নিতে চান না। তখন ঝুমনো বল্লেন "ঠাকুর হয় দিদির পূজো নাও, না হয় আমাকেও দিদির মত কর।" "ঠাকুর কি করবেন ভক্তের কথা ঠেলতে পারেন না, পূজো নিলেন, সন্তুষ্ট হলেন, বর দিয়ে চলে গেলেন।

নারায়ণের বরে রাজা দেশে এলেন, তাঁর রাজত্ব ফিরে পেলেন, রাজ্যের যে শ্রী যে শ্রীই হল। রাজা জল্লাদকে বল্লেন রাজরাণী ও রাজপুত্রকে ফিরে এনে দে, নৈলে তোর গর্দ্দান যাবে। সে কোটালের পুত্রকে সেকথা বল্লে, কোটালের পুত্র বল্লেন "তুই রাজাকে বল্‌গে যে কাল এনে দেব।" এদিকে কোটালের পুত্র রাজাকে নিমন্ত্রণ করলেন। কোটালপুত্র লোক লস্করকে হুকুম দিলেন—,

বিল ছেপে মাছ আন, গাঁ ছেপে দুধ আন।

রাজার বাড়ী আমার বাড়ী দুধের সরোবর দেও। রাজার নিমন্ত্রণ ভারী সমারোহ ব্যাপার। রাজা এলেন, খেতে বসলেন, রাণী ভাত দিতে এসেছেন, রাজা দেখেই চিনতে পারলেন। উভয়ের মিলন হ'ল। রাণীকে নিয়ে রাজা রাজপুরীতে চলে গেলেন। রাণী আসবেন শুনে রাজপুরীতে সাড়া পড়ে গিয়েছে, সাত ভুক্তি মালীরা ঝাঁট দিচ্ছে। একখানা পাথর ভুলে ফেলে দেয়নি, রাণীর পায়ে তাই লেগে রক্ত বেরুল। অমনি রাণী হুকুম দিলেন "কে আছিস রে সাতভুক্তি মালীদের গর্দ্দান নে।" তখুনি হুকুম তামিল হল।

পরদিন রাজার পিতৃশ্রাদ্ধ, দেশ শুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছে। বামুন পণ্ডিতেরা খেয়ে আশীর্ব্বাদ করে চলে গেলেন, সেই দিনই আবার খুঁটি ব্রত, রাণী ব্রত কর্‌বেন। উপবাসী সঙ্গী চাই, হুকুম দিলেন "উপবাসী আছে এমন স্ত্রীলোক নিয়ে এস"। সকলেই বল্‌তে লাগলো উপবাসী মেয়ে মানুষ পাব কোথা, রাজার বাপের শ্রাদ্ধ পিঁপড়ের মুখেও পাঁচটা ভাত; আজ কি কেউ উপবাসী থাকে? ক্রমে শোনা গেল, যে সাতভুক্তিমালীদের গর্দ্দান নেওয়া হ'য়েছে তাদের মা পুত্রশোকে না খেয়ে আছে। তাকেই আনা হ'ল, সে বল্লে "আমার ছেলেরা যে পথে গিয়েছে, আমাকেও সেই পথে পাঠিয়ে দাও"। রাণী বল্লেন, "তুমি আমার সঙ্গে ব্রত কর তোমার ছেলেদের আমি দেবো এখন।" তার পর ব্রত শেষ হল। রাণা নারায়ণের প্রসাদী জল, মড়া ছেলেদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই তারা বেঁচে উঠলো। সকলে দেখে ধন্য ধন্য কর্‌তে লাগলো। দেশময় ব্রতের প্রচলন হল। অন্তিমে বৈকুণ্ঠ থেকে রথ এল, রাজারাণী স্বর্গে চলে গেলেন।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া।

আচার্য্য বসুর নূতন আবিষ্কার।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

আচার্য্য বসুর তিনখানি পুস্তকের মধ্যে দুইখানি পুস্তকের কথা গত দুইটি প্রবন্ধে বলিয়াছি। প্রথমখানিতে সাড়া হিসাবে জড় ও জীবের সমতা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে জীবজন্তু যেরূপ ব্যবহার করে, উদ্ভিদকে এবং সোনা-লোহা আদি ধাতুকেও সেইরূপ করিতে দেখা যায়। তাহার প্রমাণ, ইহারা সকলেই সাড়ামান যন্ত্রের সাহায্যে ডাকিলে সমানভাবেই সাড়া (ক চিত্র) দেয়। সুরা সিঞ্চনে উত্তেজিত হয়—ক্লোরোফরমে অবশ হইয়া পড়ে ও বিষ প্রয়োগে মরিয়া (খ চিত্র) যায়।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে—এই বিষয়গুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে ও সবিস্তারে উদ্ভিদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইয়াছে। সকল জিনিষেরই যে সাড়া দিবার ক্ষমতা সেটি উদ্ভিদ কোষে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বাহির হইতে উত্তেজনা প্রয়োগে সেটি সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং তার ভিতরকার তরল পদার্থ সেখান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। আর যদি একটি উদ্ভিদকোষ অন্য গুলির সহিত পাশাপাশি বা উপর উপর সংলগ্ন থাকে তবে সঙ্কুচিত একটি কোষ হইতে নির্গত তরল পদার্থ নিকটবর্ত্তী অপরটিতে যায়। এবং তাহাতে সেটি স্ফীত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ কোষের বাহির হইতে উত্তেজনা আসিলে সে কোষ সঙ্কুচিত হয়—আর ভিতর দিয়া উত্তেজিত হইলে কোষটি বিস্ফারিত হয়। "action ও reaction" বা "ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার" এই সাধারণ নিয়ম জীব ও জড়ে সমান। কেবল জীবকোষে অনেকগুলি অণু একত্র থাকে বলিয়াই কতকটা অসংলগ্নভাবে থাকে ও তাহারা সহজেই বিচলিত হয়,—সঙ্কোচ তাহার প্রথম অবস্থা, ও বিস্ফারণ তাহার দ্বিতীয় অবস্থা।

এই সামান্য সঙ্কোচ ও বিস্ফারণের নিয়মটি হইতেই উদ্ভিদ জীবনের যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ

(ক চিত্র)

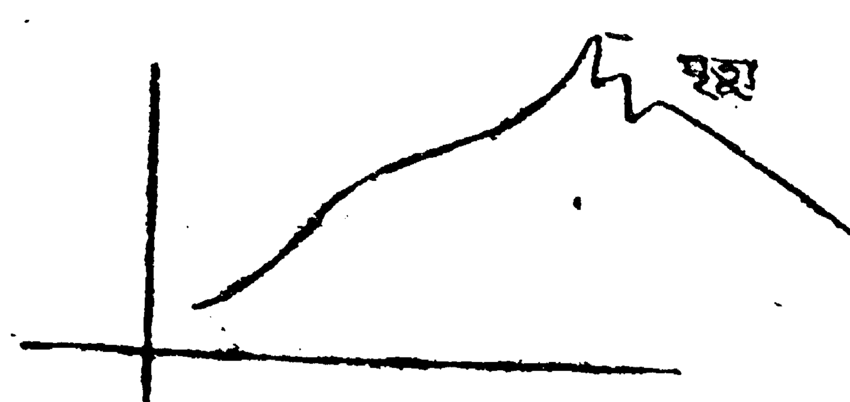

(খ চিত্র)

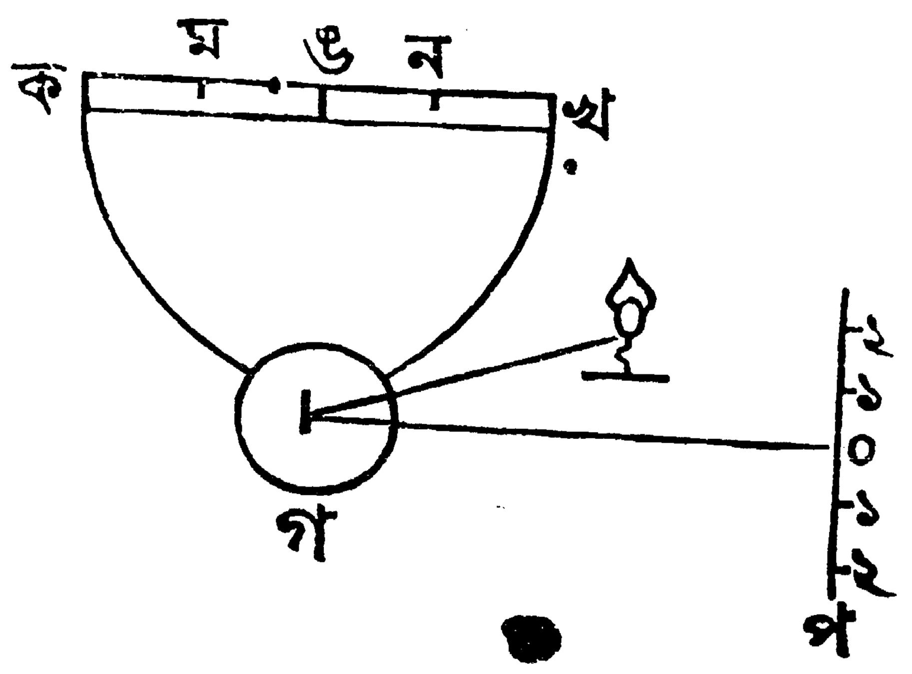

অতি সহজে ও সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে। অনেকগুলি বিষয়ের একত্র সামঞ্জস্য করাই আচার্য্য বসুর আবিষ্কারের প্রধান মাহাত্ম্য। বিজ্ঞানজগতে তাঁহার কোথায় স্থান, সে কথা অল্প ভাষায় বুঝাইতে হইলে এই বলিতে হয় যে—যেমন নিউটন জড় জগতের একতা মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কারে সুস্পষ্ট করিয়াছেন, যেমন ডারউইন জীবজগতের একতা অভিব্যক্তিবাদ স্থাপনা করিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণিত করিয়াছেন—আচার্য্য বসুও সেইরূপ—সকল জিনিষেরই আচার বা ব্যবহারের সমতা দেখাইয়া—জড় ও জীবজগতের একতা স্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহার তৃতীয় পুস্তকখানি Comparative Electro Physiology সম্বন্ধে। সেই খানিতেই সাড়া বিষয়ের অনুসন্ধান মোটা মুটী শেষ হইয়াছে, ও পরে সেই সকল নির্ণীত জ্ঞানের ভিত্তির উপর, অশেষ গবেষণা আসিয়াছে। এইখানেই আচার্য্য বসু ধাতু উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়িয়া—মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে উঠিয়াছেন। স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, সে স্থানেও সেই জড়জগতের নিয়ম প্রযুজ্য। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয়ই এক নিয়মের অধীন।

ধাতু উদ্ভিদ ও প্রাণীস্তর বহিয়া মনোবিজ্ঞানে উঠিবার পথে প্রথমেই—জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তার মধ্যে চক্ষুই সকলের প্রধান। এই ছোট গোলকের ভিতর বাহিরের আলোক তরঙ্গ বা আলোক রশ্মি চোখের তারারূপ ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হইয়া ফটোগ্রাফের ক্যামারার মত পিছনের দেওয়ালে (Retina) বাহ্যজগতের একটি ছোট ছবি ফেলে। এই টিরই প্রতিঘাত চক্ষের স্নায়ু (optic nerve) দ্বারা মস্তিষ্কের বিশেষ অংশে নীত হইয়া আলোকের জ্ঞান জন্মায়। তেমনি শব্দরশ্মি বায়ুতরঙ্গের প্রতিঘাতে কর্ণপথে শ্রবণ শক্তির উদ্ভাবক। এবং ঘ্রাণশক্তি, রসাস্বাদনও স্পর্শের সম্বন্ধে সকলই বাহির হইতে এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতের ক্রিয়া।

কিন্তু স্মৃতিশক্তি আর একটি অদ্ভুত জিনিষ। তাহাতে বাহির হইতে ঘাত প্রতিঘাত নাই অথচ জ্ঞানের উদ্ভব আছে। উহা মনের একটি বিচিত্র ও বিশেষ প্রধান শক্তি। এটি কিরূপে সম্ভব হইল? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে তিনি অতি সুন্দর সুন্দর পরীক্ষার উদ্ভাবন করিয়াছেন।

আজকাল যাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ স্থানে আছেন—তাঁহাদের সকলেরই ভাবিবার রীতি এক আলাহিদা। তাহারা শুধু সেই জিনিষটি বা সেই বিষয়টি ভাবেন না—আনুসঙ্গিক অন্য অনেক বিষয়েরও সাহায্য লয়েন। অর্থাৎ শুধু তার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সেটি কোন স্থানে রহিয়াছে তাহারও খবর লয়েন। এইরূপ বিস্তৃতভাবে দেখিবার একটী প্রধান অবস্থাকে "Law of continuity বলে। Newtonএর Law of Universal Gravitationও একটী Law of Continuityর উদ্ভাবন, Darwinএর অভিব্যক্তিবাদও সেই নিয়মের অন্তর্গত। আচার্য্য বসুর Continuity of Responseও তার অন্যতম উদাহরণ। তিনি এইরূপ প্রথাতেই মনোবিজ্ঞানের অনুধাবনা করিয়াছেন।

বাহির হইতে আলো আসিয়া বাহ্যবস্তুর ছবি দেখায়—তবে স্মৃতির বেলা সে ছবি

আপনিই মনে আসে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। উত্তর দিতে গিয়া তিনি কি দেখাইয়াছেন?—না যথার্থ দেখা ও স্মরণ করিয়া ভাবা—এই দুইটীর ভিতর উপর্য্যুপরি এতগুলি পর্য্যায় আছে—যে ক্রমে ক্রমে সে পথ দিয়া উঠিলে দেখা যায় যে, দেখা হইতে ভাবায় সিঁড়ি উঠার মত সহজেই উপনীত হওয়া যায়।

সারা রাত্রি চক্ষু মুদিয়া বিশ্রামের পর প্রাতে মুক্ত বাতাসের আলোর দিকে ক্ষণেক চাহিয়া চক্ষু বুজিলে—যে বিচিত্র আলোর খেলা দেখা যায় সে কে না জানে। মুদ্রিত চোখের সামনেও তখন ছবির পর ছবি আসিয়া আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখা দিতে থাকে। আলো তো তখন আমার চোখের সামনে নাই তখন মুদ্রিত চোখের সামনে ছবি আসে কোথা হইতে? এই কথারও যা মীমাংসা স্মৃতিরও তাই মীমাংসা। মুদ্রিতনেত্র মানসচক্ষুর সমক্ষে সেই ছবির উজ্জ্বলতার কমবেশীই কেবল মাত্র পার্থক্য।

এইরূপে উজ্জ্বল আলো দেখিবার পর চোখ বুজিয়া যে ছবির খেলা দেখা যায় তাহা চোখের ভিতরকার মুদ্রিত মূর্ত্তির কাজ। তাহা খানিকক্ষণ মাত্র স্পষ্ট থাকে ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়। স্মৃতির ছবিগুলিও তেমনি মস্তিষ্কের ভিতর মুদ্রিত থাকে। ইহার স্থিতিকাল আরও বেশী। কেহ কেহ মনে করেন অনন্ত। যে যাহা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে সে তাহা কখনও ভুলে না। মনে না পড়ুক—মনশ্চক্ষুর অন্তরালে থাকে। এই স্থানটীরই নাম—"Area of Subliminal Consciousness" বা অস্পষ্ট স্মৃতির স্থান। তাহাতে যাবতীয় দ্রব্যাদির স্মৃতিই অস্পষ্টভাবে মিশাইয়া থাকে, অথচ কোনওটাই স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই স্থানটুকুর অন্য নামই "পূর্ব্ব সংস্কার"—"প্রাক্তণ"—ইত্যাদি। অর্থাৎ কি আছে কোথায় আছে তা বুঝা যায় না, অথচ তাহার উপলব্ধি ও ধারণা বড়ই প্রবল।

ফটোগ্রাফের প্লেটেও ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। একবার ছবি পড়িলে ছবিটী সেখানে চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়। যে স্থান-টুকুতে ছবি পড়ে সেই স্থানটুকুর অন্য স্থান অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব হয়। Develop করিবার কালে সেই স্থানটী স্পষ্ট জাগিয়া উঠে—ঠিক যেন ভাবিয়া মনে আনার মত।

আবার এস্থলেও আর একটি অতি বিস্ময়-কর ঘটনা দেখা যায়। সেটি এই,—যে সকল দৃশ্য সুধু চোখে দেখিয়াও স্পষ্ট অনুমিত হয় না সেরূপ অনেক সূক্ষ্ম জিনিষও ফটোগ্রাফে বিশিষ্টরূপে প্রকটিত দেখা যায়। যে সব জ্যোতিষ্কমণ্ডল চোখে অস্পষ্ট, ফটোতে তাহা সুস্পষ্ট উঠে। ফটোতে যদি এইরূপ হইতে পারে—তবে কি মানুষের মনেও এইরূপ হইতে পারে না। এইরূপে অনেক অসম্ভব খবর মানুষের মনে আসিতে পারে। Telepathy or thought transference অর্থাৎ মনে মনে বার্ত্তা বহনও বোধ হয় এইরূপ শাস্ত্র। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। যেমন পৃথিবীর কঠিন অংশের উপর এক তরল পদার্থ জলরূপে ও বায়ুরূপে আছে, এবং উর্দ্ধে ফাঁপিয়া চন্দ্রের আকর্ষণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, (জোয়ার) তেমনি মনুষ্য দেহের দৃশ্যমান কঠিনতর অংশের চারি ধারেও

যে আর একটি বায়ুর মত বা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অদৃশ্যমান অংশ থাকিতে পারে না তাহা কে বলিতে পারে। প্রতি চিন্তা দ্বারা হয় ত সেই গুলিতে ইথার তরঙ্গের মত উত্থিত তরঙ্গ হয় এবং ইহারি বিস্তারে ও প্রতিঘাতে দূর হইতে অপরের মনের চিন্তার উপলব্ধি হয়।

শেষোক্ত এই সকল কথাগুলি অবশ্য আমার নিজের কথা। আচার্য্য বসুর সূক্ষ্ম সাড়ামান যন্ত্রের আবিষ্কার গুলি যে কত দিকে প্রযুজ্য হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য আমি ইহার উত্থাপন করিলাম।

সম্প্রতি তাঁহার আবিষ্কারের উপরই যেন ভিত্তি করিয়া খ্যাতনামা চার্লস ডারউনের যোগ্য পুত্র ছোট ডারউইন অনেকগুলি বিষয় চর্চ্চা করিয়াছেন। ডবলিন সহরের রয়েল সোসাইটির গত বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি থাকিয়া—"উদ্ভিদের বোধশক্তি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।" আচার্য্য বসু তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার Plant Response নামক পুস্তকে উদ্ভিদের চেতনা বা সজ্ঞান অবস্থা ইত্যাদি যে সব কথা বলিয়াছেন—হুবহু সেই সব কথাই তাহাতে বলা হইয়াছে। বলিতে বলিতে একটি বড় সুন্দর কথা তিনি উত্থাপন করিয়াছেন। সেটি এই—তাঁর আবিষ্কৃত Mnemonic Hypothesis অর্থাৎ স্মৃতি সহযোগিতা"। অর্থাৎ দুইটি সাড়া একত্র ঘটার পর একটি সাড়া আর একটি সাড়াকে আবার সঙ্গে করিয়া আনিতে যায়। ইহা ঠিক যেন স্মৃতিশক্তিটিরই অনুরূপ। যথা ধর্ম্মমন্দির দেখিলে মাথা আপনিই নত হয়। ডারউইন দেখাইয়াছেন—যে পদ্ম প্রভৃতি যে সকল ফুল দিনে ফুটে ও রাত্রিকালে মুদিয়া যায়—তাহা অন্ধকার ঘরে রাখিলেও অভ্যাসের বশে কিছুদিন ধরিয়া ওইরূপ ব্যবহার করিতে থাকে। এরূপ সাধারণ নিয়ম বশেই সকল দ্রব্যাদি সেই স্থানের গুণ অনুসারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যেমন বংশগত গুণ বংশপরম্পরায় বাহিত হয় (ভাইসম্যান) তেমনি শিক্ষার ফলও ঠিক যেন অভ্যাস ও স্বভাবের মত সন্তানে আরোপিত হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদ্ভিদের বোধশক্তি সম্বন্ধে আচার্য্য বসু যাহা তিন বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন ডারউইন আজ তাহাই বলিলেন। অথচ আচার্য্য বসুর নাম মাত্র উল্লেখ করেন নাই ইহা বড়ই লজ্জার কথা। যদিই বা তিনি নিজেও স্বাধীন চিন্তায় এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন তাহা হইলেও তৎসম্বন্ধে অপরের পূর্ব্বেকার আবিষ্কার উল্লেখ না করা অকর্ত্তব্য।

আচার্য্য বসুর এই সকল গবেষণার যে কতদূর প্রসারিণীশক্তি পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্বন্ধে উদাহরণ আরও দুই একটি দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তাঁহার মতে আভ্যন্তরিক অণুগুলির বিভিন্নরূপ সঞ্চালনই বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের মূল কারণ। আণবিক পরিবর্ত্তনই গুণের ভিত্তি। সে সঞ্চালন এত সূক্ষ্ম যে সহজে উপলব্ধি হয় না। তাহা মাপিবার জন্যই তাঁর—সাড়ামান যন্ত্রের আবিষ্কার। সে যন্ত্রটি একটি Defferencial Galvanometer বই আর কিছু নয়। তবে তাহার গঠন প্রণালী এমন সুন্দর যে অতি সূক্ষ্ম সাড়াও

তাহাতে সহজে সুচারুরূপে ও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পায়। তাহার সব যন্ত্রগুলিই আপনাআপনি কাজ করে। আর সাড়াগুলি ফটোগ্রাফের প্লেটে আপনি চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। এইরূপে পরীক্ষা করিলেই বেশ বুঝা যায় যে সকল জিনিষেরই সাড়া একরূপ। এবং অবস্থা বিশেষে সকলেই ঠিক সমানভাবে সাড়া দেয়। খানিকক্ষণ উৎসাহ সহকারে যেন কাজ করিতে করিতে পরে সকল অণুগুলিই ঠিক মানুষের মত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় গা টিপিয়া দিলে ধাতু উদ্ভিদেরও ক্লান্তি ব্যথা ঘুচিয়া যায়। তাহারা আবার তখন কার্য্যক্ষম হয়। এইরূপ পদে পদে মিল আছে বলিয়াই ধাতু উদ্ভিদ ও প্রাণী সবগুলি একই পর্য্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তর। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন সর্ব্বব্যাপী শ্রেণীবদ্ধ সমতা বিদ্যমান।

আর এই অণুসঞ্চালন উদ্ভিদ কোষে এক বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। বাহির হইতে প্রযুক্ত হইলেই কোষটি সঙ্কুচিত হয়। আর ভিতর দিয়া উত্তেজনা আসিলে স্ফীত হয়

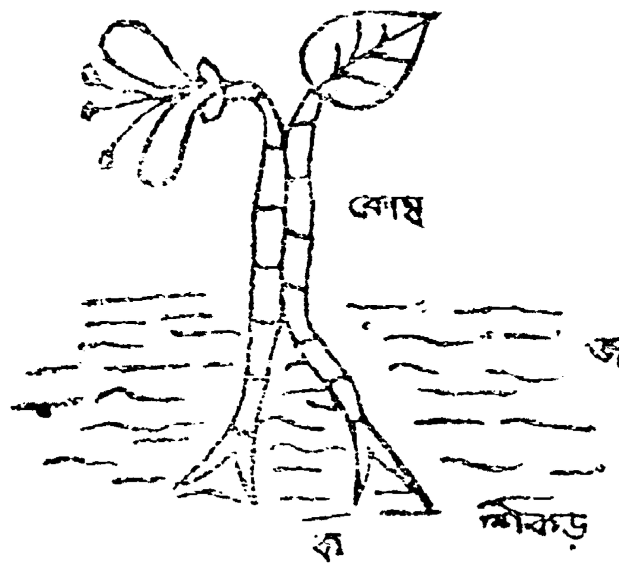

কোষ সমূহের পাশাপাশি সংস্থানে গাছ গঠিত। শিকড়ের নিম্নতম কোষটি জমির সংস্পর্শে উত্তেজিত হইয়া সঙ্কুচিত হইলেই তার তরল পদার্থ উপরের কোষটিতে উঠে, আবার সেটি সঙ্কুচিত হইয়া তার উপরের কোষটিতে পাঠায়, এইরূপে শিকড় দিয়া গাছের গুঁড়ি বহিয়া পাতায় জল উঠে। সেই শিকড়ের প্রতিঘাত স্থায়ী হইলেই গাছ বাড়ে। পাতাগুলি নানা ভাবে বাঁকিয়া সূর্য্যরশ্মি পান করে। তাই গাছ অন্ধকার হইতে আলোর দিকে ক্রমিক বাড়িয়া চলে। রাত হইলে পদ্মফুল মুদিয়া যায়। দিনের আলোকে সূর্য্যমুখী ফুটে। স্পর্শে লজ্জাবতী মুদ্রিত হয়। ড্রসিয়া নামক পতঙ্গ ভোজী গাছ মাছি ধরিয়া খায়। এ সবই সেই কোষ সঙ্কোচ বিস্ফারণের গুণে। সকল শাস্ত্রই ডাক্তার বসুর এই মৌলিক আবিষ্কারে সরল হইয়া পড়িয়াছে। আবার এই ভিত্তির উপরই জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ও সুখ দুঃখও জড়িত রহিয়াছে। সবগুলি একই সূত্রে গাঁথা বলিয়া বড়ই বিস্ময়কর।

এতগুলি কথা পুনরাবৃত্তি করিবার কারণ এই—যে দুই একটি অতিশয় মহান ও গুরুতর বিষয়ে তাঁহার আবিষ্কার ঘন সম্বন্ধ আছে সেই গুলির কথা আনিব বলিয়া। তার মধ্যে একটি Education—লোকশিক্ষা বা শিশুশিক্ষা অপরটি চিকিৎসা শাস্ত্র।

শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার তত্ত্বের এই প্রয়োগ ও তাহার প্রথার এই নির্দ্দেশ যে—শিক্ষাও একটি ঘাত প্রতিঘাতের ব্যাপার। বাহির হইতে অহরহ কতকগুলি সুখবর আসিয়া লোকের মনকে ধনী করিতেছে, তাহার মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি ও সদ্ভাব গড়িতেছে। অনায়াসসাধ্য এই কাজগুলি আমাদের চেষ্টা দ্বারা আরও সহজ সুশৃঙ্খল ও গরিষ্ঠ হয়। সে প্রতিঘাতগুলি অস্পষ্ট হইলেও চিরদিনই অন্তরে ন্যস্ত থাকিয়া স্বভাবের উপর অসীম আধিপত্য করে। স্বভাবের তাই এত দোষ গুণ। শৈশব সংস্কার গুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী হয়। সেই সদ্যোজাত নরম পুতুলকে যেমন করিয়া গড়িতে চাহিবে সে তেমনি গড়িবে—প্রথম জীবনের শিক্ষার ভালমন্দ এতই প্রবল।

তারপর রোগ চিকিৎসার কথা—সেও তো একরূপ শিক্ষা। শরীরের অংশ বিশেষ তখন নিজের কার্য্য ভুলিয়া যায়—তাই তাহার পুনর্শিক্ষার নামই চিকিৎসা। আদি অবস্থাতেই তাহার সংস্কার আবশ্যক। বাহিরেরই খাদ্যাদি নানা রূপে ভিতরে যাইয়া শরীরে শক্তি থাকে। তাহারই বাহুল্যে শরীরে স্বাস্থ্য আর তাহারই অপচয়ে শরীর হীন ও রোগগ্রস্ত হয়। এই সামঞ্জস্যেরই বিষম বিভ্রাট ঘটিলে মৃত্যু আসে। সংসারের এইরূপ অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিও সেই সাড়াবাদের বিশেষ বিষয়।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

চয়ন।

গোখলে মহোদয়ের বক্তৃতার কিয়দংশ।— মান্দ্রাজের মহাসমিতিতে গোখ্‌লে মহামতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা একদিকে যেমন প্রীতিজনক—অন্য দিকে তেমনি জ্ঞানগর্ভ। কন্‌গ্রেসে বলিবার যত কিছু আছে তাহাই ইনি সংক্ষেপে সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু হৃদয় এবং বুদ্ধির সমন্বয়ে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। তিনি বক্তৃতার প্রথমে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে হিউম ও ওয়েদারবর্ণ সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার সারাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমরা সকলেই জানি যে হিউম সাহেবই এই জাতীয় মহাসমিতির জন্মদাতা। প্রথম কয় বৎসর এই সমিতির কর্ম্ম ও উন্নতি তাঁহার কতদূর আন্তরিক স্নেহ ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। যখন শারীরিক অসুস্থতার জন্য এখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পক্ষে সমিতির কর্ম্মে যোগদান অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভারতের কল্যাণব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমাদের এই সমিতির ক্ষুদ্র জীবনের নানা বিপদে ও দুঃসময়ে, লাঞ্ছনায় ও পরাজয়ে, এবং নিজেদের মধ্যে নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহে তিনি চিরদিনই বীরের ন্যায় আমাদিগকে যথার্থ পথ দেখাইয়া দিয়া সাহস ও আশ্বাস দিয়াছেন। আমাদের বিপদে যিনি চিরবন্ধু আশ্রয় ও পথপ্রদর্শক, আজ সমিতির এই সামান্য সার্থকতার দিনে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের সন্তানোচিত কর্ত্তব্য মাত্র। তারপর সার উইলিয়াম ওয়েদারবর্ণ। এই উচ্চপ্রাণ ইংরাজকে যিনি ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতের জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারই উপলব্ধি করা সম্ভব যে আমাদের অবস্থার এই সামান্য উন্নতির জন্য আমরা তাহার নিকট কতদূর ঋণী। আমি গত তিন বৎসরে তিনবার ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার পরামর্শে ও সহায়তায় নানাকর্ম্ম করিয়া তাঁহার হৃদয়মন ও কর্ম্মের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। আজ পর্য্যন্ত কোন ইংরাজ ভারতবাসীর জন্য এরূপ অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থশ্রম স্বীকার করেন নাই। অন্য অনেক উচ্চমনাইংরাজও আমাদের কল্যাণের জন্য অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে ভারতবাসীর চিন্তাই একমাত্র চিন্তা ছিল না। অন্যান্য শত কর্ম্মের মধ্যে ভারতের কর্ম্মও তাঁহারা একটি বলিয়া

গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু আজ বিশ বৎসর ভারতবাসীর মঙ্গল চেষ্টাই মহামতি ওয়েদারবর্ণের একমাত্র চিন্তা, স্বার্থ ও সাধনা। এই বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত সময়, সমস্ত শ্রম ও অধিকাংশ সম্বল আমাদেরই সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। সম্পদে বিপদে তিনি আমাদের চিরসঙ্গী। আমাদেরই হিতকাঙ্ক্ষায় তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার স্বদেশবাসীর ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইলে, আমাদিগের যথার্থ সেবার ব্যাঘাত হইবে, তখন তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশের কল্পনাও ত্যাগ করিলেন। আমাদের জন্য তিনি তাঁহার সমাজে জাতিচ্যুত ও স্বদেশীর নিকট লাঞ্ছিত। দুঃসময়ের অন্ধকার যখন আমাদের চতুর্দ্দিকে নিবিড় হইয়া ঘেরিয়াছিল, তখন যিনি অকম্পিত চরণে ও অদম্য হৃদয়ে আলোকের পথে অগ্রসর করিয়াছেন, আজ সেই নিশাবসানের প্রথম আলোকের ক্ষীণ রশ্মিকে আবাহান করিবার সময় উৎসবের মধ্যে, নিশীথের সেই পথপ্রদর্শকের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতে অশান্তি।—বিলাতে এম্পায়ার রিভিউ নামক সংবাদ পত্রে পার্লামেণ্টের সভ্য ও'ডোনেল সাহেব ভারতে অশান্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি তরবারি নহে। ব্রিটিশ জাতির ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাই তাহার যথার্থ ভিত্তি। ইংরাজগণের এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করা আবশ্যক, এবং অপক্ষপাত চিত্তে ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী ও অভিযোগের প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।" ভারতে বর্ত্তমান অশান্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে "শিক্ষিত ভারতবাসীর সকল আবেদন নিবেদনের প্রতি অসম্মান ও উপেক্ষাই এই অশান্তির প্রকৃত কারণ। যদি দেশে পুনরায় শান্তি স্থাপিত করা অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে ছিন্ন বঙ্গকে এক করা আবশ্যক। লর্ড মর্লি বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে যাঁহারা বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভারত সাম্রাজ্যের স্তম্ভরূপ। ভারতে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি যাহা করিবেন, তাহা অন্যায় বা অসঙ্গত হইলেও, রাজা তাঁহার বিপুল রাজশক্তির সহযোগে সেই কর্ম্মের সমর্থন করিবেন, এরূপ ধারণা ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া কোন মতেই কল্যাণকর নহে।" তাঁহার মতে, যতদিন না বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবিধান করা হয়, ততদিন দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু রাজভক্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে লর্ড ম্যাকডোনাল্ডও এরূপ বলিয়াছেন যে, "ক্লাইবের সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত ভারতে আমরা ভ্রমপূর্ণ যে সকল কার্য্য করিয়াছি, তন্মধ্যে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও গুরুতর ভ্রমের কার্য্য। লর্ড ম্যাকডোনাল্ডের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এই ভ্রমের সংশোধন করা না হয় তাহা হইলে শাসন-সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য বৃথা হইবে।"

রাজ্যের কথা।

জাতীয় মহাসমিতি।—১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কনগ্রেস হইয়া গেল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যাঁহারা চরমপন্থী নামে অভিহিত—তাঁহারা ইহাতে যোগদান করেন নাই। কি কারণে এরূপ ঘটিল তাহা বলা কঠিন, এ সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভয় করিয়াছিলেন, চরমপন্থিগণ কনগ্রেসে উপস্থিত থাকিলে এবারও কনগ্রেসের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের এ আতঙ্ক অকারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কেন না যাঁহাদের চরমপন্থী বলা হইতেছে, তাঁহারা যে সত্যই দেশের অকল্যাণ ব্রতে ব্রতী ইহা আমাদের বিশ্বাস নহে। তাঁহাদিগকে আমরা

স্বদেশসেবক বলিয়াই জানি। কেহ বলিতে পারেন তবে সুরাটে গোলযোগ হইল কেন? ইহার কারণ বুঝা কঠিন নয়। কংগ্রেসের নেতাগণ নিতান্তই যেনতেনপ্রকারেণ আত্মমত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট না হইয়া নীতিকুশলতা অবলম্বনে ধীর সহিষ্ণু ভাবে মিলন প্রয়াসী হইলে ওরূপ ঘটিত না। বস্তুতঃ তাঁহারা যোগদান না করাতেই কনগ্রেসের উদ্দেশ্য যে একতা তাহারই মূলে আঘাত পড়িয়াছে। এবং এইজন্য এইবারের কনগ্রেসকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে না।

কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই; যে সকল নিয়মাবলী এলাহাবাদ কন্‌ভেনসন হইতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল সেইগুলি এইবারকার মহাসমিতির অধিবেশনে অনুমোদিত করিয়া লইলেই ঠিক হইত। তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন কথা বলিবার থাকিত না। যদিও কেহ কেহ ইহা একটি কূট আপত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে কোন সমিতির নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এবং সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত হওয়াই বিধেয়।

প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনারেবল ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয় একজন দেশহিতৈষী বিজ্ঞ বিচক্ষণ খ্যাতনামা পণ্ডিত; কিন্তু বক্তৃতার আরম্ভেই তিনি চরমপন্থিদিগকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার মত নীতিকুশল ব্যক্তির পক্ষে তাহা শোভা পায় না। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই, তিনি যে দলভুক্ত সেই দলভুক্ত যাঁহারা নহেন তাঁহারাই চরমপন্থী; আর চরম পন্থী মাত্রেই দেশদ্রোহী ও রাজবিদ্রোহী, এক কথায় অরাজকপন্থী।" এইরূপ উক্তি একশ্রেণীর ইংরাজকে আনন্দদান করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ঠিক কথা নহে। আমাদের যতদূর মনে আছে প্রথমে লণ্ডন টাইমস্‌ এবং পরে এদেশের ইংরাজ পরিচালিত কয়েক খানি সংবাদ পত্র আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলকে চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী এই দুই নামে বিভক্ত করেন। পরে তাঁহাদের মুখ হইতে এই দুটি নাম লুফিয়া লইয়া আমরাও তাহার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এইরূপ নামবিভাগে যে আমরা আপনাদেরই বিছিন্ন বলহীন করিয়া ফেলিতেছি তাহাতে আমরা অন্ধ।

যাহারা প্রকৃত রাজবিদ্রোহী অর্থাৎ অরাজকপন্থী তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য, তাহাদের সহিত সর্ব্বসাধারণের কোনই সহানুভূতি নাই, কোন পন্থীর মধ্যেই তাহাদিগকে গণ্য করা যায় না। তাহাদিগকে একটা মহাদল বলিয়া ধরিয়া লইলে তাহাদিগেরই গৌরব বৃদ্ধি করা হয়। আমাদের বিজ্ঞ প্রেসিডেণ্ট মহাশয় একথা যে কেন ভুলিয়া গেলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

মর্লির শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িয়াও আমাদের তৃপ্তিলাভ হইল না। এই সংস্কারে আমাদের কি উপকার হইবে, কিরূপ উন্নতি হইবে, ইহার কি দোষ কি গুণ, আমরা যাহা চাহি ইহাতে তাহাই পাইয়াছি,—কিম্বা আমাদের চাহিবার আরও অনেক আছে—এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমরা তাঁহার বক্তৃতায় শুনিব প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যাখ্যা একমাত্র গোখলে মহাশয়ের বক্তৃতাতেই পাওয়া যায়। আর তাঁহার বক্তৃতাই আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের বক্তৃতার আর একটি গুরুতর অভাব,—কোন কোন বিষয় তিনি একেবারেই উল্লেখ করেন নাই; যেমন আমাদের দেশীয় লোকের প্রতি ট্র্যান্‌সভালবাসীর অত্যাচার। প্রেস আইন, নূতন দণ্ডবিধি আইন, নির্ব্বাসন দণ্ড, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি যে সকল বিষয় লইয়া তাঁহার মন্তব্য বিশেষরূপে জানান উচিত ছিল সে সব বিষয়েও সভাপতি মৌন বলিলেই হয়। নূতন দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তনকালে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি বরঞ্চ ইহা অপেক্ষা অনেক কথা বলিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বয়কট সম্বন্ধে তিনি যে ইতিহাস দিয়াছেন—তাহাও ঠিক নহে। এ সম্বন্ধে বারাণসীধামে যে প্রস্তাব সাব্যস্ত হয় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মতিতেই হইয়াছিল। তিনি বয়কটের প্রতি অযথা ঘৃণা ও কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে স্বদেশী

দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইলে বিদেশী বর্জ্জন করিতেই হইবে।—ইহাতেই যে আমাদের মুক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন ইংরাজ যে মনে করেন তাঁহাদের প্রতি অসদ্ভাব বশতই আমরা তাঁহাদের দ্রব্য বয়কট করিতেছি ইহা নিতান্ত ভুল। এ ভুল সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইলেই প্রেসিডেণ্টের উচিত কার্য্য হইত। কিন্তু তিনি সেদিকে না গিয়া বয়কটকেই নিন্দা করিয়াছেন! এ মত তাঁহার কতদিন হইতে? এ মত ত সমস্ত বঙ্গের বিপরীত মত? ইহা কি তাঁহার ফিরোজ সার নিকট হইতে নূতন দীক্ষা?

লর্ড মর্লির শাসন-সংস্কার—লর্ড মর্লি তাঁহার নূতন শাসন-সংস্কারের বিধি প্রচলিত করিবার প্রস্তাব করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ইহা দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের উদার নীতির গৌরব এবং তাঁহার অতীত জীবনের রাজনৈতিক বিষয়ে সূক্ষ্মজ্ঞান ও উচ্চপ্রাণের খ্যাতিও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই সংস্কার প্রস্তাবের জন্য লর্ড মিণ্টোর নিকটও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। লর্ড মর্লি যথার্থই বলিয়াছেন যে "ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের ক্ষমতাবৃদ্ধিই আমাদের বর্ত্তমান সংস্কারের সারাংশ।" এই উক্তির সমর্থন করিয়া লর্ড মিণ্টো বলিয়াছেন, "আপনাদের এই প্রস্তাব ইংলণ্ড ও ভারতের পরস্পর সম্বন্ধের ইতিহাসের মধ্যে এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিবে সন্দেহ নাই।"

লর্ড মর্লি তাঁহার এই প্রস্তাবে ভারত শাসনের সর্ব্ববিভাগে কোন নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রণা সভা ও ব্যবস্থাপক সভার এবং বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ডের গঠন ও কার্য্য প্রণালীর সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন মাত্র। আমরা আশা করি ইহা ভারতে প্রজাতন্ত্রের বা স্বরাজ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাষ মাত্র। মর্লির সংস্কার প্রস্তাব দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—Indian World হইতে আমরা নিম্নে সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) সাময়িক আইন প্রবর্ত্তন ও দেশের আয় ব্যয় নিরূপণ করা সম্বন্ধে দেশবাসীর অধিকার; এবং (২) দেশের দৈনন্দিন শাসনকর্ম্মে দেশবাসীর সহযোগিতা। প্রথম বিভাগের মধ্যে আমরা সাতটি পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই;

(১) ভারতের বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাপক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি;

(২) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে রাজ কর্ম্মচারী সভ্যের প্রাধান্য দূর করা;

(৩) জমিদার ও মুসলমানগণের ন্যায্য নির্ব্বাচন নিঃসন্দেহ করিবার জন্য স্থানে স্থানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্যা অনুসারে নির্ব্বাচক সমিতির প্রতিষ্ঠা;

(৪) মান্দ্রাজ ও বম্বের মন্ত্রণা সভার সভ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করা ও তাহার মধ্যে অন্ততঃ একজন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা;

(৫) উক্ত দুই প্রদেশ ভিন্ন কতিপয় প্রধান প্রদেশে মন্ত্রণা সভা প্রতিষ্ঠিত করা;

(৬) ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যগণকে প্রশ্নজিজ্ঞাসা করার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায় এই সকল সভার সভ্যগণকে নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার প্রদান করা;

(৭) আলোচনার যে সকল কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহার সংশোধন।

এইরূপে মর্লি একদিকে যেমন আমাদিগকে কতকগুলি অধিকার দান করিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ তিনি আমাদিগকে কতকগুলি অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সিমলা হইতে যে প্রস্তাব তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় ও প্রাদেশিক পরামর্শ সভা ও দেশীয় রাজগণের এক মন্ত্রণা সভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ লর্ড মর্লি যে সকল প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। ইহা ভিন্ন সম্প্রদায়, সম্পত্তি ও সামাজিক পদমর্য্যাদা অনুযায়ী যে সভ্য নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ভারত গবর্মেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মর্লি

তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই মন্ত্রণাসভায় ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া লর্ড মর্লি সম্রাটের ঘোষণা পত্রের আশ্বাস-বচন কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশ শিক্ষা, উন্নতি সম্পদ ও কর্ম্মকুশলতায় বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অপেক্ষা কোন অংশে হীন? বঙ্গদেশেও মন্ত্রণা সভা প্রতিষ্ঠিত না করা, বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীকে কি হীন অপমান করা নহে?

বস্তুতঃ বঙ্গচ্ছেদরহিত করিয়া বঙ্গদেশকে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় প্রেসিডেন্সি শাসনে পরিণত না করিলে বঙ্গবাসীর মর্ম্মবেদনা দূর হইবার নহে এবং দেশে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অসম্ভব।

এই উপলক্ষে ইহাও আমাদিগের বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট যে ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারও একান্ত প্রার্থনীয়। অস্ত্র পাইলেই যদি প্রজাগণ বিদ্রোহী ও স্বাধীন হইতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে রুষিয়া এত দিনে এত অত্যাচার সহ্য করিত না। কিন্তু অস্ত্রহীন করিয়া ত্রিশ কোটী লোককে দস্যুতস্কর ও এমন কি পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম করিয়া রাখিলে যে প্রজার হৃদয়ে অপমান ও অসন্তোষের আগুণ জ্বলিতে থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! আমরা আশা করি লর্ড মর্লি এই সৎসাহসের পরিচয় দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

আর এক দিক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে যখন কার্য্যতঃ দেশশাসন আরম্ভ করেন, এখনকার এই যে সিভিল সার্ভিস তখনই তাহার মূলপত্তন হয়। কিন্তু এই কর্ম্মের নাম তখন সিভিল সার্ভিশ ছিল না—যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা রাইটার(writer)অর্থাৎ কোম্পানীর লেখক বা কেরাণী—এই নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের কার্য্যক্ষমতা ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে নামেরও রূপান্তর হইয়াছে। বিচারক্ষমতা—শাসনক্ষমতা,—আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ ক্ষমতা রাজকার্য্যের সমস্ত বিভাগের ক্ষমতাই এখন ইঁহাদের হস্তে। ইঁহারা এমনই মহাবল যে, কোন রাজপ্রতিনিধিও ইঁহাদের অমতে স্বাধীনমতানুযায়ী কাজ করিতে অক্ষম। রিপণের উদারনীতির পরাজয়ই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ভারতবর্ষের কার্য্যশেষে ইঁহারাই আবার ইংলণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বররূপে ভারতের ভাগ্যবিধাতৃ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। যদিও ভারতসচিব ইঁহাদের কথা মানিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু ফলে তিনি প্রভু হইয়াও ইঁহাদের দাস। অবশ্য তেমন মহা পরাক্রান্ত স্বাধীনচেতা মন্ত্রী হইলে ইঁহাদের অগ্রাহ্য করিতে পারেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রায় সেরূপ কোন মহাপুরুষকে ভারতসচিবপদে অধিষ্ঠিত দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান ভারতমন্ত্রী লর্ড মর্লি লিভারেল হইয়াও ইহাদের কিরূপ ভয় করিয়া চলেন তাঁহার শাসনসংস্কার সম্বন্ধীয় বক্তৃতাই তাহার প্রমাণ। বঙ্গদেশ এবং অন্যান্য যে যে প্রদেশে গভর্ণরের পরিবর্ত্তে কেবল লেপ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর আছেন—সেই সেই স্থলে গবর্ণর নিযুক্ত করার প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, সিভিল সার্ভিস হইতেই এই গভর্ণর নির্ব্বাচিত হইবে। —এখন যে যে প্রদেশে গভর্ণর আছেন—তাঁহারা বিলাত হইতে আসিয়া থাকেন,—পাছে সিভিলিয়ানগণ নব প্রস্তাবেরও উদ্দেশ্য তাহাই, এইরূপ মনে করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এই ভয়েই কিনি পূর্ব্ব হইতে উক্তরূপ বলিয়াছেন। লর্ড মর্লির সমস্ত বক্তৃতাতেই এইরূপ একটি ভয়ের ভাব লুক্কায়িত দেখাযায়। অতএব যতক্ষণ ভারতের সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণ যথার্থ ভারতবন্ধু—উদারনৈতিক না হন ততক্ষণ এই সংস্কার কার্য্যতঃ সুসিদ্ধ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। অবশ্য সকল সিভিলিয়ানগণই যে অনুদার তাহা আমরা বলিতেছি না। লর্ড লরেন্স, সার মনরো, কটন,ওয়েদারবরণ ইঁহারাও সিভিলিয়ান।

ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রথা আজ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড রিপণ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু রাজপক্ষের

নানা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলতায় তাহা ক্রমশঃ কিরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। মর্লির বিধানও অনেকাংশে রিপণের সেই স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যতে যে ইহা রাজপক্ষের সুনজরে পড়িবে বা কুনজরে পড়িবে—তাহারই উপর ইহার উন্নতি অধোগতি নির্ভর করিতেছে।

এই ব্যবস্থায়, ভারতীয় সভ্যগণ প্রথমে ভুল ভ্রান্তি করিবেন না এমন নহে। কিছুকাল হাতে কলমে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে রাজ্য শাসনের গুরুত্ব ও দায়ীত্বে তাঁহাদের প্রকৃত দীক্ষালাভ আশা করা যায় না। কিন্তু ইহাতে রাজপক্ষগণ যদি অধীর অসহিষ্ণু হইয়া ভারতবাসীদিগকে একার্য্যের অযোগ্য বিবেচনা করেন—তবে গোড়াতেই গলদ হইয়া পড়িবে ইহা মনে রাখিয়া এই নব অবস্থিত অধিকারের যাহাতে অপমান না হয় প্রজাপক্ষীয় প্রতিনিধিগণেরও তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মর্লির সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, প্রজাপ্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য হইতে ক্রমে ভারতে পার্লেমেণ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পথ পর্য্যন্ত সুগম হইয়া উঠিবে এইরূপ আশাকল্পনার আনন্দে আমরা মুহ্যমান হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু ইহার যে আর এক দিক আছে তাহা ভাবিলে আমাদের এই আনন্দ অনেক পরিমাণে ম্লান হইয়া পড়ে। বস্তুত ভারতের সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীগণ যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভক্তিভরে এই বিধানের মর্য্যাদারক্ষায় সচেষ্ট না হইয়া ইহার প্রতিকূলাচরণ করেন তাহা হইলে আমাদের এত আশা এত আনন্দ সমস্তই মিথ্যা।

আরম্ভেই ত ভারত গবর্মেণ্টের মন্ত্রিগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য ও প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া নানা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে এ ব্যবস্থা নিতান্ত অন্যায় ও সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। লর্ড মর্লি এ বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রাদেশিক সভার প্রজা প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য প্রস্তাবে ভারতবাসী ইংরাজের যে এত ভয়ের কারণ কি তাহা আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি না। কেবল হিন্দুজাতিই কি গভর্ণমেণ্টের প্রজা—না তাঁহাদের মধ্য হইতেই শুধু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে? হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, ফিরিঙ্গি এমন কি, যাঁহারা রাজকর্ম্মচারী নহেন—এমন ইংরাজ সম্প্রদায়ও (যেমন Chamber of Commerce) প্রজা প্রতিনিধি হইবেন। এইরূপ ভিন্নস্বার্থসম্পন্ন, ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন জাতি-ভুক্ত প্রতিনিধিগণ যদি এক মত হইয়া এক বাক্যে কোন আপত্তি করেন—তবে সে আপত্তি যে বিশেষ সারবান তাহা গভর্মেণ্টও বুঝিবেন। কিন্তু ইহা কি সম্ভব, যে ইঁহারা সকলেই একমত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন? লর্ড মর্লি ও লর্ড মিণ্টো ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই এরূপ সংস্কার প্রস্তাব করিয়াছেন।

নির্ব্বাসন।—আমাদের দেশের গণ্যমান্য স্বদেশ সেবক সাধু সজ্জন কয়েকটি সম্প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত। এই নির্ব্বাসনে আমরা এতই মর্ম্মাহত যে মর্লির শাসনসংস্কার প্রস্তাবও আমাদের চিত্ত হইতে এ বেদনা দূর করিতে পারে নাই। আমরা যতদূর জানি, এই নির্ব্বাসিতদিগের প্রায় সকলেই মহানুভব ব্যক্তি; দেশকল্যাণ কার্য্যে ইঁহারা চিরদিনই নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আমাদের সুপরিচিত বন্ধু; ইনি চিরদিনই সংযম ও শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী। বাক্যে লেখায় ব্যবহারে কোন রকমেই তিনি অন্যভাব প্রচার করেন নাই। তবে কি অপরাধে আজ ইঁহার মত লোক এইরূপ গুরুদণ্ডে দণ্ডিত? ইঁহাদিগের অপরাধ যে কি তাহা কেহই জানে না। স্বদেশানুরাগই বোধ হয় ইঁহাদের গুরুতর অপরাধ! আমাদের বিশ্বাস রাজপক্ষের সহিত দেশের লোকের প্রকৃত পরিচয়ের অভাবই এইরূপ অদ্ভুত শোচনীয় ব্যাপারের মুল কারণ। দেশের কাহারা যে সৎ কাহারা যে অসৎ তাহা তাঁহাদের জানিবার কিছুই উপায় নাই। পুলিশের

রিপোর্টই এ সম্বন্ধে একমাত্র তাঁহাদের পথ প্রদর্শক ধ্রুব নক্ষত্র। দেশের এইরূপ লোকদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার পূর্ব্বে যদি গভর্ণমেণ্ট সার গুরুদাস, শ্রীযুক্ত সারদা মিত্র, সত্যসিংহ প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন তাহা হইলেও তাঁহারা এতটা ভ্রান্তির মধ্যে পড়িতেন না। লর্ড মর্লি নির্ব্বাসন আইন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই বালক ভুলান কথা। তিনি বলেন, "তিনি সেক্রেটারি অব ষ্টেটের পদে নিযুক্ত হইবা মাত্র তাঁহাকে এই আইন উঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চারিদিক যেরূপ অন্ধকার, যেরূপ রহস্যময়, যেরূপ অসাধারণ, তাহাতে তিনি গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে এ অস্ত্র কাড়িয়া লইতে চাহেন না।" কথাগুলির বাক্য-বিন্যাস বেশ, কিন্তু ইহার অর্থ একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। এই বিশাল ভারতভূমির লক্ষ্য কোটি অধিবাসী মুষ্টিমেয় বিদেশীর হস্তে পরিচালিত। ভারতবাসী যে কত শিষ্ট কত শান্তিপ্রিয়—ভারত পরিচালনা কত যে সহজ উক্ত সত্যই কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নহে। দুঃখের বিষয় ইহাতেও তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। ভারতবাসীর সামান্য অধিকার লাভ চেষ্টাকে তাঁহারা অন্যায় অনধি-কার চর্চ্চা জ্ঞান করেন, এবং অনেক সময় বৃথা সন্দেহে সন্দিগ্ধ হইয়া রাজার ন্যায়কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান।

তাঁহারা বুঝেন না—ভারতের স্বাভাবিক রাজভক্তি ও শান্তিপ্রিয়তায় অল্পপরিমাণ যে শিথিলতা ঘটিয়াছে তাঁহাদের আচরণই সেজন্য দায়ী, এবং এভাব বৃদ্ধি পাইবে বা লোপ পাইয়া যাইবে তাহা তাঁহাদেরই উপর সম্যক নির্ভর করিতেছে। আমরা বেশ বলিতে পারি, তাঁহারা যদি নির্ব্বাসিতগণকে ফিরাইয়া আনেন তাহা হইলে বৃটিশরাজের ন্যায়বিচারের প্রতি দেশের বিশ্বাস এবং রাজ্যে শান্তি মঙ্গল পুনঃ স্থাপিত হইবে। কিন্তু এ কথায় কি গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করি-বেন? দেশের লোকের কোন্ কথায় এপর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিয়াছেন? তাঁহাদের বুঝি মনে হয় প্রজার মনস্তুষ্টি করিতে গেলেই তাঁহাদের প্রেষ্টিস্ নষ্ট হইবে। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"পার্টিসন রহিত করা উচিত নয়, কেননা তাহাতে বাঙ্গালীকে সন্তুষ্ট করা হইবে।"

কবিতাগুচ্ছ।

যদি—তবে।

বৈতরণী নদীতীরে বিজন কাননে,
এক বৃন্তে দুটি ফুল, যদি গো ফুটিয়া,
পারিতাম থাকিবারে দুঁহু দোঁহা সনে,
দোঁহে এক সাথে যদি যেতাম ঝরিয়া;—

স্বচ্ছ নদীজলে যদি দুলিয়া দুলিয়া,
পর্ণে পর্ণ মিলাইয়া চলিতাম হাসি—
সুমৃদু হিল্লোলে তবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
সুদূর স্বরগপুরে যাইতাম ভাসি!

পশিতনা সংসারের কোন কোলাহল,
জটিলতা প্রতারণা জাগিত না জ্ঞানে;
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিত যদি সমুদ্র অতল,
নিমগন রহিতাম দুঁহু দোঁহা ধ্যানে!

অথবা, তারকা হয়ে আকাশের গায়
উজল জ্যোছনা মাঝে গোপনে ডুবিয়া
থাকিতে পেতাম যদি তোমায় আমায়
পরস্পর পরস্পরে বিভলে চাহিয়া!

স্বার্থভরা জগতের মলিনতা-রাশি,
আবদ্ধ থাকিত শুধু জগতের পায়;
আমরা জ্যোছনা ঠেলি ধীরে পরকাশি
চাহিতাম ধরণীরে তীব্র উপেক্ষায়!

তোমার পৃথক যদি না থাকিত দেহ,
আমারি এ দেহে যদি তুমি হ'তে প্রাণ;—
চোখেতে পে'তনা দেখা তবে কারো কেহ,
থাকিত না 'তুমি' 'আমি' মাঝে ব্যবধান!

অথচ, ছুটিতে মিশি অচ্ছেদ্য বাঁধনে,
থাকিতাম যতদিন থাকিবার হয় ;
প্রাণ যবে উর্দ্ধে যে'ত দেহটি ছাড়িয়া,
নিয়ে পৃথ্বীতলে হ'ত এ জড়ের লয় !

যদি,—যদি,—যদি হ'ত এরূপ জীবন,
তবে,—তবে,—তবে বুঝি জুড়াত যাতনা ;
কিন্তু হায় ! কোথা তুমি, সাধের স্বপন
মাঝখানে বহে যদি—তবে এ কল্পনা !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

আঁখি ও তারা।

আঁখি বলে আমি যদি হইতাম তারা,
সুদূর স্বরগ হ'তে স্বপনের পারা
ঝরিয়া পড়িত নীচে আলো মিটি মিটি
শুধু আভাসের মত ; পৃথিবীর দিটি
বিমুগ্ধ বিহ্বল ভাবে আমারে হেরিত,
রহস্য-আভাসে শুধু ব্যাকুলি' উঠিত !
কি জানি কি সুদূরের লাগি সর্ব্বজনা
বিশ্ব-হৃদে সৃজি' তুলে এ শূন্য বেদনা !
দূর স্বপ্ন স্বর্গে আমি রহিতাম বসি',
নিক্ষেপি' দিতাম নীচে রহস্যের হাসি।

তারা বলে আমি যদি হইতাম আঁখি,
স্বপ্ন-শূন্য ছেড়ে দিয়ে পৃথ্বী মাঝে থাকি,
একটি হৃদয় পানে প্রেমালোক পাতে
নিরখিয়া রহিতাম চির দিবা রাতে !

এ আঁখির তাপে ফুল্ল কমলিনী সম
ফুটিয়া উঠিত ধীরে সে মানসী মম !
সে শুধু আমারি পানে মুখ খানি তুলি'
প্রেমাকুল চিত্তে ওগো উঠিত মুকুলি'।
উদাসীন বিশ্বজন ফিরে সর্ব্বকাজে
আমার বাহিরে, শুধু সে আমারি মাঝে
বিহ্বলে ফিরিত ওগো ধরিত জীবন
অনন্য অক্লান্ত চিত্তে। সে স্থায়ী আসন
একটি হৃদয়ে শুধু আমি যদি পাই—
এখনি ছায়ার রাজ্য ছেড়ে দিয়ে যাই।
তারা আমি, নাহি দেয় ধরা, যারে চাই,
আঁখি হ'য়ে দেখি তারে পাই কি না পাই !

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

প্রেম।

তুমি ভালবাস মোরে অবসর-হীন ;—
হে দেবতা, বৃথা-কাজে যাপি' নিশি দিন
আমি শুধু অবসর খুঁজিয়া বেড়াই
তোমারে বাসিতে ভাল সময় না পাই !

তুমি কর অবিরত মোরে আবাহন ;—
ভব-কোলাহলে আমি রহি আন্‌-মন
সে সুর পশে না কাণে, কভু না সুধাই—
শেষ অবকাশে শুধু তোমা পেতে চাই !

তুমি চাহ আমি হই কেবলি তোমারি ;—
সাধ যায় মোর নাথ, যদি দিতে পারি
তোমারে জগত মাঝে বিতরি' সবায়,
কি মধুর হয় ধরা সুখে সুষমায় !

তবু তুমি শুধু মোর ; আমি শুধু তব—
জীবনে মরণে আছি মিলি' অভিনব !!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

আর্য্যঋষির কামনা।

ঋগ্বেদ। ১ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত।

১

বরুণ ও মিত্রদেব, জ্ঞাত হয়ে (শ্রেষ্ঠ পথ)
সরল গতিতে
(অবিরাম অবিশ্রাম) নিয়ে যান আমাদিগে
(মঙ্গল ইঙ্গিতে)।

২

তাঁহারা (মোদেরে) ধন করেন গো বিতরণ ;
ভ্রান্তি-হীন তাঁরা ;
নিয়ত আপন কার্য্য সাধন করেন (হর্ষে)
স্বীয় তেজঃদ্বারা।

৩

সে (মহা) অমরবৃন্দ বিনাশি মোদের শত্রু
সুখ দিন দান ;
মনুষ্য মরণ শীল আমরা (যে দীন হীন)
(নাহি কিছু জ্ঞান)।

৪

বন্দনীয় ইন্দ্র, পূষা, মরুৎ ও ভগদেব,
শ্রেষ্ঠ ফল তরে
আমাদেরে (শুভ) পথ দিয়েছেন দেখাইয়ে
(কত কৃপা করে)।

৫

হে পূষা, হে বিষ্ণু (দেব), হে (দিব্য) মরুৎগণ,
মোদেরে তোমরা
যজ্ঞ-পশু দান কর, বিনাশ রহিত কর,
(ঘুচাইয়ে জরা)।

৬

যজমান তরে বায়ু করিছে বর্ষণ মধু ;
অমৃত ক্ষরণ
করিতেছে নদীকুল ; ওষধি মাধুরী যুক্ত
হউক (শোভন)।

৭

আমাদের রাত্রি-ঊষা (অক্ষয়) মধুর হোক ;
পার্থিব আবাস
মাধুর্য্য বিশিষ্ট হোক ; হোক সর্ব্ব পালয়িতা
মধুর আকাশ।

৮

(স্নিগ্ধ ছায়া) বনস্পতি (অনন্ত) মধুর হোক
আমাদের লাগি ;
তপন মধুর হোক ; হউক মধুর ধেনু ;
(মোরা এই মাগি)।

৯

(দেবতা বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও বৃহস্পতি,
ইন্দ্র (বজ্র-পাণি),
মহা পাদক্ষেপী বিষ্ণু, আমাদের সুখকর
হোন্ (হরি' গ্লানি)।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

স্বপ্ন-কন্যা।

চারিদিকে বরফ, ঠাণ্ডা কন্ কন্ করচে। রোদ নেই স্মর্য্যি নেই, কেবল কন্ কনে হিমের মত বাতাস সোঁ সোঁ করে বইচে। বরফের পাহাড়ের উপর-মণির সিংহাসন, তার আলোতে দিগ্বিদিক-আলোয় ফুটে পড়েছে।

সিংহাসনের উপর সাত আঙুল চওড়া, কুঁদফুলের মত কান্তি চাঁদমুলুকের রাজা নৃপতি চন্দ্রানন বসে ঘুমিয়ে আছেন। পাশে দাসী নেই বাঁদি নেই, পাইক পেয়াদা সেপাই বরকন্দাজ কেউ নেই।

চন্দ্রানন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত কি স্বপ্ন দেখ্‌চেন। দেখচেন, তাঁর দুটো পাখার উপর ভর করে নীল আকাশের মধ্যে দিয়ে হু হু করে নক্ষত্রটির মত ছুটে চলেছেন। কতদিন-কত-রাত্তির কেটে গেল—তবুও যাচ্ছেন, তবুও যাচ্ছেন।

এমন কতদিন যায়। শেষে তাঁর নজরে এক সোণার বরণ পাহাড় পড়ল। তখন সেই দিকেই ছুট্ ছুট্। যত কাছে যান—দেখেন সেটা সোণা নয়—রূপো। আরো কাছে গিয়ে দেখেন তার আভায় চোখ ঝল্‌সে যায়। চোখ বুজে দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে বুকের মধ্যে একশ দৈত্যের বল সঞ্চয় করে—চন্দ্রানন সেই দিকেই যান্—তিনি হলেন চাঁদ মুলুকের শ্রেষ্ঠ বীর—তিনি কিসে পেছুপা!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পড়্ পড়্ করে চাঁদ-মুলুকের রাজার ধবধবে পালোক্ দুটো কালো হয়ে পুড়ে গেল। তখন তিনি ঘুর্‌তে ঘুরতে পাক খেয়ে খেয়ে পড়তে লাগলেন।

পড়তে পড়তে চন্দ্রাননের মাথা ঘুরে গেল। শেষকালে সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে এল—অবশেষে জ্ঞানগোচর রইল না।

সংজ্ঞা পেয়ে দেখেন যে তিনি একটি নদীর তীরে পড়ে আছেন। ভাল করে মনে করে দেখ্‌লেন—সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা—অনেক-দুর থেকে পড়েচেন। মনে হল মাথায় কে হাত বুলিয়ে দিচ্চে। চোখ চেয়ে দেখেন—এক পরমা সুন্দরী কন্যা; কন্যের কোলে মাথা রয়েছে।

মনে বড় বিস্ময় হ'ল। চোখে যা দেখ্‌লেন তা আর কখনো দেখেন্‌নি। নদীর জল নীল—তার পাড়ের উপর গাছ—তাতে সবুজ সবুজ পাতা, লাল লাল ফুল! এ দৃশ্য চাঁদ-মুলুকের রাজার চোখে কখনো পড়েনি—তাই ফালা ফালা চোখ দুটিতে বড় বড় করে চেয়ে রইলেন।

এমন সময় গালের উপর টপ্ করে এক ফোঁটা জল পড়ল—রাজা দেখেন কন্যের লাল চোখে দরদর ধারে পাণি।

চন্দ্রানন তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লেন। চারিদিকে সবুজ মাঠ তাতে কচি কচি ধান গাছ ঢেউ খেলছে। বরফ দেখা চোখে—ধানগাছের সবুজ শোভা দেখে তিনি আনন্দে তের হাত লাফিয়ে উঠলেন্।

যেমন লাফিয়ে উঠ্‌লেন—অমনি সেই তের হাত উঁচুতেই রয়ে গেলেন। পোড়া পাখা ঝরে গিয়ে নতুন কচি পাখা উঠ্‌ছে—তাতেই তাঁকে উড়িয়ে রাখলে। সেখান থেকে নীচে আসবার জন্য চাঁদমুলুকের রাজা কত

চেষ্টাই না করলেন—কিছুতেই কিছু হলনা—তখন চেঁচিয়ে বল্লেন—রাজকন্যে তোমার কি দুঃখু! রাজকন্যে চোখে হাত দিয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। এদিকে চট্ পট করে যেমন পালক বেড়ে উঠতে লাগলো—চন্দ্রানন ততই উঠে যেতে লাগলেন। শেষকালে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাখা যেমনকার তেমনি হয়ে—চন্দ্রাননকে হু হু করে চাঁদের মুলুকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই সিংহাসনে বসিয়ে দিলে।

স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চন্দ্রানন দেখলেন বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করছে। চাঁদের মুলুকে সাদা আলো সাদা বরফের রাশি—তাঁর আর কিছুতেই ভাল লাগেনা। কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজকন্যের জন্য হা হুতাশ করতে লাগলেন। কিছুতেই আর তৃপ্তি নেই। মনে হল কাজ নেই এই সিংহাসনে—কাজ নেই এই পোড়া রাজ্যে—যে দেশে সেই স্বপ্নকন্যা আছেন সে দেশেই, যদি না যেতে পারি ত কিসের আমি চাঁদমুলুকের রাজা! এই ভেবে রাগ করে যেমন মাটিতে রাজদণ্ড ছুঁড়ে ফেল্লেন—অমনি চারিদিক থেকে হাসির ফোয়ারা ছুট্‌ল। চাঁদের মুলুক লোকে লোকারণ্য! ছোট ছোট প্রজাপতির মত লাল নীল ধূসর পাটকিলে রঙের ডানা পরা হাজার হাজার প্রজা এসে মাথা নীচু করে বল্লে—মহারাজ কি চা'ন মহারাজ কি চান্।

জনহীন শূন্য দেশের সেই রাজাটি ত একেবারে অবাক্! কি ভাবেন, কি করেন কিছুই স্থির করতে পারেন না।

শেষে একজন সিংহাসনের কাছে এসে চেঁচিয়ে বল্লে, মহারাজ কি নিমিত্ত আমাদের স্মরণ করেছেন—কি অসাধ্য সাধন কর্ত্তে হবে আজ্ঞা করুন।

একথা শুনে রাজার বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল হল; বল্লেন, বাছা তুমি কে?

তিন আঙুলের তরওয়াল খানা খাপ্ থেকে ফস্ করে খুলে ফেলে ধাঁ করে কপালে ঠেকিয়ে সে বল্লে 'মহারাজ এই দশলক্ষ চাঁদসেনা আর আমি তাদের সেনাপতি চাঁদশূর!'

চন্দ্রানন খুসী হয়ে কুমুদ ফুলের মালাটা নিজের গলা থেকে খুলে চাঁদশূরের' গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, তোমার এত তেজ এত বল! আচ্ছা বুঝব যদি স্বপ্নকন্যেকে আনতে পার। নীল নদীর তীরে সেখানে গাছের পাতা সবুজ—তা'তে লাল লাল ফুল ফুটে আছে—সেই নদীর তীরে স্বপ্নকন্যে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদচেন; তাঁকে যদি আনতে পার ত অর্দ্ধেক চাঁদমুলুক তোমার, আর যদি না আনতে পার ত চাঁদশূর ও তার সেনার দল—এক গাড়ে যাবে।

ভীষণ কথা শুনে চাঁদশূর মাটির দিকে চেয়ে রইলেন—আনন্দ কলরব এক নিমিষে থেমে গিয়ে সকলের মুখে ভাবনার লক্ষণ দেখা দিলে।

চাঁদশূর কি বল্‌বেন কিছুই বুঝতে পারচেন না। এদিকে নৃপতি চন্দ্রাননের প্রাণ অধৈর্য্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি স্বপ্ন-কন্যের জন্য সিংহাসনের উপর বসে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন্। কে সান্ত্বনা দেবে?

অবশেষে চাঁদশূর বল্লেন 'মহারাজ তিন মাসের সময় চাই।'

চাঁদমুলুকের রাজা রেগে আগুন হয়ে বল্লেন, তিন হপ্তার মধ্যে যদি স্বপ্ন কন্তের দেখা না পাই ত তোমার মাথা যাবে।

চাঁদমুলুকে ভারি হৈ চৈ পড়ে গেল। চাঁদশূর ত ভেবে ভেবে থড়কে হয়ে গেলেন। চাঁদ সেনারা ঠিক কল্লে রাজ্য ছেড়ে পালাবে।

২

দিন নেই রাত নেই আলো জালিয়ে নক্ষত্র পণ্ডিত লেখাপড়া কচ্ছেন। যার যা আট্‌কায় জিজ্ঞেস করলে তা'র মীমাংসা নক্ষত্র পণ্ডিত করবেনই করবেন। চাঁদের দেশের কোন কথা কোন খবর তাঁর অজানা ছিলনা।

আর তিন হপ্তার শেষ হবার দেরী নেই। চাঁদশূর মড়ার মত চেহারা নিয়ে নক্ষত্র পণ্ডিতের নির্জ্জন ঘরের দরজার ঘা দিতেই দোর খুলে গেল।

লম্বা চুল উস্‌কো খুস্‌কো চাঁদশূরকে দেখে অবাক হয়ে গিয়ে একটু আমতা আমতা করে তিনি বল্লেন—সেনাপতি মশাই—আপনার এ দশা! সে চেহারা কোথায় গেল,—সে দর্প অহঙ্কার কোথায় গেল?

সেনাপতি তখন সব খুলে বল্লেন। মহারাজের আজগুবি হুকুম—তবুও যা করবার করতে পারি—কিন্তু. এ যে বুদ্ধিতে কুলোয় না।

ভাবতে ভাবতে নক্ষত্রপণ্ডিত খড়ি পেতে বস্‌লেন। বিবর্ণ মুখ, চাঁদশূর প্রাণটি হাতে করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কি হয়, কি হয়! একদিন একরাত কেটে গেল গণনার শেষ হয় না। মস্ত মস্ত যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ধাঁ ধাঁ করে হয়ে যাচ্ছে তবুও একটা ঠিক ফল বেরোয় না। তিন হপ্তা শেষ হতে আর মোটে তিন দিন। চাঁদশূর তালপাতের মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন।

বিষাদ মলিন মুখ করে শেষকালে পণ্ডিত বল্লেন—"বড় কঠিন; উপায় আছে কিন্তু।"

চাঁদশূরের মুখ থেকে কথা বেরোবার সামর্থ্য নেই; চোখে জল, বল্লেন—"পণ্ডিত মহাশয় তবে কি সপুরী এক গাড়েই যাব?"

নক্ষত্রপণ্ডিত মুখ গম্ভীর করে বল্লেন "উপায় হচ্চে বৃহল্লাঙ্গুল একেশ্বরী; এত বড় ক্ষিপ্রগতি বাহন আর নেই, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ তাকে পাবার ইচ্ছা করে।

চাঁদমুলুক থেকে সটান্ দক্ষিণে তিপ্পান্ন লক্ষ তেষট্টি যোজন দূরে নীল নদীর তীরে সেই স্বপ্নকন্যে আমাদের রাজার জন্য কেঁদে কেঁদে যান যান হয়েচেন। তাহার এমন রূপ যে জগত আলো হয়ে আছে। একেশ্বরীর পিঠে চড়ে যদি যেতে পার ত তেইশ দণ্ডের মধ্যে সেখানে যাবে।

নীল নদীর ঠিক মধ্যিখানে একটা মস্ত সাদা শালুক ফুল ফুটে আছে তার মধ্যে স্বপ্নকন্যের বাস। দিনের আলোর সঙ্গেই ফুল বন্ধ হয়ে যায় তখন তার মধ্যে স্বপ্নকন্যে ঘুমোয়। সেই ফুল বন্ধ হয়ে গেলে তেত্রিশ হাত নীচে তার গোড়া, জলের মধ্যে এক ডুবে গিয়ে সেই গোড়া ধরে স্থলে উঠে সটান্ চলে আস্‌বে। পথে কাউকে ডরাবে না।

চাঁদশূর ঘাড় নেড়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে, একেশ্বরীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। একেশ্বরীকে খুসী করা দেবতার অসাধ্যি।

৩

একেশ্বরীর মাথাটা সাতটা পৃথিবী এক করলে যত বড় হয় তত বড়। আর ল্যাজটার

কথা কি বলব! তিরেনব্বই হাজার তিমি মাছকে এক করলে তার কাছে খড়্‌কেটি!

বড় বড় দীঘিতে যেমন রাঘববোয়ালগুলো কপ্ কপ্ করে রুই কাতলা গুলোকে পেটে পোরে—একেশ্বরীও তেমনি সামনে উল্কা ফুল্কা যা পায় কপ্ কপ করে ধরে আর একদম পেটের মধ্যে ফেলে; কাউকে বড় খাতির টাতির করে না।

চাঁদশূরের ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাথার চুলগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধবধবে সাদা হয়ে গেল। প্রাণের ভাবনা বড় ভাবনা! কি করে একেশ্বরীর উদ্দেশে একদিকে ছুটে চল্লো।

দুচোখে যা পায় এক্কি ত গিলে চলেছে সেই সঙ্গে চাঁদশূর বেচারাও পেটের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সেইখানে তিন আঙ্গুলের তরওয়ালখানা ভোঁ ভোঁ করে ঘোরাতে লাগল।

পেটের যন্ত্রণায় ত' এক্কি যায় যায়। ডাক ছেড়ে বল্লে কে আছ পেটের মধ্যে, যা চাও তাই দেব—এই হাঁ করুচি বেরিয়ে এস।

পেটের ভিতর উল্কাপচা গন্ধে চাঁদশূরের বমি হয় হয়; সে ত চটপট্ বেরিয়ে পড়ে তিন আঙ্গুলের তরওয়ালখানা বোঁ বোঁ করে বার দুই দেহের চারিদিকে ঘুরিয়ে জোড় হাতে একেশ্বরীর স্তব সুরু করলে।

তুষ্ট হয়ে এক্কি ত' স্বপ্নকন্যের খোঁজে যেতে রাজি হল। বল্লে, ভয় কি সেনাপতি মশাই তোমাকে চক্ষের পলক ফেলতে সেখানে নিয়ে যাব।

তখন চাঁদশূরের মুখে হাসি আর ধরে না। হাস্‌তে হাস্‌তে তখনি সে এক্কির পিঠে চড়ে স্বপ্নকন্যের দেশে যাত্রা করলে। এই খবর শুনে লক্ষ লক্ষ চাঁদসেনা এমনি জয়ধ্বনি করলে যে ত্রিভুবন থর থর করে কেঁপে উঠল।

৪

এ দিকে নীল নদীর তীরে সোনার বরণ তটের উপর বিদ্যুত বরণ কন্যে, গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবচেন। সেদিন থেকে তাঁর চোখে নিদ্রা নেই পেটে অন্ন নেই। এমন করে আর কতদিন কাট্‌বে।

হঠাৎ কন্যের বাঁ চোখ নেচে উঠল। কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই; আকাশের চাঁদ হাতে এসে হারিয়ে গেল। কন্যে মুখটি বুজে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

আসন কেঁপে উঠল। সখিরা বল্লে, সই অমন করে কেঁদে কেঁদে দেহটা পাত করিস্‌নে। এই বুঝি আবার কি একটা হয়—তোকে বুঝি হারাই।

এমন সময় একেশ্বরী সূর্য্যি চন্দর আড়াল করে—জগৎ ব্রহ্মাণ্ড থরহরি কাঁপিয়ে নীল নদীর দিকে নেমে আসতে লাগল। পাখী পক্ষী সব বাসায় গেল। হোমা পাখী মন্দার পাহাড়ের চূড়া ধরে থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগল। বুঝিবা প্রলয় উপস্থিত।

বিপদ দেখে সখী শুদ্ধ কন্যে গিয়ে নিজের ফুলটির মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এক্কির লেজের সাঁই সাঁই শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। পৃথিবী শুদ্ধ লোক ডাক ছাড়লে, "ত্রাহি মধুসূদন।"

তিরাশি হাত উপর থেকে, চাঁদশূর ডিক্‌বাজী খেতে খেতে নীল নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। হাতে সেই তিন আঙুলের চক্‌চকে তরওয়াল। প্রাণে ভয়ের লেশ নেই।

নীল নদীর ভারী জল—তাতে চাঁদশূরকে

পালকের মত ভাসিয়ে তুললে। সাতশ ডুব দিয়ে কিছুতেই আর জলের তলায় যেতে পারে না, এ যে মহাবিপদ!

এ দিকে এক সরল পুঁটি মৃণালের ঝোপের মধ্যে ছানা পেড়েছিল। রাত হয়েছে দেখে ধীরে ধীরে জলের উপর ভেসে উঠে দেখে দিব্য একটি আহার ভাসছে।

খপ্ করে চাঁদশূরের একখানা পা ধরে হিড় হিড় করে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। চাঁদশূর ত' তাই চায়। তরোয়ালখানা সিধে করে ধরে রইল—তেমন তেমন দেখলে পুঁটি পাটা মানবে না—একদিক থেকে আর একদিক পৈতে কোপা করে ছেড়ে দেবে।

জলের তলায় গিয়েই চাঁদশূর খপ্ করে মৃণালের গোড়াটা বাঁ হাতে চেপে ধরলে। তার পর দেখে বাইশটা পুঁটির ছানা তাঁরদিকে তেড়ে আসচে। তখন জলের মধ্যে বন্ বন্ তরোয়াল ঘুরিয়ে দিলে—কে কোথায় দেখতে দেখতে সব সরে পড়ল।

তখন হাঁইয়ো জোয়ান ছাইও জোয়ান করে, গাছের গোড়াটা উপড়ে ফেলে চাঁদশূর পলকের মধ্যে ভেসে উঠলো। এক্কির লেজের একটা পালক নীল নদীর জলে ঠেকে ছিল; চাঁদশূর দাঁত দিয়ে ধরতেই হুহু করে এক্কি আকাশে উঠে গেল।

আকাশে এক অপরূপ দৃশ্য হলো। পৃথিবীর লোকেরা সব দুরবীন টুরবীন কসে দেখতে লাগল—কি যায়, কি যায়!

৫

স্বপ্ন কন্যেকে পেয়ে মহারাজ চন্দ্রানন ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। চাঁদের মুলুকে ভারি ধুম পড়ে গেল। রাজবাড়ীতে রোজ নেমন্তন্ন—রোজ নেমন্তন্ন। সাদা ভালুকের ঝোল খেয়ে খেয়ে চাঁদের দেশের লোকের বদ হজম হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে প্রকাণ্ড এক বরফের পুরি তৈরী হল। তার মধ্যে এক মস্ত সরোবর তাতে সেই শালুক গাছটি পুতে দেওয়া হ'ল।

সরোবরের তীরে সেই মণির সিংহাসন তার উপরে চন্দ্রানন বস্‌লেন, দরবার করবেন। পাশে সাদা ভালুকের চামড়ার পোষাক পরে স্বপ্ন কন্যে বসে ঠাণ্ডায় হিহি করছেন।

চারিদিক লোকে লোকারণ্য। চাঁদশূর এসে সেলাম করে, তিন আঙুলের তলোয়ার খানির উপর ভর দিয়ে—ভঙ্গী করে একটু বেঁকে দাঁড়ালেন;—মুখে হাসি আর ধরচে না। এখন অর্দ্ধেক রাজ্য চাই।

চন্দ্রানন রাণী পেয়ে সব ভুলে গিয়ে-ছিলেন। এখন মনে হল। তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে নেমে এসে চাঁদশূরের হাত ধরলেন। সেনাপতির এই সম্মানে লক্ষ লক্ষ চাঁদসেনা জয়োল্লাস করতে লাগল।

এখন রাজ্য ভাগ হবে শুনে দেশের লোক গুলো হায় হায় করতে লাগল। সে কি কথা একখানা দেশ দুইখণ্ড হবে—তাতে হবে দুজন রাজা, তাতে কি দেশের লোকের মনের মিল থাকে?

চন্দ্রানন ভাবতে লাগলেন কি করবেন। দেশের লোক—তাঁর সৌম্য সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তখন চাঁদমুলুকের রাজা নৃপতি চন্দ্রানন মেঘগম্ভীর স্বরে দেশের লোককে ডেকে বল্লেন;—

দেখ তোমাদের দেশ—তোমাদের অমতে আমি দু ভাগ করতে পারিনে; কিন্তু আমার

সত্যরক্ষা করা চাই। তাই আমার সেনাপতি চাঁদশূরকে আমার এই অখণ্ড সাম্রাজ্য আজ থেকে ছেড়ে দিলাম।

তখন দেশময় একটা হাহাকার উঠল, সবাই বল্লে মহারাজ তা হতে পারে না—তা হতেই দেব না।

অহঙ্কারের কথা শুনে চাঁদসেনারা ক্ষেপে উঠল। বল্লে, কি! এতবড় কথা—সেনাপতির অর্দ্ধেক রাজ্য কে না দেয় দেখি!

যুদ্ধ বুঝি বাধে। সেনারা খাপ্ থেকে তলোয়ার খুলে চাঁদশূরের ইঙ্গিতের অপেক্ষা কর্ত্তে লাগল।

এমন সময়ে সকলে ধন্যি ধন্যি করে উঠলো—বল্লে এমন না হলে রাজ্যে সুখ হয়। চাঁদশূর গিয়ে রাজার পা ধরে বল্লেন—মহারাজ এই গোঁয়ার ভৃত্য এবং ততোধিক গোঁয়ার এই সেনাদলের হাতে এই সোনার চাঁদ মুলুক দিয়ে কি রাজ্য ছারখার দেবেন। কে বইবে এই রাজ্যের ভার? আপনি যদি বনে যান্ ত' আমিও আপনার সঙ্গে বনে যাব।

চারিদিকে আবার উৎসবের বাজনা বেজে উঠল। স্বপ্নকন্যের সখির সঙ্গে চন্দ্রানন চাঁদশূরের বিয়ে দিলেন। চাঁদ মুলুকে ধুমধামের আর অবধি রইল না।

আমার কথা ফুরুলো।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ফাগুনে।

১

ফাগুনে ওগো শীতল বায়ু
স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে,
শুভ্র কোমল ফুলের বুকে
জোৎস্না শুয়ে হাসে,
ফাগুনে মূক পিকের হৃদে
কূজন উঠে ফুটে,
ফাগুনে তোর অধর মধু
মদির হ'য়ে উঠে।

২

ফাগুন আনে কানন তরে
মুকুল কত শত,
তরুণ যত হৃদয় তরে
আকুল তৃষা যত;
ভ্রমর তরে ফাগুন আনে
নিত্য নব মধু
আমার তরে নূতন করে
তোমায় আনে বধূ।

৩

ফুল্ল হেন ফাগুন রাতে
ফুলের গাঁথ মালা
রাখীর রাঙ্গা সূতাটি তায়
খুলিয়া দিও বালা,
ওগো সুন্দর যত মধুর যত
কুসুম নব লয়ে,
হৃদয়খানি তাহার সাথে
গাঁথিয়া দিও প্রিয়ে।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

সংক্ষিপ্ত 'ইতুর কথা'।

[মুর্শিদাবাদ জেলার পল্লিগ্রাম ভগবান গোলা অঞ্চলে এখনও অনেক প্রাচীনারা এই পুরাতন ইতুর কথা অগ্রহায়ণ মাসের 'ইতু পূজা'র দিন বলিয়া থাকেন। 'উমূনো ঝুমূনা'র সুদীর্ঘ আখ্যানটি প্রতি রবিবারে বলা হইয়া উঠে না, কারণ অগ্রহায়ণ মাসের বেলা নিতান্তই ছোট—সকালে পুজার আয়োজনেও কিছুক্ষণ সময় যায় কাজেই সবদিন 'বড় কথা' শুনা হয় না। বিশেষ গৃহিণীরা সেই কথা এমন ভনিতা করিয়া বাড়াইয়া বলেন যে গৃহস্থ বধূ কন্যাদের সে সময় অনেক কাজ কর্ম্মের ক্ষতি হয়। কথা শুনিতে বসিয়া উঠিতে নাই সেইজন্য অনেক সময় ব্রতীরা কেহ কার্য্যান্তরে অন্য গৃহে থাকিলে অগত্যা তাঁহার নামে মাটিতে একটা দাঁড়ি কাটা হয় বা কেহ কেহ এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি কোন দিন প্রাতঃকালে শুনিয়া লন। দুই সংক্রান্তিতে কেবল উক্ত বড় ইতুর কথা বলা হয়। মাসের চারিটা রবিবারে এই ছোট কথাই প্রায় শুনা চলে। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যের তেজোহ্রাস ও অর্চ্চনার মূল ইতিহাস। সেই বৃহৎ উপাখ্যান গ্রাম্য রমণীদের মুখে মুখে এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

"৺ ঠাকুর শ্রীসূর্য্যি সমস্ত দিন ফিরে কোত পরিভ্রমণ করে এসে বল্লেন "যম যমুনা, শালুক সিঁদুর ফুল নাওসে"। যম যমুনা বল্লেন "কিবা নেব শালুক সিঁদুর ফুল? সৎমায়ে গাল্ দিয়েছে চোক কাণা হোক্, সৎমায়ে গাল দিয়েছে পায়ে গোদ হোক্।" ঠাকুর বল্লেন "রুক্মিণী কোথায়"? ঘরে গিয়ে দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন যে 'ছায়া' কন্যাকে রূপ যৌবন দিয়ে রুক্মিণী বাপের বাড়ী গিয়াছেন। ঠাকুর শ্বশুর বাড়ি গেলেন খুঁজ্‌তে, সেখানে গিয়ে বল্লেন "এখানে রুক্মিণী এসেছে?" তাঁরা বল্লেন "কই সে তো আসেনি? রুক্মিণীকে আন্‌তে যাব বলে কলা পাকাতে দিয়াছি, চিঁড়ে কুট্‌তে দিয়েছি; রুক্মিণী ত এখানে আসেনি।" তখন ঠাকুর ধ্যানস্থ হয়ে দেখ্‌লেন যে পর্ব্বতের গুহায় রুক্মিণী ঘুঁড়ি হয়ে লুকিয়ে আছেন, তিনি ঘোঁড়া হয়ে সেইখানে গেলেন। সেই গুহায় তাঁদের অশ্বিনী কুমার যুগলনন্দন হ'ল, তাঁরা ভূমিষ্ঠ হয়েই বল্লেন "প্রভু! আমাদের কি নিমিত্ত সৃষ্টি কল্লেন?" "স্বর্গে দেববৈদ্য হওগে।" তাঁরা দুই জন চলে গেলেন। এদিকে পৃথিবীতে হাহাকার পড়ে গেছে, জগতের চক্ষু জগতের জীবন যে সূর্য্যি তিনি উদয় হন্‌না। ঠাকুর বল্লেন "রুক্মিণী চল আলয়ে যাই, আমি উদয় হইতেছি না পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হচ্চে—সৃষ্টি নাশ হবে"। "ঠাকুর! তোমার তেজ সহ্য করিতে আমি পারিব না বলে তোমার ভয়েই এখানে এসে লুকিয়ে আছি, আমি যাবনা তুমি যাও।" "তাহ'লে রুক্মিণী তুমি এক কাজ কর আমাকে 'কোঁদে' বসিয়ে টান, আমার তেজ কম্‌বে।" তুমি দেবতা আমি মনিষ্যি তাকি পারি?" "আমি ইচ্ছে করে 'কোঁদ' মেগে নিচ্ছি তোমার কোন অপরাধ হবে না।" তখন রুক্মিণী হেলেঞ্চা কলমীর দড়া করলেন, নিম কাঠের গড় কর্‌লেন, করে ঠাকুরকে সেই কোঁদে বসিয়ে প্রথমবার টান্‌তে শ্রী অঙ্গ হতে লোম সকল খসে পড়ল। ঠাকুর বল্লেন "আহা-হা আমার লোম নষ্ট হবে? পৃথিবীতে গিয়ে 'দুর্ব্বা' হয়ে জন্মাক; সকল পুষ্পের সার দুর্ব্বা সকল দেবতার পুজোয় লাগবে।" দুই বারের

বার টান্‌তে গায়ের রক্ত দর্ দর্ করে পড়তে লাগ্‌ল, "আহা-হা আমার রক্ত নষ্ট হবে? পৃথিবীতে গিয়ে ওড়ফুল, জবা ফুল, করবী ফুল হয়ে জন্মাক্ সকল দেবতার পূজোয় লাগ্‌বে।" আবার টান্‌তে অঙ্গের মাংস থানা থানা হয়ে খসে পড়্‌ল। "আহা-হা আমার মাংস নষ্ট হবে? পৃথিবীতে গিয়ে তাম্রপাত্র সকল পাত্রের সার পাত্র হয়ে জন্মাক্, সকল দেবতার পূজোয় লাগ্‌বে।" ঠাকুরের অস্থিমাত্র অবশেষ থাকল; তখন রুক্মিণী খানিকটা আদা বাঁটা এনে গায়ে মাখিয়ে দিলেন—ঠাকুরের শরীর ধাঁ ধাঁ করে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। তিনি শাপ দিলেন যে আমার বারে যে আদা খাবে সে আমার মত দগ্ধ হবে।" তখন রুক্মিণী খানিকটা আম্‌লা বাঁটা এনে মাখিয়ে দিলেন। ঠাকুর যাতনায় অস্থির হয়ে শাপ দিলেন, আমার বারে যে আমলা খাবে আমলা তলা দিয়ে যাবে সে আমার মত দগ্ধ হবে।" শেষে খানিকটা তিল বাটা এনে মাখিয়ে দিলেন; ক্ষত শরীরে যা পড়ে তাই জ্বলে তিনি বল্লেন, "যে আমার বারে তিল, নিম, কলমী খাবে সে আমার মত দগ্ধ হবে।" তখন রুক্মিণী সূর্য্যি ঠাকুরকে তামার টাটে বসিয়ে কাঁচা দুধ্ গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করালেন, ওড়জবা, করবীফুল্ল দূর্ব্বা রক্তচন্দন কামসিঁদুর দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে ঠাকুরকে পূজো করলেন।' ঠাকুর বল্লেন "আহা রুক্মিণী আমি বড় তৃপ্ত বড় শীতল হ'লাম, তুমি এই পূজো মর্ত্তে প্রচার করে দাওগে; এ পূজো যে ক'রবে আমি তার উপর বড় তুষ্ট হব। অগ্রহায়ণ মাস সংক্রান্তি, রবিবারে এই সব ফুল চন্দন দুর্ব্বা কামসিঁদুর দিয়ে যে আমার পূজো 'অর্চ্চনা' ক'র্‌বে সে আমার মত শীতল হবে, দুঃখ দশা দূরে যাবে সুখ সম্পদ হবে।" রুক্মিণী সেই পূজো মর্ত্ত্যে প্রচার করে দিলেন। ঠাকুরের তেজ ক্ষয় হল—ঠাকুর-ঠাকুরুণ আপন আলয়ে গমন কর্‌লেন।

এই কথার আরম্ভে "নমঃ জবাকুসুম"—বলে সূর্য্যদেবকে একবার চাক্ষুস দর্শন করে হাত তুলে সকলে প্রণাম করেন। প্রায় গৃহিণীরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকন্যাগণ ইতুপূজার মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ ঘটস্থাপনা করিয়া থাকেন। কেবল সংক্রান্তির দিন প্রতিবৎসর এক মাসের সংকল্প করিয়া ঘট-স্থাপনা পুরোহিত দ্বারা করাইয়া লইতে হয়। "মার্কণ্ডেয় পুরাণের" 'বিশ্বকর্ম্মার সূর্য্যশাতন' হইতেই যে এই ক্ষুদ্র কাহিনীর অবতারণা তাহা স্পষ্ট অনুমান হয়। গ্রাম্য রমণীদের মুখে সূর্য্যপত্নী 'সংজ্ঞা' রুক্মিণী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সূর্য্যের তেজোহ্রাসের মূল ঘটনা যাহা তাহা এই—

"ভাস্করের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ দেহ হইতে রবির প্রিয়তমা সংজ্ঞা স্বীয় ছায়াময় তনু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "স্বামী ও অপত্যগণের প্রতি আমার সদৃশ আচরণ করিবে কেহ না জানিতে পারেন যে তুমি আমার ছায়া"। এইরূপ বলিয়া 'উত্তর কুরুবর্ষে' বড়বারূপিণী (ঘোটকী) হইয়া তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। 'ছায়া উক্ত উপদেশ মত চলিতে পারেন নাই। তিনি আপন সন্তানগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন সংজ্ঞার পুত্র কন্যাকে নলিনাদি উপভোগের সময় ভিন্ন ভাব দেখাইতেন। সংজ্ঞার দুই পুত্র এক কন্যা। 'মনু' (ইনিই 'বৈবস্বত মনু') 'যম' ও 'যমুনা'। ছায়ারও দুই

পুত্র এক কন্যা। 'সাবর্ণিক' 'শনৈশ্চর' ও 'তপতী'।

মাতার পক্ষপাত লক্ষ্য করিয়াও মনু 'ছায়া'কে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু যম কুপিত হইয়া মাতৃমূর্ত্তিকে পদাঘাতের জন্য পদ সমুদ্যত করেন, কিন্তু ছায়ার অঙ্গে উক্ত পদ নিপতিত করেন নাই। ছায়া যমকে অভিশাপ দেন "তোমার পদ পৃথিবীতে পতিত হইবে।" ভয়াতুর যম পিতাকে ইহা জানাইলে পর সূর্য্য বুঝিয়াছিলেন যে ছায়া প্রকৃত সংজ্ঞা নহে। ছায়াকে ডাকিয়া "সংজ্ঞা কোথায় গমন করিয়াছেন?" প্রশ্ন করিয়া উত্তর না পাইয়া শাপ দিতে উদ্যত হইলে পর ভীত হইয়া ছায়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেন। সূর্য্য তখন সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্ম্মার আলয়ে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গমন করেন। সেখানে তাঁহাকে না পাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন 'সংজ্ঞা 'উত্তর কুরুবর্ষে'। এবং সংজ্ঞার বিবাগিনী হইবার কারণও তিনি ধ্যানে অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা স্বীয় তেজোহ্রাস করিয়া ঘোটক রূপে তথায় উপস্থিত হন।

সূর্য্য বিশ্বকর্ম্মাকে স্বীয় তেজোহ্রাস করিতে আদেশ করিলে পর বিশ্বকর্ম্মা ও দেবদেবর্ষিগণ ভগবান রবির স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া অব্যয় সূর্য্য স্বীয় তেজ মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই রবির ঋঙ্ময় তেজ হইতে পৃথিবী, যজুর্ম্ময় তেজ হইতে আকাশ, ও সামময় তেজ হইতে স্বর্গ হয়। মহাত্মা ত্বষ্টা শাকদ্বীপে বিবস্বান্‌কে ভ্রমিযন্ত্রে (কুঁদ) আরোপণ করিয়া যে পঞ্চদশ ভাগে শাতন করেন তাহার দ্বারাই মহাদেবের শূল, বিষ্ণুর চক্র, শঙ্কর ও পাবকের সুদারুণা শক্তি নির্ম্মিত হয়। সুরারিগণের, যক্ষ বিদ্যাধর বর্গের যে সকল উগ্র অস্ত্র আছে তৎসমস্তই বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের তেজো-অংশ হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সূর্য্য হীনপ্রভ হইয়া ঘোটক রূপধারণ করতঃ সংজ্ঞাকে আনিতে জান। সেই স্থানে তাঁহাদের 'অশ্বিনী কুমার'দ্বয় ও 'রেবন্ত' নামে অপর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 'অশ্বিনী-কুমার'দ্বয় পিতৃ আদেশে স্বর্গবৈদ্য এবং 'রেবন্ত' গুহাধিপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। সূর্য্য হ্রস্বতেজ হইয়া যে কান্তমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন বড়বারূপিণী সংজ্ঞা সেই অতুলরূপ দর্শনে প্রীত হইয়া স্বরূপ ধারণ করেন। তখন জলশোষক ভাস্কর স্বরূপধারিণী প্রীতিময়ী ভার্য্যাকে নিজ আশ্রয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন। যমকে শত্রু মিত্রে সমদর্শী দেখিয়া সূর্য্য তাঁহাকে 'যমত্বে নিযুক্ত করেন। 'যমুনা' নদীরূপে কলিন্দ দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইলেন। সংজ্ঞার জ্যেষ্ঠপুত্র বৈবস্বত মনুর তুল্য ছায়ার জ্যেষ্ঠপুত্র সাবর্ণিকও 'বলি'র ইন্দ্রত্ব কালে মনু হইয়াছিলেন। শনৈশ্চর পিতা কর্ত্তৃক গ্রহগণ মধ্যে নিযুক্ত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা 'তপতী' 'সংবরণ' নামীয় রাজা হইতে 'কুরু' নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। "শিশির বর্ষা ও গ্রীষ্মকালের সেতুস্বরূপ ত্রিভুবন পবিত্রকারী তেজঃস্বরূপ নিখিল জগতের প্রদীপ বিশ্বস্রষ্টা এবং হরিহর ব্রহ্মার সংস্তুত ভানুদেবের এই তনু পরিলিখন কথা শ্রবণ করিলে জীবনান্তে দিবাকরলোক প্রাপ্তি এবং জীবিত কালেও উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত

হইয়া মহাযশঃ প্রাপ্তি এবং অহোরাত্র কৃত পাপ সকল বিনাশিত হয়।"

এই কাহিনী শুনিয়াই "উমনো ঝুমনো'র দুঃখ দশা দূরে গিয়া সুখ সম্পদ হইয়াছিল।

শ্রীমতী সুরমা দেবী।

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত যে সংক্ষিপ্ত ইতুকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

মেয়ে আট বছরের বেলা, গলায় দানার মালা, তপ করেন, জপ করেন, সুয্যির থালে অর্ঘ্য দেন, দিয়ে বর মাগেন, "হে সুয্যিঠাকুর আমার হিঙ্গুলের থালা হোক্, গামার কাঠের পিঁড়ে হোক্, রাজ্যেশ্বর বাপ হোক, দশরথের মত শ্বশুর হোক, সভা-আলো স্বামী হোক্, দরবার-আলো পুত্র হোক, হেঁসেল-আলো বৌ হোক, মেঝে-আলো ঝি হোক, আড়ি-মাপা সিঁদুর হোক, সোনার আঁচিল সোনার পাঁচিল হোক্ সকল স্বুবর্ণময় হোক্!"

সুয্যিঠাকুর কপাট দিয়ে শুয়ে আছেন; সুয্যির মা তপ্ত জল ভাত রেঁধে ঘর-বার কচ্ছেন, এখনো কেন সুয্যি উঠল না! মানুষ মরে শীতে, গরু মরে ঘাসে। সুয্যির মা ঘরে গিয়ে দেখেন যে সুয্যি ঘরে কপাট দিয়ে শুয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "এখনো কেন ওঠনি বাপু?" সুয্যি বল্লেন, উঠ্‌বো কি? একটি গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে আঠ বছর বয়সের বেলা, গলায় দানার মালা তপ করেন, জপ করেন, আমার থালে অর্ঘ্য দেন, দিয়ে বর মাগেন; তা আমি এক তোলা সোণা দিয়ে উদয় হই, এত সোণা কোথা পাব?" সুয্যির মা বললেন, "তুমি দেবতা দিবাকর, তুমি 'তথাস্তু' বললেই তা সম্পূর্ণ হবে!" সুয্যি বললেন, "হবে ত মা হবে?" এই বলে উদয় হলেন।

এগার বছর ব্রত হয়েছে, এক বছর আর বাকী আছে। রক্তচন্দন জবাফুল নিয়ে সুয্যির থালে অর্ঘ্য দিয়ে বর মাগলেন, "হে সুয্যি ঠাকুর, আমার হিঙ্গুলের থাল হোক, গামারের পিঁড়ে হোক, রাজ্যেশ্বর বাপ হোক্, দশরথের মত শ্বশুর হোক, সভা-আলো স্বামী হোক, দরবার-আলো পুত্র হোক, হেঁসেল-আলো বৌ হোক, মেঝে আলো ঝি হোক, আড়ি-মাপা সিঁদুর হোক্, সোনার আঁচিল পাঁচিল হোক, সকল সুবর্ণময় হোক্!"

সুয্যি ঠাকুর 'তথাস্তু বললেন; সকল সুবর্ণময় হোল!

কিছুদিন ঘরকন্না করলেন, শেষে সুয্যি ঠাকুরকে অর্ঘ্য দিয়ে বললেন, "হে সুয্যি ঠাকুর আমরা আর মর্ত্ত্যে থাকবো না, আমরা স্বর্গে যাব!

সুয্যি ঠাকুর আলোক-রথ পাঠিয়ে দিলেন। আলোক-রথ এল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, চুয়া চন্দনের ছড়া পড়তে লাগল, বেড়ির বাজনা বাজতে লাগল, মা-বাপ স্ত্রী পুরুষ রথে উঠে স্বর্গে যাচ্ছেন; যেতে যেতে মনে হল 'এমন যে ব্রত করলুম, তা পৃথিবীতে নরলোক টের পাবে না,' বলে কানের তালপত্র নিলেন, নয়নের কাজল নিলেন, চিরকুট লিখে মর্ত্ত্যে ফেলে দিলেন; 'এই ব্রত যে করবে, এই ফল তার হবে, অন্তকালে স্বর্গে যাবে।'

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী।

ইতুর অর্থ ব্যাখ্যা।

বিগত মাঘের ভারতীতে দেখিলাম মাননীয়া ভারতী সম্পাদিকা ঋতুশব্দ হইতে ইতুশব্দের উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় ইতুশব্দ মিতুশব্দের অপভ্রংশ। সূর্য্যের এক নাম "মিত্র" এই মিত্রপূজা হইতেই ক্রমশ মিতু বা ইতুপূজা প্রচলিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবারে শস্যবৃদ্ধি কামনায় সূর্য্যের পূজা করিতে হয়। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা সমাপ্ত হয়।

যে পরিবারে যতগুলি স্ত্রীলোক ততগুলি ইতুঘট মৃত্তিকা-সরার উপর স্থাপন করিতে হয়। ঘট বসাইবার পূর্ব্বে সরার উপর মৃত্তিকা দিয়া শঞ্চশস্য ছড়াইতে হয় এবং তাহাতে ধান্য .মান ও হরিদ্রা বৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক ছোট ছোট খুরির উপর ঘট বসান হয়। ঘটগুলি গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে হরিতকী বা শুপারী দিয়া পরে সূর্য্যের ধ্যান মন্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া ইতুর কথা শুনিতে হয়। ইহার ব্রতকথা স্থানভেদে রূপান্তর হইয়া পড়িয়াছে।

বিনীতা নিঃ

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

নিষ্ফল।

নীড়ে নাহি ছিল একটি শাবক,
বুকটি পীযূষভরা।
মা বলিয়ে কভু করেনি ভাষণ
যতদিন ছিল ধরা।
উজলি অন্তর সেই মুখখানি,
ঢাকিত নিরাশা ব্যথা।
সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ পরাণ
জড়ায়ে মমতালতা।
নিশা শেষ হায় ফুরাল স্বপন,
ফুরাল সাধের খেলা।
টুটিল বন্ধন ছিঁড়িল আঁধার
থাকিতে আকাশে বেলা।

ভীষণ দুখের গহন কান্তারে,
যেন কে টানিয়া নিল।
শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ দর্শনে
চিত্ত উন্মাদিল।
পায় পায় ফুটে অগণ্য কণ্টক
যাইতে পারেনা ছুটে।
আজি জর জর অন্তর বাহির,
তবু ত যায়না টুটে।
অনিমিখ আঁখি উরধে চাহিছে,
বিন্দু অশ্রু ফুটে।
শত মলা ধুলা ধৌত করি তায়,
দেবতা চরণে লুটে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

তরুসিংহ।

সদাকাঙ্ক্ষ ভাই তরুসিংহ মঞ্ঝা জঙ্গল প্রদেশস্থ পোল্লা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার সংসারে তিনি, তদীয় বৃদ্ধ মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী পরমসুখে দিন যাপন করিতেন। ভাই তরুর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ হইলেও তিনি এ যাবৎকাল দারপরিগ্রহ করেন নাই। চিরকাল লোকসেবায় আপনাকে নিরত রাখিবার অভিলাষেই তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। তদীয় মাতা ও ভগিনী প্রথমে তাঁহার সে কঠোর ব্রতের প্রতিবন্ধকে দাঁড়াইলেও শেষে তাঁহারা তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সকল কার্য্যের সহযোগিনী হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া অনন্যচিত্তে দরিদ্র বুভুক্ষু ব্যক্তিদিগকে অন্নদানে, পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সেবা দানে, ও মনঃক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা দানে তুষ্ট করেন। লোকসেবাই এক্ষণে তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছে, দৃঢ়তার সহিত সেই ব্রতেই তাঁহারা নিরত আছেন।

ভাই তরুর কয়েক বিঘা ভূমি ছিল। সমস্ত বৎসর তাহা কর্ষণ করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তৎসমুদয়ই লোক-হিতার্থ ব্যয় করিতেন। স্বীয় সংসারের জন্য তাহার কণামাত্রও ব্যয় করিতেন না। তাঁহার মাতা ও ভগিনী আরামে দিন না কাটাইয়া কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই কোনরূপে সংসার চলিয়া যাইত। কিন্তু এরূপ কষ্টে তাঁহাদের সৎসাহস দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল।

এইরূপে যখন দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছিল, তখন একদিন সহসা সম্রাটের 'আম হুকুম' হইল,—যে যেখানে পাইবে, শিখ-হত্যা করিবে। শিখ-হত্যাকারীরা রাজ-সরকার হইতে বহু অর্থ পুরস্কার পাইবে। আর যদি কেহ কোন শিখকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে পারে, তবে সে বিবিধ রাজ-সম্মানে ভূষিত হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র শিখেরা জঙ্গলদেশে পলায়ন করিল। কিন্তু তথায় কয় দিন লুকাইয়া থাকিতে পারে? যখন ক্ষুধায় উৎপীড়িত হইতে লাগিল, তখন তাহারা রাজসরকারের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল এবং মুসলমান নগর-গ্রাম নষ্ট করিয়া আত্মোদর পূর্ণ করিতে লাগিল। এই সময় রাজসৈন্যগণের সহিত তাহাদের নিয়তই যুদ্ধক্রীড়া চলিত। সম্মুখ সমরে পরাজয় অসম্ভব জানিয়া ধূর্ত্ত শিখেরা অসতর্ক মোগলদিগের উপর হঠাৎ আপতিত হইয়া খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়া যথাসম্ভব লুণ্ঠন করিয়া পলাইত। এই সময় হইতেই তাহারা অশ্বারোহণ করিতে শিখে ও ক্রমে প্রবল অশ্বারোহী সৈন্য হইয়া উঠে।

এই সময় যে সকল শিখে মঞ্ঝাপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা সকলেই ভাই তরুসিংহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত। তরুর সেবায় ও তাঁহার মাতা ভগিনীর শুশ্রূষায় উৎকণ্ঠিত শিখদিগের প্রাণে বিমল স্ফূর্ত্তির উদ্রেক করিত। ভাই তরু কেবল অতিথি-দিগকেই সেবা করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, ভ্রাতা-ভগিনীতে মিলিয়া অন্ন-হস্তে গভীর অরণ্য প্রদেশে গমনপূর্ব্বক লুক্কায়িত শিখ-

দিগকে আহার করাইয়া তৃপ্ত হইতেন। তাঁহাদের এরূপ সেবায় কত শিখকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই!

অল্পদিন মধ্যেই তরুর গৃহ শিখদিগের তীর্থস্থল হইয়া উঠিল। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দিগ্‌বিদিক হইতে শিখেরা নীরব কর্ম্মবীরের কর্ম্মসাধনা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, তরুও 'তন-মন-ধন দিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন।

শিখদিগের সন্ধান পাইবার জন্য রাজ-সরকার হইতে বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সব চরেরা রাজসম্মান ও অর্থলোভে নিরীহ প্রজাপুঞ্জের গৃহে অকারণ আর্ত্তনাদ তুলিতে বড়ই সুখানুভব করিত। তাহাদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া কত রাজভক্ত প্রজাকেও শেষে রাজদ্রোহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু চরপ্রধান রাজন্যবর্গ রাজ্যের এই গুপ্ত শত্রুদিগকে নিয়তই প্রশ্রয় দিয়া আপনারাই অকল্যাণকে বরণ করিয়া লইলেন। মোগল রাজন্যেরা নিরীহ শিখদিগকে উত্যক্ত না করিলে তাহারা কোন ক্রমেই বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইত না এবং মোগল সিংহাসন চূর্ণ করিতেও প্রয়াস পাইত না।

হিন্দু-কুলাঙ্গার হরভকত নিরঞ্জণী এই সকল চরদিগের নেতা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে সমস্ত শিখসমাজ কম্পিত হইত। তাঁহার মায়াবী কৌশল অতিক্রম করিবার ক্ষমতা বা সুবিধা সব সময় তাহাদের হইয়া উঠিত না। ফলে শিখগণ প্রায়ই ধৃত হইয়া বিনা বিচারে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মোগল-রাজলক্ষ্মীকে অভিসম্পাত করিতে করিতে অনন্তকালে মিশিয়া যাইত! ভাই তরুসিংহের শিখসেবার কথা অচিরেই তাঁহার কর্ণগোচর হইল। 'বিদ্রোহী, দস্যু ও দুর্বৃত্ত শিখদিগকে পোষণ করিয়া তরু রাজআজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে এরূপ শাস্তি প্রদান করা উচিত, যাহাতে আর কেহ তাঁহার পদানুসরণ করিতে সাহস না পায়।'—লাহোরপতিকে এইরূপভাবে উত্তেজিত করিয়া, নিরঞ্জণী বহুসংখ্যক মোগল অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পোল্লাগ্রামে 'শুভাগমন' করতঃ ভাই তরুসিংহকে বন্দী করিলেন। ভাই তরুও কোনরূপ আপত্তি না করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

লাহোর যাইবার পথে বহুসংখ্যক শিখ একত্রিত হইয়া তরুসিংহকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রয়াস পায়; কিন্তু তরুসিংহ হাস্যবদনে এরূপ রাজদ্রোহিতায় তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ক্ষুণ্ণ মনে শিখেরা সে স্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন মোগলসৈন্য তরুসিংহকে লইয়া লাহোরে উপস্থিত হইল, তখন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে রজনীতে আর তাঁহাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিবার সময় ছিল না কাজেই এক অন্ধ কারাগারে তাঁহাকে সে রাত্রির জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। বীর অম্লানবদনে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন যথাসময়ে তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইলে, বীর স্বীয় প্রথামত 'শ্রীবাহ্ গুরুজি কা খালাস, শ্রী বাহ্ গুরুজিকা ফতে!' এই নিনাদ দ্বারা বিচারপতিকে

সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহার এই 'ধৃষ্টতায়' মোগলেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে নানারূপ কটূক্তি করিতে লাগিল।

বিচার আরম্ভ হইলে, তরুসিংহ মোগল সরকারকে জানাইলেন, কোন কালেও তিনি দস্যুতা করেন নাই। তাঁহার সামান্য যে জমি আছে, তিনি তাহাই কর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় আহার্য্য উৎপাদন করেন। চির দিনই যথা সময়ে কর দিয়া আসিয়াছেন। তথাপি তাঁহার প্রতি এ নিগ্রহ কেন? তাঁহার সে প্রশ্নোত্তরে নবাব তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—'তুমি সরকারের বিরুদ্ধাচারী। বিদ্রোহী-শিখদিগকে আশ্রয় দিয়া তুমি বিদ্রোহে প্রশ্রয় দিয়াছ। সুতরাং বিদ্রোহী বলিয়াই তোমার বিচার হইবে। তুমি কি জন্য বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়াছ?'

তরুসিংহ উত্তর করিলেন—"আমার বিশ্বাস, তাহারা কোন মতেই বিদ্রোহী নহে। তাহারা আমার সমধর্ম্মী। আমি যদি তাহাদিগকে আমার স্বীয় ধন-সম্পত্তি দান করি, অথবা অন্নদানে তুষ্ট করি, তাহাতে কাহার কি বলিবার আছে? আমার জিনিষ আমি দিব, আমি তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি, তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করা অন্যের শোভা পায় না।"

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানবের সকল স্বাধীনতাই অপহৃত হয়। সংসারের প্রায় সামান্য কার্য্যটী পর্য্যন্ত তাহাকে ভয়ে ভয়ে সম্পাদিত করিতে হয়। পাছে রাজসরকার কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে তাহার কোন দোষ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে বিপদগ্রস্ত করেন, এই ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদা একরূপ ত্রস্ত থাকিতে হয়। তাই তরু পুণ্য কর্ম্ম সাধনের আগ্রহাতিশয্যে এই সত্যটি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাই তিনি অতি সহজে নবাবের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু নবাব তাঁহার সে সহজ উত্তরে তুষ্ট হইবেন কেন? বরং তাহাতে তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আদেশ করিলেন, চক্রযন্ত্রে পেষণ করিয়া শিখবীরকে হত্যা করা হউক। তখনই সে আদেশ পালিত হইল। ভীষণ চক্রযন্ত্রে বসাইয়া মোগলেরা তাঁহার সবল দেহ ভগ্ন করিতে লাগিল;—মাংস ছিন্ন হইতে লাগিল, রক্তে ভূমিতল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। অম্লানবদনে বীর 'অকাল' শব্দ জপ করিতে করিতে সকল অত্যাচারই সহ্য করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া বীরকে কারাগারে রুদ্ধ করা হইল। তখন ইস্লাম অবলম্বনের জন্য তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস চলিল। কিন্তু বীর সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়া শিখসুলভ সাহসের পরিচয় দিলেন। কিন্তু সে সৎসাহস হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা ধর্ম্মান্ধ অত্যাচারীর নাই। কাজেই আবার তাঁহাকে চক্রযন্ত্রে পেষণ করা হইতে লাগিল। এইরূপে যন্ত্রণা দিয়াও যখন কোনমতেই তাঁহাকে মোগলের পাপ প্রস্তাবে সম্মত করিতে পারা গেল না, তখন তাঁহাকে পুনরায় নবাবের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। নবাব তাঁহার দৃঢ়তায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—'যুবক! যদি ভাল কথায় ইস্লাম গ্রহণ করিতে সম্মত না হও, তবে তোমাকে জোর করিয়া—জুতা প্রহার করিতে করিতে ও

তোমার ঐ অতি-পূজ্য কেশ কাটিয়া দিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করাইব।'

এত অত্যাচারেও তরুসিংহ একটিও ক্রোধের কথা কহেন নাই। কিন্তু আর বুঝি সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন—'উদ্ধত নবাব! যতক্ষণ আমার জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমার কেশ কর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এ সামান্ত কেশের প্রতি লোভ কেন? কেশের সহিত এই মস্তকটি লইলেই ত' সব চুকিয়া যায়? জুতা মারিবে! মূর্খ! মনে রাখিও, একদিন শিখেরই জুতা তোমার গর্ব্বোন্নত শিরে বর্ষিত হইয়া তোমার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিবে!' *

তরুর কেশ কর্ত্তন ও মুণ্ডন করিবার জন্য তখনই নবাব আদেশ করিলেন। অনুচরেরা কাঁচি ও ক্ষুর লইয়া আদেশ পালনে তৎপর হইল। কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই সে কেশ কর্ত্তন বা মুণ্ডন করিতে পারিল না। শেষে টানাটানিতে চর্ম্ম শুদ্ধ কেশরাশি উপড়াইয়া আসিল!

মস্তকে বিষম আঘাত পাইয়া বীর তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কতিপয় হিন্দুর উপর সে দেহ স্থানান্তরিত করিবার ভার পড়িল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরের মূর্চ্ছা অপনীত হইয়াছিল। তখন বীর সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া ভজন গাহিতে গাহিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। সেই ধ্যানাবস্থাতেই তাঁহার প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* শিখেরা বলেন—তাঁহাদের সে কথা কতদুর সত্য জানি না, যে দিন নবাব তরুর কেশ কর্ত্তনের আদেশ দেন, সেই দিনই তিনি একটি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। তখন তাঁহার মনে নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের হত্যার জন্য অনুতাপ হয়, এবং এই রোগ তরুসিংহের অভিসম্পাতের ফল মনে করিয়া শিখ বীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শিখবীর তাহাতে বলেন—'নবাব আমাকে ত' অপমান করেন নাই—অপমান করিয়াছেন গুরুকে—সমগ্র শিখ সমাজকে। আমার প্রতি যদি কোনরূপ অন্যায় করিয়া থাকেন, সেজন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু সমগ্র শিখ সমাজকে যে অপমান করিয়াছেন, তাহার জন্য ক্ষমা করিবার অধিকার আমার নাই।" তৎপরে নবাব নাকি যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্ত হইবার জন্য শিখবীরের নির্দ্দেশ মত শিখদিগের জুতা মস্তকে ধারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। কিন্তু এ সমস্ত কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বোধ হয় না। নবাবের এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তিনি এ ঘটনার পর আর শিখহত্যায় মত্ত হইতেন না।

প্রেম-স্বপ্ন।

কি দেখি'ছ?
—দেখিতেছি তোমারে হে প্রিয়া;
দেখিতেছি যেন ভাবনায়। যেন তুমি নহ গো রূপসী,
কিম্বা নহ আমার প্রেয়সী;
যেন তুমি শুধু সুধা—বাঞ্ছিত অমিয়া;
পূর্ণ, মগ্ন করে' আছ আমার এ হিয়া;
সদা স্নাত করিতেছ মোরে
লহরে লহরে!

—

যেন এই দেখিতেছি তোমারে প্রথম স্বপ্ন মাঝে।
মোর মুখপানে তব ওই যে নয়ন চেয়ে আছে
যেন সেই নেত্র মোর অস্তিত্বেরে করি' দীর্ণ ধীরে
প্রবেশি' এ অন্তঃপুরে, মনেরে ডুবা'য়ে তন্দ্রানীরে
ফেলিয়াছে অবসন্ন, জ্ঞান-হারা করে'। আজি তাই,
যেন মোর জাগিবার—বুঝিবার কোন শক্তি নাই!
কে তুমি, কি তুমি-কহ। তুমি তো আমার কেহ নহ!
তবে কেবা কিবা তুমি?
আজি তব নাহি কোন দেহ;
আজি তুমি রূপময়ী—অন্তরের যে অতুল প্রভা
ওই স্বচ্ছ তনু'পরে উঠে'ছে ফুটিয়া! এ কি শোভা,
—না, এ মায়া মোহময়ি? সুখভরা এ বেদনা হায়,
কহ-কহ কেন জাগে অনিবার হেরিলে তোমায়?
কেগো তুমি?—কেহ নহ; যেন তুমি নহ পৃথিবীর!
উদিয়াছ শুধু আলো দিতে;—যেমন আঁধার রজনীর
গাঢ়তম ঘুচাইয়া দিতে ওঠে শরতের শশী,
তুমি যেন সেই মত! তা'ই কিগো?—উঠিলে উল্লসি'
একবার মৌন হাস্যভরে তুমি, অনন্ত পাথার
তাই কি অমন কাঁপে আবেশ-তরঙ্গে বারম্বার?
নহে, হায়—তাহা নহে'। তুমি যে আমারি কাছে বসি'
শুধু মোরে দহিতেছ তাপহীন দাহে! রবি-শশী
তবে নহ তুমি।
কিন্তু, তবে কিবা তুমি? রহি' রহি'
এই যেগো নিরন্তর করিতেছ বিচেতন, দহি'
এই যে এমন ভাবে সুখী করি'—দিতেছ বেদনে,
এ আবার কোন লীলা? নহ দেবী; তবে বা কেমনে
এত মায়া করিছ বিস্তার? তবে, হেরিলে তোমায়,
কেঁদে উঠি হাসিতে হাসিতে তবে কেন? এ আমায়
কেন তবে হারাইয়া ফেলি আমি তোমার মাঝারে
পলে পলে? কেন তবে এত ব্যথা?—তবে এ সংসারে
তুমি মোর তৃপ্তি নহ?
তবে কিগো মলিন মরতে
তুমি শুধু খসে'-পড়া এক বিন্দু তারা? চিন্তা-স্রোতে
তুমি কিগো ভেসে'-আসা অপূর্ব্ব চেতনা? তুমি তবে
শুধু কিগো স্বরগের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়—ভবে,
আসিয়াছ নামি' ভ্রমে সুমধুর গীতি-অংশ সম?
তুমি কিগো শুধু এক-স্বপ্ন-স্মৃতি—চির-অনুপম,
প্রীতি ও বেদনা মাখা?
তুমি কি? ভাবিগো তাই আমি
—তুমি যেন কিসের আভাস! যেন নিত্য দিন-যামি'
তুমি—যাতনায় দীপ্ত, প্রখর-উত্তপ্ত ধরণীর
প্রীতি-ছায়া-নিম্ন-বাহী, স্নিগ্ধ, মন্দ, মর্ম্মর সমীর!
যেন তুমি দীর্ঘশ্বাস শুধু! যেন তুমি?—কিছু নহ!
শুধু এক মূর্ত্তিমান, প্রাণোন্মাদী, জীবন্ত বিরহ!
জাগি'ছ—ঝঙ্কারসম; আলোকে সঙ্গীতে সমহান;
অপূর্ব্ব গন্ধের মত!
কে তুমি হে নিখিলের প্রাণ!

—

কি কহি'ছ?
—এ কি স্বপ্ন? কি বলে'ছি প্রিয়া?
কহিয়াছি কিছু?...বুঝি নহে। শুধু, মুখর-উন্মাদ মত
কহে'ছি নিরর্থ কথা যত!
ক্ষমা কর অপরাধ। কিন্তু, কি দেখিয়া
তোমাতে, কেমন হ'ল! বক্ষে আলিঙ্গিয়া
এস, এস—'তবে ডুবে' যাই;
—ঘুচুক বালাই!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

দুই ইচ্ছা।*

আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব।

এর মধ্যে দুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ-উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে বরকন্যার মিলন এবং তাকে বেষ্টন করে আছে আহূত অনাহূত রবাহূতের মিলন—পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন—তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মুল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্ব-সাধারণের সঙ্গে আনন্দ মিলন।

আজ প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে সেই মূল কথাটিকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই—সব মিলনের মূলে যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগৎসংসার নেই কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন সেই খান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব—তার পরে সেই একটিমাত্র বৃন্তের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয়পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিভৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত আরম্ভ করা যাক্! কোন্‌খানে আমি আর তিনি মিল্‌চেন সেইটে একবার চেয়ে দেখি।

রোজই ত দেখা যায় সকাল থেকেই সংসারের কথা ভাবতে সুরু করি। কেননা, সে যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কি চাই কি না চাই কি রাখব কি ছাড়ব এই কথাটাকেই মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার।

যে বিশ্বভুবনে বাস করি তার ভাবনা আমাকে ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য্য উঠচে না, বায়ু বইচে না, অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্চে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড় ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেননা সেটা যে আমারি ভাবনা।

তাই এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে মনে হয় না, আমার প্রভাতকালের সামান্য আয়োজন-চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্য্যোদয়ের কাছে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না, এমন কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চল্‌তে পারে।

তবেই ত দেখছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্চে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করচেন; আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্বটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্য্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেননা ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা, তার কর্ত্তৃত্ব, আছে।

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন।

* মাঘোৎসবে পঠিত।

যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্চে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছাময় তিনি "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক-একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে। এই বলে, সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই, আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে। স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। সে মায়ের কাছ থেকে কেবল সেবা চায় না, সেবার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চায়—বলে যে, বন্ধু ইচ্ছা করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার করুক্—এমন কি, উপকার নাও করুক কিন্তু তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে—আমি যেন তার অনিচ্ছার সামগ্রী না হই।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না, সেখানে নিজেকে তার খর্ব্ব করতেই হয়। আমি যেম্‌নি ইচ্ছা তেম্‌নি চল্‌ব অথচ অন্যের ইচ্ছাকে বশ করে আন্‌ব এ ত হয় না। গৃহিণীকে বাড়ীর সকলেরই সেবিকা হতে হয় তবেই তিনি বাড়ির সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুল্‌তে পারেন।

এই যে ইচ্ছার অধীনতা এতবড় অধীনতা ত আর নাই। আমরা দাসতম দাসের কাছ থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদায় করতে পারি না—অতএব সেই ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে তখন আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাই বল্‌ছিলুম—ইচ্ছাতেই আমাদের স্বাধীনতার সব চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। ইহা, অহঙ্কারেরর মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে সুখ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে বড় সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে।

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্ম্মটি দেখতে পাচ্চি—তিনিও ইচ্ছাকে চান। এই জন্যেই—চাইতে পারবেন বলেই—আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একবারে নিঃশেষ বেঁধে ফেলেন নি। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য কেবল ঐ একটি জিনিষ তিনি নিজে রাখেন নি। সেটি আমার ইচ্ছা—ঐটে তিনি কেড়ে নেন না, চেয়ে নেন—মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিষ আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি সে আমারি ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করেছেন। আমার কাছে এসে বল্‌চেন আমি রাজখাজনা চাইনে আমাকে প্রেম দাও! হে প্রেমস্বরূপ, তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যেই এই এক সৃষ্টিছাড়া "আমি'র লীলা ফেঁদে বসেছ এবং আমাকে এই একটি

ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

তাই যদি না হত তবে এ গানটি গাইতে কি আমার সাহস হত?

"নাথহে, প্রেম পথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও—
মাঝে কিছুই রেখোনা রেখোনা—
থেকোনা থেকোনা দূরে!"

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে?

বিশ্বভুবন বল্‌তে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোট যে কোনো অঙ্কের দ্বারা তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে একেবারে তাঁর পাশে এসে বস্‌বে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোম হুতাশন যুগযুগান্তর জ্বল্‌চে আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবীর জোরে দ্বারীকে বলচি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে?

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষার অশান্ত উন্মত্ততা, অহঙ্কারের চরম পরিচয়?

কিন্তু অহঙ্কারের একটা যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা সেটা ত এর মধ্যে দেখ্‌চিনে—এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করা। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে সে যে নিজেকে দীন করে, সকলের পিছনে সে দাঁড়ায়; যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধূলা পেলেও সে যে বাঁচে।

সেইজন্যে জগৎ সৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য বড় লাভ বলে চায়।

কেন চায়? কেন না, সে যে অধিকার পেয়েছে। হোন্‌না তিনি বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ, এই প্রেমের দাবি তিনিই জন্মিয়েছেন, আবার প্রেমও তাঁরই সঙ্গে। এতে আর ভয় লজ্জা কিসের!

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ "আমি" করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। একদিকে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড, আর একদিকে আমার এই আমি! এ রহস্য কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে সেই পরম আমি যে মিল্‌বেন!

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর একলা কি অনন্ত একলা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই তাঁর একাধিপত্য এক জায়গায় বিসর্জ্জন করেছেন! তিনি আমার এই "আমি" টুকুর আনন্দ নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন, বন্ধু হয়ে ধরা দিয়েছেন। বলেছেন, "আমার চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজন দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে; তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি হয়েছ, তুমি আছ!"

এই খানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে

সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বল্‌তে পারি—"আমি তোমাকে চাইনে! সে কথা তাঁর ধূলোজলকে বলতে গেলেও তারা সহ্য করে না—তারা তখনি মারতে আসে! কিন্তু তাঁকে যখন বলি "তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই।" তিনি বলেন আচ্ছা বেশ! বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন!

এদিকে কখন্ এক সময় হুঁস্ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকাকড়ি ধনদৌলৎ কোনোমতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছায়না—বাইরে আবর্জ্জনার মত পড়ে থাকে! সেখানে ফাঁক থেকেই যায়! সেখানকার সেই একলা ঘরটিকে মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যেদিন বল্‌তে পারব চন্দ্রসূর্য্যহীন এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার সেইদিন আমার "আমি" জন্মের মত সার্থক হবে!

আমাদের অন্তরাত্মার "আমি" ক্ষেত্রের একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎজুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে! আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্ব্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আস্‌তেন তাহলে জোড় হাত করে, মাথা ধূলায় লুটিয়ে তাঁকে মান্‌তুম—কিন্তু ঐ জায়গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন—সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না—সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে!

কিন্তু এমন করলে ত চল্‌বে না! শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বীকার না করে তবে জন্ম জন্ম সে কেবল দাস দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে! মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না! ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টি পৌঁছয়না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই—যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জ্বেলে তোল্! যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তাঁর আলোক আমাকে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ তাঁর ইচ্ছা তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে! তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্ত্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগ্‌বে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাক্‌বে না। কেন যে "আমি" হয়ে এতদিন এতদুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি সেদিন সেই বিরহ দুঃখের রহস্য এক মুহূর্ত্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

হে আমার প্রাণের প্রাণ, জগতের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে—ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে।

কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাকে "আমি" বলচি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। এযে ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব্ব—এ কেবলমাত্র "আমি," একলা "আমি," অনুপম অতুলনীয় "আমি"। "আমি"র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহা বিজন লোকে হে আমার অন্তর্যামী তুমি ছাড়া আর কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালেই নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু! এই আমি নামক তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব—একের সঙ্গে এক হয়ে মিল্‌ব!

এই "আমি"টিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আসচ। কত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ,, তারার মধ্যে দিয়ে এ'কে তোমার পাশে করে হাতে ধরে নিয়ে এসেচ কিন্তু কারো সঙ্গে এ'কে জড়িয়ে ফেলনি! কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালনা করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ! তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ যে আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্চে এই "আমি"র রেখা। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কিছুই তোমার সমান না হোক্, তোমার চেয়ে বড় না হোক্! আর, আমার এই যে একটা সাধারণ জীবন, যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণাচিন্তা-চেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করচি সেইটেই নানাদিক্ দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি—কিন্তু "আমি" রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে জান্‌তে চাই! এই আমি ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ—আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, "আমি" নিকেতনেই যে তোমার চরম লীলা, এইজন্যেই ত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান! সেই জন্যেই ত এইখানেই মৃত্যু এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বল্‌তে পারি আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছু চাইনে!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্পষ্ট কথা।

কথায় বলে, 'কুমাতা কখন নয়'। সন্তান সুরূপ হউক কুরূপ হউক নির্ব্বিচারে তাহাকে বুকে রাখিয়া পালন মাতার কায; আর দেশের শিল্প, দেশের সাহিত্য যেমনই হউক তাহাদের সযত্নে ও সস্নেহে পোষণ ও রক্ষণ হচ্ছে দেশের লোকের কায, এবং সেইটাই স্বভাবের নিয়ম; কিন্তু যদি দেখা যায়, কোন রমণী তাহার কালো ছেলেটিকে পথের কাঙ্গাল করিয়া প্রতিবেশিনীর সুন্দর ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন তবে সেই রমণীকে প্রকৃতিস্থা বলিয়া লোকের ধারণা সহসা চলিয়া যায় এবং মাতৃত্বের আদর্শে এই বিষম আঘাত মানব মাত্রকে ব্যথিত করিতে থাকে। তেমনি আজ যদি দেখি জগতের মধ্যে কোন এক জাতি তাহার নিজের শিল্প, নিজের সাহিত্যটাকে হেয় জ্ঞান করিতেছে অর্থাৎ ঘোরো জল বাহির করিয়া বেনো জল ঘরে প্রবেশ করাইতেছে তবে নিশ্চয়ই সে জাতির অধঃপতন সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই থাকে না; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয়তার আদর্শটাও যে বিষম আঘাত পায় তাহা বলাই বাহুল্য।

বিচিত্রতাই যখন জগতের নিয়ম তখন সেখানে স্বভাবের নিয়ম যে কখন কখন উল্টাইয়া যাইবে এবং সময়ে সময়ে মানবের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অথবা কোন এক জাতি একটা একটা বিপরীত কাণ্ড ঘটাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এ মহা ঘোর কলিযুগে আমাদের ভারতবর্ষে এইরূপ একটা বিপরীত কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে এবং সেই অভিনয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে আমাদের বঙ্গবাসীরাই জগৎ-নাট্যশালার দর্শকের দৃষ্টি ও কৌতুক করতালি সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সেটা আর কিছু নয় আমাদের কলা বৌটিকে লই না। ছেলেরা যে কালো বউ লইয়া ঘর করিবে তাহা আমাদের মনে ধরিতেছে না, আমরা মেম বৌ ঘরে আনিবার জন্য ব্যস্ত। আমাদের ঘরের কলালক্ষ্মী নিরপরাধিনী হিন্দুকন্যা কাজল পরিয়া সিন্দুর মাথায় দিয়া বিচিত্র বেনারসি সাড়ির আড়ালে থাকিয়া তাহার নুপূর কিঙ্কিনীর মৃদুগুঞ্জনে যে আমাদের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া অন্তঃপুরের শোভা ও সংসারের কল্যাণ-বর্দ্ধন করিতে থাকিবে ইহা আমাদের মনঃপুত নয়। আমরা চাহি এমন বৌ যাহাকে আমরা মেমসাহেব বলিয়া চালাইতে পারি।

হৃদ্‌পদ্মাসনা বরাভয়হস্তা দেবীমূর্ত্তি আমাদের মনে ধরিতেছে না। আমরা চাহিতেছি উষ্ট্রপক্ষীপঙ্খধারিণী, গিল্টির ফ্রেমবাসিনী কেদারাআসীনা অর্দ্ধনগ্না আর কাহাকেও যিনি আমাদের ঘর আলো করিয়া থাকিবেন। জাত্যাভিমান বলিয়া যদি কোন একটা পদার্থ থাকে তবে সেটা আমাদের মধ্যে কোন কালে ছিল, এই কাণ্ডের পর একথা সহজে আর বিশ্বাস করিতে পারি না। আফ্রিকাবাসী অসভ্য, যাহাদের নিজের কোন কলকৌশল নাই তাহারা যদি এ কাণ্ডটা করিত তবে দোষ দিতে পারিতাম না। যাহার ঘরে জলের অভাব সে যদি বাহিরের জল ঘরে

আনে তবে তাহাকে বুদ্ধিমানই বলিতে হয়; কিন্তু আমরা নিজের শিল্পকলা বিসর্জ্জন দিয়া যে হৃদয়বিদারক ব্যঙ্গ কৌতুকের অভিনয়টায় যোগ দিয়াছি তাহার লাঞ্ছনা আর কাহার স্কন্ধে চাপাইব!

আমাদের কলালক্ষ্মী আমাদের কোন্ অভাবটা অপূর্ণ রাখিয়াছিলেন? আমাদের রাজপ্রাসাদ, আমাদের দেবমন্দির, আমাদের থাকিবার গৃহ, পরিবার বসন, খাইবার বাসন, আরামের শয্যা, ঐশ্বর্য্যের আসবাব কোন্টা না তিনি পদ্মহস্তের স্পর্শে পবিত্র করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেবমন্দিরসকল পূজার উপযুক্ত, রাজপ্রাসাদ রাজার যোগ্য, ব্যবহারের জিনিষগুলা ব্যবহারের মত সুন্দর করিয়া কি তিনি গড়াইয়া যান নাই? তবে কোন্ দোষে আমরা তাঁহাকে এখনও নির্ব্বাসনে রাখিয়া দিব? চীন জাপান শিল্পরাজ্যে যে স্বর্ণপদ্মাঙ্কিত বিজয় নিশান আজ উড়াইয়া দিয়াছে সে পদ্ম কাহার আসন? বৌদ্ধ যুগে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও যে আমাদের ভিক্ষুরা দেশে বিদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি!

যে পথে তাতার সৈন্য ভারতবিজয়ে আসিয়াছিল ঠিক সেই পথেই গ্রীক ও রোমক শিল্প একদিন প্রবল বেগে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। গান্ধারের পুণ্যক্ষেত্র সে ঘোর সঙ্কটের সাক্ষীভূমি সেই দুঃসময়ে আমাদের এই নির্ব্বাসিতা কলালক্ষ্মী অভয়-দাত্রীরূপে প্রকাশিতা হইয়া কি আমাদের ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করেন নাই! সে দিনের রণসাগর মন্থনে যে হলাহল উঠিয়াছিল তাহা তিনিই পান করিয়া আজও যে নীলকণ্ঠী রূপে বিরাজ করিতেছেন?

এ দেশের সাধারণের, এমন কি যাঁহাদের আমরা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানি তাঁহাদের, বিশ্বাস যে আমাদের শিল্পে Perspective বলিয়া একটা গুণ ছিল না—এবং আমাদের শিল্প আমাদের ঠিক মানুষটি—ঠিক রামবাবু শ্যামবাবুটি গড়িয়া দিতে পারে নাই; Havell-সাহেব তাঁহার নবপ্রকাশিত Indian Sculpture and Painting নামক পুস্তকে এবং Laurence Binyon তাঁহার Painting in the Far East নামক পুস্তকে এই ভুল বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। Les Characteristiques de la Peinture Japonaise প্রণেতা Binyon সাহেব R. Petrucci সম্বন্ধে যে কয় ছত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই এ ভ্রম আমাদের অপনোদন হওয়া সম্ভব।

"He has conclusively shown that the mastery of perspective in Eastern painting is quite comparable to that of European painting: only it is different in the conventions it allows. Even in masterpieces of artists like Leonards and Ingres the laws of perspective are boldly violated in obedience to aesthetic necessities.

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ন্যায় কলালক্ষ্মীর এই নির্ব্বাসন কাণ্ডটা প্রাচ্যজাতি আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বেশ খাপ খাইবার যোগ্য নয়। আমরা দেবী সরস্বতীকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি আর তাঁহার ভগিনীটিকে ঘরের দাওয়া মাড়াইতে দিতে নারাজ কেন? কলালক্ষ্মীর হইয়া মোকদ্দমা চালাই এমন কড়ি আমার হাতে নাই কিন্তু ভিক্ষা করিয়া দেবীর পূজা দিবার আশা রাখি, কেন না আমাদের গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষুক কখন রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় না।

আজ কয়েক বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রাচ্য শিল্পের চর্চ্চা করিয়া আমি একটি সত্য লাভ করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি যিনি আমাদের গৃহে ছিলেন তিনি ছিলেন গেহিনী ও সখী তাঁহার স্থানে আমরা যাঁহাকে বসাইতে চাহি তিনি গেহিনীও নয় সখীও নয় রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী—বড় লোকের ক্রীত দাসী।

বহুবার বহুবন্ধু আমাকে ভারত শিল্পটা কি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে আমার এই মাত্র নিবেদন যে পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিবার প্রত্যাশা বৃথা। সূর্য্য যে কি পদার্থ তাহা দেখিতে পূর্ব্বমুখ হউন। যে সূর্য্য সমস্ত প্রাচ্যজগৎ সৌন্দর্য্য কিরণে ডুবাইয়া পশ্চিম সাগরে একদিন অস্ত গিয়াছেন আবার নিশ্চয়ই কোন সুপ্রভাতে তাঁহার দর্শন পাইবেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যৌবন-উৎস।

(জাপানী গল্প)

(ফরাসী হইতে)

আমাদের জাপানী বন্ধু ওগওয়া, 'গেইশা'-নর্ত্তকীদিগের নাচের মজ্‌লিসে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। কিয়োটো-নগরের মমিজি-ইয়া নামক হোটেলের বৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে আমরা সমবেত হইলাম—দর্শকবৃন্দের মধ্যে নানাজাতীয় লোক ছিল। অর্দ্ধ-বিলাতী-ভাবাপন্ন দুই তিন জন জাপানীর সহিত একজন জর্মান পণ্ডিত ছিলেন—তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য আসিয়াছিলেন; একজন ইংরেজ ছিলেন,—তিনি "হৌস্ অভ্ লর্ডসের" একজন সদস্য; তারপর, আমি ও আর একজন ফরাসী মহিলা। আস্‌বাব্-হীন একটা ঘরে আমরা তুর্কী-ধরণে গদীর উপর আসীন; দেয়াল কাগজে মণ্ডিত, ঘরের মেজের উপর ঝক্‌ঝকে মাদুর পাতা; আমরা দুগ্ধ-চিনি-বর্জ্জিত হল্‌দে রঙ্গের চা পান করিতেছি এবং তাহার সঙ্গে ব্যাসনের পিঠা আহার করিতেছি। নর্ত্তকীদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, ওগওয়াকে একটা পুরাতন জাপানী গল্প বলিতে আমরা অনুরোধ করিলাম। যে গল্পটি বিভিন্ন আকারে সর্ব্বজাতীয় সাহিত্যের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই

অনুরূপ একটি গল্প তিনি আমাদিগকে শুনাইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সেই গল্পটির নাম—যৌবন-উৎস।

*

এক ছিল কাঠুরিয়া—খুব বুড়ো,—তার স্ত্রী, সেও খুব বুড়ী। বুড়ার নাম যোশিদা, বুড়ীর নাম ফুমি। উহারা মিয়া-জিমা নামক পুণ্য দ্বীপে বাস করিত। গ্রামের সকল লোকই উহাদিগকে ভক্তি করিত ও ভাল বাসিত। জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখসকল মাথা পাতিয়া অকাতরে গ্রহণ করিতে দেখিয়া উহাদিগকে সকলে প্রশংসা করিত, বিবাহের পর হইতে ৬০ বৎসর কাল উহাদের পরস্পরের মধ্যে অচলা প্রীতি দেখিয়াও সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিত।

উভয়ের মধ্যে পরিচয় না হইতে হইতে তাহার বহুপূর্ব্বেই উহাদের পিতামাতারা উহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যোশিদা তখন ফুমির সহিত কখনও বাক্যালাপ করে নাই বটে, কিন্তু নদীর তীরে যোশিদা যখনই ফুমিকে দেখিতে পাইত, তখনই যোশিদা সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। সুশিক্ষিতা সুবিনীতা যুবতীগণের ন্যায় ফুমি একটু সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া চলিত। উৎসবের দিনে যোশিদা জনতার মধ্য হইতে ফুমির মুখখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে ভাল বাসিত;—তাহার সেই আম-দীর্ঘ মুখ, তাহার সেই পীচ্-ফুলের মত টুক্‌টুকে দুটি গাল—তাহার সেই ধূসর রঙ্গের লম্বা জামা যাহা একটা চওড়া কোমরবন্ধের দ্বারা কটিদেশে আবদ্ধ, এবং যাহার কালো রেশ্‌মি জমির উপর সাদা জুঁই ফুলের বুটিদার কাজ করা। এই বিবাহে ফুমির বিশেষ আগ্রহ না থাকিলেও, সে জানিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আসন্ন-বিবাহ বালিকারা যে শিরো-বেষ্টন ব্যবহার করে, ফুমি এক্ষণে কয়েক মাস হইতে তাহা মাথায় পরিতেছে। তাহার ভাবী পতি হয়-ত তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিবেন, হয়-ত তাঁহার প্রেমে চপলতা প্রকাশ পাইবে, মৃদু-প্রকৃতি বালিকা এইরূপ আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতেই করিতে লাগিল। "পুরুষের হৃদয় শারদ গগনের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল।" কিন্তু ফুমি তাহার মধুর ধৈর্য্যের দ্বারা, তাহার নীরব প্রেমের দ্বারা, পতির ভালবাসা পাইবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইল। কথায় বলে, "যদি তিন মাস কাল একটা পাথরের উপর বসা যায়, তা হলে সেই পাথর গরম হয়ে ওঠে।" * * *

যোশিদা বুঝিল, পিতামাতা মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তাহা সুখেরই হইবে। তাই যোশিদা, ফুল্লযৌবনের জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত ফুমিকে ভাল বাসিল; ফুমিও কৃতজ্ঞ হইয়া প্রাণ ঢালিয়া যোশিদার প্রেমের প্রতিদান করিল। বহু বৎসরাবধি উহারা এইরূপ পরস্পরের প্রণয়পাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল।

তদনন্তর উহারা, অতিশয় সুখ ও অতিশয় দুঃখ ভোগ করিল। পর পর তিনটি পুত্র সন্তান হওয়ায় উহারা পরমসুখী হইল, পরে সেই তিনটি পুত্র পূর্ণবয়স্ক হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় উহারা আবার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইল। তখন উহারা ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করিল। একদিন সমুদ্রে ঝড় উঠিল,

কিন্তু সমুদ্র উহাদিগকে রক্ষা করিলেন। পুত্রশোকে ভগ্নহৃদয় দম্পতী, পরস্পরের সম্মুখে, মুখের সস্মিত প্রশান্তভাব রক্ষা করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিত। কিন্তু যখনই লোকজন চলিয়া যাইত,—উহারা দুজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিত। কিমোনোর (জোব্বা) হাত দিয়া সেই অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিত।

যে ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই ঘরের একটি গুপ্ত কক্ষের পালিস্-করা কাষ্ঠময় একটা ধাপের উপর,—তিনটি পুত্রের স্মরণার্থ—উহারা একটা বেদী খাড়া করিল; অনেকদিন ধরিয়া, প্রতি দিবস, একটা ছোট গালার টেবিলের উপর, তাহাদের জন্য বিবিধ খাদ্যসামগ্রী স্থাপন করিত, ধূপ-বাতি জ্বালাইয়া রাখিত এবং সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই প্রেতাত্মাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিত।

এখন সংসারে উহাঁদের আর কেহ নাই; উহারা পরস্পরকে ভাল বাসিয়াই যাহা কিছু সান্ত্বনালাভ করিত। শোকের তীব্র অনুভূতি কমাইবার উদ্দেশে উভয়ই উভয়কে জ্বলন্ত প্রেমের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। ক্রমে উহাদের হৃদয় আবার শান্তি-লাভ করিল; অপরিহার্য্য দুঃখের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিল। "যখন চেরি-ফুল একবার ঝরিয়া পড়ে,—যতই দুঃখ আক্ষেপ কর না কেন, আর তাহাদের ফুটাইতে পারিবে না।" (জাপানী প্রবচন)

এখন উহারা খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; —বর্ষীয়ান্ কচ্ছপের ন্যায় বৃদ্ধ; যোশিদার দেহ শুষ্কশীর্ণ, লোল মাংস বলি-রেখায় সমাচ্ছন্ন, সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু কম্পমান্; ফুমির সমস্ত কেশ ও ভ্রূ-লোম কামানো; এখন দেখা যায়, উহারা এক সঙ্গে খুব ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছে; স্বামীর একটু পিছনে স্ত্রী চলিয়াছে। কখন-কখন উহারা সেই সুন্দর মন্দিরটি পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যায়—যাহার জন্য, জাপানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—মিয়া-জিমার পুণ্য দ্বীপ এত প্রসিদ্ধ। আবার অনেক সময় উহারা বাড়ীতেই বসিয়া থাকে। বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও ফুমি গৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত রাখিবার জন্য তৎপর। সে, কাগজের দেয়ালের শুভ্রতা ও নূতন মাদুরের চেক্‌নাই ভাল বাসে। সামঞ্জস্য সম্বন্ধে তাহার এরূপ সুকুমার অনুভূতি যে, দিনের ও ঋতুর রং-অনুসারে, মনের বিষণ্ণ ও প্রফুল্ল অবস্থা অনুসারে,—রেশমের উপর চিত্রিত ছবি, গুপ্ত-কক্ষের দেয়াল-মণ্ডিত কাগজ ("কাকেমোনো") সময়ে-সময়ে বদ্‌লাইয়া ফেলে। পিতলের পুষ্প-ঘটে তিনটি পুষ্পিত শাখা রাখিয়া দেয়; অনেক সময়, সেই ঘটের পাশে, তাহার ইষ্ট দেবতার লাক্ষাময় মূর্ত্তি স্থাপন করে;—সেই কিম্ভুত-কিমাকার দেবতা, যাহার লম্বা দাড়ী, যাহার মাথায় একপ্রকার অদ্ভুত ধুচুনি-টুপি, এবং হাতে একটা যষ্টি ও মন্ত্রের পুঁথি; সেই দেবতার নাম "ফুকুরোকুজু",—সুখ সৌভাগ্যের সাত দেবতার মধ্যে একজন; —ইনি সুখী বৃদ্ধদের দেবতা।

অবশ্য যোশিদা ও ফুমি সুখী বৃদ্ধদের মধ্যে ধর্ত্তব্য; কেননা, জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখ শোকের মধ্যে উহারা হৃদয়ের শান্তি ও প্রেম রক্ষা করিয়াছে। তথাপি, অতি-বার্দ্ধক্যবশত, একটা বিষাদের ভাব, অতীত যৌবনের জন্য

একটা অস্পষ্ট আক্ষেপের ভাব উহাদের মনে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এইরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল ;—আমাদের মধ্যে একজন মরিলে অন্যটির কি দারুণ বিষাদ—কি দারুণ বিচ্ছেদ-দশা উপস্থিত হইবে! আমাদের যদি যৌবন থাকিত, আমরা যদি দুজনে দীর্ঘজীবি হইয়া এক সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি সুখেরই হইত! আহা সে কি সুখের স্বপ্ন! আমাদের জীবন তাহা হইলে কি মধুময় হইত। যদি এই অসম্ভব কোন রকমে সম্ভব হয়!...

*

সৌর-করোজ্জ্বল কোন এক শারদ দিবসে যোশিদা একপ্রকার রহস্যময় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিল। সে পূর্ব্বে সেখানে কাঠুরিয়ার কাজ করিত; যে সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছে,—মরিবার পূর্ব্বে সেই সকল বৃক্ষ-দিগকে আবার দেখিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল।

কিন্তু পূর্ব্বেকার ভূভাগগুলি সে আর চিনিতে পারিল না। অরণ্যের প্রান্তদেশে সেই প্রকাণ্ড mable গাছ, শরৎকালে যাহার পাতাগুলা লাল হইয়া যায় এবং দেবদারুর ঘোর সবুজের মধ্যে যাহা ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে সেই বৃক্ষটি এখনও সে দেখিতে পাইল না। সে এখনও সেই স্বচ্ছজলের উৎসটি দেখিতে পাইল না, যাহার একপ্রকার অদ্ভুত নীল রং!...

ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া যোশিদা তৃষ্ণার্ত্ত হইল। এইবার একটা উৎস দেখিতে পাইয়া করপুটে একটু জল লইয়া ধীরে ধীরে পান করিল।

অদ্ভুত কাণ্ড! উৎস-দর্পণে আপনাকে দর্শন করিবামাত্র দেখিল, সহসা তাহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাহার চুল আবার কালো হইয়াছে; তাহার মুখে আর বলি-রেখা নাই, তাহার মাংসপেশীতে নব বল সঞ্চারিত হইয়াছে; সে ২০বৎসরের যুবা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অজ্ঞাতসারে সে "যৌবন-উৎস" হইতে জল পান করিয়াছে!

বলিষ্ঠ হইয়া, জীবনের সুখে সুখী হইয়া, সস্মিত মুখে ও দ্রুতপদে সে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। বৃদ্ধা ফুমি একজন যুবাপুরুষকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। পরে, হতবুদ্ধি হইয়া স্তম্ভিতভাবে এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল! একটা যাতনাময় ভীতি তাহার মনকে অধিকার করিল; বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল...

শীঘ্রই যোশিদা তাহাকে আশ্বস্ত করিল। তখন ফুমি আনন্দে একবার হাসিতে লাগিল—একবার কাঁদিতে লাগিল। আগামী কল্য সেও সেই অদ্ভুত উৎস-স্থানে গমন করিবে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেও ২০ বৎসরের নবীন যৌবন-লাবণ্য লাভ করিবে! দুজনে তা' হ'লে কেমন সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে!—আহা! যৌবনের জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত, তীব্র অনুভূতি ও অতীতের স্মৃতি মিশ্রিত হইয়া, জীবন কি সুখেরই হইবে!...

*

তাহার পরদিন প্রাতে, যখন স্বচ্ছ আকাশে উষার অরুণ আভা ব্যাপ্ত হইল, ফুমি তাড়া-

তাড়ি সেই ঘোর-নীল উৎসের অভিমুখে যাত্রা করিল...

যোশিদা গৃহ রক্ষা করিতে লাগিল। প্রথমে সে নিশ্চিন্তভাবে ফুমির' জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তাহার স্ত্রীর উৎস হইতে ফিরিয়া আসিতে কেন এত বিলম্ব হইতেছে, ভাবিয়া সে বিস্মিত ও চিন্তিত হইল। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে অধীর হইতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে, তবু তাহার দেখা নাই—এযে দারুণ বিলম্ব, না জানি কি ঘটিয়াছে! যোশিদার আশঙ্কা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহার সেই অনির্দ্দেশ্য ভয়কে সে আর কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। তখন সে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অরণ্যের দিকে ছুটিল।

শীঘ্রই সেই অদ্ভুত উৎসের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। বৃক্ষ শাখার মর্ম্মর শব্দের সহিত মিশ্রিত জলের কুলুকুলুধ্বনি সে শুনিতে পাইল। ফুমির প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ এরূপ অতিমাত্র উত্তেজিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে; সে কেবল দূরস্থ আকাশই দেখিতে পাইতেছে, যাহার অন্বেষণে আসিয়াছে তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। অপরিসীম নৈরাশ্য আসিয়া তাহার হৃদয়কে অভিভূত করিল।

সহসা একটা অদ্ভুত শব্দ তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল; একটা অস্পষ্ট আর্ত্তরব—বোধ হয় কোন আহত জীবের কাতরধ্বনি...

যোশিদা উৎসের ধারে আসিল এবং হতবুদ্ধি হইয়া সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইল; পরে, উচ্চ তৃণরাশির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শিশুকে দেখিতে পাইল; মাস কয়েকের একটি ছোট মেয়ে—এখনও তাহার কথা ফোটে নাই। মেয়েটি হতাশভাবে তাহার দিকে বাহু বাড়াইয়া দিল...

যোশিদা তাহাকে ক্রোড়ে লইল। এক দৃষ্টিতে শিশুটির চোখদুটি দেখিতে লাগিল। সে চোখের কি অপূর্ব্ব দৃষ্টি! যেন সেই চোখে বহুকালের অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে, যেন সেই চক্ষু দুটি সমস্ত জীবনের স্মৃতি-সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; যেন কাহার সহিত কি একটা সাদৃশ্য আছে;—এরূপ একটা সাদৃশ্য যে তাহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। ঐ চোখের মত আর যেন কাহার চোখ সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে; ঠিক্ ঐরূপ দুটি চোখ যেন পূর্ব্বে তাহার দুঃখে কাঁদিয়াছে, তাহার সুখে হাসিয়াছে। যোশিদার অন্তঃকরণ একপ্রকার অমানুষিক আবেগে অভিভূত হইয়া পড়িল।

সহসা সে সমস্ত বুঝিতে পারিল,—এই ক্ষুদ্র শিশুটিই তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী; এ তাহার সেই ফুমী—শুধু তরুণভাবাপন্ন হইয়াছে—একটু বেশীমাত্রায় তারুণ্য লাভ করিয়াছে। বোধ হয় তার সেই চিরযৌবনের তৃষা পাছে স্বল্পজল পানে নিবৃত্তি না হয় এই আশঙ্কায় সে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঐ উৎসের জল পান করিয়াছে, এবং সেই জন্যই সে দুগ্ধপোষ্য শিশুর আকারে পরিণত হইয়াছে!...

জাপানীরা শিশুসন্তানদিগকে যেরূপভাবে বহন করে—যোশিদা সেইরূপ শিশুটিকে আপনার পিঠে বাঁধিয়া লইয়া বিষণ্ণচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সে ভাবিতে লাগিল, যে পূর্ব্বে তাহার জীবন-সঙ্গিনী ছিল, এখন

হইতে তাহাকে পিতৃভাবে লালনপালন করিতে হইবে। হা অদৃষ্ট!...

* * *

এই গল্পটি শেষ করিয়া ওগওয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে এক পেয়ালা চা পান করিলেন। এই আখ্যায়িকাটি যেরূপ নূতন ধরণে শেষ হইল, তাহাতে বিস্মিত হইয়া আমরাও হাসিলাম, কিন্তু জর্ম্মান পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার গল্পের তাৎপর্য্যটা কি?" ওগওয়া বলিলেন :—

—"তাৎপর্য্য জেনে কি ফল? গল্পটা শুনে যদি আমোদ হয়ে থাকে তাই যথেষ্ট; গল্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেই সন্তুষ্ট হও। পীচ-ফুলের সুগন্ধ উপভোগ করবার জন্য, পীচ গাছের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা কি আবশুক হয়?"

তথাপি, জর্ম্মান পণ্ডিত এইরূপ না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না :—"আমার বোধ হয়, এই গল্পের ভিতরে একটা গভীর রূপক-তত্ত্ব আছে। তত্ত্বটি এই :—ইহা (ideal) মানসীর উৎস; ইহা হইতে অল্প জলপান করিতে হয়—বেশী পান করিতে নাই। অল্পস্বল্প মানসী-কল্পনা নবযৌবন আনয়ন করে, বল বিধান করে; বেশী হইলে মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, কার্য্যে অশক্ত করে। যাহা মানসিক—তাহা বুঝিবার জিনিস; যাহা বাস্তবিক তাহা ভালবাসিবার জিনিস। ধর্ম্মনীতি প্রকৃতির বিরোধী নহে,—ধর্ম্মনীতি শুধু প্রকৃতিকে বিভূষিত করে, পৃথক্-পৃথক্ সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে, অসীম বিশ্বপ্রেমকে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়..."

এইসময়ে পণ্ডিতকে থামাইয়া দেওয়া হইল : জাপানী গল্পটি শুনিয়া আমাদের মনে কেমন একটা বেশ হাল্‌কা ভাব আসিয়াছিল—বিদ্যা-আস্ফালক জর্ম্মান পণ্ডিত আমাদের এই ভাবটাকে নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

জর্ম্মান পণ্ডিত যদি বা থামিলেন, রাজনৈতিক ইংরেজ ঐ কথার সূত্র ধরিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—"বরং আমার মনে হয়, ওগওয়ার এই গল্পটাকে রাজনৈতিক জীবনে খাটানো যেতে পারে। ফুমি তোমাদের ফ্রান্স ও জর্ম্মানির সেই সব কাল্পনিক সত্যযুগপ্রবর্ত্তকদের কথা (utopeist)—মনে করিয়ে দেয় যাহারা তাহাদের স্বপ্নকল্পনার আদর্শে, সমাজকে সহসা পুনর্গঠিত করিতে চাহে : তাহাদের সেই অতি-কাল্পনিকতার ফল—শিশুজনোচিত অসামর্থ্য ও অকর্ম্মণ্যতা; পৃথিবীতে তাহারা কোন কাজ করিতে পারে না—পৃথিবীকে তাহারা বোঝে না। পক্ষান্তরে যোশিদা—আমাদের ইংরেজ সমাজসংস্কারকের আদর্শ; বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য স্থির করেন; যাহাতে বাস্তবের উপর তাঁহাদের কার্য্যের বনিয়াদ স্থাপন করিতে পারেন—এই উদ্দেশে তাঁহারা বাস্তবকে ভাল করিয়া জানিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা কল্পনার উৎস হইতে দুই চারি ফোঁটা জল পান করেন মাত্র—ঠিক্ ততটুকু পান করেন যতটুকু পান করিলে তাঁহারা যৌবনের উৎসাহ অনুভব করিতে পারেন, আনন্দের সহিত কাজ করিতে পারেন..."

আমাদের বন্ধু ফরাসী-রমণী ঐ গল্পের শেষটা খুব ঔৎসুক্য ও মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিলেন। যেন তাঁহার মনের অন্তরতম

কথা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—এইভাবে তিনি অর্দ্ধস্ফুটস্বরে ও গম্ভীরভাবে এইরূপ বলিলেন : গল্পটি কি সুন্দর! প্রেমের সম্বন্ধে গল্পটি বেশ খাটে!"

আমাদের এই রমণী-বন্ধুর আন্তরিকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম; সকলে নিস্তব্ধ হইল। এই রমণীর দুঃখময় ইতিহাস—বীরত্বের ইতিহাস আমরা সকলেই জানিতাম। ইনি ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভালবাসিয়া অনেক কষ্টও সহিয়াছিলেন; পরে প্রেমের সুখ দুঃখকে ছাড়াইয়া তাহার বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন;—পূর্ব্বেকার প্রেমের ভাবুকতাকে তিনি উদ্যম-পূর্ণ হিতৈষণায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। লোকহিতের চিন্তায়, পরসেবায়—তাঁহার পূর্ব্বেকার প্রণয়-সুখ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল; পূর্ব্বেকার প্রণয়যাতনা,—দুঃখিজনের দুঃখ অনুভব করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিল; মানুষের অশেষ দুঃখক্লেশ উপশম করিবার নিমিত্তেই এখন তিনি জীবনধারণ করিতেছেন।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন :—"যাহারা যৌবনপ্রদ প্রেম-উৎস-বারি কখন পান করে নাই, যাহারা প্রেমের জলন্ত সোহাগ, ও প্রেমার্দ্র হৃদয়ের সুকোমল ভাবসমূহের সহিত কখন পরিচিত হয় নাই, তাহারা চিরকালই বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, শুষ্কপ্রাণ স্বার্থপর লোক। তাহাদের কঠোর নীতি প্রণয়-সুখের প্রতি দোষারোপ করে, কেননা সে সুখ তাহারা কখন পায় নাই এবং সে সুখের তাহারা যোগ্যও নহে। যাহারা নিজে কখন সুখী হয় নাই, তাহারা সুখের গূঢ় রহস্য অন্যকে কি-করিয়া বলিবে? কিন্তু যাহারা ফুমি-বেচারীর ন্যায় তৃপ্তিহীন প্রেম-তৃষাকে দমন করিতে পারে নাই, তাহারা চিরজীবন শিশুর মতই থাকিয়া যায়—তাহারা শিশুরই মতন লঘুহৃদয়, চপল-চিত্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। তাহারাই নিরন্তর কষ্ট পায়; হৃদয়ের অপরিহার্য্য চঞ্চলতায়, মানুষের মৃত্যুতে, এই মর্ত্ত্য জগতের সমস্ত জীব ও পদার্থের সাংঘাতিক পরিবর্ত্তনে তাহারাই ভীত হয়। প্রণয়ই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায়, প্রণয় অন্তর্হিত হইলেই তাহারা নির্ব্বীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য, হইয়া পড়ে; তাহারা উৎসপার্শ্বস্থ সেই ক্ষুদ্র বালিকাটির ন্যায়, ভূতলশায়ী হইয়া আকুলভাবে কেবল বাহু বাড়াইয়া দেয়।...প্রণয়ের উৎস হইতে অল্পই পান করা উচিত—বেশী পান করা ঠিক্ নহে..."

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সমর্পণ"।

তুমি ত রাখনি বাধা, সঁপেছ নিজেরে
সম্পূর্ণরূপেতে মোর ক্ষুদ্র বক্ষ 'পরে :—
নানা কর্ম্মে, আলোচনে, নানা সুখে দুঃখে,
নানা বাধা বিঘ্নমাঝে, বিপদের মুখে,
শত রূপে শোভা দৃশ্যে, সঙ্গীতে, উচ্ছ্বাসে
সম্মানের গৌরবের মহান্ আদর্শে,
কঠোর কর্ত্তব্যমাঝে, স্বার্থহীন প্রেমে,
তুমি মোর চিত্তে নিতি আসিয়াছ নেমে—
বাধাহীন অসংশয় স্থির বিশ্বাসেতে,
কেমন স্বচ্ছন্দ-গতি সহজ ভাবেতে!
আমিই বসিয়া আছি—নিশ্চল, পাষাণ—
গলে নাই—গলিল না—এতটুকু প্রাণ!
—তুমি হারায়েছ তোমা,' ধন্য আজি তায়;
আমি সে 'আমিত্বে' লুটি অতৃপ্তি ব্যথায়!

শ্রীসুধীর চন্দ্র মজুমদার।

কবি-সমাধি।

(কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে।)

আঁধারি' ভূমি চলিলে তুমি,
উজল দেব-জগতে,
উজলতর করিতে খর আলোকে ;
রহিল শুধু আঁধার ধূধূ
পড়িয়া জড় মরতে
অহর্নিশ অভাবে দিশ ঝলকে।

"পলাসী" সম কঠোরতম
নীরস ভূমি করষি,
দেখালে তাহে ফলে গো ফলে অমৃত।
"রঙ্গমতী"—স্রোতস্বতী
তীরেতে তুলি পরশি,
দেখালে সেথা কতনা সুধা নিহিত!

রাজার ছেলে হর্ম্ম্য ফেলে,
ভুলিয়া স্নেহ মমতা,
ধর্ম্মে মন পশিল ঘন কাননে ;
ফিরিল যবে, আসিল ভবে
মুক্তি মহাপ্রাণতা ;
মোক্ষদ্বার দেখালে তার আননে।

"ভারত" খনি খনিয়া মণি
আনিলে তুলি' যতনে
"ভদ্রা" "কারু" "শৈল" "সুলী" রমণী ;
মায়ের দেহ, ভাষার গেহ
ভরিয়া দিলে রতনে,
তড়িৎ ভরা করিলে মরা ধমনী।

আলোক লাগি', উঠেছে জাগি',
আবেগ ভরে নিশাসি',
আজিকে সুখে লক্ষ বুকে যাহা রে ;
অবিভাজ্য "ধর্ম্মরাজ্য"—
তোমারি বীণা উছাসি'
ধ্বনেছে আগে বজ্ররাগে তাহারে।

কত কি ক'ব, প্রতিভা তব
দীপ্ত নব সবিতা,
বঙ্গভূমি ঢেকেছ তুমি আলোকে ;
মৃতেরে প্রাণ করেছ দান
বিতরি' সুধা কবিতা।
মুছাবে আজি অশ্রুরাজি বল কে ?

মহাব্রত সাধনে রত
ঋষির মত আছিলে,
প্রখেপে নাহি দেখিলে চাহি যাতনা ;
জীবন দিয়া, ভূষণ দিয়া,
ভাষার দৈন্য মুছিলে ;
ধন্য তব এ অভিনব সাধনা।

হে দেব কবি, মুক্ত রবি,
সমাধি এত নহে গো,
মরণ নহে, জীবন এ যে জাগিছে।
স্বর্গ হতে সুধার স্রোতে
পুলক ভরে' নেয়ে গো,
দেবের বালা বরণমালা মাগিছে।

ভ্রান্তিবশে প্রতিভা খসে'
পড়িয়াছিলে ধরাতে!
জানি সে স্নায়ু মাটীর বায়ু সবেনা।
ওগো ও কবি, তোমার ছবি
তুচ্ছ দেহের মরাতে,
জেন গো জেন লুপ্ত, ম্লান' হবেনা।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন।

আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে সম্প্রতি বাঙলার কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন এমনি করিয়া আমাদিগের সাহিত্যসমাজের পুরাতন যে সকল বন্ধুগণ একে একে বিদায়-গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদিগের স্থান আর সহজে পূর্ণ হইবার নহে। কবি নবীনচন্দ্রের দেহান্তরের সহিত বাঙলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম যুগের কথা মনে পড়ে। যখন বঙ্কিমচন্দ্র, সূর্য্যমণ্ডলের মত, চতুর্দ্দিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কগণকে লইয়া উদিত হইয়াছিলেন ;—যখন বঙ্গদর্শন বাঙালীর গৃহে গৃহে নূতন বাণী, নূতন আলোক আনিয়া দিয়াছিল! নবীনচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনতন্ত্রী কবিতার শেষ বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গেল!

সকল দেশেই দেখা যায় 'এপিক' বা মহাকাব্য যুগের পর 'লিরিক' বা গীতি কবিতা প্রসার লাভ করে। কিন্তু শুধু 'লিরিক' লইয়াই জাতীয় সাহিত্য নহে। যে সাহিত্যের মেরুদণ্ড 'মহাকাব্যে' গঠিত নয় তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশের পর হইতে নবীনচন্দ্রের উদয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহার পর তাঁহার অমরকীর্ত্তি 'কৃষ্ণবিষয়ক মহাকাব্য'। এ সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ থাকিলেও এ কথা স্বীকার্য্য যে কল্পনার গাম্ভীর্য্যে এই কাব্যত্রয় বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী! বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের পূর্ব্বাভাষমাত্র পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইলে নবীনবাবু নূতন মহাভারত রচনা করিবেন।

নবীনচন্দ্রের কবিতায় সর্ব্বত্র যে একটা ঋজুতা ও অনাড়ম্বর ভাব আছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাবচ্ছবির প্রতিচ্ছায়ামাত্র। তাঁহার বিশ্বপ্রেম যথার্থই অতি উদার অতি গভীর। 'অমিতাভে'র উপসংহারে জগতের উপদেষ্টাগণকে দেবাংশ মনে করিয়া তিনি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 'এক ধর্ম্ম এক ভগবান'—এই মহাবাণী তিনি শঙ্খনিনাদে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই স্বার্থসংঘর্ষের দিনে চিত্ত যখন একান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন নবীনচন্দ্রের কাব্য পাঠে হতাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার করে!

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক স্বার্থ।

গত কংগ্রেসের সময়ে অমৃত সহরে ভারতের মুসলমানেরা কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র 'মোসলেম লিগ' নামে এক পৃথক সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। সভাপতি মিষ্টার সৈয়দ্ আলি ইনাম তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, হিন্দুদিগের সহিত তাঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা সম্ভব নহে, কারণ সেরূপ মিলন তাঁহাদের পক্ষে অশুভকর। এবং তাঁহারা স্বরাজ পাইবার জন্যও উৎকণ্ঠিত নহেন। বোধহয় তাঁহার বিশ্বাস স্বরাজ অর্থে ইংরাজের পরিবর্ত্তে হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ভারতে

এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রাজনৈতিক স্বার্থ বিভিন্ন তাহা কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। এমন কি সভাপতির সহোদর ভ্রাতাও এসম্বন্ধে ভ্রাতার সহিত একমত নহেন। ইনি কংগ্রেসের একজন মুখপাত্র। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে কংগ্রেসে তাঁহাদের যোগ দিবার যে বাধা কোথায় তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। কংগ্রেস যাহা চায় তাহা সম্প্রদায় বিশেষের লাভের জন্য, না দেশবাসী মাত্রেরই লাভের জন্য? দেশের যাহাতে মঙ্গল তাহাতে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই যে সমান লাভ ও মঙ্গল, এই সহজ কথাটা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ যে কেন বোঝেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। রাজপক্ষ হইতে কোন বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার লাভ করিয়া যদি কোন সম্প্রদায় বিশেষ অপর সম্প্রদায়ের সহিত উপযুক্ত প্রতিযোগিতায়—তাহার সম্যক ফললাভে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে দোষ কাহার? অপর সম্প্রদায়ের, না তাঁহাদের নিজের সম্প্রদায়ের? কংগ্রেস কখনও ভেদনীতি প্রচার করে নাই। কংগ্রেস যাহা চাহিতেছে ও করিতেছে, তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেরই সমান অধিকার ও মঙ্গল। এ স্থলে যদি কোন সম্প্রদায় বিশেষ কংগ্রেসের নিন্দা করেন তাহা হইলে তাহাদ্বারা নিজেদেরই অন্তঃসারশূন্যতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। মুসলমানেরা—স্বরাজ চান না, তাহার কারণ তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতার গণ্ডীকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়া, মানবের সকল স্বাভাবিক অধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেই—কি সমাজের শ্রী ও শক্তি পুষ্ট হইয়া উঠিবে? মুসলমানদিগের যদি বিশ্বাস থাকে যে তাঁহারা হিন্দুদিগের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন, তাহাহইলে তাহার প্রতিকার হিন্দুদিগের সহিত বিচ্ছেদ ও হিন্দুবিদ্বেষ নহে, তাহার প্রতিকার কায়-মনোবাক্যে—আপনার সমাজকে শিক্ষা ও শক্তি প্রদান করা। প্রবল বিদেশীর নিকট হইতে শক্তি-লাভ আকাঙ্ক্ষায়, সবল স্বদেশীর সহায়তাত্যাগ করা বুদ্ধিহীনতা মাত্র। পৃথক ভাবে বিচ্ছিন্ন চেষ্টা আমাদের কাহারও পক্ষেই কল্যাণকর নহে। ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, কিন্তু তাহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের স্থানে অধিষ্ঠিত করে না, এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয় উন্নতির পথে বাধা প্রদান করে না। জাতীয় কর্ম্মে জাতীয় শক্তি ও সম্মান লাভে তাহাদের ক্ষুদ্রবৃহৎ, উচ্চনীচ সকল সম্প্রদায়ই সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কেবল আমাদেরই এই দুর্ভাগ্য দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থ, সমাজগত স্বার্থেরও উর্দ্ধে স্থান পায়;—সম্প্রদায় গত বিদ্বেষ, জাতীয় শক্তি ও স্বার্থের পথে কণ্টক রোপিত করে। এক দেশের সহোদরগণের মধ্যে যত দিন এইরূপ অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত থাকিবে, ততদিন রাজ-পথের যথেচ্ছশাসনের পথ প্রশস্ত, এবং দেশবাসীর মনুষ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা মরীচিকা মাত্র।

মর্লির শাসনসংস্কারের প্রস্তাবে দেশ ও জাতি-নির্ব্বিচারে ভারতব্যাপী কৃতজ্ঞতা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান- সমাজে যে একটা সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ও অভিযোগের সুর জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারও কারণ তাঁহাদের উক্তরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি। সাধারণভাবে এই সংস্কার প্রস্তাবে যে আমাদের অভাব বা অভিযোগের কিছুই নাই, তাহা নহে। কিন্তু মুসলমান অভিযোগের অন্তরালে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থই লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থা-পক সমিতিতে ভারতবাসী-সভ্যনির্ব্বাচনের একটা সাধারণ ও সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথমে প্রস্তাব করেন যে, দেশের বিভিন্ন স্বার্থ সম্পন্ন বিভিন্নসম্প্রদায়ের যোগ্যতা ও আবশ্য-কতা অনুযায়ী ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের বিশ্বাস এই উপায়ে সমিতিগুলিকে যথার্থরূপে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হইবে এবং দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল সম্প্রদায়কেই সমক্ষেত্র ও তুল্য অধিকার দান করায় দেশময় শান্তি ও সন্তোষ

প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু এরূপ ব্যবহারে ফলে যে দেশময় অশান্তি ও অকল্যাণই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, তাহা মর্লির ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সেইজন্য তিনি উক্তরূপ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার অনুমোদন না করিয়া, যোগ্যতা ও দেশহিতৈষিতা অনুসারে প্রজাসাধারণের দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন। এক্ষণে আমাদের দেশের মুসলমান সম্প্রদায় ভীত হইয়া উঠিয়াছেন যে, এরূপ ব্যবস্থায় তাঁহাদের কোন লাভ না হইয়া বরং সমূহ ক্ষতিই হইবে, কারণ তাঁহাদিগের ন্যায় শিক্ষা ও শক্তিহীন সম্প্রদায়ের পক্ষে হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠা সম্ভব হইবে না; ফলে হিন্দুদিগেরই একাধিপত্য বা প্রাধান্য রহিয়া যাইবে। এই বিষয় লইয়া মুসলমানসমাজে একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে মিষ্টার আমীর আলি প্রমুখ কয়েক জন শিক্ষিত ও পদস্থ মুসলমান মর্লি সাহেবের নিকট তাঁহাদের এই অভিযোগ নিবেদন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। মর্লি সাহেবের নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন, এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে হিন্দুদিগের স্বার্থই সাধিত হইবে ও অপর পক্ষে মুসলমানগণের স্বার্থের সমূহ হানি হইবে, এবং তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধ দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বড়লাটের মন্ত্রণাসভায় যদি একজন হিন্দু মনোনীত হন, তাহা হইলে অপর একজন মুসলমানও মনোনীত হওয়া আবশ্যক। উত্তরে মর্লি সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সমিতিতে নির্ব্বাচনপদ্ধতি বিষয়ে যাহাতে মুসলমানগণ স্বতন্ত্র অধিকার লাভ করিতে পারেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েন, সে বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বড়লাটের মন্ত্রণাসভায় মুসলমান সভ্য মনোনীত করার বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের মন্ত্রণসভায়-মনোনীত ভারতীয় সভ্য হিন্দু কি মুসমলমান তাহা বিচার করা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি ভারতবাসী বলিয়াই ভারতীয় মন্ত্রণাসভায় স্থান পাইবেন এবং তাহাই এক্ষণে তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

মর্লি সাহেবের শেষের উত্তরটি তাঁহার ন্যায় উচ্চমনা ও সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্তই হইয়াছে। যেখানে সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থ জড়িত, সেখানে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য, দেশের সাধারণ মত ও ভাবপ্রকাশের জন্য একজন উপযুক্ত দেশীয় সদস্য থাকাই বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বা সমাজ তাঁহার জাতিগত কর্ত্তব্যপালনের অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে না। যাঁহার জ্ঞানে গভীরতা আছে, অন্তরে সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি আছে, প্রাণে সহৃদয়তা ও উদারতা আছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতিগণ স্বার্থের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি আছে, যিনি আপনার সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা আপনার স্বদেশের কল্যাণকেই অধিকতর বরেণ্য বলিয়া মনে করেন, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, পঞ্জাবী হউন বা মহারাষ্ট্রী হউন, তিনি আমাদের সকলেরই সমান প্রতিনিধি, তিনি আমাদের সকলেরই সমপূজ্য। এরূপভাবে পরস্পরকে দেখিতে ও বুঝিতে না শিখিলে আমাদের মধ্যে একতা বা জাতীয়তা, শিক্ষা বা সাধনা পুষ্টিলাভ করা অসম্ভব। বৃহৎ এককে উপেক্ষা করিয়া আপন আপন ক্ষুদ্র খণ্ডকেই যদি আমাদিগের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিতে শিখি, যদি একে অপরের কল্যাণচেষ্টা করিবার এবং বিশ্বাসভাজন হইবার সাধনা হইতে আমরা বিরত হই, তাহা হইলে মর্লির সংস্কার কেন সমগ্র স্বাধীন মানবের সকল অধিকার পাইলেও আমাদের পক্ষে কোনও দিন মানুষ হওয়া সম্ভব হইবে না। তাই আমরা মর্লি সাহেবের শেষ উত্তরে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছি সেইরূপ প্রথম উত্তরে ভেদনীতি প্রবর্ত্তনের আশ্বাস দেখিয়া ভীত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এরূপ নীতির প্রবর্ত্তন করিলে তিনি যে কেবল আমাদিগেরই মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও পক্ষপাতিতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবেন তাহা নহে। এ নীতির ফলে ভবিষ্যতে গবমেণ্টকেই

ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। ভারতবর্ষের ন্যায় বিপুল দেশের বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ও পক্ষপাতিতাকে একবার প্রশ্রয় প্রদান করিলে, ক্রমে তাহা সহস্রমুখী হইয়া, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বিষে সহস্র রসনা লেলিহান করিয়া, প্রশ্রয়দাতাকেই দংশন করিবার জন্য নিয়তই অগ্রসর হইবে। এরূপ পরিণাম যে এ নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল, মর্লির ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির তাহা অবিদিত হওয়া সম্ভব নহে। উদারনৈতিক মর্লি যেন দেশের এ দুঃসময়ে উদারনীতি প্রবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ না হন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। ইহা ভিন্ন মুসলমান স্বদেশবাসীগণকেও আমাদিগের একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ভারতে মহামতি রিপনের সময় হইতে যেটুকু স্বায়ত্তশাসন চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে ব্যবস্থাপক সমিতি, মিউসিপালিটি, জেলা বোর্ড ও অন্যান্য সমিতিতে যে সকল ভারতবাসী সভ্য নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন হিন্দু কি মুসলমান কি কখনও আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপর সম্প্রদায়ের অনিষ্টচেষ্টায় রত হইয়াছেন? বহু মুসলমান প্রজার প্রতিনিধির পদে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কি কোনও দিন তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্যপালনে, অপক্ষপাতবিচারে বিমুখ হইয়াছেন? তবে আজ তাঁহাদের এ অমূলক ভীতি ও সন্দেহ কিসের জন্য? সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বই যাঁহাদের ধর্ম্মের সারশিক্ষা, তাঁহারা আজ কোন্ মোহের কুহকে পড়িয়া তাঁহাদের স্বদেশের আপন সহোদরের সহিত ভেদনীতির শিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ নীতির ফল কাহারও পক্ষে শুভকর নহে, ইহা যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন। সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাতিতাকে স্পষ্ট ও পুষ্ট করিয়া আজিও জগতে কোন ব্যক্তি কোন জাতিকে মহৎ ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলে নাই। যাহা দুর্ব্বলতা হইতে প্রসূত তাহাকে আশ্রয় করিলে, দুর্ব্বলতাকেই বরণ করিয়া লওয়া হয় মাত্র, তাহা মনুষ্যত্বের, মহত্ত্বের সাধনা নহে; এবং যাহা ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন তাহা একতা ও জাতীয়তার জন্মদাতা নহে। আমীর আলি প্রমুখ আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতৃগণ যেন জয় পরাজয়ের এই পুরাতন সহজ সত্যটি বিস্মৃত না হন।

মিষ্টার আমীর আলি প্রমুখ মুসলমানগণের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন নামক সংবাদ-পত্রে একটি যে সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ক্ষুদ্র ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রেরণের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও,—ইহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে এই সকল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন শক্তি দান করা, বা লর্ড মর্লির প্রস্তাবানুযায়ী সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে তাহাদিগের সংখ্যানুসারে প্রতিনিধি প্রেরণের শক্তিদান করা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়। মুসলমানগণকে পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণের শক্তিদান করা সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, যে সকল প্রদেশে মুসলমান প্রজাগণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছেন, সে সকল স্থানে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু ইহা ভিন্ন এ বিষয়ে আর একটি প্রধান আপত্তি আছে। মুসলমানগণকে দুইবার ভোট দিবার ক্ষমতা না দিয়া এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা অসম্ভব। কারণ এ ব্যবস্থায় হয় হিন্দুদিগের প্রতি অবিচার করিতে হয়, নতুবা মুসলমানগণকে তাহাদের সাধারণ ভাবে ভোট দিবার স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। নির্ব্বাচিত জেলাসমিতি হইতেই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সমিতি গঠিত হইবার কথা। সুতরাং প্রাদেশিক সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য মুসলমানকে পৃথক ক্ষমতা প্রদান করিলে, প্রত্যেক মুসলমানকে দুইটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। একটি পৃথক ভাবে আর অপরটি জেলা সমিতির নির্ব্বাচন ক্ষমতায়। এবং মুসলমানগণকে পৃথক নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে, তাহাদিগের প্রতি আর এক অবিচার করিতে আমরা বাধ্য, অর্থাৎ জেলা সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা হইতে

তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে হয়। এ সমস্যার মীমাংসা করা অসম্ভব। লর্ড মর্লি যে প্রস্তাব করিয়াছেন যে নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতায় মুসলমানগণ যথাবিহিত রূপে প্রতিনিধি প্রেরণে অক্ষম হইলে, তাহাদের সংখ্যানুযায়ী কয়েকজন করিয়া মুসলমান প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া সমিতি সমূহে তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইবেন, ইহাই বর্ত্তমান অবস্থায় এ সমস্যার একমাত্র মীমাংসা বলিয়া মনে হয়। যদি নির্ব্বাচন সমিতিতে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান নির্ব্বাচিত না হন, তাহা হইলে লর্ড মর্লির প্রস্তাবানুযায়ী গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া তাহাদিগের প্রতিনিধির অভাব পুরণ করিতে পারিবেন। মুসলমানগণ বলেন যে হিন্দুরা মিলিত হইয়া এরূপ মুসলমানকে নির্ব্বাচিত করিবেন, যিনি মুসলমান সমাজের যথার্থ প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতে বিমুখ না হন, তাহা হইলে হিন্দুরা এরূপ করিলে, ফলে আর একজন মুসলমান গবর্মেণ্টের দ্বারা মনোনীত হইবেন মাত্র। সুতরাং হিন্দুদিগের তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই নাই।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিলাতি জাহাজে।

যাবার সময় সমুদ্র দিয়াই যাইব ঠিক করিয়া টিকিট কিনিয়াছিলাম। কিন্তু ভূমধ্যস্থ সাগরে সমুদ্রপীড়ায় কাতর হইয়া ফরাসীদেশে মার্সেলে নামিয়া রেল গাড়িতেই উঠিতে হইল; তাহাতে যদিও অনেক বেশী খরচ পড়িয়া গেল; তবুও ফিরিবার সময় বিলাত হইতে সমস্ত পথ সমুদ্র দিয়া আসিবার কথা একবারও মনে আনি নাই। ভূমধ্যস্থ সাগর হইতেও, "বে অফ্ বিস্‌কে" আরও তুফানময় স্থান। আটলাণ্টিক মহাসাগরের যত ঢেউ এই পথে ঢুকিয়া জাহাজকে বড়ই বিধ্বস্ত করে। এই কথা লোকমুখে শুনিয়া পুনরায় ফরাসীদেশের ভিতর দিয়াই রেল যোগে আসিয়া মার্সেলে জাহাজে চড়িলাম।

পথে যতগুলি বন্দর আছে—একটি হইতে অপরটিতে পৌঁছিতে প্রায় চার পাঁচ দিন বা ততোধিক সময় লাগে। এই সময়ে অনন্ত সমুদ্রের উপর ভাসিয়া কাহারও কিছু বড় করিবার থাকে না। কেবল যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া, সময়ে সময়ে একটু লেখা পড়া তাহা ছাড়া একত্র ডেকে বসিয়া খেলাধুলা ও গল্প গুজব করাই কাজ। জাহাজে একলাটি সময় যেন আর কাটে না কাজেই পরস্পরে আলাপ করিবার স্পৃহা এখানে বড়ই বলবতী হয়।

কেবল খাবার ও শোবার সময় ছাড়া সকলেই প্রায় অন্য সময় ডেকের উপর থাকেন। কেহ কেহ বা সময়ে সময়ে সেলুন অর্থাৎ বৈঠকখানার ভিতর বসিয়া লেখেন পড়েন তাস খেলেন বা গীতবাদ্য করেন। কিন্তু অধিকাংশ জনতাই ডেকের উপর কেহ কেহ বা এখানে এক একটি হালকা বেতের বা ক্যানবিসের চেয়ারের উপর বসিয়া কেহ কেহ বা বেড়াইতে বেড়াইতে নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহেন। প্রাতর্ভোজনের পর খেলিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।

তখন ডেকের ষ্টুয়ার্ড অর্থাৎ ডেকের খানসামা আসিয়া সব খেলিবার আসবাবগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া যায়। সে সব খেলাগুলিই এমন—যে জাহাজের অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যেও অনেক চলা ফেরা ও লাফান ঝাঁপান হয়। স্বাস্থ্যের দিকে একান্ত লক্ষ্যশীল কর্ম্মট ইংরাজ জাতি বসিয়া খেলা বড় বেশী ভালবাসে না। আর সাধারণতঃ সব খেলাতেই মেয়ে পুরুষে যোগ দিয়া থাকেন।—তাহাতে কত আনন্দ আর সে দৃশ্য দেখিতেই বা কি সুন্দর! উচ্চহাসি আনন্দের রোল ও আহ্লাদের ছুটাছুটিতে ডেক তখন ভরপূর হইয়া উঠে। "কয়েট রিং" ফেলা খেলাতে—রমণীগণ একটু নিকট হইতে রিং ছুঁড়িতে অধিকার পান—কেন না তাঁহাদের হাতে পুরুষদের মত বল নাই।

আর একটি খেলায়—চোখ বাঁধিয়া জমীতে ছবি আঁকিতে হয়। মধ্যস্থানে একটি জানোয়ারের প্রতিমূর্ত্তি আঁকা আছে। দূর হইতে চোখ বাঁধিয়া চলিয়া আসিয়া তার যথাস্থানে ল্যাজটি আঁকিয়া দিতে হয়। চোখের বাঁধা খুলিয়া দিবার পর লোকে যখন নিজের ভুল দেখে অমনি এক একটি বৃহৎ হাসির রোল পড়ে।

এই সব গোলমাল হইতে দূরে কোথাও বা ছোট টেবিলের চারি পাশে চারি জনা বসিয়া—ব্রীজ খেলেন। সেগুলি সবই জুয়া খেলা। অনেকে বিপুল হারেন জেতেন। তাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ। দর্শকবৃন্দ তাহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ান। এই সকল খেলার জন্য চাঁদা উঠে ও কে হারিল কে জিতিল তাহার তালিকা জাহাজের নোটিস-বোর্ডে লেখা থাকে।

জাহাজের দোলনাগুলিতে চড়িয়া দোলাও একরূপ খেলা। যেন সঙ্কীর্ণ জাহাজখানিতে আবদ্ধ থাকিয়াও শূন্যপথে—আকাশে উঠিতেছি মনে হয়। আর জাহাজখানি ঢেউতে বেশী দুলিলেও—দোলনায় বসিয়া থাকিলে ঢেউ বড় লাগে না।

আরও কত রকমের আনন্দ আছে। নাচ গান উৎসব প্রায় রাত্রির আহারের পরই হইয়া থাকে। যদিও সেই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা শীত ও ঠাণ্ডা তবুও রমণীগণ অর্দ্ধোন্মুক্ত বক্ষ ও মনোহর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

পিয়ানোর পরদার উপর সরু সরু আঙ্গুল চালাইয়া একজন রমণী কোমল মধুর কণ্ঠে গান গাহেন। আর মধ্যে মধ্যে আরো অনেকগুলি মেয়ে পুরুষে নানা রকম গলা মিশাইয়া তাঁহার গানের 'কোরস' গাহিতে থাকে। একবার সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠে আবার ধীরে নামিয়া মিলাইয়া যায় —আবার উঠে আবার নামে যেন ঢেউয়ের খেলা চলে। কিন্তু কে জানে আমাদের দেশের সঙ্গীতের মত সে সঙ্গীত আমাকে তত আনন্দ দিত না। সুরে যেন সেরূপ তানের আবেশ নাই—সে গিটকিরী, গমক, ঝঙ্কার, রেশ, কিছুই নাই। সুরগুলি তারের মত যেন সোজা সোজা চলে, দূর হইতে সেকহ্যাণ্ড করে—কোলাকুলী করে না; প্রাণমনে মেশে না; যেন "সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান, দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান"।

তার পর নাচ আরম্ভ। পিয়ানোর বাজনাটি তখন এত মধুর হয়—যে তার সঙ্গে তালে তালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনিই বিদ্রোহী হইয়া নাচিতে চায়। একটি পুরুষ

একটি রমণীর কোমর ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচাকেই ওয়ালস্ নাচ বলে। সে নাচে মধ্যাকর্ষণের গ্রহ উপগ্রহের একত্রে ঘোরার সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। পলকা প্রভৃতি নাচগুলিও প্রায় ঐ রকম, কেবল তালের তফাতে নামের তফাৎ হইয়াছে মাত্র। আমাদের মত দুর্ব্বল লোকের পক্ষে সব নাচগুলিই প্রায় ক্লান্তিকর।

আমাদের সহিত একজন আসামের চা-কর সাহেব দেশে যাইতেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি পনর ষোল বৎসরের ছেলে ছিল। তাহার বর্ণ আমাদের মতই শ্যামবর্ণ। পরে জানিতে পারিলাম—সে ছেলেটি উঁহারি পুত্র। এবং একটি দেশীয় স্ত্রীলোক উহার মাতা। ছেলেটি জন্মাইবার পর হইতেই তিনি তাহাকে দারজিলিঙ্গে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ও পরে সেই স্থানে রোমানক্যাথলিক কলেজে ১৫ বৎসর অবধি শিখাইয়া এখন তাহাকে বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়াইবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। সে ছেলেটিকে তিনি ঠিক নিজের ছেলের মতই যত্ন করিতেন— এক কেবিনেই রাখিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর আমাদের একজন ডাক্তারের নিকট তাহাদের সব ইতিবৃত্ত শুনিয়া বড়ই চমৎকৃত হইলাম। তার মা একটি কুলী রমণী ছিলেন। সাহেবের সুনজরে পরিবার পর হইতেই তাহাকে সে অবস্থা হইতে সরাইয়া লইয়া তিনি একটি ছোট বাড়ী করিয়া দেন ও তাহার শিক্ষার জন্য এক মেম রাখেন। আমাদের 'রিজিড্ হিন্দু' স্বদেশী সিভিলিয়ান সাহেবের তুলনায় এ ব্যবহারটি কতই সুন্দর।

একটী যুবা পুরুষ তিনি ভারতবর্ষ বেড়াইতে আসিয়া এখন দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহার হাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন পর্য্যটকের লেখা একখানি বই দেখিলাম আর সে পুস্তক খানিতে ভারতবর্ষের লোকদের—বিশেষ বাঙ্গালীকে লইয়া বিস্তর নাড়াচাড়া আছে। যেমন হইয়া থাকে ইহার মধ্যে অনেক সত্য কথাও আছে অনেক মিথ্যা কথাও আছে। আমাদের সামাজিক অনেক দোষের কথা উল্লেখ করিয়া লেখক বলেন যে ভারতবাসী এখনও Self Governmentএর উপযুক্ত হয় নাই। একটি কারণ—দেশের স্ত্রী জাতির উপর তাহারা নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করে। দ্বিতীয় কারণ নিম্নশ্রেণীর জাতিদের উপর তাহাদের দারুণ ঘৃণা ও অত্যাচার। যে ভদ্র লোকটির হাতে এই পুস্তক খানি ছিল তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের দেশের সম্বন্ধে কিছুই জানি না—আপনি এই বই খানি পড়িয়া—আপনার মন্তব্য আমাকে বলিবেন। তাঁহার দেখিলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানিতে বড়ই আগ্রহ। লর্ড কার্জ্জন সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। তাঁহার ধারণা কার্জ্জন খুব কার্য্যদক্ষ হইলেও Self willed একগুঁয়ে লোক ছিলেন।

অনেক লোকের সঙ্গেই প্রায় ভারতবর্ষের কথা হইত। অধিকাংশ লোকই দেখিতাম পলিটিকস্ ও টেড' সম্বন্ধে কথা বলিতে ভালবাসেন। সাহিত্য বিজ্ঞান বা দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নহে। অধিকাংশ লোকেরই দেখিলাম মত যে—ভারতবাসী লেখা পড়া

তখন ডেকের ষ্টুয়ার্ড অর্থাৎ ডেকের খানসামা আসিয়া সব খেলিবার আসবাবগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া যায়। সে সব খেলাগুলিই এমন—যে জাহাজের অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যেও অনেক চলা ফেরা ও লাফান ঝাঁপান হয়। স্বাস্থ্যের দিকে একান্ত লক্ষ্যশীল কর্ম্মট ইংরাজ জাতি বসিয়া খেলা বড় বেশী ভালবাসে না। আর সাধারণতঃ সব খেলাতেই মেয়ে পুরুষে যোগ দিয়া থাকেন।—তাহাতে কত আনন্দ আর সে দৃশ্য দেখিতেই বা কি সুন্দর! উচ্চহাসি আনন্দের রোল ও আহ্লাদের ছুটাছুটিতে ডেক তখন ভরপুর হইয়া উঠে। "কয়েট রিং" ফেলা খেলাতে—রমণীগণ একটু নিকট হইতে রিং ছুঁড়িতে অধিকার পান—কেন না তাঁহাদের হাতে পুরুষদের মত বল নাই।

আর একটি খেলায়—চোখ বাঁধিয়া জমীতে ছবি আঁকিতে হয়। মধ্যস্থানে একটি জানোয়ারের প্রতিমূর্ত্তি আঁকা আছে। দুর হইতে চোখ বাঁধিয়া চলিয়া আসিয়া তার যথাস্থানে ল্যাজটি আঁকিয়া দিতে হয়। চোখের বাঁধা খুলিয়া দিবার পর লোকে যখন নিজের ভুল দেখে অমনি এক একটি বৃহৎ হাসির রোল পড়ে।

এই সব গোলমাল হইতে দূরে কোথাও বা ছোট টেবিলের চারি পাশে চারি জনা বসিয়া—ব্রীজ খেলেন। সেগুলি সবই জুয়া খেলা। অনেকে বিপুল হারেন জেতেন। তাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ। দর্শকবৃন্দ তাহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ান। এই সকল খেলার জন্য চাঁদা উঠে ও কে হারিল কে জিতিল তাহার তালিকা জাহাজের নোটিস-বোর্ডে লেখা থাকে।

জাহাজের দোলনাগুলিতে চড়িয়া দোলাও একরূপ খেলা। যেন সঙ্কীর্ণ জাহাজখানিতে আবদ্ধ থাকিয়াও শূন্যপথে—আকাশে উঠিতেছি মনে হয়। আর জাহাজখানি ঢেউতে বেশী দুলিলেও—দোলনায় বসিয়া থাকিলে ঢেউ বড় লাগে না।

আরও কত রকমের আনন্দ আছে। নাচ গান উৎসব প্রায় রাত্রির আহারের পরই হইয়া থাকে। যদিও সেই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা শীত ও ঠাণ্ডা তবুও রমণীগণ অর্দ্ধোন্মুক্ত বক্ষ ও মনোহর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

পিয়ানোর পরদার উপর সরু সরু আঙ্গুল চালাইয়া একজন রমণী কোমল মধুর কণ্ঠে গান গাহেন। আর মধ্যে মধ্যে আরো অনেকগুলি মেয়ে পুরুষে নানা রকম গলা মিশাইয়া তাঁহার গানের 'কোরস' গাহিতে থাকে। একবার সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠে আবার ধীরে নামিয়া মিলাইয়া যায় —আবার উঠে আবার নামে যেন ঢেউয়ের খেলা চলে। কিন্তু কে জানে আমাদের দেশের সঙ্গীতের মত সে সঙ্গীত আমাকে তত আনন্দ দিত না। সুরে যেন সেরূপ তানের আবেশ নাই—সে গিটকিরী, গমক, ঝঙ্কার, রেশ, কিছুই নাই। সুরগুলি তারের মত যেন সোজা সোজা চলে, দুর হইতে সেকহাণ্ড করে—কোলাকুলী করে না; প্রাণমনে মেশে না; যেন "সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান, দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান"।

তার পর নাচ আরম্ভ। পিয়ানোর বাজনাটি তখন এত মধুর হয়—যে তার সঙ্গে তালে তালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনিই বিদ্রোহী হইয়া নাচিতে চায়। একটি পুরুষ

একটি রমণীর কোমর ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচাকেই ওয়ালস্ নাচ বলে। সে নাচে মধ্যাকর্ষণের গ্রহ উপগ্রহের একত্রে ঘোরার সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। পলকা প্রভৃতি নাচগুলিও প্রায় ঐ রকম, কেবল তালের তফাতে নামের তফাৎ হইয়াছে মাত্র। আমাদের মত দুর্ব্বল লোকের পক্ষে সব নাচগুলিই প্রায় ক্লান্তিকর।

আমাদের সহিত একজন আসামের চা-কর সাহেব দেশে যাইতেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি পনর ষোল বৎসরের ছেলে ছিল। তাহার বর্ণ আমাদের মতই শ্যামবর্ণ। পরে জানিতে পারিলাম—সে ছেলেটি উঁহারি পুত্র। এবং একটি দেশীয় স্ত্রীলোক উহার মাতা। ছেলেটি জন্মাইবার পর হইতেই তিনি তাহাকে দারজিলিঙ্গে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ও পরে সেই স্থানে রোমানক্যাথলিক কলেজে ১৫ বৎসর অবধি শিখাইয়া এখন তাহাকে বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়াইবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। সে ছেলেটিকে তিনি ঠিক নিজের ছেলের মতই যত্ন করিতেন—এক কেবিনেই রাখিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর আমাদের একজন ডাক্তারের নিকট তাহাদের সব ইতিবৃত্ত শুনিয়া বড়ই চমৎকৃত হইলাম। তার মা একটি কুলী রমণী ছিলেন। সাহেবের সুনজরে পরিবার পর হইতেই তাহাকে সে অবস্থা হইতে সরাইয়া লইয়া তিনি একটি ছোট বাড়ী করিয়া দেন ও তাহার শিক্ষার জন্য এক মেম রাখেন। আমাদের 'রিজিড্ হিন্দু' স্বদেশী সিভিলিয়ান সাহেবের তুলনায় এ ব্যবহারটি কতই সুন্দর।

একটী যুবা পুরুষ তিনি ভারতবর্ষ বেড়াইতে আসিয়া এখন দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহার হাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন পর্য্যটকের লেখা একখানি বই দেখিলাম আর সে পুস্তক খানিতে ভারতবর্ষের লোকদের—বিশেষ বাঙ্গালীকে লইয়া বিস্তর নাড়াচাড়া আছে। যেমন হইয়া থাকে ইহার মধ্যে অনেক সত্য কথাও আছে অনেক মিথ্যা কথাও আছে। আমাদের সামাজিক অনেক দোষের কথা উল্লেখ করিয়া লেখক বলেন যে ভারতবাসী এখনও Self Governmentএর উপযুক্ত হয় নাই। একটি কারণ—দেশের স্ত্রী জাতির উপর তাহারা নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করে। দ্বিতীয় কারণ নিম্নশ্রেণীর জাতিদের উপর তাহাদের দারুণ ঘৃণা ও অত্যাচার। যে ভদ্র লোকটির হাতে এই পুস্তক খানি ছিল তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের দেশের সম্বন্ধে কিছুই জানি না—আপনি এই বই খানি পড়িয়া—আপনার মন্তব্য আমাকে বলিবেন। তাঁহার দেখিলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানিতে বড়ই আগ্রহ। লর্ড কার্জ্জন সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। তাঁহার ধারণা কার্জ্জন খুব কার্য্যদক্ষ হইলেও Self willed একগুঁয়ে লোক ছিলেন।

অনেক লোকের সঙ্গেই প্রায় ভারতবর্ষের কথা হইত। অধিকাংশ লোকই দেখিতাম পলিটিকস্ ও টেড' সম্বন্ধে কথা বলিতে ভালবাসেন। সাহিত্য বিজ্ঞান বা দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নহে। অধিকাংশ লোকেরই দেখিলাম মত যে—ভারতবাসী লেখা পড়া

শিখিয়া বড়ই রাজবিদ্রোহী হইয়াছে। তারা নিজেদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য উন্নতি করিতে চেষ্টা না করিয়া রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে কেন! মনে হলো তাঁহারা সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষার বিরোধী। অনেকেরই ইচ্ছা আমরা চিরদিনই নিম্ন স্তরে থাকি।

অপর দুই চার জন অন্য ভাবের লোকও ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের কথা—বিশেষ পুরাতন হিন্দু জাতির কথা হিন্দুদর্শনের ও কাব্যের কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের কথা সংস্কৃত ভাষার কথা আমিও যতটা পারি তাঁহাদের জানাইতাম। মনে ত হইত তাঁহারা মেয়ে পুরুষে তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন। ক্রমে আমার দল বাড়িতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেকেই আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব আধুনিক রকমে বুঝাইতে পারিলে দেখিলাম উচ্চশ্রেণীর ইংরাজগণের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়। তাঁহারা মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনেন।

আসিবার সময় আমাদের সহিত তিনটি যুবক ছিলেন তাঁহারা এইবার সিভিল সার্ভিসে পাশ হইয়া কাজে যোগ দিতে আসিতে ছিলেন। তার মধ্যে একজনের দেখিলাম সংস্কৃতের প্রতি বড়ই অনুরাগ। তিনি পরীক্ষাতেও সংস্কৃত লইয়াছিলেন; সংস্কৃত কিছু জানেন ও শ্লোক বলিলে বুঝিতে পারেন। তিনি আমাকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। বলিতেন আমাদের মুখ থেকে সংস্কৃত শ্লোক শুনিতে বড়ই ভাল লাগে। আর একজন প্রাচীন সিভিলিয়ান—তিনি আমার নিকট হইতে অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তকের নাম ও প্রাপ্তির ঠিকানা লিখিয়া লইলেন—তার ভিতর একখানি গীতা ও অপর খানি অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

আবার এমনও দুএকজন লোক দেখিলাম Easotoric Hindu ধর্ম্মে অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বের প্রতি তাঁহাদের বড়ই অনুরাগ। তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে ইংরাজিতে তরজমা করা গীতা আছে—ও Ethics of Chaytanya প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তকও দেখিলাম। আরও দেখিলাম বুদ্ধদেবের প্রশস্ত ধর্ম্মের সুবাতাস ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোকেরই মনে লাগিয়াছে। কেবল জাহাজে নহে, ইহা বিলাতেও দেখিয়াছি।

আমাদের দেশ সম্বন্ধে এই কথাগুলি এত বিস্তারিতরূপে বলিলাম তাহার কারণ, অন্য লোকে আমাদের বিষয় কিরূপ ভাবে দেখে এ খবর আমাদের খুবই জানা উচিত।

জাহাজে বসিয়া আর একটি জ্ঞান আমি এই লাভ করিয়াছি যে, আমাদের সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সুর ইউরোপের লোকদের খুব ভাল লাগে। আমাদের ভিতরেই একজন মধ্যে মধ্যে পিয়ানোতে দেশীয় গত বাজাইতেন। আর চারিদিক হইতে লোকেরা বিশেষতঃ রমণীগণ সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতে ছুটিয়া আসিত। তাঁহারা বার বার সেই গত শুনাইতে অনুরোধ করিতেন। সংস্কৃত শ্লোক ও ভারতীয় দর্শনের কথার ন্যায় ভারতের সঙ্গীতও যে পাশ্চাত্য দেশের উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের মুগ্ধ করিতে পারে—ইহা আমি আগে জানিতাম না।

বস্তুতঃ দেশভেদে, লোকভেদে, শিক্ষাভেদে বিভিন্ন গুণের অভিব্যক্তি। আমাদের এ দেশের এই গান এই শ্লোক এই দর্শনের বিশিষ্ট গুণেই আমরা সমৃদ্ধিশালী। অন্য প্রকারে অশেষ রকমে হীন হইলেও এই হিসাবে ভারত সর্ব্বাগ্রগণ্য।

এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আদান প্রদানের সাধারণ নিয়মানুসারে অন্য যে সকল বিষয়ে আমরা হীন তাহা অন্য হইতে আমাদের লইতে হইবে আর সঙ্গীত ও দর্শনাদির ন্যায় যে সকল দ্রব্য সামগ্রী আমাদের অপর্য্যাপ্ত দিবার আছে তাহা অন্যকে দিব।

জাহাজে এই সব প্রচার করিবার যেমন সুন্দর অবসর এমন আর কোথাও নাই। এই অবসরের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করিলে বিলাতে গিয়া এ সকল বিষয়ে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারি। সেখানে এক লণ্ডনেরই অল্প আয়তনের মধ্যে যে ৪৮টি থিয়েটার আছে—তাহাতে বিদেশী আসিয়াই অধিক অর্থ উপায় করিয়া লইয়া যায়। একটা নূতন কিছুর নাম শুনিলেই তাহা দেখিতে আমোদপ্রিয় লোকেরা প্রথমে ছুটে। সেই উপলক্ষ করিয়াই ভারতের নাট্যাভিনয় ইতিবৃত্ত ও অবস্থা বিলাতে সহজেই প্রচার করা যায়। পলিটি-ক্যাল বা সারগর্ভ দার্শনিক বক্তৃতায় যত না হইতে পারে—অতি শীঘ্র এই প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে। এবং এইরূপে সে দেশের সাধারণ লোককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারিলে অনেক উপকার আছে।

আমাদের জাহাজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ক্ষীণজীবী লোক ছিলেন। তাঁহার হাবভাব দেখিলেই মনে হইত তিনি যেন মনোকষ্টে আছেন। কে জানে কেন—এইরূপ লোকের সহিত আমার অতি সহজেই ভাব হইয়া যায়। আমি যেন তাঁহাদের সহজেই চিনিতে পারি, আর তাঁহারাও কি আকর্ষণে আমার কাছে আপনিই আসেন। অল্প আলাপের পরই তিনি আমাকে অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর মত কত কথাই যে বলিলেন। শুনিলাম তাঁহার একটি রমণীর সহিত বড়ই ভালবাসা হইয়াছে। তাহারও অবস্থা ভাল নয় বলিয়া আজ এগার বৎসর তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইতেছে, ইচ্ছা আরও কিছু জমাইয়া বিবাহ করিবেন। কিন্তু রমণীটি গত মেলে চিঠি লিখিয়াছেন—

"জন তুমি আর অপেক্ষা করিও না। যত শীঘ্র পার চলিয়া এসো। আশা করি আমরা একত্র হইলে দুইজনের চেষ্টায় কোনরূপে খাওয়া পরা চালাইতে পারিব। আমার সে সাহস আছে, তুমি দ্বিধা করিও না।"

কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করিতে তিনি এখন অপারক। তাঁর আরও এক বছর এ জাহাজে থাকিবার গ্রীমেণ্ট আছে। তাঁর ছোট কেবিনের টেবিলের উপর ভাল ফ্রেমে বাঁধান সেই রমণীর ফটো খানিতে ইঁহারই মত বিষণ্ন ভাব।

এই জাহাজে জাপান দেশের একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমেরিকার যুক্ত রাজ্য সাঁফ্রানসিসকোতে ফ্লানেলের কারবার করেন। তখন জাপানীদের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সেখানে ভয়ানক বাদানুবাদ চলি-তেছে। তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে কথা হইল! খর্ব্বাকৃতি লোকটি তেজে পরিপূর্ণ। এত সাহস এত প্রতিভা যেন একাকী একশত

জনের মত বীর্য্যবান; তিনি উদ্ধতভাবে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ ও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতার তেজ কি অসীম!

তাঁর সহিত একটি জাপানী রমণী ছিলেন। নানা রঙে ঢলঢলে ফুলপাখী প্রজাপতি আঁকা কিমোনো পরা, গোল গোল গড়ণ— অতিশয় খর্ব্বাকৃতি, মাথার উপর নানা ভাবে বিন্যস্ত ফাঁপান খোপা, এই কারণ মুখখানি খুব বড় দেখায়; উচ্চ চিবুক, এবং ক্ষুদ্র, চক্ষু তথাপি তাঁহাকে সুন্দরই দেখাইত। এমন আনন্দময় জীবন আর কোনও দেশের রমণীর নাই। বর্ত্তমান জাপান সম্রাট ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যের সংস্কারকালে নূতন আখ্যা নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন-কল্পে রাজ্যের লোকের সহিত একত্রে যে আটটি প্রতিজ্ঞা করেন তাহার মধ্যে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমাধিকার একটি। তৎ পূর্ব্বে প্রায় আমাদের দেশেরই মত তাহাদের অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। কিন্তু সেই দিন হইতেই জাপানে ভাগ্য-শ্রী ফিরিয়াছে। হে ভারতবাসি তোমরা দেশের উন্নতির জন্য এত প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিশেষ ফল পাইতেছ না, এই উপায় অবলম্বন কর—অচিরাৎ ফল পাইবে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

চয়ন।

ভারতে জাতীয়তার জাগরণ।—আমেরিকার উদারচেতা ধর্ম্মযাজক জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব আমাদের মধ্যে অনেকেরই নিকট পরিচিত। তিনি অক্‌টোবর মাসে আটলাণ্টিক মাসিক পত্রিকায় ভারতে জাতীয়তার জাগরণ সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ আমরা ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড্ হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষই আমাদের মধ্যে এই নবভাবের উৎপত্তির এক প্রধান কারণ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

আমরা গত শতাব্দীকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে দেখিতে পাই. প্রথম ভাগে ভারতে পাঁচ বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং দশ লক্ষ ভারতবাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। দ্বিতীয় ভাগে দুইবার দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পাঁচ লক্ষ ভারতবাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তৃতীয় ভাগে ভারতে ছয় বার দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পঞ্চাশ লক্ষ ভারত বাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। চতুর্থ ভাগে দেশে অষ্টাদশ বার দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত এবং মৃত্যুসংখ্যা এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ হইতে দুই কোটি ষাট লক্ষ পর্য্যন্ত অনুমান করা হয়।

সাণ্ডারলাণ্ড সাহেবের মতে দেশে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের, অর্দ্ধেক দেশবাসীর নিত্য অনাহারের কারণ শস্যের অভাব নহে,—অর্থের অভাব। দেশবাসীর এই দৈন্যের তিনি পাঁচটি প্রধান কারণের উল্লেখ করিয়াছেন:—

(১) অতিরিক্ত করভার;

(২) ভারতবাসীর জাতীয়শিল্পের বিনাশ;

(৩) গবর্মেণ্টের জন্য বৃহৎ ও অনাবশ্যক অর্থব্যয়;—

(৪) সামরিক বিভাগের জন্য গবর্মেণ্টের অসঙ্গত ব্যয়;

(৫) ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের নানা ভাবে নিত্য অর্থ-শোষণ।

ভারতে জাতীয়তার উৎপত্তির দ্বিতীয় কারণ —ভারতবাসীর পরাধীনতা। ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনে অধিকারী; কিন্তু ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে পরাধীন। অথচ ভারতবাসী আসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি; তাহাদের মধ্যে এরূপ শতশত ব্যক্তি বর্ত্তমান যাহারা তাহাদের ব্রিটিশ প্রভুদিগের সহিত বিদ্যা ও জ্ঞানে, কর্ম্মকুশলতার, বিশ্বস্ততায় এবং যাবতীয় সদ্‌গুণে সমকক্ষ। এরূপ জাতির প্রতি হীন ব্যবহারে যে অনেক ইংরাজ লজ্জিত হইবেন এবং উক্তরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ইহা যে কেবল মাত্র তাঁহাদের স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার চিরন্তন উচ্চ আদর্শশীল জাতীয় গৌরবের পক্ষে হানিকর তাহা নহে, এরূপ নীতি অবলম্বনে তাঁহাদের স্বার্থেরও বিলক্ষণ ক্ষতি আছে। এই নীতির বলেই তাঁহারা আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ হারাইয়াছিলেন এবং কানাডা হারাইতে বসিয়াছিলেন। যদি এই নীতির অনুসরণ হইতে বিরত না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভারত হারানও অসম্ভব নহে।

তাঁহার মতে ভারতবাসীকে তাহাদের স্বদেশ শাসনে অধিকার দান করাই ভারত-রক্ষার একমাত্র উপায়। তাহাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাহাদিগকেই দান করা কর্ত্তব্য, কারণ বিদেশীর দ্বারা তাহা হইয়া উঠা সম্ভব নহে। ভারত গবর্মেণ্টের ন্যায় শাসননীতি ও সহানুভূতিতে দেশবাসী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অপর কোনও গবর্মেণ্টের কল্পনা করাও কঠিন। এ বিষয়ে ইংরাজ ও রুষশাসনেব কোনও পার্থক্যই দেখা যায় না।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসার প্রসঙ্গে তিনি দেখাইয়াছেন যে দেশের শাসন কর্ম্মে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা ভিন্ন দেশে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনে উপযুক্ত নহে বলিয়া অনেকে যে অপবাদ দিয়া থাকেন তাহা তাঁহার মতে নিতান্তই অসঙ্গত—।

বস্তুতঃ সুবিধা ও ক্ষমতা পাইলে যে তাহারা স্বায়ত্ত শাসনে সম্পূর্ণ সমর্থ তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আজই যদি ভারতে পার্লামেণ্ট গঠিত হয় তবে তাহার সভ্যগণ শিক্ষা, শক্তি ও চরিত্রের বলে জাপানের সুন্দর পার্লামেণ্টের সভ্যগণের সম্পূর্ণ সমকক্ষ হইবে। ভারতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যের ও প্রদেশের নেতৃবৃন্দকে লইয়া ভারতে এমন এক জাতীয় পার্লামেণ্ট সৃষ্টি করা সম্ভব, যাহা বুদ্ধি বা চরিত্রের বলে পাশ্চাত্য যে কোন পার্লামেণ্টের তুলনায় ন্যূন নহে।

ভারতে যে জাতীয় ভাবের অস্ফুট বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

ইহা অধীন জাতির অবসাদ হইতে জাগরণ মাত্র ...পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র। যে জাতি জগতের জনসমাজে শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত ছিল, যে জাতি আজিও তাহার স্বাভাবিক জন্মগত শ্রেষ্ঠতা অন্তরে অনুভব করে, এই নবভাব তাহার ধূল্যবলুণ্ঠিত অবস্থা হইতে আপনার পদের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার —দুঃসহ শৃঙ্খলভার মোচন করিবার চেষ্টা মাত্র! গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী স্বদেশকে বিদেশীর যথেষ্ট বিহার স্থল করিতে দিয়াছিল, ভবিষ্যতে আর তাহা না করিয়া, তাহারা তাহাদের দেশকে পুনরায় যথার্থ স্বদেশ ভাবে ফিরিয়া পাইতে চায়। ভারতবাসী চায় যে সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষকেও ঠিক কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত স্থান দেওয়া হউক এবং সকল উপনিবেশের ন্যায় স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনে ভূষিত করা হউক।

শাসন সংস্কার ও সার এডওয়ার্ড বেকার—

আমাদের নূতন লাট বেকার সাহেব তাঁহার নবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেদিন প্রথম তাঁহার ব্যবস্থাপক সমিতির অধিবেশনে সভাপতির স্থান অধিকার করিয়া-

ছিলেন। সদস্তগণের অভিনন্দনের উত্তরে ভাবী শাসন সংস্কারের উল্লেখ করিয়া রাজকর্ম্মচারিদিগকে তিনি যে উদার ও সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের সাহস ও সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমি আশা করি যে গবর্মেণ্টের যাবতীয় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিশেষতঃ সিভিল সার্ভিসের অন্তর্গত কর্ম্মচারিগণ দেশবাসী ও তাহাদিগের নেতৃবৃন্দের পক্ষে এই নব সংস্কার প্রবর্ত্তনের কর্ত্তব্যপথ সহজ করিয়া তুলিবার চেষ্টাকেই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। এই নব সংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে তাঁহাদিগের এত দিনের অধিকৃত কতকটা শক্তি ও শাসনের ভার প্রজার হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে। যদি তাঁহারা অনিচ্ছা বা অসন্তোষের সহিত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমরা এই সংস্কারে ব্যর্থতার বীজ রোপণ করিব মাত্র এবং প্রজার প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবার অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইব।" * * "যথেচ্ছ শাসনরূপ সহজ উপায়ের দ্বারা প্রজাবশের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতে শাসন কর্ত্তাদিগকে প্রজার মনস্তুষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সদুপায়ে ঈপ্সিতপথে চালিত করিবার কঠিন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যাঁহারা এতদিন তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রজার সহিত মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্ম করার অপেক্ষা স্বেচ্ছামত স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতেই অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার ও নীতিপরিবর্ত্তনের দাবী করা, তাঁহাদের মানসিক শক্তির উপর আমাদের দাবী; এ দাবী অবশ্য সামান্য দাবী নহে। কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস আছে যে আমার এ দাবী ব্যর্থ হইবে না।"

রাজপক্ষের নিকট হইতে আমরাই চিরদিন উপদেশ শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু দেশের কোন শাসনকর্ত্তা রাজকর্ম্মচারিদিগকে অর্থাৎ দেশের নিত্য ও প্রকৃত শাসসকর্ত্তাদিগকে প্রকাশ্যে এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে এতই বিরল যে আমরা বেকার সাহেবের এই উক্তিতে বস্তুতঃই একটা অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি।

আমাদের বিশ্বাস যে, শাসনকর্ত্তা যদি এরূপ কঠোর কর্ত্তব্যপালন ও প্রজারঞ্জনের দৃষ্টান্ত তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সম্মুখে ধরিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে বাধ্য। লর্ড রিপণের সময়েও আমরা কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ পরিবর্ত্তন আমাদের দেশে স্থায়ী হইতে পারে না। শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সাধারণতঃ শাসনের আদর্শেরও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি প্রজাগণের শাসন শক্তি যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততদিন স্থায়ী পরিবর্ত্তনের আশা করা বোধহয় দুরাশা মাত্র। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যেটুকু পাই সেইটুকুই আমাদের লাভ। বেকার সাহেবের উক্তি হইতে আমাদের আশা জন্মিতেছে যে, মর্লির প্রবর্ত্তিত সংস্কার অন্ততঃ তাঁহার রাজ্যকালে সম্মান ও সহানুভূতির সহিত গৃহীত হইয়া কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হইবে।

শ্রীযুক্ত দত্তচৌধুরীর বক্তৃতা।

সেদিন লাহোর ব্র্যাড্‌ল হলে স্বনামখ্যাত পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরী তাঁহার পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ট্রাইবিউন পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম—।

ট্রেন হইতে লণ্ডন নগরে অবতরণ করিয়া আমি আমার প্রত্যাশিত পরিচিত ব্যক্তিটিকে দেখিতে না পাইয়া, এক গাড়ীভাড়া করিয়া হোটেলের সন্ধানে যাত্রা করিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি আমি কোন স্থানে আশ্রয় পাইলাম না, কারণ হোটেলগুলি সবই পূর্ণ, কোথাও স্থান নাই। অবশেষে একটি ভারতবাসী ইংরাজের ভদ্রতায় আমি সে রাত্রের মত একটি ঘর পাইয়া বিশ্রাম-সুখের অবসর পাইলাম। পরদিন আমি স্বতন্ত্র একটি বাটী ভাড়া করিলাম।

ইংলণ্ডে কি প্রণালীতে কর্ম্ম করিলে ভারত-

বাসীর যথার্থ উপকার সাধিত হইতে পারে, এই বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বক্তৃতার পথ হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দান করিলেন। তখন আমি মহা বিপদে পড়িলাম, তবে কি উপায়ে ভারতবাসীর দুঃখের কথা তাহাদিগকে জানাইব? অবশেষে স্থির করিলাম যে, পার্লামেণ্টের সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদিগকে জানাইব এবং সংবাদপত্রের সহায়তায় সাধারণ লোককে এ বিষয় জানাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পরে আমি ডাক্তার রাদারফোর্ড ও সার হেনরি কটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহারা উভয়েই আমাকে সাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তখন আর এক সমস্যা—বক্তৃতা দিব কোথায়? লণ্ডনের কোন হল বিলক্ষণ ব্যয়ে ভাড়া ভিন্ন পাইবার উপায় নাই। গোখলে আমাকে বলিয়াছিলেন যে প্রথম বারে তাঁহার হলভাড়ার উপর আরো হাজার টাকা লাগিয়াছিল। শেষে যখন আমি শুনিলাম যে লর্ড মর্লি হইতে সকলেই হাইড্ পার্কে বক্তৃতা দিয়া থাকেন, তখন সেই উপায়ই অবলম্বন করাই শ্রেয়জ্ঞান করিলাম। ন্যাশানাল ডেমক্রাটিক লিগের সেক্রেটারি ডব্‌সন্ সাহেব আমার বক্তৃতার আয়োজনের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমাকে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, বিলাতের শ্রোতৃবৃন্দ তাহাদের আপন বিশ্বাসের বিপরীত কোন কথা শুনিতে চায় না এবং নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া বক্তাকে বিরক্ত করে। সৌভাগ্য বশতঃ আমাকে কোন বক্তৃতাস্থলেই এরূপ ব্যবহার পাইতে হয় নাই। দিন দিন শ্রোতৃ সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অনেকেই আমার প্রস্তাবিত প্রতিবিধানের সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ইহা ভিন্ন আমি প্রত্যহ ২।৩ জন পার্লামেণ্টের সভ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা করিতাম। কোন কোন সভ্যের ধারণা যে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি হিংস্র কুকুরের ন্যায় এক্ষণে পৃথক ভাবে শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাই উভয়েই সজীবিত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মুক্তিলাভ করিবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা পরস্পরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে। আমি তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করিতাম। কোন কোন সভ্যের মতে হিন্দুগণের মধ্যে একতার ও জাতীয় ভাবের এতই অভাব, যে তাহারা কেবল বালুকা স্তূপের ন্যায়। আমি তাঁহাদের বুঝাইতাম যে তাঁহাদের এ বিশ্বাস নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

অবশেষে আমি আমার ভারতবাসী শ্রোতৃবর্গকে অনুরোধ করিলাম যে তাঁহারা হিন্দুমুসলমানের ভেদনীতি পরিত্যাগ করিয়া এক বৃহৎ জাতীয়তার—সূত্রে আবদ্ধ হইয়া না উঠিলে, বর্ত্তমান শাসন সংস্কারের কোন ফললাভ করাই ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না।

হ্যামিলটন সাহেবের উদারতা।

কলিকাতার অনারেবল হ্যামিণ্টন সাহেব আমাদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আমাদের সকলেরই নিকট সুপরিচিত। বঙ্গের যুবকবৃন্দ যাহাতে দাসত্বের জন্য লালায়িত না হইয়া—কৃষিকর্ম্মের দ্বারা স্বাধীনভাবে ও সম্মানের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এই সম্বন্ধে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি সম্প্রতি তাঁহার এক বক্তৃতায় একটি সারগর্ভ প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুন্দর বনের ন্যায় অকর্ষিত ও উপেক্ষিত ভূমিসমূহ যথাবিধি কর্ষিত করিয়া শস্য উৎপাদনের দ্বারা লাভবান করিবার চেষ্টা করা আমাদের যুবকদিগের এক্ষণে প্রধান কর্ত্তব্য। কতকগুলি যুবক একত্র হইয়া যৌথ কারবারে এই কর্ম্ম আরম্ভ করিলে, ক্রমে সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার হইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন। এ বিষয়ে দেশের যুবকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি তাঁহার সুন্দর বনের জমিদারি হইতে পাঁচ শত বিঘা জমি বিনা খাজনায়

দুই এক বৎসরের জন্য একটি সুগঠিত যৌথ সমিতিকে দান করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রথম বৎসর যদি কিছু ক্ষতি হয় তাহা তিনি স্বয়ং বহন করিবেন এবং যদি কিছু লাভ হয় তাহা সেই সমিতি-কেই দান করিতে প্রস্তুত। এই উপায়ে বিনা ব্যয়ে ও বিনা ক্ষতির সম্ভাবনায় তাহারা এই কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইবে। পরে তাহারা উপযুক্ত হইলে স্বাধীন ভাবে জমি খাজনা করিয়া লইয়া কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারে। ক্রমে লাভবান হইতে পারিলে ধীরে ধীরে তাহাদের কর্ম্মের বৃদ্ধি করিতে পারে এবং এই ভাবে দেশময় পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া তাহারা নিজে ধনবান হইতে পারে ও তাহদের স্বদেশকেও সম্পদবান করিতে পারে। তাঁহার মতে স্বদেশী ভাবে স্বদেশের যথার্থ উন্নতি করিবার ইহাই সর্ব্বা-পেক্ষা প্রশস্ত পথ। সুখের বিষয় সভাস্থলেই একটি এইরূপ যৌথকারবার গঠনসমিতি গঠিত হইয়া এ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। হ্যামিণ্টন সাহেবের এই প্রস্তাব ও স্বার্থ ত্যাগের জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। সাধারণ গৃহস্থ যুবকদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা ও দৈন্যের অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ পথে দৃষ্টি ও শক্তি চালিত করিতে পারিলে যে ব্যক্তি-গত, পরিবারগত স্বার্থের সহিত দেশেরও স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা যে কেবল আমাদের ধনলাভেরই সুবিধা হইবে তাহাও নহে, এইরূপে একত্রে কর্ম্ম করিতে শিক্ষা করিলে আমাদের মধ্যে বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং দেশের কর্ম্মে একতা ইত্যাদি অনেক সদ্‌গুণের শিকড়ও বদ্ধমূল হইয়া বসিবে।

রাজ্যের কথা।

মেদিনীপুরে বিচার। মেদিনীপুরে বোমার বিচার এতদিনে শেষ হইয়াছে। পাঠক জানেন যে প্রথমে পুলিস সেখানে একটা বিরাট ও ভীষণ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করে। এই অভিযোগের ফলে মেদিনীপুরের অধিকাংশ গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তিকে হাজতে রাখিয়া, কয়মাস ধরিয়া নিপীড়িত করা হয়। অথচ পরে দেখা গেল গুপ্তচরের গল্পকথা ভিন্ন অন্য কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পুলিসের ছিল না। যাহা হউক সৌভাগ্যবশতঃ গবর্মেণ্ট পক্ষের ব্যারিষ্টার মিষ্টার এস্, পি, সিংহের ন্যায়বিচার ও সৎসাহসের ফলে গবর্মেণ্ট সন্তোষ দাস, সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগজীবন ঘোষ ঐ তিনটি যুবক ভিন্ন অপর সকলকে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন। এই তিনটির নিকট বোমা ছিল বলিয়া প্রকাশ ও তাহারা নাকি ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েস্টন সাহেবের প্রাণনাশের সংকল্প করিয়াই সেই বোমার সংগ্রহ করিয়াছিল। সন্তোষ ও সুরেন্দ্র হাজতে থাকিয়া তাহাদের অপরাধ স্বীকার করে এবং যোগজীবন তাহাদের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করে। আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন, যে তাহারা পুলিসেরই প্ররোচনায় ও আশ্বাসে এরূপ স্বীকার করিয়াছিল, এবং সন্তোষের ভৃত্য বনমালী বলিয়াছে প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে তাহারা কিছুই আনে না; পুলিসই তাহার হাত দিয়া বোমা সন্তোষের ঘরে রাখাইয়া ছিল। উভয়পক্ষের যুক্তি ও প্রমাণে এ্যাসেসর দুই জনই ইহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু জজ সাহেব তাঁহাদের মতের অনুমোদন না করিয়া তিন জনকেই অপরাধী জ্ঞানে কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। যোগজীবন ও সন্তোষের দশ বৎসর, সুরেন্দ্রের সাত বৎসর দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা এ রায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। সন্তোষ ও সুরেন্দ্রের স্বীকার পত্র ভিন্ন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রমাণ কিছুই ছিল না। পুলিসের সাক্ষীর অসারতাও আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টারের জেরায় যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা ভিন্ন যে দুই জন এ্যাসেসর ইহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, তাঁহারা যে অপক্ষ-পাত বিচার করিয়াছেন, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। এইরূপ অবস্থায় কেবল পুলিসের কথার উপর নির্ভর করিয়া এই তিনজন হতভাগ্য যুবার প্রতি যেরূপ ভীষণ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইল তাহাতে আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। হাইকোর্ট যদি ইহার প্রতিবিধান করেন তবেই ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং দেশবাসী অতীত দুঃখবেদনা ভুলিয়া যায়। কিন্তু এ আশা কি কি পূর্ণ হইবে!!!

নূতন আইন ও তাহার ফল। ভারত গবর্মেণ্ট নূতন আইন অনুসারে ঢাকা, বরিশাল ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহের পাঁচটি দেশহিতকর সমিতি উঠাইয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত সমিতির যুবকেরাই যে সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বদেশ সেবা ভিন্ন অন্য কোন অবৈধ কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, এরূপ আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বরিশালের সমিতিটি গত দুর্ভিক্ষের সময়ে সমগ্র জেলার দরিদ্র ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্রদান এবং সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। জেলার শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ ইহার সহায় ছিলেন এবং প্রাচীন ধর্ম্মভীরু নেতৃগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোন কল্যাণকর কর্ম্ম প্রকৃত ভাবে করিতে গেলে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা তাহা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু পুলিসের গুপ্ত অভিযোগ শুনিয়া যদি গবর্মেণ্ট দেশের মঙ্গল ও সেবারত সমিতি গুলিকে দেশ হইতে উচ্ছিন্ন করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর পরার্থপর প্রবৃত্তিকে একবারে মারিয়া ফেলা হয়।

ব্যায়াম সমিতি!—কেবল সেবাসমিতিগুলি নহে, উক্ত আইনের ফলে ছেলেদের ব্যায়াম সমিতি গুলিও প্রায় সমস্তই উঠিয়া যাইতেছে। সংবাদপত্রে প্রথমে পড়িলাম; পঞ্জাবে লায়ারপুরের ডেপুটি কমিশনার সমস্ত জিলাদার ও লম্বরদারদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে অতঃপর তাঁহার অনুমতি না লইয়া কেহ কুস্তি বা ব্যায়ামক্রীড়ার আখড়া স্থাপন করিতে পারিবে না। বঙ্গদেশে কোন কমিসনার বা ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ হুকুমজারি করেন নাই সত্য, কিন্তু শুনিলাম এখানে ৫।৭ জন যুবক একত্র হইয়া কোন বিশেষ আড্ডায় ব্যায়াম করিতে গেলেই তাহাতে পুলিসের শুভদৃষ্টি পতিত হয়,—এবং এই দৃষ্টির ফলে কোন্ দিন কাহাকে বৃথা সন্দেহ জনিত অত্যাচারে দগ্ধ হইতে হইবে এই ভয়ে যুবকগণ একে একে সমস্ত আখড়াই উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। কালীঘাটে আগে অনেকগুলি ব্যায়াম সমিতি ছিল, এখন একটিও নাই। এই ঘটনাতে আমাদিগকে যারপরনাই হতাশ্বাস ও চিন্তাতুর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যায়ামক্রীড়া বন্ধ হইয়া গেলে আমাদের যেরূপ অনিষ্ট হইবে এমন অন্য কিছুতে নহে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা কারণে একেই বালকগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল—ব্যায়াম বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা একেবারেই ভগ্নস্বাস্থ্য অকর্ম্মণ্য—হৃতবীর্য্য হইয়া পড়িবে। দেশের লোকের হাতে একখানা অস্ত্র নাই—বন্যপশু হইতে আত্মরক্ষার পর্য্যন্ত উপায়টুকু নাই;—শরীরিক বলে,—লাঠির অবলম্বনে যতটুকু আত্মরক্ষা করা যায় তাহার চেষ্টাও যদি অবৈধ হয়—তবে ভারতবাসীর পক্ষে জীবন রক্ষাই যে অবৈধ হইয়া দাঁড়ায়!

এ সম্বন্ধে রাজা প্রজার কর্ত্তব্য।

দেশের লোকের জন্য ব্যায়ামব্যবস্থা ত রাজপক্ষের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য তাঁহারা একবারে অবহেলা করিয়া চলেন তাহাও নহে; অনেক স্কুলে গভর্ণমেণ্ট ব্যায়াম শিক্ষায় ব্যয়ভারও বহন করিয়া থাকেন; অতএব একটি আইনের দ্বারা ব্যায়াম চর্চ্চা বন্ধ করিয়া দেওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত আইনের ফলে তাহাই হইতেছে।

যদি ব্যায়াম সমিতির প্রতি সন্দেহের কারণ ঘটে তবে রাজপক্ষ অন্যরূপে সহজেই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। সহরে; গ্রামে—পল্লীতে সকল স্থলেই রাজকর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা ব্যায়াম সমিতির পৃষ্ঠপোষক হউন, মেম্বর হউন, বালকদের কার্য্য-

কলাপ নিরীক্ষণ করুন—উৎসাহ প্রদান করুন—তাঁহাদের নেতৃত্বে সহকারীত্বে—সমিতির কার্য্য চলুক। অন্যপক্ষে সভ্য বা সমিতি বিশেষের কোন মন্দ লক্ষ্য বা কর্ম্মের কথা গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলে বিচারালয়ে বিহিতরূপে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা ত তাঁহাদের হাতের মধ্যেই রহিয়াছে! বিচারে ব্যক্তি বিশেষ বা সতিতে বিবেশেষের প্রতি যদি অন্যায় শাস্তিও প্রদান করা হয় তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু ক্ষতি-কর।—এই ত বিদ্রোহিতার সন্দেহে কত লোকের লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইতেছে, কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি নিপীড়িত হইতেছে, কিন্তু তথাপি তাহার ফল দেশব্যাপী নহে। কিন্তু যে আইনের ফলে দেশের উচ্ছেদ অনিবার্য্য, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। পার্টিসন হইতেও ভয়ঙ্কর, বিনা বিচারে নির্ব্বাসন দণ্ড অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। কেন না ইহা স্থায়ী হইলে ইহার ফলে সমস্ত দেশবাসীকে চিররুগ্ন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে, মর্লির শাসন সংস্কার তখন আর কাহারও ভোগে আসিবে না। অথচ দেশের লোক এখন প্রশান্ত ভাবে ইহা দেখিতেছেন কি করিয়া তাহা আরো আশ্চর্য্যের বিষয়। এজন্য ঘন ঘন বিরাট সভা হয় না কেন? লাট সাহেবের নিকট আবেদন নিবেদন ডেপুটেশন যায় না কেন? ইংলণ্ডে আন্দোলনের জন্য লোক পাঠান হয় না কেন? সুরেন্দ্র বাবু মতিবাবু প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্ত্তৃপক্ষগণ এমন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন কেন? সংবাদ পত্রে দু এক কলম লেখাতেই কি এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট কর্ত্তব্য সাধিত হইল? বিনা বিচারে নির্ব্বাসন বিধি রহিত করিবার জন্য ইংলণ্ডের উদার মনস্বীগণ কত না চেষ্টা করিতেছেন। এই সমিতি সম্বন্ধীয় আইনে দেশে যে তদোধিক সর্ব্বনাশ উপস্থিত ইহা জানিলে কি তাঁহারা ইহার প্রতিকারে চেষ্টা করিবেন না; না প্রকৃত কথা বুঝিলে গভর্ণমেণ্টই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন। বেকার সাহেব, লর্ডমিণ্টো কেহই আমাদের অহিতাকাঙ্ক্ষী নহেন এবং তাঁহাদিগকে আমরা মহৎ হৃদয় বলিয়াই জানি। অতএব ইহার প্রতিবিধান জন্য দেশের লোকের প্রাণপণ চেষ্টা ও আন্দোলন করা কর্ত্তব্য।

সমালোচনা।

জাপানী ফানুস। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কান্তিপ্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। মূল্য ॥• আট আনা মাত্র। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি। ইহার ছাপা' বাঁধাই' কাগজ, প্রভৃতি বহিরবয়ব যেমনি সুন্দর ভিতরে গল্প কয়েকটিও তেমনি সুন্দর হইয়াছে। নয়খানি সুরঞ্জিত হাফটোন চিত্রও যেন সোণায় সোহাগা মিশিয়াছে। ভাষা ও গল্প বলিবার ভঙ্গীটি এমন হৃদয়-গ্রাহী যে তাহা নিমেষেই হৃদয় স্পর্শ করিয়া ফেলে! অনাড়ম্বর ভাষায়, ছোট কথায় এমন কবিত্বের সমাবেশ করিতে বিশেষতঃ শিশু সাহিত্যে—এক অপূর্ব্ব কলাবিদ্ অবনীন্দ্র বাবু ভিন্ন অপর কেহ সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা 'জাপানী ফানুসের' আর এক পাঠ দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম!

মুকুট। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে "বালক" পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যকৃত। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিতে দুই একটি ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া মহারাজ অমরমাণিক্যের পিতৃস্নেহার্দ্র অথচ রাজোচিত দার্ঢ্য, চন্দ্রমাণিক্যের স্নেহ ও ক্ষমতা, ইন্দ্রকুমারের তেজস্বিতা, ও ভক্তি নম্র অধীনতা, রাজধরের ধূর্ত্ততা ও নীচতা, ধুরন্ধরের কুমন্ত্রণা, ইষা খাঁর দ্রোণাচার্য্যের মত শিষ্যস্নেহ বিচিত্র ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সামান্য দুই একটি রেখাতে কবিবর একখানি সমগ্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশা করি বাঙালী পাঠক চারি আনামাত্র ব্যয় করিয়া এই শিশু নাট্যখানি পাঠ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিবেন না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জরোড হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

মহতাব সিংহ।

ভাই মণিসিংহের হত্যার পর অমৃতসর একেবারে শিখশূন্য হইয়া পড়িল। জয়োন্মত্ত মোগলেরা তখন নির্ব্বিবাদে 'গুরুদ্বার হরমন্দর' (হরিমন্দির) অধিকার করিয়া লইল। নবাবের আত্মীয় পরম বিলাসী মস্‌সা জংঘড় অমৃতসরের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া হরমন্দরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনাধীনে হরমন্দর দুই দিনেই বিলাস নিকেতন হইয়া উঠিল। যেখানে ধূমপান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, সংযমের লীলাস্থল বলিয়া যাহা, এতকাল পঞ্জাববাসীর হৃদয়জাত শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল, আজ তাহা পাপ-কলুষিত নৃত্য-গীতে সদা মুখরিত হইয়া উঠিল।

'জালীম' মোগলের হস্তে পবিত্র হরমন্দরের এরূপ দুর্দ্দশার কথা অচিরেই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সে বার্ত্তা শুনিয়া পঞ্জাব-বাসী শিখেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু হরমন্দর উদ্ধারের কোন উপায়ই তাহারা করিয়া উঠিতে পারিল না। শোকে, ক্রোধে তাহাদের প্রাণ উদ্বেজিত হইতে লাগিল। শক্তিসঞ্চয়ের জন্য তখন তাহারা দূরবর্ত্তীস্থানে, পলায়িত শিখদিগের সাহায্য প্রার্থনায় ভিন্ন ভিন্ন দিকে দূত প্রেরণ করিল।

এই সময় বিকানীরে একদল শিখ অবস্থান করিতেছিল। ভাই বুলাকাসিংহ তাহাদিগের নিকটে দৌত্য কার্য্যে প্রেরিত হন। স্থির-বুদ্ধি, বাগ্মী ও তীক্ষ্ণধী বলিয়া ভাই বুলাকার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহার অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা অতুলনীয়। গ্রীষ্মের প্রবল উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া বীর একাকী জন-মানব-হীন পাদপ-শূন্য বিস্তৃত প্রচণ্ড মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ। শিখেরা পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পঞ্জাবের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য সোৎসুকে নানা প্রশ্ন করিলে, ভাই বুলাকা তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় মস্‌সার অন্যায় আচরণের কথা, হরমন্দরের কলঙ্ককাহিনী ও শিখ হত্যার জন্য বাদশাহ মহম্মদ শাহ জঙ্গলীর 'আম হুকুম' ইত্যাদি সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে শিখেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, লজ্জায় ও ক্ষোভে তাহাদের বদন আরক্তাভা ধারণ করিল। অসি আকর্ষণ করিতে করিতে উন্মত্ত শিখেরা "শ্রীবাহি গুরু" "শ্রীবাহি গুরু" * নাদে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল।

সেই সঙ্গতের † এক পার্শ্বে মিরাণকোট নিবাসী বীরবর ভাই মহতাব সিংহ নীরবে অবস্থান করিয়া বুলাকার বর্ণনা শুনিতে ছিলেন। পঞ্জাবে একটি মাত্র শিখ জীবিত থাকিতেও দুর্ব্বৃত্ত মোগল গুরুদ্বারের এরূপ অবমাননা করিতে সাহস পায়, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। বুলাকার কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বীর বলিয়া উঠিলেন—"হে ভাই! এই সব অত্যাচার চক্ষের উপর নিরীক্ষণ

* শিখেরা 'বহি'কে উচ্চারণ করে 'বাহ', সতি-সৎ, হরি—হর, মন্দির—মন্দর, ইত্যাদি।
† শিখ-সভা।

করিয়াও তোমরা কি করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ? আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে! হা গুরো! সাধুরা জীবন পাত করিয়া আমাদিগকে যে সকল মহৎ শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন, সে সকলই কি আজ বৃথা হইয়া গেল? শিখের সে সাহস, সে বীরত্ব আজ কোথায়? কে আমাদের হৃদয়ে হীন কাপুরুষতার বীজ উপ্ত করিয়া দিল? ছি! ছি! কি লজ্জার কথা! গুরু-পুরী হইতেও আজ আমাদের প্রাণের মর্য্যাদা অধিক হইয়া উঠিয়াছে! গুরুকে ত্যাগ করিয়া সামান্য এই মাটীর শরীরের 'কদর' করিতে শিখিয়াছি। ধিক্ আমাদের এছার জীবনে!"

এই তীব্র তিরস্কারে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ভাই বুলাকা সিংহ উত্তর করিলেন—"হে ভাই সাহেব! আপনি যেমন স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য গৃহ-পরিবার ত্যাগ করিয়াছেন; ঐরূপ সকল শিখই জালীম শত্রুর অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া 'ঘরবার' ত্যাগ করিয়াছে। কাহাকে আপনি এরূপ শ্লেষাত্মক তিরস্কার করিতেছেন? কাহার স্কন্ধে আপনি এই কলঙ্কের দায়িত্ব অর্পণ করিতেছেন? এই বিপুল পঞ্জাবে এমন একটু স্থান নাই যেখানে শিখেরা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারে। আজকাল তথায় একটিও শিখ দেখা যায় না। যাঁহাদের ভয়ে অত্যাচারীরা এককালে কম্পিত হইয়া উঠিত, যাঁহাদের "সতি শ্রী অকাল" শব্দ গগন পর্য্যন্ত পৌঁছিত, যাঁহাদের গতিরোধে অত্যাচারী রাজন্যবর্গের আদৌ সাধ্য ছিল না, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য 'শির' উৎসর্গ করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না, আজ তাঁহাদের নাম ও চিহ্ন কোথায়! আজ আমরা কেবল নামেই সিংহ, কর্ম্মে ভীরু, মেষেরও অধম। কেবল 'গুরুদ্বার' দুষ্ট ম্লেচ্ছের হস্তে ত্যাগ করি নাই, সামান্য প্রাণের ভয়ে সাধের স্বদেশ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি!"

বুলাকা সিংহের কথায় শিখদিগের হৃদয়ে তীব্র আঘাত লাগিল। তাহারা ত্রুটি স্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত হইল। ভাই বুঢ়া সিংহ এই দরবারে শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধভাবে স্বীয় কোষমুক্ত করত সভাতলে স্থাপনপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সভা মধ্যে এমন কেহ বীর আছে কি, যে এই অসি লইয়া "জালীম জংঘড়ের" শির কাটিয়া আনিবে?"

ভাই মহতাব সিংহ "শ্রীবাহি গুরু" উচ্চারণ করিয়া সেই অসি গ্রহণ করিলেন। শিখমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হইয়া তিনি বলিলেন—"হে হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ! যাহাতে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে সফলকাম হই, এজন্য আপনারা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। গুরুদ্বারের অপমান সহ্য করিতে আমি অক্ষম। যদি অকাল পুরুষ সুপ্রসন্ন হন, তবে এই অসির আঘাতেই অত্যাচারীর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কলঙ্কমুক্ত করিব। যদি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে যাইয়া আমার দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। যাহারা জীবনকে ভালবাসে, তাহারা কাপুরুষ, তাহারা বিরুদ্ধাচারী। যদি এই কার্য্যে আমার মৃত্যু হয় তবে আমি মাতা সাহেব দিবানের ক্রোড়ে স্থান পাইব। আর যদি ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাই, তবে আবার সাহ্লাদে আপনাদের শ্রীচরণ চুম্বন করিব।"

মহতাবের বক্তব্য শেষ হইতে না হইতে ভাই সুখা সিংহ বলিয়া উঠিলেন—"প্যারে (প্রিয়) খালসাজী—শিখমণ্ডলি! আমাকে আদেশ করুন, যেন আমি আমার এই শিখ-ভ্রাতার সহগামী হইতে পারি। কথায় আছে —"এক উর এক এগার হোতে হৈঁ"। * আর এ কার্য্য ত' নিতান্ত সহজ নহে। ধর্ম্মের জন্য মরিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে।"

শিখেরা তখন পরম আহ্লাদে এই বীরকে হরমন্দরের উদ্ধার-ভার দিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশাদি সহ আন্তরিক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। সে পূত আশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে সেই প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত জ্বালাময়ী 'লু' প্রবাহিত মরুদেশ উত্তীর্ণ হইয়া, যথাকালে বীরদ্বয় অমৃতসরে উপস্থিত হইলেন। 'সাদিক' † শিখরে রক্ত-বিধৌত নগরে প্রবেশ করিতেই কত পুণ্য কাহিনী, কত আত্মদান-কথা তাঁহাদের প্রাণে উদিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিল!

শত্রুপুরিতে আত্মগোপন করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বীরদ্বয় উভয়েই মোগল-বেশে সজ্জিত হইলেন এবং স্ব স্ব স্থালী গোলাকার কঙ্করে পূর্ণ করিয়া হরমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। বাহিরে অশ্ব রাখিয়া, মনে মনে 'সতি শ্রী অকাল পুরুষ'কে ধ্যান করিতে করিতে সেই স্থালী হস্তে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রজা করপ্রদান করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া কেহই কোনরূপ আপত্তি করিল না।

বীরদ্বয়-তন্ন তন্ন করিয়া মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, বুলাকা সিংহের একটি কথাও অতিরঞ্জিত নহে। মস্সা ঠিক্ পূজার স্থলেই পালঙ্ক বিস্তার করিয়া মদিরা সেবা করিতেছেন; আর মধ্যমাগণ তাঁহার শ্রুতি বিনোদনের জন্য সুর-তান লয়ে মধুর সঙ্গীত-স্রোত বহাইতেছে। এই সব কাণ্ড দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের ধৈর্য্যভঙ্গ হইল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ শ্রী বাহি গুরুজীকি ফতে" শব্দে চারিদিক্ কম্পিত করিয়া বীরদ্বয় মন্দিরের দ্বারীদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। মন্দির মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। শিখে-মোগলে খণ্ডযুদ্ধ চলিল। অসতর্ক মোগলেরা সহজেই শিখহস্তে নিহত হইল। সেই অকস্মাৎ বিপ্লব নিবারণের জন্য মস্সা টলিতে টলিতে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মহতাব সিংহ লম্ফে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। মস্সা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই মহতাবের করাল অসির আঘাতে তাঁহার মুণ্ড দেহচ্যুত হইল। তখন বীরেরা সেই মুণ্ড লইয়া, অশ্বারোহণে দ্রুত বিকানীর যাত্রা করিলেন। মোগলেরা কোনক্রমেই তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিল না।

যথাসময়ে বিকানীরে উপস্থিত হইলে শিখেরা পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। শিখেরা মস্সার কলঙ্কিত মুণ্ডের

* একে আর একে এগার হয়।"

† কোন ধর্ম্ম মত রক্ষার জন্য যাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন দান করেন, তাঁহারাই 'সাদিক' অর্থাৎ 'মার্টার'।

কিরূপ দশা করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু এই হত্যায় যে শিখ-সমাজ পুলকিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়।

এই ঘটনার পর মহতাবের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। তিনি পঁচিশ জন সহচর লইয়া একটি দল সংগঠন করিলেন। অত্যাচারিত শিখদিগের উদ্ধার করা এবং শত্রুর দম্ভ সাধ্যমত চূর্ণ করাই তখন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তিনি একস্থানে স্থির থাকিতেন না। এমনই সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান নির্দ্দেশ করিতেন যে, মোগলেরা কোনরূপেই তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারিত না।

এদিকে মোগলেরা মস্সার হত্যাকারীর সন্ধান পাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে দক্ষ চর সকল প্রেরণ করিল। হরভকত, নিরঞ্জনী ও রামরন্ধব এই চরদিগের নেতৃ মনোনীত হইয়াছিলেন। "ঘরকা ভেদী লঙ্কা ডাহে।" নিরঞ্জনী অনেকবার শিখদিগের সন্ধান দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্বীয় নিপুণতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। শিখেরাও তাঁহার বুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিত। এবারেও তাঁহার বুদ্ধি জয়যুক্ত হইয়াছিল। তিনি অনতিকালবিলম্বেই রাজসরকারকে জানাইলেন, মিরাণকোটনিবাসী ভাই মহতাব সিংহই মস্সার হন্তা। তিনি আরও বলিলেন, 'মহতাব ভয়ানক দুঃসাহসিক, সে কাহাকেও ভয় করে না। সে কোথায় থাকে না থাকে, কিছুই জানিতে পারি নাই। তাহার কোনরূপই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাহাকে ধৃত করা আমার সাধ্যাতীত।'

ফকির সৈয়দ মীর আলি কমব্রু এই সময় মিরাণকোটের জায়গীরদার ছিলেন। নবাব মীর মৈয়ন-উল-মুল্ক নানা চেষ্টা সত্ত্বেও মহতাবের কোন সন্ধান না পাইয়া শেষে মীর আলিকে ভয় দেখাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। তাঁহাকে জানাইলেন, যে-কোন উপায়েই হউক, মহতাবের সংবাদ দিতে হইবে এবং অপরাধীকে ধরিবার জন্য মোগল-সরকারকে যথোচিত সাহায্য করিতে হইবে; অন্যথা তাঁহার জায়গীর রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

সেনাপতি নুরুদ্দীন এই পত্রসহ সসৈন্যে মিরাণকোটে উপস্থিত হইয়া নগর অবরোধ করিলেন। পত্র পাইয়া জায়গীরদার বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মহতাবের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে তাঁহার চর ঘুরিতে লাগিল। অনতি বিলম্বেই তিনি সংবাদ পাইলেন,—নথে চৌধুরী ভাই মহতাবের আন্তরিক বন্ধু ও তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মের সহযোগী। সে নিশ্চয়ই মহতাবের সংবাদ জানে; কিন্তু সে কিছুই বলিতেছে না। মহতাব মিরাণকোট ত্যাগ কালে নথের নিকট তাঁহার সপ্তম বর্ষীয় পুত্র রায়সিংহকে রাখিয়া গিয়াছেন। নথে সেই পুত্রকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিতেছে।

তখনই মীর আলির আদেশে নথে বন্দী হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। মহতাবের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য মীর আলি নথেকে অনেক প্রলোভন দেখাইলেন; কিন্তু বীর নথে সে সমস্ত উপেক্ষা করিল, সে মহতাবের কোন সংবাদই দিল না। তখন নুরুদ্দীন নথেকে আদেশ করিলেন, 'অবিলম্বে মহতাব-পুত্র রায় সিংহকে রাজদরবারে উপস্থিত কর, নতুবা সবংশে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।'

এই আদেশ পাইয়া নথে বিনাবাক্যে রাজাজ্ঞা পালনে স্বীকৃত হইয়া মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া ক্রীড়ারত সরল বালককে দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এমন সুন্দর নির্দ্দোষ বালক অত্যাচারীর ক্রোধ সম্বরণের জন্য ভস্মীভূত হইবে, এ চিন্তা নথের সহ্য হইল না। তখনই প্রিয় বন্ধুর একমাত্র সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে নথে আপনার পরিবার বর্গের কথা বিস্মৃত হইয়া রায় সিংহকে স্কন্ধে তুলিয়া গুপ্তপথে নগর প্রান্তে উপস্থিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে, নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন কালে মোগল-চর তাহা জানিতে পারিল। নথেও ভাবী বিপদ্ উপলব্ধি করিয়া তথায় কালবিলম্ব না করিয়াই দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল।

ক্রোশ তিন চারি পথ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই নথে দেখিল, মোগলেরা তাহার অনুসরণ করিতেছে। তখন পলায়ন বৃথা জানিয়া রায়সিংহকে সে একটি নিবিড় ঝোপের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া পথে দাঁড়াইল। এই সময় সে নিতান্ত নিরাশ ভাবে বলিয়া উঠে—

"চাক্ কে তকদীর কো মুমকীন
নহী করুণা রফো।
সোজনে তদবীর কো স্যারী
উসর সীতে রহে॥

—যে ভাগ্য একবার ছিন্ন হইয়াছে, সারা জীবন ধরিয়া নানা চেষ্টা করিলেও তাহা আর বেমালুম সারিতে পারা যায় না।"

দেখিতে দেখিতে মোগলেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নথেও একটি সুরক্ষিত স্থানে দাঁড়াইয়া চিন্তামাত্র না করিয়া অজস্র ধারে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার সে বাণাঘাতে অনেকগুলি মোগলকেই চির নিদ্রাভিভূত হইতে হয়। তাহার সে বীরত্বে মোগলেরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ তাহার তুনারে একটি মাত্রও বাণ ছিল, ততক্ষণ কেহ তাহার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু এক ব্যক্তির পক্ষে একটি সুশিক্ষিত বাহিনীর সহিত অধিকক্ষণ যুদ্ধ করা অসম্ভব! অচিরেই নথে রিক্ত-হস্ত হইয়া পড়িল, ফলে মোগলের অসির আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল। 'সাদিক' বীর ধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিল।

বালক রায়সিংহ ঝোপের ভিতর হইতে এই যুদ্ধক্রিয়া দেখিতেছিল। যখন দেখিল, তাহার পিতৃস্বরূপ নথে মোগলের অসিতে দেহত্যাগ করিল, তখন আর সে থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঝোপের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোগলেরা শিকার পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান লুপ্ত হইল। তাহারা তখনই সেই বালককে অস্ত্রাহত করিল। বালক অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। বালককে মৃত বিবেচনা করিয়া মোগল-সৈন্য সগর্ব্বে লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে জনৈক 'শাকওয়ালী' সেই পথ দিয়া যাইবার কালে রায়সিংহকে দেখিতে পাইল। বালককে দেখিয়া রমণীর প্রেমাশ্রু বহিল। সে দেখিল, বালক মূর্চ্ছিত, সেবাশুশ্রূষা করিলে হয়ত বাঁচিতেও পারে। গ্রীবার একাংশ মাত্র কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আঘাত তত সাংঘাতিক

নহে। তথন রমণী সস্নেহে সেই ধূলাবলুণ্ঠিত রক্তাক্ত-কলেবর ক্ষুদ্র বালকটিকে তাহার ‘ঝুড়িতে’ তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। রমণীর ঐকান্তিক ও মাতৃবৎ শুশ্রূষায় কিছুকাল পরে বালক সুস্থ হইল। শুনা যায়, অদ্যাপি ‘ভিড়ী’ গ্রামে রায়সিংহের বংশধরেরা বাস করিতেছে।

নুরুদ্দীনের বৈফল্যে নবাবের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আবার শিখ-হত্যার জন্য ‘আম হুকুম’ প্রচার করিলেন। আবার শিখের উপর নিদারুণ অত্যাচার স্রোত চলিতে লাগিল। নির্দ্দোষ শিখেরা অকারণে নিহত হইতে লাগিল। এই সময় মহতাবের ধর্ম্মভ্রাতা তরুসিংহও ধৃত হইয়া চক্রযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছিলেন। * তাঁহার প্রতি এই অত্যাচারের কথা জানিতে পারিয়া ভাই মহতাব অস্থির হইয়া উঠিলেন। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অচিরে লাহোরে উপস্থিত হইয়া মুমূর্ষু তরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বহুকালের পর দুই ভ্রাতায় মিলন হইল। সে মিলন কত মধুর! মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই ভ্রাতায় কত কথা হইল। বহুকাল পূর্ব্বে উভয়ে একই গুরুর নিকট এক সঙ্গে দীক্ষিত হইয়া শিখ সেবায় নিরত হইয়াছিলেন। তার পর তাঁহাদের কত আশা, কত নিরাশার যুগ চলিয়া গিয়াছে। আজ মৃত্যুর প্রাক্কালে উভয়ে একবার সেই সব কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহারা উভয়ে সমকণ্ঠে ঈশ্বর স্তোত্র ও গুরু মহিমা গান করিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ ভ্রাতৃ সমীপে অবস্থান করিয়া মহতাব সে স্থান ত্যাগ করিলেন। লাহোর পরিত্যাগ কালে কয়েকজন মোগল-শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার কলহ হয়। সে কলহে শাস্ত্রীরা তাঁহার করাল হস্তে দেহত্যাগে বাধ্য হয়। কিন্তু মহতাব চেষ্টা করিয়াও আর পলাইতে পারিলেন না। চর-শ্রেষ্ঠ নিরঞ্জনী কৌশলে তাঁহাকে ধৃত করিয়া নবাব-সমীপে উপস্থিত করিলেন। নবাবকে দেখিয়া মহতাব ‘শ্রীবাহিগুরু’ নিনাদে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিলেন। সে ভীম নাদে নবাবের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। মহতাবকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া নিহত করিবার জন্য তিনি তথনই আদেশ প্রদান করিলেন। হাস্যমুখে বীর সে যন্ত্রণা আলিঙ্গনে তৎপর হইলে কঠোর-হৃদয় নবাবও মুগ্ধ হইলেন। তথন তিনি শিখবীরকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ‘সাদিক’ বীরের হৃদয় কিছুতেই টলিল না। নবাবকে কটূক্তি করিয়া শেষে তিনি বলিলেন—

“জিস মরণে সে জগ ডরে
মেরে মন আনন্দ।
মরতে হীতে পাইয়ে পূরণ
পরম আনন্দ॥

—যে মৃত্যুতে জগৎ ভীত হয়, সেই মৃত্যু আমার আনন্দদায়ক। জীব মৃত্যুমাত্র পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়। তথাপি মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও মানুষ কেন যে ধর্ম্মের জন্য দেহ ত্যাগ করে না, তাহা আমার অবোধ্য।”

তথন নবাবের আদেশ ক্রমে মহতাবকে চক্রযন্ত্রে পেষণ করা হইতে লাগিল। সে

* ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে ‘তরুসিংহ’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পেষণে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। বীর এ যন্ত্রণা সহাস্যে সহ্য করিতে লাগিলেন। “শ্রীবাহিগুরু” ব্যতীত অন্য কোন শব্দ তাঁহার জিহ্বা উচ্চারণ করে নাই। একদিন অনবরত পেষণ করিয়াও তাঁহার মৃত্যু হইল না দেখিয়া, রাত্রির জন্য তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তৎপর দিন আবার তাঁহাকে চক্রযন্ত্রে পেষণ করা হইতে লাগিল। এই দিন তাঁহার জড়দেহ সে অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না। পেষণ কালে বীর অম্লান বদনে পঞ্চভূতে মিশিয়া গেলেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরধাত্রী।

[মিবারের রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর রাজপরিবারের পান্না নাম্নী এক ধাত্রী ছয় বৎসরের কুমার উদয়সিংহকে রাজপ্রতিনিধি বনবীরের নিষ্ঠুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল; সেই ঘটনা অবলম্বনে এই গাথা বিরচিত।]

গৃহে গৃহে ধীরে নিবিয়াছে দীপ
রজনী তিমির-বন্যা,
সুপ্তি যবনিকা নয়নে নয়নে
এসেছে ঘনা’য়ে’লইয়া স্বপনে,
শুধু সে প্রকোষ্ঠে চকিত পরাণে
জাগিছে নীরবে পান্না;
আজিকে নয়নে ঘুম নাই তার,
থেকে থেকে কেঁপে উঠে বার বার,
হৃদয়ে জমাট ভাবনার ভার,
পীড়িত নিভৃত মর্ম্ম,
রয়েছে জাগিয়া বিজনে যখন
নিদ্রিত রাজার হর্ম্ম্য।

গত রজনীর অবসান যবে
দেখেছে ভীষণ স্বপ্ন;—
কোল হ’তে ছিঁড়ি উদয় কুমারে
দুষ্ট বনবীর আঘাতিছে তারে,
ফেলিছে উপাড়ি’ রাজ্য লভিবারে
পায়ের কণ্টক লগ্ন;
অরুণের মত দীপ্ত তেজোময়
বাপ্পারাও বংশ হয়ে গেছে লয়,
কুমার রুধিরে রঞ্জি’ করদ্বয়
রাজা বনবীর লুব্ধ,
দীন প্রজাগণ করে, হাহাকার,
সহায় বিহীন ক্ষুব্ধ।

থাকি’ থাকি’ আজ চমকিছে তাই
ঘুম নাই তার চক্ষে,
বিশ্ব মগন আঁধার অতলে,
রত্নদীপ গৃহে মিটি মিটি জ্বলে,
কর মুষ্টি ’পরে রাখিয়া কপোলে
নীরবে সে বসি’ কক্ষে;
পালঙ্ক শয়নে নিদ্রিত কুমার,
আলো কণাগুলি চুমে মুখ তার,
ঝলকি উঠিছে গলে হেমহার
ছড়া’য়ে হিরণ দীপ্তি,
উপকথা কত স্বপ্নজাল সম,
জড়াইছে তার সুপ্তি।

সহসা পান্না দেখিল চমকি’
পাশে অনুচর ভক্ত,

ভীত নেত্রে তার ব্যথা ব্যাকুলতা,
রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বাক্য জড়তা,
বলিল "আসিছে বনবীর হেথা
লইতে কুমার রক্ত ;"
কুঞ্চিয়া-উঠিল কপালের রেখা,
পান্না সে যেন ছবি সম অ‍াঁকা,
অ‍াঁখি পটে নাই চঞ্চল লেখা
বদনে কথন রুদ্ধ ;
একা বীর যেন দেখে অ‍াঁখিপরে
ভীষণ অসম যুদ্ধ।

ক্ষণতরে পান্না ভাবিল নীরবে
প্রভু সংগ্রামের কথা,
বাপ্পারাও বংশ আসিল স্মরণে,
দেখিল কুমারে হাসিছে স্বপনে,
কেমনে রক্ষিবে কি সাধ্যসাধনে
বিপদ কাণ্ডারী কোথা।
সুপ্ত অচেতন দেখে রাজপুরী,
দেখে নিজ পানে বলহীনা নারী,
ঘাত.কর হাতে ঝলসিছে ছুরি,
একা কি করিবে পান্না !

কি ভাবি, পলকে পুলকি' সহসা
ভাবিল নিজেরে ধন্যা।
নিমেষে আনিল ফলের চাঙ্গারি
স্থাপিল প্রাসাদ কক্ষে,
তারি মাঝে যত্নে রাখিল কুমারে,
ঢাকি' দিল মুখ লতা-পুষ্পভারে,
অনুচর তুলি শিরোপরি তারে
পলায় স্বধাম লক্ষ্যে।
অমনি সহসা খুলি' গেল দ্বার,
ঢুকি' বনবীর "কোথায় কুমার"
শুধাল ; অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহার
দেখাল নিজেরি পুত্রে।
নিমেষের লাগি' নয়ন মুদিল,
ভাসিল শয়ন রক্তে।
ফিরে নাহি চাহি সন্তানের পানে
নীরব অশ্রু মুছিয়া নয়নে
চলে পুণ্যবতী ভৃত্যের ভবনে
কর্ত্তব্য সংগ্রামে জয়ী,
প্রাচীতে তখন হাসে উষারাণী
অরুণ কিরণময়ী।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

"সুন্দর"।

প্রলয়ের তমঃ হতে সৃজিয়া জগৎ
হে সুন্দর, হে শোভন ! ছায়া স্বপ্নবৎ
তুমি ভাত প্রতি অণু পরমাণুমাঝে
নিমিষে নবীন রূপে নব নব সাজে ;
—তাই বিশ্বে এত রূপ, শোভা মনোহর
তোমারি সৌন্দর্য্যে ভরা—হে চির-সুন্দর !

আমার এ বক্ষ জুড়ি প্রলয় আঁধার—
—সংসারের শত ত্রুটি শোক হাহাকার ;
তবু যেন কোথা হ'তে কি আশার বাণী
সচকিত মুগ্ধ শান্ত করে গো পরাণি !—
কি আশ্বাস কত সাধ জন্ম জন্মান্তের
সার্থক করিয়া তোলে স্বপ্ন জীবনের !
—তোমারি আলোকে ভরি' উঠে যে অন্তর,
—হে দৈন্য-সন্তাপ-হর হে চির-সুন্দর !

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

ঘাট-কালী ব্রত কথা।

এখনকার রমণীরা প্রায় চাকুরে স্বামীর সঙ্গেই থাকেন বিরহ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, সেকালে যদিও চাকরীর এত প্রাচুর্য্য ছিল না, কিন্তু বাণিজ্যার্থে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রকেই প্রায় দূরে যাইতে হইত, কখনও কখনও বা এমনও হইত যে বাণিজ্যগামী স্বামী বার "বচ্ছরে"ও দেশে আসেন না। সুতরাং বিদেশের স্বামীকে দেশে আনিবার জন্য দেব দেবীর পূজা অর্চ্চণা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িত। দেবী ভগবতী "ঘাট-কালী" রূপে বিরহিণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

সেকালে গৃহে শ্বাশুড়ী বা বিধবা ননন্দারই অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল, স্বামী উপার্জ্জনকারী হইলেও সংসারে বধূর 'টুঁ' শব্দটি করিবার যো ছিল না, সুতরাং সেকালের দেবীও ব্রতকারিণীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য একটা অসম্ভব কিছু দাবী করিয়া বসিতেন না। "নিরাকালী" দেবীর ন্যায় ঘাটকালী দেবীও এক বিড়া পান ও তদুপযোগী সুপারী চূণ, খয়ের এবং কিঞ্চিৎ সিন্দুর পাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। ঘাটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ব্রতের কাহিনী শুনিতে হয়। ব্রত আরম্ভের পূর্ব্বে, ব্রতকারিণী পাড়াপড়সীকে একবার মাত্র ব্রতের কথা বলিবেন, পাড়াপড়সীদের মধ্যে যাঁহারা দেবীর কোপ নয়নে পতিত হইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা একবার আহ্বানেই ঘাটে ব্রতস্থলে সমাগতা হইবেন ইহাই দেবীর অভিপ্রায়।

ব্রতকারিণী ব্রতের উপকরণ পান সুপারী প্রভৃতি লইয়া ঘাটে উপস্থিত এবং প্রতিবেশিনীগণ সমাগতা হইলে রমণীমণ্ডলীর মধ্যে একজন নিম্নলিখিত কাহিনীটী বলিতে আরম্ভ করেন—।

একছিলেন সদাগর, তার এক ছেলে। ছেলে বড় হল, বে'থা দিলেন, তারপর সদাগর, ও সদাগরপত্নীর কালপূর্ণ হল, তাঁরা মরে স্বর্গে গেলেন। বাপ যে টাকা কড়ি রেখে গেলেন সদাগরের ছেলে তাই খেয়ে দিন গুজরাণ করতে লাগলেন, কিন্তু বসে বসে ঝিনুক মেগে খেলেও রাজার যে গোলা তাও ফুরিয়ে যায়। "স্থাপ্য" (সঞ্চিত) ধনে আর ক' দিন চলে? তাই সদাগর পুত্র বাণিজ্যে যাবার মন কল্লেন। কিন্তু স্ত্রীকে কোথায় রেখে যাবেন? স্ত্রী বামা জাতি সঙ্গে নেওয়া চলে না, তাই মামার বাড়ীতে গিয়ে ছয় মাসের আন্দাজ খোরাক পোষাক দিয়ে স্ত্রীকে রেখে মামীকে বল্লেন "মামী! আমি তোমার বউমাকে তোমার কাছে রেখে গেলুম, আবার ছয় মাস পরে ফিরে এসে একে নিয়ে যাব।" লক্ষ্মী ঠাকরুণের বরে মামাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। গোলায় ধান, গোয়ালে গরু, কৃষাণদের চেঁচামেচীতে বাড়ী জমজমাট, তাই মামীর দেমাকে মাটীতে পা পড়ে না, তিনি মনে ভাবলেন "এ আবার কোন আপদ এসে জুটল"। কিন্তু কি করেন, লজ্জায় পড়ে বউকে রাখ্‌তে স্বীকার করলেন। সদাগর-পুত্র বাণিজ্যে গেলেন। কিন্তু ছ'মাস উতড়ে একবছর হয়ে গেল তবু সদাগর পুত্র বাড়ী আসেন না। দু বছর, চার বছর পার হয়ে গেল তবু সদাগর পুত্রের উদ্দেশ নাই। এদিকে

মামী বউকে যারপর নাই জ্বালা যন্ত্রণা দিতে লাগলেন, দিন রাত গালমন্দ দিতে লাগলেন, তা ছাড়া খেতে দেন পরতে দেন বলে সর্ব্বদাই খোঁটা দিতে লাগলেন। খেতে পরতেই বা দেন কোন ছাই! দিনান্তে পোড়া ভাত পোড়া ব্যঞ্জন খেতে দিতেন, আর ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়ে রাখতেন। সদাগরের পত্নী এ পোড়া প্রাণ আর রাখবেন না এই ভেবে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে বনে বসে কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী শুন্‌তে পেলেন, কে যেন বল্‌ছে "তুই কে কাঁদছিস? ঘাটকালী ঠাকুরাণীর ব্রত যদি করতে পারিস তবে তোর সোয়ামী ঘরে ফিরে আসবে। পাড়াপড়সীকে ডেকে ঘাটে নিয়ে যাবি, এক ডাকের বেশী দু ডাক কাউকে দিবিনে, তাতে যে আসে, যে না আসে। যারা আসবে তাদের নিয়েই ঘাটে ঘাটকালী ঠাকরুণের কথা শুনবি। এক বিড়াপান, সুপারী, খয়ের চূণ আর সিন্দূর নিবি, কথা শোনা হলে সকলকে প্রসাদ দিবি।" তিনি এই শুনে ব্রত করবেন ভাবলেন। কিন্তু এ সকল উপকরণ কোথা পাবেন? মামীশ্বাশুড়ী যে রায়বাঘিনী—বাপরে তার কাছে চাইলে কি আর রক্ষা আছে? কোন জিনিস তো দেবেই না আরো বার কথা শুনিয়ে দেবে, তার চাইতে ভিক্ষে করে নেওয়া ভাল। তাই ভেবে তিনি পাড়াপড়সীর বাড়ী গেলেন, একবাড়ী গিয়ে দেখেন, যে বাড়ীর বউরা পান খাচ্ছে, তিনি তাদের কাছে দুটো পান চাইলেন। তারা তো তাঁকে দেখেই দুর ছাই করে উঠলো, আর বলতে লাগলো "ওমা মাগীর রঙ্গ দেখ, পেটে ভাত নেই "নেঙ্গে" (কটিতে) কাপড় নেই, বার বচ্ছরে সোয়ামী খোঁজ করে না, তার আবার পান খাবার সখ দেখ।" বুড়ীরা বল্লে "আলো বাছারা, খেতে চায় দুটো পান দেনা"। তার পর সদাগরের স্ত্রী সেখান থেকে দুটো পান নিয়ে এলেন। এক পান চাইতেই এই, চূণ খয়ের চাইলে হয়তো ঝাঁটা নিয়েই উঠবে। তাই অন্য বাড়ীতে চূণ খয়ের আনতে গেলেন। সকল বাড়ীতেই তাঁকে "দূর দুর ছাই ছাই" করে কিছু কিছু দিলে, তিনি তাই নিয়ে ঘাটে ব্রত কর্‌তে গেলেন। পাড়া পড়সীকে ডাকলেন, মামী শ্বাশুড়ীকে ডাকলেন তিনি এলেন না, বল্‌লেন "আমার গোলে গরু রয়েছে, হাতী শালায় হাতী রয়েছে, দাসী নফর ঘুমিয়ে রয়েছে, সোয়ামী পুত্তুর শুয়ে আছে, ওমা! আমি কি এখন ও সব বাজে কাজে মন দিতে পারি। বউ একাই ঘাটে গিয়ে ঘাটকালী ঠাকরুণের ব্রত করলেন, কথা শুনলেন, ব্রতের পর সকলকে সিন্দুর পরিয়ে দিলেন, প্রসাদ বেটে দিলেন। কিন্তু স্বামী বাড়ী এলে যে আবার ব্রত করবেন, কথা শুনবেন, ব্রত শেষে ঘাটকালী ঠাকরুণকে প্রণাম করে সে কথা আর বললেন না। ওদিকে ঘরে গিয়ে দেখেন, উঠানে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে মামী শ্বাশুড়ী চীৎকার করে কাঁদছেন। তাঁর হাতীশালে হাতী মরে রয়েছে, দাসী নফর ঘরে মরে রয়েছে। ওঁকে দেখেই শ্বাশুড়ী বল্লেন "ওলো ডাইনী তোকে ঘরে জায়গা দিয়েই আমার এই সর্ব্বনাশ হল, ঘাটে গেলি, বিড় বিড় করলি, তাই শুনলেম না বলেই আমার এ দশা হল। বউ বল্লেন, ঠাকরুণ! তুমি ঘাটকালী ঠাকরুণকে তুচ্ছ করেছ বলেই

তোমার কপাল পুড়েছে, এখন ওঠ, ঘাটে গিয়ে পান সুপারী দিয়ে ব্রত কর, কথা শোন, তবেই আবার সব বেঁচে উঠবে এখন।" উনি তাড়াতাড়ি উঠে পান সুপারী নিয়ে ঘাটে গেলেন, কথা শুনলেন, সোয়ামী পুত্তুর, দাসী নফর সব বেঁচে উঠুক বলে প্রার্থনা করলেন। বাড়ীতে এসেই দেখেন আবার সব বেঁচে উঠেছে।

এদিকে ঘাট কালী ঠাকুরাণীর বরে সদাগর ধনে রত্নে তাঁর ডিঙ্গা বোঝাই করে দেশে এলেন। পাড়াপড়সীরা সব দৌড়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে খবর দিলে "ওলো তোর সোয়ামী বাণিজ্য করে দেশে ফিরে আসছে। তাই শুনে তিনি তাড়াতাড়ি ঘাটে গেলেন, কিন্তু সর্ব্বনাশ! অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল, ঘাটে এসেই ভরা নৌকা সদাগর্ পুত্রকে নিয়ে ডুবে গেল। তখন সদাগরের স্ত্রী হায় কি হল বলে কাঁদতে কাঁদতে যে বনে প্রথমে দৈববাণী শুনতে পেয়ে ঘাটকালী ঠাকরুণের ব্রত কয়েছিলেন সেই বনে যেয়ে হত্যা দিয়ে পড়লেন। ঘাটকালী ঠাকরুণ আবার দৈববাণী করলেন। "হরকৎ" (কষ্ট) না দিয়ে কেবল "বরকৎ" (সুখসৌভাগ্য) দিলে নরলোকে দেবদেবীকে গ্রাহ্য করে না। যে ব্রতের ফলে সোয়ামী দেশে এল, সোয়ামীকে দেখে তার কথা আর মনে করলে না, মনস্কাম পূর্ণ হলে ব্রত করবে, এরূপ অঙ্গীকার করলে না। তাই তোমার সোয়ামীকে ঘাটে ডুবিয়েছি। সদাগর ঘরে এলে আবার ঘাটকালী ঠাকরুণের ব্রত করবে, কথা শুনবে এরূপ প্রার্থনা কর, স্বামীকে ফিরে পাবে। তিনি তাই তাড়াতাড়ি ঘাটে গিয়ে ঘাটকালী ঠাকরুণকে উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লেন, ঘাটকালী ঠাকরুণ! ভরা সহ আমার স্বামী ফিরে আসুক, আমি পাঁচ বিড়ে পান দিয়ে তোমার ব্রত কর্‌বো। কথা শুন্‌বো।" অমনি স্বামী বেঁচে উঠলেন, তাঁর ডিঙ্গে ভেসে উঠলো, সদাগরের স্ত্রী বাণিজ্যের দ্রব্য বরণ করে ঘরে নিলেন। তারপর পাঁচ বিড়ে পান, সুপারী চূণ খয়ের ও সিন্দুর প্রভৃতি আনলেন, পাড়া পড়সীকে ডাকলেন, এক ডাকে যে এল সে এল, যে না এল না এল, তার পর ব্রত করলেন, কথা শুনলেন মনস্কাম পূর্ণ হলে সকলেই ব্রত কর্‌বেন এরূপ অঙ্গীকার করে গেলেন।

ঘাটকালী ঠাকরুণের বরে সদাগরের আর কোনই অভাব রইল না। দেশের লোক ঘাটকালী ঠাকুরাণীর অপার মহিমার কথা শুনে সকলেই ব্রত কর্‌তে লাগলেন। দেশে ঘাটকালী ঠাকুরাণীর ব্রত প্রচলিত হল।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া।

বাসবদত্তা।*

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে যে কয়টী বরেণ্যা রাজরাণা বা মুগ্ধা নায়িকার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই প্রায় একই প্রকৃতির। তাঁহাদের চরিত্রের উপাদানগুলির মধ্যে কিছু ইতর-বিশেষ থাকিলেও, তাঁহারা যে এক ছাঁচ হইতে গঠিত, অল্পায়াসেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু বাসবদত্তাকে সেইরূপ একই পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায় না। বাসবদত্তা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এই চরিত্রে কবি পরস্পর বিরোধীগুণগুলি এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে এমন একটি সমবায় স্থাপিত হইয়াছে, যে তাহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। তেজস্বিতার সহিত কোমলতা, দৃঢ়তার সহিত নম্রতা এবং শাসনের সহিত স্নেহ একাধারে মিলিত হইয়া বাসবদত্তা-চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

'রাজরাণী' বলিলে আমাদের মনের যে গৌরবদৃপ্ত মহীয়ান্ চিত্র ফুটিয়া উঠে, বাসবদত্তা তাহারই প্রতিবিম্ব। তজ্জন্য সর্ব্বত্রই তাঁহাকে মহানুভবা ও আত্মমর্য্যাদারক্ষণে যত্নশীলা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনপ্রকার লঘুতা বা কোনরূপ চাপল্য যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ভয় করে। কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে পারা যায়, 'মহত্ত্ব যেন সে বাঁধা নিগড়ে!'

নাটিকার প্রথমাঙ্কের প্রারম্ভে আমরা বাসবদত্তাকে দেখিতে পাই না। রাজা বসন্তকের সহিত পুরবাসীদের বসন্তোৎসব দেখিতেছেন। মধুপানে মত্ত-কামিনী, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত আবির কুঙ্কুম, প্রক্ষিপ্ত পটবাস, সুবর্ণালঙ্কার, পলাশপুষ্পমালা;—নৃত্য, গীত, বিলাস, বিভ্রম ও উচ্ছৃঙ্খল আমোদপ্রমোদে সর্ব্বত্র মুখরিত!—এই সকল বিলাস-সুখসেব্য পদার্থ দেখিতে দেখিতে যখন দর্শকের নয়ন ক্লান্ত, কর্ণ পরিশ্রান্ত এবং চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিয়া কবি তাঁহার নির্ম্মাণ কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

বাস্তবিকই বসন্তোৎসবের উদ্দাম বিলাস লীলার মধ্যে বাসবদত্তার একটি সংযত পবিত্র ভাব আমাদের হৃদয় মুহূর্ত্তে অধিকার করিয়া ফেলে। যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য্যে আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, তখন মকরন্দোদ্যানে দেবপূজার্থিনী রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রবেশ কিরূপ তৃপ্তিপ্রদ ও রমণীয়! ব্রত নিয়মে ক্ষীণাঙ্গী, সদ্যস্নাতা, সেই কুসুমসুকুমার দেবীমূর্ত্তি আমাদের চিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়!

সিন্ধু মধ্যে নিমজ্জিত কোন উত্তুঙ্গ শৈল যেরূপ স্বীয় মস্তক উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করে, চারিদিকে শততরঙ্গ আসিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় কিন্তু সে তিলমাত্রও বিচলিত হয় না, তাহার উন্নত শির ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি অবিকৃত থাকে, সেইরূপ সংসারে থাকিয়াও বাসবদত্তা আপনার উচ্চ লক্ষ্যের

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত।

প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়াছেন। চারিদিক হইতে অসংযত ভাবস্রোত আসিয়া তাঁহাকে কোনরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

এই অঙ্কে বাসবদত্তার সম্বন্ধে আর দুইটি কথা জানিবার আছে। বাসবদত্তা যথার্থ প্রণয়শালিনী ও পতিব্রতা রমণী। তিনি স্বামীর দুর্ব্বলতা বিশেষরূপে জানিতেন। তজ্জন্যই অসামান্যরূপে লাবণ্যসম্পন্না সাগরিকাকে সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষের অন্তরালে রাখিতেন। মদনপূজার দিবসে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তিনি অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সাগরিকাকে কোন কার্য্যব্যপদেশে অন্তঃপুরে যাইতে আদেশ করেন। স্বামীর প্রতি যে এই বিশ্বাসের অভাব ইহার জন্য উদয়নই দায়ী। দর্পণে বিম্বিত মুখমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার চরিত্র বাসবদত্তার অধিগত ছিল। তাই পতনের পথ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বাসবদত্তার এই ব্যগ্রতা ও প্রয়াস।

লঘুপ্রকৃতির হইলেও, উদয়ন রাজবংশ-সম্ভূত। প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে না পারিলেও, তিনি তাঁহার মহিষীর মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্ভ্রম করিতেছিলেন।

দেবপূজায় অত্যন্ত-ব্যাপৃতা মহিষীকে তিনি যে প্রণয় কথা বলিলেন তাহার মধ্যে কবিত্ব আছে কিন্তু প্রাণ নাই। বাসবদত্তা যথার্থ প্রেমিকা সেইজন্য তাঁহার একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার নীরবতাই যেন রাজাকে নীরবে তিরস্কার করিল। ভূদেববাবু যথার্থই বলিয়াছেন—'বাসবদত্তার প্রকৃতি উদয়নের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উদয়ন তাঁহার বশ কিন্তু তত প্রেমে নহে—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকৃতিবশতঃ, কিছু ভয়ে অনেকটা ভক্তিতে ও কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমে।'

বাসবদত্তার ন্যায় অমূল্য কণ্ঠহার লাভ করিয়াও, উদয়ন সম্যকরূপে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। বাসবদত্তার সকল যত্ন ব্যর্থ হইল। মদনদেব অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই পূজার দিনেই সাগরিকার হৃদয়ে শরসন্ধান করিলেন। রাজার পক্ষেও তাঁহার মনোমত নায়িকা পাইবার অবসর ঘটিল। দ্বিতীয় অঙ্কে, কবি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সাগরিকার সহিত রাজার মিলন সুগম করিয়া তুলিয়াছেন।

অনুচ্চ মধুর রবে সারিকা রাজাকে তাঁহার নবানুরাগিনীর সন্ধান বলিয়া দিলে, তাঁহার হৃদয় বহুকাল-পোষিত ও আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় সমাগমের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিদূষকের সহিত অন্যমনস্কভাবে কদলীগৃহে প্রবেশ করিয়া, রাজা সাগরিকার চিত্র দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলেন;—সাগরিকা স্বয়ং রাজার সে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে! ইহাতে সাগরিকার মনোভাব রাজার অগোচর রহিল না। সারিকা নিপুণা দূতী, পূর্ব্বে তাহার বাক্যে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন।

এদিকে বানরভয়ে পলায়িতা সুসঙ্গতার সহিত চিত্র আনয়নের জন্য সাগরিকা পুনরায় কদলীগৃহের নিকটবর্ত্তিনী হইলে, রাজার সহিত বসন্তকের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। সুসঙ্গতার কৌশলে ও সহায়তায় এইরূপে নবীন প্রণয়ী যুগলের প্রথম মিলন সম্পাদিত হইল!

এই চিত্রে, কন্বাশ্রমে প্রথম প্রণয় মিলন

স্মরণ হয়, এবং অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদার ছায়া যেন সুসঙ্গতায় ঈষৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই প্রথম মিলনের সময় সাগরিকা সখীর প্রতি কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে বিদূষক ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল ইনি যে দ্বিতীয়া দেবী বাসবদত্তা! বাসবদত্তার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র, রাজা সচকিতে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ করিলেন, সুসঙ্গতা ও সাগরিকা উভয়েই তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাসবদত্তার প্রভাব এই একটিমাত্র কথায় পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে!

সত্য সত্যই বাসবদত্তা পরক্ষণে পরিচারিকার সহিত উপস্থিত হইলেন। কবি এই স্থলে বাসবদত্তাচরিত্রের আর এক অংশ উদ্ঘাটিত করিবার সুযোগ পাইলেন। বাসবদত্তা স্বভাবতঃ গম্ভীরা হইলেও, কখনও কখনও নর্ম্মসখীর ন্যায় তৃপ্তিদায়িনী। রাজার বনমালিকা ও রাণীর মাধবীলতা—ইহার মধ্যে কাহার আগে ফুল ফুটিবে, ইহা লইয়া একটি পণ রাখা হয়। রাজার হারিবার উপক্রম হয়, এমন সময়ে তিনি এক সাধুসন্ন্যাসীর নিকট হইতে একটা কৃত্রিম দোহদ সংগ্রহ করিয়া সংলগ্ন করিবার পরই তাঁহার মাধবীলতায় প্রথমে ফুল ধরিল;—রাণী সেই উপলক্ষে রাজার নিকট আসিয়াছিলেন। তৃতীয়াঙ্কের আর একটি ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ যোগ্য। ছদ্মবেশে যখন রাণী সাগরিকার প্রতি রাজার সুস্পষ্ট অনুরাগ বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি চরণে পতিত মহারাজকে হস্তের দ্বারা নিবারণ করিয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই আর্য্যপুত্রের প্রথম অপরাধে তাঁহার এরূপ আচরণ অনুচিত হইয়াছে বলিয়া বাসবদত্তার অনুশোচনা উপস্থিত হয়। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, সহচরী কাঞ্চনমালাকে আবেগভরে বলিয়া ফেলিলেন, 'অলক্ষিতে পশ্চাৎদিক হইতে কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিব!'

বাসবদত্তা রাজার মুখের ভাব দেখিয়া আর সেই ফুল দেখিতে গেলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বসন্তকের নির্ব্বুদ্ধিতায় যে চিত্র তাহার সম্মুখে পড়িল তাহা দেখিয়া তাঁহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। কোন্ সাধ্বী স্ত্রী প্রিয়তমের সহিত অন্য রমণীকে একই চিত্রে অঙ্কিত দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন? রাজা, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও, বাসবদত্তা বিনয়ের সহিত বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র, আপনি অন্যরূপ ভাবিবেন না—সত্যই আমার শিরঃপীড়ায় কষ্ট হইতেছে। আমি গমন করি'। এইরূপ সময়ে, বিনয় রক্ষা করা কত কঠিন, প্রভূত হৃদয়বল ভিন্ন এরূপ আত্মদমন একরূপ অসম্ভব। রাজা বাসবদত্তার ভাবানুবন্ধ গোপনের যে সুন্দর চিত্র দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

ভ্রুভঙ্গে সহসোদ্গতেঽপি বদনং
নীতং পরাং নম্রতা-মীষন্মাং প্রতি
ভেদকারি হসিতং নোক্তং বচো নিষ্ঠুরম্।
অন্তর্বাষ্পজড়ীকৃতং প্রভুতয়া চক্ষুর্ন
বিস্ফারিতৎ কোপশ্চ প্রকটীকৃতো
দয়িতয়া মুক্তশ্চ ন প্রশ্রয়ঃ॥

দ্বিতীয় অঙ্কে বাসবদত্তা কেবল চিত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয়াঙ্কে এতদপেক্ষা কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে কবি তাহাকে ফেলিয়াছেন। সাগরিকার অভিসার এই অঙ্কের

প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। এই অভিসারের প্রধান উদ্যোক্তা সুসঙ্গতা ও বসন্তক। এইরূপ স্থির হইয়াছে, সুসঙ্গতা কাঞ্চনমালার ও সাগরিকা বাসবদত্তার বেশে সন্ধ্যার সময়ে মাধবীলতামণ্ডপ নামক সঙ্কেতগৃহে উপস্থিত হইবে। বাসবদত্তার বেশে যাইতে হইলে তাঁহার পরিহিত পরিচ্ছদ চাই—কিন্তু তাহার জন্য কিছু ভাবিতে হইল না, কেন না সেই দিবসেই বাসবদত্তা, প্রসাদের চিহ্নস্বরূপ, তাহাকে একটা পুরাতন বেশ দিয়াছেন। দাসদাসীদের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ বাসবদত্তার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। কিন্তু সুসঙ্গতা দেবীর এই অনুগ্রহ কি সুন্দর সদ্ব্যবহারে নিয়োজিত করিল! মদনিকা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হতভাগিনী সুসঙ্গতা তুই একেবারে গিয়াছিস, পরিজন বৎসলা দেবীকে এরূপ বঞ্চনা করছিস!"

রাজা অসুস্থ এই সংবাদে তিনি ব্যাকুলা হইয়া কাঞ্চনমালাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার বিলম্ব দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না আবার মদনিকাকে পাঠাইলেন! কিরূপ উদ্বিগ্ন সদয়ে দাসীর পর দাসী পাঠাইয়া স্বামীর কুশল প্রার্থিনী হইয়া বাসবদত্তা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে রাজার এতদূর অধঃপতন হইতে পারে, কিম্বা সাগরিকা তাহার আশ্রয় দাত্রীর সর্ব্বনাশে সমুদ্যতা হইবে। বুদ্ধিমতী কাঞ্চন মালা রাজার রোগের বিষয় এবং তাহার প্রতিকারের উপায় সকলেই জানিয়া আসিয়াছিল। সে যখন এ সকল ভর্ত্রীপদে নিবেদন করিল তখন তাঁহার পবিত্র উচ্চহৃদয় কিছুতেই যেন এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। বাসবদত্তা অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "হঞ্জে, কঞ্চনমালে, সচ্চং জ্জেব্ব মহ বেঅধারিণী ভবিঅ সাঅরিআ অজ্জউত্তং অহি সরিস্সদিত্তি।" কাঞ্চনমালা, সত্যই কি সাগরিকা আমার বেশ ধারণ করিয়া আর্য্যপুত্রের নিকট অভিসারে গমন করিবে? কিন্তু এ সন্দেহ ভঞ্জন করা অতি সহজ, গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হয়। ফলে তাহাই ঘটিল। বাসবদত্তা কাঞ্চনমালাকে লইয়া সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে বসন্তক তাঁহাদিগকে সুসঙ্গতা ও সাগরিকা মনে করিল! রাজা ও এই ভ্রমে পড়িলেন—তিনি সাগরিকা ভ্রমে বাসবদত্তার প্রতি যে সকল অত্যুক্তি করিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল! তিনি সাশ্রুনেত্রে কাঞ্চনমালাকে জনান্তিকে কহিলেন, কঞ্চনমালে এব্বং স অং মন্বেদি অজ্জউত্ত।" পুনোবি কহং মং আলবিস্সদিত্তি অহো অচ্চরিঅং। কাঞ্চনমালা, আর্য্যপুত্র স্বয়ংই এইরূপ আলাপ করিতেছেন! আমার সহিত কিরূপে পুনরায় আলাপ করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু সাহসিক পুরুষদের পক্ষে সকলই সম্ভব—বাসবদত্তার পক্ষে এই লজ্জাপ্রকাশ কি সুন্দর ও স্বাভাবিক!

এখন আর কোন সন্দেহই রহিল না—অসীম ধৈর্য্যের সহিত, রাজার সাগরিকার প্রতি প্রেমোক্তি শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। যখন শূন্যগর্ভ ভাবোচ্ছ্বাস তাহার নিতান্ত অসহনীয় হইল, তখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন! আর্য্যপুত্র, আমি সত্যই সাগরিকা, আপনি সাগরিকার

প্রেমে বিহ্বল হৃদয় হইয়া সকলই সাগরিকাময় দেখিতেছেন!’ বিদূষক দুষ্ট বুদ্ধিতে বৃহস্পতি! সে বাসবদত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আপনি মহানুভাবা প্রিয়বয়স্যের এই এক অপরাধ ক্ষমা করুন। বাসবদত্তা যে প্রত্যুত্তর দিলেন, তদপেক্ষা সুন্দর উত্তর আর হইতে পারে না। ইহার একদিকে শ্লেষ অন্যদিকে প্রেমাস্পদের প্রতি অভিমান।

‘আর্য্য বসন্তক, প্রথম সমাগম্ সময়ে বিঘ্নের কারণ হইয়া, আমিই অপরাধী;—আর্য্যপুত্রের কোন অপরাধ নাই।”

চরণে পতিতা মহারাজকে রাণী হস্তদ্বারা নিবারণ করিয়া চলিয়া গেলেন! কিন্তু তাঁহার পশ্চাত্তাপ হইল। হাজার হউক স্বামী, আর এই তাঁহার প্রথম অপরাধ। হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা প্রকাশের জন্য রাজা লজ্জিত ও সন্তপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ অনুমান করিয়া বাসবদত্তা পুনরায় সেইস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি পশ্চাদিক হইতে কণ্ঠ-গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিবেন,—এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন রাজা সাগরিকার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন! অবলীলাক্রমে প্রেমোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিতেছেন, “বাসবদত্তাকে আমি সেবা করি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি।” এই অপ্রত্যাশিত নিদারুণ দৃশ্য তাঁহাকে কি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিল! তিনি কিছুতেই এই অন্যায়ের আর প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। মহীয়সী রাজ্ঞীর মত সসম্ভ্রম গাম্ভীর্য্যে রাজাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন, বিদূষক পুনরায় মিথ্যাকথায় দোষ ঢাকিবার চেষ্টায় বলিল, “দেবি, আপনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিতেছেন বেশের সাদৃশ্যহেতু এই ভ্রমে পতিত হইয়া আমি প্রিয়বয়স্যকে এখানে আনিয়াছি। যদি আমার বাক্যে বিশ্বাস না হয় এই লতাপাশ দেখুন।”

মানুষ যে কতদূর নির্লজ্জ হইতে পারে বসন্তকই তাহার প্রমাণ! দেবী সকল জানিতে পারিয়াছেন, স্বকর্ণে সকল শুনিয়াছেন, তথাপি সে এইরূপ মিথ্যাকথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না! বাসবদত্তা এইরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন ‘কাঞ্চনমালা, এই লতাপাশে বন্ধন করিয়া এই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া লও। আর এই দুর্ব্বিনীতা কন্যাকে অগ্রে লইয়া চল।’ এই সময় রাজ্ঞীর এক মহিমাদীপ্ত মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে।

শেষ অঙ্কে, বাসবদত্তার চরিত্রের পরিণতি ও পূর্ণবিকাশ। দেবচরণে উৎসর্গীকৃত নির্ম্মাল্যের ন্যায় বাসবদত্তার মহান্ স্বার্থত্যাগে এই অঙ্ক সমুজ্জ্বল।

এই অঙ্কের প্রথমেই হৃষ্টচিত্ত বসন্তকের সাক্ষাৎ পাই। দেবীর কৃপায় তাহার মুক্তি-ঘটিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ব্রাহ্মণ খাইতে বড় ভালবাসে তাই মুক্তির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে খাদ্যাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছেন। অধিকন্তু, পট্টবস্ত্রযুগল ও কর্ণাভরণ সে পাইয়াছে! নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণকে ত বাসবদত্তা মুক্তি দিলেন। কিন্তু সাগরিকাকে লইয়া একটু বিপদে পড়িলেন। তাহাকে মুক্ত—অবস্থায় রাখিতে সাহসে কুলায় না! আর সাগরিকার কি গুরুতর অপরাধ! সে কোন্ সাহসে তাহার আশ্রয়দাত্রীর জীবন সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে সাহসী হয়? যে দিন অনাথিনী

সাগরবক্ষ হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইয়া সহায়হীন, সম্পদহীন, বন্ধুহীন অবস্থায় যৌগন্ধারায়ণ কর্ত্তৃক বাসবদত্তার হস্তে সমর্পিত হয় সে দিনের কথা কি সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে! বাহিরে যে লাজনম্রা, সরলা স্বল্পভাষিণী তাহার ভিতরে একি দুষ্টবুদ্ধি। বাসবদত্তা স্বভাবতঃ নিষ্ঠুরা নহেন, কিন্তু ঘটনাধীনে তাঁহাকে নিষ্ঠুরা করিয়া তুলিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া, সাগরিকাকে তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে একটি নিভৃতকক্ষে নিগড়সংযতা করিয়া রাখিলেন। একটা জনপ্রবাদ রটিয়া গেল যে দেবী সাগরিকাকে উজ্জয়িনী পাঠাইয়াছেন। এই জনপ্রবাদের অর্থ এই মনে হয় যে, সাগরিকা যতই অপরাধিনী হউক না কেন, তাহাকে চিরকালের জন্য এরূপ ক্লেশ দেওয়া বাসবদত্তার অভিপ্রায় নয়, শীঘ্রই পিতৃগৃহে উজ্জয়িনীতে পাঠাইবেন কিন্তু তাহার জন্য বিশ্বস্তলোক ও সুবিধা আবশ্যক, এতাবৎকাল তাহাকে বন্দিনী করিয়া রাখা ভিন্ন অন্য উপায় কি?

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে অচিরাৎ সাগরিকার মোচন হইল। উজ্জয়িনী হইতে এক ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত। ইহার মধ্যেও যৌগন্ধারায়ণের হাত ছিল। উজ্জয়িনী বাসবদত্তার পিত্রালয়, সুতরাং তাহার যথেষ্ট সমাদর হইল। সে নানারূপ ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। রাজা ও রাণী একত্রে দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া নিবেদন করিল, ‘সিংহলেশ্বর বিক্রম-বাহুর অমাত্য বসুভূতি আসিয়াছেন।’ বাসবদত্তা অন্য নারীর ন্যায় ঐন্দ্রজালিকের অভিনয় দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন না। প্রয়োজনের গুরুত্বে আপনার কৌতূহলী চিত্তকে তৎক্ষণাৎ দমন করিয়া কহিলেন—“আর্য্যপুত্র, মুহূর্ত্তের জন্য ইন্দ্রজাল থাক্, মাতুলকুল হইতে অমাত্যপ্রধান বসুভূতি আসিয়াছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন্।’ তাঁহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ঐন্দ্রজালিক অনুরোধ করিল “আপনাদের আমার একটি বিশেষ ক্রীড়াভিনয় দেখিতে হইবে।”

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ অন্তঃপুরে অগ্নি সমুত্থিত হইল। এই আকস্মিক অগ্নি যথার্থ অগ্নি নহে, এ কেবল সেই ঐন্দ্রজালিকের বিশেষ খেলার অভিনয়। রাজা রাণী ও অন্য সকলেই সত্য অগ্নি ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ সাগরিকার জন্য রাণীর বড় ভয় হইল, সে বন্দিনী, পলাইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। বাসবদত্তা তখন রাজাকে সাগরিকার প্রাণ রক্ষার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। সাগরিকার জীবন রক্ষার জন্য, তিনি স্বামীর জীবন বিপন্ন হইলেও দৃক্পাত করিলেন না। এই ঘটনা হইতেও বুঝা যায়, যে সাগরিকার প্রাণহরণ বা তাহাকে কোনরূপ গুরুতর ক্লেশ দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। পতিব্রতা বাসবদত্তা স্বামীর চরম বিপদ হইলে তাঁহার অনুগামিনী হইবেন ইহাও স্থির করিলেন।

সাগরিকার উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিও অন্তর্হিত হইল। তখন সকলেই বুঝিলেন ইহা ইন্দ্রজাল! এতদিবসের প্রচ্ছন্ন রহস্য আজ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বাসবদত্তা জানিলেন, তাঁহাদের সাগরিকা সিংহলশ্বরের কন্যা রত্নাবলী! সম্পর্কে তাঁহারি এক প্রকার ভগিনী।

ভাবিয়া দেখিলেন—এই মুকুলিতযৌবনা রত্নাবলীর অপরাধ কি! দৈবদুর্ব্বিপাকে সমুদ্রে যান মগ্ন হওয়ায় সে অনাথিনীবেশে আসিয়াছে এই কি তাহার অপরাধ!" রাজরাণী হইতে আসিয়া তাহার ভাগ্যে এমন ঘটিয়াছে। সে আবার বাগ্‌দত্তা—উদয়ন ভিন্ন অন্য পতি বরণ করিলে পাতিব্রত্যধর্ম্মে পতিতা হইবে। রাজার কুমারী, পরিচারিকা হইয়া আছে—মুখ ফুটিয়াও কিছু বলিবার যো নাই। যদি অনুকূল ঘটনাধীনে রাজার সহিত মিলন হইয়াছে, তবে এ মিলনে আমি কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?

ভাবিয়া, আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। সাগরিকার বিষয় পূর্ব্বে কিছু জানিতেন না এক্ষণে জানিতে পারিয়া তাঁহার দারুণ মর্ম্ম-পীড়া জন্মিল। ভগিনীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ, বৃশ্চিকের ন্যায়, তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। অজ্ঞাতসারে তিনি যে দোষ করিয়াছেন তাহার জন্য কি গুরুদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন! ভাবাবেগরুদ্ধ হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনারাশি তুচ্ছ করিয়া, সকল কামনা, সকল বাসনা নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি যে অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ দেখাইলেন তাহা একান্তই দুর্লভ! যেরূপ প্রশান্তভাবে তিনি সাগরিকাকে রাজার হাতে সঁপিয়া দিলেন তাহা কেবল অনুভবের যোগ্য, বর্ণনা করিয়া বুঝান অসম্ভব!

পরিশেষে 'মিলন' থাকিলেই যে 'কমেডি' হয় না, রত্নাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই মিলনের অন্তরালে কি আমরা বাসবদত্তার অন্তর্নিহিত বেদনা দেখিতে পাই না? আয়েষা কিম্বা রেবেকা অপেক্ষাও বাসবদত্তার দুঃখ অধিক; কেন না প্রেমস্বর্গচ্যুত হইয়া, প্রেমাস্পদের নিকটে রহিয়া, পলে পলে নীরবে যে মর্ম্মভেদী যাতনা সহিতে হয়—সে যাতনা তাঁহাদের সহিতে হয় নাই। কিন্তু এই বেদনার মধ্য হইতে ত্যাগের কি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে! বাসবদত্তার এই অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনে রত্নাবলী নাটিকার সকরুণ সমাপ্তি।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যুর প্রতি।

হে শঙ্কর, মৃত্যু মম! কোন তপস্যায়
মগ্ন তুমি হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে,
শ্রবণে পশে না তব ব্যাকুল হিয়ায়
ডাকিছে শঙ্করী তোমা নিশিদিন ধরে'?

তার অন্তরের দীপ্ত অভিলাষ রাশি
হে ধূর্জ্জটি; প্রেমময়, মঙ্গল-নিলয়,
ধ্যেয় পদার্থের সম উঠেনা বিকাশি'
বারেক উদ্‌ভ্রান্ত করি প্রশান্ত হৃদয়?

তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব, কার তরে তব
অদৃষ্ট অশ্রুতপূর্ব্ব কঠোর সাধনা;—
সতী সে যে গৌরীরূপ লভি অভিনব
করিছে সমগ্র প্রাণে তোমারি কামনা!

মায়াময়! রাখ মায়া, রাখ রুদ্র খেলা—
মহামায়া পদপ্রান্তে কাঁদিছে একেলা!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

রূপার কাটির জয়।

মার্ক টোয়েনের গল্পাবলম্বনে।

আমি একদিন সকালবেলা থেকে কেমন একটা অবোধ্য অবাচ্য আনন্দ-উল্লাস অনুভব কচ্ছিলাম। এই স্বদেশীর দিনেও আমার বিলাতী নেশা কাটেনি। আমি একটা বিলাতী সিগার ধরিয়ে ধোঁয়া ফুঁকে ফুঁকে ঘরময় বেড়িয়ে বেড়িয়ে গুন্ গুন্ করে' গান গাইতে আরম্ভ কোল্লাম। সে গানের না ছিল ছন্দ, না ছিল সুর, না ছিল তাল মান—কেবল আমার মনের অস্ফুট আনন্দোল্লাস এই অস্ফুট অপরিণত গান হয়ে' আমার মনের লঘুতা জ্ঞাপন কচ্ছিল। মনের লঘুতার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও কেমন লঘু বোধ হচ্ছিল,—আমার কেমন নাচতে ইচ্ছে কচ্ছিল। আমি ঠিক নাচিনি, তবু ঘরময় ঘুরপাক খেয়ে, ধোঁয়া ফুঁকে, প্রাণটাকে ধোঁয়ার মতই অস্পষ্ট লঘু মনে হচ্ছিল।

এমন সময়ে ডাক হরকরা কতকগুলো চিঠি দিয়ে গেল। উল্লাসিত লঘুচিত্ত একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে' উঠল, চিঠির মধ্যে এ কার হস্তাক্ষর?—সে আমার বোঠান নীরজার।

নীরজা আমারই পল্লীবাসিনী, প্রতিবেশিনী, আমার শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গিনী; সে আমার চেয়ে ৫।৬ বছরের বড়; তবু আমি ছেলেবেলা থেকে তাকে বড় ভালবেসেছি। আমার জীবনে পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাউকে কখন ভালবেসেছি কি না জানি না; বুঝি বাসিনি! তারা যদি সব এক দিনে আত্মহত্যা করে, কি নৌকাডুবি হয়, তবে আমার দুঃখ ত' হয়ই না, খুব সম্ভব সুখ হয়,—মুক্তির সুখ, ভারলাঘবের সুখ! এই আমার অন্ধকার জীবনের মধ্যে একমাত্র স্নেহার্চ্চি নীরজার ভালবাসাটুকু। তাকে আমি ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম, সম্ভ্রম করতাম। বাল্যকালে তাকে না বুঝে দেবতার পূজা দিয়েছি; যৌবনে কি এক অবর্ণনীয় মোহে পড়ে' জগতের শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছি; আর এই প্রৌঢ়ত্বের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে দুর্ব্বচ কি এক আকর্ষণে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

"নীরজা চ হৃদিমে পরমাস্তে
জীবনাদপি ধনাদপি গুর্ব্বী।
ন স্বমেব মম সার্হতি, যস্যাঃ
ষোড়শীমপি কলাং কিল নোর্ব্বী॥"

আমার কাছে জীবন-ধন ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু প্রিয় প্রার্থিত নেই; কিন্তু মনে হয় নীরজা আমার জীবনধন অপেক্ষাও পরমধন। শুধু কি তাই সমগ্র পৃথিবী তার ষোড়শাংশেরও তুল্য নয়; আমি তার নিতান্ত অনুপযুক্ত।

বাল্যে সে আমার হৃদয়-দেবতা ছিল; বয়সে বাল্যের অনেক মোহ বিগতমোহিনী হয়ে' তুচ্ছ আকর্ষণহীন হয়ে' যায়; কিন্তু এখনও তাকে সেই আগেরই মত মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে দেখছি; বয়সে তাকে মোহজড়ান ভাবময় ভালবাসার সিংহাসন থেকে নামাতে পারেনি। সেখানে তার আসন অটল হয়ে' গেছে, ভবিষ্যতেও

তার সিংহাসনচ্যুতি অসম্ভাব্য ব্যাপারের শ্রেণীভুক্ত মনে হয়েছে। যেদিন সে আমার নিকট বিগতমোহিনী হবে, সেদিন আর আমি থাকব না।

বাল্যে আমি যখন নীরজার পাতা খেলাঘরে তারই শেখান খেলার আখড়াই দিতাম, এবং বাপমার জেদাজেদির জন্যে নয়, শুধু নীরজার কাছে পড়তে সুখ পেতাম বলে পড়তাম 'কাক ডাকে কা কা, আগে অ পরে আ' এবং (৯)কারকে ডিগবাজি খেতে দেখে হাসতে হাসতে নীরজাকে একবার আমার ডিগবাজি খাওয়া দেখিয়ে দিতাম, তখন এক দিন নীরজার বিয়ে বিয়ে খেলা হ'ল, মনে পড়ে। আমি তাতে বড় দুঃখিত হয়ে' কেঁদেছিলাম, নীরজা বউ বউ খেলায় আমাকে সাথী না করে' আমারই পিসির ছেলে রমেশদাদাকে সাথী করলে'। নীরজা তারপর দিন পাল্কী চড়ে' চলে' গেল,—আমার সঙ্গে বুঝি আড়ি করলে এই ভেবে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। সেই দিন থেকে আমার আর খেলা জমল না। সেই মধুর-স্মৃতি-সংযুক্ত খেলাঘরে বসে' নীরজার বিষম অভাব আমার সেই বাল্যহৃদয়ে নিদারুণভাবে অনুভব করতাম, আর মাঝে মাঝে সুর করে' বলতাম 'গৌরমাঝি হাল ধরেছে, চৌদিকেতে পাল, এই নৌকা চড়ে' দাদা বৌ আনবে কাল'। সে 'কাল' বহুদিন আমার বাল্যহৃদয়কে প্রলুব্ধ উন্মুখ প্রত্যাশী করে' রেখেছিল।

বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, কাম্যধন আয়ত্তের মধ্যে পেলে, অধিকারিত্ব, সমত্বভাব এবং উপভোগ তাকে কেমন খর্ব্ব, ক্ষুদ্র, সাধারণ, করে' ফেলে। নীরজার বিরহ, দুর্লভতা, অনভিগম্যতা আমার প্রেমময়ী মানসীমূর্ত্তিকে জ্যোতির্ম্ময়ী, মহিমাময়ী, আবেগময়ী, চিরনূতন, সদাসুন্দর করে' রেখেছিল।

নীরজাকে হারান থেকে সুরু করে' আমার কেমন একটা হারের পড়তা পড়ে' গেল। আমি নীরজাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে পাবার মত যোগ্যতা আমার ছিল না; কতকগুলো পুঁথি পড়েছি, বিদ্যাবুদ্ধি কাকে বলে জানি না; ধন উপার্জ্জন করেছি কি রকম করে' ব্যয় করলে সুখ হয় বুঝতে পারি না। সংসারের অবিচার নির্ব্বিচারে আমার চিত্ত সংসারের প্রতি বিমুখ ও বিদ্রোহী হয়ে' উঠেছিল। পরাজয়বিক্ষোভ বিস্মৃত হবার জন্যে আমি মদ খেতে আরম্ভ করেছি।

মদের প্রসাদে আমি যেন সংসারকে একটু করে' জয় কচ্ছিলাম। প্রথম প্রথম সমাজের নিন্দা, বিদ্রূপ, শাস্তির ভয়ে আমি লুকিয়ে আরম্ভ করি; এখন বোতল বগলে নিয়ে সদর্পে প্রকাশ্য পথে মাতামাতি করতে একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিনা। আত্মীয় স্বজন, পড়সী, পরিচিত সকলের নিষেধ-অনুরোধ, উপদেশ-ধিক্কারের বিরুদ্ধে আমার চিত্ত দুর্গপ্রাকারের মত অনম্য, অবেধ্য, অলঙ্ঘ্য হয়ে' উঠেছে। সকলের তিরস্কার অনুযোগ যেন পাষাণ প্রাচীরের তলে শিশুদের পটকা আওয়াজের মত কৌতুকপ্রদ ব্যর্থ বলে মনে হয়। কিন্তু এই প্রস্তর-কঠিন চিত্তও নীরজার সানুনয় সস্নেহ নিষেধ-বাক্য ও নম্র ধিক্কারের কাছে কেমন ভাঙো, ভাঙো, পড়ো পড়ো হয়ে' ওঠে। সকলের শাণিতশাসনাস্ত্র সকল আমার পাষাণ-চিত্তগাত্রে লেগে ব্যর্থ প্রতিহত ভোঁতা হয়ে' যায়,

তাতে একটুও আঁচড় পাড়্তে পারে না। কিন্তু নীরজার শান্ত অনুযোগ আমার নিকষ কঠিন মনের গায় স্বর্ণরেখাপাত করে। আমার মনে হয় আমার প্রাণ নিকষ প্রস্তরের মতই কৃষ্ণকঠিন, আর নীরজা স্বর্ণের মতই ভাস্বর, দুর্লভ, অমূল্য। আমারই নিকটে তার শুচিতার যাচাই, আমি তার মূল্য স্থির করি।

নীরজাকে আমি এতই বেশি শ্রদ্ধা করতাম, সম্ভ্রম দেখাতাম, ভালবাসতাম। তাকে আমি আবাল্যের সঞ্চিত ভালবাসার মুকুট পরিয়ে আমার সেই দুরধিগম্য চিত্ত-দুর্গ মধ্যে, প্রতিষ্ঠা করেছিলাম;—নীরজা তা' জানত। কিন্তু কখন তার আচারের ব্যতিক্রম দেখিনি; কখন সে তার ব্যবহারে, বাক্যে, হাবভাব-ইঙ্গিতে সে কথা আমায় জানতে দেয়নি। আমিও কখন সাহস করে' বাক্যে কিছু প্রকাশ করিনি। তার প্রতি আমার প্রীতি এতই প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত; আমি তার নিকট এতই সঙ্কুচিত, অবনত পরাজিত ছিলাম।

কিন্তু সুখের বিষয়, সকল ব্যাপারেরই একটা সীমা আছে। এমন শুভদিন আমার জীবনে এসেছিল, যখন এই নীরজার কাছে পরাজয়ের আনন্দ কাটিয়ে উঠে, আমি স্বাধীন মুক্ত হ'তে পারলাম। এমন দিন এল যেদিন তমসাবৃত চিত্তে নীরজার ভালবাসা—জোনাকির আলোকটি এক টিপুনিতে নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারের বিরাট গাম্ভীর্য্য, নিরবচ্ছিন্ন একাকারত্ব অনুভব করে' আনন্দিত হয়ে উঠলাম,—শুধু আনন্দ নয়, আমার নিজের প্রভু শক্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে পড়ে, জয়মাল্য দিয়ে আমার নিজের ক্ষমতার পূজা করেছিলাম। এখন নীরজার কথা মনে হলে' বিস্মৃতকাহিনী সুখস্বপ্নস্মরণের মত একটা অবুঝ আনন্দ হয়, প্রশান্ত সন্তোষ অনুভব করি, কিন্তু তার কাছে আর সঙ্কুচিত, অবনত হই না।

সে যখন মদ ছাড়তে বলত, চুরুট ফুঁকতে নিষেধ করত, স্বদেশী হ'তে বলত, দান করে' ব্যয়ের সার্থকতা করতে বলত, তখন প্রথম প্রথম প্রাণটা কেমন দমে' যেত। কিন্তু মদে ক্রমশ যখন পেকে উঠলাম, এবং জোর' করে সকলের কথা অবহেলা করতে শিখলাম, তখন নীরজারও বাক্যের তেজ আমার কাছে ক্রমশ হ্রস্ব হয়ে' এল, শেষে আমার আরো উন্নতি হ'ল,—অভ্যাস এবং সচেষ্ট অবহেলা এমনি জিনিষ। দুর্গপ্রাকারে শিশুর খেলনা হাওয়ার বন্দুকের ছোট্ট ছিটের আঘাতের মত তার কথায় আমি আমার অজেয়ত্ব ও তার নিস্ফলতা দেখে আনন্দই লাভ করতাম, হাসতাম। তার নিষেধ, উপদেশ প্রভৃতি অবশেষে বাস্তবিকই আমার খেলার সামগ্রী হয়ে' উঠেছিল। তার পাদ্রিগিরি, গুরুগিরি, আচার্য্যগিরি আমার চিত্ত-প্রাকারের পলস্তরার কাজ করত—চিত্ত ক্রমশ কঠিনতর অবেধ্য হয়ে উঠছিল। তার অত্যাচার শিশুর দুরন্তপনার মত উপেক্ষ্য প্রীতিপ্রদ ছিল। আমার উপদ্রবে ও আমার কার্য্যে বিদ্রোহিতা না করে' সে যদি ঠিক আমারই মত সর্ব্বজয়ী, সমাজ-দ্রোহী, অপকর্ম্মপটু হ'ত, তা হ'লে বোধ হয় সে আমার প্রীতি আকর্ষণ করতে পারত না। আমি সদাই উন্মুখ থাকতাম তার

আক্রমণ ব্যর্থ করে' জয়ের আনন্দ লাভের জন্যে।

তাই সেদিন সকালের ডাকে তার হস্তাঙ্কিত লিপি দেখে আমি একেবারে প্রফুল্ল হয়ে' উঠেছিলাম,—না জানি, নিগ্রহ-কর্ত্রী কোন নূতন অস্ত্র শানিয়ে আমার প্রতি প্রয়োগ করেছেন। তাড়াতাড়ি চিঠি খুলে দেখি, শ্রীমতী বোঠান স্বয়ং সশরীরে আমার গৃহে 'তসরিফ্' আনছেন; এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে পৌঁছিবেন।

আমি আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে আপনা হতে' বলে' উঠলাম, 'ওহো, আজ কি আনন্দ! পুরাকালের রাজাদের আনন্দ সংবাদ শুনে রাজচিহ্ন শ্বেত ছত্রচামর ছাড়া আর কিছুঁই অদেয় থাকত না; আমারো সুরা ও চুরুট এই দুই অনাচার চিহ্ন ত্যাগ ভিন্ন অন্য কিছুই অদেয় নেই। আজ আমি কল্পতরু, আয় কে তোরা কি নিবি, আজ আমার পরম শত্রুও যদি আমার সঙ্গে আপোশ করতে চায়, আমি রফা করতে রাজি আছি, ওগো সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি'।

তৎক্ষণাৎ আমার ঘরের দরজা খুলে' পলিতকেশবিষ্ণু, জরাবিশ্লথ, বলিতবপু, নোংরা কুদৃশ্য একটী বামন প্রবেশ করলে। সে উঁচুতে দু হাতও নয়। তবু তাকে চল্লিশ বছরের বুড়ো বলে' বোধ হ'ল। এই মানবকটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই অসদৃশ; খণ্ডশ কোনটাকেই বেমানান বোধ হয় না, অথচ মোটের উপর তার যেন কোথায় কি অভাব রয়ে গেছে। সে যেন র‍্যাফেলের তুলিতে আঁকা আমারই ব্যঙ্গচিত্র। র‍্যাফেলের চিত্রের বিশেষত্ব—তাঁর চিত্রিত ব্যক্তির কোন অঙ্গটাই অতিসুন্দর নয়, অথচ মোটের উপর চিত্রখানি অতিসুন্দর। তেমনি এই মানবক বামনটার কোন অঙ্গটাই একেবারে বিশ্রী ছিল না, অথচ মোটের উপর সমস্তটাই বিকৃত বোধ হচ্ছিল। তার হাবভাব, আকৃতি প্রকৃতি, পোষাকপরিচ্ছদে যেন আমাকেই প্রতিফলিত কচ্ছিল। সে যেন আমারই ব্যঙ্গচিত্র।

তার খুদে খুদে চোখে ও মুখে কেমন একটা তৎপরতা, হিংসা ও ধূর্ত্ততা খেলা কচ্ছিল, তার মুখে বক্র হাসির, এবং চোখে' জ্বলজ্বলে চটুল দৃষ্টির আস্ফালন দেখে' আমার মনে আতঙ্কের উদয় হচ্ছিল। তাই সেই বিশ্রী কুৎসিত চেহারা'খানা দেখে গা বমি বমি কচ্ছিল।

সে দিব্যি চির-পরিচিতের মত সহাস্য নিশ্চিন্ত স্বাধীনভাবে এসে ঘরে ঢুকল এবং আমার অনুমতির কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে' একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বেশ আরামের ভাবে বসে' গেল।

তার এই স্বাধীনতা দেখে আমার বড় রাগ হচ্ছিল—কতক তার অসভ্যতায় এবং কতক তার হাবভাবে আমারই যথাযথ অনুকরণ দেখে'। তার প্রত্যেক প্রক্রিয়া যেন আমা-কেই ভ্যাংচাচ্ছিল। তার প্রতি উপেক্ষা দেখাবার জন্যে আমি একটা চুরুট নতুন করে' জ্বেলে দাঁতে চেপে' তাকে হুকুম করার সুরে বললাম, 'তুমি কি চাও'?

সে হেসে চোখ মট্‌কে বললে, 'চাই ঢের —তা' ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু বলি কি, এত চুরুট ফোঁকাটা কি ভাল? দেহ-মন উচ্ছন্ন গেল যে। আর আগন্তুক যতই অনভিপ্রেত

হোক না কেন, তার সঙ্গেও একটু বিনয়নম্র ব্যবহার করতে হয়'।

আমার ক্রোধ উদ্বেল হয়ে' উঠল। ইচ্ছে হ'তে লাগল, এক লাথিতে এই আবর্জ্জনার পিণ্ডটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দি। কিন্তু তার দিব্য সহাস্য নিশ্চিন্ত ভাব ও ক্রূর হাসি-ভরা উপহাসব্যঞ্জক দৃষ্টি যেন কোন অবোধ্য অজ্ঞাত শক্তিতে আমাকে তার সম্পূর্ণ অধীন ও অক্ষম করে' ফেলেছিল। আমি দু-আঙু-লের ফাঁকে চুরুটটাকে নামিয়ে ধরলাম। তার হুকুমে আমি এতটা বাধ্য দেখে' আমি লজ্জিত হ'লাম, আর সেই মানুষের অপভ্রংশ জীবটা খল খল করে' হেসে আমার মাথায় অপমানের বিষম গুরুভার চাপিয়ে আমার গর্ব্বোদ্ধত মাথাটা হেঁট করে' দিলে।

সে হাসি, সে কথা যেন আমারই মত। আমি কত দিন কত লোকের ত্রুটিসঞ্জাত সলজ্জভাবকে উপহাসে বেশি করে' রাঙিয়ে তুলেছিলাম, সেই সব কথা এই প্রতিশোধের দিনে মনে জাগ্রত হয়ে' উঠছিল, আর লজ্জায় আমার কানে নাকে চোখে আগুন ছুটছিল, আমি নিস্পন্দ নীরবে গলদ্-ঘর্ম্ম হচ্ছিলাম।

খানিক পরে একটু সামলে নিয়ে রূঢ় ভাষায়—যতটা রূঢ়তা সেই বর্ব্বরটার দৃপ্ত ভাবের সামনে সংগ্রহ করতে পারা যায়, ততটা রূঢ়ভাষায়—আমি বল্‌লাম, 'দেখ বেহায়াপনা, বে-আদবী এখানে চলবে না। কি আবশ্যকে আসা সেটা শিষ্ট সভ্যভাবে যদি বলতে না পার, তোমার ঘাড় ধরে' বার করে' দেব'। 'লাথি মেরে বার করব' বলবার ইচ্ছে থাকলেও তার সেই পরিহাস-রসিক দৃষ্টি উপেক্ষা করে' সে কথাটা মুখ থেকে আর বেরুল না। এবং যে কথা কটা তাকে বল্লাম, তার ভাবার্থটা যথাসম্ভব রূঢ়-গোচের করে' সংগ্রহ করলেও আমার কণ্ঠকাকুতে কেমন ভীতিসঙ্কোচের ভাবই প্রকাশ হয়ে' পড়েছিল।

আমার কথা শুনে সেই কিম্ভূত কিমাকার জন্তুটা দিব্যি সমকক্ষভাবে চেয়ারটায় হেলে পড়ে' আমার নাকের সোজা টেবিলের উপর তার ধূলোমাখা জুতোশুদ্ধ পা-জোড়া তুলে' নাচাতে নাচাতে বললে, 'যাও, থাম থাম, অভদ্র, অসভ্য! মান্য-লোকের সামনে এতটা ধৃষ্টতা ভাল নয়, একটু সমঝে চল'।

এই নিশ্চিন্ত রূঢ় বাক্য আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন কশাঘাত করলে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে আমি তার হুকুম-করা স্বর শুনে কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। সেই বামনটা খানিকক্ষণ নিতান্ত সন্তোষ ও আরামের সহিত আমার সেই স্তম্ভিত ভাবটা উপভোগ করে', তার শৃগালচক্ষু মিটমিট করে', ভারি গম্ভীর হয়ে' দুঃখমিশ্র তিরস্কারের স্বরে বল্‌লে, 'আজকে একটা ভিখারীকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ'!

আমি বিরক্তির স্বরে উত্তর কল্লাম, 'হয় ত' বা দিয়েছি, হয় ত' বা দিই নি। তুমি সে কথা কেমন করে' জানলে?

'যেমন করেই জানি না কেন, আমি জানি, তুমি সেই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ক্ষুধাতুরকে প্রত্যাখ্যান করেছ'।

'বেশ, ধরে' নেও না হয় যে, আমি তাকে তাড়িয়েছি। কিন্তু তাতে তোমার কি?' আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে 'তুই' বলতে পাচ্ছিলাম না।

সেটা উত্তর করলে, 'তাতে আমার বিশেষ কিছু নেই, আবার একটু কিছু আছে—কিন্তু সে বিতর্ক এখন থাক। সম্প্রতি এটা ঠিক যে তুমি সেই ভিক্ষার্থীকে শুধু তাড়াও নি, মিথ্যা কথা বলে' প্রবঞ্চনা করে' বিমুখ করেছ'।

'তা, অঁইঃ, এঁ আমি? না'!

'নিশ্চয়, আলবৎ, তুমি মিথ্যা বলে' বেচারাকে প্রতারিত করেছ'।

আমার মনে পাপের জ্বালা অনুভব করলাম। সেই ক্ষুধাতুর কঙ্কালটাকে তাড়িয়ে অবধি আমি শতেকবার এই জ্বালা অনুভব করেছি। কিন্তু তবু সে ভাব গোপন করে' মিথ্যাপবাদ-ব্যথিতের মত ভাব ধরে' বললাম, 'তোমার নির্জলা মিথ্যাকথা। আমি তাকে বলেছিলাম—'

'ঐ খানেই থাম, থাক্ তোমার কল্পিত ভাষ। আবার মিথ্যা বলে' মিথ্যা ঢাকতে যাচ্ছ। মিথ্যার উপর মিথ্যার প্রলেপ চড়িয়ে মিথ্যার মাত্রা আর বাড়াতে হ'বে না। তোমার বলতে হ'বে না,—আমি বেশ জানি তুমি তাকে কি বলেছ। তাকে বলেছিলে,—'ঝি বামুন সব বাজারে গেছে; আর এখন ঘরে খাবারও কিছু নেই'। একেবারে ডবল মিথ্যা! ঝি তখন তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে, আর ঘরেও যথেষ্ট ভাত তরকারি মজুত ছিল'।

আমি তার বাক্যের অত্যাশ্চর্য্য যথার্থ আঘাতে অবাক হয়ে' গেলাম। মনে মনে নানা বিচার বিতর্কে ঠিক করবার চেষ্টা করতে লাগলাম, এই জানোয়ারটা এ সব ঘটনা কেমন করে' টের পেলে। এ হয়ত সেই কঙ্কালসার ক্ষুধার কাছে কতক শুনে থাকবে—কিন্তু সে আমার ঘরের খবর কেমন করে' পেলে?

উঃ কি অনুতাপের জ্বালা! মনে হচ্ছিল যেন সাঁড়াশী দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে কে মোচড়াচ্ছিল। কিন্তু সেই হতভাগা পিশাচটা আমায় দেখে দেখে ঘৃণামিশ্র আনন্দে মৃদু মৃদু হাসছিল। আমাকে তদবস্থ দেখে সে আবার আলাপ আরম্ভ কল্লে। তার প্রত্যেক কথাই আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ,—এবং প্রত্যেক অভিযোগই আমার দুর্ভাগ্যক্রমে নিতান্ত রূঢ় সত্য! প্রত্যেক বাক্যাংশ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-গ্রথিত; এবং প্রত্যেক বাক্য জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আমার মনে এসে পড়ছিল, যেন অলাতপত্র দিয়ে' আমার মর্ম্মবিঘট্টন করছিল।

সে কত ছোট ছোট ত্রুটি, নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল। বিনা দোষে কত লোককে ঠেঙিয়েছি, কতবার কত ভিক্ষুককে কি রূঢ় কথা বলেছি, কত লোককে কত প্রতারণা করেছি, কত বন্ধুর অসাক্ষাতে কত নিন্দা করেছি, বা তাঁদের মিথ্যানিন্দা শুনে নিতান্ত হীনচরিত্রের মত তার প্রতিবাদ করিনি বা সমর্থনই করেছি। কত মন্দ চিন্তা, কুভাব যা শুধু কার্য্য বিফলতা আর আমারই ক্ষতির ভয়ে কার্য্যে অপ্রকাশ রয়ে গেছে, সেই সব মনের কথাও—সেই দানবটা বলতে সুরু করলে। সে প্রত্যেক ক্ষতমুখে বিষপ্রয়োগের মত শেষকালে স্মরণ করিয়ে দিলে, নির্ভরশীল কত বিশ্বস্ত বন্ধুকে আমি কি রকমে মর্ম্মপীড়া দিয়ে, তাঁদের মৃত্যুর কারণ হয়েছি; আমি কত অনাথাকে বিপথে টেনে এনে অসহায় নিঃসম্বল পরিত্যাগ করেছি; কত বিধবার বিত্তনাশ, কত শিশুর অন্নোপায় হরণ করেছি।

অতঃপর কি কি কুকর্ম্ম করব চিন্তা করে' রেখেছি, তা পর্য্যন্ত সেই নিষ্ঠুরটা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে আমাকে লজ্জায় ক্ষোভে অন্ধ বিচেতনপ্রায় দেখেও হেসে হেসে কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে, বললে, 'এই যে এখনো তুমি জ্বালা অনুভব করছ। বেশ বেশ!'

'নরাধম, আমি লক্ষবার এর জন্যে কষ্ট পেয়েছি, আরো কোটিবার হয় ত' পাব। কিন্তু সকল পাপগুলি একসঙ্গে একেবারে আমার মনে করিয়ে দিয়ে যে তুষানলের জ্বালা জাগিয়ে তুলেছ, সয়তান করুক, তুমি সেই রকম জ্বালার জ্বলে' পলে পলে পুড়ে মর।'

সেই ক্ষুদ্রকটা মহা আনন্দে হাসতে হাসতে আমার জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পাপ-কাহিনী বিবৃত করতে লাগল। আমি মৌন-ভাবে তার নির্দ্দয় অভিযোগের তাড়না সহ্য করতে লাগলাম। অবশেষে তার একটি কথায় আমাকে সহসা সহস্র কশাঘাতে উদ্বুদ্ধ করে' তুললে। সে বললে—

'সেই গত আশ্বিনের কোজাগরের রাতে তোমার বোঠান নীরজার ঘুমন্ত মুখে পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নাপ্রলেপ দেখে তুমি—'

'থাম থাম, ওগো নির্দ্দয়, ক্ষান্ত হও? আমি যা' নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে ইতস্তত করি, সেই অতিগুপ্ত নিভৃত চিন্তাও কি তোমার অগোচর নহে? তুমি কি অন্তর্যামী?

'সেই রকমই বোধ হচ্ছে, না? স্বীকার কর, ঐ রকম চিন্তা তোমার মনে চকিতের মতও উদয় হয়েছিল কি না।'

'তোমার কাছে কেমন করে' বলব—না। ওগো অন্তর্য্যামী, বল বল ওগো তুমি কে?'

'তুমিই আন্দাজ কর না, আমি কে?'

'আমার ত' মনে হচ্ছে তুমি স্বয়ং সয়তান বা পিশাচ কি দানব এই রকম একটা কিছু।'

'আন্দাজটা ঠিক হল না।'

'তবে তুমি কে?'

'তুমি কি সত্যই আমার পরিচয় জান্তে উৎসুক হয়েছ? তবে বিজ্ঞাত হও, আমি তোমার বিবেক!'

শ্রুতিমাত্র আমি আনন্দউল্লাসে উত্তেজিত হয়ে'—

'ওরে অত্যাচারী নিষ্ঠুর, আমি সহস্রবার ইচ্ছা করেছি যে তুই যদি আমার দর্শনীয় ও স্পর্শনীয় হ'তিস, তা হ'লে আমি মনের সাধে তোর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতাম, আজ সেই ইচ্ছা ফলবতী হয়েছে, আমার শুভদিন এসেছে; ওরে পাপিষ্ঠ তোর কৃতকর্ম্মের ফলভোগ কর।'

—বলতে বলতে সেই দুরাত্মার উপর লাফিয়ে পড়লাম।

অহো দুর্দ্দৈব! হায় লজ্জাকর নিষ্ঠুর নিষ্ফলতা! ধিক অদৃষ্টের রূঢ় পরিহাস! আমি লাফিয়ে গিয়ে সেই প্রসরপ্রসর্পী বরাক পরিত্যক্ত শূন্য কেদারাখানার উপর পড়ে' জড়িয়ে গড়িয়ে ভূশায়িত হ'লাম। আর আমার বিবেক মহাশয় তড়িৎত্বরিতগতিতে আমার আক্রমণ এড়িয়ে দূরে একটা তাকের উপর গিয়ে বসে' আমার নিষ্ফলতাকে ব্যঙ্গ করে' হাস্তে হাস্তে ওষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ দেখাতে লাগল। কুকবক্রৌষ্ঠিক বরাক ক্ষুদ্রকের পরি-হাস তীব্র মুখভাব দেখে; আমার নিষ্ফলতার

লজ্জা উগ্রতর হচ্ছিল। আমি ক্রোধান্ধ ষণ্ডের মত ছুটে গিয়ে সেই তাকের উপর তাকে ধরতে গেলাম ; সে আমার হাত ফোস্কে উচু আলসের উপর গিয়ে বস্‌ল, এবং আমি হাত দিয়ে কেবল খানিকটা বাতাস চেপে ধরে' দ্বিগুণ অপ্রস্তুত হ'লাম। তখন আমি হাতের কাছে যা' পেলাম,—জুতো, দোয়াত, রুলার, কাপজচাপা ইত্যাদি যা' কিছু চোখে পড়তে লাগল,—তাই ছুঁড়ে সেই ক্ষিপ্রগতি শক্তি-মানকে মারবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু সব নিষ্ফল, ব্যর্থ হ'ল। বিটপ-বিনোদী মর্কট যেমন আপনার শরীরমাত্র অবনত বা তির্য্যক করে' শিশুদের ছোঁড়া ঢিল থেকে আত্মরক্ষা করে, সে তেমনি দিব্য নিশ্চিন্ত বসে' অল্প অল্প হেসে হেসে মৎপ্রেরিত সকল শাস্ত্র লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করেছিল। অবশেষে আমি যখন দেহ-মনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে' চেয়ারে হতাশ-ভাবে এলিয়ে বসে' পড়লাম, তখন তার বিজয়ানন্দ আমার একেবারে অসহ্য হয়ে' উঠল। আমি যখন ক্রোধলজ্জা প্রদীপ্ত হয়ে' কর্ণমূলে জ্বালা ও বেদনা অনুভব কচ্ছিলাম, তখন আমার বিবেক বলতে লাগল—

'ওরে আমার সেবকাধম, তোর মানী-মর্য্যাদামৎসরী ব্যবহার আমার অসহ্য। বেশি অসহ্য—তোর মূর্খতাপ্রসূত ধূর্ত্ততা। রাবণ প্রবঞ্চিত হয়ে' আপন মৃত্যুবাণের সন্ধান বলে' ফেলেছিল ;—আর আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তোকে আমার মৃত্যুপায় বলে' দিচ্ছি, ক্ষমতা থাকে চেষ্টা কর। আমার আক্রমণে ব্যথিত হয়ে' যে আমার মৃত্যুকামনা করে, তার ভাগ্যে নিষ্ফলতা অনিবার্য্য ; আমার পীড়না-তীত অগ্রাহ্যতাই আমার মৃত্যুর সহজ পন্থা।

আমি আমার পরম শত্রুর মৃত্যুপায় জেনে মহা আনন্দিত হয়ে' তার পীড়ন অগ্রাহ্য করতে কত চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু হায়, তার সেই জম্বুকোচিত মিটমিটে চোখে ক্রূরদৃষ্টি ও বক্র ওষ্ঠে কুটিল হাসি আমাকে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব হ'তে দিচ্ছিল না। আমি অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করে' আরো জ্বালাতন হয়ে' উঠছিলাম। তখন আমি হতাশভাবে আমার প্রভুর দিকে চেয়ে কত কি চিন্তা কচ্ছি এমন সময় আমার ঝিটা দরজা খুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে—

'ওমা একি কাণ্ড, বাবু তুমি এত চেঁচা-মেচি, হুটপাট কচ্ছ কেন? আজ বুঝি বেশি মদ খেয়েছ?'

আমি বিবেক-পলায়ন-সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে' লাফিয়ে উঠে ঝিটাকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে রেগে বললাম—

'পালা মাগী পালা যা, শীঘ্র দূর হ, দরজাটা বন্ধ ক'রে দে, দেখছিস্ নে আমার বিবেক চূড়ামণি পালিয়ে যাবে'।

ঝিটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু আমার কর্কশকণ্ঠের গালাগালির বিচিত্র বাঁধুনি শুনেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে' দিলাম, এবং তখনো বিবেক প্রভুকে অ-পলায়িত দেখে মহা খুসি হয়ে' বল্লাম—

'ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পেয়েছি। দরজা খোলা পেয়ে তুমি পিঠটান দিয়েছিলে আর কি। আচ্ছা, ঝিটা এল, কিন্তু তোমায় যেন দেখতে পেলে না বোধ হল। ব্যাপার কি রকম বল দেখি'।

'আমি তুমি ছাড়া আর সকলের অদৃশ্য'।

এই কথায় অন্তরে অন্তরে বড় খুসি হ'লাম। যাক, জীবনে এই একটা খুন করব, যা' আর লুকোবার চেষ্টা করতে, আর পুলিশকে ঘুষ দিয়ে অর্থ নষ্ট করতে হবে না। আমি এই পাপিষ্ঠটাকে খুন করব, অথচ কেউ টের হবে না, বাঃ কি মজা, কি সুবিধা! আমি তখন যথেষ্ট নিশ্চিন্ত হয়ে' বললাম,—'ভাল বিবেক, তবে কিছুক্ষণের জন্যে বিগ্রহ বন্ধ রেখে সন্ধি করা যাক। আমি তোমায় কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই'।

'আচ্ছা, আরম্ভ কর'।

আচ্ছা তোমরা দিন রাত, রাত দিন, সপ্তাহপক্ষ, মাসবৎসর, যুগযুগান্তর ধরে' মানুষ বেচারাকে সেই এক চিরপুরাতন বিষয় নিয়ে একেবারে জ্বালাতন করে' ভাজা ভাজা করে' ফেল। তোমাদের ব্যবহারের কোন ঠিক ঠিকানা নেই ; তোমাদের স্বভাবের কুলকিনারা পাওয়া ভার। অকারণ পরপীড়ন সুখী বিবেকের দল তোমরা 'অধম ধুলি চেয়ে'। তোমরা এমন কেন, বল দেখি'?

'আমাদের ভাল লাগে বলে'।

'তোমরা কি বাস্তবিকই মানুষকে ভাল করবার সদুদ্দেশ্যে ঐ রকম জ্বালাতন কর'?

'ঠিক তা নয় ; জ্বালাতন করি কতকটা আমাদের স্বভাবের ধর্ম্মে, কতকটা আমাদের কর্ত্তব্য ব্যবসায়ের খাতিরে। অবশ্য এ ব্যব-সায়ের উদ্দেশ্য মনুষ্যকে উন্নত করা, কিন্তু আমরা আমাদের উপরওয়ালার নিয়োগ পালন করি মাত্র। আমরা চিনির বলদের মত, উষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ, নির্লিপ্ত অনাসক্তভাবে কাজ করি, ফলের কথা ভাবি না। অথচ আমরা 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা' মানুষের উত্থানপতন অগ্রাহ্য করে' অপরিবর্ত্তিত থাকতে পারি না! মানুষের হাতেই আমাদের মরণ-বাঁচনের রূপার কাঠি সোণার কাঠি আছে।

আমি এই শেষতথ্য অবগত হয়ে' বড় খুসি হ'লাম, মনে আশাভরসার উদয় হ'তে লাগল। মরণ কাঠি যখন আমার আয়ত্ত, একবার খুঁজে পেলে হয় সেটা কোথায়, তা হ'লে এই প্রেতটাকে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। বরাক বিবেক বলে' যেতে লাগল—

'একটা ত্রুটি বার বার স্মরণ করিয়ে দেবার হুকুম আমাদের উপর আছে, আমরা তাই তামিল করি। সেই নিয়োগ আমাদের ব্যক্তি-গত স্ফূর্ত্তি, সজীবতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অনুপাতে পালিত হয়। যারা সুস্থ স্ফূর্ত্তিবাজ তারা তাদের মনের মানুষকে নিয়ে' একটু বেশি নাড়াচাড়া করে' আমোদ করে ; আর যে সব বিবেক নির্জীব গোচের তারা শুধু নিদ্রালু চৌকিদারের মত মনিবের ভয়ে ভয়ে কখন বা একবার সাড়া দেয়, কখন বা মনোগুহায় তন্দ্রাগত হয়ে' পড়ে' থাকে। মানুষ যদিও আমাদের ভাল বাসে না, আমরাও মানুষের মিত্রগোষ্ঠির কেহ নহি, তথাপি কোন কোন সহৃদয় মুমূর্ষু শত্রুকেও ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা দিয়ে' বেশ 'তাজাতামানা' করে' তোলে। আর এমন নরাধমও অনেক আছে যারা শত্রুকে মুমূর্ষু দেখে', গলাটা টিপে শীঘ্র শীঘ্র কাজ চুকিয়ে ফ্যালে। কিন্তু আমরাও আবার বড় মজার প্রকৃতির ;—'নরমের সাতপিঠ খাই, গরমের কাছে না যাই' ; সহৃদয়ের সাক্ষাৎ পেলেই আমরা যেন

সে বেচারাকে পেয়ে বসি;—একচোট, এক-হাত দেখে নি; নিষ্ঠুর ভাবহীনের কাছে ঘেঁসতে বড় একটা সাহস করি না। আমাদের পীড়নো-পভুঞ্জান চিত্ত সোণার কাঠি, পীড়ন-প্রতীপ অথবা পীড়নানুদ্বেগ চিত্ত রূপার কাঠি। নিষ্ঠুর ভাবহীনতাই মরণ কাঠি; কোমল ভাব শীলতাই বাঁচন কাঠি'।

বিবেকবাহাদুর তার পরাজয়ের উপায় মৃত্যু-বাণের সন্ধান বলে ফেললে দেখে আমার মন উল্লাসে ভরপূর হয়ে' উঠল। নিষ্ঠুরতা ও ভাবহীনতাই বিবেকের মরণকাঠি। আমি নিষ্ঠুর কম কি?—আরো হ'ব, আরো আরো হ'ব। কোমল ভাবশীলতাই তার সোণার কাঠি। আমার সমগ্র প্রাণের উপর কোমল-ভাবের একটু ক্ষীণ প্রলেপও ত' দেখা যায় না; যা একটু আছে নীরজা বৌঠানের মানসীমূর্ত্তির চরণ দুখানির অলক্তরাগের মত্ত ঘিরে। নীরজা বোঠান আমার পরম শক্র, বিবেকের বাঁচন কাঠি, এই মনে হ'তেই রোষে ক্ষোভে বিরক্তিতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস অন্তর ভেদ করে' বেরিয়ে এল। হায়, এ যে মহা উৎকট সমস্যা উপস্থিত—নীরজা বোঠানের প্রতি প্রীতিপোষণ ও বিবেকের তাড়না এবং তার প্রতি বৈরক্তি ও রিবেকের মরণ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটা শ্রেয়ঃ, কোনটা প্রেয়! প্রেয় ও শ্রেয়ঃ পন্থার এ কি বিচিত্র অশুভ সজ্ঘাত।

আমি অবলম্ব্যপন্থা স্থির করতে না পেরে, আবার বিবেকের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে দিলাম।

"আচ্ছা বিবেক মহাশয় এমন ফরমাস দেওয়া বদ চেহারা তুমি কোথায় পেলে বল দেখি? এ কোন আনাড়ী শিল্পীর প্রথম নির্ম্মাণ, অথবা তুমি কোন নিপুণ শিল্পীর ব্যঙ্গচিত্র? তুমি বোধহয় সবচেয়ে জঘন্য বিশ্রী, বলিত লোলদেহ অদ্ভুত প্রাণী। তুমি যে আমি ভিন্ন অন্য সকলের অদৃশ্য, সে জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার মত কদাকার বিবেকের সেবক বলে' পরিচিত হ'লে, আমি লজ্জায় মরে যেতাম। অন্য পক্ষে তুমি যদি দিব্য সুন্দর, বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ত জোয়ান হ'তে—

'হই নি, সে কার দোষে?'

'তা' আমি কি জানি প্রভু,—আমি ত' আর তোমার মত অন্তর্য্যামী নই।'

'একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারতে আমার কদাকারের জন্য দায়ী, দোষী তুমি, তুমি।'

'বাঃ, তোমার সৃষ্টির সময় কি আমার মতামত অনুসৃত হয়েছিল?'

'সৃষ্টির সময় হয় নি; আমার সৃষ্টির পরে তুমি আমার অঙ্গবৈকল্য সম্পাদন করেছ। যখন তুমি কিশোর ছিলে, তখন আমি বলিষ্ঠ জোয়ান ও আলেখ্য সুন্দর ছিলাম।'

'তুমি যদি বিরূপ হওয়ার আগে, শৈশবেই মরতে ত বেশ হ'ত। তুমি দেখছি উল্টো পথে অগ্রসর হয়েছ—স্বভাবে বর্দ্ধিত পুষ্ট না হয়ে', কেমন সঙ্কুচিত ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছ।'

'আমাদের পুষ্টিক্ষয় তোমাদের হাতে। আমাদের কেউ বা পুষ্ট বর্দ্ধিত হয়, কেউ বা ক্লিষ্ট ক্ষীণ হয়। তোমার শৈশবে আমি বেশ সবল সুস্থ সুন্দর ছিলাম, এখন বিশ্রী বামন হয়েছি। তুমি আমার প্রতি যত বিমুখ, সমাজের কথায় যত বধির হয়েছ আমার অঙ্গ তত কিণাঙ্কিত হয়ে উঠেছে।'

'তোমার কথা বেশ আশ্বাসপ্রদ। তুমি

শীঘ্র কিণাঙ্ক কঠিন হও, আমি তোমাকে পাদ-পীঠ করে' নৃত্য করি।'

'আমি এতদিন কিণাঙ্কলাঞ্ছন জড় হয়ে' যেতাম যদি আমি আমার পরিচিত অপরাপর বিবেকের কাছে সাহায্য না পেতাম। তারা মাঝে মাঝে এসে আমার হ'য়ে তোমায় দুএকটা খোঁচা দিয়ে যায় তাই রক্ষা। পুস্তকের পৃষ্ঠায় দূরদূরান্তের কত অপরিচিত বিবেকও এসে মাঝে মাঝে আমাদের সাহায্য করে' থাকে! আমি মাঝে মাঝে এই রকম সাহায্য না পেলে তোমার বিমুখতার পেষণযন্ত্রে অবি-শ্রাম [illegible] হ'তে হ'তে এত দিনে হয় ত' হোমিওপ্যাথি গ্লোবিউলের মত সূক্ষ্ম হয়ে যেতাম।'

'সৌভাগ্য হোক, সেই শুভদিন শীঘ্র আসুক, তুমি হোমিওপ্যাথি গ্লোবিউলের মত হও, আমি কাচের শিশিতে ছিপি এঁটে, লেবেল মেরে বিবেকাণুর প্রদর্শনী খুলি। কিংবা কলেরার রোগীকে খাইয়ে দিয়ে বিষে বিষক্ষয় করে' তোমায় একেবারে নরকে নির্ব্বাণ পাইয়ে দি। আচ্ছা, তোমার কতগুলি বিবেকের সঙ্গে আলাপ আছে?'

'পুঁথির পৃষ্ঠায় চড়ে' অতীত বর্ত্তমানের যত বিবেক আমার সঙ্গে দেখা করে, তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার কুটুম্ব সম্বন্ধ স্থাপন করেছি। তা' ছাড়া আমার আত্মীয় প্রতিবেশী অনেক আছে।'

'তুমি কাউকে আমায় দেখাতে পার।'

'না, তারা আপনার সেবক ছাড়া অপরের অদৃশ্য। তাদের পরিচয় দিতে পারি।'

'ভাল, দুচার জনের পরিচয় জেনে নি। তুমি প্রসাদের বিবেকের স্বরূপ বর্ণনা কর।'

'তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে খুব বলিষ্ঠ, তেজস্বী, সুশ্রী ছিল, তুমিই তার মুখে ক্ষতচিহ্ন এঁকে খুঁত করে' দিয়েছিলে। এই যে তোমার মুখ লজ্জারক্তিম হয়ে উঠল—ভয় নেই, কালে সে ক্ষত পূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

'সু-কুলের বিবেকের স্বরূপ বল।'

'সে সুস্থ সবল শিশুটি, কলুষশূন্য, অনঘ।'

'তুমি চন্দ্রশেখরের বিবেকের স্বরূপ জান?'

'ঠিক জানি না,—বুঝতে পারি না, সে আমা হ'তে এত বিভিন্নধর্ম্মী। সে জন্মেছিল পূরো চার হাত লম্বা বলিষ্ঠ জোয়ান, বেড়ে উঠেছিল লম্বা সাতহাত,—শালপ্রাংশু মহাভুজ, কপাটবক্ষা ভীমকান্ত, পৌরুষসুন্দর। আমার প্রতিবেশী বন্ধুদের মধ্যে তেমন বলবান্ সুশ্রী বিবেক দেখি নি। সে লক্ষ্মণের মত চির-জীবন সংযমী, অতন্দ্র, অনলস, সতর্ক ছিল। সে আমাদের বিবেক সমিতির নায়ক ছিল। এত শীঘ্র স্বর্গপ্রস্থিত না হ'লে তার আরো গৌরববৃদ্ধি হ'ত নিঃসন্দেহ।'

'তুমি আমার নীরজাবোঠানের বিবেককে চেন?'

'একটু একটু। সে তপঃকৃশ নিয়ম বশী-কৃতচিত্ত তাপস কুমারের মত। নীরজার বিবেক তোমাকে মারের মত, সয়তানের মত দেখে; কিন্তু পাপজয়েই তার আনন্দ বলে' সে তোমায় ভালবাসে, কৃপা করে।

ঠিক এই সময়েই বাইরে গাড়ী থামার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই সিঁড়িতে পদশব্দ। আমি দরজা খুলে দাঁড়ালাম, নীরজাবোঠান একমুখ হাসি নিয়ে লীলাঞ্চিত চেলাঞ্চলখানি

গুটিয়ে নিয়ে ঘরে প্রবেশ কল্লে। প্রথম কুশলপ্রশ্নের পর বোঠান একটু মুখভার করে' অভিমানের স্বরে বল্লে—

'দেখ ঠাকুরপো, আমি তোমার ওপর বড় রাগ করেছি। একটু ঝগড়া করব। ঝি বলছিল, তুমি নাকি আজ আবার সমস্তদিন ঘরে দরজা বন্ধ করে' শুধু মদ খেয়েছ, আর গোলমাল করেছ। ছি! তুমি অমন করলে আর আমি তোমার বাড়ী আসব না।'.

নীরজার চির অদর্শন আমার পক্ষে ভীষণ শাসন, নীরজা তা বুঝত। আমার মনটা সেই শাসনে প্রথমে একটু বিচলিত হ'ল, আর দেখি বিবেকটা অমনি উৎফুল্লভাবে সোজা সটান হয়ে বসল। তখন আমি প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করে' চাঞ্চল্য দমন করলাম, বিবেক-টাও ম্লান, অবনত, কম্পিত হয়ে উঠল। আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনেও অবিচলিত দেখে', নীরজা বোঠান আশ্চর্য্য হয়ে বললে—

'দেখ ঠাকুরপো, সেই সব দুর্ভিক্ষকাতর অনশনক্লিষ্ট পরিবারদের সাহায্য করতে বলে' গেছলাম, তার কিছুই কর নি, আমাকেও কিছু জানাও নি। আহা কতগুলি প্রাণ তোমার অবহেলায় অকালে মরে গেল। তুমি তাদের ত' মারো নি, তুমি আমারই প্রীতি-স্নেহ-সখ্যকে উপেক্ষাদিগ্ধ করেছ। তোমার কি সে জন্যে একটুও লজ্জা বা কষ্ট বোধ হচ্চে না?'

আমি হেসে বললাম, 'কিচ্ছু না। কতক-গুলো অকর্ম্মণ্য প্রাণ অপসৃত হয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করে' গেল—এতে ত আহ্লাদ হবার কথা।'

এই বাক্যশেলাঘাতে আমার বিবেকবন্ধু মূর্চ্ছিত হয়ে সেই উচ্চ আলসে থেকে গড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে গেল। আমি আনন্দাতিশয্যে তার জড় নিস্পন্দ দেহের উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে পদমর্দ্দিত করে নাচতে নাচতে শিশ দিয়ে মনের লঘুতা প্রকাশ করতে লাগলাম। এই সব কাণ্ড দেখে আমার বোঠান বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতিকষ্টে অতিক্রম করে বললে—

'ছি ছি ঠাকুরপো, দরিদ্রের অনশনমৃত্যুতে আনন্দনৃত্য নিতান্ত গর্হিত। তুমি এতদূর অধঃপাতে গেছ?'

আমি রোষকষায়িত লোচনে রূঢ়স্বরে বললাম, বলি ঢের অনুযোগ অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আমারই ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকেই কটুভৎসনা! আমি আর সহ্য করব না। তোমার আচার্য্যগিরি, গুরুগিরি, শাস্ত্রীগিরি নিয়ে তুমি শীঘ্র দূর হও নতুবা অপমান হবে।'

নীরজা ভীতত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ চলে' গেল। বরাক বিবেক একটিমাত্র অস্ফুট কাতরশব্দ করে মরে' গেল।

আমি আজ জয়ী! বহুপ্রার্থিতদর্শন পরম শত্রু আজ পদমর্দ্দিত, চিরনিদ্রিত—কি সুন্দর দৃশ্য—আঃ কি প্রাণারাম, কি চিত্ততোষ! আজ আমি দুঃখাতীত নিরঞ্জন নির্ব্বিকার। আজ আমি মুক্ত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, জয়ী! আজ আমার নবজীবন লাভ হল। অহো পরমানন্দ।

আমি নূতন জীবন অতি সুখে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমার বৈঠকখানা থেকে দূরদৃষ্টি রোধ কর্ত্ত বলে একখানা কুটীর জ্বালিয়ে দিলাম; আমার বাগানটাকে দীর্ঘ-প্রস্থে মামানসই করব বলে' বিধবা ও অনাথ শিশুর বাস্তুভিটায় চাষ দিলাম আরো কত

কি জঘন্য কাজ—যাকে সামাজিক অভিধান পাপ বলে, তাই—অল্প দিনের মধ্যে করে' ফেললাম। কিন্তু এখন কি আরাম, নিরন্তর নিরন্তর বিবেকের কর্ণদাহকর অভিযোগ নাই, পীড়ন নাই, ধিক্কার নাই। আগে হ'লে ভাবনায় চিন্তায় আমাকে এতগুলো পাপ হয় ত' মেরে ফেলত; কিন্তু এখন আমি রূপার কাটির প্রভাবে প্রমুক্ত স্বাধীন, বিশ্ববিজয়ী, সম্রাট! এখন আমি ভূমানন্দ ভোগ কচ্ছি!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচয়।

ভারতবাসীর কাছে ভারতশিল্পের পরিচয় চেনা বামুণের পৈতার মতন নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু কালের গতিকে তাহারও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বিশেষ করিয়া।

সেদিন যখন সাহিত্য পরিষদে Havell সাহেবকে ভারতশিল্পের আদর বর্দ্ধনের জন্য ধন্যবাদ দিয়া অভিনন্দন পত্র দিবার প্রস্তাব হয়, শুনিয়াছি কেহ নাকি সেই সময়ে প্রশ্ন তুলিয়া ছিলেন—ভারতশিল্পটা এমন কি অপূর্ব্ব পদার্থ? ইউরোপীয় শিল্প যেমন আমাদের হুবহু মানুষটা কিম্বা জানোয়ার অথবা গাছ-পালাটা আঁকিয়া ও গড়িয়া দেয় ভারতশিল্পটা কোনকালে তেমনটা পারিয়াছে কি? তবে কিসের জন্য আমরা সুসভ্য পাশ্চাত্য শিল্পটাকে ছাড়িয়া তাহার আদর করিব আর সেই কারণে কেনই বা কাহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইব। Havell সাহেবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটা কতকটা "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং" গোছের বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে কিন্তু আমাদের নিজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটি বড় সিধে বলিয়া বোধ হয় না। যখন আমরা দেখি নিজের শিল্পে বীতশ্রদ্ধ, পরশিল্পলুব্ধ ব্যক্তিটা বড় একটা যে-কেহ নন, ইঁহার মতের সমর্থন করিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ 'কেহই' অগ্রসর তখন তো আর চুপ থাকিলে চলেনা। একের বিপক্ষে মৌন থাকা ভদ্রতার লক্ষণ বটে কিন্তু অনেকের বিপক্ষে চুপ করিয়া গেলে মৌনটা যে সম্মতি হইয়া পড়ে, তার উপায় কি? কাযেই লোক বুঝাইবার জন্য না হউক, নিজের মন বুঝাইবার জন্যও প্রশ্নটা লইয়া নাড়া চাড়া করা চাই।

নেপাল রাজদরবারে শুনিয়াছি, ঠিক শাস্ত্র-সম্মত ছবি না আঁকিয়া যদি নূতন রকম—অর্থাৎ দেশী না হইয়া বিলাতী ধরণ—ছবি কেহ আঁকে তবে তাহাকে ধরিয়া জেল দেয়। আমার পরশিল্পলুব্ধ দেশভ্রাতাগণের জন্য সে ব্যবস্থা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু এই প্রস্তাব লইয়া ব্রিটিশগভর্মেণ্টের কাছে যাইলে আগে তো ধরিয়া আমাকে তালা বন্ধ করিবে। অতএব 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' এই দেশী শ্লোকটার

চাল বানাইয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে 'Look before you leap' অর্থাৎ যেখানটায় নির্ভর করিয়া জীবলীলা যাপন করিতেছ সেটা ছাড়িয়া অপরিচিত কোন-একটা-কিছুর দিকে লাফ দেওয়াটা ঠিক নয়। যেটা ধরিতে যাইতেছি সেটা এত লোভনীয় কিনা যার জন্য সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাটাও তুচ্ছ করিতে পারি, দেখা কর্ত্তব্য। যে আমাদের নিজের শিল্পটা আমাদের জীবন যাত্রার চারিদিক দিয়া চিরদিন আমাদের মন হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, ধর্ম্ম আমাদের যে শিল্পকে সহায় করিয়া দেশে বিদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে, আমাদের জীবনের অনেকখানি সুখ, অনেকখানি গৌরব যেটার উপরে অনেকটা নির্ভর করিতেছে, সেটাকে ছাড়িয়া পশ্চিমসাগরপারে কোন একটা অনিশ্চিত চকচকে পদার্থকে হঠাৎ ধরিতে যাওয়ায় বিপদ তো নিশ্চিতই আছে উপরন্তু সে বিপদে কেহ যে আমাদের জন্য আহা উহু করিবে এমন আশাও খুব কম। ঐশ্বর্য্যকে বিষ জানিয়া যে গৃহস্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি সাধ করিয়া পথের কাঙ্গাল হইলেন বলিয়া কেহ তো দোষ দেয় না, উল্টা বরং তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আমরা ধন্য হইয়া থাকি। আর যে মূর্খ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অপব্যয়ে অর্থ উড়াইয়া পরিবারে অনর্থ ঘটাইয়া পথের কাঙ্গাল, লোকে কবে তাহাকে ভাল বলিয়া পূজা দিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, এই যে বাঙ্গালী আমরা মোটে দেড়শত কি দুইশত বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া বৎসর ত্রিশেক মাত্র পাশ্চাত্য শিল্পকলায় অপরিপক্ক শিক্ষা বা শিক্ষার ভাণ মাত্র লাভ করিয়া, perspective, light, shade এইরূপ দুই চারিটা বিলাতি বুলি কপচাইতে কপচাইতে বুড়া বিশ্বকর্ম্মার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া পশ্চিম আকাশে চকচকে পদার্থটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি সেটা কি কতকটা not looking before leaping গোছের কায করা হইতেছে না? সাধ করিয়া বাস্তু ভিটা কেহ ছাড়ে না, যদি বা নূতন বাড়িতে উঠিবার প্রয়োজন হয় তবু পাঁজিপুঁথি দেখিয়া কালাকালের জন্য অপেক্ষা করিয়া নূতন বাড়িটাকে যতটা সম্ভব পুরাতন বাড়িটার মত আবাসের এবং বাসোপযোগী করিয়া তবে অন্যত্র উঠিয়া যাই। সেইরূপ দেশীয় শিল্পটাকে ছাড়িবার বেলা এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে চলিবে কেন?

শুনিয়া খাওয়াতে আর চাখিয়া খাওয়াতে অনেক তফাৎ। রসগোল্লাটা চাখিয়া দেখিলে তবে বোঝা যায় সন্দেশ অপেক্ষা রসগোল্লাটা কত মিষ্ট আবার সন্দেশটাও চাখিয়া দেখিতে হয় নচেৎ কেমন করিয়া বুঝিব সন্দেশ মিষ্ট কি গোল্লাটা মিষ্ট। অতএব দেখিতেছি আমাদের এই শিল্প বিসর্জ্জন ব্যাপারে পুরাতনটাকে ছাড়িতে গেলেও যে গোল নূতনটাকে ধরিতে গেলেও সেই গোল। আমরা কালাকে ছাড়িয়া গোরাকে ধরিতে গেলে সে বলিবে,—তুমি আগে কালার সহিত বেশ করিয়া পরিচয় করিয়া এস তবে তো বুঝিবে গোরার কত গুণ, আবার কালার পক্ষ হইতে ঐ একই ভাবের কথা আমাদের শুনিতে হইবে—গোরাটা কতটা মিষ্ট তা

না জানিলে আমি অধিকতর মিষ্ট কি না বুঝিব কেমন করিয়া? এ যে দেখি বিষম বিপদ—রামের হাতেও মার, রাবণের হাতেও মার! উপায় কি? উপায় আছে বইকি। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' করিয়া নিজের শিল্পে ভিড়িয়া পড়া অথবা বহ্নিমুখ পতঙ্গবৎ নূতন আগুনে আমার মত একবার জ্বালা সহিয়া আগুনটা কেমন লোভনীয় জানিয়া ফিরিয়া আসা। প্রথম উপায়টা সহজ; তাহাতে অনেক ল্যাঠা চুকিয়া যায়,—হত্যা দিয়া চরণে পড়িয়া থাকার মত। এ উপায়ে রসগোল্লাটা সন্দেশের চেয়ে মিষ্টতর কিনা বোঝা যায় না কিন্তু সেটা যে মিষ্ট সেটুকু বেশ বোধ হয়। কিন্তু এই উপায়ের দোষও আছে—সন্দেশটা না জানি কেমন এইরূপ মনে একটা লালসা থাকিয়া যায় এবং সুযোগ পাইলে সন্দেশের হাঁড়ির দিকে হাত বাড়াইতে ইচ্ছা করে কাযেই নিজের শিল্পে আত্মসমর্পণটা কতকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ দ্বিতীয় উপায়টিতে অনেক জ্বালা সত্য কিন্তু তাহাতে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা আর জীবনে ভুলিবার নয়;—ঘরপোড়া গরুর মত পোড়া মন পশ্চিমের সিন্দূরবরণ দেখিবামাত্র চমকিয়া ওঠে। গভীরতর দুঃখ পাইলে তবে জীবনের আনন্দ নিবিড়তর করিয়া বোঝা যায়; শিল্পে এই পতঙ্গবৃত্তি আমাদের সঙ্গে আমাদের শিল্পের যে বন্ধন ঘটাইয়া দেয় তাহা অটুট;—কাটাও যায় না কাটিতে ইচ্ছাও হয় না। এ অবস্থাটা যেন কতকটা, সতরংচ খেলার পাকা ঘুঁটির মত সব ঘর হইয়া নিজের কেল্লায় আসিয়া বসা। তবেই দেখা গেল, শিল্প বিষয়ে আর সকলের মত আমাদেরও অনন্য গতি অর্থাৎ আমরা যেদিকেই যাইতে চাহিনা কেন নিজের শিল্প চর্চ্চা না করিয়া আমাদের নান্যেব গতিরন্যথা। নদীর গতি নূতন নূতন দেশের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু সেই চির-পুরাতন নির্ঝরের সহিত যোগ রাখিয়া; পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেই তাহার মরণ নিশ্চয়। শিল্পের গতিও সেইরূপ; পুরাতনকে ছাড়িলেই সর্ব্বনাশ। আবার দেখা যায় নূতনের দিকে,—সম্মুখের দিকে নদীর যে স্বাভাবিক গতি তা যদি অবরুদ্ধ করিয়া তাহাকে উজান বহাইবার চেষ্টায় থাকা যায় তবে নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া তাহাতে আবর্জ্জনা ও চড়া পড়িতে থাকে এবং শেষে নদী একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়।

পুরাতনের সঙ্গে নূতন নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিলে আমাদের যে দশা নূতনের দিকে না যাইলেও সেই দশা।

যে দেশে যখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তখনই সেখানকার শিল্পে জড়তা ও মৃত্যু আসিয়া উদয় হইয়াছে।

এক কথায় শিল্পেতে হউক সভ্যতাতে হউক যেদিন হইতে আমরা adopt করিতে শিখি adapt করিয়া লইতে ভুলি সেই দিন হইতে আমাদের সভ্যতা কি শিল্প দুইয়েরই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। আমরা যখন কোন একটা শিল্পের উপযোগিতা অনুপ-যোগিতা গণ্য না করিয়া নির্ব্বিচারে সেটাকে গ্রহণ করি তখন বলিতে হইবে আমরা সেটা adopt করিলাম। আর যখন সেটাকে ভাঙিয়াচুরিয়া গড়িয়াপিটিয়া মনের মত, নিজের মত করিয়া লই তখন জানিতে

হইবে আমরা সেটা adapt করিয়া লইলাম।

adopting কতকটা যেন চাকরী করিতে বাসা-বাড়ীতে থাকা বা বাঙ্গালীর সাহেবী সাজ করার মত। দেহ, মন, উপযোগিতা, অনুপ-যোগিতার কথাই নাই। যেমনটি পাইলাম তেমনটি লইলাম। আর যেখানে adapting সেইখানেই আমার কথাটি আসিয়া পড়ে। আমার বাড়ি আমার সাজ আমার শিল্প!

মানব শরীরের পরিপাক শক্তি যেমন, শিল্পের পক্ষে adapting শক্তিটাও সেইরূপ দুইটা শক্তির বলেই বহির হইতে যেটাকে গ্রহণ করা হয় সেটাকে নিজের করিয়া দেয়। শরীর যেমন ভুক্ত দ্রব্যটাকে শোণিতে পরিণত করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে, শিল্পও তেমনি বাহির হইতে যখন যেটা গ্রহণ করে, সেটাকে নিজের করিয়া লইয়া নিজের ভিতরে অমৃতরূপে সঞ্চালিত করিতে থাকে এবং একমাত্র এই উপায়ে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই adapting ব্যাপারটা আমাদের শিল্পে পুরাকালে কিরূপ কাজ করিয়াছিল এবং একালেই বা কিরূপ কাজ করিতেছে দেখা যাক। একালে আমরা adapting ব্যাপার কি ভাবে চালাইতেছি তাহা দেখিবার জন্য আমাদের বেশিদূর যাইতে হইবে না। আমাদের পয়সাওয়ালাদের ঘরবাড়ী ও আমা-দের সংসারযাত্রার আসবাব গুলার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই চলিবে। কিন্তু পুরাকালে এই শক্তি আমাদের শিল্পে কিরূপ কাজ করিতেছিল তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচীন Asiatic Artটার চর্চ্চা করিতে হইবে অর্থাৎ তুরস্ক হইতে জাপান, একদিকে চীন তাতারের উত্তরসীমা আর একদিকে দক্ষিণ মহাসাগর এই বিরাট ভূখণ্ডের খণ্ড শিল্পগুলার ক্রমচর্চ্চা আবশ্যক, পরে বৌদ্ধযুগে যে মহাশিল্প এই খণ্ড শিল্পগুলাকে নিজতেজে অনুপ্রাণিত করিয়া এক অখণ্ড অম্লান Asiatic Artরূপে প্রকাশ করিয়া গেছে সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা চাই। বৌদ্ধযুগের ভারতশিল্পের বিরাট স্রোতের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতশিল্পও নানাদেশে নানা শিল্পের মধ্য দিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে! চীনে যাই, জাপানে চলি, তুরস্কের মরু-প্রান্তরেই বা সন্ধানে ফিরি সেই শিল্প যে শিল্প আমাদের ভারত-স্তূপ ভাস্কর্য্যে মণ্ডিত অজন্তা গুহা বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত করিয়াছে। সে যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই নিজের ছাপ স্পষ্ট অঙ্কিত রাখি-য়াছে অথচ সেই সেই দেশের শিল্পটাকে লোপ না করিয়া। আমি বলি এইখানেই ভারত-শিল্পের মহত্ত্ব। রাজার যেমন মহত্ত্ব প্রজার উচ্ছেদ সাধন না করিয়া প্রভাব বিস্তার করা; নদীর যেমন মহত্ত্ব শাখানদী গুলি শোষণ না করিয়া নিজের স্রোত পূরণ করা; তেমনি মহৎ শিল্পের লক্ষণই হচ্ছে অপর যে শিল্পের সংস্পর্শে আসে সেটাকে লোপ না করিয়া পরিত্যাগ না করিয়া নিজের উপযোগী করিয়া লয়।

এক প্রকারের রোগ আছে তাহাতে জঠরাগ্নি এত প্রবল হয় যে যাহা খাও তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায় ও মানুষটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহার চাহিতে থাকে। এই অপরিমিত আহারের ফলে দাঁড়ায়, মানুষটা চোখে দেখিলে বোধ হয় বেশ নধর ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে

কিন্তু ভিতরে শোনিতের পরিবর্ত্তে মেদ জমিতে জমিতে একদিন লোকটা বুক নয়তো পেট ফাটিয়া মারা পড়ে। কোন কারণে adapting শক্তিটা হারাইলে শিল্পের এই দশা হয়, সে ক্রমাগত আমাদের মত বাহির হইতে র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো, ব্রাসেল কার্পেট, ফ্রেঞ্চ কেদারা, ইতালীয় ভিলা, পম্পস্থ জার্ম্মান উল, ও প্রিন্টেড ছিট adopt করিতে থাকে; সে গুলাকে adapt করিতে অক্ষম হইয়া, আর তারি ফলে নিজের সঞ্চয় গুলার ভারে দম আটকাইয়া মারা পড়িয়া যক্ষের মত আমাদের রুধির শোষক হইয়া বিদ্যমান থাকে। মনুষ্য শরীরে পরিপাক শক্তির মত যদি আমাদের শিল্পে adapting শক্তি না থাকিত তবে সে পুরাকালে স্বচ্ছন্দ সুন্দররূপে প্রকাশিত থাকিতে পারিত না; এবং আজ প্রায় শতাব্দির উপর আমাদের adopt করা বুট ইত্যাদির নির্ঘাত ভার নির্যাতন সহিয়াও তাহাকে আবার মাথা নাড়া দিতে দেখিতাম না। বৌদ্ধ যুগ হইতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত যেমন বিচিত্র ধর্ম্ম, বিচিত্র সভ্যতা তেমনি নূতন নূতন শিল্প আসিয়া আমাদের শিল্পের সঙ্গে কত যে মিলিয়াছে তাহার অন্ত নাই; কিন্তু এই সমস্ত বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া আমাদের শিল্পের চিরপুরাতন ধ্রুবপদের পবিত্র স্বর সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাই—

প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ
তথা নান্যেন মার্গেন প্রত্যক্ষেণাপিবা খলু॥

নাভি যেমন শরীরের মধ্য-বিন্দু, তুরস্ক হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট Asiatic শিল্পের মধ্য-বিন্দু তেমনি আমাদের ভারত শিল্প। সেই ভারত শিল্পের মুলে হচ্ছে ধ্যান।

জগতে মূর্ত্তি-শিল্পে আমাদের দেশ একটি মাত্র মূর্ত্তি রাখিয়া গেছে সেটি হচ্ছে বুদ্ধদেবের ধ্যান মূর্ত্তি, ইহার তুলনা নাই ইহার জোড়া নাই। গ্রীক মূর্ত্তি-শিল্প তাহার সমস্ত নৈপুণ্য সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া শিল্পের সেই স্তরে আসিয়া পৌঁছে নাই যে স্তরে এই বুদ্ধমূর্ত্তির আসন।

এই বুদ্ধমূর্ত্তির আলোচনা করিবার সময় Havell সাহেব তাঁহার নবপ্রকাশিত পুস্তকে বলিয়াছেন—

"Now Buddha as we know attained to his Buddhahood at the close of a long fast; and according to the Canons of European art he should have been represented in a state of extreme emaciation ...but the Indian Sculptors never descended to such vulgarity. With their finer artistic insight they would not take the hidiousness of the starvation as the Symbol of their worship; they thought not of the feeble wasted human body but only of the spiritual strength and beauty the Master had gained through his enlightment. They gave him a new spiritualised body broad shouldered, deep chested, golden coloured, smooth skinned supple and lithe as a young lion.

ভারতশিল্প আমাদের কি দিতে চাহে ও দিতে পারে এক বুদ্ধমূর্ত্তিতে আর শুক্রাচার্য্যের কয় ছত্র শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গেছে।

ভারতশিল্পের কাছে আমরা যদি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি চাহিতাম তবে সে আমাদের গোলদিঘীর ধারে ইতালীয় শিল্পশাস্ত্রানুশারে গঠিত জরাজীর্ণ কুঞ্চিত মুখশ্রী ওই ক্ষীণবল বৃদ্ধমূর্ত্তিটি দিতে চেষ্টা করিত না; কিন্তু সাগরের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর জ্ঞান-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তাঁর যে তেজোময় অমর মূর্ত্তি যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মনে আছেন সেই মানস মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা পাইত।

আমার পিতামহের কোন মূর্ত্তি কি প্রতিকৃতি আজ প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া পাই নাই কিন্তু তাই বলিয়া পিতামহের মূর্ত্তি না থাকার অভাবটা বড় বোধ করিতে পারি নাই তাঁর সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও বৃদ্ধদের মুখে গল্প ও বর্ণনা শুনিয়া পিতামহের একটা কমনীয় হাস্যময় প্রফুল্ল মূর্ত্তি আমার মনে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ একদিন বর্দ্ধমানের রাজবাটি হইতে পিতামহের এক তৈলচিত্র পাওয়া গেল; অবশ্য এই আবিস্কারে আনন্দলাভ করিলাম কিন্তু দাদামহাশয়ের চেহারা দেখিয়া নিরাশও যে হই নাই তাহা বলিতে পারি না—ইনিতো আমার সে দাদামশায় নন; সে নধর শরীর, হাস্যময় পুষ্ট মুখশ্রী, ধুতি চাদরে আলু আলু বেশ কিছুই নাই! ছবিটা যে তাঁহারই Portrait তাহার লিখিত পড়িত অব্যর্থ প্রমাণ সত্ত্বেও পরিবারের অনেক বৃদ্ধারা অস্বীকার করিয়া বসিলেন; আমিও তাঁহাদের মতে মত দিয়া ছবিটা Family Portrait galleryতে রাখিলাম বটে কিন্তু মনে আমার সেই দাদামহাশয়ের মানসমূর্ত্তি তাঁর নির্ভুল পার্থিব প্রতিমূর্ত্তির চেয়ে জীবন্ত সত্য রূপে জাগিয়া রহিল এবং দাদামহাশয়ের অভাব তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ পরিপূরণ হইতেছে। এরূপটা কেন হয় বলিতে পার? বোধ হয় চোখে আমরা মানুষটার মায়াচ্ছন্ন ছদ্ম মূর্ত্তিটা দেখি আর মনে তাহার সত্য মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই বলিয়া। শাস্ত্রেও তো বলে সত্যটা চোখে দেখা যায় না, মনে ধরা দেয়।

আমাদের শিল্প বলে বিদ্যাসাগরের জরাজীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর মাটির দেহের ছাচ লইয়া কি লাভ—এই লও আমি তোমাকে সেই মুক্ত আত্মার অজর মূর্ত্তি দিতেছি যে মূর্ত্তিতে তিনি দেবলোকে বাস করিতেছেন এবং যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মানসলোকে বিরাজ করিতে চাহেন।

এইখানেই আমাদের শিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের মূলগত প্রভেদ। এই প্রভেদ Havell সাহেব তাঁহার পুস্তকে অতি সুন্দর করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

Europen art has as it were its wings clipped, it knows only the beauty of Earthly things. Indian art soaring into the highest emphyrean, is ever trying to bring down to Earth something of the beauty of the things above....Physical beauty was to the Greeks a divine characteristic, the perfect human animal received divine honours

from them both before and after death.

The Hindu artist has an entirely different Starting point. He believes that the highest type of beauty must be sought after, not in imitation or selection of human or natural forms but in the endavours to suggest something finer and more subtle than ordinary physical beauty.......Indian art is essentially idealistic mystic symbolic and transcendental. The artist is both priest and poet.

আমাদের Asiatic art আমাদের কি দিয়াছে এবং দিতে পারে দেখিলাম। এখন যে European artএর দিকে আমরা মৃগতৃষ্ণিকা লুব্ধের মত ছুটিতে চলিতেছি সেটাইবা আমাদের কি দিয়াছে বা দিতে পারে দেখিয়া ঘরে যাইব। গোরার সহিত করমর্দ্দন না করিয়া গেলে কালার কাছেও যে সম্মানের আশা নাই। পূর্ব্ব শিল্পের ইতিহাসটা আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই এই গোরা শিল্পরাহুর কবলে কেবল আজ আমরাই যে পড়িয়াছি এমন নয় পুরাকালে এই জম্বু দ্বীপের একটি নাতিবৃহৎ অংশের অত্যধিক উদারচেতা রাজা ও প্রজামণ্ডলী গান্ধার প্রদেশের art school নয় art পাঠশালা গুলায় অত্যধিক পরিমাণে গ্রেকো রোম্যান শিল্প ও শিল্প শিক্ষকের আমদানি করিয়া নিজকে গোরারাহুগ্রস্ত এবং আমাদের গালে চিরদিনের জন্য গোরা কলঙ্ক লেপন করিয়া গিয়াছেন। যে শিল্পীর কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য বোধ আছে Havell সাহেবের সহিত একমত হইয়া সেই বলিবে "The Buddhas and Bodhi Sattavas of this period are soulles puppets, debased types of the Greek and Roman pantheon posing uncomfortably in the attitudes of Indian asceticism. Not even in the best type of Gandhara do we find the sparituality the worshipfulness of the true Indian ideal.

কথায় বলে History repeats itself কি আশ্চর্য্য যথনই আমরা পাশ্চাত্য শিল্পের পিছনে ছুটিয়াছি তথনই এইরূপ কুকাণ্ড করিয়া বসিয়াছি।

গোরাশিল্প আমাদের কি দিয়াছে দেখিলাম। কি দিতে পারে অর্থাৎ সে শিল্প-দেবতাটি কত ক্ষমতাবান তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিত Max Nordan'র মুখ হইতে শুনিয়া লই। পণ্ডিত তাঁহার নিজের দেশের শিল্প সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন—The art of future will be no *little chapel* but a mighty cathedral *wide enough* to admit the whole mankind and that will be exactly *its vocation : to be hallowed place* where in mankind will rise again to the *childship of God* for which religion has educated them in past stages of Evolution. কয়ছত্র হঠাৎ পড়িলে ইউরোপীয় শিল্পের বিরাট ভবিষ্যৎ আশায় মনটা

উৎফুল্ল হইয়া উঠে কিন্তু কথাটা তলাইয়া বুঝিলে দেখি, কাহার কাছে পণ্ডিত জগজ্জয়ের আশা করিতেছেন। এবং সে ভিত্তিটাইবা কিরূপ যার উপরে পণ্ডিত তাঁহার গগনস্পর্শী শিল্পগির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে চাহেন— little chapel, wide enough নয়, এমন art যাহার vocationটা exactly এখনও ঠিক হয় নাই, little chapel যাহা cathedral হইলে তবে hallowed হইবে এবং সেটা হইলে যেখানে আমরা childship of God পাইয়া অমর হইব! ভ্রূণ নিরাপদে গর্ভাবস্থা কাটাইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্লেগ বসন্ত অকালমৃত্যু অপমৃত্যু কাটাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ হইয়া দিগ্বিজয় করিবে! এতদিন আমাদের ধৈর্য্য ধরিতে হইবে আশা প্রতীক্ষা করিতে হইবে! এটা যে আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত শুনাইতেছে; কিন্তু উপন্যাসের কাচের বাসনের মত এ স্বপ্নটাও যে হঠাৎ পদাঘাতে চূর্ণ হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। আমাদের ধৈর্য্য সহজে নষ্ট হয় না কিন্তু তাহারও তো একটা সীমা থাকা চাই। childship of God আমরাও পাইতে চাহি। "দেবাণাং প্রতিবিম্বানি কুর্য্যাচ্ছে যক্ষাণি চ স্বর্গানি" ইত্যাদি ভারতশিল্পের মূলমন্ত্র কি আমাদের সেই পথই নির্দ্দেশ করিতেছে না? ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল কঠোর সাধনার ফলে এই European দেবতাটি আমাদের দিয়াছেন কি? দুঃখ দিয়াছেন দৈন্য দিয়াছেন আর দিয়াছেন তাঁহারই সন্তানগণের মুখের বাক্যবাণ! ইনি আমাদের আপনার বলিবার কিছু রাখেন নাই যদিও আমরা নিতান্ত আপনার লোকের মত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার দেশের Furniture Oilpainting কেদারা চৌকি দিয়া সাহেবি পছন্দমত ঘরখানি সাজাইয়াছি।

শাস্ত্রে আছে দেবতা সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে আসিয়া আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া যান। সকলের সে সৌভাগ্য ঘটে না সেই জন্য সহজে বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু আমি সেটা অবিশ্বাস করিতে পারি না। এইরূপ ইউরোপ হইতে সেখানকার শিল্পদেবতাই হউন বা কোন দেবদূতই হউন অল্পদিন হইল কেহ একজন এক ফরাসী কুমারী artist বেশে আমাদের বাড়িতে দেখা দিয়া আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গেছেন তাহা বলিতে আনন্দও হয় আবার চক্ষু ফাটিয়া জলও আসে। কন্যা পৃথিবী ঘুরিয়া আমাদের দেশের রাজারাজড়ার ঘর বাড়ি আসবাবপত্র তন্ন তন্ন পরখ করিয়া যখন আমায় আসিয়া বলিলেন—সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া এই আমি একমাত্র তোমাদের ঘরে স্বজাতীয় শিল্পের আদর ও চর্চ্চা দেখিতেছি—মহিলাটির কথায় প্রথমটা আমার একটু আনন্দ ও গর্ব্ব হইল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতিত দেশে শিল্পকলার দুর্গতির একটা জীবন্ত ছবি হৃদয়ে বিঁধিয়া রহিল। আমার সেইদিন হইতে কেবলি মনে হইতেছে—হায়রে যার জন্যে চুরি করিলাম সেই বলিয়া গেল চোর!!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একজন বহিষ্কৃতের দৈনিক-লিপি।

(ফরাসী হইতে)

শুক্রবার ২১ জুন ১৯০১

জাপান হইতে ফিরিবার সময়, মনে করিলাম, সাইবিরিয়া ও রুসের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে আসিব। ক্রমে ভ্লাডিভষ্টকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়, এদেশের তত্ত্বানুশীলনের জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন; প্যারিস-অ্যাকাডেমীর প্রধান অধ্যক্ষের নিকট হইতে এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্রীয় সচিবের নিকট হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছি; তাই মনে করিলাম, আমাদের "মিত্র-সাম্রাজ্যের" মধ্য দিয়া আমি অক্লেশে ও অবাধে ভ্রমণ করিতে পারিব।

তবু, আরও আইন-দুরস্তভাবে কাজ করিবার জন্য য়োকোহামার ফরাসী কন্সলের নিকট হইতে ভ্রমণের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম,—তাহা আমি এই নগরের রুস-কন্সলকে দেখাইয়াছি। তা ছাড়া, টোকিয়ো নগরের রুসীয় রাষ্ট্রদূত, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, সাইবিরিয়ার উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের নিকট আমার নামে পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সিন্তৌ নামক একটা জর্ম্মান-জাহাজে চড়িয়া আমি একটু প্রাক্-কালেই এই বন্দরে আসিয়া পৌছিলাম। কিন্তু এখন ডাঙ্গায় নামিবার যো নাই; যতক্ষণ না রুসীয়-পুলিস্ আসিয়া যাত্রীদিগের ছাড়-পত্র পরীক্ষা করিবে ততক্ষণ জাহাজেই অপেক্ষা করিতে হইবে। একজন জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী, ছাড়-পত্র পরীক্ষা করাইবার জন্য সমস্ত জাহাজে যাত্রীদিগকে এক জায়গায় জড়ো করিলেন। প্রায় ৮ ঘটিকার সময়, রুস-জাহাজের পতাকা উড়াইয়া একটা নৌকা আমাদের জাহাজের দিকে আসিতে লাগিল; দেখিলাম, সেই নৌকায় কতকগুলি উর্দ্দি-পরা লোক রহিয়াছে:—একজন বন্দরাধ্যক্ষ (harbour master) ও বিভিন্ন পদস্থ কতকগুলি পুলিস্ কর্ম্মচারী। প্রথমেই এই পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের দারুণ নিষ্ঠুর ও করাল-কুটীল মুখের ভাব আমাদের নজরে পড়িল, এবং একটা অস্পষ্ট অহেতুক ভীতির দ্বারা আমাদের সকলেরই হৃদয় আক্রান্ত হইল। আমাদের মনে কেন এইরূপ অহেতুক ভীতির সঞ্চার হইল?

এই সময়ে এক দল চীন্-যুবক, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, পুলিস্ কর্ম্মচারীদিগের নিকট তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাদিগকে কতকগুলা মোটা-মোটা চুরোট্ দিল। তাহারা গ্রহণ করিল। গত কল্য আমি এই চীন-যুবকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে সে ভ্লাডিভষ্টকে গিয়া বাণিজ্যব্যবসায় আরম্ভ করিবে। ভ্রমণের ছাড়-পত্র যেই দেখান হইয়া গেল অমনি যাত্রীরা একটা চীনে জাহাজে উঠিয়া ডাঙ্গায় নামিয়া পড়িল। আমি দেখিলাম,—রুস, জর্ম্মান, জাপানী, চীনে, কোরীয়—একে-একে সবাই চলিয়া গেল। শুধু আমিই কেন একলা রহিলাম—আমার কাগজগুলা কেন আমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না?

উহারা আমাকে কাপ্তেনের ঘরে যাইতে

বলিল। বন্দরের অধ্যক্ষ, জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে সেই ঘরে ছিলেন; তিনি জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁহার কাম্রার দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিয়া, আমাকে জাহাজের বৈঠকখানা-ঘরের একটা কোণে টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং ইংরাজি ভাষায় চুপি-চুপি আমাকে বলিলেন যে, ভ্লাডিভষ্টকের শাসনকর্ত্তা আমাকে এখানে আট্‌কাইয়া রাখিতে হুকুম দিয়াছেন। শাসনকর্ত্তাকে না জানাইয়া আমি ডাঙ্গায় নামিতে পারিব না। আরও বলিলেন,—এখনি ফিরিয়া আসিয়া তিনি আসল ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইয়া বলিবেন।

এই রহস্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, চিন্তাকুল চিত্তে আমি ডেকের উপর পায়চালি করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে দুইটি ছোট ছোট পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম; সেই দুইটি পাহাড়ের উপর ভ্লাডিভষ্টকের নূতন বাড়ীগুলি থাকে-থাকে উঠিয়াছে: একটা বৃহৎ রুস গির্জ্জা, বড় বড় বাড়ী, একটা বড় জার্ম্মান-বাণিজ্য-কুঠীর দোকান ও বিপণি-সকল এখান হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। তাহার পর, পার্শ্ববর্ত্তী গিরি-সমূহের সবুজ ঝোপঝাপের মধ্যে, অনেকগুলি দুর্গ দৃষ্টিগোচর হইল। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম যে দুর্গ তাহার উপর বড় বড় কামান স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

দশটার সময়, বন্দরের কর্ত্তা আবার আসিলেন। আবার তিনি মৃদুস্বরে—এবার জর্ম্মান ভাষায়—তিনি আমাকে চুপি চুপি এইরূপ বলিলেন:—একমাস হইল, ভ্লাডিভষ্টকের শাসনকর্ত্তা পুলিস-সচিবের নিকট হইতে একটা টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, তাহাতে রুসরাজ্যে আপনাকে প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করা হইয়াছে; আর আপনাকে উদ্দেশ করিয়াই যে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই আদেশ-পত্রে আপনার নিজ নাম, আপনার কৌলিক নাম, এমন-কি আপনার দর্শন-অধ্যাপকের উপাধি—সমস্তই বিবৃত হইয়াছে…” হতবুদ্ধি হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অপরাধে আমার সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ প্রচার হইয়াছে? তিনি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—“এইরূপ স্থলে, কোন হেতু প্রদর্শন করা রুস-দেশের দস্তুর নহে।”

আমি বলিলাম,—আমি একজন অধ্যাপক, প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমি একটা বিশেষ কাজে প্রেরিত হইয়াছি; জাপানস্থ রুসীয় রাষ্ট্রদূত, ভ্লাডিভষ্টকের শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য শাসন কর্ত্তার নামে আমাকে যে সকল পত্র দিয়াছেন তাহাও দেখাইলাম। বন্দরাধ্যক্ষ, শাসনকর্ত্তার হাতে ঐ সকল পত্র আমাকে দিতে বলিলেন। হয়ত ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া শাসনকর্ত্তা, সেণ্টপিটরস্‌বর্গে পত্র লিখিয়া বহিষ্করণের আদেশ রহিত করাইতে পারিবেন।

একটু পরেই, আমাদের জাহাজের কাপ্তেন আসিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন—জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় নামিয়া যদি নিকটস্থ কোন স্থানেও বেড়াইতে যাই তাহা হইলে আমি বিপদে পড়িব। আমার উপর নজর রাখিবার জন্য একজন রুস পুলিস কর্ম্মচারীকে জাহাজে মোতায়েন রাখা হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার জন্য একটা ক্যাবিন্‌ও ভাড়া করা হইয়াছে। ফলকথা, জাহাজে আমি বন্দী।

সমস্ত অপরাহ্ণ, আমি ডেকের উপর পায়চালি করিতে লাগিলাম, আর আমার এই দুর্ঘটনার কারণ কি, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। রুস-দেশ সম্বন্ধে আমার কোন মতামত আমি ত কোথাও প্রকাশ্যরূপে বলি নাই কিংবা লিখি নাই। রুসের রাষ্ট্রপদ্ধতি আমার মনে যে সকল ভাবের উদ্রেক করিয়াছে—(হয় ত সেগুলি প্রতিকূল ভাব) তাহা কোথাও ত প্রকাশ করিয়া বলিবার উপলক্ষ্য ঘটে নাই। যে সময়ে, ভীষণ অত্যাচারে উৎপীড়িত রুস্-ছাত্রদিগের অনুকূলে, কিংবা ধর্ম্মসমাজবহিষ্কৃত মহাত্মা টল্‌ষ্টইর অনুকূলে, কিংবা রুসীয় যথেচ্ছাচার-নিষ্পেষিত ফিন্‌ল্যাণ্ডের অনুকূলে, একটা আবেদন-পত্র স্বাক্ষরিত হইতেছিল তখন ত আমি প্যারিসে ছিলামই না। সেই সর্ব্বজনবিদিত হত্যাকাণ্ডের পর, আর্ম্মিনীরা সহজেই রুস-ভাবাপন্ন হইবে মনে করিয়া, যখন রুসিয়া, দৌত্যনৈপুণ্যের দ্বারা, আর্ম্মিনীদিগকে য়ুরোপের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিল, তখন সে সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকটে আমি বলি নাই। যখন রুস-সেনানায়কগণ, ব্লাগোভেসচেন্সক-নগরে, তিন সহস্র নিরীহ চীনেদিগকে ডুবাইয়া মারিয়াছিল, তখন সে সম্বন্ধেও আমার কোন অভিপ্রায় কাহারও নিকট আমি ব্যক্ত করি নাই। তবে আমার উপর এ জুলুম্ কেন?

বোধ হয়, পিটর্‌সবর্গের পুলিস্ জানিতে পারিয়াছে, আমি পূর্ব্বে কতকগুলি বিপ্লবকারী রুস্-যুবতী ও রুস্-যুবকের সহিত যাতায়াত করিয়া সম্মান ও আনন্দ অনুভব করিতাম। দুই বৎসর হইল, বর্লিন-নগরে এইরূপ ঘটিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমরা তাহাদের সহিত একসঙ্গে যাইতাম।

আমাদের কতকগুলি সাধারণ বন্ধুর বাটীতে আমরা একত্র সম্মিলিত হইতাম;—আমাদের সেই বন্ধুগুলি প্রকৃত ‘অন্তর্জাতীয়’ (internationalist) দলের লোক। সর্ব্বদেশীয় উদার-পন্থী ও সাম্যবাদীরা (socialist) তাঁহাদের গৃহে আসিয়া মিলিত হইতেন। এবং যে সকল প্রকাশ্য সভা-সমিতি বর্লিন-সমাজ-জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ—সেই সকল সভাসমিতিতেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হইত। তখনকার সেই সব কথা মনে করিতেও আনন্দ হয়:—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মদের ভাঁটী; অসংখ্য মজুর ও মজুরণী ‘বিয়ার’-সুরা পান করিতেছে; মাধ্যাহ্নিক ভোজনে শুধু এক টুক্‌রা শূকর-মাংস আহার করিতেছে; তাহাদের মধ্যে, অল্পই নাগরিক; শুধু কতকগুলি ইহুদী ও ইহুদিনী; কতকগুলি ছাত্র ও বিদেশী ছাত্র; বক্তা (প্রায়ই জর্ম্মান-পার্লেমেণ্টের সাম্যবাদীদলের প্রতিনিধি) ছুঁচালো শিরস্ত্রাণ মাথায় পরিয়া বক্তৃতা করিতেছে, আর তাহার দুই পাশে পুলিস্-কমিশনার ও বক্তৃতা-বন্দোবস্তকারী ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। পুলিস্-কমিশনার নোট্ লইতেছেন; এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই তিনি সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত আছেন; শ্রোতৃমণ্ডলী খুব মনোযোগের সহিত সেই বক্তৃতা শুনিতেছে, এবং নিয়মশাসনও বেশ মানিয়া চলিতেছে। কেবল সময়ে সময়ে, জনতা হইতে এক একটা চীৎকার ধ্বনি উঠিতেছে!—“ঠিক্ কথা! Sehr richtig!”…

কোনপ্রকারে সময় কাটাইবার জন্য আমি অতীত কালের আনন্দগুলিকে আবার কল্পনায় আনিতে লাগিলাম। রুস-রাজ্য আমার প্রতি যে নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন, পাছে তাহার দরুণ আমি রুস্-দেশের প্রতি অন্যায় করি, এই ভয়ে আমি সেই সব বিপ্লব-পন্থী রুস্‌দিগের স্মৃতি আমার মনে জাগাইতে লাগিলাম—যাহাদের উপর পূর্ব্বে আমার খুব শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। বিশেষত দুটি যুবতীর কথা মনে আনিলাম; তাহাদের মতামত এক হইলেও, তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকিলেও, দুইজন দুই রকমের।—একজন ক্ষুদ্রকায় রুস্-রমণী, সুশ্রী, সুবেশী ও মন, মোহিনী; তাহার বড় বড় কালো চোখে, ও তাহার চঞ্চল ক্ষুদ্র ঠোঁট দুটিতে প্রকাশ পায় যে, তাহার আভ্যন্তরিক জীবন বিশুদ্ধ মহৎ-ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই রুস্-যুবতী বেশ বুদ্ধিমতী ও সুবোধ, শিশুপ্রকৃতি ও কৃতবিদ্য আমুদে ও গম্ভীর, পর্য্যায়ক্রমে,—ভাবোন্মত্ত, পরিহাস-প্রিয় ও বৎসল।—তাহার পিতা, রুস্-সৈন্য-মণ্ডলীর একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক; তাহার সকল ভাই ও ভগিনীপতিরাও সেনানায়ক, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ Guard-সৈন্যশ্রেণীর অন্তর্গত সেনানায়ক। এক দিন ঐ রমণী, সোস্যালিষ্টের উচ্চ আদর্শে মুগ্ধ হইয়া, তাহার পিতামাতাকে জানাইল—সে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া সেণ্ট পিটর্‌স্‌বর্গে যাইতেছে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইল। এক্ষণে সে রাষ্ট্র-নৈতিক কার্য্যে ও প্রচারকার্য্যে উৎসাহের সহিত ব্যাপৃত হইল। সে এরূপ লোক-বোধ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও সাদাসিধা সংক্ষিপ্ত বাক্য সকল রচনা করিতে লাগিল, যাহা অল্প-শিক্ষিত লোকেরা সহজেই বুঝিতে পারে। যখন আইননিষিদ্ধ গ্রন্থ কিংবা পুস্তিকাসকল আনিবার জন্য রুসিয়া-সীমান্ত প্রদেশে যাওয়া আবশ্যক হইত, তাহার সঙ্গীগণ এই গুরুতর ও ভীষণ কার্য্যের ভার তাহার উপরেই ন্যস্ত করিত: তখন সে এমন একজন পর্মিটের কর্ম্মচারীকে খুঁজিয়া বাহির করিত যে তাহার পিতা কিংবা ভ্রাতাদের সঙ্গী; তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিত—ফ্রান্স কিংবা জর্ম্মানি হইতে তাহার নামে যদি কোন পরিচ্ছদ ও টুপির বাক্স আসে, তাহা যেন খোলা না হয়; পর্মিটের বাধ্য লোকেরা ঐ সময়ে চোক্ বুজিয়া থাকিত। এইরূপে সাম্য-বাদ-সংক্রান্ত ফরাসী ও জার্ম্মান গ্রন্থসকল, রুসরাজ্যে প্রবেশ করে!

তাহার সখী, Lydia-M., কদাকার, বেঁটে ও মোটা; তাহার মুখ ফুলো-ফুলো ও ফ্যাকাশে; কেবল তার চোখে একপ্রকার অপূর্ব্ব আলোক,—একটা আগুন জ্বলিতেছে। কাপড়-চোপড় গরিবিয়ানা ধরণের, আধুনিক সৌখীন ধরণের নহে; সেকেলে টুপী; প্রকাণ্ড চাবাড়ে ছাতা। এই রমণীও স্বকীয় পরিবার বর্গকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। তাহার আত্মীয় স্বজন রাজধানীতে উচ্চ-উচ্চ পদে নিযুক্ত; এখন এই রমণী সোস্যালিষ্টদের কার্য্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে; দুঃখের জীবন বীরত্বের সহিত বরণ করিয়াছে, কাগজে প্রবন্ধ ও অনুবাদ লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; দিনের প্রধান ভোজনের সময় কখন একটুকরা রুটি, কখন একটু পনির, কখন এক পেয়ালা চা খায়; তাছাড়া, অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান সঙ্গীদের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করে না। সে সাম্য-তন্ত্রের বিবিধ মতবাদ অনন্ত আগ্রহের সহিত

অধ্যয়ন করে। তাহার বন্ধু, Karl Marx প্রণীত 'Kapital'-গ্রন্থের প্রথম ভাগমাত্র পাঠ করিয়াছে, কিন্তু এই রমণী তিন ভাগই পাঠ করিয়াছে বলিয়া তাহার বন্ধুর মুখে প্রশংসা আর ধরে না...Lydia M-এর একটা বৃহৎ সঙ্কল্প আছে: সে, পিটর্‌স্‌বর্গে একটা লোকোপযোগী পাঠাগার স্থাপন করিবে; প্রকাশ্যভাবে শ্রমজীবীদিগকে আইন-সম্মত বিজ্ঞান ও গল্পের কেতাব সকল ধার দিবে, কিন্তু গোপনে, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত নিষিদ্ধ গ্রন্থসকল তাহাদিগকে পড়াইবে। এইরূপে, সে দুই বৎসর প্রচারকার্য্য চালাইতে পারিবে বলিয়া আশা করে। দুই বৎসরের পর প্রায়ই এই সকল লোক ধরা পড়ে ও গেরেফ্‌তার হইয়া ৫।১০ বৎসরের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়; তাহার পর, যখন ভাঙ্গা-শরীরে ফিরিয়া আসে, তখন আর তাহারা সোস্যালিষ্টদের কাজে তেমন সফলতার সহিত ব্যাপৃত হইতে পারে না। কিন্তু তাহার আরব্ধ কাজ আবার তাহার অন্য সহকর্ম্মীরা চালাইতে থাকে...

এই স্মৃতিগুলি আমার মনে যতই জাগিয়া উঠিতেছে, ততই যেন আমার এই বন্দী-অবস্থার কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি। কয়েক মাস হইল, Lydia M-কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম; তাহাতে ভ্লাডিভষ্টক ও সাইবিরিয়া দিয়া আমি রুশিয়ায় পৌঁছিয়াছি, এই সংবাদটি ছিল। হয়ত আমার সেই রমণী-বন্ধু গেরেফ্‌তার হইয়াছেন, আমার চিঠি ধরা পড়িয়াছে; রুস্-সম্রাটের পুলিস্, বোধ হয় আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কতকগুলি বন্ধুত্বসূচক কথার আবরণের মধ্যে, এরূপ বিশাল রাষ্ট্রনৈতিক মৎলব সকল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যাহা রুস্-রাজ্যের পক্ষে বড়ই বিপদজনক।

আমার অনুমানটি যদি ঠিক্ হয়, যে দারুণ অত্যাচারে, রুসিয়ার সমস্ত উদারচেতা মহাত্মা-গণ নিষ্পেষিত হইতেছেন, আমিও সেই অত্যাচারের অংশভাগী হইতে গর্ব্ব বোধ করিব। যদি পরে আমার এই ঘটনার কথা শুনিয়া রুস-বিপ্লব-পন্থীরা আমার নিকট আসেন এবং আমাদের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমার কত আনন্দ হইবে। প্রকৃত বীরপুরুষ ও বীর-রমণীর মধ্যে বাস করিয়াছি বলিয়া যদি কখন আমার মনে একটা স্থায়ী ধারণা হইয়া থাকে, তবে যখন আমি সেই রুস্-ছাত্র ও রুস্-ছাত্রীদের মধ্যে যাতায়াত করিতাম, তখনই সে ধারণা হইয়াছিল।*

যখন রাত্রি প্রায় দশটা, তখন ভ্লাডিভষ্টকের প্রজ্বলিত দীপালোক দেখিবার জন্য ক্ষণেকের জন্য আমার ক্যাবিন হইতে বাহির হইলাম। আমার ক্যাবিন্-দ্বারের নিকটেই যে 'রেলিং' ছিল সেই রেলিং-এর উপর কনুইয়ের ভর দিয়া আমার পুলিস্-প্রহরী আমার উপর বরাবর নজর রাখিতেছিল...।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* আমার অনুমানটি ঠিক্। আমার পত্র যখন সেণ্টপিটারস্‌বর্গে পৌঁছায় তখন Lydia M কারাগারে বদ্ধ। ঐ সময়ে, জেল্‌খানাগুলা পরিপূর্ণ থাকায়, উহাকে একটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক নগরের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতে আসিয়াই লিডিয়া শ্রমজীবিদের সহিত আবার মিশিতে লাগিল; একটা ধর্ম্মঘটের দিনে, সেই ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে লিডিয়া যোগ দেয়; "লাল পতাকার" পার্শ্বে লিডিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে তাহাকে গেরেফতার করে, তাহার পর, ৫ বৎসরের জন্য সাইবিরিয়ায় প্রেরিত হয়। লিডিয়া এখন সাইবিরিয়াতেই আছে।

রাজ্যের কথা।

আশুতোষ বিশ্বাস। কয়েকমাস চারিদিক নিস্তব্ধ দেখিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম যে দেশের উন্মত্ত যুবকগণের গুপ্তহত্যার অভিনয় বুঝি চিরদিনের মত শেষ হইল। কিন্তু আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। সেদিন গবর্মেণ্টের উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস গুপ্তহত্যাকারীর গুলির আঘাতে প্রকাশ্যভাবে নিহত হইয়াছেন। হত্যাকারীর নাম চারুচন্দ্র বসু। এই বিংশতি বৎসরের যুবা আশুবাবুর প্রতিবেশী ও পরিচিত। যেরূপ ভাবে সে আশুবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে মনে হয় সে কিছুদিন ধরিয়া তাহার এই হিংস্র কর্ম্মের অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিল। আশুবাবুকে আঘাত করার পরক্ষণেই চারুকে পুলিসের লোক ধরিয়া ফেলে এবং তাহাকে এই হত্যাচেষ্টার কারণ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে সে বলিয়াছিল—"আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছি—এ হত্যা বিধাতার অভিপ্রেত।" বিচারে চারুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

আশুবাবু উন্নত চরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার জীবনের প্রথমভাগে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। দেশসেবা যখন উপহাস ও লাঞ্ছনার বিষয় ছিল, স্বজাতিগঠন যখন স্বদেশবাসীর নিকট আকাশকুসুম বলিয়া বিবেচিত হইত, পরার্থের জন্য স্বার্থত্যাগ যখন মস্তিষ্কবিকার বলিয়া পরিগণিত হইত, আমাদের জাতীয়জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে আশুতোষ সুরেন্দ্রনাথের সহিত একত্রে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই আশুতোষ আজ তাঁহারই স্বদেশবাসীর নিকট নিহত—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

আশুবাবু আমাদের পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু; তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার জন্য, তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য আমরা যেরূপ শোকাভিভূত হইয়াছি—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের দেশের অরাজকপন্থী—ভ্রান্তমতি বালকগণের চিত্তবিকার উপলব্ধি করিয়া আমরা যেরূপ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছি—যদি সম্ভব হয়—তবে তাহা আরো গুরুতর।

দেশকে উন্নত করিতে হইলে, স্বজাতিকে শিক্ষা শ্রী সম্পদে ভূষিত করিতে হইলে; জাতি গঠনেই আমাদের সকলকে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। নষ্টের পথ অবলম্বন করিয়া জগতে আজিও কেহ বা কোন জাতি দেশের মধ্যে স্বাধীনতা ও সম্পদ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। গঠন-কার্য্য যত কঠিন, অবস্থা যত প্রতিকূল, বাধা যত বিরাট, স্বদেশসেবকের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সংযম ও ধর্ম্মানুরাগ সেই পরিমাণে তত অধিকতর আবশ্যক।

দেশমঙ্গলব্রতধারী যুবকগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কোথায় ভারতের চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্যপথের যাত্রী হইয়া একের পুণ্যময় নির্ভীক আদর্শে অন্যকে কর্ম্মে কর্ত্তব্যে জাগ্রত করিয়া বিক্ষিপ্ত ভারতকে জাতীয় বন্ধনে এক করিয়া তুলিবে—না তাহারাই পাশবাচারকে বীরত্ব—মোহমদকে আত্মোৎসর্গ জ্ঞানে, দেশের হিতসাধন উদ্দেশে—দেশের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল! হায়! ইহা হইতে আমাদের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে! বালকদিগের মনের এই শোচনীয় অবস্থা তীব্র শেলের ন্যায় আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে; এই নির্ব্বোধ প্রিয়তম সন্তানদিগের হস্তনিক্ষিপ্ত শেলে যদি কোনদিন হৃদয় বিদ্ধ হয় তাহা হইলে কি ইহা হইতে অধিক বেদনা অনুভব করিব—জানি না!

শাসননীতি। একদিকে মতিভ্রষ্ট বালকগণ দেশহিত উদ্দেশ্যে দেশের অমঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত, অন্যদিকে শাসনকর্ত্তাগণ অনর্থকর উপায়ে ইহার প্রতিবিধানে উদ্যত, রাম এবং রাক্ষস উভয় হইতেই দেশ বিপন্ন। দেশের গণ্যমান্য লোকগণও এখন বিনা বিচারে বন্দী, বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত, দেশহিতকর সমিতিগুলি বিনষ্ট, বহু পূর্ব্বে কবে কোন লেখক তাঁহার পুস্তকে সিডিসন ইঙ্গিত করিয়াছেন—

সেই অপরাধে আজ তাঁহারা নিরতিশয় নিপীড়িত; এমন কি এই উপলক্ষে নিরীহ নির্দ্দোষ মুদ্রাযন্ত্রজীবির পর্য্যন্ত অনর্থক শাস্তিভোগ চলিতেছে। অধিক কি, সম্প্রতি একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক বিদেশী পণ্য-বিক্রেতার বাটীতে অগ্নিসংযোগের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অবশ্য বিদ্রোহিতা দমনই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সেই শুভ উদ্দেশ্যেই এই দলননীতির অবতারণা। কিন্তু লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান দ্বারা কি দেশে স্থায়ী শান্তিসন্তোষ স্থাপিত হওয়া কখনো সম্ভবে? উক্তরূপ উপায় তাহার অনুকূল হওয়া দূরে থাক এই কারণে গভর্ণমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণও এখন অন্তরে অসন্তোষ অনুভব করিতেছেন। এইরূপ নীতির—এইরূপ ফলই অবশ্যম্ভাবী। প্রজার মনোরঞ্জনে শাসনের সার্থকতা হইলে আর রাজভক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারালয় বা কারাগারের আশ্রয় লইতে হয় না। মিণ্টোর ন্যায় নীতিজ্ঞ ব্যক্তি এখনো যে কেন একথা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না—ইহাতে আমরা নিতান্ত বিস্মিত এবং দুঃখিত হইয়াছি।

রাজভক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।—প্রকৃতপক্ষে রাজপক্ষই বা এই বিদ্রোহিতার জন্য কতদূর দায়ী তাহা তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বঙ্গবিভাগসূচনা হইতেই লোকে বিক্ষিপ্তচিত্ত, ইহা হইতেই বন্দেমাতরং মন্ত্রের প্রচার, ইহা নিবারণ সঙ্কল্পেই উষ্ণশোণিত বোধশূন্য বালকগণ বিকৃত মস্তিষ্ক; অথচ বঙ্গবিভাগ রহিত দ্বারা এই অসন্তোষের মূল উৎপাটন না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ বেত্র হস্তে রাজভক্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হইলেন! বস্তুতঃ বঙ্গবালকগণ সাধারণতঃ উদ্ধতস্বভাব অশিষ্টাচারী, অসহিষ্ণু নহে। কর্ত্তৃপক্ষগণ শিষ্টাচারও সহানুভূতি প্রদর্শনে সহজেই যেখানে তাহাদিগকে বাধ্য করিতে পারিতেন—সেইখানে রূঢ় ব্যবহারে কঠোর নীতিতে তাহাদের অবাধ্যতা ক্রমশ রাজদ্রোহিতায় গঠন করিয়া তুলিলেন!!

কিঙ্গসফোর্ডের প্রতি বালকগণ খড়্গহস্ত হইল কেন? বন্দেমাতরং শব্দ উচ্চারণকারীদিগকে তিনি নিগৃহীত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ষড়যন্ত্রের মূলে যদি কোন কারণ থাকে ত তাহা কি? ওয়েষ্টন সাহেব বালকদিগকে প্রদর্শনীতে বন্দেমাতরং চিহ্ন ধারণ করিতে দেন নাই।—বন্দেমাতরং তাহাদিগের নিকট গুরুমন্ত্রের ন্যায় পূজ্য; তাহাদের অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই এই sentimentটুকু লইয়াই তাহারা আপনাদিগকে বলীয়ান মনে করে—যদি এই ফাঁকা sentementটুকুর মূলেও কুঠারাঘাত করা হয় তাহাদের এই কল্পিত বলটুকুও হরণ করা হয়—তাহা হইলে আর তাহাদের ধৈর্য্য থাকে কিরূপে? তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিল! কোন বড় অধিকার রক্ষায়—আসলক্ষতি যাহাতে নাই এমন ছোটখাট অধিকার দানে মুক্তহস্ত হওয়া রাজনীতিজ্ঞেরই কাজ। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সামান্য সহানুভূতি পাইলে বালকগণ কিরূপ বশীভূত হয়—১৬ তারিখে হ্যালিডে সাহেবের প্রতি সম্মানই তাহার দৃষ্টান্তের স্থল। সে দিন হ্যালিডে সাহেব বন্দেমাতরং উচ্চারণে বাধা না দিয়া নিজেই তাহাদের সহিত বন্দেমাতরং উচ্চারণ করায় বালকগণ এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে 'রাখি'তে 'রাখি'তে তাঁহার হাত ভরিয়া দিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে রাজজাতিদিগের রূঢ় ব্যবহারই রাজভক্তির হন্তারক—এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে দিন তাঁহারা প্রজাকে সমকক্ষভাবে দেখিবেন সে দিন হইতে দেশে চির শান্তি প্রবাহিত হইবে।—রূঢ়তার হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে, দেশের বালকদিগকে বহু স্থানে রূঢ় হইতে হয়—তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা এ সম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে যে একটি গল্প শুনিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—একজন ট্রামারোহী ইংরাজ—সম্মুখের বেঞ্চে পা তুলিয়া দিলেন। সেই বেঞ্চে আসীন বাঙ্গালীটি দু একবার তাহাকে পা নামাইতে বলায় তিনি অবশ্য তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। বাঙ্গালী নিগার কি ভদ্রতার পাত্র! তখন আর একজন বঙ্গযুবক পূর্ব্ব যুবকের সহিত স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া সাহেবের বেঞ্চে পা তুলিয়া দিল। সাহেব ঝগড়ার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া তখন পা নামাইয়া লইল।

আখসারই ত এইরূপ ঘটে। বিলাতের কুণ্ডলালের সহিত যে মারামারি তাহারও মূলে ইংরাজের এইরূপ অভদ্র ব্যবহার।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রজাহিতের অনেক চেষ্টা করিতেছেন। দেশে যাহাতে ধন বৃদ্ধি হয়—জ্ঞান বিস্তার হয়, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হয় সে জন্য তাঁহাদের চেষ্টার অভাব নাই—তথাপি প্রজাবর্গের নিকট তাঁহারা যশস্বী হইতে পারেন না কেন? তাঁহারা দেশের লোকের মন বুঝিয়া কাজ করিতে চাহেন না; তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বন্ধুতা করিয়া তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সুখ দুঃখ sentimentএ সহানুভূতি দেখাইয়া চলেন না বলিয়া! ইংরাজ সংবাদপত্রগণ পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব ক্রমাগত বর্দ্ধিত করে; তাহার দমন না করিয়া দেশীয় সংবাদ পত্রই অযথা শাসিত হয়। ভারতবাসীকে রাজপক্ষ এমনি দীনহীন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, যে কার্য্যদক্ষতা সত্ত্বেও তাহাদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যের উপযুক্ত বিবেচনা করেন না। এই ভেদজ্ঞানে ভারতবাসীর অপমানিত অনুভব করিবার অধিকার আছে ইহা পর্য্যন্ত তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। অথচ তাঁহারা রাজভক্তির অভাব দেখিলেই আশ্চর্য্য হইয়া উঠেন।

বৃটিস প্রেষ্টিজ।—তাঁহারা কি সত্যই মনে করেন প্রজারঞ্জনে বৃটিস প্রেষ্টিজ নষ্ট হইবে? সেই জন্যই কি আমাদের কোন আবেদন নিবেদনে তাঁহারা কর্ণপাত করিতে চাহেন না? টাইমস স্পষ্টই বলিয়াছেন বটে বঙ্গবিভাগ উঠাইয়া দিলে বাঙ্গালীদিগকে তুষ্ট করা হইবে। প্রজাতুষ্ট করা কি সত্যই গর্হিতনীতি? বঙ্গবিভাগ দেশের অসন্তোষ অশান্তির প্রকৃত কারণ একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াও এই প্রেষ্টিজ ভঙ্গ ভয়েই কি মর্লি প্রমুখ মন্ত্রিদল বঙ্গবিভাগ রহিত করিলেন না? সেই জন্যই কি দেশের লোকের এত উপরোধ অনুরোধেও বৃদ্ধ দুর্গাচরণ এখনো জেলে, সেই জন্যই কি বিনা বিচারে নির্দ্দোষ ব্যক্তি বন্দী, নির্ব্বাসিত, আর সমগ্র রাজ্যের এই অশান্তি, হাহাকারের উপর বৃটিস প্রেষ্টিজ সদর্পে দণ্ডায়মান। কিন্তু হায়। ভারতবাসী এ প্রেষ্টিজের মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম। বজ্রশাসননীতিকেই তাহারা রাজগৌরবজনক বলিয়া জানে না। লর্ড ক্যানিং তাঁহার করুণনীতির দ্বারাই ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার শাসন চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ড ও ভারতে বৃটিশ বিচার-ভেদ।—সে দিন লণ্ডন নগরে কুণ্ডলাল ভট্টাচার্য্য নামে এক ছাত্র সেক্রেটরি অফ্ ষ্টেটের মন্ত্রণা সভার সভ্য সার উইলিয়াম লীওয়ার্ণার সাহেবকে প্রহারকরার অপরাধে তথাকার বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়। বাদীর পক্ষের উকিল ব্যাপারটাকে বেশ একটা রাজনৈতিক রং দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারক সে কথা না শুনিয়া কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড বিধান করিয়াছেন। তিন শর্তে অঙ্গীকার মুচলিকা লিখাইয়া লইয়া তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। ছয় মাস কালের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ পুনরায় আসিলে সে দণ্ডলাভ করিবে এইমাত্র।

কিন্তু এরূপস্থলে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিচারকগণ আইনের চক্ষে অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, রাজনৈতিক দিক হইতে অপরাধীর বিচার করিয়া থাকেন। ফলে অনেক সময়ে সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হয়। কেবল তাহাই নহে, কোন্ কালে কে কি বলিয়াছিল বা করিয়াছিল তাহার জন্য আজকাল গবর্মেণ্ট তাহাদিগের নামে অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন এবং বিচারকগণও সেই সকল লোকের প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ; সেদিন বর্দ্ধমানে তিনজন লোক অস্ত্রআইনের অন্তর্গত অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারে প্রত্যেককে দুই বৎসরের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে ইহারা নিতান্ত নিরীহ ও নিরপরাধ। আপিলে তাহাই সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। সেশন জজ একজনকে মুক্তিদান

করিলেন ও অপর দুই জনের প্রত্যেককে কেবল ২৫০৲ টাকা জরিমানা করিলেন। আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি যে দেশে যথার্থ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অপক্ষপাতি বিচার হয় না। ব্রিটিশ বিচারের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে!

প্রজার স্বাস্থ্য ও রাজা। আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পীড়িত। এই কারণে দেশের কত গ্রাম পরিত্যক্ত, কত জনপদ জনহীন এবং সমগ্র জাতি রুগ্ন, দুর্ব্বল ও নির্জীব! কিন্তু এতকাল গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অবসর লাভ করেন নাই। প্রজা রক্ষা যদি রাজার কর্ম্ম ও ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে এই মহারোগকে দেশ হইতে দূর করিতে চেষ্টা করা রাজার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে তাঁহারা কিঞ্চিৎমাত্র মনোযোগ করিলে যে নিরুপায় প্রজার কত অকাল মৃত্যু নিবারিত হয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়ের চেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিব। তিনি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার অস্বাস্থ্যকর গ্রাম সকলের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সেই অর্থে বহরমপুরের নিকট চুয়া নামক গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা হয়। গ্রামের জঙ্গল কাটাইয়া জলপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করিয়া, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া এবং গ্রামবাসীকে স্বাস্থ্যশিক্ষা দান করিয়া, পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রামে মৃত্যুসংখ্যা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। অতএব প্রজার এই অকাল মৃত্যু যে গবর্মেণ্ট চেষ্টা করিলেই অনেক পরিমাণে নিবারণ করিতে পারেন, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের প্রার্থনা যে গবর্মেণ্ট এখনও এ কর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী হউন এবং তাঁহাদের উপেক্ষার ফলে অকারণ প্রজানাশ নিবারণ করুন।

তারকেশ্বরে স্বেচ্ছাসেবক। বঙ্গের স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ের উপর নানা কারণে অনেকের বিষদৃষ্টির পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা উপযুক্ত নেতৃত্বে চালিত হইলে যে দেশের অশেষ মঙ্গল কর্ম্ম সাধন করিতে পারে, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কলিকাতায় অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ে তাহাদের কল্যাণকর শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। সম্প্রতি তারকেশ্বরে শিবরাত্রি উপলক্ষে তাহারা যাত্রীগণের যেরূপ সেবাসহায়তা করিয়াছে, তাহাতে তাহারা রাজা প্রজা উভয়েরই কৃতজ্ঞতা ভাজন। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রায় ত্রিশ হাজার যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল। যুবকগণের অক্লান্ত সেবা ও শ্রমের ফলে যাত্রীগণের প্রতি এবার আর দুষ্টেরা কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহাদের কর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষ এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এই মহৎকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং আগামী চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে তাহাদের সহায়তা পাইলে সুখী হইবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্যে সহায়তা করিলে ও তাহাদিগকে সুভাবে চালিত করিলে, দেশের অনেক উপকার ও মঙ্গল সাধিত হয়, এবং গবর্মেণ্টেরও অনেক দায়িত্ব-কষ্ট কমিয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী। স্বর্গীয় মহারাণী তাঁহার ঘোষণাপত্রে প্রচার করেন যে ভারতবাসী তাঁহার রাজ্যগ্রহণের দিন হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে ব্রিটিশ প্রজার সকল অধিকার লাভে ও উপভোগে সমর্থ হইবে, এবং তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে বর্ণভেদে ব্যবহারভেদ করা হইবে না! সেদিন আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটও তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর এই উদার বাণীর সমর্থন করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন। ভারতে এই আশ্বাসবাণী সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত না হইলেও, বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃগণ যে ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে ব্রিটিশ প্রজার অধিকার দানের পথ সুগম করিবার প্রয়াস করিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের বাহিরে আমরা ভারতবাসীর প্রতি ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবহারই দেখিতে পাই! দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন বুয়রগণের স্বাধীন রাজত্ব ছিল, তখন বুয়রগণ ভারতবাসীর প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার করেন না বলিয়া ইংরাজগণ আক্ষেপ করিতেন। বুয়রগণের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে

TORN PAGES

ভারতবাসীর দুর্দশা তাঁহাদের দুরবস্থার একটা কারণ বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই সকল ভারতবাসীর আজীবন শ্রম, চেষ্টা ও স্বার্থ ত্যাগের ফলেই তথাকার শ্রীসম্পদ আজ এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। বুয়র যুদ্ধের সময়ে তথাকার ভারতবাসীগণ আপনাদের প্রাণপর্য্যন্ত দিয়াও ইংরাজকে জয়লাভে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী তাহার এই রাজভক্তি, স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আজ কি পাইয়াছে! আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় কোথাও তাহার ভূমি ক্রয় করিবার অধিকার নাই; কোথাও তাহার সাধারণ হোটেলে প্রবেশের পর্য্যন্ত অধিকার নাই, কোথাও তাহার সাধারণ রাজপথে চলিবার অধিকার নাই, কোথাও তাহার রাত্রিকালে গৃহ হইতে বাহির হইবার অধিকার নাই, কোথাও তাহার যথেচ্ছ প্রবেশের পর্য্যন্ত অধিকার নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্প্রতি ভারতবাসীর প্রতি নাম রেজিষ্ট্রী করার এক নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রেজিষ্ট্রি করাইবার অর্থ এই যে, শ্যামাঙ্গ প্রজাগণ এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকিবে যে উহাদের বিরুদ্ধে কোন শ্বেতাঙ্গ কোনপ্রকার অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিলে, উহাদিগের পক্ষে কেবলমাত্র অপরাধ অস্বীকার করিলে চলিবে না। শ্বেতাঙ্গ তাহার অভিযোগ সমর্থনে কোনপ্রকার প্রমাণ না দিলেও, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আর যদি কৃষ্ণাঙ্গ অকাট্য প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারে যে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ অমূলক তবেই সে দায়মুক্ত। প্রথমে অধিকাংশ ভারতবাসীই তাঁহাদের নাম রেজেষ্ট্রি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের এই কর্ম্মের ভাবী ফল উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা অনেকে রেজেষ্ট্রি পত্র পুড়াইয়া ফেলেন। এই অপরাধে দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক গণ্যমান্য ভারতবাসীকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আফ্রিকাবাসী কৃষ্ণাঙ্গগণ ইংলণ্ডে রাজসন্নিকটে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল কিছুই হয় নাই। এত প্রকার নৈরাশ্য, বাধা ও বিপত্তির মধ্যেও গান্ধি প্রমুখ ভারতবাসী যেরূপ অদম্য সাহস ও দৃঢ়তার সহিত আপনার সুহজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের চরিত্রের ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অসীম ভক্তি জন্মে। যতদিন পৃথিবীতে থাকিয়া এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে যে ভবিষ্যতে একদিন বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদিগেরই অঙ্কে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এদেশেও আমাদের ভারতবাসী ভ্রাতাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলি। ইহাই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। অধর্ম্ম ও অন্যায় জগতে কখনও চিরদিন একাধিপত্য স্থাপন করে নাই, করিতে পারিবে না। যে পক্ষ এই কথা বুঝিয়া সহিষ্ণুভাবে অবিচলিত চিত্তে কার্য্য করিতে পারিবেন সেই পক্ষই পরে জয়লাভ করিবেন ইহা সুনিশ্চিত।

বর্ষ-বিদায়।

বরষের শেষ রবি অস্তে গেল ধীরে ধীরে,
আঁধারে মিলিল বর্ষ অতীতের স্নেহ-নীড়ে!
ছায়াময় বন-ভূমে শেষগান মিলি যায়,
তার সনে হিয়া মোর একবার বলে 'হায়!'
সে যখন এসেছিল, নববধূটীর মত,
উষা এনেছিল ডেকে দেখাইয়া গৃহ-পথ।
প্রথম তরুণ রবি নদী তীরে ফুল ফল,
পরিমল ভরা বায়ু ঢেউ-হীন নদীজল।
যাহাদের কাছে ছিল তাহাদেরি সব দিয়ে
আপনার তরে শুধু স্মৃতিটুক গেল নিয়ে;
এখন তাহারে ডেকে যদি কেহ এইবেলা
বলে তারে,—"হে বরষ, করিয়াছ একি খেলা!"
তা হলে সজল চোখে সেকি ফিরে বলিবে না,
"আমি তো চুকায়ে গেনু আমার যা-কিছু দেনা!"

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।